বাংলা-বিদ্যার
মৌলিকজ্ঞান
কোষগ্রন্থ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা

ড. সৌমিত্র শেখর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

SUSTAINED JOB MATERIALS

SUSTAINED JOB MATERIALS

https://t.me/sustainjm

আসুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বক্তব্যকে
ভুল প্রমাণ করি :

'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।'

'হাতির লেজ হওয়ার চেয়ে স্বাধীন পিঁপড়া হওয়া শ্রেয়।' –সৌমিত্র শেখর

সূচিপত্র

বাঙালি ও বাংলা ভাষা

বিশ্বায়নকৃত জাতি নিয়ে ২৩
সাধারণ আলোচনা ২৩
জাতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৫
লিপি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৬
ভাষা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৭
বাংলা ভাষা : সংজ্ঞার্থ ও স্থান ৩১
ভাষাচিত্র ৩২

বাংলা ব্যাকরণ

সাধারণ আলোচনা ৩৬
ধ্বনি ও বর্ণ ৩৭
যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ ৪০
ধ্বনি পরিবর্তন ৪২
ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ৪৬
সন্ধি ৪৭
লৈঙ্গিক শব্দ ৫১
বচন ৫৪
উপসর্গ ৫৫
প্রত্যয় ৫৭
কারক ৬০
সমাস ৭৭
অব্যয়ীভাব সমাস ৭৭
তৎপুরুষ সমাস ৭৯
দ্বিগু সমাস ৮২
কর্মধারয় সমাস ৮২
দ্বন্দ্ব সমাস ৮৫
বহুব্রীহি সমাস ৮৬
অন্যান্য সমাস ৮৮
শব্দ ৮৯
উৎপত্তিগত দিক ৯০
গঠনগত দিক ৯৪
অর্থগত দিক ৯৪
দ্বিরুক্ত শব্দ / অনুকার শব্দ ৯৫
পদের শ্রেণিরূপ ৯৬
পদ-প্রকরণ ১০১
পদ এবং Parts of Speech: সম্পর্ক ১০৬
বিশেষ্য-উদাহরণ ১০৭
সর্বনাম-উদাহরণ ১০৭
নাম-বিশেষণ-উদাহরণ ১০৭
ভাব-বিশেষণ-উদাহরণ ১০৮
ক্রিয়া-উদাহরণ ১০৮
পদাশ্রয়ী অব্যয়-উদাহরণ ১১০
সংযোজক অব্যয়-উদাহরণ ১১০
অনন্বয়ী অব্যয়-উদাহরণ ১১০
বাক্য-প্রকরণ ১১১
যতি বা ছেদচিহ্ন ১১৪
সমার্থক ও প্রতিশব্দ ১১৬
বিপরীতার্থক শব্দ ১১৯
প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ১২৪
অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ ১৫৫
সংক্ষেপে বাক্যশুদ্ধি ১৫৯
বানানের নিয়ম ১৬০

বাংলা-বিদ্যার অন্যান্য শৃঙ্খলা

ভাষাবিজ্ঞান
পরিচয় ১৬৪
ধ্বনিতত্ত্ব ১৭১
রূপতত্ত্ব ১৭৩
বাক্যতত্ত্ব ১৭৪
শব্দার্থতত্ত্ব ১৭৬
ছন্দ-প্রকরণ ১৭৮
অলঙ্কার নোটস ১৮১

শব্দদ্বৈত ১৮১
অর্থদ্বৈত ১৮৩
শব্দবৈত ও বাক্য-রীতি ১৮৯
একদল প্রবাদ ২০৩
প্রবাদ ২০৯
প্রবাদ-প্রবচন থেকে Proverbs ২৩১
প্রবাদ থেকে ইংরেজি : প্রবাদসাদৃশ্য শব্দ ২৪০
হাত-পরিচয় ২৪০
আড়াই-পরিচয় ২৪১
পুরাণাদি ২৪১
বাংলা ও পরিচয় ২৪২
পাত্র-পরিচয় ২৪৩
ঘরদোর ২৪৩
শোকতাপ-পরিচয়ন ২৪৪
অলঙ্কার ২৪৪
রোগ ২৪৪
ওষুধ এবং চিকিৎসা ২৪৫
পেশা ২৪৫
ব্যবসা-বাণিজ্য ২৪৭
কৃষিকাজ ২৪৮
খেলাধুলা ২৪৯
শিক্ষা ২৪৯
ধর্ম ২৫০
আইন ও বিচার ২৫১
প্রতিরক্ষা ২৫২
পশু ২৫৩
পাখি ২৫৩
মাছ ২৫৪
কীট-পতঙ্গ ২৫৪
ফল ২৫৪
ফুল ২৫৫
রং ২৫৫
গণিত ২৫৫
ধাতু এবং খনিজ পদার্থ ২৫৬
সময়, দিন ও মাস ২৫৬
পারিভাষিক শব্দ ২৫৭

বাংলা সাহিত্য
সাধারণ আলোচনা ২৬৯
সাহিত্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা ২৬৯

প্রাচীনযুগ
সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা
চর্যাপদের কবিদের পরিচয় ২০৯
কাহ্নপা ২১০
কুক্কুরীপা ২১০
ধর্মপা ২১০
ভেওপা ২১১
বিরূপা ২১১
বীণাপা ২১২
ডোম্বিপা ২১৩
ভুসুকুপা ২১৩
মহীধরপা ২১৪
লুইপা ২১৪
শবরপা ২১৪
শান্তিপা ২১৫
সরহপা ২১৫
ডোম্বীপা ২১৭
কম্বলাম্বরপা ২১৮
ওড়ীপা ২১৯
চাটিলপা ২১৯
আর্যদেবপা ২২০
দারিকপা ২২১
তাড়কপা ২২২
কঙ্কণপা ২২৩
জয়নন্দীপা ২২৩
তন্ত্রীপা ২২৪

অন্ধকারযুগ ও অন্যান্য
অন্ধকারযুগ ২২৫
শূন্যপুরাণ ২২৫
সেক শুভোদয়া ২২৭
নিরঞ্জনের উষ্মা ২২৮

মধ্যযুগ
সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা ২৮১
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৮৪
শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব পদাবলি ২৮১
মঙ্গলকাব্য ২৯২

হাজার বছরের ৩৪৫
মুসলিমরচিত পুথি ৩৪৭
লোকসাহিত্য ও অন্যান্য ৩৫৪
কবিওয়ালা ও পাঁচালি ৩৫৫
মৈমনসিংহ-গীতিকা ৩৬৮

লেখক পরিচিতি ও তাঁদের কর্মের পরিচয়
আবদুল হকিম ৩৬৮
আলাওল ৩৬৮
একটি ভিডিও ৩৬৯
উইলিয়াম জোন্স ৩৬৯
কবি কঙ্ক ৩৬৯
কাশীরাম দাস ৩৭০
কোরেশী মাগন ঠাকুর ৩৭০
কৃত্তিবাস ওঝা ৩৭০
গোবিন্দদাস ৩৭১
চণ্ডীদাস ৩৭২
চন্দ্রাবতী ৩৭৩
জ্ঞানদাস ৩৭৩
দৌলত উজির বাহরাম খান ৩৭৪
দৌলত কাজী ৩৭৪
দ্বিজ বংশীদাস ৩৭৬
বড়ু চণ্ডীদাস ৩৭৭
বিজয় গুপ্ত ৩৭৮
বিদ্যাপতি ৩৭৮
ভারতচন্দ্র রায় ৩৭৮
'আমার সন্তান' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮০
মানিক দত্ত ৩৮১
মালাধর বসু/গুণরাজ খান ৩৮১
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৩৮১
রামনিধি গুপ্ত ৩৮১
রামপ্রসাদ সেন ৩৮২
শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ ৩৮২
শাহ মুহম্মদ সগীর ৩৮২
সৈয়দ সুলতান ৩৮৩

আধুনিকযুগ
লালন ফকিরের ৩৮৪

লেখক পরিচিতি ও তাঁদের কর্মের পরিচয়
অক্ষয়কুমার বড়াল ৩৯৩
অন্নদাশঙ্কর রায় ৩৯৬
অমিয় চক্রবর্তী ৩৯৬
আবদুল কাদির ৩৯৮
আবদুল গফফার চৌধুরী ৩৯৯
আবদুল মান্নান সৈয়দ ৪০০
আবদুল্লাহ আল মামুন ৪০১
আবদুল্লাহ আল-মুতী ৪০২
আবু ইসহাক ৪০৩
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ৪০৪
'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' থেকে জিজ্ঞাসা ৪০৪
আবু জাফর শামসুদ্দীন ৪০৫
আবু রুশদ ৪০৫
আবু হেনা মোস্তফা কামাল ৪০৬
আবুল কাসেম শামসুদ্দীন ৪০৬
আবুল ফজল ৪০৭
আবুল মনসুর আহমদ ৪০৮
আবুল হাসান ৪০৯
আবুল হুসেন ৪১০
আবুল হোসেন ৪১১

আবেদ আলী মাতুব্বর ৩২১
আল মাহমুদ ৩২২
'লোক-লোকান্তর' থেকে জিজ্ঞাসা ৩২৩
আলাউদ্দিন আল আজাদ ৩২৩
আশরাফ সিদ্দিকী ৩২৪
আসকার ইবনে শাইখ ৩২৪
আহমদ ছফা ৩২৬
আহমদ শরীফ ৩২৭
আহসান হাবীব ৩২৮
'সেই অন্ধ' থেকে জিজ্ঞাসা
'আমি কোনো আগন্তুক নই'
থেকে জিজ্ঞাসা ৩৬০
ইমদাদুল হক মিলন ৩৬০
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩৬১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৬২
উইলিয়াম কেরি ৩৬৫
এস ওয়াজেদ আলি ৩৬৬
কাঙাল হরিনাথ ৩৬৭
কাজী আবদুল ওদুদ ৩৬৭
কাজী ইমদাদুল হক ৩৬৮
কাজী নজরুল ইসলাম ৩৬৯
'আমার পথ' থেকে জিজ্ঞাস ৩৭৯
'সাম্যবাদী' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৭৯
'মানুষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮০
'ভাব ও কাজ' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮০
'নারী' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮২
কাজী মোতাহার হোসেন ৩৮৩
কামরুল হাসান ৩৮৩
'আমাদের লোকশিল্প' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৪
কামিনী রায় ৩৮৬
'পাছে লোকে কিছু বলে'
থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৬
কালিদাস রায় ৩৮৭
'বাবুরের মহত্ত্ব' থেকে জিজ্ঞাসা ৩৮৭
কায়কোবাদ ৩৮৯
'প্রার্থনা' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৩৯০
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৩৯১
কুসুমকুমারী দাশ ৩৯১
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ৩৯২
গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই) ৩৯২
গোবিন্দচন্দ্র দাস
গোলাম মোস্তফা
চন্দ্রকুমার দে
জগদীশ গুপ্ত
জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
জন ক্লার্ক মার্শম্যান
জসীমউদ্দীন
'রূপাই' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা
'পল্লিজননী' থেকে জিজ্ঞাসা
অহিব রায়হান
'একুশের গল্প' থেকে জিজ্ঞাসা
জীবনানন্দ দাশ
'এই পৃথিবীতে এমন এক স্থান আছে'
থেকে জিজ্ঞাসা
'সেই দিন এই মাঠ'
থেকে জিজ্ঞাসা
'আবার আসিব ফিরে'
থেকে জিজ্ঞাসা
জোশুয়া মার্শম্যান
ডিরোজিও, হেনরি
তসলিমা নাসরিন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তালিম হোসেন
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
দাউদ হায়দার
দিলওয়ার
'রক্তে আমার অনাদি অস্থি'
থেকে জিজ্ঞাসা
দিলারা হাসেম
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দীনবন্ধু মিত্র
দীনেশচন্দ্র সেন
দোম আন্তোনিয়ো
নওয়াব ফয়জুন্নেসা
নবীনচন্দ্র সেন
নরেন বিশ্বাস
নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড
নির্মলেন্দু গুণ
'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে
আমাদের হলো' থেকে জিজ্ঞাসা ৪১
নীলিমা ইব্রাহিম ৪২৫
নুরুল মোমেন ৪২৬
পঞ্চানন কর্মকার ৪২৭
প্রমথ চৌধুরী ৪২৭
'বইপড়া' থেকে জিজ্ঞাসা ৪২৮
প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪৩২
প্যারীচাঁদ মিত্র ৪৩২
ফজিলতুন্নেসা ৪৩৩
ফররুখ আহমদ ৪৩৩
ফয়েজ আহমদ ৪৩৪
বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
'নিমগাছ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৩৬
বদরুদ্দীন উমর ৪৩৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
'বিড়াল' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৪২
বন্দে আলী মিয়া ৪৪৫
বিজন ভট্টাচার্য ৪৪৫
বিপ্রদাশ বড়ুয়া ৪৪৬
'মংডুর পথে' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৪৭
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৯
'আহ্বান' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৫১
'পড়ে পাওয়া' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৫২
বিষ্ণু দে ৪৫৬
বিহারীলাল চক্রবর্তী ৪৫৭
বুদ্ধদেব বসু ৪৫৮
'নদীর স্বপ্ন' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৬০
বেনজীর আহমদ ৪৬১
মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ ৪৬১
মমতাজ উদদীন আহমদ ৪৬২
'সুখী মানুষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৬২
মহাদেব সাহা ৪৬৩
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪৬৩
'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ'
থেকে জিজ্ঞাসা ৪৬৮
'কপোতাক্ষ নদ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৬৮
'বঙ্গভূমির প্রতি' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৬৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭১
'মাসি-পিসি' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৭৩
'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৭৪
'তৈলচিত্রের ভূত' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৭৫
'মমতাদি' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৭৭
মামুনুর রশীদ ৪৭৭
মাহমুদুল হক ৪৭৮
মীর মশাররফ হোসেন ৪৭৯
'জমীদার দর্পণ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৮১
মুনীর চৌধুরী ৪৮১
'রক্তাক্ত প্রান্তর' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৮৫
মুস্তাফা মনোয়ার ৪৮৬
'শিল্পকলার নান্দনিক'
থেকে জিজ্ঞাসা ৪৮৬
মুহম্মদ আবদুল হাই ৪৮৯
মুহম্মদ এনামুল হক ৪৮৯
'বাংলা নববর্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৯০
মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ৪৯১
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ৪৯১
'পল্লীসাহিত্য' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৯২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ৪৯৫
মোতাহের হোসেন চৌধুরী ৪৯৫
'জীবন ও বৃক্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৯৬
'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৯৬
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ৪৯৭
মোহাম্মদ আকরম খাঁ ৪৯৭
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী ৪৯৮
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ৪৯৮
'মানুষ মুহম্মদ' থেকে জিজ্ঞাসা ৪৯৯
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ৫০১
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ৫০১
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ ৫০২
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ৫০২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ৫০৩
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ৫০৩
মোহিতলাল মজুমদার ৫০৪
যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৫০৪
রণেশ দাশগুপ্ত ৫০৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫০৬
রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা ৫২৩
'সুভা' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা ৫২৪
'অপরিচিতা' থেকে জিজ্ঞাসা ৫২৫
'ঐকতান' থেকে জিজ্ঞাসা ৫২৬
'জুতা-আবিষ্কার' কবিতা
থেকে জিজ্ঞাসা ৫২৬
'দুই বিঘা জমি' থেকে জিজ্ঞাসা ৫২৮

ওসীদ কবীম ৫৩০
রামরাম বসু ৫৩০
রামমোহন রায় ৫৩১
লুৎফ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ৫৩২
লোকমুজ্জামান খান (দাদাভাই) ৫৩৩
লোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৫৩৩
'চাষার দুক্খু' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৩৪
লালন শাঁই ৫৩৫
'মানবধর্ম' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৩৬
শওকত আলী ৫৩৭
শওকত ওসমান ৫৩৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪১
'অতিথির স্মৃতি' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৪৬
শহীদ কাদরী ৫৪৭
শহীদুল জহির ৫৪৮
শহীদুল্লা কায়সার ৫৪৮
শামসুজ্জামান খান ৫৫০
'বাংলা নববর্ষ' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫১
শামসুদ্দীন আবুল কালাম ৫৫৪
শামসুর রাহমান ৫৫৬
'ফেব্রুয়ারি : ১৯৬৯' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫৭
'তোমাকে পাওয়ার জন্য
হে স্বাধীনতা' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৫৮
শাহ্ আবদুল করিম ৫৫৯
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৬০
'পালামৌ' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৬১
সতীনাথ ভাদুড়ী ৫৬৬
সত্যেন সেন ৫৬৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৬৮
'ঝর্ণার গান' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৬৯
সমর সেন ৫৬৯
সমরেশ বসু ৫৭০
সরদার জয়েনউদ্দীন ৫৭১
সাঈদ আহমেদ ৫৭১
সানাউল হক ৫৭২
সিকান্দার আবু জাফর ৫৭২
'আশা' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৪
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৫৭৫
সুকান্ত ভট্টাচার্য ৫৭৫
'রানার' কবিতা থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৬
'আঠারো বছর বয়স' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৭
'প্রার্থী' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৭৮

সুকুমার রায় ৫৮১
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৮২
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫৮৩
সুফিয়া কামাল ৫৮৭
'তাহারেই পড়ে মনে' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৮৮
'জাগো তবে অরুণা কন্যারা'
থেকে জিজ্ঞাসা ৫৮৯
সেলিনা হোসেন ৫৯১
সেলিম আল দীন ৫৯৪
সৈয়দ আলী আহসান ৫৯৭
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৫৯৯
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ৫৯৯
সৈয়দ মুজতবা আলী ৫৯৯
'প্রবাস বন্ধু' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯৯
সৈয়দ শামসুল হক ৫৯৯
'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে'
থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯৯
'আমার পরিচয়' থেকে জিজ্ঞাসা ৫৯৯
সোমেন চন্দ ৬০১
স্বর্ণকুমারী দেবী ৬০১
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৬০১
হাসান আজিজুল হক ৬০১
হাসান হাফিজুর রহমান ৬০১
হুমায়ুন আজাদ ৬০১
'বাঙলা শব্দ' থেকে জিজ্ঞাসা ৬০১
হুমায়ুন কবির ৬০১
হুমায়ুন আহমেদ ৬০১
'নিয়তি' গল্প থেকে জিজ্ঞাসা ৬০১
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০১

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম ৬১১
বাংলা পত্র-পত্রিকা ৬১১
বাংলা গানের ইতিহাস ৬২১
'বাংলা একাডেমি' ও একুশে বইমেলা
সংক্রান্ত তথ্যাবলি ৬৪১
ভাষাশহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৬৪৩
খনার বচন ৬৬১
সংখ্যাসূচক বাংলাজ্ঞান ৬৭১

s an English pa
d an influential f
st important line
entury.
r of the Eliza
ogian (পর্তুগি

ification.
cal Polite

506)

ার। অনে
ন। লেখ
। বছর
এ গ্রন্থে
য়েদের
লক্ষ্ম
ি ও

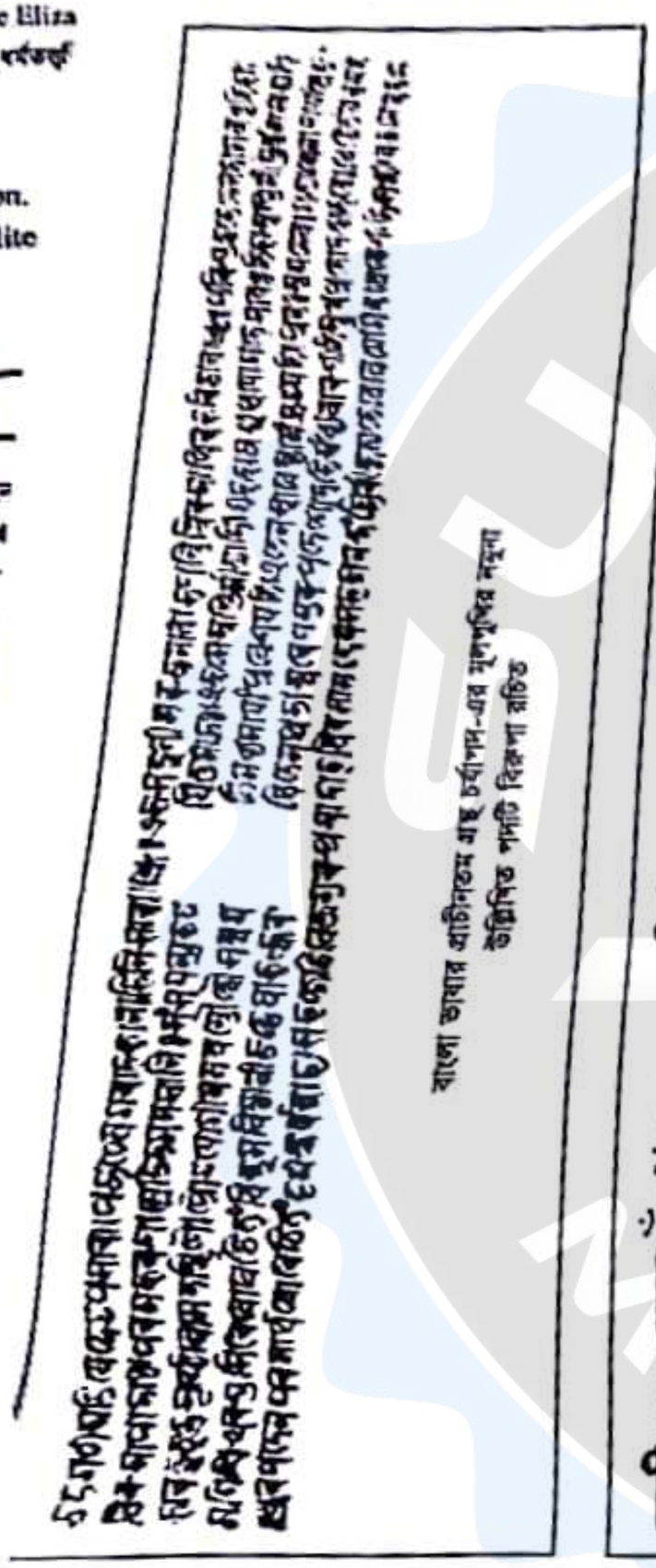

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ-এর মুদ্রণপুথির নমুনা
ঊনবিংশ পদটি বিরূপা রচিত

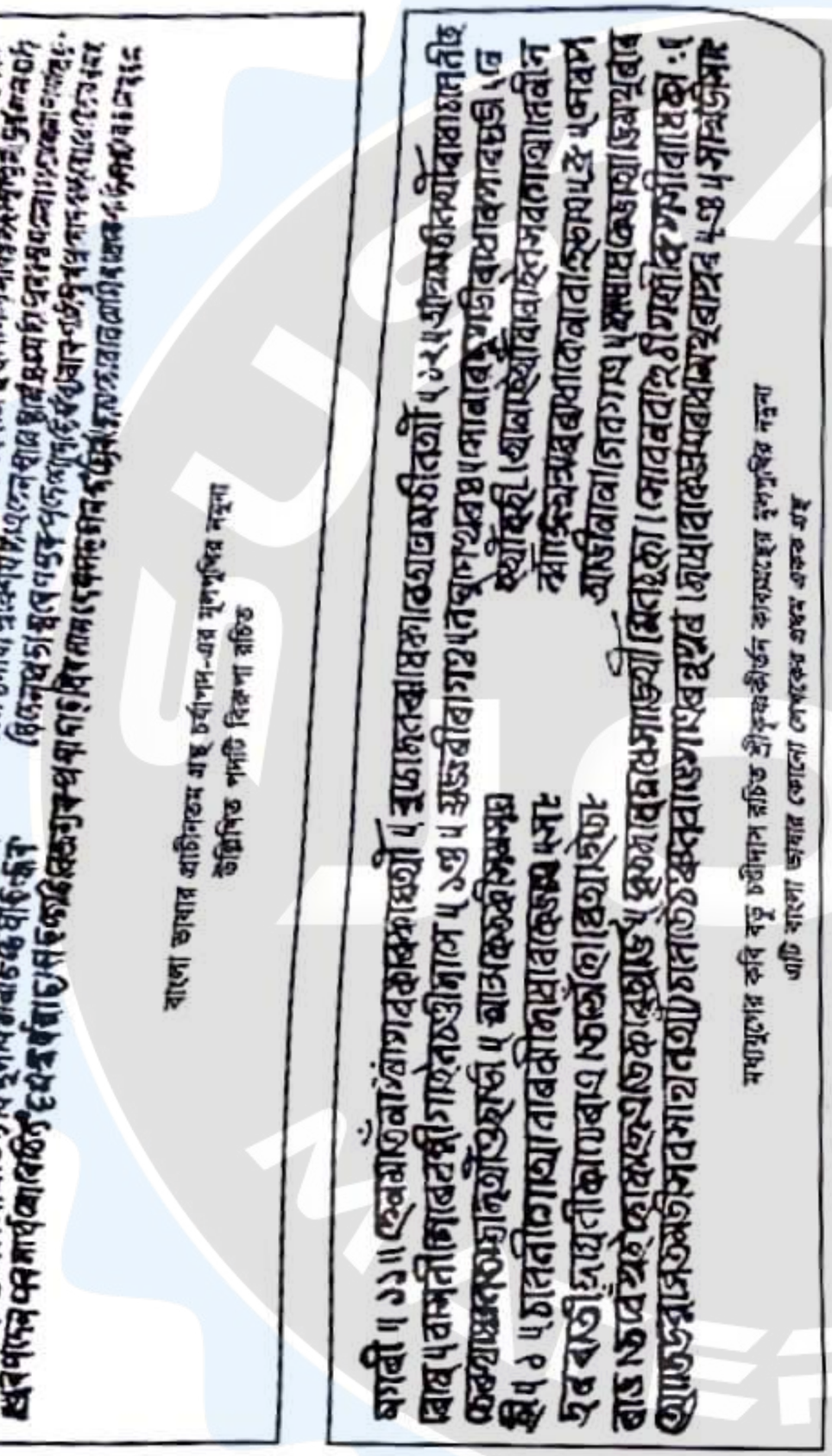

এটি বাংলা ভাষার কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ

মধ্যযুগের কবি বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থের মুদ্রণপুথির নমুনা

বাঙালি ও বাংলা ভাষা

বিশ্বায়নকৃত জাতি নিয়ে সাধারণ আলোচনা

পৃথিবীতে কতো জাতি রয়েছে নিশ্চয়ই বলা মুশকিল। তবে বিশ্বায়নের কারণে যারে যারে জাতিসত্তার পরিচয়টি যে পরিবর্তমান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বায়নের কথা এজন্যই আমরা শুধু আধুনিক প্রপঞ্চসমূহের পরিবর্তনকেই মনে করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, বাঙালি জাতিই প্রথম বিশ্বায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন জাতের মানুষ একত্রিত হয়েই বাঙালির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এতোদিন ধরণা করেছি : 'বাঙালি সংকর জাতি।' এটি খুবই সাদামাটা পরিচয়। আমরা বরং বলবো, বাঙালি বিশ্বায়নকৃত জাতি; সমরক্ত মানবদেহ ও সংস্কৃতিতে প্রথম বিশ্বায়নের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে বাঙালিরা। বাঙালির শরীরদেহেতো বটেই, তার ভাষাদেহ, সংস্কৃতিদেহ, পরিমণ্ডলদেহ সবকিছুতেই এই প্রথম বিশ্বায়নের ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বহিরাগত জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সম্মিলনে আজকের বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে। নৃতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুসারে এই অঞ্চলে প্রথম আসে খর্বকায় নিগ্রোপ্রতিম মানুষ। আফ্রিকা থেকে আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে পারস্য উপকূল বেয়ে ধীরে ধীরে এই মানুষেরা বর্তমান ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। এরপর আসে অস্ট্রিকরা। অস্ট্রিকদের পর দ্রাবিড় ভাষী মানুষ। প্রাক-ঐতিহাসিককালেই আসে নর্ডিক ও মোঙ্গলরা। বলা হয়, এরাই প্রাক-ঐতিহাসিককালে সর্বশেষ জনধারা, যারা এ অঞ্চলে আসে। আর ঐতিহাসিককালে এসেছে পারসিক, মেসিডোনীয়, গ্রিক, শক, হূন, তুর্কি, আফগান, মোগল, ইংরেজ, পাকিস্তানিরা। এই জনধারার মিশ্রণ এখনও অব্যাহত আছে, তবে অন্যভাবে। খ্রিষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে প্রথম বেদ সংকলন করা হয় এবং কক বেদে প্রথম বঙ্গ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় বলে সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মহাভারত ও মৎস্যপুরাণে বলি রাজার পাঁচ পুত্রের নাম বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে: অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। এসব তথ্য ও তত্ত্বের সূত্র ধরে বিশেষজ্ঞরা বলেন, আদি অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কহেন, তাঁরা নাকি উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল থেকে, স্থানে স্থানে বিশ্রাম করতে করতে এবং বিপরীত দিকগুলোর মানুষের সঙ্গে মিশতে মিশতে বাঙালির দেহ গড়ে উঠেছে উত্তরে মিশ্রণে। এই উপমহাদেশে আর্যভাষার যে প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় তা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনের সময় ব্যবহার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই লিপিকে ব্রাহ্মী লিপি বলা হয়। ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত হয়ে তিনটি রূপ ধারণ করে। এর একটি কুটিল রূপ। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে একে কুটিল লিপি, কেউ কেউ আবার লিপি বলেন। সে নিয়ে থেকে সুখের বিষয় এই যে, বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির সৃষ্টিকাল মোটামুটি কাছাকাছি। শুরু থেকেই বাংলা ভাষা বাংলা লিপি দিয়ে লিখিত হতো। ভাষাকে ভিত্তিরূপ করেই গড়ে উঠেছে এক-একটি জাতি বা উপজাতি। যেমন, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। কিন্তু সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে কোনো জাতি যখন তার নিজস্ব ভাষাকে বর্জন ও পর ভাষাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তখন সে তার জাতিসত্তাকেই ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মিশর বা ইজিপ্টের সভ্যতা যেমন প্রাচীন ছিল, তেমনি মিশরীয়রাও ছিল এক প্রাচীন জাতি। ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রাচীন মিশরীয় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন মিশরীয় ভাষা থেকে আধুনিক মিশরীয় ভাষা কপ্টিক (Coptic) উদ্ভূত হয়। ষোড়শ শতাব্দী অবধি মিশরবাসী এই ভাষাতেই কথা বলত এবং মিশরীয়দের জাতি-পরিচয়ও বজায় ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব-জাতির মিশরে অনুপ্রবেশের ফলে সমগ্র মিশরবাসী আরবি ভাষা গ্রহণ করে।

ফলে ক্রমে ক্রমে তারা আরব জাতিপরিচয়ে বিশ্বে পরিচিত হয়ে যায়।

ভাষার নিয়মই হলো এই যে, কোনো একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেলে সেই ভাষাভাষীদের জাতিগত পরিচয়ও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। সেই ভাষাভাষীরা যে পৃথক ভাষা গ্রহণ করে, সেই ভাষার জাতি-পরিচয়েই ক্রমে ক্রমে তারা পরিচিত হয়। তেমনি কোনো এক ভাষা যখন অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরিত হয়, তখন সেই প্রাচীন ভাষাভাষীর জাতি-পরিচয়ও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আর্যভাষী মানুষ ককেশীয় পার্বত্য পথে ভারতে আগমন করে। তাদের ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীগণ Old Indo-Aryan (O.I.A.) নামে অভিহিত করেছেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এই ভাষারই একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় বৈদিক সাহিত্যে। খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে 'বেদ' সংকলিত বলে তিনি মনে করেন। আর্যরা তাদের আদিবর্তী যাত্রা সিন্ধু নদের কূল থেকে গঙ্গা-যমুনার কূল পর্যন্ত বিস্তৃত করলে নিজেদের আধিপত্য ও ঔপনিবেশিকতা এবং ভাষার বিস্তার ঘটে। এই বিস্তার মূলত মধ্যভারত পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের ভাষার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। সম্প্রতিকালে অনেক গবেষক মনে করেন যে, আর্যরা আজকের পাঞ্জাব বা তার চেয়ে দূরবর্তী কোনো দেশ থেকে আসে নি, এসেছে এ অঞ্চলের কাছাকাছি কোনো দেশ থেকে। কেননা, আর্যদের জীবনযাপন ও ভাষা-সংস্কৃতিতে বহুদূর দেশে অবস্থানের পরিচয় নেই। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৬০০ অব্দের দিকে আর্যরা নিজেদের ভাষা সংস্কারে মনোনিবেশ করে। এই সংস্কারকৃত ভাষাই 'সংস্কৃত' ভাষা নামে পরিচিত। ভাষা হিসেবে 'সংস্কৃত' শব্দটির উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় মহাকাব্য 'রামায়ণে'। লোকমুখে চর্চিত হয়ে এই ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়, তার রূপের সঙ্গে 'বেদ'-এর ভাষার স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ফলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একটি 'লৌকিক সংস্কৃত' এবং অন্যটি 'বৈদিক সংস্কৃত'— এই দুই রূপের পরিচয় মেলে। তবে একথা সত্য, নিদর্শন পাওয়া এই দুই রূপের বাইরেও আলোচ্য ভাষার একাধিক রূপ অবশ্যই প্রচলিত কোনো পৃথক নিদর্শন পরবর্তীকালে আর পাওয়া যায় নি। ভাষার ক্রমবিবর্তিত এই রূপটিকে 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা' বা Middle Indo-Aryan (M.I.A) বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ এই হাজার বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে ভাষার বিবর্তনের এই অধ্যায়। 'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'র পর আসে প্রায় দেড় হাজার বছর গিয়েছে আমাদের একটি পরিমার্জিত ভাষারূপ পেতে।

'মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা'— যাকে 'প্রাকৃত' ভাষা হিসেবে অভিহিত করা হয়, কালের ধারাবাহিকতায় এর চারটি রূপে বিবর্তন ঘটেছিল। যেমন :

এক. আদিস্তর : খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত

দুই. প্রাক-মধ্যস্তর : খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

তিন. মধ্যস্তর : ২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

চার. অন্ত্যস্তর : ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত

ভাষার এই আদিস্তরের নিদর্শন মেলে পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থকে। তাছাড়া অশোকের কালের শিলালিপি বা উত্তর প্রদেশের যোগীমারা গুহায় প্রাপ্ত 'সুতনুকা' নাট্য শিলালিপিতে এই স্তরের ভাষার নিদর্শন 'উদীচ্যা-প্রাকৃত' বা 'প্রাচ্যা-প্রাকৃত' ভাষায় পাওয়া যাবে। মধ্যস্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটক ও মহাকাব্যে। এখানে অশিক্ষিত পুরুষ চরিত্রের মুখের ভাষায় 'মাগধী প্রাকৃত', নারীর মুখে 'শৌরসেনী প্রাকৃত', কাব্যদেহের ভাষায় 'মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত' ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ স্থান ও পাত্র ভেদে ভাষারূপের একটি বৈচিত্র্য আমরা লক্ষ করি। এভাবেই ভাষা অন্ত্যস্তরে এসে পৌঁছে। একে ভাষাতাত্ত্বিকগণ 'গৌড়ী প্রাকৃত' বলেছেন। বাংলা ভাষার প্রকৃত বিকাশ এখান থেকেই। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর 'গৌড় অপভ্রংশ' থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

উলিখিত চারটি [illegible]

'অপভ্রষ্ট'ও বলে। অপভ্রংশে কখনো শৌরসেনী, কখনো মাগধী ইত্যাদি ভাষার লক্ষ করা গেছে। কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, 'শৌরসেনী অবহট্‌ঠ' এক সময় সমগ্র উত্তর ভারতে শিষ্টজনগৃহীত সাহিত্যিক ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। এই অবহট্‌ঠ ভাষা থেকেই আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম শতকের দিকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের উদ্ভব ঘটে। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'নব্য ভারতীয় আর্যের উদ্ভবের সময় ভাষাগুলির মধ্যে যে সাধারণ লক্ষণ ছিল সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময়ের ভাষাগুচ্ছকে একটি বিশিষ্ট ভাষার সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনার সুবিধার জন্য এই কাল্পনিক ধাত্রী ভাষাটিকে প্রত্ন নব্য ভারতীয় আর্য (Proto-New Indo-Aryan) বলা হয়। অপভ্রষ্টের দ্বিতীয় বা শেষ স্তর হইল এই প্রত্ন নব্য ভারতীয়।' এইভাবে ভাষা বিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রবর্তী হয়। তবে এটা ঠিক, যে অনুমান 'প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা' থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে, তা-ই পরবর্তীকালে 'গৌড়ী ভাষা'য় বিবর্তিত হয়। এর নিদর্শন মালবে প্রাপ্ত শিলালিপিতে মেলে। এই ভাষাগুলি থেকে পূর্ব ভারতের অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরী, বাংলা ইত্যাদি ভাষার উদ্ভব ঘটে। অতএব এ কথা বলা চলে যে, প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে যে ক্রমিক ধারাবাহিকতা চলে এসেছে, উল্লিখিত সে রীতিতেই বৈদিক কথ্যভাষা, মাগধী ও গৌড়ী প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অপভ্রষ্ট (অবহট্‌ঠ)— এই স্তর অতিক্রম করে প্রাচীন বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। এরপর বাংলা ভাষা প্রায় দেড় হাজার বছর অতিক্রম করে আজকের আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা থেকে আধুনিক বাংলা ভাষা পর্যন্ত সময়কে নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

এক. প্রাচীনযুগের বাংলা ভাষা (৯৫০-১২০০ খ্রি.)

দুই. অন্ধকারযুগের বাংলা ভাষা (১২০১-১৩৫০ খ্রি.)

তিন. মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (১৩৫১-১৮০০ খ্রি.)

অনেকের মতে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের পর বাংলা ভাষায় এসেছে উত্তর-আধুনিক যুগ। অবশ্য এই মত সর্বজন স্বীকৃত নয়।

প্রাচীনযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় 'চর্যাপদ' গ্রন্থে। বৌদ্ধদের সাধন-ভজনতত্ত্বসমৃদ্ধ এই গ্রন্থের ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানীরা 'সান্ধ্যভাষা' হিসেবেও চিহ্নিত করেন। এখানে শুধু ভাষায় নয়, বক্তব্যেও আলো-আঁধারি ভাবটি স্পষ্ট। অন্ধকারযুগের কোনো ভাষা-নিদর্শন পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের ভাষার উল্লেখ এ দিক দিয়ে প্রচুর। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা এবং অন্যান্য পদকারদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলিতে ব্রজবুলিমিশ্রিত বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া অনুবাদসাহিত্যেও বিদেশি শব্দবহুল বাংলা ভাষার প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকে বাংলা ভাষায় পরিবর্তন দ্রুত ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিকযুগের বাংলা ভাষা দুটো দিকে আমাদের সামনে পরিদৃষ্ট হয় : এক. কাব্যসাহিত্য, দুই. গদ্যসাহিত্য। কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গদ্যসাহিত্যে উইলিয়াম কেরি থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের কৃতিত্ব ও কীর্তির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আজ আরো পরিশীলিত ও গতিশীলতার দিকে অগ্রসরমান।

জাতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : বাঙালির জাতি-গঠন কিরূপ?

উ : বিশ্বায়নকৃত সংকর জাতি।

প্র : কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়?

উ : ঋক বেদ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ।

প্র : কোন গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল এই উভয় শব্দের উল্লেখ আছে?

উ : শামস্-ই-সিরাজ আফিফ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহি গ্রন্থে।

প্র : আকবরের সুবা-বাঙলা কথাটি কোন শব্দ থেকে সৃষ্টি?

উ : [illegible] শব্দ থেকে সুবা-বাঙলা নামটি গ্রহণ

প্র : 'ভাটি হইতে আইল বঙ্গাল লখা লখা দাড়ি।'—এই প্রাচীন পঙ্‌ক্তিটি কোন কাহিনিতে পাওয়া যায়?
উ : ময়নামতি-গোপীচাঁদের কাহিনিতে।
প্র : বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদ কোন সময় পর্যন্ত বিভক্ত ছিল?
উ : খ্রিস্টের জন্মের পর সাতশ বছর পর্যন্ত।
প্র : কার সময়ে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করে?
উ : গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক এবং পরবর্তীকালে পাল আমলে। উল্লেখ্য, 'গৌড়' বাংলাদেশের অবণ্ড জনপদ সত্তার আরেক নাম।
প্র : সম্রাট আকবর এই অখণ্ডসত্তার কী নাম দিয়েছিলেন?
উ : সুবা-বাঙলা।
প্র : এ-সম্পর্কে কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়?
উ : আইন-ই-আকবরি।

লিপি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : এই উপমহাদেশে আর্য ভাষার যে প্রাচীনতম বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় তা কোন সময়ের?
উ : খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোকের অনুশাসনের সময়।
প্র : মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত লিপির সঙ্গে কোন লিপি সাদৃশ্যপূর্ণ?
উ : অশোকের সময়ের লিপির।
প্র : এই লিপির নাম কী?
উ : ব্রাহ্মী লিপি।
প্র : বাংলা লিপি কোন লিপি থেকে এসেছে?
উ : ব্রাহ্মী লিপি।
প্র : ব্রাহ্মী লিপির কয়টি রূপ দেখা যায়?
উ : তিনটি। সারদা (কাশ্মির ও পাঞ্জাবে প্রচলিত রূপ), নাগর (রাজস্থান ও মালব; গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপ), কুটিল (ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপ)।
প্র : ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা এসেছে?
উ : কুটিল রূপ থেকে।
প্র : কোন সম্রাট তাঁর অধিকাংশ কর্ম ব্রাহ্মী লিপিতে লেখান?
উ : সম্রাট অশোক।

প্র : কখন ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু পরিবর্তন আসে?
উ : কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের সময়।
প্র : বাংলা লিপি বা বর্ণ কীভাবে সৃষ্টি?
উ : এই উপমহাদেশে আর্য ভাষার প্রাচীনত্ব যে বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া যায় তা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের, অশোকের অনুশাসনের সময়ের। মহাস্থানগড়ে যে লিপি পাওয়া গেছে উহা প্রায় লিপির সাদৃশ্য আছে। এই লিপিকে ব্রাহ্মী লিপি বলে। ব্রাহ্মী লিপি কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত হয়ে তিনটি রূপ ধারণ করে। যথা: সারদা (কাশ্মির ও পাঞ্জাবে প্রচলিত রূপ), নাগর (রাজস্থান ও মালব; গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপ) ও কুটিল (ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত রূপ)। বাংলা লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকে সৃষ্টি হয়েছে।
প্র : এর নাম কুটিল কেন? আর কোন লিপি এই রূপ থেকে এসেছে?
উ : এর মাত্রা ও বর্ণ কুটিল। কোথাও পূর্ণ, কোথাও অর্ধ, কোথাও মাত্রাহীন এবং বর্ণগুলি বিশেষ করে যুক্তাক্ষরগুলি খুবই জটিল বা কুটিল। বাংলা, অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি লিপি ব্রাহ্মী লিপির এই কুটিল রূপ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রায় সহস্র বৎসরে নিজ নিজ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।
প্র : বাংলা লিপির ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লেখ।
উ : জাপানের হরিয়াজি বৌদ্ধমঠে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি হস্তলিখিত পুথি আছে যেখানে প্রাচ্যলিপির নমুনা পাওয়া যায়। ৭ম শতাব্দীর লিপির প্রমাণ মেলে আদিত্য সেন নামক এক মগধরাজের অনুশাসনকালে। পরে এ অঞ্চলের পালরাজাদের সময় লিপি ক্রমবিবর্তিত হয়ে বাংলা লিপির রূপ পরিগ্রহ করে। ৯ম শতাব্দীতে বাংলাদেশের পালবংশীয় রাজা নারায়ণ পালের তাম্রশাসনে বাংলা লিপির সুস্পষ্টরূপ পরিলক্ষিত হয়। আজকের বাংলা লিপি সেই ধারার পরবর্তী রূপ।
প্র : বাংলা লিপির সুসংগঠন কোন আমলে হয়?
উ : সেন রাজাদের সময়।
প্র : কে বাংলা লিপিকে ছাপাখানায় মুদ্রণযোগ্য করে তৈরি করেন?
উ : ইংরেজ আমলে, পঞ্চানন কর্মকার।

প্র : পঞ্চানন কর্মকার কার কাছ থেকে বাংলা লিপি তৈরির কৌশল শিখেছিলেন?
উ : ইংরেজ কর্মচারী চার্লস উইলকিন্সের মাতামহ ছিলেন ইংল্যান্ডের সুনিপুণ ইংরেজি লিপি তৈরির কারিগর। উইলকিন্স তাঁর মাতামহের কাছ থেকে লিপি তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিলেন। তিনি পঞ্চানন কর্মকারকে লিপি তৈরির কৌশল শেখান। পঞ্চানন কর্মকারের পর তাঁর পুত্র ও পৌত্র মিলে প্রায় পঞ্চাশ বছর সুনিপুণতার সঙ্গে বাংলা লিপি তৈরি করে গেছেন।
প্র : উড়িয়া, অসমিয়া ও বাংলা ভাষার লিপির সম্পর্ক কী?
উ : উড়িয়া ও বাংলালিপির উদ্ভব ব্রাহ্মীলিপির কুটিল রূপ থেকে। প্রাচীনকালে কলা পাতাতে লেখার সময় উড়িয়ারা লোহার 'খুন্তি' ব্যবহার করায় প্রথম দিকে পাতা ছিঁড়ে যেত। তাই তারা বর্ণগুলো গোল করে লেখে। আর বাংলাভাষীরা যেহেতু খাগ বা বাঁশের লেখনী ব্যবহার করত সেহেতু তাদের বর্ণের কোনাগুলো অক্ষুণ্ন থাকে। অসমিয়ারা বাংলালিপিতেই লেখে তবে তাদের দু-একটি বর্ণে এখনো মৈথিলি ও বাংলার প্রাচীন রূপ রয়ে গেছে।

ভাষা-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : বাংলা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
উ : ইন্দো-ইউরোপীয়।
প্র : 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা কাকে বলে?
উ : পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে কয়েকটি ভাষাবৃক্ষে বিভক্ত করা হয়। এই ভাষাবৃক্ষগুলোর মূলভাষার একটি ইন্দো-ইউরোপীয়। নামটি কাল্পনিক। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সব ভাষাকে এই মূলভাষা বা ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা মূলভাষাকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: কেন্তুম ও শতম। কেন্তুম শাখায় ইউরোপীয় এবং শতম শাখায় ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগুলির অবস্থান। বাংলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের শতম শাখার একটি ভাষা।

প্র : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে আর ভাষা পাওয়া গেছে কী কী?
উ : পৃথিবীতে যতগুলি ভাষাবংশ বা ভাষাপরিবার আছে, তাদের মধ্যে ইন্দো-ইউরোপীয়ই শ্রেষ্ঠ। আনুমানিক ৫০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে (মতান্তরে মধ্য ইউরোপে) এই ভাষাপরিবারের আদি ভাষার জন্ম। যে মূল ভাষা (Parent Language) থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার কোনো নিদর্শন (প্রত্নলিপি বা গ্রন্থ) এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। তাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদি রূপ আমরা জানতে পারি নি। সেজন্যেই, সেই মূল ভাষা-উদ্ভূত প্রাচীন ভাষাগুলির (যেমন বৈদিক, আবেস্তীয়, গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন পারসিক ইত্যাদি) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমান-নির্ভর রূপ খাড়া করা হয়েছে। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে নাগাদ মূল ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি আর্যরা তাদের আদি বাসস্থান থেকে ক্রমশ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে মূল আর্যভাষা থেকে ক্রমশ দশটি প্রাচীন ভাষাশাখার জন্ম হয়–
(১) ইন্দো-ইরানীয় (Indo-Iranian), (২) বাল্তো-স্লাভিক (Balto-Slavic), (৩) আলবানীয় (Albanian), (৪) আর্মেনীয় (Armenian), (৫) গ্রিক (Greek), (৬) ইতালিক (Italic), (৭) কেল্টিক (Celtic), (৮) জার্মানিক (Germanic), (৯) তোকারীয় (Tokharian) এবং (১০) হিত্তীয় (Hittite)। প্রথম চারটি কেন্তুম্ (Centum) বর্গের এবং শেষ ৬টি শতম্ (Satam) বর্গের ভাষাশাখা।
প্র : ইন্দো-ইরানীয় ভাষার পরিচয় দাও।
উ : ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত–(১) ইরানীয় আর্য উপশাখা এবং (২) 'ভারতীয় আর্য' উপশাখা। ইরানীয় আর্য শাখাটি বিস্তার লাভ করে প্রাচীন পারস্য জুড়ে–এলম এবং মেসোপটেমিয়া (প্রাচীন ইরাক)-র পূর্ব দিক থেকে ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত। ইরানীয় উপশাখার দুটি প্রাচীন ভাষা হলো আবেস্তীয় এবং প্রাচীন

পারসিক। এই দুটি ভাষাই প্রাচীন ইরানে প্রচলিত ছিল এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ইরানের ধর্মগুরু, পারসি-ধর্ম-প্রবর্তক জরথুস্ত্র রচিত গাথাগুলির (গ্রন্থের নাম 'আবেস্তা' বা 'বেশ অবেস্তা') ভাষাই হল অবেস্তীয় ভাষা। প্রকৃতপক্ষে উত্তর-ইরানের প্রাচীন কথ্য ভাষা অবলম্বনেই আবেস্তীয় ভাষা গড়ে উঠেছিল। তবে ৫৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই ভাষা লুপ্ত হয়ে প্রাচীন পারসিক সম্রাট ইরানের রাজভাষা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে প্রাচীন পারসিক ছিল ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশ পারস্য (>পারস্য)-এর ভাষা। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণেই প্রাচীন পারসিক সম্রাট ইরানের রাজভাষা হয়ে দাঁড়ায়। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মধ্য-পারসিক ভাষা 'পহ্লবী' উদ্ভূত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে পহ্লবী ভাষা থেকে নব্য-পারসিক ভাষা ফারসি জন্মগ্রহণ করে। বর্তমানে ফারসি ভাষায় এতো বেশি সংখ্যক বিজাতীয় ভাষা আরবি শব্দ প্রবেশ করেছে যে, একে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলে চেনা যায় না। ইরানীয় উপশাখার অন্য দুটি আধুনিক ভাষা হলো আফগানিস্তানের ভাষা পশতো বা পুশতু (Pashtu) (পাঠান জাতির ভাষা) এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের ভাষা বেলুচি (Baluchi)। অন্যদিকে ভারতে প্রবেশ করা 'ভারতীয় আর্য' উপশাখার অন্তর্গত প্রাচীন যুগের ভাষা হলো বৈদিক ভাষা, পরবর্তীকালের ভাষা হলো পালি, সংস্কৃত, প্রাকৃত ইত্যাদি এবং আধুনিক যুগের ভাষা হলো হিন্দুস্থানি (হিন্দি ও উর্দু), বাংলা, মারাঠি ইত্যাদি।

প্র : ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলার সৃষ্টি?

উ : প্রাকৃত।

প্র : এই প্রাকৃতকে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক কী বলেছেন?

উ : গৌড়ী প্রাকৃত।

প্র : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক মত কী?

উ : ভারতীয় গৌড়ী ভাষা থেকে প্রাচীন বাংলা ভাষার উদ্ভব।

প্র : বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় সম্পর্কে মতগুলো কী?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন সপ্তম শতাব্দী, স্যার জর্জ অব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি।

প্র : বাংলা সাহিত্যে 'ব্রজবুলি' একটি পরিচিত নাম। 'ব্রজবুলি' কোন ধরনের ভাষা?

উ : 'ব্রজবুলি' একটি কৃত্রিম বা artificial ভাষা। এ ভাষায় কেউ কোনো দিন কথা বলে নি। মৈথিলি ভাষার সঙ্গে অবহট্‌ঠ বা বাংলা ভাষার বিশেষ রূপের সংমিশ্রণে এই কৃত্রিম ভাষা তৈরি করেন কতিপয় লেখক। এই ভাষা ব্রজধামের ভাষা নয়। ব্রজধামের ভাষার নাম 'ব্রজভাষা'। তবে এই কৃত্রিম ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় তা ব্রজবুলি নামকরণ হয়। ব্রজবুলির বৈশিষ্ট্য হলো : এই ভাষা অভিজাত, কোমল, মধুর ও কাব্যিক। মৈথিলি ও বাংলার সঙ্গে এখানে বেশ কিছু হিন্দি শব্দের মিশ্রণ আছে। এই ভাষা চতুর্দশ শতাব্দীর মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির কল্যাণে বাংলায় ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা এই ভাষায় যেরূপ মোহনীয়ভাবে প্রকাশিত হয়, অন্য ভাষাতে তেমন নয় বলে অনেকে মনে করেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে মিথিলার কবি উমাপতি উপাধ্যায় এমন কি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই ভাষা ব্যবহার করেন। 'ব্রজবুলি' ভাষা হিসেবে প্রচারিত থাকলেও শব্দটির লিখিত ব্যবহার ঈশ্বর গুপ্তের রচনার আগে বাংলায় দেখা যায় না। ব্রজবুলির উদাহরণ : 'গাগরি বারি ঢারি করি পীঢল / চলতহি অঙ্গুলি চাপি / মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।'

—গোবিন্দ দাস

প্র : 'অপভ্রংশ' কী?

উ : বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি বিশেষ ভাষার বিচ্যুত বা বিকৃত ভাবকে অপভ্রংশ নামকরণ করেন। 'অপভ্রংশ' শব্দটিকে বিভাজন করলে পাওয়া যায় : অপ+ভ্রংশ+অ (ষঞ্)-ভা। অপভ্রংশ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর আছে। কেউ বলেন : 'ভারতীয় আর্যভাষার একটি স্তরের নাম অপভ্রংশ।' প্রাকৃত ভাষার শেষ এবং আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের সূচনার অন্তর্বর্তীকালে অপভ্রংশ ভাষার স্তর ধরা হয়। কেউ বলেন : 'সাধুভাষা হতে ভ্রষ্ট কিংবা বিকৃতভাবে উচ্চারিত শব্দই অপভ্রংশ।' খ্রষ্ট থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অপভ্রংশের বিস্তারকাল হিসেবে ধরা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে গ্রথিত গীতি কবিতার সংকলন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' অপভ্রংশে রচিত। অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ প্রায় সমার্থক শব্দ।

প্র : 'অবহট্‌ঠ' কী?

উ : প্রাচীন অপভ্রংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপকে সুকুমার সেন নাম দিয়েছেন 'অবহট্‌ঠ', অনেকে বলেন 'অর্বাচীন অপভ্রংশ'। এ প্রসঙ্গে 'অপভ্রংশ কী' আলোচনা-অংশ দেখা যেতে পারে।

প্র : 'অর্ধমাগধী ভাষা' কী?

উ : প্রাচীন ভারতের এক ভাষারূপ। পুরাতন জৈনগ্রন্থসমূহ অর্ধমাগধী ভাষায় রচিত। প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে দুধরনের ভাষারূপ লক্ষ করেন। এর প্রথম স্তরকে বলেন প্রাচীন মাগধী এবং দ্বিতীয় স্তরকে বলেন প্রাচীন অর্ধমাগধী। উত্তর বিহার অর্থাৎ প্রাক্তন কোশল অঞ্চলে অর্ধমাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা গৌতম ও জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এই ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের হাতে অর্ধমাগধীর চেয়ে পালি ভাষা অধিক চর্চিত হয়। কিন্তু মহাবীরের ভাষা হিসেবে জৈনরা তাদের রচিত সাহিত্যিক ও ধর্মীয় গ্রন্থে এই ভাষার চর্চা করে।

প্র : কৃত্রিম বিশ্বভাষা এসপেরান্তো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর।

উ : প্রতিটি ভাষাই তার নিজের সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক এবং তার স্বভাববৈশিষ্ট্যও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। যে-কোনো ভাষাভাষী মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও কেবলমাত্র মাতৃভাষার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে কেউ যথার্থ আন্তর্জাতিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি মাতৃভাষা ভিন্ন আরও কয়েকটি ভাষা শিখেও এই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করলেও চিন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মান, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি প্রভৃতি উন্নত দেশের মানুষ এখনও আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে নিজেদের ভাষাকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। এ ব্যাপারটা আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বমানবতা-ভাবনাকে অনেকখানিই পিছনে সরিয়ে দিয়েছে। বিশ্ব-ঐক্য এবং একবিশ্বের ভাবনা যেমন বিশ্বমনীষীদের ভাবিত করেছে, তেমনি ভাবিয়েছে ভাষাবিজ্ঞানীদেরও। মানুষে মানুষে ভাষাগত ব্যবধান দূর করার জন্য ভাষাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে একটি বিশ্বভাষা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। অবশ্য অনাসন্ত ভাষাকে লুপ্ত করে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা তাঁরা কখনোই চিন্তা করেন নি। মানুষের জাতিগত পরিচয়বাহী ভাষাটিকে অক্ষুণ্ন রেখেই প্রতিটি মানুষের জন্য দ্বিতীয় একটি ভাষার চিন্তা করে তাঁরা। সেই ভাষাটি অবশ্যই কৃত্রিম এবং সর্বজনীন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক রেনে দেকার্ত (Descartes)-ই প্রথম এই রকম কৃত্রিম এক আন্তর্জাতিক ভাষার কল্পনা করেছিলেন। এরপর জার্মান চিন্তাবিদ জোহান মার্টিন শ্লেয়ের (Schleyer)-ও এমনই এক বিশ্ব-ভাষার পরিকল্পনা করেন, যার নাম তিনি দেন ভোলাপ্যুক (Volapuk)। এরপর ফ্রান্সিস বেকন, জন উইলকিন্স্ প্রভৃতি বহু চিন্তাবিদ এ ধরনের বিশ্বজনীন ভাষার পরিকল্পনা করেন এবং তার নামকরণও করেন। যেমন Idiom Neutral, Ido, Latino Sine Flexione, Antido, Occidental, Novial ইত্যাদি। কিন্তু এগুলির কোনোটিই বিশ্ব-চিন্তাবিদদের দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

উৎপত্তি : যে কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষাটি 'বিশ্বভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তা হলো এসপেরান্তো (Esperanto) পোল্যান্ডের চক্ষুচিকিৎসক ডা. এল. এল. জামেনহফ (Dr. L. L. Zamenhof ১৮৫৯–১৯১৭) ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ডা এসপেরান্তো ছদ্মনামে রুশ ভাষায় এ গ্রন্থ রচনা করেন। বইটিতে সর্ব

বিশ্বভাষার গঠনবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ড. জামেনহফের ইচ্ছানুযায়ী এইটিতে আলোচিত বিশ্বভাষাটির নাম দেওয়া হয় এসপেরান্তো।

বৈশিষ্ট্য : 'বিশ্বভাষা' এসপেরান্তো প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্ববাসীর জন্য তৈরি করা একটি দ্বিতীয় ভাষা। ভাষাটি এমন সহজসরল যে, পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ সহজেই এই ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে সক্ষম হবে। এই ভাষা মানুষের মাতৃভাষার বিরোধীও নয়। বিশ্বভাষা এসপেরান্তোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো–

(১) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির ওপর ভিত্তি করেই এসপেরান্তো ভাষা গড়ে উঠেছে। ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্রে স্লাভ এবং রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমান ও জার্মানিক ভাষাগুলির দ্বারা এই কৃত্রিম ভাষা প্রভাবিত। এই ভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি, ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ২টি অর্ধস্বর এবং ৬টি যৌগিক স্বর আছে। ৯২১টি শব্দমূলের সঙ্গে বিভক্তি-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এই ভাষার শব্দ তৈরি হয়। যেমন, -a যোগে বিশেষণ, -i যোগে অতীতকাল ইত্যাদি।

(২) বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ভাষাতেই দেখা যায় যে, শব্দের বানান সর্বদা উচ্চারণ অনুযায়ী গঠিত হয় না। যেমন, বাংলা ভাষায় আমরা 'বন' (=জঙ্গল) লিখলেও তার মান্য উচ্চারণ হলো বোন্ (ব্ + ও + ন্)। এসপেরান্তো ভাষায় বানান ও উচ্চারণের এই বৈপরীত্য নেই। এ ভাষার বানান বিধিবদ্ধ।

(৩) এসপেরান্তো ভাষার ব্যাকরণ সহজসরল এবং সংক্ষিপ্ত। এই ভাষার ব্যাকরণে আছে মাত্র ষোলটা নিয়ম। উদাহরণস্বরূপ, এই ভাষার ক্রিয়াপদ বচন ও পুরুষ নিরপেক্ষ। যেমন–

Mi dormas nokte (আমি রাতে ঘুমাই)

Li Dormas nokte (সে রাতে ঘুমায়)

বাংলায় 'আমি' উত্তমপুরুষের ক্রিয়ারূপ 'ঘুমাই' হলেও 'সে' প্রথম পুরুষের ক্রিয়ারূপ 'ঘুমায়'। কিন্তু এসপেরান্তো ভাষায় উত্তমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষে একই ক্রিয়ারূপ (উপরের দুটি উদাহরণ nokte) ব্যবহৃত হয়েছে।

(৪) মাত্র ছয় হাজার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহজ শব্দ দিয়ে তৈরি হয়েছে এ ভাষার শব্দভাণ্ডার।

(৫) পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলির শব্দ এবং ব্যাকরণগত উপাদান কমবেশি গ্রহণ করেই এই ভাষা তৈরি করা হয়েছে এবং এ ভাষার প্রচারের জন্য তৈরি হয়েছে 'এসপেরান্তো অ্যাসোসিয়েশন'।

সারা পৃথিবীর কুড়ি লক্ষ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে সক্ষম এবং বহুসংখ্যক ভাষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী এসপেরান্তো ভাষা-শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তবু এখন অবধি সাধারণ বিশ্ববাসীর মধ্যে এই ভাষা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি। প্রতিটি রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ না নেয়, তবে কোনোদিনই এই ভাষা তেমনভাবে স্বীকৃতি পাবে না।

প্র : কোনো ভাষা কি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে?

উ : বিখ্যাত 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এ ভাষাবিদ ড. জন ম্যাকহোর্টার ২০১৫ সালে একটি প্রবন্ধে আশংকা ব্যক্ত করে লেখেন যে, বিশ্বায়ন ও আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে আগামী ২১১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে ক্ষুদ্র ভাষাগুলো লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সারা বিশ্বে মাত্র ৬০০-এর মতো ভাষা জীবিত থাকতে পারে। আধিপত্যবাদী অর্থনীতির কারণে মানুষ নিজ ভাষার বদলে পরভাষায় আগ্রহী হবে আরো বেশি। এর ফলে ক্ষুদ্র ভাষাগুলোতো লুপ্ত হবেই, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল জাতির অনেক ঋদ্ধ ভাষাও সীমিত হয়ে যাবে। ভাষার সংখ্যা কমে গিয়ে মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও কমবে।

প্র : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত কী?

উ : বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এই মতসমূহে ব্যাপক কোনো পার্থক্য নেই। শুধু দু একটি স্থানে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমতই সর্বাপেক্ষা বেশি মান্য হতে পারে। বাংলাদেশে শহীদুল্লাহর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইন্দো-ইউরোপীয় নামে একটি কল্পিত ভাষাগোষ্ঠী বিবেচনায় এনে ভাষার জন্মের ইতিহাস খোঁজা হয়েছে। এই গোষ্ঠীভাষা পাঁচ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের। এর দুটো শাখা কেন্তুম ও শতম। সাড়ে তিন হাজার খ্রিষ্টপূর্ব কাল আগে এরা স্বতন্ত্র রূপ নেয়। কেন্তুম থেকে ইউরোপীয় বেশির ভাগ ভাষার জন্ম আর শতম থেকে ভারতীয় বা তার আশপাশের ভাষাগুলোর সৃষ্টি হয় খ্রিষ্টপূর্ব ষাবোশ অব্দে। 'ভাষাতিক' একটি আনুমানিক ভাষা-নাম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, ভারতিক ভাষা থেকেই বৈদিক এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সৃষ্টি। ঋগ্বেদ বৈদিক ভাষায় রচিত। আজ বৈদিক ভাষা মৃত আর ভারতীয় আর্য ভাষা অনুমান-নির্ভর। খ্রিষ্টপূর্ব আটশ অব্দে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই আদিম প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। আদিম প্রাকৃত প্রাচীন ভারতের এই অঞ্চলে শক্তিশালী ভাষা ছিল। পালিসহ একাধিক ভাষা এই ধারার। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচশ অব্দে আদিম প্রাকৃত ভাষা থেকে পালি ভাষার মতো প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার সৃষ্টি হয় বলে শহীদুল্লাহ্ মনে করেন। আনুমানিক দুইশ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে এই ভাষা থেকে গৌড়ী প্রাকৃত এবং আনুমানিক চারশ অব্দে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশের সৃষ্টি। জর্জ গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী মনে করেন, মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, গৌড় অপভ্রংশ থেকে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পাঁচশ অব্দে বঙ্গ কামরূপী ভাষা তৈরি হয়। তিনি বলেন, গৌড় অপভ্রংশ এখন মৃতভাষা। বঙ্গ কামরূপীও একটি অনুমান-সিদ্ধ নাম। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে গৌড় অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গ কামরূপী ভাষার মাধ্যমে ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে। শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'বাংলা ভাষার পুথিটা' শিরোনামে একটি ভাষাচিত্র উপস্থাপন করেছেন। বাংলাভাষা সম্পর্কিত অংশটুকু পরের পৃষ্ঠায় হুবহু তুলে ধরা হলো।

বাংলা ভাষা : সংজ্ঞার্থ ও স্থান

প্র : ভাষা কাকে বলে?

উ : ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম। আইটি (ইনফরমেশন টেকনোলজি)-র এই যুগে তথ্য প্রবাহের জন্যেও প্রয়োজন হয় ভাষা। আর বহুকাল ধরে প্রচলিত যে সংজ্ঞার্থ তা হলো : মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে সব ধ্বনি উচ্চারণ করে বা স্বীকৃত বর্ণে যা কিছু লিপিবদ্ধ করে অথবা কোনো বিশেষ সংকেত (ধ্বনি, অঙ্গভঙ্গি, লেখা, অঙ্কন যে কোনোভাবে সৃষ্টি হতে পারে) প্রকাশ করে, তাকে ভাষা বলে।

প্র : ভাষা কিভাবে প্রকাশ করা যায়?

উ : কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে। অর্থাৎ ভাষা প্রকাশ মাধ্যম হলো তিনটি। একেত্রে ইঙ্গিতের ভাষা নির্দিষ্ট ও গতিবদ্ধ। আবার এখানে কোনো ব্যাকরণও কাজ করে না।

প্র : বাংলা ভাষা কাকে বলে?

উ : প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণ ও লেখা রীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাঙালি জাতির মাতৃভাষাকে বাংলা ভাষা বলে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার তুলনায় এর রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। বহু বছর আগে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে ও বর্তমানে তা বিবর্তিত হচ্ছে।

প্র : ভাষা হিসেবে বাংলা নামের উৎপত্তি কেমন করে হয়?

উ : রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ, বগড়ী, বঙ্গ, চট্টল এই ভূভাগকে একত্রে বাংলা বলা হতো। এই সব অঞ্চলের ভাষা এক হলেও অন্তত চারটি উপভাষায় তা বিভক্ত ছিল। এই বিভক্তি সত্ত্বেও মুসলিম শাসনামলে অঞ্চলসমূহের ভাষাকে 'জবান-ই-বাংলা' অর্থাৎ 'বাংলার ভাষা' বলে অভিহিত করা হতো। পণ্ডিতগণ অবশ্য এই ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলে অভিহিত করেন।

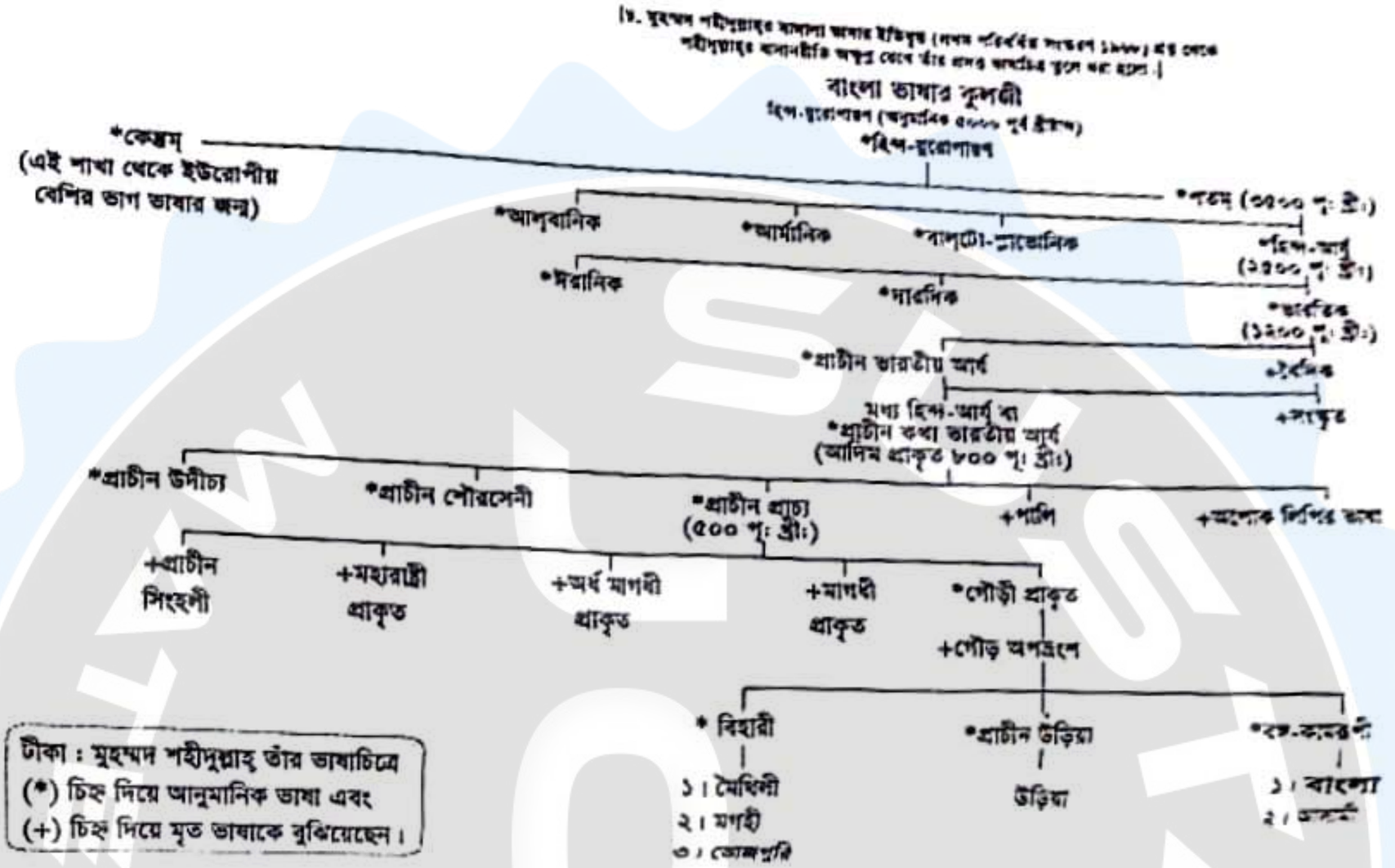
বাংলা ভাষার কুলজী
*কেন্তুম্
(এই শাখা থেকে ইউরোপীয় বেশির ভাগ ভাষার জন্ম)
*শতম্ (৩৫০০ খৃ: পূ:)
*আলবানিক
*আর্মানিক
*বালটো-স্লাভোনিক
*ইরানিক
*সাংস্কৃতিক
*প্রাচীন ভারতীয় আর্য
+ইরানিক
+সংস্কৃত
মধ্য ইন্দো-আর্য বা
*প্রাচীন কথ্য ভারতীয় আর্য
(আদিম প্রাকৃত ৮০০ খৃ: পূ:)
*প্রাচীন উদীচ্য
*প্রাচীন পৌরসেনী
*প্রাচীন প্রাচ্য
(৫০০ খৃ: পূ:)
+পালি
+অশোক লিপির ভাষা
+প্রাচীন সিংহলী
+মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
+অর্ধ মাগধী প্রাকৃত
+মাগধী প্রাকৃত
*গৌড়ী প্রাকৃত
+গৌড় অপভ্রংশে
* বিহারী
১। মৈথিলী
২। মগহী
৩। ভোজপুরি
*প্রাচীন উড়িয়া
উড়িয়া
*বঙ্গ-কামরূপী
১। বাংলা
২।
টীকা : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষাচিত্রে
(*) চিহ্ন দিয়ে আনুমানিক ভাষা এবং
(+) চিহ্ন দিয়ে মৃত ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

৫

1. Learned Discourse on Justification.
2. Of the Laws of Ecclesiastical P...

(সূত্র : The Cambridge Factfinder, Cambridge University Press, 1993)

প্র : দাপ্তরিক ভাষা বা Official language হিসেবে বিশ্বে কোন ভাষার স্থান প্রথম?

উ : ইংরেজি।

প্র : Official language হিসেবে বিশ্বে বাংলার স্থান কত?

উ : দশম।

প্র : দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত বিশ্বের শীর্ষ দশটি ভাষার নাম লেখ।

উ : ১ম > ইংরেজি; ২য় > চৈনিক; ৩য় > হিন্দি; ৪র্থ > স্পেনিশ; ৫ম > রুশীয়; ৬ষ্ঠ > ফরাসি; ৭ম > আরবি; ৮ম > পর্তুগিজ; ৯ম > মালয়; ১০ম > বাংলা।
এখানে উল্লেখ্য যে, বিশ্বে বেশ কিছু শীর্ষ ভাষা (যেমন : তেলেগু, জার্মান) দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত নয়, আবার অন্য কিছু ভাষা (যেমন : মালয়) বহুভাষী দেশসমূহে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।
(সূত্র : http://www.ethnologue.com/BrainBank/COMMUNICATIONS/TopLanguages.html)

প্র : অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষার স্থান কত ছিল?

উ : ১৯২১ সালের গণনায় দেখা যায়, অবিভক্ত ভারতের ১২৫টি ভাষার মধ্যে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত ভাষার দিক থেকে বাংলার স্থান প্রথম। মাতৃভাষা নয় কিন্তু প্রচলনের দিক থেকে হিন্দি ভাষা প্রথম।

প্র : বাংলার সীমান্ত ভাষা কী ও কোনগুলো?

উ : ভাষার মানচিত্র আর রাজনৈতিক মানচিত্র সাধারণত এক হয় না। বাংলার ক্ষেত্রেও নয়। সীমান্ত ভাষা হলো কোনো ভাষা-অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে কিন্তু সংলগ্ন এলাকার ভাষা। এই ভাষা একাধিক হতে পারে এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তও হতে পারে। সে দিক থেকে বাংলার সীমান্ত ভাষা হলো : পূর্ব সীমান্তে অসমিয়া এবং পশ্চিম সীমান্তে উড়িয়া, মগধি ও মৈথিলি ভাষা। তাছাড়া কতিপয় অনার্য ভাষা যেমন, পশ্চিমে সাঁওতালি, হো, মুণ্ডারি, ওরাওঁ, উত্তরে সিকিমি ও ভুটানি, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে খোড়ো ও খাসিয়া ভাষা। তাছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের চাকমা, ককবরক (ত্রিপুরা) ইত্যাদি ভাষা।

প্র : কোন কোন দেশ/অঞ্চলে বাংলা ভাষার প্রসার দেখা যায়?

উ : বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, আসামের কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা, বিহার ও ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, সিংহভূম, পূর্ণিয়া; উড়িষ্যার পুরী; ত্রিপুরার বেশ কিছু অঞ্চল; ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল।

প্র : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বয়স কত?

উ : বাংলা ভাষা তার সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে প্রায় এক হাজার বছর আগে। বাংলা সাহিত্যও ভাষার সমবয়সী। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' রচনার কাল বিবেচনা করলে দেখা যায় বাংলা ভাষা গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য রচিত হতে থাকে।

প্র : বাংলা ভাষার প্রকাশ-প্রকারভেদ কী?

উ : বাংলা ভাষা দ্বিবিধ। শ্রী যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি প্রদত্ত পরিভাষায় বলা যেতে পারে : মৌখিক ও লৈখিক। প্রতিটি সচল ও জীবন্ত ভাষাতেই এ দুটি প্রকাশ-প্রকার আছে।

প্র : বাংলা মৌখিক ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

উ : দুই প্রকার। যথা : মান মৌখিক ভাষা ও আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা।

প্র : মান মৌখিক ভাষা কী?

উ : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনের ফলে সব কিছুই পরিমার্জিত ও সর্বজনীন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ভাষাও নানা স্থানের বহুরূপ থেকে পরিমার্জনার মাধ্যমে একটি বিশেষ মান অবস্থার চেষ্টা চলে। বাংলা ভাষায় এক্ষেত্রে নদীয়া-শান্তিপুরের ভাষাকে মৌখিক মান ভাষা ধরা হয়। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙা, মেহেরপুর, একদা নদীয়া জেলাধীন ছিল। অনেকে 'মানভাষা' না বলে এ ধরনের ভাষাকে 'মান্যভাষা' বলেন।

প্র : আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা কী?

উ : ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন, মৌখিক ভাষার প্রতি দশ কিলোমিটার অন্তর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাতেই মৌখিক একাধিক রূপ আছে। বাংলা ভাষাতেও থানা বা উপজেলা ভেদে মৌখিক ভাষার রূপান্তর ঘটেছে। ভাষার এ রূপকে অবশ্য উপভাষা বা dialect বলে।

ব্রিটিশ রাজের উচ্চপদস্থ আমলা স্যার এব্রাহাম গ্রিয়ার্সন ভারতের উপভাষাগুলোর তদারিক করে 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' (১৯০৩) নামে বিশ খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগে রয়েছে বাংলা আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা বা উপভাষার উদাহরণ ও আলোচনা। এই ভাষারূপ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাবলীলভাবে ব্যবহার হলেও ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে তা কটকর ও দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা থেকে একটি বাক্যের উদাহরণ দেয়া হলো। এতেই বোঝা যাবে, আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা পরস্পর থেকে কতটা পৃথক। উদাহরণ :
সাধুভাষা : কোনো এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল।
মানিকগঞ্জ : যাক জনের দুইডা ছাওয়াল আছিলো।
ময়মনসিংহ : এক জনের দুই পুৎ আছিল্।
বগুড়া : এক কনের দুই বাটাছেল্যে আছিল।
নোয়াখালি : একজন মাইনষের দুগা হোলা আছিল্।

প্র : উপভাষা বা Dialect কাকে বলে?

উ : আঞ্চলিক মৌখিক ভাষা কী?-এর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্র : বাংলাদেশের উপভাষার অভিধান রচনা সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশ অঞ্চলের উপভাষার অভিধান রচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন স্থাপন করেন এফ. ই. পার্জিটার। তিনি ১৯২৩ সালে লেখেন 'Vocabulary of Peculiar Vernacular Bengali Words'. এটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল থেকে প্রকাশ পায়। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমি থেকে বের হয় 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা ছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মুহম্মদ।

প্র : লৈখিক ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

উ : দুই প্রকার। যথা : সাধু ও চলিত।

প্র : সাধু ভাষা কী?

উ : যে ভাষা প্রধানত তৎসম শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদসমূহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কিছুটা গুরুগম্ভীর ও কৃত্রিম তাকেই সাধু ভাষা বলে। যেমন : 'যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্র-রেখাহীনের শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল।'
— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র : চলিত ভাষা কী?

উ : ভাগীরথী-তীরবর্তী জনপদের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা পরিমার্জিত হয়ে সাহিত্যে যেভাবে স্থান পেয়েছে তাকেই চলিত ভাষা (লৈখিক) বলে। এ ভাষায় তৎসম শব্দবহুলতা, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ, স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতির প্রভাব এবং গতিময়তা বিশেষ গুণ। যেমন: 'অমিত যেখানে সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে– ফিরপোর দোকানে যাকে তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে। এখান এখান থেকে যা তা কিনছে আর একে ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে; ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ বাড়িতে ও বাড়িতে ফেলে আসছে আর ফিরিয়ে আনছে না।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র : কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষার গঠনগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়?

উ : ১. সর্বনামপদে— তাহার > তার; ইহারা > এরা।
২. ক্রিয়াপদে— করিতেছি > করছি; যাইবো > যাবো।
৩. অনুসর্গে— অপেক্ষা > চেয়ে; হইতে > হতে।
৪. তৎসম শব্দে— সমভিব্যাহার > সঙ্গে; যৎপরনাস্তি > খুব।
৫. বিশেষণে— সাতিশয় > অত্যন্ত; ঈদৃশ > এ রকম।
৬. সমাসবদ্ধতায়— নীলোৎপলদলশ্যামা > নীল পদ্মের পাপড়ির মতো।

2. Of the Laws of Ecclesiastical

বাংলা ব্যাকরণ

সাধারণ আলোচনা

প্র : ব্যাকরণ কাকে বলে?
উ : ভাষা ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম, যা ওই ভাষাকে অশুদ্ধির সীমানায় প্রবেশ করতে দেয় না, শুদ্ধির পরিকাঠামো তৈরি করে তাকে ব্যাকরণ বলে।

প্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লেখ।
উ : পর্তুগিজ পাদ্রি মনোএল দা আসসুম্পসাউ রচিত ও ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগালা ই পোরতুগিজ গ্রন্থের ব্যাকরণ অংশই বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ, কিন্তু প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ নয়। এটি ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রচিত, ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই গ্রন্থটি ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রধানত ইংরেজি, অংশত বাংলায় রচিত এবং ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এরপর উইলিয়াম কেরি ১৮০১ সালে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ সালে, কিথ সাহেব ১৮২০ সালে বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াস পান। কিন্তু এই সবগুলোই ইংরেজি ভাষায় লেখা। ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। এরপর তিনি ১৮৩৩ সালে স্কুল বুক সোসাইটির জন্য ওই গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে নাম দেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। সে-বিচারে এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ।

প্র : ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপ কী?
উ : বি + আ + √কৃ + অন।

প্র : ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কী?
উ : বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

প্র : ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
উ : ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান; বলা ও লেখায় শুদ্ধভাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকরণ পাঠ প্রয়োজন।

প্র : ব্যাকরণে সাধারণ আলোচ্য বিষয় কয়টি?
উ : তিনটি। ধ্বনিতত্ত্ব: শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

প্র : ব্যাকরণে সার্বিক আলোচ্য বিষয় কয়টি?
উ : ছয়টি। ধ্বনিতত্ত্ব; শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব; বাক্যতত্ত্ব; ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকরণ; বাগর্থ বিজ্ঞান বা অর্থতত্ত্ব; অভিধানতত্ত্ব।

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : ধ্বনি, এর উচ্চারণরীতি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি।

প্র : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : শব্দ, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, কারক, পুরুষ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, সমাস, পদের পরিচয়, ক্রিয়া প্রকরণ ইত্যাদি।

প্র : বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?
উ : বাক্যের সঠিক গঠন প্রণালি, পদক্রম, পদের স্থান, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংযোজন, বাক্য সংকোচন, প্রবাদ-প্রবচন, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি।

প্র : ভাষার সাংগঠনিক গড়ন কী?
উ : কোনো কথ্য ভাষায় ধ্বনি শব্দ ও পদ এবং লেখ্য ভাষায় বর্ণ, শব্দ ও পদ বাক্যে প্রযুক্ত হয়ে একটি ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করে। সুতরাং ধ্বনি/বর্ণ, শব্দ, বাক্যের সম্মিলনে ভাষা গড়ে ওঠে।

প্র : ভাষার মৌলিক উপাদান কী এবং কেন?
উ : ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। কারণ শব্দেই প্রথম অর্থের সংশ্লিষ্টতা দেখা দেয়। ধ্বনিতে অর্থের সংশ্লিষ্টতা নেই। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু অর্থবাচকতা প্রকাশ করা, সেহেতু এক্ষেত্রে শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান।

প্র : ভাষার মূল উপকরণ কী?
উ : বাক্য ভাষার মূল উপকরণ। কারণ, একটি সম্পূর্ণ বাক্যই ভাষার প্রাণ। বাক্য না হলে ভাষাকে সঠিকভাবে চেনা যায় না। শুধু শব্দের সমষ্টি থাকলে তা অভিধান হিসেবে গণ্য হতে পারে, ভাষার নির্দশন হিসেবে গণ্য হবে না।

ধ্বনি ও বর্ণ

প্র : ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে সম্পর্ক কী?
উ : একটি মৌখিক ও অন্যটি লৈখিক রূপ। ধ্বনি লিখিতভাবে প্রকাশের প্রতীকচিহ্নই বর্ণ।

প্র : বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনিগুলো কয়ভাগে বিভক্ত, কী কী?
উ : দুইভাগে। স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্র : স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উ : যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ অন্য কোনো ধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।

প্র : বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উ : ১১টি। যথা : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

প্র : আগে যে স্বরবর্ণগুলো ব্যবহৃত হতো সেগুলো লেখ।
উ : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঌ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

প্র : মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উল্লেখ কর।
উ : অ আ ই উ এ অ্যা ও।

প্র : যৌগিক স্বরধ্বনিগুলো উল্লেখ কর।
উ : ঐ ঔ।

প্র : ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?
উ : যে সবধ্বনি অন্তত একটি স্বরধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলোকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

প্র : বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
উ : ৩৯টি। যথা : ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ। (অনেকে অন্তঃস্থ ব বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে গণ্য করার পক্ষে।)

প্র : স্পর্শ ধ্বনি কাকে বলে, এগুলো কী কী?
উ : কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি।

প্র : কণ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ক, খ, গ, ঘ, ঙ।

প্র : তালব্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।

প্র : মূর্ধন্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ।

প্র : দন্ত্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ত, থ, দ, ধ, ন।

প্র : ওষ্ঠ্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : প, ফ, ব, ভ, ম।

প্র : নাসিক্য বর্ণ কোনগুলো?
উ : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

প্র : অনুনাসিক বা সানুনাসিক বর্ণ কী?
উ : নাসিক্য বর্ণগুলোকেই অনেকে অনুনাসিক বা সানুনাসিক বলেন।

প্র : অন্তঃস্থ বর্ণ কোনগুলো?
উ : য, র, ল, ব (এই 'ব' আগে গণ্য ছিল। এখন গণনাতে আনা হয় না)।

প্র : য-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী?
উ : তালব্য।

প্র : র-এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী?
উ : কম্পনজাত মূর্ধা স্থানীয়।

প্র : ল-এর উচ্চারণ স্থানজাত অবস্থান কী?
উ : পার্শ্বিক দন্ত্য স্থানীয়।

প্র : উষ্মবর্ণ কাকে বলে, কোনগুলো?
উ : যে বর্ণ উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য থাকে তাকে উষ্মবর্ণ বলে। এগুলো : শ, ষ, স, হ।

প্র : শ, ষ, স, হ উষ্মবর্ণগুলোর অন্তর্বিভাগ কী?
উ : শ, ষ, স শিশ্ধ্বনি; হ ঘোষ ধ্বনি।

প্র : তাড়নজাত ধ্বনি কোনগুলো?
উ : ড়, ঢ়।

প্র : খণ্ডব্যঞ্জন কোনটি?
উ : ৎ (মূল = ত)।

প্র : অঘোষ হ ধ্বনির বর্ণরূপ কী?
উ : ঃ (বিসর্গ)।

প্র : পরাশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বর্ণের মতো কার বা ফলাগ্রহণ করতে পারে না, অন্য বর্ণের আশ্রয়ে শব্দ তৈরি করে, সেগুলোকে পরাশ্রিত ব্যঞ্জন বর্ণ বলে। এগুলো হচ্ছে : ং ঃ ঁ।

প্র : স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি ও কী কী?
উ : [illegible]
প্র : স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?
উ : [illegible]
প্র : স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
উ : [illegible]
প্র : বাংলা দুপ্ত স্বরধ্বনি কোনগুলো?
উ : [illegible]
প্র : যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?
উ : [illegible]
প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?
উ : [illegible]
প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্টবর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?
উ : [illegible]
প্র : ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?
উ : [illegible]
প্র : বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা কত?
উ : পঞ্চাশ।
প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত?
উ : বত্রিশ।
প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কত?
উ : আট।
প্র : পঞ্চাশটি বর্ণে মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কত?
উ : দশ।
প্র : উচ্চারণরীতি অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিভাগ কী?
উ : ঘোষ-অঘোষ; মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ।
প্র : ঘোষ বর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক বাতাস প্রবাহিত হয় এবং নিনাদিত উচ্চারণ হয় তাদের ঘোষ বর্ণ বলে। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ।
প্র : অঘোষ বর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে বর্ণগুলো উচ্চারণ করতে ফুসফুস থেকে অপেক্ষাকৃত কম বাতাস প্রবাহিত হয় এবং কম নাদিত হয়, তাদের অঘোষ বর্ণ বলে। যথা: বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ।
প্র : মহাপ্রাণ বর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে বর্ণসমূহ উচ্চারণ প্রলম্বিত হয় অর্থাৎ ফুসফুস তাড়িত বাতাস অধিক প্রবাহিত হয়, সেগুলো মহাপ্রাণ বর্ণ। যথা: বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ।
প্র : অল্পপ্রাণ বর্ণ কী ও কোনগুলো?
উ : যে বর্ণসমূহের উচ্চারণ নাতিদীর্ঘ হয় অর্থাৎ ফুসফুস তাড়িত বাতাস কম প্রবাহিত হয়, সেগুলো অল্পপ্রাণ বর্ণ। যথা: বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ।
প্র : বানান কাকে বলে?
উ : ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যোগ করাকে বানান বলে।
প্র : সংযুক্ত বর্ণ কাকে বলে?
উ : দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হলে সংযুক্ত বর্ণ হয়। যথা: ক্ত, জ্ঞ।
প্র : কার কাকে বলে?
উ : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে।
প্র : কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
উ : অ।
প্র : কোনটি নিলীন বর্ণ?
উ : অ।
প্র : 'অ' নিলীন বর্ণ কেন?
উ : 'অ' কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায় না। কারণ 'অ'-এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ নেই। কিন্তু 'অ' ছাড়া বাকি স্বরধ্বনিগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ আছে বলে সেগুলো কোনো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে দেখা যায়। যেমন :
কর = কর্ + অ ('অ') দেখা যায় না।)
করা = কর্ + আ ('আ' দেখা যায়।)
অর্থাৎ 'অ' অন্য বর্ণের সঙ্গে লুকিয়ে থাকতে পারে বা নিঃশেষে লীন হয়ে থাকতে পারে বলে নিলীন বর্ণ।
প্র : স্বরবর্ণসমূহের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখাও।
উ : আ = া, ই = ি, ঈ = ী, উ = ু, ঊ = ূ, ঋ = ৃ, এ = ে, ঐ = ৈ, ও = ো, ঔ = ৌ।

প্র : ফলা কাকে বলে?
উ : [illegible]
প্র : কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ ফলা রূপে ব্যবহৃত হতে পারে?
উ : [illegible]
প্র : বাংলা বর্ণমালায় কতটি যৌগিক স্বরধ্বনিক বর্ণ আছে?
উ : ২টি (ঐ ঔ)।
প্র : যৌগিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উ : পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি এক প্রয়াসে ও দ্রুত উচ্চারিত হয়ে যদি একটি যুক্তধ্বনিতে রূপ নেয়, তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে।
যেমন : অ + ই = ঐ; অ + উ = ঔ
বাংলায় এই যৌগিক স্বরধ্বনি দুটোকে পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় (ঐ, ঔ)।
প্র : যৌগিক স্বরধ্বনিকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?
উ : বিস্বর বা সন্ধিস্বর বা যৌগিক স্বর।
প্র : বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি আসলে কয়টি?
উ : পৃথক বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় দুটো (ঐ, ঔ)। এ ছাড়া আরো তেইশটি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে কিন্তু এদের জন্য পৃথক কোনো বর্ণ নেই। অর্থাৎ বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি সাকুল্যে পঁচিশটি। এর মধ্যে নিচে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :
অ + ও = অও > লও;
অ + এ = অয় > নয়;
আ + ই = আইন > গাই;
আ + এ = আয় > খায়;
আ + উ = আউ > হাউ;
ই + আ = ইআ > উড়িয়া;
ই + ই = ইই > দিই;
ই + উ = ইউ > মিউ;
ই + এ = ইএ > গাইয়ে;
ই + ও = ইও > নিও;
উ + ই = উই > ছুঁই;
উ + ও = উও > কুয়ো;
এ + ই = এই > সেই;
[illegible]
প্র : কোন বর্ণ দুটির পৃথক উচ্চারণ নেই?
উ : [illegible]
প্র : ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি?
উ : [illegible]
প্র : বাংলা উচ্চারণে 'ঐ' ধ্বনির কয় প্রকার উচ্চারণ হয়েছে? কী কী?
উ : দুই প্রকার [illegible]
প্র : 'অ' ধ্বনির কয় প্রকার উচ্চারণ পাওয়া যায়? কী কী?
উ : দুই প্রকার [illegible]
প্র : ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ কী কী?
উ : [illegible]
প্র : ই ও ঈ ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা কী অবস্থায় থাকে?
উ : [illegible]
প্র : বাংলা বর্ণমালার কোন বর্ণটি স্বরস্থানে উচ্চারিত হয় না?
উ : [illegible]
প্র : বাঙালি শিশুরা কোন বর্ণের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?
উ : 'প' বর্গের অর্থাৎ ঔষ্ঠ্য ধ্বনি
প্র : 'ন' ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
উ : জিভের ডগা দন্তমূলকে স্পর্শ করে।
প্র : 'ঐ' কি রকম ধ্বনি?
উ : যৌগিক ধ্বনি (অ+ই)
প্র : 'ঋ' কোন বর্ণ?
উ : তালব্য বর্ণ।
প্র : প্রত্যেক বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণকে বলে?
উ : মহাপ্রাণ বর্ণ।
প্র : 'ত' এর উচ্চারণ স্থান হল?
উ : দন্ত্য।
প্র : 'প' এর উচ্চারণ স্থানের নাম?
উ : ওষ্ঠ্য।

6. John Lyly (1554 ...

প্র : 'অ' এর উচ্চারণ স্থান কোথা?
উ : কণ্ঠ্য।
প্র : অ আ ক খ এগুলোকে কি বলে?
উ : বর্ণ।
প্র : জিহ্বার গোড়ালি ও তালুর নরম অংশের সংযোগে কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়?
উ : ক খ গ ঘ।
প্র : 'ঙ' ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়?
উ : জিভের গোড়া উপরের পাটি দাঁতকে স্পর্শ করে।
প্র : জিভের ডগা আর উপর পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত ধ্বনি কোনগুলো?
উ : ত থ দ ধ ন।
প্র : ঙ ঞ ণ ন, ং ধ্বনিগুলো ইংরেজি করলে কোন বর্ণ লিখতে হয়?
উ : N (এন)।
প্র : অন্তঃস্থ বর্ণ কাকে বলে?
উ : যে বর্ণগুলো স্পর্শ বর্ণের অন্তে স্থিত (কিন্তু উষ্মবর্ণের পূর্বে) তাকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।
প্র : অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে অর্ধস্বর বা Semi-vowels কোনগুলো?
উ : য, ব
প্র : 'ই' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : 'ই' কণ্ঠতালব্য উষ্ম ঘোষবর্ণ। যদি 'া' (ব-ফলা)-র সঙ্গে যুক্ত হয় তবে এর উচ্চারণে 'ঝ'-এর মতো হয়। ঘ-ফলাসহ এর উচ্চারণ দাঁড়ায় 'জ্‌ঝ'।
প্র : 'ং' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : 'ং' পরাশ্রিত বর্ণ। নিজে এককভাবে কোনো শব্দে অবস্থান করতে পারে না। বাংলায় এর উচ্চারণ 'ঙ'-এর মতো।
প্র : ' ঁ ' বর্ণের পরিচয় দাও।
উ : ' ঁ ' পরাশ্রিত বর্ণ। অন্যবর্ণের উপরে বসে। মূলত অনুনাসিক। যে-বর্ণের উপরে ' ঁ ' বসে সেই বর্ণকে নাসিকা-সংযোগে উচ্চারণ করতে হয়।

যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ

বাংলা বানানে যুক্তবর্ণ অনিবার্য নিয়তি। প্রাচীনকালে হাতে লেখার প্রথম পর্যায়ে বর্ণগুলো পরস্পরের সঙ্গে খুবই লাগিয়ে দেয়া হতো। পরে লেখকের দ্রুততার কারণে বর্ণগুলো ছিন্ন রূপ নিয়ে নেয়। যেমন : 'এ' এর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হলে 'ক্ষ' হয়। এটা লেখা ও বোঝা দুটোই জটিল। যৌগিক বর্ণগুলো ছাড়া বাংলা স্বরবর্ণে কোনো যুক্তাক্ষর নেই। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে এই যুক্তাক্ষরের সংখ্যা প্রচুর। বাংলা ৫০টি বর্ণের বাইরে এগুলো নতুন করে শিখতে হয়। এই যুক্তবর্ণ বাংলা ভাষা লেখার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

যুক্তব্যঞ্জন স্পষ্টতার দিক থেকে দুভাগে ভাগ করতে পারি । স্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন: অস্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন। স্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন বলব সেগুলোকেই, যেখানে যুক্ত হওয়া বর্ণগুলো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। যেমন : প + ন = প্ন; অ + ন + ত = ক্ত ইত্যাদি। আর অস্পষ্ট যুক্তব্যঞ্জন বলব সেগুলোকে, যেখানে যুক্ত হওয়া বর্ণগুলো স্পষ্ট বোঝা যায় না, আয়াস করে বুঝে নিতে হয়। যেমন : ঞ্ + চ = ঞ্চ; ক্ + ষ = ক্ষ; হ্ + ম = হ্ম ইত্যাদি। অন্যদিকে যুক্তব্যঞ্জনকে বর্ণের সংখ্যা অনুসারে দুভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন : দ্বিযুক্তব্যঞ্জন ও বহুযুক্তব্যঞ্জন। যে যুক্তব্যঞ্জনে দুটো বর্ণ যুক্ত হয় (স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেমনই হোক) তাকে দ্বিযুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন: ব্ + ব = ব্ব; ঞ্ + জ = ঞ্জ; ট্ + ট = ট্ট ইত্যাদি। আর যে যুক্তব্যঞ্জনে দুয়ের অধিক বর্ণযুক্ত হয় (স্পষ্ট বা অস্পষ্ট যেমনই হোক) তাকে বহুযুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন : চ্ + ছ্ + ব = চ্ছ্ব; ন্ + ত্ + ব = ন্ত্ব; ত্ + ম্ + য = ত্ম্য; ন্ + ধ্ + ব = ন্ধ্ব ইত্যাদি। ফলাও একটি ব্যঞ্জন হিসেবে মান্য।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি সরকারিভাবে লিপিসংস্কার করার চেষ্টা হচ্ছে। এর ফলে অস্পষ্ট ব্যঞ্জনসমূহ তারা যথাসম্ভব ভেঙে লিখছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র অস্পষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ পরিদৃষ্ট হয়।

প্র : র্ক-এখানে কোন কোন ব্যঞ্জন যুক্ত আছে?
উ : র্ + ক।
প্র : র্ক-সহযোগে গঠিত শব্দ লেখ।
উ : কর্ক, অর্ক ইত্যাদি।

প্র : ক্ক-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ক।
প্র : ক্ক-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পাক্কা, কুক্কুট, বক্ক, চক্কা, ধাক্কা ইত্যাদি।
প্র : ক্ষ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ষ।
প্র : ক্ষ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পরীক্ষা, ক্ষত্রিয়, অক্ষয়, দীক্ষিত ইত্যাদি।
প্র : ক্ষ্ক-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ষ্ + ক।
প্র : ক্ষ্ক-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : আকাঙ্ক্ষা, মক্ষিকাক্ষরী, ভক্ষাকাঙ্ক্ষী।
প্র : ক্ষ্ম বর্ণটি বিশ্লেষণ কর।
উ : ক্ + ষ্ + ম।
প্র : ক্ষ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ দেখাও।
উ : লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ ইত্যাদি।
প্র : ক্ষ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ম।
প্র : ক্ষ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মপুত্র।
প্র : জ্ঞ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : জ্ + ঞ।
প্র : জ্ঞ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, জ্ঞাত, বিজ্ঞান, অভিজ্ঞান।
প্র : জ্ঞ্ব-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : জ্ + ঞ্ + ব।
প্র : জ্ঞ্ব-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : উজ্জ্বল, ঔজ্জ্বল্য ইত্যাদি।
প্র : ঞ্জ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + জ।
প্র : ঞ্জ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : গঞ্জ, অঞ্জন, রঞ্জন, গঞ্জনা ইত্যাদি।
প্র : ঞ্চ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + চ।

প্র : ঞ্চ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : সঞ্চার, সঞ্চয়না, অঞ্চল, সঞ্চারিতা, সঞ্চিতা।
প্র : ঞ্ছ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ছ।
প্র : ঞ্ছ-সহযোগে গঠিত একটি শব্দ লেখ।
উ : মাঞ্ছা।
প্র : ঞ্জ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ঝ।
প্র : ঞ্ঝ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ঝাঞ্ঝা, ঝাঞ্ঝনীয়, ঝঞ্ঝিত, ঝাঞ্ঝনা, ঝাঞ্ঝিত।
প্র : ঞ্ঞ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ঞ্ + ঞ।
প্র : ঞ্ঞ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : কঞ্ঞা, কঞ্ঞাট ইত্যাদি।
প্র : ট্ট-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ট্ + ট।
প্র : ট্ট-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : চট্টলা, চট্টগ্রাম, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি।
প্র : ট্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ট্ + র (ফলা)।
প্র : ট্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ট্রাক, ট্রেন, ট্রাম ইত্যাদি।
প্র : ত্ত-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ত।
প্র : ত্ত-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : মত্ত, চিত্ত, উত্তাল, প্রদত্ত ইত্যাদি।
প্র : ক্ত-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + ত।
প্র : ক্ত-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : উক্ত, ব্যক্ত, ভক্তি, শক্তি ইত্যাদি।
প্র : ত্ন-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ন।
প্র : ত্ন-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : যত্ন, প্রযত্ন, প্রত্ন, রত্ন ইত্যাদি।
প্র : ত্ম-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + ম।

প্র : ত্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : আত্মা, আত্মিক, মারাত্মক, সর্বাত্মক।
প্র : ত্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + র (ফলা)।
প্র : ত্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পত্র, মিত্র, পবিত্র ইত্যাদি।
প্র : ত্রু-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + র (ফলা) + উ (কার)।
প্র : ত্রু-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ত্রুটি, শত্রু, শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।
প্র : ত্রু-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ক্ + র (ফলা)।
প্র : ত্রু-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ক্রোড়, ক্রীড়া, বিক্রি, ক্রয় ইত্যাদি।
প্র : থ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ত্ + থ।
প্র : থ-সহযোগে যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : উত্থান, উত্থিত ইত্যাদি।
প্র : দ্ব-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : দ্ + ব।
প্র : দ্ব-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : দ্বাদশ, দ্বিতীয়, দ্বেষ, বিদ্বান ইত্যাদি।
প্র : দ্ধ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : দ্ + ধ।
প্র : দ্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : যুদ্ধ, আবদ্ধ, উদ্ধার, উদ্ধত ইত্যাদি।
প্র : ধ্ন-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ধ্ + ন।
প্র : ধ্ন-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : মুগ্ধ, দগ্ধ, দুগ্ধ ইত্যাদি।
প্র : ন্ধ- এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + ধ।
প্র : ন্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : অন্ধকার, বন্ধ, সম্বন্ধ, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
প্র : ন্ত্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ন্ + ত্ + র (ফলা) + য (ফলা)।
প্র : ন্ত্র-সহযোগে গঠিত শব্দ লেখ।
উ : স্বাতন্ত্র্য।
প্র : ব্ধ-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : ব্ + ধ।
প্র : ব্ধ-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : ক্ষুব্ধ, স্তব্ধ, উপলব্ধি ইত্যাদি।
প্র : হ্ল-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ণ।
প্র : হ্ল-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।
প্র : হ্ন-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + ন।
প্র : হ্ন-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ইত্যাদি।
প্র : হ্ম-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ + ম (কার)।
প্র : হ্ম-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : হৃত, সুহৃদ, হৃদয় ইত্যাদি।
প্র : হ্র-এই যুক্তব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?
উ : হ্ + র (ফলা)।
প্র : হ্র-সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ লেখ।
উ : হ্রদ, হ্রাস, হ্রী (লজ্জা) ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তন

ভাষা বহমান নদীর মতো। এই বহমানতা রক্ষিত হয় মৌখিকভাবে ধ্বনি পরিবর্তন এবং লেখার ক্ষেত্রে বিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে। ১৮৭৫ সালে বিশ্ব-ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এক মত হয়ে বলেন যে, ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন একটি নিয়মিত ব্যাপার। কোনো ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে তা মৃতভাষাতে পরিণত হবে এবং অতি-পরিবর্তন হলে সে ভাষা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাবে (সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কি অতি-পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে না?)।

প্র : ধ্বনি পরিবর্তন কী?
উ : কোনো ভাষার শব্দ বহুজনে ব্যবহার হতে হতে কখনো সেই শব্দের ধ্বনিসমূহে নির্দিষ্ট ক্রমরক্ষা হয় না অথবা এর কোনো কোনো ধ্বনি লোপ বা এতে ধ্বনির আগমন ঘটে কিন্তু আগের অর্থ বোঝায়। শব্দের ধ্বনিসমূহের এ রূপ পরিবর্তনকে ধ্বনি পরিবর্তন বলে। যেমন :
স্কুল > ইস্কুল,
পিশাচ > পিচাশ,
ঝিনাইদহ > ঝিনাইদ > ঝিনেদা ইত্যাদি।
প্র : ধ্বনি পরিবর্তনের কারণসমূহ কী?
উ : * উচ্চারণের দ্রুততা
* উচ্চারণে সহজতা
* উচ্চারণের সময় অসাবধানতা
* মুখগহ্বরের প্রত্যঙ্গ-আড়ষ্টতা বা হীনতা।
প্র : ধ্বন্যাগম কী?
উ : এক ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন। উচ্চারণের কারণে অনেক শব্দে যে ধ্বনি নেই তাও এসে গেলে তাকে ধ্বনির আগম বা ধ্বন্যাগম বলে। আগত ধ্বনি স্বরধ্বনি হলে বলে স্বরাগম, ব্যঞ্জনধ্বনি হলে বলে ব্যঞ্জনাগম।
প্র : আদি স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে। যেমন :
স্কুল > ইস্কুল,
স্পর্ধা > আস্পর্ধা,
স্ত্রী > ইস্ত্রী,
স্টেশন > ইস্টেশন,
স্তাবল > আস্তাবল,
স্টিমার > ইস্টিমার ইত্যাদি।
প্র : মধ্য স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে মধ্য স্বরাগম বলে। যেমন : রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, নয়ন > নয়ান, প্রীতি > পীরিতি, ফিল্ম > ফিলিম, মুক্তা > মুকুতা, ভ্রু > ভুরু, গ্রাম > গেরাম , শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ, ক্লিপ > কিলিপ, শুক্রবার > শুক্কুরবার ইত্যাদি।
প্র : অন্ত্য স্বরাগম কাকে বলে?
উ : ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মূল শব্দের অন্তে বা শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটাকে। যেমন : সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি, ট্যাক্স > ট্যাকসো, দিশ্ > দিশা ইত্যাদি।
প্র : অপিনিহিতি কাকে বলে?
উ : শব্দের মধ্যে ই বা উ ধ্বনি থাকলে তাদের উচ্চারণ যথাস্থানের আগে করার প্রবণতা। এর দরুন ই অথবা উ নির্দিষ্ট স্থানের আগে উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। যেমন। আজি > আইজ, চারি > চাইর, মারি > মাইর, জালিয়া > জাইলা, রাতি > রাইত, কালি > কাইল ইত্যাদি। শব্দে আপাতত দেখা যাচ্ছে না, তবে অন্তর্নিহিত আছে, এমন ক্ষেত্রেও অপিনিহিতি হয়। যেমন : ভাগ্য (ভাগ্যইয়) > ভাইগ্য, বাক্য (বাক্যইয়) > বাইক্য, সত্য (সত্যইয়) > সইত্য। অনুরূপ : কন্যা > কইন্যা, বক্ষ > বইক্ষ, লক্ষ > লইক্ষ, কাব্য > কাইব্য ; সাধু > সাউধ, মাছুয়া > মাউছ্যা ইত্যাদি।
প্র : অভিশ্রুতি কাকে বলে?
উ : অপিনিহিতির প্রভাবজাত ই কিংবা উ-ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষায় যেমন অপিনিহিতির প্রাচুর্য, পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক কথ্যভাষা ও মান্যচলিত ভাষায় তেমনি অনেক অভিশ্রুতি শব্দ লক্ষ করা যায়। যেমন : মানিয়া > মাইন্যা > মেনে, করিয়া > কইর‍্যা > করে, বাছিয়া > বাইছ্যা > বেছে, শহরিয়া > শহইর‍্যা > শহরে, মাছুয়া > মাউছ্যা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, মাঠুয়া > মাউঠ্যা> মেঠো, হাটুয়া > হাউট্যা > হেটো ইত্যাদি।
প্র : অসমীকরণ ধ্বনি পরিবর্তন কাকে বলে?
উ : সমধ্বনি পাশাপাশি উচ্চারণের সময় অনেক ক্ষেত্রে একটি স্বরধ্বনি যুক্ত হলে তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : ফট + ফট > ফটাফট, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, পট + পট > পটাপট ইত্যাদি।
প্র : স্বরসঙ্গতি কাকে বলে?
উ : পরপর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মতো হওয়াকে স্বরসঙ্গতি বা উচ্চতাসাম্য বলে। যেমন : অতি > ওতি (অ = নিম্নমধ্য থেকে পরিবর্তিত হয়ে ও =

প্র : মধ্যব্যঞ্জনলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : গোষ্ঠ > গোঠ, মজদুর > মজুর, দুগ্ধ > দুধ ইত্যাদি।

প্র : অন্ত্যব্যঞ্জনলোপ কাকে বলে?

উ : শব্দের শেষে বা অন্তে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে। যেমন : বৌদিদি > বৌদি, আলোক > আলো, ছোটকাকা > ছোটকা, ঝিনাইদহ > ঝিনাইদ, শিয়ালদহ > শিয়ালদ ইত্যাদি।

প্র : অন্তর্হতি কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন : আলাহিদা > আলাদা, ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার।

প্র : ব্যঞ্জন বিকৃতি কাকে বলে?

উ : শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যদি কোনো নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন : ধোবা > ধোপা, কবাট > কপাট, ধাইমা > দাইমা, শাক > শাগ ইত্যাদি।

প্র : ব্যঞ্জনচ্যুতি কাকে বলে?

উ : শব্দের শেষে পাশাপাশি সমউচ্চরণ সম্পন্ন দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থেকে একটি লোপ পাওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বা ধ্বনিচ্যুতি বলে। যেমন : বড়দাদা > বড়দা, বড়দিদি > বড়দি ইত্যাদি।

প্র : সমাক্ষর লোপ কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় কোনো শব্দে একই জাতীয় অক্ষর অথবা সম (বা একই) অক্ষর (বা Syllable) লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন : ছোটদাদা > ছোটদা; বড়দাদা > বড়দা; বউদিদি > বউদি; ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা; ভাইশ্বশুর > ভাইশুর > ভাশুর। সমাক্ষর লোপ ব্যঞ্জনচ্যুতি ও ব্যঞ্জনলোপের উদাহরণও বটে।

প্র : ধ্বনিবিপর্যয় কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি স্থান পরিবর্তন হলে। একে বর্ণ বিপর্যয়ও বলা হয়। যেমন : নকশা > নশকা, কলমি > কমলি, পিশাচ > পিচাশ, বাক্স > বাসক, রিক্সা > রিস্কা, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, চাকরি > চারকি, লোকসান > লোসকান, তুলতুলা > লুতলুতা, এক্সিডেন্ট > এক্সিডেন্ট ইত্যাদি।

প্র : সমীকরণ কাকে বলে?

উ : দেখা যায় পর পর উচ্চার্য দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান পৃথক হলে একটির ধ্বনি বদলে যায়, যাতে ধ্বনি দুটির উচ্চারণস্থান এক কিংবা কাছাকাছি হয়, এরূপ হলে। যেমন : অনু + স্থান= অনুষ্ঠান (এখানে স > ষ হলে উচ্চারণস্থানের পরিবর্তন হেতু থ > ঠ হচ্ছে। এতে ষ ও ঠ একই উচ্চারণ স্থানীয় হল।)

প্র : সমীভবন কাকে বলে?

উ : উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি একই রকম হয়ে যাওয়া, কিংবা একই রকম হওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় সমীভবন। সমীভবনকে ব্যঞ্জনসঙ্গতিও বলা হয়। যেমন : দুর্গা > দুগ্গা, জন্ম > জম্ম ইত্যাদি।

প্র : পরাগত সমীভবন কাকে বলে?

উ : সমীভবন ঘটিত পরিবর্তনটি যদি প্রথম ধ্বনির ক্ষেত্রে ঘটে এবং প্রথম ধ্বনি পরের ধ্বনির মতো হয়। যেমন : গল্প > গপ্প, তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, বদ্ + জাত > বজ্জাত ইত্যাদি।

প্র : প্রগত সমীভবন কাকে বলে?

উ : সমীভবন ঘটিত পরিবর্তন যদি দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে ঘটে এবং দ্বিতীয় ধ্বনি প্রথম ধ্বনির মতো হয়। যেমন : চন্দন > চন্নন, পদ্ম > পদ্দ, পক্ব > পক্ক, চক্র > চক্‌ক, লগ্ন > লগ্‌গ ইত্যাদি।

প্র : অন্যোন্য সমীভবন কাকে বলে?

উ : যে সমীভবন প্রক্রিয়ায় শব্দস্থিত দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনির রূপান্তর হয়। যেমন : বৎসর > বছর, সত্য > সচ্চ (পরে স্বরাগমের মাধ্যমে সচ্চ > সাচ্চা হয়), বিদ্যা > বিজ্জা (এখানে 'বিদ্যা'র য-ফলা অর্থাৎ য > জ এর মত উচ্চারণ হয়ে দ্বিত্ব হচ্ছে) ইত্যাদি।

প্র : বিষমীভবন কাকে বলে?

উ : দুটো সমবর্ণের একটির অপরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর >

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

প্র : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কী?

উ : বাংলা ভাষায় বহু সংস্কৃত বা সংস্কৃতভব (তৎসম) শব্দ আছে সংস্কৃত ভাষার ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান রীতি এখনো চালু আছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দগুলোতে এই নিয়ম প্রয়োগ হয়। ফলে শুদ্ধ ণ এবং ষ ব্যবহারের এসব বিধানকেই ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান বলে।

প্র : ণ ব্যবহার হয় এমন দুটি নিয়ম লেখ।

উ : ১. ট-বর্গের ধ্বনির আগে ণ হবে। যেমন: কণ্টক, ঘণ্ট, ঘণ্টা, কণ্ঠ ইত্যাদি।

২. ঋ র ষ ধ্বনির পরে ণ হবে। যেমন: তৃণ, তৃণ, বেণু, বিশ্বেষণ, দূষণ, বিভীষণ, তৃণ, বর্ণ, স্মরণ ইত্যাদি।

প্র : ণ-ত্ব বিধানের দুটি অন্য নিয়ম লেখ।

উ : ১. ঋ র ষ ধ্বনির পর হসন্ত যেকোন স্বরবর্ণ ও-কার, ণ-বর্গ, য, ব, হ, ং ধ্বনি থাকে, তার পরে ণ হবে। যেমন: প্রবণ, পরিবহণ, পরিমাণ, বেদন, প্রমাণ, কর্ণক, গ্রহণ, ব্রাহ্মণ, নির্মাণ ইত্যাদি।

২. ক র ষ-এর পর চ-বর্গ, ত-বর্গ, ট-বর্গের কোনো বর্ণ থাকলে এরপর ণ না হয়ে ন হবে। যেমন: রচনা, রটনা, রর্তন, আবর্জনা ইত্যাদি।

প্র : নিত্য মূর্ধন্য ণ বিধান কী?

উ : কোনো কোনো তৎসম শব্দে স্বাভাবিকভাবেই ণ ব্যবহৃত হয়। এর জন্য কোনো নিয়ম রীতি নেই। এগুলোকে নিত্য মূর্ধন্য-ণ বলে। যেমন : অণু, কঙ্কণ, নিপুণ, পণ্য, পাণি, পুণ্য, ফণী, বণিক, বাণ, লাবণ্য, স্থাণু, চাণক্য, মণিকা, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, বীণা, কণিকা, শোণিত, মণি, বেণী, বিপণী, আপণ, পণ, শাণ, নিকৃণ ইত্যাদি। এসব বানানে ণ এর স্থলে ন লিখলে ভুল হবে।

গল্পচ্ছলে এগুলো মনে রাখা যায় :

এক বণিক কতেকশ মণ লবণ বাণিজ্য করে। ভণি, মাণিক তার পুত্রের চাকরি নেই। অণু নামের এ নিপুণ লাবণ্যময়ী গুণী তরুণ, বেণু আর বীণা তাদের নিপুণ করে গান বাঁধানো আর গেয়ে বেড়ানোর বিপণীতে আগে। নিজ আপণে স্থাণু হয়ে বসে বহু পুণ্য ও চাকরোর সঙ্গে আপণে রাত তখন নিপুণ মেই নাবিক। অণু পণ করেছিল, তার দেহে এক কণিকা পৌঁছে থাকলেও বণিকের মুখোমুখি হলে সে এর পরিণতে থাকবে তার মৃত্যুবরণ।

প্র : ষ-ত্ব বিধানের দুটির সরল নিয়ম লেখ।

উ : ১. ট ও ঠ ধ্বনির আগে যুক্তবর্ণরূপে সর্বদা ষ হবে। যেমন : স্পষ্ট, ষ্ঠান, ষষ্ঠ, কষ্ট, নিষ্ঠুর, নষ্ট ইত্যাদি।

২. অ-কার ও ব-এর পর ষ হয়। যেমন : কৃষক, বর্ষা, কর্ষণ, বৃষ্টি, তৃষা ইত্যাদি।

প্র : ষ-ত্ব বিধানের অন্য দুটি নিয়ম লেখ।

উ : ১. ই-কার ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে (যেমন : সদ, সিচ্, সন্জ, সিধ, সেন্, স্থা) ষ হয়। যেমন: অভি-সেক>অভিষেক, সু-সুপ্ত>সুষুপ্ত, অনু-সঙ্গ> অনুষঙ্গ, প্রতি-সেধক> প্রতিষেধক, প্রতি-স্থান> প্রতিষ্ঠান, অনু-স্থান> অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

২. অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক/র-এর পর ষ প্রয়োগ হলে তা অবিকৃত থাকে। যেমন : ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, বিষয়, সুষমা, চিকীর্ষা ইত্যাদি।

প্র : নিত্য মূর্ধন্য-ষ রীতি কী?

উ : কোনো কোনো শব্দে স্বভাবতই ষ বসে, এক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে বানান ভুল হয়। যেমন : আষাঢ়, বাষ্প, মহিষ, উষা, অভিলাষ, মানুষ, সরিষা, ঔষধ, ঔষধি, ষোড়শ, পৌষ, ভূষণ, রোষ ইত্যাদি।

গল্পচ্ছলে এগুলো মনে রাখা যায় :

বাষ্পহীন আষাঢ়ের ঊষাকালে সরিষা ক্ষেতে মহিষ চরে। ঋষিক ক্ষেতে শস্য মানুষেরা অভিলাষ করে, ভোর হলে ক্ষেতের ভূষণ সবাকে যে আনাচী দেখাবে।

প্র : ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব নিষেধ কী?

উ : দুটি ক্ষেত্রে ণ / ষ ব্যবহার করা যাবে না বলে নিয়ম আছে। একে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব নিষেধ বলা হয়। যেমন :

১. যে কোন বিদেশি শব্দে ণ/ষ ব্যবহার ভুল।

২. দেশি শব্দেও ণ/ষ ব্যবহার ভুল।

এছাড়াও সমাসবদ্ধ পদে সাধারণ ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়, এক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মনে রাখতে হয়। যেমন— দাক্ষায়ণী, [illegible] ক্ষেত্রে ণত্ব হয়। যেমন— [illegible] ষত্ব হয়। যেমন— [illegible]

সন্ধি

সন্ধি ভাষার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। চলার পথে শব্দাবলি দ্রুত উচ্চারণের সুবিধার্থে বক্তা শব্দস্থিত পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক ধ্বনিকে একত্রে উচ্চারণ করেন। এই একত্র উচ্চারণ ঐ ধ্বনিসমূহের বৈশিষ্ট্য মোতাবেক হয়ে থাকে; বক্তার স্বেচ্ছাচারিতার উপর তা নির্ভরশীল নয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সব ভাষাতেই সন্ধি আছে। তিনি ইংরেজি ভাষার উদাহরণ দিয়ে লিখেছেন : 'extraordinary – উচ্চারণে [ikstrordinari] (a এবং O-এর সন্ধিতে প্রথম স্বর-ধ্বনি লোপ)' ঘটে। তবে একথা ঠিক, সব ভাষাতেই নিজস্ব নিয়মে সন্ধি সম্পন্ন হয়। ইংরেজির নিয়ম সংস্কৃতে খাটে না, সংস্কৃতের রীতি বাংলায় হুবহু চলে না।

প্র : সন্ধি কাকে বলে?

উ : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনি পরিবর্তন হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরকে সন্ধি বলে। বাংলা ভাষার তুলনায় সংস্কৃতে সন্ধি বেশি হয়।

প্র : 'সন্ধি' শব্দের বিশ্লেষণাত্মক রূপ কী?

উ : সম+√ধৃ (সমভাবে যা ধারণ করে)।

প্র : সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?

উ : বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি দু প্রকার। স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে তিন প্রকার; স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ [illegible] সন্ধি। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হয়, তাই বাংলা সন্ধি আলোচনাকালে বিশেষ সন্ধি অবশ্যই [illegible]

প্র : সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য কী?

উ : পরস্পর সন্নিহিত দুই ধ্বনির এক ধ্বনিতে পরিণত হওয়াকে সন্ধি বলে। অন্য সমাস বহুপদ একপদে পরিণত হওয়াকে বোঝায়। ফলে সন্ধিতে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে, সমাসে পদের পরিবর্তন ঘটে।

প্র : সন্ধির উদ্দেশ্য কী?

উ : উদ্দেশ্য দুটি : শব্দোচ্চারণ সহজ করা, ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

প্র : যে দুটি শব্দে সন্ধি হয়, সেগুলোকে কী বলে?

উ : প্রথমটি পূর্বপদ, পরেরটি উত্তরপদ।

প্র : অন্তঃসন্ধি কাকে বলে?

উ : যে সন্ধি অর্থোচ্চারণকারী কোনো শব্দ নয়, কোনো ধ্বনি, প্রত্যয়, উপসর্গ বা এই জাতীয় শব্দাংশ বা ধ্বনিসমষ্টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। যেমন : পো + ইত্র > পবিত্র। এখানে পো বা ইত্র-র কোনো পৃথক অর্থ নেই।

অনুরূপ : ভজ্ + ত = ভক্তঃ মুহ্ + ত = মুগ্ধঃ দহ্ + ত = দগ্ধ।

প্র : বহিঃসন্ধি কাকে বলে?
উ : দুটি পদের অর্থ বিশেষ কিছু বদল হয়ে যে সন্ধি হয়, যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়। এখানে বিদ্যা ও আলয় দুটি পদের পৃথক অর্থ আছে। অনুরূপ : দুরন্ত + ধর্ম = দুরন্তধর্ম, উৎ + দিষ্ট = উদ্দিষ্ট।

প্র : বহঃসন্ধি কাকে বলা?
উ : যেসব সন্ধি করলে বিশেষ কোনো সন্ধি হয় না, শুধু দুটি পদকে আলাদা করে দিলে এই সন্ধি করা যায়, তাকে বহঃসন্ধি বলে। যেমন : দুরন্ত + ধর্ম = দুরন্ত ধর্ম, অতি + অন্ত = অত্যন্ত ইত্যাদি।

প্র : ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে?
উ : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যে কোনো স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে যে সন্ধি করে তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন : দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, বাক্ + দান = বাগ্দান ইত্যাদি।

প্র : বিসর্গসন্ধি কাকে বলে?
উ : পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরের পদের যে সন্ধি হয় তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন : তত্ত্ব+অধিক = তত্ত্বাধিক, আশী+বাদ = আশীর্বাদ ইত্যাদি।

প্র : বিসর্গসন্ধিকে স্বরসন্ধি বলা হয়েছে কেন?
উ : দুইভাবে : স-জাত বিসর্গ (প্রথম) এবং স-জাত বিসর্গ (দ্বিতীয়) একত্রে নয়)।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্বরসন্ধির উদাহরণ দাও।
উ : দিবসের = দিব + অসর
পুরুষ = পত + এক
একত্রিত = একত্র + ইত
অনেক = অন্ত + ইচ্ছা
কঙ্কাল = কঙ্কা + কলা
দীর্ঘায়ু = দীর্ঘ + আয়ু
জলৌঘ = জল + ওঘ
মহোর্ধ্ব = মহা + ঐর্ধ্ব
রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র
পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
ইত্যাদি = ইতি + আদি
নবোঢ়া = নব + ঊঢ়া
হিতোপদেশ = হিত + উপদেশ
কথোপকথন = কথা + উপকথন

উত্তমর্ণ = উত্তম + ঋণ
অধমর্ণ = অধম + ঋণ
রাজর্ষি = রাজা + ঋষি
তৃষ্ণার্ত = তৃষ্ণা + ঋত
ভয়ার্ত = ভয় + ঋত
ক্ষুধার্ত = ক্ষুধা + ঋত
মনোযোগ = মনঃ + আযোগ
একেন = এক + ঊন
মাতৃদেশ = মাতৃ + আদেশ
পিতৃালয় = পিতৃ + আলয়
ভবন = ভো + অন
নরাধম = নর + অধম
হৃদন্তর = হৃদ + অন্তর
কথামৃত = কথা + অমৃত
যথার্থ = যথা + অর্থ
সানুনাসিক = স + অনুনাসিক
পশ্বধম = পশু + অধম
পশ্বাচার = পশু + আচার
বেশকম = বেশি + কম
অন্বেষণ = অনু + এষণ
মন্বন্তর = মনু + অন্তর
নয়ন = নো + অন
পবিত্র = পৌ + ইত্র
গবেষণা = গো + এষণা
শায়ন = শে + অন
গায়ক = গৈ + অক
নিশকাল = নিশি + কাল
অর্ধেক = অর্ধ + এক
বধূক্তি = বধূ + উক্তি
লঘূর্মি = লঘু + ঊর্মি
তথৈবচ = তথা + এবচ
বধূৎসব = বধূ + উৎসব
রত্নাকর = রত্ন + আকর
স্বাধীন = স্ব + অধীন
স্বাধিকার = স্ব + অধিকার
স্বেচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা
নরেন্দ্র = নর + ইন্দ্র
নীলোৎপল = নীল + উৎপল
হিতৈষী = হিত + ঐষী
মতৈক্য = মত + ঐক্য
মহৌষধি = মহা + ওষধি
উপর্যুক্ত = উপরি + উক্ত
প্রত্যেক = প্রতি + এক
নদ্যম্বু = নদী + অম্বু
স্বল্প = সু + অল্প

অত্যন্ত = অতি + অন্ত
প্রত্যেক = প্রতি + এক
গত্যন্তর = গতি + অন্তর
যদ্যপি = যদি + অপি
ভবী = ভবু + ঈ
ধর্মাধর্ম = ধর্ম + অধর্ম
চন্দ্রানন = চন্দ্র + আনন
নিশাই = নিশা + অই
নদ্যুপকণ্ঠ = নদী + উপকণ্ঠ
মাতৃপদেশ = মাতৃ + উপদেশ
সূক্ত = সু + উক্ত
একৈক = এক + এক

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনসন্ধি লেখ।
উ : বিজন্ত = বিচ্ + অন্ত
সুবন্ত = সুপ্ + অন্ত
বাগধারা = বাক্ + ধারা
বাগদত্তা = বাক্ + দত্তা
সচ্চিন্তা = সৎ + চিন্তা
সচ্চরিত্র = সৎ + চরিত্র
কুচ্ছটিকা = কুৎ + ঝটিকা
উচ্ছ্বাস = উৎ + শ্বাস
উচ্চীন = উৎ + চীন
ষড়ঋতু = ষট্ + ঋতু
পচ্ছত্তি = পদ্ + হত্তি
উদ্যোগ = উৎ + যোগ
সঞ্চয় = সম্ + চয়
দিগন্ত = দিক্ + অন্ত
বাগীশ = বাক্ + ঈশ
কৃদন্ত = কৃৎ + অন্ত
সদুপদেশ = সৎ + উপদেশ
মুখচ্ছবি = মুখ + ছবি
বৃক্ষচ্ছায়া = বৃক্ষ + ছায়া
উচ্চারণ = উৎ + চারণ
শরচ্চন্দ্র = শরৎ + চন্দ্র
উজ্জ্বল = উৎ + জ্বল
যাবজ্জীবন = যাবৎ + জীবন
উচ্ছৃঙ্খল = উৎ + শৃঙ্খল
ষড়যন্ত্র = ষট্ + যন্ত্র
জগন্নাথ = জগৎ + নাথ
শঙ্কা = শম্ + কা
কিম্ভূত = কিম্ + ভূত
কিন্নর = কিম্ + নর
সন্ধান = সম্ + ধান
স্বয়ংবরা = স্বয়ম্ + বরা
সংগত = সম্ + গত

সংঘ = সম্ + ঘ
অহরহঃ = অহম্ + হাঃ
সংখ্যা = সম্ + খ্যা
সংলাপ = সম্ + লাপ
কিংবা = কিম্ + বা
সপ্তাহ = সপ্ত + হ
যন্ত্র = যম্ + ত্র
রাজ্ঞী = রাজ্ + ঈ
কুদ্বি = কুৎ + ছি
হট্ট = ষদ্ + ট
বাঙ্ময় = বাক্ + ময়
উদ্ধত = উৎ + হত
ষড়ানন = ষট্ + আনন
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ + বদা
সন্ধান = সম্ + ধান
সিংহ = সিন্ + হ
হিংসা = হিন্ + সা
চলচ্চিত্র = চলৎ + চিত্র
উদ্যম = উৎ + যম
বাগ্মুলাল = বাক্ + মোল
পচ্ছত্তি = পদ্ + হত্তি
ক্ষুৎপিপাসা = ক্ষুধ্ + পিপাসা
সম্পাদ্যাত = সম্পদ্ + দ্যাত
বসুন্ধরা = বসুন্ + ধরা
বিচ্ছেদ = বি + ছেদ
বুদ্ধ = বুধ্ + ত
সংস্কৃত = সম্ + কৃত
পরিচ্ছেদ = পরি + ছেদ
চিন্ত = চিন্ + ত
বরঞ্চ = বরম্ + চ

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিসর্গসন্ধি লেখ।
উ : প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
অতএব = অতঃ + এব
তপোবন = তপঃ + বন
তপোধিকা = তপঃ + অধিকা
যশোচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা
শিরোপরি = শিরঃ + উপরি
মনোহর = মনঃ + হর
পুনরায় = পুনঃ +আয়
পুনর্জন্ম = পুনঃ + জন্ম
দুর্যোগ = দুঃ + যোগ
নিরাকার = নিঃ + আকার
নীরস = নিঃ + রস
নীরব = নিঃ + রব

= অহঃ + অহ
দ = আশীঃ + বাদ
= দুঃ + লোভ
= নিঃ + চয়
= বহিঃ + কার
= ধনুঃ + টঙ্কার
দুঃ + তর
ধ = মনঃ + যোগ
ঃ + খ
= শিরঃ + ছেদ
= ইতঃ + তত
= যশঃ + লাভ
= দ্বিঃ + আগমন
= অন্তঃ + লীন
= ততঃ + অধিক
= পুরঃ + কার
= তিরঃ + কার
= আবিঃ + কার
= চতুঃ + কোণ
মনঃ + জ
দুঃ + আত্মা
দুঃ + অবস্থা
= ভ্রাতুঃ + পুত্র
শ্রেয়ঃ + কর
ঃ + কর
= যশঃ + অভিলাষ

ড কাকে বলে?

সাধারণ বা বিশেষ কোনো
ই যখন কোনো কর্ম ব্যাখ্যা
অথচ তা সংঘটিত হয়, তখন
মকে বৈধতা দেয়ার নাম
সিদ্ধ। বৈয়াকরণিকগণ
র সহযোগে সন্ধিসহ বেশ
মোদন করেছেন।

ও বিশেষ নিয়মে সাধিত
ক্ষেপ কর।
রসন্ধি :
+ অন্য
অটা
ক্ষ

গবেন্দ্র = গো + ইন্দ্র
গবেশ্বর = গো + ঈশ্বর
অক্ষৌহিণী = অক্ষ + ঊহিণী
মার্তণ্ড = মার্ত + অণ্ড
রক্তোষ্ঠ = রক্ত + ওষ্ঠ
সীমন্ত = সীমন + অন্ত
শারঙ্গ = শার + অঙ্গ
শুদ্ধোধন = শুদ্ধ + ওদন

মনে রেখো এভাবে :

শৈর রাজা গবেন্দ্র, তাঁর দুই মন্ত্রী গবেশ্বর ও শুদ্ধোধন-কে নিয়ে সকালবেলার মার্তণ্ড (সূর্য) দেখবেন বলে গবাক্ষ (জানালা) পথে তাকালেন। একদিকে দেখলেন শারঙ্গ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) হাতে এক প্রৌঢ় কুলটা (সমাজ যাদের অসতী বলে) নারী। তার সীমন্ত (সিঁথি) এলোমেলো ও রক্তোষ্ঠ। অন্যদিকে দেখলেন অক্ষৌহিণী (২১৮৭০০ যোদ্ধাবিশিষ্ট সেনাদল) সহ তাঁর সেনাপতি ও অন্যান্য মন্ত্রী রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আসছেন।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :
আশ্চর্য = আ + চর্য
ষোড়শ = ষট্ + দশ
দ্যুলোক = দিব্ + লোক
পতঞ্জলি = পতৎ + অঞ্জলি
একাদশ = এক + দশ
বৃহস্পতি = বৃহৎ + পতি
গোষ্পদ = গো + পদ
বনস্পতি = বন + পতি
পরস্পর = পর + পর
তস্কর = তৎ + কর
মনীষা = মনস্ + ঈষা

মনে রেখো এভাবে :

পতঞ্জলি ও মনীষা আশ্চর্য হয়ে পরস্পর তাকায়। সেই তস্করকে (চোর) তারা চিনে ফেলে। গত বৃহস্পতিবার ষোড়শ অথবা একাদশজন মিলে দ্যুলোকের গোষ্পদ আর বনস্পতি এরা ধ্বংস করেছে।

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি :
উত্থান = উৎ + স্থান
সংস্কার = সম + কার
উত্থাপন = উৎ + স্থাপন
পরিষ্কার = পরি + কার
সংস্কৃতি = সম + কৃতি
পরিষ্কৃত = পরি + কৃত
সংস্কৃত = সম + কৃত

মনে রেখো এভাবে :

চুরির এই ঘটনা তারা কোনো সংস্কার না রেখেই সংস্কৃত ভাষায় পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করে এবং এতে এক পরিষ্কৃত সংস্কৃতির উত্থান ঘটে।

নিপাতনে সিদ্ধ
আস্পদ = আ
অহরহ = অহ
ভাস্কর = ভা
বাচস্পতি = ব
মনঃকষ্ট = মন
অহর্নিশ = অ
প্রাতঃকাল =
শিরঃপীড়া =
হরিশ্চন্দ্র = হ

মনে রেখো এভা

বাচস্পতি বাবুর
অহরহ শিরঃপীড়া
তিনি ভাস্কর (সূর্য
মনঃকষ্টে আছেন

লৈঙ্গিক শব্দ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন :

এক. 'লিঙ্গ' নামে একটি বিষয় বাংলা ব্যাকরণে পঠিত হয়ে আসছে। ইংরেজিতে যাকে Gender বলে বাংলায় তাকে বলা হচ্ছে 'লিঙ্গ'। আবার ইংরেজরা যাকে 'penis' বলেন তাকেও বাঙালিরা চলতি বাংলায় 'লিঙ্গ' বলেই চেনেন। ইংরেজদের 'sex' শব্দের অনুবাদেও বাংলা ভাষায় 'লিঙ্গ' লেখা হয়। (উদাহরণ : 'Sex : Female / Male'। বিভিন্ন ছাপা ফরমে এই উদাহরণটি খুবই দেখা যাবে।) বারংবার 'লিঙ্গ' শব্দের ব্যবহার বাংলার শব্দ-দারিদ্র্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করে। বিশেষ করে 'Gender' বলতে যে প্রতীতি বোঝায় তার জন্য পৃথক শব্দের আগমন জরুরি। ব্যাকরণ পাঠের সময় 'লিঙ্গ' শব্দটি শ্রুতিমধুর হয় না; বারংবার উচ্চারণের সময় ক্ষেত্রবিশেষে তা শিক্ষার্থীদের হাস্যরসের উদ্রেক করে। Gender-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'লিঙ্গ'-এর বদলে 'জন' প্রস্তাব করছি।

দুই. প্রচলিত
প্রতীতি
না বলে
দাবি।
মানসিকত
হিসেবে
পত্নী,
কামিনী।
যেখানে
সেখানে
সেদিক
স্ত্রীলিঙ্গে
Masc
(হাস্য
গৃহীত
এটা
হাতি
আছে
প্রস্তা
কর্ত
ছাত্র
শব্দ

প্র : লৈঙ্গিক শব্দ কী?

উ : এটি শব্দের শ্রেণিবিশেষ। এগুলো সাধারণত বিশেষ্য পদ।

প্র : লিঙ্গ কত প্রকার ও কী কী?

উ : দুই প্রকার: পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ।

প্র : ক্লীবলিঙ্গ বাংলায় বিবেচনা করা হয় না কেন?

উ : সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ক্লীবলিঙ্গ বিবেচনা করা হয়। সেখানে স্ত্রী শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, দার (অর্থ স্ত্রী) শব্দটি পুংলিঙ্গ, কলত্র (অর্থ স্ত্রী) ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃতের মতো বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গান্তর এতটা কঠোর নিয়মবদ্ধ নয়। এমন কি বিশেষণেও লিঙ্গভেদ ঘটে না। যেমন : সুন্দর বালিকা (সুন্দরী নয়)। তাই ক্লীবলিঙ্গ বিবেচনা করা হয় না।

প্র : 'হিজড়া' কোন লিঙ্গের?

উ : 'হিজড়া' শব্দটি হিন্দি। তারা সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। হিজড়াকে বলা হয়: Hermaphrodite. পৃথিবীতে অনেক দেশেই হিজড়াদের Male বা Female নয় Third sex বলে। বাংলাদেশেও ২০১৩ সালের নবেম্বরে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'হিজড়া'দের 'হিজড়ালিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এতে বলা হয়, বাংলা ও ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রেই 'হিজড়া' লেখা হবে- এর কোনো ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে হিজড়া হচ্ছে ক্রোমোজমের ত্রুটি ও জটিলতার কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী মানুষ, যাদের পরবর্তীকালে লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়। হিজড়ারা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দুধরনের। নারী-হিজড়াদের মধ্যে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্ত্রীজননাঙ্গ না থাকায় তাদের শারীরিক গঠন অস্বাভাবিক; পুরুষ-হিজড়াদেরও পুংজননাঙ্গ না থাকায় তারাও অস্বাভাবিক। বৈশিষ্ট্যে বা বাইরে নারী-পুরুষ যেমনই দেখা যাক না কেন, নিজেদের এরা নারী হিসেবেই বিবেচনা করে থাকে। বাংলাদেশে পনের হাজার, মতান্তরে এর একটু বেশি সংখ্যক হিজড়ার বাস।

প্র : খাঁটি বাংলায় লিঙ্গান্তর প্রক্রিয়াকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উ : বাংলা ভাষায় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দের লিঙ্গান্তর প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : প্রাকৃতিক ও সামাজিক। দেবর — জা এই লিঙ্গান্তর প্রাকৃতিক, দেবর — ননদ লিঙ্গান্তর সামাজিক। বৈবাহিক ও পেশাগত দিক থেকে সামাজিক এই বিভাগটিকে দুটো উপ-বিভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : শিক্ষক — শিক্ষকপত্নী বৈবাহিক লিঙ্গান্তর, কিন্তু শিক্ষক — শিক্ষিকা বা শিক্ষয়িত্রী পেশাগত লিঙ্গান্তর। কোনো শব্দের সব ধরনের লিঙ্গান্তর যে থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। আচার্য শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'আচার্যানী'। এটা সামাজিক (বৈবাহিক) লিঙ্গান্তর। আবার আচার্যাও সামাজিক তবে পেশাগত। ভাই — বোন লিঙ্গান্তর প্রাকৃতিক। আবার ভাই — ভাইবৌ/ভাবি সামাজিক (বৈবাহিক) লিঙ্গান্তর। লিঙ্গান্তরের সামাজিক ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে নয়।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্গান্তর লেখ।

উ :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রী লিঙ্গ
ঠাকুর	ঠাকুরন বা ঠাকরুন বা ঠাকুরানী
হুজুর	হুজুরাইন
মৎস্য	মৎসী
মনুষ্য	মনুষী
মানুষ	মানুষী
গো	গবী
বিধাতা	বিধাত্রী
গৃহস্বামী	গৃহস্বামিনী
হুলো বিড়াল	মেনি বিড়াল
মদ্দা ঘোড়া	মাদি ঘোড়া
সভ্য	মহিলা সভ্য
শুক	সারী
দুলহা	দুলাইন/দুলহিন
মলিন	মলিনা
মেধাবী	মেধাবিনী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
মালেক	মালেকা
মুহতারিম	[illegible]
ধাতা	ধাত্রী
মহৎ	মহতী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
খান	খানম
মরদ	জেনানা
গণ্ড (ষাঁড়)	গাবী (গাভি)
ষাঁড়	গাভি
রাজা	রাজী
ব্যঙ্গমা	ব্যঙ্গমী
ঋষি	ঋষ্যানী/ঋষিকা
ব্রহ্মা	ব্রহ্মাণী
ভব	ভবানী
ডাহুক	ডাহুকী
নর-হাতি	মাদি-হাতি
নর-চিল	মাদি-চিল
এঁড়েবাছুর	নইবাছুর/বকনা
তাঐ	মাঐ

প্র : নিত্য স্ত্রী-বাচক কয়েকটি শব্দ লেখ।

উ : সতিন, ডাইনি, বাইজি, শাঁখচুন্নি, শাঁখিনী, সৎমা, এয়ো, দাই, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, কলঙ্কিনী, অন্তঃসত্ত্বা, সপত্নী, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সধবা, রূপসী, সজনী, ধনি ইত্যাদি।

প্র : নিত্য পুরুষবাচক কয়েকটি শব্দ লেখ।

উ : কবিরাজ, যোদ্ধা, সেনাপতি, দলপতি, ঢাকী, কৃতদার, রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি ইত্যাদি।

প্র : সুকেশ (যে-পুরুষের মাথায় সুন্দর চুল আছে) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী?

উ : সুকেশা, সুকেশী, সুকেশিনী এ তিনটিই শুদ্ধ।

প্র : অবয়ববাচক কতিপয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একাধিক শব্দরূপ দেখা যায়। উদাহরণ দাও।

উ : চন্দ্রমুখ > চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখা
সুনয়ন > সুনয়নী, সুনয়না
সুকেশ > সুকেশী, সুকেশা, সুকেশিনী
হেমাঙ্গ > হেমাঙ্গী, হেমাঙ্গা, হেমাঙ্গিনী
কুলোদর > কুলোদরী, কুলোদরা
মৃগনয়ন > মৃগনয়নী, মৃগনয়না
চন্দ্রবদন > চন্দ্রবদনী, চন্দ্রবদনা
সুকণ্ঠ > সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা
(ব্যতিক্রম : পূর্ণগর্ভ > (শুধু) পূর্ণগর্ভা)

প্র : অবয়ববাচক শব্দ ছাড়াও কতিপয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ একাধিক শব্দ দেখা যায়। উদাহরণ দাও।

উ : সিংহ > সিংহী, সিংহিনী
অভাগা > অভাগী, অভাগিনী
মাতঙ্গ > মাতঙ্গী, মাতঙ্গিনী
দেবর > ননদ, ননদিনী
গোপ > গোপী, গোপিনী
বিহঙ্গ > বিহঙ্গী, বিহঙ্গিনী
রজক > রজকী, রজকিনী

প্র : স্ত্রীলিঙ্গান্তর করলে ক্ষুদ্রার্থ প্রকাশ পায়, এমন কয়েকটি শব্দ লেখ।

উ : একাঙ্ক — একাঙ্কিকা; নাটক — নাটিকা; মালা — মালিকা; গীত — গীতিকা; পুস্তক — পুস্তিকা; ঘট — ঘটি।

প্র : স্ত্রীলিঙ্গান্তর করলে বৃহৎ অর্থে বোঝায় কোনগুলো?

উ : স্থূল — স্থূলী; অরণ্য — অরণ্যানী; হিম — হিমানী ইত্যাদি।

(টীকা : অনেকে ক্ষুদ্রার্থ ও বৃহদার্থের শব্দাবলিকে লিঙ্গান্তর বলে স্বীকার করেন না।)

প্র : সংস্কৃত ইন্ ভাগান্ত লিঙ্গান্তরের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ : মানী — মানিনী; যামী — যামিনী; তপস্বী — তপস্বিনী; মায়াবী — মায়াবিনী; ধনী — ধনিনী; গুণী — গুণিনী ইত্যাদি।

প্র : অবজ্ঞাসূচক কয়েকটি স্ত্রী-বাচক শব্দ লেখ।

উ : ডাক্তার — ডাক্তারনি; দারোগা — দারোগানি; জমিদার — জমিদারনি মাস্টার — মাস্টারনি ইত্যাদি।

বচন

মনে রেখো : বাংলা ভাষায় একটি বাক্যে একাধিক বহুবচনাত্মক শব্দের ব্যবহার ভুল। যেমন : 'সব ছাত্ররা পড়ছে।' এটা ভুল। শুদ্ধ হবে : 'সব ছাত্র পড়ছে' অথবা 'ছাত্ররা পড়ছে।' কিন্তু All students are reading শুদ্ধ বাক্য। যদিও এখানে (All) (students) (are) এই তিনটি বহুবচন ব্যবহার হয়েছে।

প্র : বচন কাকে বলে?
উ : যার দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা-জ্ঞান সূচিত ও চিহ্নিত হয় তাকে বচন বলে।
প্র : এক কথায় বচনকে কী বলে?
উ : সংখ্যার ধারণা।
প্র : বচন একটি পারিভাষিক শব্দ। এর মূল শব্দ কী?
উ : Number.
প্র : বচন কত প্রকার?
উ : বচন দু প্রকার : একবচন, বহুবচন।
প্র : সব ভাষাতেই কি এক এবং বহুবচন নির্দিষ্ট?
উ : বচন পরিমাণগত ধারণা দেয়। বাংলা ভাষায় এক এবং বহুবচন থাকলেও পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রীতি অনুসৃত হয়, তা বলা যায় না। সংস্কৃত ভাষাতেই বচন তিন প্রকার। যেমন : একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। একবচনে নরঃ (একজন পুরুষ মানুষ), দ্বিবচনে নরৌ (দুজন), বহুবচনে নরাঃ (দুয়ের বেশি)। বাক্যেও এর প্রয়োগ দেখা যাবে। যেমন : বালকঃ বিনীতস্বভাবঃ (বালকটি বিনীত স্বভাবের।); বালকঃ বালিকা চ বিনীতস্বভাবৌ (বালক ও বালিকাটি বিনীত স্বভাবের।); বালকাঃ বালিকাশ্চ বিনীতস্বভাবাঃ (বালক এবং বালিকাগুলো বিনীত স্বভাবের।)- এখানে স্বভাবঃ→ স্বভাবৌ→স্বভাবাঃ যথাক্রমে একবচন → দ্বিবচন → বহুবচনাত্মক। সংস্কৃত ভাষাতে বচন তিন প্রকারের হলেও বাংলা ভাষায় বচন দু রকমেরই।
প্র : কোন ধরনের শব্দের বচনভেদ হয়?
উ : শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় শব্দের বচনভেদ হয়।
প্র : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কোনগুলো?
উ : গণ (নরগণ), বৃন্দ (ভক্তবৃন্দ), মণ্ডলী (শিক্ষকমণ্ডলী), বর্গ (পণ্ডিতবর্গ)।
প্র : কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ কোনগুলো?
উ : আবলি (কুসুমাবলি/গ্রন্থাবলি), গুচ্ছ (কবিতাগুচ্ছ), দাম (শৈবালদাম), নিকর (কমলনিকর), পুঞ্জ (মেঘপুঞ্জ), মালা (পর্বতমালা), রাজি (তারকারাজি), রাশি (ফুলরাশি)।
প্র : কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের শেষে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়?
উ : গণ-বিভক্তি। যেমন— শিক্ষকগণ জ্ঞান দান করেন।
প্র : কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কী কী?
উ : পাল ও যূথ। যেমন— হস্তিযূথ দেখে মৃগপাল দৌড়ে পালালো।
প্র : প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ লেখ।
উ : কুল (ইষ্টককুল/ কবিকুল); নিচয় (পর্বতনিচয়/ মনুষ্যনিচয়); সকল (পর্বতসকল/ মনুষ্যসকল); সব (নথিসব/ পাখিসব); সমূহ (বইসমূহ/ বৃক্ষসমূহ)।
প্র : বিশেষ্য দ্বিত্ব বসে যখন বহুবচন বোঝায়, তার উদাহরণ দাও।
উ : 'পাগল হইয়া ফিরি বনে বনে'—রবীন্দ্রনাথ
'দেশ দেশ নন্দিত করি' —রবীন্দ্রনাথ
'চরকার ঘর্ ঘর্ পল্লীর ঘর ঘর'
—সত্যেন্দ্রনাথ।
প্র : বিশেষণ দ্বিত্ব বসে যখন বহুবচন বোঝায়, তার উদাহরণ দাও।
উ : ছোট ছোট ফল (অনেকগুলো ফল, তবে প্রতিটি ছোট)।
সুন্দর সুন্দর ছেলে (অনেকগুলো ছেলে, তবে সবাই সুন্দর)।
প্র : বিদেশি শব্দে বহুবচনে বিদেশি নিয়ম মানা হয় কি?
উ : সবক্ষেত্রে নয়। যেমন : জনাব > সর্বজনাব, এটা বিদেশি নিয়মে বহুবচন হলো না। কিন্তু সাহেব > সাহেবান; বুজুর্গ > বুজুর্গান বিদেশি নিয়মে হয়েছে।

উপসর্গ

প্র : উপসর্গ কাকে বলে?
উ : উপসর্গ সাধারণত কতিপয় অব্যয়, যা ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয় এবং এর অর্থবদল ঘটায়। উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ নাও থাকতে পারে, তবে তা অর্থবদলে কার্যকর ভূমিকা রাখে। কখনো একই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহার হতে দেখা যায়। নিলাজ > নি + লাজ। এখানে উপসর্গ : নি।
প্র : উপসর্গকে ইংরেজি ব্যাকরণে কী বলে?
উ : Prefix.
প্র : উপসর্গ শব্দে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করে?
উ : উপসর্গ শব্দে একাধিক পরিবর্তন আনতে পারে। যেমন :
ক. শব্দের সংগঠনগত পরিবর্তন
খ. শব্দের অর্থগত পরিবর্তন
গ. অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ
ঘ. অর্থের সম্পূর্ণতা সাধন।
ঙ. শব্দের বিপরীতার্থক পরিবর্তনও আনতে পারে।
প্র : বাংলা ভাষায় কত প্রকারের উপসর্গ আছে?
উ : তিন প্রকার। যেমন : খাঁটি বাংলা, তৎসম (সংস্কৃত) ও বিদেশি।
প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গ কতগুলো?
উ : মোট একুশটি।
প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলো লেখ।
উ : অ / অঘা / অজ / অনা / আ / আড় / আন / আব / ইতি / উন (উনা) / কদ্ / কু / নি / পাতি / বি / ভর / রাম / স / সা / সু / হা = মোট একুশটি।
প্র : খাঁটি বাংলা উপসর্গসমূহ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?
উ : খাঁটি বাংলা শব্দের আগে।
প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ কতগুলো?
উ : মোট বিশটি।
প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গগুলো লেখ।
উ : প্র / পরা / অপ / সম / নি / অব / অনু / নির / দুর / বি / অধি / সু / উৎ / পরি / প্রতি / অপি / উপ / অভি / অতি / আ = মোট বিশটি।
প্র : কোনো শব্দের পূর্বে 'অপ' উপসর্গটি বসলে এর দ্বারা সাধারণত ঋণাত্মক অর্থ বোঝায়। যেমন : অপব্যবহার, অপব্যয় ইত্যাদি। কোন শব্দের আগে 'অপ' ব্যবহার করলে তা নিয়ে খুবই ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়?
উ : রূপ। অপ + রূপ= অপরূপ বা অপরূপা।
প্র : সংস্কৃত উপসর্গগুলো সাধারণ কোন অর্থে ব্যবহার হয়?
উ : প্র > প্রকৃষ্ট, খ্যাতি, গতি, আধিক্য;
পরা > বৈপরীত্য, অনাদর, প্রাধান্য;
অপ > বৈপরীত্য, দূরে;
সম > সম্যক, সহিত, সমীপ;
অনু > পশ্চাৎ, পরে, সাদৃশ্য;
নি > নিষেধ, বহির্গত;
অব > অনাদর, নিশ্চয়, অল্প;
নির > অভাব, নিশ্চয়, নিঃশেষ;
দুর > অভাব, মন্দ, নিষিদ্ধ;
বি > বিশেষ, বিপরীত;
অধি > আধিপত্য, উপরে;
সু > উত্তম, সহজ;
উৎ > উপর, বিরুদ্ধ, প্রশংসা;
পরি > আতিশয্য, সম্যকরূপ;
প্রতি > সাদৃশ্য, ব্যাপ্তি, বিরোধ;
অভি > সর্বতোভাবে, সম্মুখে;
অতি > আতিশয্য;
অপি > ও, সমুচ্চয়;
উপ > নিকট, সহিত, সাদৃশ্য;
আ> ঈষৎ, অবধি, সীমা।
প্র : তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গসমূহ সাধারণত কোন ধরনের শব্দের আগে যুক্ত হয়?
উ : তৎসম শব্দসমূহের আগে।
প্র : কোন চারটি উপসর্গ খাঁটি বাংলা ও তৎসম (সংস্কৃত) উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়?
উ : সু, বি, নি, আ।
প্র : এই উপসর্গগুলো দিয়ে পৃথক শব্দ তৈরি কর।
উ : খাঁটি বাংলা উপসর্গ সহযোগে :
সু > সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুকাজ।
বি > বিপথ, বিফল, বিভুই।
নি > নিলাজ, নিখোঁজ, নিখুঁত, নিরেট
আ > আধোয়া, আকাঁড়া, আলুনি, আকাঠা, অন্ধ

তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ সহযোগে :
সু > সুনীল, সুদর্শন, সুনিপুণ, সুলভ।
বি > বিভক্ত, বিবর্ণ, বিজ্ঞান, বিভক্ত, বিপদ।
নি > নিষ্কাম, নির্ণয়, নিষ্পন্ন, নিবৃত্তি।
আ > আগমন, আকণ্ঠ, আবক্ত, আভাস।

প্র : বিদেশি উপসর্গ কতগুলো?
উ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি উপসর্গ এখনো অনির্ণেয়।
প্র : কতগুলো বিদেশি উপসর্গের উল্লেখ কর।
উ : ইংরেজি উপসর্গ :
ফুল (Full) > ফুলহাতা; ফুলপ্যান্ট।
হাফ (Half) > হাফবেতন; হাফস্কুল।
হেড (Head) > হেডপণ্ডিত।
সাব (Sub) সাব কর্মকর্তা; সাব-ইনসপেক্টর।
ডবল (Double) ডবলডিম, ডবলপরটা
প্রো (Pro) > প্রো-উপাচার্য।
উর্দু/হিন্দি উপসর্গ :
হর (প্রত্যেক) > হরবোজ; হরমাহিনা; হরহামেশা।
হরেক (বিভিন্ন) > হরেক রকম।
পারসি (ফার্সি) উপসর্গ :
কার (কাজ) > কারচুপি; কারবার।
দর (অধীন) > দরপত্তনি; দরপাট্টা।
না (না) > নারাজ; নালায়েক।
নিম (আধা) > নিমরাজি; নিমমোল্লা।
ফি (প্রতি) > ফি বছর; ফি-রোজ।
বদ (মন্দ) > বদমেজাজ; বদনাম।
বে (না) > বেতার; বেকার; বেকসুর।
বর (বাইরে) > বরখেলাপ; বরখাস্ত।
ব (সঙ্গে) > বনাম; বকলম; বমাল।
কম (অল্প) > কমজোর, কমবখ্‌ত।
আরবি উপসর্গ :
আম (সাধারণ) > আমজনতা; আমদরবার, আমমোক্তার।
খাস (বিশেষ) > খাসমহল; খাসখবর, খাসবন্দি।
লা (না) > লাপাত্তা; লাখেরাজ, লানায়েক।
বাজে (বিবিধ) > বাজেখরচ; বাজেকাজ।
গর (অভাব) > গরমিল; গররাজি, গরহাজির।
খয়ের (ভাল) > খয়ের খাঁ ইত্যাদি।

প্র : বিদেশি উপসর্গগুলোকে পদ্যাকারে সাজাও।
উ : ফুল-হাফ-ডবল-হেড-সাব-প্রো
ইংরেজি উপসর্গ গো-।
লা-খয়ের-বাজে-আম, গর 'হলো' খাস
আরবি উপসর্গ এইটুকু ব্যাস-
কম-বদ, ব-বে-বর (আরো আছে)
কার-ফি-নিম-না-দর।
উপসর্গ এইগুলো ফারসি-
হর-হরেক হিন্দি ও উর্দু।
হি-হি, হি-হি, হি-

প্র : উপসর্গগুলো মনে রাখার জন্য কি কোনো কৌশল অবলম্বন করা যায়?
উ : উপসর্গগুলো গল্পচ্ছলে মনে রাখার সুবিধার্থে বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা অঘারাম ও নিমবাবুকে নায়ক করে দুটি গল্পকথা সাজিয়েছেন। মনোযোগ দিলেই এই গল্পকথায় উপসর্গগুলো পাওয়া যাবে।

খাঁটি বাংলা ২১টি উপসর্গের জন্য গল্পকথা:
অঘারাম অকেজো। অজ পাড়াগাঁয়ে অনাদরে বড়। আধোয়া চালের ভাতও ভরপেট সে খেতে পায় না। তবে সে আড়চোখে আড়ালে আবডালে ইতিহাসের দিকে লক্ষ করে। ভাবে, কবে সে সাজোয়ানের মতো একাই উনিশটি কদ্‌বেল খাবে, কুঅভ্যাসগুলো ত্যাগ করবে, নিখুঁতভাবে চলবে। এ নিয়ে আনকোরার মতো সে হাপিত্যেশ করতে থাকে। তার এই বিফল স্বপ্নে পাতিকাক হাসে, রামছাগল সরবে বলে, সুদিন তোমার আসবে না।

তৎসম/সংস্কৃত ২০টি উপসর্গের জন্য গল্পকথা :
এই অপমান অবজ্ঞা দুর্ভাগ্য ও পরাজয় অতিশয় দুঃখজনক। আরক্ত হয়ে তার সমাদরহীন প্রস্থানও হৃদয় বিদারক। জীবনের বিশুষ্ক ও উত্তপ্ত উপকূলে বসে প্রতিদিন নিরক্ষর অনুগামীদের যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে। পরিশেষে অপি নামের এক বন্ধু সুকঠিন অভিযান চালিয়ে তার নিগূঢ় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

পারসি (ফার্সি) উপসর্গের জন্য গল্পকথা:
নিমবাবুর কারখানায় বকলম বদমেজাজি বেকার কিছু লোক ফিসণ্ডায় চাকরির দরখাস্ত করে। কমবখ্‌ত নালায়েকগুলো জানে না, গত সপ্তাহেই নিমবাবু বহু শ্রমিককে বরখাস্ত করেছেন। ওদের চাকরি হবে কী করে।

আরবি উপসর্গের জন্য গল্পকথা :
রাজার খাসমহলে খয়েরখাঁদের বাজেকাজ আমজনতা পছন্দ করে না। তাই ভয়ে খয়েরখাঁরা এখন গরহাজির থাকে, অনেকে লাপাত্তা।

প্রত্যয়

প্র : প্রত্যয় কাকে বলে ও কী কী?
উ : ধাতুর সঙ্গে যা যোগ করে শব্দ কিংবা কালরূপ এবং শব্দে যা যোগ করে অন্য শব্দ কিংবা ধাতু হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় দুপ্রকার। ধাতুপ্রত্যয় বা কৃৎপ্রত্যয় এবং শব্দপ্রত্যয় বা তদ্ধিতপ্রত্যয়। যেমন : √ কৃ (ধাতু) + তব্য (কৃৎপ্রত্যয়) = কর্তব্য (শব্দ)
প্র : ধাতু কথাটি বোঝানোর জন্য ধাতুর আগে কোন চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়?
উ : √ (যেমন: √পড়)। এই চিহ্ন ব্যবহার করলে 'ধাতু' কথাটি লেখার প্রয়োজন হয় না।
প্র : প্রকৃতি কাকে বলে?
উ : কোনো মৌলিক শব্দের যে অংশকে আর কোনোভাবেই বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। কোনো পদ বা শব্দ থেকে যদি প্রত্যয় ও বিভক্তি সরিয়ে নেয়া যায়, তাহলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাকেও প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি দুধরনের। যথা :
১. সংজ্ঞার্থ প্রকৃতি বা নামপ্রকৃতি বা প্রাতিপদিক। উদাহরণ : জল, মুখ, পা ইত্যাদি।
২. ধাতু বা ধাতুপ্রকৃতি। উদাহরণ : √কর্, √ধর্, √খা ইত্যাদি।
প্র : কৃদন্ত পদ কাকে বলে?
উ : কৃৎ প্রত্যয়ের সাধিত পদকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন :
√ চল্ + অন্ত = চলন্ত। এখানে চলন্ত কৃদন্ত পদ।
প্র : উপধা কাকে বলে?
উ : শব্দে অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণকে উপধা বলে। যেমন : রাজা > রাজ্ + আ। এখানে 'জ্' উপধা। অন্যদিকে আম > আম্ + অ। এখানে 'ম্' উপধা।
প্র : প্রাতিপদিক কাকে বলে?
উ : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : মা, হাত, কাঠ ইত্যাদি।
প্র : নাম প্রকৃতি কাকে বলে?
উ : প্রাতিপদিক বা বিভক্তিহীন নাম শব্দকে নাম প্রকৃতি বলে।

প্র : প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার, কী কী?
উ : দুই প্রকার। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়।
প্র : তদ্ধিত প্রত্যয় কত প্রকার, কী কী?
উ : তিন প্রকার। বাংলা, বিদেশি ও তৎসম (সংস্কৃত)।
প্র : নিয়মানুসারে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।
উ : ঈশ্বর = √ঈশ + বর
কর্তা = √কৃ + তা
কার্য = √কৃ + ঘাণ > য
কাত্যা = √কীর্ত + না
কারক = √কৃ + ণক > অক
ক্ষয়িষ্ণু = √ক্ষি + ইষ্ণু
খেলনা = √খেল্ + অনা
খ্যাত = √খ্যা + ক্ত > ত
গমন = √গম্ + অন
গতি = √গম্ + তি
গ্রথিত = √গ্রন্থ + ক্ত > ইত
গীতি = √গৈ + ক্তি > তি
গায়ক = √গৈ + ণক > অক
গ্রাহী = √গ্রহ + ণিন
চরিত্র = √চর্ + ইত্র
জ্ঞাত = √জ্ঞা + ক্ত > ত
জনক = √জন + ণক > অক
জাগরূক = √জাগৃ + ঊক
ধার্য = √ধৃ + ঘ্যণ্ > য
ডুবন্ত = √ডুব্ + অন্ত
ত্যাগী = √ত্যজ্ + ঘ্নিণ্ > ইন্
নয়ন = √নী + অন
নায়ক = √নৈ + অক
নম্র = √নম্ + র
নন্দন = √নন্দি + অন
নর্তন = √নৃত্ + অন
দীপ্যমান = √দীপ্ + শানচ্
দোলনা = √দুল্ + অনা
দাতা = √দা + তৃচ > তা
দর্শক = √দৃশ্ + ণক / অক
পায়ী = √পা + ইন
পাকড়াও = √পাকড় -- আও

পাচক = √পচ্ + ণক > অক
পাঠক = √পঠ্ + ণক > অক
প্রিয় = √প্রী + ক
বহতা = √বহ্ + তা
বর্তমান = √বৃৎ + মান
বর্ধিষ্ণু = √বৃধ্ + ইষ্ণু
বুভুক্ষু = √ভুজ্ + উ
বিদ্বান = √বিদ্ + কৃসু
বর্ধমান = √বৃধ্ + শানচ্
মোড়ক = √মুড় + অক
মহৎ = √মহ্ + শতৃ > অৎ
রচনা = √রচ + অন +(আ)
লেখক = √লিখ্ + ণক > অক
শক্তি = √শক্ + ক্তি
শ্রবণ = √শ্রু + অন
স্মারক = √স্মৃ + ণক > অক
সৎ = √অস্ + শতৃ
সহিষ্ণু = √সহ্ + ইষ্ণু

প্র : বিশেষ নিয়মে সাধিত কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ : উক্তি = √বচ্ + ক্তি
খাওন = √খা + অন
গত = √গম্ + ক্ত
গম্য = √গম্ + য
ত্যাগ = √ত্যজ্ + অ
দত্ত = √দা + ক্ত/ত
নাওন = √না + অন
পঠিত = √পঠ্ + ইত
পাক = √পচ্ + ঘঞ
ভুক্ত = √ভুজ্ + ক্ত (ত)
ভক্তি = √ভজ্ + ক্তি (তি)
মুক্ত = √মুচ্ + ক্ত (ত)
যুদ্ধ = √যুধ্ + ক্ত
যোদ্ধা = √যুধ্ + তৃ
লভ্য = √লভ্ + য
শান্তি = √শম্ + ক্তি (তি)
শোক = √শুচ্ + ঘঞ > অ
সিক্ত = √সিচ্ + ক্ত
হত = √হন্ + ক্ত

প্র : নিপাতনে সিদ্ধ কৃৎ প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : গীতি = √গৈ + ক্তি
বুদ্ধি = √বুদ্ + ক্তি
শক্তি = √শক্ + ক্তি
সিদ্ধি = √সিধ্ + ক্তি

প্র : নিয়মানুসারে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ দাও।

উ : অদিতা = অদিতি + ষ্ণ্য > য
আগ্নেয় = অগ্নি + ষ্ণেয় > ঐয়
আঙুলি = আঙ + উলি
কলু = কল + উ
কাব্য = কবি + য
কুলীন = কুল + নীন > ঈন
কৌমার্য = কুমার + ষ্ণ > য
গৌরব = গুরু + ষ্ণ > এ
গরু = গো + রু
গুণবান = গুণ + বতুপ্
চৈত্র = চিত্র + ষ্ণ > অ
ছেলেপনা = ছেলে + পনা
জলুয়া = জল + উয়া
জমকাল = জমক + আল
জলীয় = জল + নীয় > ঈয়
দয়াবান = দয়া + বতুপ্
দ্রাঘিমা = দীর্ঘ + ইমন > ইমা
দৈব = দেব + ষ্ণ > অ
নাগর = নগর + ষ্ণ > অ
নীলিমা = নীল + ইমন্ > ইমা
ডিঙি = ডিঙা + ই
ঢালু = ঢাল + উ
পারলৌকিক = পরলোক + ষ্ণিক > ইক
পাঞ্চভৌতিক = পঞ্চভূত + ষ্ণিক > ইক
প্রাচ্য = প্রাচী + য
পয়সা = পাদ + সা
বাহাদুরি = বাহাদুর + ই
বোমারু = বোম + আরু
বায়বীয় = বায়ু + নীয় > ঈয়
বুদ্ধিমান = বুদ্ধি + মতুপ্
বৎসল = বৎস + ল
বাগ্মী = বাচ্ + মিন
বৈমাত্রেয় = বিমাতৃ + ষ্ণেয় > ত্রয়
মুটে = মোট + এ
মেছো = মাছ + ও
মাছুয়া = মাছ + উয়া
মিথ্যুক = মিথ্যা + উক
মাধুর্য = মধুর + ষ্ণ > য
মাধব = মধু + ষ্ণ > অ
মহিমা = মহৎ + ইমন্
মানব = মনু + ষ্ণ > অ
দানব = দনু + ষ্ণ > অ
মনুষ্য = মনু + ষ্ণ্য > স

যৌবন = যুবন্ + ষ্ণ > অ
রূপসী = রূপ + সী
লঘিষ্ঠ = লঘু + ইষ্ঠ
শৈশব = শিশু + ষ্ণ > অ
শ্রীমান = শ্রী + মতুপ্
শীতল = শীত + ল
সৌভাগ্য = সুভগ + ষ্ণ্য > য
সার্বভৌম = সর্বভূমি + ষ্ণ > অ
সাম্য = সাম + য
সুখী = সুখ + ঈন্
সর্বজনীন = সর্বজন + নীন > ঈন
সৌর = সূর্য + ষ্ণ > অ
সাহিত্যিক = সাহিত্য + ষ্ণিক > ইক
স্বামী = স্ব + মিন
হাতা = হাত + আ
হৈমন্তিক = হেমন্ত + ষ্ণিক > ইক

প্র : বাংলা ভাষায় বেশ কিছু পারসি (ফার্সি) তদ্ধিত প্রত্যয় রয়েছে। কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : তর > তুলা, সাদৃশ্য অর্থে > যেমনতর, কেমনতর।
গিরি > বৃত্তি, ব্যবহার অর্থে > কেরানিগিরি, বাবুগিরি।
গর > নির্মাতা অর্থে > কারিগর, বাজিগর।
খোর > অভ্যস্তার্থে > সুদখোর, আফিমখোর।
দান / দানি > পাত্র বা আধারার্থে > ধূপদান, মোমদানি।
দার > অস্ত্যর্থে > চৌকিদার, দোকানদার।
বাজ / বাজি > দক্ষ অর্থে > চাপাবাজ, গলাবাজি।
সই / সহি > উপযুক্ত অর্থে > মানানসই, টেকসই।
নবিশ > অভিজ্ঞ অর্থে > পত্রনবিশ, নকলনবিশ।
বন্দ / বন্দি > সংযুক্ত অর্থে > নজরবন্দ, নজরবন্দি।
খানা > বাস বা কার্যস্থল অর্থে > জেলখানা, ছাপাখানা।
মন্দ > সম্পন্ন অর্থে > আক্কেলমন্দ, দরদমন্দ

প্র : বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিদ্দি তদ্ধিত প্রত্যয় রয়েছে। কতিপয় উদাহরণ দাও।

উ : সা / সে > মতো অর্থে > পানসা, পানসে, কালসা, কালসে।
আন / ওয়ান > অস্থার্থে > পাড়োয়ান বাগোয়ান > বাগান।
আনা / আনি > ভাব, কাজ অর্থে > বাবুয়ানা, বাবুয়ানি।
আলা / ওয়ালা > অধিকার অর্থে > বাড়িআলা, ডিমওয়ালা।
পনা > সাদৃশ্যসূচক অর্থে > বেহায়াপনা, ছেলেপনা।

প্র : ণিচ্ কোন ধরনের প্রত্যয়?

উ : সংস্কৃত প্রত্যয়। কর্তা নিজে ক্রিয়া সম্পন্ন না করে যদি অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সাধন করে তাহলে ণিচ্ প্রত্যয় হয়। যেমন : √দৃশ্ (দেখা) + ণিচ্ = দর্শি (দেখান)।

প্র : অপশ্রুতি কাকে বলে?

উ : প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বরগত অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে অপশ্রুতি বলে। অপশ্রুতি তিনভাবে প্রকাশ পায়। যথা : গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ।
গুণ : এই প্রক্রিয়ায় ই, ঈ > এ-তে পরিণত হয়। যেমন : শী > শে + অন = শয়ন।
উ, ঊ > ও-তে পরিণত হয়। যেমন : পূ > পো + অন = পবন।
ঋ > অর্ (কৃ + অন = করণ)।
বৃদ্ধি : এই প্রক্রিয়ায় অ > আ-তে পরিণত হয়। যেমন : অলস + য = আলস্য।
ই, ঈ > ঐ-তে পরিণত হয়। যেমন : নিশা + অ = নৈশ।
উ, ঊ > ঔ-তে পরিণত হয়। যেমন : ভূত + ইক = ভৌতিক
ঋ > আর-এ পরিণত হয়। যেমন : স্মৃ + অক = স্মারক।
সম্প্রসারণ : এই প্রক্রিয়ায় ব > উ-তে পরিণত হয়। যেমন : বচ্ + ত = উক্ত।
য > ই-তে পরিণত হয়। যেমন : যজ্ + তি = ইষ্টি
র > ঋ-তে পরিণত হয়। যেমন : গৃহ্ + ত = গৃহীত।

কারক

প্র : কারক শব্দের অর্থ কী?
উ : যা ক্রিয়া সম্পাদন করে (কৃ + ণক)।

প্র : কারক কাকে বলে?
উ : বাক্যান্বিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের (বিশেষ্য/সর্বনাম) যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।

প্র : বিভক্তি কাকে বলে?
উ : পদকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী পদে রূপান্তরিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যা যোগ করতে হয় তাকে বিভক্তি বলে। যেমন : মাকে > এখানে 'কে' বিভক্তি।

প্র : ক'টি বাংলা শব্দ বিভক্তির উল্লেখ কর।
উ : শূন্য বা অ, এ, (য়), তে (এ), কে (এ), রে, র (এর)।

প্র : বিভক্তি কয়টি ও কী কী?
উ : ৭টি। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।

প্র : কয়েকটি বিভক্তিবোধক চিহ্ন-নাম লেখ?
উ : শূন্য বা অ / এ / য় / তে / কে / রে / র / এর / য়া / এরা / এরে / দিগ / দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক / হইতে / থেকে ইত্যাদি।

প্র : এগুলোর মধ্যে কারক-অব্যয় কোনগুলো?
উ : দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক / হইতে / থেকে এই পাঁচটি কারক অব্যয়।

প্র : বাংলা কারকে ব্যবহৃত বিভক্তি চিহ্নগুলো শ্রেণিভুক্ত কর :

উ :

শূন্য বা প্রথমা	০ / অ	রা / এরা / গুলি / সমূহ
দ্বিতীয়া	কে / রে / রে	দের / দিগকে
তৃতীয়া	দ্বারা / দিয়া / কর্তৃক	দিগের দ্বারা / দের দ্বারা
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মতো	দ্বিতীয়ার মতো
পঞ্চমী	হতে/থেকে / চেয়ে	দিগ হতে / দের থেকে
ষষ্ঠী	র / এর	দিগের / দের
সপ্তমী	এ, য়, তে	দিগে/দিগেতে ইত্যাদি।

প্র : কোন কারক দুটোতে কোনো বিভক্তি নেই?
উ : করণ ও অপাদান কারকে।

প্র : শূন্য বিভক্তি কাকে বলে?
উ : বাক্যের কোনো পদে যখন কোনো বিভক্তি দৃশ্যমান হয় না, সেই আপাত বিভক্তিহীন পদে যে বিভক্তি থাকে। যেমন : ছেলেটা সকালের চা নিজে করে। এই বাক্যে 'চা'-এর সঙ্গে শূন্য বিভক্তি আছে।

প্র : কর্তৃকারক কাকে বলে?
উ : বাক্যে কর্তাপদের কারকের নাম। যেমন : পাখি ওড়ে।

প্র : ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য অনুযায়ী কর্তৃকারক কত প্রকার?
উ : চার প্রকার। মুখ্য, প্রযোজক, প্রযোজ্য, ব্যতিহার।

প্র : বাক্যের বাচ্য ও প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তৃকারক কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। কর্মবাচ্যের কর্তা, ভাববাচ্যের কর্তা, কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা।

প্র : কর্মকারক কাকে বলে?
উ : ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মপদের সম্পর্কে। যেমন : তিনি *বাগান* দেখাশোনা করেন।

প্র : কর্মকারকে কোন কর্মে বিভক্তিযুক্ত হয়?
উ : গৌণকর্মে হয়, মুখ্য কর্মে হয় না।

প্র : কর্মকারক কত প্রকার?
উ : চার প্রকার। সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম, প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম, সমধাতুজ কর্ম, উদ্দেশ্য বিধেয় কর্ম।

প্র : করণ শব্দের অর্থ কী?
উ : সহায়ক বা উপায়।

প্র : করণ কারক কাকে বলে?
উ : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে। যেমন : আমি *পেনসিল দিয়ে* লিখি।

প্র : সমধাতুজ করণ কাকে বলে?
উ : কোনো বাক্যে করণ কারক ও ক্রিয়াপদ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে সমধাতুজ করণ কারক বলে। যেমন: মনের *জ্বালায়* জ্বলছে।

প্র : সম্প্রদান কারক কাকে বলে?
উ : যাকে স্বত্বত্যাগ করে কিছু দান করা বা দেয়া হয়।

প্র : সম্প্রদান কারকের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?
উ : স্বত্ব ত্যাগ করে যাকে কিছু দান করা অথবা যার জন্য বা যার উদ্দেশে কিছু করা যায়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। কাকে, কার জন্য, কার তরে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান কারক পাওয়া যায়। প্রচলিতভাবে 'ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর' বা 'সৎ পাত্রে কন্যা দান কর' সম্প্রদান কারক। কিন্তু লক্ষ করলে বোঝা যাবে, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানের পেছনে বা দরিদ্রকে অর্থ দানের পেছনে মানুষের মনে পুণ্য লাভের মোহ কাজ করে। আজকাল কন্যাকে চিরতরে দান করা হয় না। স্বামীর বাড়িতে অত্যাচারিত হলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব কন্যাই আজ সে বলত ত্যাগ করার অধিকার রাখে। যেখানে স্বত্ব ত্যাগ করে দান করা হয় না– স্বত্ব রেখে, ভয় বলে বা দেয় বস্তু বলে যেখানে অর্পণ হয় সেখানেও সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না অনেকে। যেমন : এবার ডাকাতকে সর্বস্ব দিন অথবা শ্রমিককে মজুরি দিন। এসব দান স্বত্ব ত্যাগ করেই দিতে হয়, কিন্তু এগুলো কি সম্প্রদান?
সংস্কৃতে সম্প্রদান কারকে বিশেষ বিভক্তি আছে কিন্তু বাংলায় কর্ম ও সম্প্রদান কারকের বিভক্তি অভিন্ন। বাংলায় সম্প্রদান কারক প্রচলিত আছে শুধু সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য। প্রাচীনকালে স্বত্ব ত্যাগ করে দানের ব্যাপারটি স্বাভাবিক ছিল। আজ যে-কোনো দানের পেছনেই উদ্দেশ্য থাকে। আর উদ্দেশ্য যে দানে থাকে তাকে সম্প্রদান বলা যায় না।
বাংলা গৌণকর্ম ও সংস্কৃতের সম্প্রদান কারকের মধ্যে অর্থগত দিক থেকে পার্থক্য নেই। দান অর্থে, নিমিত্ত অর্থে এবং অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তিযোগে সংস্কৃতে সম্প্রদান কারক হয়। গৌণকর্মও সম্প্রদান কারক। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : 'এই দুইটীকে পৃথক করিয়া ধরিবার বিশেষ সার্থকতা বাঙ্গালায় নাই।' রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে' সম্প্রদান কারককে স্বীকার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলায় শুধু একটি বিশেষ দান-ক্রিয়ার জন্য আলাদা কারকের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেছেন। অবশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্প্রদান কারক উঠিয়ে দেওয়াকে অযৌক্তিক মনে করেন।

প্র : সৎপাত্রে কন্যা দান কর। 'সৎপাত্রে' কারক-বিভক্তি কী?
উ : কর্মে শূন্য। কারণ এখন কন্যাকে স্বত্বত্যাগ করে দান করা হয় না।

প্র : কোনো শব্দের সঙ্গে নিমিত্তার্থে 'কে' যুক্ত হলে কোন বিভক্তি বলে?
উ : চতুর্থী। যেমন : জলকে চল।

প্র : অপাদান কারক কাকে বলে?
উ : বাক্যে ক্রিয়াটির সম্পাদন যে জায়গা থেকে হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের নাম অপাদান কারক। যেমন : তিল থেকে তেল হয়।

প্র : অধিকরণ কারক কাকে বলে?
উ : ক্রিয়ার সংঘটন যে স্থানে, সময়ে কিংবা বিষয়কে অবলম্বন করে ঘটে, বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সেই স্থান, সময় কিংবা বিষয়ের সম্পর্ককে বলা হয় অধিকরণ কারক। যেমন : সুন্দরবনে বাঘ আছে।

প্র : অধিকরণ কারক কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। যথা : আধার অধিকরণ, কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ।

প্র : ভাবে সপ্তমী কাকে বলে?
উ : ভাবাধিকরণে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে।

প্র : আধার অধিকরণ কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। ঐকদেশিক, অভিব্যাপক, বৈষয়িক।

প্র : সম্বন্ধপদ কাকে বলে?
উ : নাম পদের সঙ্গে সাধারণত ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে। কোনো বাক্যে যদি তা না থাকে এবং নামপদ অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন : রতনের বন্ধু ভাল ছাত্র। এই বাক্যে 'রতনের' সম্বন্ধ পদ। এই পদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নেই।

প্র : সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন?
উ : ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদের সম্বন্ধ নেই বলে।

প্র : সম্বোধন পদ কাকে বলে?
উ : বাক্যে যে পদের মাধ্যমে কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা হয়। যেমন : হে মাধবী, দ্বিধা কেন?

প্র : সম্বোধন পদ কারক নয় কেন?
উ : বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে এই পদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে।

প্র : কারক নির্ণয় করার জন্য কোন প্রশ্নগুলো করা যায়?

উ : কারক ক্রিয়ার সঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট পদের (সাধারণত নিচে দাগ দেয়া থাকে) সম্পর্ক বোঝায়। তাই বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে এভাবে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় কারকের উত্তর :

ক. কে / কারা দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কর্তৃকারক;

খ. কি / কাকে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কর্মকারক;

গ. কীসে / কীসের সাহায্যে / কার সাহায্যে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে করণ কারক;

ঘ. কার জন্য দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে (যদি স্বত্ব ত্যাগ করে দান বোঝায়) সম্প্রদান কারক;

ঙ. কোথা থেকে / কী হতে / কীসের হতে দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অথবা ভয়-ভয়-ভীতি-শঙ্কা প্রকাশ পেলে অপাদান কারক;

চ. কোথায় / কীসে / কখন দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র-সময়-বিষয় বোঝালে অধিকরণ কারক হবে।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারক বিভক্তির প্রয়োগ দেখাও।

উ : অ

অর্থ অনর্থ ঘটায় > কর্তায় শূন্য
অর্থে অনর্থ ঘটে > করণে ৭মী
অন্তজনে দেহ আলো > সম্প্রদানে ৭মী
অন্নহীনে অন্ন দাও > সম্প্রদানে ৭মী
অন্ন শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর > করণে ৭মী
অন্তে আঁচল সুশীল বরণ, রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ > অধিকরণে ৭মী
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। > অধিকরণে ৭মী
(প্রচলিত ব্যাকরণ বইতে সিদ্ধিতে করণ কারক নির্দেশ করা হলেও কবি এখানে সিদ্ধি দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন : সাধনা ও নেশা।)
অতিমানে কিবা অভিজ্ঞ ত্যজিল পরাণ > অপাদানে ৭মী; কর্মে শূন্য
অহংকারে পতন ঘটে > করণে ৭মী
অশুতে গঠিত হিমালয় > করণে ৭মী
অক্ষবিদ্যা ভয়ংকরী, কথায় কথায় চিকশনারি > কর্মে শূন্য
অধ্যয়নে বিরত হতে নেই > অপাদানে ৭মী

আ

আজকে নগদ কালকে ধার > অধিকরণে ২য়া
আমাদের একটি গল্প বলুন > কর্মে ৬ষ্ঠী
আমা হতে এ কার্য হবে না সাধন > কর্তায় ৫মী
আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয় > অধিকরণে ৭মী
আমি ঢাকা যাবো > অধিকরণে শূন্য
আমরা বোজ স্কুলে যাই > অধিকরণে ৭মী
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা > কর্মে ২য়া
আমাকে একখানা বই দাও > কর্মে শূন্য
আমার যাওয়া হয় নি > কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমার খাওয়া হলো না > কর্তায় ৬ষ্ঠী
আমাকে যেতে হবে > কর্তায় ২য়া
আমার একটু আশ্রয় দিন > সম্প্রদানে ৭মী
আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে > অপাদানে ৭মী
আগুনে সেঁক দাও > করণে ৭মী
আকাশে চাঁদ উঠেছে > অধিকরণে ৭মী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি > করণে ৭মী
আলো চাই, অন্ন চাই, চাই মুক্তবায়ু > সম্প্রদানে শূন্য
আকাশের ঐ তারার সনে কইব কথা নাই বা তুমি এলে। > কর্মে ৬ষ্ঠী, কর্তায় শূন্য
আমারে লহ তুমি করুণা করে। > কর্মে ২য়া
আচার ব্যবহারে ভদ্র-অভদ্র চেনা যায় > অপাদানে ৭মী
আত্মার সম্পর্কই হল আত্মীয় > কর্মে শূন্য
আকাশ আজি মেঘলা যেয়ো নাকো একলা > অধিকরণে শূন্য
আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান > অধিকরণে ২য়া
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ > অধিকরণে ৭মী
আমার স্বপন আধো জাগরণ > কর্মে শূন্য
আমারে করহ তোমার বীণা > কর্মে ২য়া
আলোয় আঁধার কাটিয়া যায় > করণে ৭মী
আজ হবে না, কাল এসো > অধিকরণে শূন্য

এ

এ প্রার্থনা হতে পাপ দূর হবে না > করণে ৫মী
এ বাড়িতে কেউ নেই > অধিকরণে ৭মী
এ সুতায় কাপড় হয় না > করণে ৭মী
এত শঠতা, এত যে বাধা, তবু কেন তা মধুতে মাখা > করণে ৭মী
এ দেহে প্রাণ নেই > অধিকরণে ৭মী
এ কলমে ভাল লেখা হয় > করণে ৭মী
এ বছর খুব ভাল ফসল হয়েছে > অধিকরণে শূন্য
এর অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন > কর্মে ৭মী
এই বনে বাঘের ভয় নেই > অপাদানে ৬ষ্ঠী
এই নদীর মাছ বড় > অধিকরণে ৬ষ্ঠী
এক যে ছিল রাজা > কর্তায় শূন্য
একদিন যাব > অধিকরণে শূন্য
এ জমিতে সোনা ফলে > অধিকরণে ৭মী
একদিন পাপের ফল ফলিবে > অধিকরণে শূন্য
এ মেঘে বৃষ্টি হয় না > অপাদানে ৭মী
এ সময় তার দেখা মেলা ভার > অধিকরণে শূন্য
এমন চোরের মতো বাঁচা বাঁচিতে চাই না > কর্মে শূন্য
'একদা প্রভাতে ভানুর 'প্রভাতে' ফুটিলে কমলগুলি' > করণে ৭মী
এক যে ছিল চাঁদেরকোনায় চরকা কাটা বুড়ি > অধিকরণে ৭মী
একটি গান শোনাও > কর্মে শূন্য
এবারের সংগ্রাম দেশগড়ার সংগ্রাম > কর্মে ৬ষ্ঠী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম > নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী

ঐ

ঐ দেখা যায় তালগাছ ঐ আমাদের গাঁ > কর্মে শূন্য

ক

কপোল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে > কর্মে শূন্য
কালো কুসুমকলি সকলি ফুটিল > কর্মে শূন্য
কত ধানে কত চাল তা আমি জানি > অপাদানে ৭মী
কান্নায় শোক নদীভূত হয় > প্রকারবিকরণে ৭মী
কপালের লেখা না যায় খণ্ডন > অধিকরণে ৬ষ্ঠী
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল > অধিকরণে ৭মী
কথায় কথা বাড়ে > করণে ৭মী
কাঁথার শীত মানে না > করণে ৭মী
কলমের খোঁচা দিও না > করণে ৬ষ্ঠী
কুকর্মে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
কাজে মন দাও > অধিকরণে ৭মী
কাচের জিনিস অতি সহজে ভাঙে > করণে ৬ষ্ঠী
কাজের বেলা গোল করো না > অধিকরণে শূন্য
কি সাহসে এমন কথা বললে > কর্মে ৭মী
কোথাও আমার হারিয়ে যেতে নেই মানা > কর্তায় ৬ষ্ঠী
কবিগুরু গীতাঞ্জলি লিখেছেন > কর্মে শূন্য
কথায় চিড়ে ভেজে না > করণে ৭মী, কর্মে ৭মী
কোথা সে ছায়া নদি কোথায় সে জল > কর্মে শূন্য
কত ধানে কত চাল হয় আমি তা জানি > অপাদানে ৭মী
ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ, মোহ থেকে পাপ > অপাদানে শূন্য
কূলে একা বসি আছি নাহি ভরসা > অধিকরণে ৭মী
কোকিল ডাকে > কর্তায় শূন্য
কি কবি আজ ভেবে না পাই > অধিকরণে শূন্য
কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না > কর্মে শূন্য

খ

খুব ঘুম ঘুমিয়েছি > কর্মে শূন্য
খিলিপান দিয়ে সে ঔষধ খাবে > অধিকরণে ৩য়া
খড়্গে ছাগে কাটে > করণে ৭মী
খড়্গে ছাগে কাটে > কর্মে ৭মী
খুব ঠকা ঠকেছি > কর্মে শূন্য

যেই যায় এলোচুলে মাথে সেই জন
> অধিকরণে শূন্য
যেই যায় এলোচুলে মাথে সেই জন
> করণে ৭মী
সেহর-রসে ভরা ২ > সম্প্রদানে ৭মী

ব
বাবে বাদল মন ভরেছে > করণে ৭মী
ভরসাতে কর বৃষ্টি > সম্প্রদানে ৭মী
বৃহস্পতি বৃহ ভাত > সম্বন্ধপদে ৭মী
বক পাখি টানে > কর্তায় শূন্য
বকের ডাক থামে > কর্তায় ৭মী
বকের পাখি টানে > কর্তায় ৭মী
বাড়ি স্টেশন হতে > অপাদানে শূন্য
বারে ঔষধ খেয়েছে ভেল >
অধিকরণে ৭মী
বীর মরে না আপনি মোড়ল >
কর্তায় ৭মী
ভগবান তিনদিন থাকে পরাধীন >
কর্তায় শূন্য
ভগবানে ভাগ কর > কর্মে ৭মী
ধানের গরজে নেয় মন বরষা >
অধিকরণে ৭মী
ভরসা পরিবের মাথায় লাঠি মেরেছে
> অধিকরণে ৭মী
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা > কর্তায় ৭মী
মত বিবয়ের জন্য শোক করিও না
> কর্মে শূন্য
গাছ থেকে পাতা পড়ে > অপাদানে শূন্য

ম
ঘোড়াকে চাবুক মার > করণে শূন্য
ঘোড়ায় গাড়ি টানে > কর্তায় ৭মী
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে
> অধিকরণে ৭ম, কর্তায় শূন্য
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল
> অধিকরণে ৭মী

চ
চেষ্টায় সব হয় > করণে ৭মী
চোখ দিয়া পানি পড়ে > অপাদানে শূন্য
চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনি >
কর্তায় ৭মী
চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয় > কর্তায় ৭মী
চিন্তা রোগের ওষুধ নেই > কর্মে শূন্য
চোর ধৃত হয়েছে > কর্মে শূন্য

ছ
ছিন্ন যেথা ভরপূরা ছাঁচ সেথা শির
> করণে শূন্য
ছাঁদ বুঝি তা জানে > কর্তায় শূন্য
ছাড়ি না কহিতে বাদ-প্রতিবাদ >
কর্মে শূন্য

জ
জয়রথ বল খেলে > করণে শূন্য
জয়রথ ক্রিকেট খেলে > কর্মে শূন্য
জগলে কি না খায় > কর্তায় ৭মী
জলে পানি পড়ে > অপাদানে ৭মী
(ছাদ থেকে)
জলে বৃষ্টি পড়ে > অধিকরণে ৭মী
(ছাদেতে)
ছেলেটি আছে বাঁচা > অধিকরণে ৭মী
জায়গা বস > অধিকরণে ৭মী
ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
> অধিকরণে শূন্য

ঝ
ঝিজ্ঞাসিব জনে জনে > কর্মে ৭মী
ঝল পড়ে পাতা নড়ে > কর্মে শূন্য
ঝলে বাষ্প হয় > অপাদানে ৭মী
ঝলে কুমির থাকে > অধিকরণে ৭মী
ঝন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো
> কর্মে শূন্য
ঝগতে কীর্তিমান হওয়া যায় সাধনায়
> অধিকরণে ৭মী, করণে ৭মী
ঝটাতে তাপস চিনি
> করণে ৭মী, কর্মে শূন্য
ঝলকে চল > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
জ্যোৎস্নাতে আলোকিত এই রাত্রি
> করণে ৭মী
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায়
> করণে ৭মী

ঞ
ঞিকে মেরে বৌকে শিখানো > কর্মে ২য়া

ট
টানে এক আঁকে বক > করণে ৭মী
টাকায় বাঘের দুধ মেলে > করণে ৭মী
টাকায় কিনা হয় > করণে ৭মী
ট্রেন ঢাকা ছাড়ল > অপাদানে শূন্য
ট্রেন ঢাকা পৌঁছল > অধিকরণে শূন্য
টাকায় টাকা হয় > অপাদানে ৭মী

ড
ডাকার ডাক > কর্মে শূন্য
ডাকাতেরা গৃহস্থালীর মাথায় লাঠি
মেরেছে > করণে শূন্য

ত
তার চোখ দিয়ে জল পড়ে > অপাদানে
৭মী
তোমাদারা একাজ হইবে না মনে >
কর্তায় ৭মী
তোমার দেখা পেলাম না > কর্মে ২য়া
তাকে বল > কর্মে ২য়া
তিলে তৈল হয় > অপাদানে ৭মী
তিলে তৈল আছে > অধিকরণে ৭মী
তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত > অধিকরণে ৭মী
তিনি শুক্রবারে আসবেন >
অধিকরণে ৭মী
তিরিশ বছর ভিক্ষায়ে বেরেছি দুই নয়নের
জলে > করণে ৭মী
তাস খেলে কত ছেলে পড়া নষ্ট করে >
করণে শূন্য
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য
করে > সম্প্রদানে ৭মী
তোমায় দেখলেও পাপ > কর্মে ৭মী
তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি > সম্প্রদানে ৪র্থী
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি
> সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী
তর্কে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
ত্যাগে তিনি নিরহঙ্কার > অধিকরণে ৭মী
তোমার মহিমা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা
> করণে ৭মী
তাকে হাতে না মারলেও ভাতে মারব
> করণে ৭মী
তোমায় কেন দেই নি আমার সকল শূন্য
করে > সম্প্রদানে ৭মী
তুমি সন্ধ্যাকাশের তারার মত
> অধিকরণে ৬ষ্ঠী

থ
থানায় এজাহার দাও > অধিকরণে ৭মী

দ
দীনে দয়া কর > সম্প্রদানে ৭মী
দরিদ্রকে ধন দাও > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি > সম্প্রদানে শূন্য
দুধে ছানা হয় > অপাদানে ৭মী
দেশের জন্য প্রাণ দাও > সম্প্রদানে ৪র্থী

[illegible] > অধিকরণে ৭মী
[illegible] > অধিকরণে ৭মী
দিনে দিনে বহু বাড়িতেছে ঋণ
> অধিকরণে ৭মী
দুঃখীর ঘরীকে দুঃখ করে > করে ২য়া
দাসত্ব শিকলে দাসকর্ণ করে > করে ২য়া
দুরন্ত যাদের চঞ্চল পদ্মা, তাদের ডাকের
দুরন্ত কাজেরা > অধিকরণে ৭মী
দেখে শেষে ভরা হয় ডিমি ডিমারে
> করে ২য়া
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি জগতে
> করণে শূন্য, অধিকরণে ৭মী
দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যাওয়া
> অপাদানে ৭মী

ধ
ধন হইতে সুখ হয় না > অপাদানে ৭মী
ধর্ম হতে বিচলিত হয়ো না >
অপাদানে ৭মী
ধানের কাল বাতাসে নড়ে > অধিকরণে ৭মী
ধোপাকে কাপড় দাও > করণে ২য়া
ধানেতে তৈরি হয় মুড়ি চিড়ে খই >
অপাদানে ৭মী
ধৈর্য ধর, বাঁধ বুক > কর্মে শূন্য, করণে শূন্য

ন
না মরে পাষাণ বাপ নিলা হেন করে >
কর্মে ৭মী
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন > করণে ৭মী
নিজের চেয়ে বড় হও > করণে ৭মী
নাইবা তুমি এলে > কর্তায় শূন্য
নগরের নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে
মত্তা > নিমিত্তার্থে ৭মী

প
প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ >
অধিকরণে ৭মী
পাইলটে কালি ধরে বেশি > অধিকরণে
৭মী
পরাজয়ে ভয়ে না বীর > অপাদানে ৭মী
পাপে বিরত হও > অপাদানে ৭মী
পরকে কি না বলা ছাগলে কি না খায়
কর্তায় শূন্য

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল > কর্তায় শূন্য
পুলিশে খবর দাও > কর্মে ৭মী
পুলিশ ডাক > কর্মে শূন্য
পুলিশ চোর ধরেছে > কর্তায় শূন্য
পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার? > কর্মে শূন্য
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির > অধিকরণে ৭মী
পরীক্ষা আসিলে তাই চোখে জল করে > অপাদানে ৭মী
প্রাসাদ হইতে তাহাকে ডাকিলাম > অধিকরণে ৫মী
পরের মুখে শেখা বুলি > অপাদানে ৭মী
পাপীকে ধিক > কর্মে ২য়া
পাপী পশুর অধম > অপাদানে ৬ষ্ঠী
পাছে লোকে কিছু বলে > কর্তায় ৭মী
পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা > কর্মে ২য়া
পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলে > কর্তায় ৭মী
পাপ থেকে পুণ্য পৃথক > অপাদানে ৫মী
প্রাণপণে চেষ্টা কর > কর্মে শূন্য
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে > কর্মে ৭মী; সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী

ফ
ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয় > কর্তায় ৩য়া
ফলে বৃক্ষের পরিচয় > করণে ৭মী
ফুলে ফুলে সাজিয়েছে ঘর > করণে ৭মী
ফুটেছে বাগানে আজ অজস্র গোলাপ > অধিকরণে ৭মী
ফলে না বৃক্ষে সুমধুর ফল > অধিকরণে ৭মী
ফুলদল দিয়া কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে > কর্মে ৭মী
ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে > করণে ৭মী

ব
বিনা জ্বালে ভাত হয় না > করণে ৭মী
বাড়ি থেকে নদী দেখা যায় > অধিকরণে ৫মী
বাবা বাড়ি নেই > অধিকরণে শূন্য
বাবাকে বড্ড ভয় পাই > অপাদানে ২য়া
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে > কর্তায় ৭মী
বনে বাঘ থাকে > অধিকরণে ৭মী
বসন্তে কোকিল ডাকে > অধিকরণে ৭মী
বিপদে মোরে রক্ষা কর > অপাদানে ৭মী
বিপদে অধীর হইও না > অধিকরণে ৭মী
বিপদে যেন করিতে পারি জয় > কর্মে ৭মী
বিপদে আমি না যেন করি ভয় > অপাদানে ৭মী
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে > কর্তায় ৭মী
বাঘে মহিষে এক ঘাটে পানি খায় > কর্তায় ৭মী
বেলা যে পড়ে এল জলকে চল > নিমিত্তার্থে ৪র্থী
বাজিল কাহার বীণা > কর্মে শূন্য
বনোরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে > অধিকরণে ৭মী
বড় হও নিজের চেষ্টায় > করণে ৭মী
বসিরকে যেতে হবে > কর্তায় ২য়া
বোঁটা আলগা ফল গাছে থাকে না > অধিকরণে ৭মী
ব্যবহারেই ইতরভদ্র চেনা যায় > করণে ৭মী
বাজনা বাজে > কর্মে শূন্য
বিশ্বাস বুদ্ধিকে হার মানায় > কর্মে ২য়া
বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে > অপাদানে ৩য়া; কর্মে শূন্য

ভ
ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও > সম্প্রদানে ৪র্থী
ভিক্ষা দাও দুয়ারে দাঁড়ায়ে ভিক্ষুক > সম্প্রদানে শূন্য
ভূতকে আবার কিসের ভয় > অপাদানে ২য়া
ভয়কি মরণে > অপাদানে ৭মী
ভোরে সূর্য ওঠে > অধিকরণে ৭মী

ম
মনেতে আগুন জ্বলে চোখে কেন জ্বলে না > অধিকরণে ৭মী
মৃতজনে দেহ প্রাণ > সম্প্রদানে ৭মী
মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন > করণে ৩য়া
মানুষ ভাবে এক হয় আরেক > কর্তায় শূন্য
মশা মারতে কামান দাগা > কর্মে শূন্য
মানুষকে মানুষ হতে হয় > কর্তায় ২য়া; কর্মে শূন্য
মীরা বাগানে ফুল তুলছে > কর্মে শূন্য

মিথ্যারে করো না উপাসনা > কর্মে ২য়া

য
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় > অপাদানে ৬ষ্ঠী
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে > কর্মে শূন্য
যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ > কর্মে শূন্য

র
রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে ঢাকায় আছি > অধিকরণে ৭মী
রকিব অঙ্কে কাঁচা, কিন্তু ব্যাকরণে ভাল > অধিকরণে ৭মী
রতনে রতন চিনে > কর্তায় ৭মী
রেখ মা দাসেরে মনে > কর্মে ২য়া
রামের ভাই গান গায় > সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী
রবীন্দ্রনাথ পড়লাম > কর্মে শূন্য
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন > কর্মে শূন্য
রাতে তারা দেখা যায় > অধিকরণে ৭মী
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি > কর্তায় শূন্য
রাখাল গরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরে > কর্তায় শূন্য
রাজায় রাজায় লড়াই উলুখাগড়ার প্রাণান্ত > কর্তায় ৭মী

ল
লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয় > করণে ৩য়া
লাঙলে জমি চাষ করা হয় > করণে ৭মী
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু > অপাদানে ৭মী
লোকটি কানে খাটো > করণে ৭মী
লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব > করণে ৭মী
লোকমুখে এ কথা শোনা যায় > অপাদানে ৭মী

শ
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে > অধিকরণে ৭মী
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল > করণে ৭মী
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায় > করণে ৭মী
শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান অন্যে কভু নয় > কর্তায় শূন্য
শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না > করণে তৃতীয়া
শিক্ষককে শ্রদ্ধা কর > সম্প্রদানে ৪র্থী
শ্রম বিনা ধন লাভ হয় না > করণে শূন্য
শুধু বৈকুণ্ঠের তরে তরে বৈষ্ণবের গান > সম্প্রদানে ৬ষ্ঠী

স
সর্বাঙ্গ দংশিল মোর নাগ নাগবালা > কর্মে শূন্য
সর্বছাত্রে জ্ঞান দেন শিক্ষকগণ > সম্প্রদানে ৭মী
সমিতিতে চাঁদা দাও > সম্প্রদানে ৭মী
সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু > নিমিত্তার্থে ৬ষ্ঠী
সরোবরে পদ্ম ফোটে > অধিকরণে ৭মী
সমুদ্রে লবণ আছে > অধিকরণে ৭মী
সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় > করণে ৭মী
সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা > অধিকরণে ৭মী
সর্বজনে দয়া কর > সম্প্রদানে ৭মী
সারারাত বৃষ্টি ছিল > অধিকরণে শূন্য
সব ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায় না > অপাদানে ৭মী
সৌন্দর্যে কার না রুচি আছে > অধিকরণে ৭মী
সাদা মেঘে বৃষ্টি হয় না > অপাদানে ৭মী
স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় > কর্তায় শূন্য
সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয় > অধিকরণে ৭মী (ভাবে ৭মী)
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন > অপাদানে শূন্য
সকলকে মরিতে হইবে > কর্তায় ২য়া
সরিষা হইতে তৈল হয় > অপাদানে ৫মী
সোজা পথে চল না কেন? > করণে ৭মী
সর্বভূতে ধন দাও > সম্প্রদানে ৭মী

হ
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে > অধিকরণে ২য়া
হালে যেমন তেমন মইয়ে তুফান > অধিকরণে ৭মী
হারি জিতি নাহি লাজ > কর্মে শূন্য

তারক বিভক্তি : বিদ্যার লেখকদের

বিদ্যার পঙ্‌ক্তিসমূহ

০১। এতকাল মরিলে তরিলা বিদ্যাদে- করণকারকে ৭মী
০২। বিদ্যুৎ হেন ছিনি- কর্মকারকে শূন্য
০৩। মরি যদি শত বার- অধিকরণ কারকে শূন্য
০৪। নয় বছরে জন্মেছে- কর্তৃকারকে ৭মী
০৫। সাক্ষিরে ঈশ্বর দেখিলা সম্মুখে- কর্তৃকারকে শূন্য
০৬। পরিল হরিষ ফাঁদে- কর্মকারকে শূন্য
০৭। নিজ পুর পর ভাত দেখায় তস্করে- করণকারকে ৭মী
০৮। চন্দনে চলয় অনি বাজার অলয়ে- কর্মকারকে ২য়া
০৯। নদী পড়ি তোমা- কর্মকারকে শূন্য
১০। শব্দের কলহ অতি ভঙ্গির আবেশে- করণকারকে ৭মী
১১। ঘুচিল বিধুরে বিধি ঘুমুর ললাটে- কর্মকারকে ২য়া / অধিকরণকারকে ৭মী
১২। জনম তব কোন মহাক্ষণে?- অধিকরণকারকে ৭মী
১৩। অমূল্যন যোধে কী সে সাধে সাধান- কর্মকারকে ৭মী
১৪। কী দেখে ভবিবে এলাস হেন দুর্বল মানবে?- অপাদানকারকে ৭মী বিভক্তি
১৫। মহাসত্ত্ববলে যথা নদ্রগির ফণী- করণকারকে ৭মী
১৬। মজাইলা এ কনকলঙ্কা রাজা- কর্মকারকে শূন্য
১৭। বিরত সতত পাপে দেবকুল- অপাদানকারকে ৭মী
১৮। রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী- অধিকরণকারকে ৭মী
১৯। পরদোষে কে চাহে মজিতে?- করণকারকে ৭মী
২০। শুধু বিধে দুই ছিল মোর ভুই- কর্মকারকে শূন্য
২১। কুকেছ উপেন ও জমি লইব কিনে- উপেন=সম্বন্ধপদ, জমি=কর্মকারকে ৭মী
২২। পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা।-করণ কারকে ৭মী
২৩। ওটা দিতে হবে।-কর্ম কারকে শূন্য
২৪। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া-অধিকরণ কারকে ৭মী
২৫। সজল চক্ষে।-করণ কারকে ৭মী
২৬। সত্যযুগের যোগ্য মানুষ।-কর্তৃকারকে শূন্য
২৭। সৈন্যের মাঝে বেচিব সে মাথে- কর্মকারকে ৭মী
২৮। রাজা তখনকাল রহিলা মৌনভাবে- কর্তৃকারকে শূন্য
২৯। রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। রাজার=সম্বন্ধপদ, হস্ত = কর্তৃকারকে শূন্য
৩০। মোরে ভগবান রাখিবে না মোর গর্ভে।-কর্তৃকারকে শূন্য
৩১। তাই লিখি দিল বিশ্ব নিখিল-কর্মকারকে শূন্য
৩২। সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে- অপাদান কারকে ৭মী
৩৩। স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৪। পৌরবিকে এখানে নিয়ে আসে মুকুন্দ- কর্মকারকে ২য়া
৩৫। চোখে আসে জল ভরে।-অধিকরণ কারকে ৭মী
৩৬। সেই সুমধুর তব্ধ দুপুর পাঠশালা পলায়ন।-অপাদান কারকে শূন্য
৩৭। সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস। -কর্তৃকারকে শূন্য
৩৮। দুটি পাকাফল নড়িল ভূতল- কর্তৃকারকে শূন্য
৩৯। সপ্তম সুরে পড়িতে লাগিলভূতল। -কর্তৃকারকে শূন্য
৪০। শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন-করণকারকে ৭মী
৪১। পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ- কর্তৃকারকে শূন্য
৪২। বন্দন করি তাঁরে- কর্মকারকে ৭মী
৪৩। এক দেহে হল লীন-অধিকরণ কারকে ৭মী
৪৪। ভাসছে যেন আলগা স্রোতে। -করণকারকে ৭মী
৪৫। তাবা যা সে ওদের পিঠে।- অধিকরণকারকে ৭মী
৪৬। প্রাণের হাসি হাসতে জানে। -কর্মকারকে শূন্য
৪৭। অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হয়ে।-নিমিত্তার্থে ৭মী
৪৮। পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখ-অধিকরণ কারকে ৭মী

৪৯। দেশ দেশান্তে ছুটিয়ে আজি আনবে দেশ জ্ঞান বিভব- অধিকরণকারকে ৭মী
৫০। প্রণামান্তে হয় গো কাদু-করণকারকে ৭মী
৫১। আকুল করিয়া তোলে মন-কর্মকারকে শূন্য
৫২। কেহ সাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে -কর্মকারকে শূন্য
৫৩। সাগরে সুখ আমি দেখিয়াছি-কর্মকারকে শূন্য
৫৪। অন্ধকারে জেগে ওঠা-অধিকরণ কারকে ৭মী
৫৫। পাতাটির নিচে বসে আছে চোখের দোয়েল পাখি।-কর্তৃকারকে শূন্য
৫৬। চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের সুখ- কর্মকারকে শূন্য
৫৭। কৃষ্ণা দ্বাদশীর জোৎস্না যখন মরিয়া গেছে-কর্তৃকারকে শূন্য
৫৮। একদিন অমরায় গিয়ে।-অধিকরণে ৭মী
৫৯। বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঘুরের মত কেঁদেছিল পায়।-কর্তৃকারকে শূন্য
৬০। যে অমৃত চলতে কী তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে-অমৃত = সম্বন্ধ পদ, প্রাণ = কর্মকারকে শূন্য
৬১। আজকে প্রাণের সো আগারে উড়ছে আজ কালাপাহাড়?-কর্তৃকারকে শূন্য
৬২। খবর শোনা বন্ধ খাঁচায় ঘেরাটোপে- অধিকরণকারকে ৭মী
৬৩। উড়ছে আজো ধর্মধ্বজা টিকির পিঠে দাড়ির কোপে-কর্তৃকারকে শূন্য
৬৪। নিন্দনাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান-অধিকরণকারকে ৭মী
৬৫। ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী-রোষে = করণকারকে ৭মী, ব্যথায় = করণ কারকে ৭মী, বাণী = কর্তৃকারকে শূন্য
৬৬। মাতালদের এই ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি-অধিকরণ কারকে ৭মী
৬৭। বিষের জ্বালায় বিশ্ব জুড়ে-করণকারকে ৭মী
৬৮। ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে-করণে ৭মী
৬৯। কেঁদে ভাসাইত বুক- কর্মে শূন্য
৭০। এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা- কর্মে শূন্য
৭১। ভাবি সান মোর ভাষাশা করিত কত-কর্তৃকারকে শূন্য
৭২। আমারে দেখিয়ে যাইবে কিছু উদাস হৃদয় দীর-অধিকরণে শূন্য
৭৩। মাঝি যে তোমার কর খুশি হয়- কর্তৃকারকে শূন্য
৭৪। বেঁচে আছি ভবিষ্যতে-করণকারকে ৭মী
৭৫। মাটির মাটি যে ধরে' আসেপাশে- কর্মে শূন্য
৭৬। সবার তারকাঁটা ঝিমুচ্ছে-কর্তৃকারকে শূন্য
৭৭। পড়ছে সবার ছায়া-কর্মকারকে শূন্য
৭৮। একটি শিশুর ভিড়-কর্তৃকারকে শূন্য
৭৯। কোন রাখালের গানের ছায়ায়- অধিকরণে ৭মী
৮০। যেখানে আমার মরু হৃদয়ের উচ্ছল ঝর্ণাধারা- অধিকরণে ৭মী
৮১। একটা হৃদয়ের সাথে সকল উজাড় হয়ে যাই-করণে ৭মী
৮২। তোমার সাথের আমি কেবল যখন দুজন ছিনু-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৩। তবু ফুরিয়ে দিয়ে আমার সকল পাত্র তোমা-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৪। আমার বসন্ত কাটে যাদের কবিতে প্রতীক্ষায়-অধিকরণে ৭মী
৮৫। নাচির নাচির বাঁশী কেলাইরে বাঁশী পরিহাস-কর্তৃকারকে শূন্য
৮৬। বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিরকার করিতে লাগিল-কর্মে ২য়া
৮৭। সমুদ্র দেখিব বলে' মনে ছিল-কর্মে শূন্য
৮৮। চতুর্দিক ঘিরি শত্রু কুহুকিনীর ব্যূহ হইয়াছে-করণে ৭মী
৮৯। বুদ্ধিমান মানবে নিয়ত বিপদ্রম হইয়াছে- কর্মে শূন্য
৯০। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল-অধিকরণে ৭মী
৯১। তাহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন- অপাদানে ৭মী
৯২। ঈশ্বরের জিনিস তো-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৯৩। কিছুদিন বাদেই হারাব বাবা মাবা যায়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৯৪। গৌরবি অবাক হয়ে গেল-কর্তৃকারকে শূন্য
৯৫। নদী আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য-সম্বোধন পদ (কারক নয়)
৯৬। সেই ক্ষীণবায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

১১। ছোটো ছোটো ছেলেগুলি জীর্ণ পুঁথির মতোহইয়া-অধিকরণ কারকে ৭মী

১২। কঠিন ঠিকানা কবিতাং-কর্মকারকে ২য়া

১৩। হাসপাতাল কবিতাকে পুনঃ পরিণত হইল-অধিকরণ কারকে শূন্য

১৩৪। সেই সব লক্ষ কবিতা বহু স্থান, জলপথ, বিমান মারফত করিয়া চলিতে লাগিল -কর্মকারকে শূন্য

১৩৫। হেনকালে ভাঙা হইয়া-কর্মকারকে শূন্য

১৩২। মন হইল জনম দিকে সমুদ্র প্রমাণ পুঁথির চাহিয়া আছে- কর্মকারকে ৭মী

১৩৩। ঘিঞ্জন এই মহানগরীর চাহিত-কর্মকারকে ৭মী

১৩৪। সমুদ্র এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে-কর্মকারকে শূন্য

১৩৫। অবশেষে বৃহত্তরক্ষেত্রে উপনীত হইলাম-অধিকরণ কারকে ৭মী

১৩৬। জলদ ভিজে বৃক্ষ শিরায় পুষ্প দুটী কবিতেছে-কর্তৃকারকে শূন্য

১৩৭। সেই শুষ্ক বহু সেতুপথ সৌরভে পরিপূর্ণ-করণ কারকে ৩য়া

১৩৮। সুদূর কুলকুদূর হইতে পরিত্র হইয়াছে- অপাদান কারকে ৫মী

১৩৯। নক্ষত্রেই মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে-অধিকরণ কারকে ৭মী

১৪০। মহাকাশে পৃথিবী অপেক্ষা হইতেছে-অপাদান কারকে ৫মী

১৪১। রবীন্দ্রিপথারের হিসাব নাই-কর্তৃকারকে ৩য়া

১৪২। কোনদিন অদৃষ্টকে দেখ দিই নাই-কর্মকারকে ২য়া

১৪৩। আমাদের অনাদের পৌষিনতার গন্ধও ছিল না-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৪৪। আমাদের বাড়ির দরজি সেলাদের কবিদ- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

১৪৫। আমাদের চাটুয্যেরা একজোড়া হরিত- কর্মকারকে শূন্য

১৪৬। তারা হামারদের পড়িয়াছিলাম-অধিকরণে ৭মী

১৪৭। প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে-কর্তৃকারকে ২য়া

১৪৮। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূন্য নিস্তব্ধ -সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৪৯। এই বাটিকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম-কর্মকারকে ২য়া

১৫০। ছোটো ছোটো মনে কি পড়ে তাদা প্রতিদিন হট-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৫১। শিশুর পালক নাম কবিতে ধাত্ত-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৫২। সেই জনা বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিয়াছি-কর্মকারকে ২য়া

১৫৩। মধ্যে সেই ছন্দে আসিয়া উপস্থিত হইতাম-অধিকরণ কারকে ৭মী

১৫৪। তা ছাড়া আমি মাসি-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৫৫। বন্ধিত থাকিতেন না-অধিকরণে ৭মী

১৫৬। তাহার ধারের দক্ষিণ প্রান্তে একটা লেকা ছিল- অধিকরণে ৭মী

১৫৭। তাহাদের মনটাকে উদাস করিয়া দিত-কর্মকারকে ২য়া

১৫৮। তখন সবেমাত্র শহরে জলের কল হইয়াছে-অধিকরণে ৭মী

১৫৯। শহরে জলের কল হইয়াছে-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৬০। তাহার বেলা মাটি হইয়া যায়-কর্মকারকে শূন্য

১৬১। উহার কোণে মাটি একটা ঢেঁকি ঘর ছিল-অধিকরণে ৭মী

১৬২। এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম-অধিকরণে ৭মী

১৬৩। প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম-অধিকরণে ৭মী

১৬৪। আজ সেখানে গিয়াছিলাম-অধিকরণে শূন্য

১৬৫। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি-কর্মকারকে ২য়া

১৬৬। আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি-অধিকরণে ৭মী

১৬৭। পৃথিবীর উপরকার এই মোটে রাজের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে- কর্মকারকে ২য়া

১৬৮। একটা রহস্য সিন্দুকের তালা খোলা হইতেছে- সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৬৯। একটা রহস্য সিন্দুকের তালা খোলা হইতেছে-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৭০। আত্মার বীজ হইতে আজও অঙ্কুর বাহির হয়-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৭১। যেখানে আকাশের নীলিমা তাহারই পাতাতে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

১৭২। আমাদের মতো শিশুর আজা যদি বাচিত-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৭৩। দোকানদে মানুষের মতো আমরা দেখে থাকি-অধিকরণে ৭মী

১৭৪। সে কথা জানা-কর্মকারকে শূন্য

১৭৫। আমাদের বাস পকেট এক খোঁয়াড়ে নিয়েছে পুরে-কর্মকারকে ২য়া বিভক্তি/ অধিকরণে ৭মী

১৭৬। অহি নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে-কর্মকারকে ২য়া

১৭৭। যেন প্রবল অবহেলার পঙ্ক দিয়ে ঘষিয়ে ওঠে-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৭৮। মায়ের শেষে আমের বোল ধরে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

১৭৯। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন- কর্মকারকে ২য়া

১৮০। এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকেও যেন দেখতে পাব-কর্মকারকে ২য়া

১৮১। সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হতে উঠে-করণে ৩য়া

১৮২। ওর চির অসমাপ্ত গল্প-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৮৩। বলাই মনে মনে ওঁহার ভয়ে-কর্তৃকারকে শূন্য

১৮৪। আমার মা তো সেই-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৮৫। এইজন্য বাধাটা লুকোতে চেষ্টা করে-কর্মকারকে শূন্য

১৮৬। ছড়ি দিয়ে দুপাশের গাছ গুলোকে মারতে মারতে চলে-করণকারকে ৩য়া

১৮৭। সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে-কর্মকারকে শূন্য

১৮৮। যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে-কর্তৃকারকে শূন্য

১৮৯। সমস্তই নিখুঁত নিপুনি দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়-করণে ৩য়া

১৯০। আমার ওই গাছগুলো যেন না কাটে-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৯১। বলাই কী যে পাগলের মতো বকিস-সম্বোধন পদ (কারক নয়)

১৯২। পৃথিবীর অমৃত ভাণ্ডারের জন্য প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

১৯৩। বলাই অনেক দিন থেকে বুকতে পেরেছিল-কর্তৃকারকে শূন্য

১৯৪। অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থ যাত্রা করব-অধিকরণে ৭মী

১৯৫। একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি-অধিকরণে ৭মী

১৯৬। একেবারে খবরের কাগজ পড়ি-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

১৯৭। বলাই, আমাকে বাস করে ধরে নিয়ে গেল কলেজে-কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি; কলকাতাকে ২য়া বিভক্তি/ অধিকরণে ৭মী

১৯৮। নিজেরাদের একটা একটা ঢাল নিয়ে -করণে ৩য়া

১৯৯। ছুটিদিন নিজেরাদের একটা একটা ঢাল নিয়ে-করণে ৩য়া

১৯০। কিন্তু বলাইয়ের অন্যায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কার চ-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৯১। বলাই চলল-কর্তৃকারকে শূন্য

১৯২। মাস্টারকে বলতে হবে-কর্মকারকে ২য়া

১৯৩। কাকা হেসে বুড়ি পায়ে পড়ি-সম্বোধন পদ (কারক নয়)

১৯৪। একেবারে রাস্তার মাঝখানে চায়-অধিকরণে ৭মী

১৯৫। এই মাতৃহীন শিশুটি যেন তার কর্তব্য করা-কর্তৃকারকে শূন্য

১৯৬। তুমি কাকাকে বাবার করে দাও-কর্তৃকারকে ২য়া

১৯৭। বলাইকে ফোন দেখেছে-কর্মকারকে ২য়া

১৯৮। সেই খোকে আমার ফোন গেল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

১৯৯। তিনি বিদায়ে ইতিমধ্যেই শিখরে গেলেন-অধিকরণে ৭মী

২০০। লাইব্রেরির শিবুদাদুটির বড়ো বাই বোতাম-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২০১। এক সময়ে নিচুর ঢালে কেটে-অধিকরণ কারকে ৭মী

২০২। তার কবিকে এক চিঠি পাঠাল-কর্মকারকে ২য়া

২০৩। কবি মামার সেই বিপুল গায়ের একটি ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও- সম্বোধন পদ (কারক নয়)

২০৪। ওগো বন্ধু-সম্বোধন পদ (ঐ)

২০৫। একজন ফটোগ্রাফওয়ালা থেকে আনা- কর্মকারকে শূন্য

২০৬। আমার বইগুলির নুয়ে হয়েছে-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

২০৭। আমাদের ঘর খুলা হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২০৮। বলাইয়ের বাবা ওকে তার কোল থেকে নিয়ে গেল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

২০৯। বলাইয়ের বাবা ওকে তার কোল থেকে নিয়ে গেল-কর্মকারকে ২য়া বিভক্তি; অধিকরণে ৭মী

১৯০। তাহলেও তব যেন সমস্ত সংসারকে বাইরে-কর্মকারকে ২য়া
১৯১। দাদুটে তার প্রলাপ দু পক্ষটি বাঁধতে পারে না-করণে ৭মী
১৯২। ঠাকরুন ঝিমধর বেলায় বাটী ঝিকিতেছিলেন-অধিকরণে ৭মী
১৯৩। মনে বৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আজন করিয়া পড়িতেছে-অপাদানে ৫মী
১৯৪। ওরে ও 'গফুরা' বলি ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (কারক নয়)
১৯৫। গফুর চাহিয়া রহিল-কর্তৃকারকে শূন্য
১৯৬। ভাতা ভোকে জ্বালা করে দেবে-কর্মকারকে ২য়া
১৯৭। খামারে পড়ে-অধিকরণে ৭মী
১৯৮। কার গাদা কেড়ে খাবে-কর্মকারকে শূন্য
১৯৯। গফুর জবাব দিল না-কর্তৃকারকে শূন্য
২০০। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি-কর্মকারকে শূন্য
২০১। এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাকা রোধ হইয়া গেল-করণে ৭মী
২০২। কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন-কর্তৃকারকে শূন্য
২০৩। আমার মহেশ মরে যাবে-কর্তৃকারকে শূন্য
২০৪। এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না-কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
২০৫। মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল-অধিকরণে ৭মী
২০৬। তোমাকে ফাঁকি দেবনা-কর্মকারকে ২য়া
২০৭। ঘরে যাই বেলা বয়ে গেল-অধিকরণে ৭মী
২০৮। একমুখো যেতে চায়-কর্মকারকে শূন্য
২০৯। তোকে দিলে না-কর্মকারকে ২য়া
২১০। গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল-করণে ৭মী
২১১। গায়ে আর তোর জোর নেই-অধিকরণে ৭মী
২১২। একখানি মলিন সান্ত্বনাতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে-অধিকরণে ৭মী
২১৩। একজন বেধে করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া সব তরিলেন-অধিকরণে ৭মী
২১৪। মানিক তোরো মহেশকে আমাদের... -কর্মকারকে ২য়া
২১৫। পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় পৌঁছে দেবে-অধিকরণে ৭মী
২১৬। অর্থমিলা তাহা জানিত না-কর্তৃকারকে শূন্য
২১৭। আজও মাপতি করিল না-অধিকরণে শূন্য
২১৮। একথা কর্তার কানে গিয়াছে-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
২১৯। সকলেই বিস্মিত হইল-কর্তৃকারকে ৭মী
২২০। ছেঁড়ার বুক ফেটে গেল-করণে ৭মী
২২১। এত লোকে মরে-কর্তৃকারকে ৭মী
২২২। গফুরের বুকে শেল বিধিল-অধিকরণে ৭মী
২২৩। সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
২২৪। ওরে ও গফরা বলি ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (ঐ)
২২৫। কী করব বাবাঠাকুর-সম্বোধন পদ (ঐ)
২২৬। বাবুমশায় হরিণ তুমি-সম্বোধন পদ (ঐ)
২২৭। দাও না ঠাকুর মশায় কাহন দুই ধার-সম্বোধন পদ (ঐ)
২২৮। মহেশ তুই আমার ছেলে-সম্বোধন পদ (ঐ)
২২৯। গফুর চোখের জল গোরুটার পিঠের উপর-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩০। মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ বাবা-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩১। একটা পিতলের থালায় পিতার হাত - সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩২। একটুখানি ছলনার অভিনয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩৩। কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩৪। বুড়া চাদরের খুট হইতে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৩৫। গফরা ঘরে আছিস-সম্বোধন পদ (ঐ)
২৩৬। আমিনা চল আমরা যাই-সম্বোধন পদ (ঐ)
২৩৭। আল্লা যত খুশি আমাকে সাজা দিয়ো -সম্বোধন পদ (ঐ)
২৩৮। তাহা সাধারণে পায় না-কর্তৃকারকে ৭মী
২৩৯। এই ছোটো মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁষিতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

২৪০। আমার খাওয়া খাওয়া হয়নি-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী
২৪১। অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল-অধিকরণে ৭মী
২৪২। আমাকে যত খুশি সাজা দিও-কর্মকারকে ২য়া
২৪৩। তার কসুর কুমি যেন কখনো মাপ কোরো না-কর্মকারকে শূন্য
২৪৪। তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস ছেঁড়ার ভার-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
২৪৫। মাঝরাতে শঙ্করের ঘুম ছেড়ে গেল-অধিকরণে ৭মী
২৪৬। দুজনেই কান খাড়া করে শুনলে-কর্তৃকারকে ৭মী
২৪৭। দুটো চিতা বাঘ তো ওদের গা ঘেঁসে ছুটে পালাল-কর্তৃকারকে শূন্য
২৪৮। প্রাণের ভয়ে ছুটেছে-অপাদানে ৭মী
২৪৯। আগুনটা ভালো করে জ্বালা-কর্মকারকে শূন্য
২৫০। কী হচ্ছে বাইরে-অধিকরণে ৭মী
২৫১। অলঙ্কারেজ সেদিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল-কর্তৃকারকে শূন্য
২৫২। লক্ষটা ডুবড়ি একসঙ্গে জ্বলছে-কর্মকারকে শূন্য
২৫৩। শংকরের মনে হল-কর্তৃকারকে ৭মী
২৫৪। ওরা কেউ এর আগে প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি দেখিনি-কর্মকারকে শূন্য
২৫৫। শংকরের টর্চের আলোয় সেটা গমোনতো খেয়ে-করণকারকে ৭মী
২৫৬। দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল-কর্তৃকারকে ৭মী
২৫৭। কুব মিহি ধূসর বর্ণের ছাই আকাশ থেকে পড়েছে-অপাদানে ৫মী
২৫৮। হেমলক গাছের জঙ্গল দাবানলে ও প্রস্তর বর্ষণে সম্পূর্ণ নষ্ট হতে গেল-করণ কারকে ৭মী
২৫৯। সারাদিন সন্ধানভাবে অগ্নিলীলা চলল-অধিকরণে শূন্য
২৬০। রাত্রি এল-কর্তৃকারকে শূন্য
২৬১। অবশিষ্ট জঙ্গলটাকেও ঢাকা ছিল-কর্মকারকে ২য়া
১৬২। আলডারেজ পাথরের ঘায়ে আহত হল-করণকারকে ৭মী
১৬৩। সকালে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল-অধিকরণে ৭মী
২৬৬। আলডারেজ ম্যাপ দেখে বলল-কর্মকারকে শূন্য
২৬৭। নামটা শুনে মনে হয়-কর্মকারকে শূন্য
২৬৯। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য
২৬৭। শংকর আগুনটা ভালো করে জ্বালো-সম্বোধন পদ (কারক নয়)
২৬৮। একটা শিশ্রংবের হরিণের দল ওদের পদশব্দের মধ্যে এসে পড়ল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৬৯। নজর পড়ল দূরের পাহাড়ের দুটোটার দিকে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭০। রাঙা আগুনের মেঘ নিচু হয়ে যায়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭১। পালাও পালাও শংকর-সম্বোধন পদ (ঐ)
২৭২। ধক্কের গন্ধ বাতাসে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭৩। জলন্ত পাহাড়ের দুটোর মুখটা উড়ে গিয়েছে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭৪। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল পাথরের চোট খেয়ে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭৫। জুলজ্বায় এর নাম অগ্নিসবের শয্যা -সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭৬। হে রুদ্রদেব প্রণাম-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
২৭৭। এই বসিবসি আসমান জমিন করয় কীত্তারি-কর্মকারকে শূন্য
২৭৮। ভালকরি বাজাইলে কত সুর কণ্ঠ-কর্তৃকারকে শূন্য
২৭৯। আইজো কোন ও কাম পালুনা-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য
২৮০। নাইন কইরে মারামারি লাগিলেন বুঝি-কর্মকারকে শূন্য
২৮১। হাকিমুদ্দির বাড়ি কানে যাবার কইস-অধিকরণে শূন্য
২৮২। ক্যামন আগে থাকি শহরে যারা তলকি ত্যালেয়া-অধিকরণে ৭মী
২৮৩। ইয়ারাই দুনিয়ায় আগুন লাগেয়া দিলে -অধিকরণে ৭মী
২৮৪। কাইল বিহানে উঠিয়া বহির আর ফুলজানকে বাবি আসীছ-অধিকরণে ৭মী
২৮৫। আইজ বাড়িটি সুনসুনটা হয়া গেইছে-অধিকরণে শূন্য

২৯৪। পরার সবর বেকারার অবশ হয়ে এল-কর্তৃকারকে ৭মী

২৯৭। কাইল দুই দরবারের কারা নিহি-অধিকরণে ৭মী

২৯৮। পাপের বর্ণনাটা বেশি ভালো ছিল-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯১। কালা জন্তির কাসেরা চালান দিবে-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯০। কাইল রাইতে কিছুই খাং নাই-অধিকরণে ৭মী

২৯১। টুমরার আইজ মোর দরিয়ার তুফান লাগিবে-অধিকরণে ৭মী

২৯২। জালোয়ার গিলে নিজে মইরবারে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

২৯৩। কোন বস্তুর হানরা কজি-কর্মকারকে শূন্য

২৯৫। আসমান ভাঙি ফ্যারিস্তা জাসিয়া সালেশ মিঠাই নিয়া যাইবে-কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য

২৯৫। বাচ্চা কালে দুখের দিন দেখছি হয়-অধিকরণে ৭মী

২৯৬। এই টাকার বাপজান হজ করি অইল-করণে ৭মী/কর্মে শূন্য

২৯৭। বাপজানের মুসকিল আসান হচ্ছিল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২৯৮। আইজ মোরও পরীক্ষা-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

২৯৯। একটা কথা কবার চাই-কর্মকারকে শূন্য

৩০০। পাতড়ি না খায়া মইল-কর্তৃকারকে শূন্য

৩০১। মুই শহরে চালি যাই-অধিকরণে ৭মী

৩০২। স্থির অপলক দৃষ্টিতে রহিমের দিকে চেয়ে-করণে ৭মী

৩০৩। রহিম অস্থির হয়ে উঠানে ঘুরছে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩০৪। হাকিমুদ্দির মনের সাধটা মিছিল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩০৫। আকালে সব এক হয়া গেল-অধিকরণে ৭মী

৩০৬। তারা মাইনষের হাতে সব কয়ায়-করণে ৭মী

৩০৭। মইলে কবরে মুতি নিদ যায়-অধিকরণে ৭মী

৩০৮। ভগবান যা করায় তায় ভাল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩০৯। আর মালিকেরও পরীক্ষা-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১০। খাবার নাম নাইও-কর্মকারকে শূন্য

৩১১। গ্যাওয়ানি ভাড়েয়া দিলে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩১২। বাহিরকে দেখিয়া দ্যাওয়ানি চিনেছে-কর্মকারকে শূন্য

৩১৩। রহিমের দিকে চেয়ে বলল-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১৪। ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ-কর্মকারকে শূন্য

৩১৫। তোক ভাল্লাক দেখি নিহি-কর্মকারকে শূন্য

৩১৬। এক শয়তানটা খাবার দিবার বাধা-কর্তৃকারকে শূন্য

৩১৭। কাঁথো শুনি যায়া শয়তানকে কইবে-কর্মকারকে ২য়া

৩১৮। উস্তার মান গেলে মোরও মান যায়-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩১৯। বহির একমনে চিড়া খাচ্ছিল-কর্মকারকে শূন্য

৩২০। মানুষের জানটাও মালটারে মতো-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩২১। হয়রে বহিমভাই লাড়ুখানা না তোরে বুদ্ধিতে হইল-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২২। মরনাটয়না গুণা দিঘির জলে আর কুঁয়াতে ফেলি দেয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৩। দাদির বাড়ি থাকি আলুবে বহির- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৪। বাচ্চা কালে দুঃখের দিন দেখছি হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৫। কিয়ামতের রোজ কমো-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৬। মাস্তরে বড়ো ভোখ লাইগছে-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২৭। শ্রীমন্ত তুইয়ে তো দ্যাখো মোর ফ্যারিস্তা হলুরে-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩২৮। দুনিয়ার মালিক যদি এই জন্যে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩২৯। ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩৩০। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না-করণে ৭মী

৩৩১। জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩৩২। আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি-করণে ৬ষ্ঠী

৩৩৩। আমাকে আপনি বলবেন না সাহেব-কর্মকারকে ২য়া

৩৩৪। পেটোয়া লোকা পেয়ে মুখমন্ত্রী মশাই তাকে আপ্যায়েত করে শোনালেন-কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে ২য়া

৩৩৫। যাদের খুশা ধনদৌলত দিয়েছেন-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৩৬। আমারেই গা ধলাইছড়ার লোক-অধিকরণে ৬ষ্ঠী

৩৩৭। আমার ঠিক মনে পড়ছে না-কর্তৃকারকে ৬ষ্ঠী

৩৩৮। তখন তো মানুষ খুন করে-কর্মকারকে শূন্য

৩৩৯। শুধু সমীরুদ্দি একবারের তারও কারর দুখনি-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৪০। সমীরুদ্দি বন্দরে নামলেই না-অধিকরণে ৭মী

৩৪১। আমার ছিটে ছেড়ে দাও-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৪২। আমরা শাকসবজি বেচে নামমাত্র সেখানে-কর্মকারকে শূন্য

৩৪৩। হাম ঘুরে সব মাল নেমে গেলে-অধিকরণে ৭মী

৩৪৪। পৌঁছালুম নুতক বন্দরে-অধিকরণে ৭মী

৩৪৫। মিরবিকন মজুরদের জবর লোকসান হয়-কর্মকারকে শূন্য

৩৪৬। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দি-অপাদানে ৭মী

৩৪৭। ডাক্তার তাকে কয়ে থাকবার হুকুম দিলে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৪৮। সে জাহাজ থেকে পালাবে-অপাদানে ৫মী

৩৪৯। সে খবর দিয়ে রেখেছিল-কর্মকারকে শূন্য

৩৫০। সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে-অধিকরণে ৭মী

৩৫১। কিন্তু দেশে যাবার ফুরসত হয়ে ওঠে নি- অধিকরণে ৭মী

৩৫২। বুড়ি নাকি আমার জন্য কাঁদত-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৫৩। সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে-অধিকরণে ৭মী

৩৫৪। মিরিকিন মুলুক সোনার দেশ-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৫৫। নউক বন্দরে আমাদের নামতে দেয় নি- অধিকরণে ৭মী

৩৫৬। সে আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে-কর্মকারকে ২য়া

৩৫৭। এর বদ মা মানুষটি সইতে পারে-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৫৮। সে পাঁয়তাই ছিল-অধিকরণে ৭মী

৩৫৯। অতি মন্দ কথায় সমীরুদ্দি আমাকে সবকিছু বুঝিয়েছিল-করণে ৭মী

৩৬০। আবার সে টাকটা গুজরি-কর্মকারকে শূন্য

৩৬১। মনি জাহাজের খালাসি নই-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)

৩৬২। সারেং সাহেব জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে নাস্তো-সম্বোধন পদ (ঐ)

৩৬৩। টিপলে মনে হোত কচ্ছপের খোল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৪। সমীরুদ্দি সাঁতারের ভাসিয়া পরে নামল- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৫। গেল জোয়ারের নমাজ নকতে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৬। পা বন্দরের বাবুদাঁর পুতুলের মতো চুপ করে বসে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৭। তার স্ত্রীটির খুন করিয়ে ছিল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৮। মোস্তাফি আর পাঁয়তর মুরুব্বিরা ভাই ভাইকে নিয়ে এলেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৬৯। সমীরুদ্দির ভাই এলের বলেছেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৭০। পাথরের পুতুলের মতো বসে রইল সে- সম্বন্ধ পদ (ঐ)

৩৭১। আমরা এই বায়ুকে দূষিত বলুবলি-কর্মকারকে ২য়া

৩৭২। বিজ্ঞানীরা তা ভালো বুঝতে পারছিলেন – কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৩। তখন আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/করণে ৭মী

৩৭৪। প্রশাসন সচেতন হয়-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৫। আমেরিকাতে ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট আইন পাশ হয়ে যায়-অধিকরণে ৭মী

৩৭৬। প্রাণী বাঁচতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য

৩৭৭। এসব আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণুবাহী মাছি কীটপতঙ্গের জন্ম হয়-অপাদানে ৫মী

৩৭৮। ভ্রূণস্থ শিশুর ক্ষতি করে-কর্তৃকারকে ৫মী

৩৭৯। গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নিতে পারে-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৮০। মানুষের সৃষ্টি সভ্যতা যেন পৃথিবীকে না গ্রাস করে-কর্তৃকারকে ২য়া
৩৮১। অমেরিকায় টমাটো গাছে জন্মে হয়-অধিকরণে ৬ষ্ঠী
৩৮২। বায়ুর নাইট্রোজেন উদ্ভিদ জগতের পোষণে সাহায্য করে-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৩৮৩। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দান নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৪। নদীর জল দূষিত হয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৫। জল উদ্ভিদ ও প্রাণী বাঁচতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৮৬। প্রাণীদেহের জীবকোষ অচিরেই নষ্ট হয়-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৩৮৭। গাছের শিকড় প্রচুর জল টেনে নেয়-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৮। সংগীতের সুন্দর এই শ্রেণিতে পড়ে না-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৮৯। কানের ঢাকা পরে শব্দ কারখানার কর্মীরা কাজ করতে পারেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৯০। প্রায় ৭০ হাজার মাছির সূতিকাগার হতে পারে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৩৯১। হারা গৌরবের উঠানে এসে দাঁড়াল-কর্তৃকারকে এ বিভক্তি/অধিকরণে ৭মী
৩৯২। ঘুরে ঘুরে জিভ এড়ে কথা ওর সড়োগড়ো হয়নি এখনও-করণে ৭মী
৩৯৩। গৌরবি তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না-কর্তৃকারকে শূন্য
৯৪। বলে মাটিতে খুতু ফেলেছিস-অধিকরণে ৭মী
৫। মানুষে বউ এসে শাশুড়িতে পর করে-কর্মকারকে ২য়া
৬। আজকাল মানুষ বড়ো মন্দ হয়ে গেছে-অধিকরণে শূন্য
৭। বিকেলে পয়সা দে যাবে-অধিকরণে ৭মী বিভক্তি/কর্মকারকে শূন্য
৩৯৮। গৌরবির বৈকালে শাশুড়িরা বাদ-কর্তৃকারকে শূন্য
৩৯৯। এ গ্রামে যে মানুষ বসতে দেয়-অধিকরণে ৭মী
৪০০। গৌরবির ভেতরটা ভরে একিয়ে যেত-অপাদানে ৭মী
৪০১। শেয়াল উঠোন দিয়ে হাঁটে-কর্তৃকারকে শূন্য
৪০২। ছেলেকে বোলে না যেন-কর্মকারকে ২য়া
৪০৩। বউকালে চলে এলাম-অধিকরণে ৭মী
৪০৪। শহরে গৌরবি আর হারার সময়ও অনেক বড়ো-অধিকরণে ৭মী
৪০৫। বিষ খুব তাড়াতাড়ি মাতায় উঠে গিয়েছিল-কর্তৃকারকে শূন্য
৪০৬। বাসস্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে উনুন ধরেনি-সম্বন্ধ পদ (কারক নয়)
৪০৭। হারার মা র ওপরই ওর নির্ভর-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪০৮। ওর মাথায় বালিশের নিচে রূপোর হাঁসুলির মতো চকচকে নিয়ড়চাঁদা সাপ-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪০৯। মানুষ মুড়ে হারার বাবাকে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১০। তুমি গলাবাবুদের চেয়ে উচু ঘর তোল কেন-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১১। আমাদের দেশের কথা মনে পড়ে-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১২। কাত ফিরে শো হারা-সম্বোধন পদ (ঐ)
৪১৩। মার গায়ের ধুঁপুলটা গৌরবিকে দিয়ে মর-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১৪। মাদার গাছের ছায়ায় চেঁকিশালের জঙ্গল-সম্বন্ধ পদ (ঐ)
৪১৫। সকাল বেলা গৌরবি হারাকে বলল-অধিকরণে শূন্য বিভক্তি/কর্মকারকে ২য়া
৪১৬। নিবারণ তো শুকে চায় না-কর্মকারকে ২য়া
৪১৭। মোটে আলুটা নিয়ে যা-কর্মকারকে শূন্য
৪১৮। একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল।-অপাদানে ৫মী।

সমাস

প্র : সমাস শব্দের অর্থ কী?
উ : সমাস অর্থ সংক্ষেপ।
প্র : সমাসের সংজ্ঞার্থ লেখ।
উ : পরস্পর অর্থসঙ্গতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।
প্র : সমাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।
উ : (১) সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন ঘটে ও পদের বিভক্তি লোপ পায়।
(২) সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।
(৩) বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।
প্র : সমাসের প্রতীতি কয়টি ও কী কী?
উ : সমাসের প্রতীতি পাঁচটি। এগুলো হচ্ছে : সমস্তপদ, পূর্বপদ, পরপদ, ব্যাসবাক্য ও সমসামান পদ।
প্র : সমস্তপদ কোন কোন পদের সমন্বয়ে গঠিত?
উ : পূর্ব ও পরপদ।
প্র : বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস কত প্রকার ও কী কী?
উ : চার প্রকার। অব্যয়ীভাবীয়, তৎপুরুষীয়, দ্বন্দ্বমূলক ও বহুব্রীহিমূলক।
প্র : সমাস সাধারণত কত প্রকার ও কী কী?
উ : ছয় প্রকার। অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, দ্বিগু, কর্মধারয়।
প্র : উপরিউক্ত সমাসের বাইরে কতিপয় অপ্রধান সমাসের নাম লেখ।
উ : প্রাদি, নিত্য, অলুক, উপপদ।
প্র : বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?
উ : তৎপুরুষীয়।
প্র : সমাস চিহ্নিতকরণের প্রধান উপায় কী?
উ : পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে অব্যয়ীভাব; পরপদ বা উত্তরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু; উভয়পদের অর্থের প্রাধান্য থাকলে দ্বন্দ্ব এবং কোনো পদের অর্থ প্রধান না হয়ে তৃতীয় কোনো অর্থের সৃষ্টি হলে বহুব্রীহি সমাস হয়।
প্র : ব্যাসবাক্য দিয়ে সহজে কিভাবে সমাস চেনা যায়?
উ : ব্যাসবাক্যের উপর নির্ভর করে বর্তমান গ্রন্থের লেখক নিম্নের পদ্যাংশটি তৈরি করেছেন। এটি মনে থাকলে ব্যাসবাক্য থেকে সমাস নির্ণয় কিছুটা সহজ হবে :
'ও নিয়ে যুক্ত হলে বলবে দ্বন্দ্ব
সমাহার দ্বিগু হয়, এটা নয় সন্ধ।
যে যিনি যেটি তিনি কর্মেরধারায়
যাহার বাক্যের শেষে বহুব্রীহি পায়।
বিভক্তি লোপ হয়ে তৎপুরুষ করে
ব্যয়ীভাব পদটি কোনো অব্যয়ী হবে,
বিভক্তি না লুপ্ত হয়ে অলুকও হয়
মন দিয়ে পড় সবে, কোনো সন্দেহ নয়।'

অব্যয়ীভাব সমাস

প্র : অব্যয়ীভাব সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় থাকে, উত্তরপদে সাধারণত বিশেষ্য থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
প্র : সাধারণত কোন কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়?
উ : সামীপ্য, যোগ্যতা, অনতিক্রম, অভাব, পর্যন্ত, অতিক্রান্ত, বিরোধ, যোগ্যতা, সাদৃশ্য, পশ্চাৎ প্রভৃতি অর্থে।
প্র : কতিপয় উল্লেখযোগ্য অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।
উ : সামীপ্য (উপ) অর্থে :
উপনগরী = নগরীর সমীপে
উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে
উপকূল = কূলের সমীপে
সাদৃশ্য (উপ) অর্থে :
উপভাষা = ভাষার সদৃশ
উপবন = বনের সদৃশ
উপগ্রহ = গ্রহের তুল্য
উপকথা = কথার সদৃশ্য
উপদ্বীপ = দ্বীপের সদৃশ
উপশহর = শহরের সদৃশ
উপনদী = নদীর সদৃশ
উপসাগর = সাগরের সদৃশ
উপবিভাগ = বিভাগের সদৃশ

প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ
উপমাতা = মাতার সদৃশ
(মাসি, পিসি, ফুফু, খালা)
(দ্রষ্টব্য : বিমাতা ও উপমাতা এক নয়)

বীপ্সা (পুনঃ পুনঃ) অর্থে :
প্রতিগৃহে = গৃহে গৃহে
প্রতিক্ষণ / অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে
প্রতিদিন = দিন দিন
প্রতিমণ = মণে মণে
প্রতিজন / জনপিছু = জনে জনে
ক্ষিবছর = বছর বছর
ক্ষরোজ = রোজ রোজ

অনতিক্রম (যথা) অর্থে :
যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে
যথাবিধি = বিধিকে অতিক্রম না করে
যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে
যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে
যথেচ্ছা = ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে

অভাব (নিঃ/নির) অর্থে :
নির্জল = জলের অভাব
নিরামিষ = আমিষের অভাব
নির্ভাবনা = ভাবনার অভাব
নিরুৎসাহ = উৎসাহের অভাব
নির্ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝাটের অভাব

ঈষৎ (আ) অর্থে :
আনত = ঈষৎ নত
আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম

পর্যন্ত (আ) অর্থে :
আজীবন = জীবন পর্যন্ত
আসমুদ্র = সমুদ্র পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত
আসমুদ্রহিমাচল = সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত
আমূল = মূল পর্যন্ত
আমরণ = মরণ পর্যন্ত
আকৈশোর = কৈশোর পর্যন্ত (অবধি)
আপাদমস্তক = পদ (পা) হতে মস্তক পর্যন্ত
আজন্ম = জন্ম (-এর বিনাশ) পর্যন্ত
আজানু = জানু পর্যন্ত
আবাল্য = বাল্যের সূচনা থেকে বাল্যের শেষ পর্যন্ত
আশৈশব = শৈশবের সূচনা থেকে শৈশবের শেষ পর্যন্ত
অদ্যাবধি = অদ্য পর্যন্ত
আকর্ণ = কর্ণ পর্যন্ত
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত
আবালবৃদ্ধবনিতা = বাল, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত
(নোট: 'বাল' অর্থ শিশু)
আপামরজনসাধারণ = পামর থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত

অতিক্রান্ত (উৎ) অর্থে :
উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত
উন্মূলন = মূলকে অতিক্রান্ত
উন্নিদ্র = নিদ্রাকে অতিক্রান্ত

যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে

বিরোধ (প্রতি) অর্থে :
প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ
প্রতিকূল = বিরুদ্ধ কূল
প্রতিযোগ = বিরুদ্ধ যোগ

পশ্চাৎ (অনু) অর্থে :
অনুগমন = পশ্চাৎ গমন
অনুধাবন = পশ্চাৎ ধাবন
অনুসরণ = পশ্চাৎ সরণ
অনুতাপ = পশ্চাৎ তাপ

প্র : আরো কিছু অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।
উ : বেমালান = মানানের অভাব
বেবন্দোবস্ত = বন্দোবস্তের অভাব
হুতাত = ভাতের অভাব
গরমিল = মিলের অভাব
আলুনি = নুনের (লবণের) অভাব
না-টক না-মিষ্টি = টকের অভাব মিষ্টির অভাব

হা-ঘর = ঘরের অভাব
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত
উপদেবতা = হীন দেবতা
ফিকাপাল = ঈষৎ লাল
ফিকানীল = ঈষৎ নীল
অনুরূপ = রূপের যোগ্য।
সমস্তদিন = দিনভর
সমস্তরাত = রাতভর
বেহায়া = হায়ার অভাব
বেকার = কাজের অভাব
বিশ্রী = শ্রীর অভাব
প্রত্যহ = অহ অহ
প্রত্যঙ্গ = ক্ষুদ্র অঙ্গ
অন্যায় = ন্যায়ের অভাব
দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব

প্র : কতগুলো নিপাতনে সিদ্ধ অব্যয়ীভাব সমাস লেখ।
উ : সমক্ষ = অক্ষির সমীপে
প্রত্যক্ষ = অক্ষির অভিমুখে
পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে
অধ্যাত্ম = আত্মাকে অধি (অধিকার অর্থে)
অধিভূত = ভূতকে অধিকার করে
অধিদৈব = দৈবকে অধিকার করে
দুর্গত = দুঃ-কে (দুঃখকে) গত
প্রদক্ষিণ = দক্ষিণকে প্রগত

তৎপুরুষ সমাস

প্র : তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?
উ : পূর্বপদে দ্বিতীয়াদি (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত) বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় এবং যেখানে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়।

প্র : তৎপুরুষ সমাস প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?
উ : প্রধানত ছয় প্রকার। যেমন : দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী তৎপুরুষ। তবে এগুলো ছাড়াও কতিপয় তৎপুরুষ সমাস আছে (এই নামগুলো অন্য সমাসের সঙ্গেও দেখা যাবে)। যেমন : নঞ্ তৎপুরুষ, উপপদ তৎপুরুষ, অলুক তৎপুরুষ, প্রাদি তৎপুরুষ ইত্যাদি।

প্র : নঞ্ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে, উদাহরণ দাও।
উ : পরপদের প্রাধান্য রেখে নঞ্ অব্যয় (ন, না, নাই, নেই, নয় ইত্যাদি) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন :
অক্ষত = ন (নয়) ক্ষত
অবিশ্বাস্য = নয় বিশ্বাস্য
বেআইনি = বে (নয়) আইনি
অপর্যাপ্ত = নয় পর্যাপ্ত
অনতিবৃহৎ = ন অতিবৃহৎ
অমিল = ন মিল
অনভিজ্ঞ = ন অভিজ্ঞ
নাতিদূর / অনতিদূর = ন অতিদূর
অসময় = ন সময়
অনাচার = ন আচার
অনুর্বর = ন উর্বর
নাতিশীতোষ্ণ = ন অতিশীতোষ্ণ
অসহযোগ = ন সহযোগ
অকেজো = ন কেজো
অনশন = ন অশন
অনুন্নত = ন উন্নত
অসুখ = ন সুখ
অকাতর = ন কাতর
অনাদর = ন আদর

নর্মদর্শন = ন মর্মের দর্শন
নর্মমর্ম = ন মর্মের মর্ম
অপ্রসাদ = ন প্রসাদ
অকাল / আকাল = ন কাল
অনৈতিক = ন নৈতিক
অকেশা = ন কেশা/কেশর
অসুর = ন সুর
অবিশ্বাস = ন বিশ্বাস
অন্যান্য = ন (অন্য অর্থে) ন্যায়
অজানা = নাই জানা
বেদরকারি = ন (নয়) দরকারি
অন্যান্য = নয় ন্যায়
নিবরণ = নাই বরণ
অনাসৃষ্টি = নয় সৃষ্টি
বেটেল = নাই টেল
বেসরিক = নয় সরিক
নামঞ্জুর = নয় মঞ্জুর
অনুচিত = নয় উচিত
নিখুঁত = নাই খুঁত
অনেক = নয় এক
গরমিল = নাই মিল
গরহাজির = নয় হাজির

প্র : উপপদ কাকে বলে?
উ : কোনো শব্দকে বিশ্লেষণ করলে যদি একটি পূরক শব্দ, এরপর ধাতু, এরপর প্রত্যয় পাওয়া যায় (শব্দ+ধাতু+প্রত্যয়)। এবং সেই প্রত্যয়টি হয় কৃৎ প্রত্যয় তাহলে প্রাক্ বিশিষ্ট শব্দকে উপপদ বলা হয়। যেমন :
বাস্তুহারা = বাস্তু + √হৃ(হর্) + আ;
খেচর = খ + √চর্ + অ।
এখানে বাস্তু এবং খ (আকাশ) যথাক্রমে উপপদ।

প্র : কৃদন্ত পদ কাকে বলে?
উ : কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে শব্দ তৈরি হয় তাকে কৃদন্ত পদ বলে। যেমন : √চর্ > চর (বিচরণ করা অর্থে); √ধর্ >ধর (ধরা অর্থে)।

প্র : উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?
উ : উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। এ সমাসে পূর্বপদ সাধারণত বিশেষ্য হয়ে থাকে।

প্র : কতিপয় উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ দাও।
উ : প্রিয়ংবদা = প্রিয়ম্ বলে যে (নারী)
ক্ষীণজীবী = ক্ষীণভাবে বাঁচে যে
মনোহারিণী = মন হরণ করে যে (নারী)
গৃহস্থ = গৃহে থাকে যে

জলভর = জলে ভরে যা
সর্বহারা = সব হারিয়েছে যারা
জলদ = জল দেয় যে / যা
পুথিপোড়ুয়া = পুথি পড়ে যে
মনমরা = মনে মনে, যে
কুম্ভকার = কুম্ভ করে যে
প্রভাকর = প্রভা করে যে
সত্যবাদী = সত্য বলে যে
সর্বনাশ = সর্বনাশ করে যে
ধামাধরা = ধামা ধরে যে
ছেলেধরা = ছেলে ধরে যে
হাড়ভাঙা = হাড় ভাঙে যাতে
বুকভাঙা = বুক ভাঙে যাতে
অর্থকরী = অর্থ করা হয় যার দ্বারা
ধাপ্পাবাজ = বাজ করে যে
মানুষকরা = মানুষ করে যে
একমাত্রবাহী = একমাত্র (এক অক্ষর) বহে যে
পড়ুয়া = পা চালে যে
ভারবাহী = ভার বহন করে যে
ভাবুক = ভাব করে যে
স্বপ্নকার = স্বপ্ন করে যে
টনকনড়া = টনক নড়ে যাতে
পকেটমার = পকেট মারে যে
মাছিমারা = মাছি মারে যে
ছা-পোষা = ছা-পোষে যে

প্র : অলুক তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে?

উ : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদে বিভক্তি লোপ পায় না। তৎপুরুষ সমাসের যতগুলি শ্রেণি আছে, অলুক তৎপুরুষ তার সবরকম শ্রেণিরই হতে পারে। যেমন :
ঘোড়ার-ডিম = ঘোড়ার ডিম
খসে পড়া = খসে পড়া
ছাঁচে ঢালা = ছাঁচে ঢালা
আইনের প্যাঁচ = আইনের প্যাঁচ
ভাগের-মা = ভাগের মা
সোনার-বাংলা = সোনার বাংলা
সোনার-তরী = সোনার তরী
হাতের-পাঁচ = হাতের পাঁচ
সাপের-পা = সাপের পা
মনের-মানুষ = মনের মানুষ
কলের-গান = কলের গান
হাতে-কাটা = হাতে কাটা
ঘিয়ে-ভাজা = ঘিয়ে ভাজা
চোখের-বালি = চোখের বালি
জলচর = জলে চরে যা
ভূতপেত্নি = ভূত পেত্নি
ভূতের-ভয় = ভূতের ভয়
ভূতের-বেগার = ভূতের বেগার
ভূতের-রাজা = ভূতের রাজা
ভূতের-মুখে-রাম-নাম = ভূতের মুখে রাম নাম
ভূতের-বাপের-শ্রাদ্ধ = ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
ভূতের-নৃত্য = ভূতের নৃত্য
ভূতের-ব্যাগার = ভূতের ব্যাগার
ভূতের-মন্ত্র = ভূতের মন্ত্র
ভূতের-ওঝা = ভূতের ওঝা
ভূতের-গলি = ভূতের গলি
ভূতের-বাড়ি = ভূতের বাড়ি
ভূতের-ভাই = ভূতের ভাই
ভূতের-বাপ = ভূতের বাপ
ভূতের-বাড়ি = ভূতের বাড়ি
ভূতের-ভাই = ভূতের ভাই
ভূতের-বাপ = ভূতের বাপ
ভূতের-বাড়ি = ভূতের বাড়ি
ভূতের-ভাই = ভূতের ভাই
ভূতের-বাপ = ভূতের বাপ

প্র : উপমান কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?

উ : যে কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদে উপমান থাকে, সে সমাসকে প্রায়শ উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন :
প্রভাত = প্রকৃষ্টরূপে ভাত
প্রবেশ = প্রকৃষ্ট মন যার।

প্র : কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ দাও।

উ : দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বা কর্মতৎপুরুষ সমাস
বহুধান = বহুকে ধারণ
শব্দোচ্চারণ = শব্দকে উচ্চারণ
পুরোধা = পুরকে ধারে
অন্নকৃতান্ন = অন্নকে কৃতান্নে
দেশত্যাগ = দেশকে ত্যাগ
পুস্তকপ্রদর্শন = পুস্তককে প্রদর্শন
জলসেচন = জলকে সেচন
চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী
দুঃখাতীত = দুঃখকে অতীত
বিস্ময়াপন্ন = বিস্ময়কে আপন্ন
ব্যক্তিগত = ব্যক্তিকে গত
বিপদাপন্ন = বিপদকে আপন্ন
শরণাগত = শরণকে আগত
বয়ঃপ্রাপ্ত = বয়সকে প্রাপ্ত
পরলোকগত = পরলোকে গত
দুঃখপ্রাপ্ত = দুঃখকে প্রাপ্ত
ক্ষণস্থায়ী = ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী
সংখ্যাতীত = সংখ্যাকে অতীত
চরণাশ্রিত = চরণকে আশ্রিত
চিরশত্রু = চির দিন ধরে শত্রু
নিত্যধারা = নিত্যকাল ব্যাপিয়া ধারা
অর্ধমৃত = অর্ধ রূপে মৃত
দ্রুতগামী = দ্রুত যায় তথা গামী
চিরসুন্দর = চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর।
বেগসংবরণ = বেগকে সংবরণ
স্বর্গপ্রাপ্ত = স্বর্গকে প্রাপ্ত
ভারপ্রাপ্ত = ভারকে প্রাপ্ত
সাহায্যপ্রাপ্ত = সাহায্যকে প্রাপ্ত
কলাবেচা = কলাকে বেচা
হৃদদেখা = হৃদকে দেখা
শোকাতীত = শোককে অতীত
তপবনদর্শন = তপবনকে দর্শন

তৃতীয়া তৎপুরুষ বা করণতৎপুরুষ সমাস
স্বর্ণখচিত = স্বর্ণ দ্বারা খচিত
জ্ঞানপূত = জ্ঞান দ্বারা পূত
সমাবেদনাতুরা = সমাবেদনা নিয়ে যারা
স্বভাবসিদ্ধ = স্বভাব দ্বারা সিদ্ধ
ন্যায়সঙ্গত = ন্যায় দ্বারা সঙ্গত
বাক্‌বিতণ্ডা = বাক্য দ্বারা বিতণ্ডা
মনোহরা = মন দ্বারা হরা
বাগদত্তা = বাক্য দিয়ে দত্তা
বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন
একোন = এক দ্বারা উন
মাতৃহীন = মাতৃ দ্বারা হীন
মধুমাখা = মধু দ্বারা মাখা
কণ্টকাকীর্ণ = কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ
ধনাঢ্য = ধন দ্বারা আঢ্য
শ্রমসক্ত = শ্রম দ্বারা সক্ত
ছায়াশীতল = ছায়া দ্বারা শীতল
হৃতাহুত = হৃত দ্বারা আহুত
বস্ত্রাহৃত = বস্ত্র দ্বারা আহৃত
অস্ত্রোপচার = অস্ত্র দ্বারা উপচার
পদদলিত = পদ দ্বারা দলিত
জলমগ্ন = জল দ্বারা মগ্ন
বিজ্ঞানসম্মত = বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত
ঢেঁকিছাঁটা = ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা
রক্তাক্ত = রক্ত দ্বারা অক্ত

চতুর্থী তৎপুরুষ বা সম্প্রদান/নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস
দেবদত্ত = দেবকে দত্ত
গুরুভক্তি = গুরুকে ভক্তি
বিয়েপাগলা = বিয়ের জন্য (নিমিত্তে) পাগলা
আরামকেদারা = আরামের জন্য কেদারা
শিশুবিভাগ = শিশুদের জন্য বিভাগ
বসন্তবাটি = বসন্তের নিমিত্তে বাটি
মরাকান্না = মরেছে জন্য কান্না (নিমিত্তে)
চোষকাগজ = চুষবার জন্য কাগজ
তপোবন = তপের নিমিত্ত বন
সেচনকলস = সেচনের নিমিত্ত কলস
মাথারকাঁটা = মাথার (চুলের) জন্য কাঁটা।
পাঠশালা = পাঠের জন্য শালা

পঞ্চমী তৎপুরুষ বা অপাদান তৎপুরুষ সমাস
মুখভ্রষ্ট = মুখ থেকে ভ্রষ্ট
দেশপলাতক = দেশ থেকে পলাতক
জন্মান্ধ = জন্ম হতে অন্ধ
সত্যভ্রষ্ট = সত্য হতে ভ্রষ্ট
স্থানভ্রষ্ট = স্থান হতে ভ্রষ্ট
রসশূন্য = রস হতে শূন্য
দেশত্যাগ = দেশ হতে ত্যাগ
জেলমুক্ত = জেল হতে মুক্ত
ঋণমুক্ত = ঋণ হতে মুক্ত
পদচ্যুত = পদ হতে চ্যুত
ঈশ্বরবিমুখ = ঈশ্বর হতে বিমুখ
বিদ্যোৎসাহক = বিদ্যার তরে যোগাই
স্কুলপালানো = স্কুল হতে পালানো
বন্ধনমুক্ত = বন্ধন হতে মুক্ত
স্বর্গচ্যুত = স্বর্গ হতে পড়া
রোগমুক্ত = রোগ হতে মুক্ত
দলছুট = দল থেকে ছুট
স্বর্গদূত = স্বর্গ হতে দূত
প্রাণাধিকার = প্রাণ থেকে উচ্চ
দেশত্যাগ = দেশ হতে ত্যাগ

ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস
খড়কুটো = খড়ের কুটো
বৃক্ষশীর্ষ = বৃক্ষের শীর্ষ
চাষাবাস = চাষের বাসের
কবিযশ = কবিদের যশ
পূর্ণচন্দ্র = আকাশ পূর্ণচন্দ্র
চাঁদমুখ = চাঁদের মুখ
মুক্তোহার = মুক্তোর হার
বনস্পতি = বনের পতি
ফোড়পত্র = ফোড়ের পত্র
কার্যালয় = কার্যের আলয়
গণতন্ত্র = গণের তন্ত্র
মনমধ্যে = মনের মধ্যে
তথ্যপ্রতি = তার প্রতি
জনকণ্ঠ = জনের কণ্ঠ
রাজকন্যা = রাজার কন্যা
রাজপথ = পথের রাজা
অতিথিসৎকার = অতিথির সৎকার
বিদ্যাসাগর = বিদ্যার সাগর (টীকা : বিদ্যা রূপ সাগর : এটি রূপক তৎপুরুষও বটে)
কর্ণকুহর = কর্ণের কুহর
তপস্বীকন্যা = তপস্বীর কন্যা
দূতাবাস = দূতের আবাস
মাঝনদী = নদীর মাঝ
মালগুদাম = মালের গুদাম
প্রাণবধ = প্রাণের বধ
বজ্রসম = বজ্রের সম
কার্যক্ষতি = কার্যের ক্ষতি
ভুজবল = ভুজের বল
স্বাক্ষর্ণ = ভাবের অর্থ

উপলখণ্ড = উপলের খণ্ড
পুষ্পসৌরভ = পুষ্পের সৌরভ
জীবনসঞ্চার = জীবনের সঞ্চার
সন্ধ্যাপ্রদীপ = সন্ধ্যার প্রদীপ
সুখসময় = সুখের সময়
গৃহকর্ত্রী = গৃহের কর্ত্রী
মাতৃসেবা = মাতার সেবা
নাট্যাভিনয় = নাটকের অভিনয়
হাতঘড়ি = হাতের ঘড়ি
মৎপ্রতি = আমার প্রতি
খেয়াঘাট = খেয়ার ঘাট
প্রাগৈতিহাসিক = ঐতিহাসিকের প্রাক্
মনোযোগ = মনের যোগ
পৌরসভা = পৌরদের সভা
প্রজাতন্ত্র = প্রজাদের তন্ত্র
কলাভবন = কলার (Art) ভবন
বিশ্বভারতী = বিশ্বের ভারতী (বিদ্যা)
ফুলকুমারী = ফুলের কুমারী (দ্র. উপমিত কর্মধারয়)

সপ্তমী তৎপুরুষ বা অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস
দিবানিদ্রা = দিবার নিদ্রা
রথারোহণ = রথে আরোহণ
কোটরস্থিত = কোটরে স্থিত
গাছপাকা = গাছে পাকা
দানবীর = দানে বীর
পুথিগত = পুথিতে গত
শ্রুতপূর্ব = পূর্বে শ্রুত
সংখ্যালঘিষ্ঠ = সংখ্যায় লঘিষ্ঠ
তালকানা = তালে কানা
সত্যাগ্রহ = সত্যে আগ্রহ (নিষ্ঠা)
ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত
অশ্রুতপূর্ব = পূর্বে অশ্রুত
অদৃষ্টপূর্ব = পূর্বে অদৃষ্ট।
জলমগ্ন = জলে মগ্ন
অকালপক্ব = অকালে পক্ব
মাথাব্যথা = মাথায় ব্যথা
কর্মনিপুণ = কর্মে নিপুণ
বাকপটু = বাকে পটু
রাতকানা = রাতে কানা

দ্বিগু সমাস

প্র : দ্বিগু সমাস কাকে বলে?
উ : পূর্বপদে সংখ্যাবাচক পদ ও উত্তরপদে বিশেষ্য বাচক পদে যে সমাস হয়। এখানে সমাহার বা সমষ্টি বোঝাবে।

প্র : কয়েকটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ দাও।
উ : যেমন :
চতুরঙ্গ = চার অঙ্গের সমাহার
ত্রিপদী = ত্রি পদের সমাহার
সপ্তাহ = সপ্ত অহের (দিবস) সমাহার
চৌরাস্তা = চৌ (চারি) রাস্তার মিলন
তেমোহনা = তিন মোহনার মিলন
ত্রিকাল = তিন কালের সমাহার
শতাব্দী = শত অব্দের সমাহার
ত্রিফলা = তিন ফলের সমাহার
ত্রিপদী = তিন পদের সমাহার
পসুরি = পাঁচ সেরের সমাহার
নবরত্ন = নব (নয়) রত্নের সমাহার
সপ্তর্ষি = সপ্ত ঋষির সমাহার
ষড়ঋতু = ছয় ঋতুর সমাহার
তেমাথা = তে (তিন) মাথার সমাহার
অষ্টধাতু = অষ্ট ধাতুর সমাহার
তেরনদী = তের নদীর সমাহার
সাতসমুদ্র = সাত সমুদ্রের সমাহার
পঞ্চবটী = পঞ্চ বটের সমাহার
পঞ্চনদ = পঞ্চ নদীর সমাহার
পঞ্চভূত = পঞ্চ ভূতের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানসমূহ) সমাহার

কর্মধারয় সমাস

প্র : কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সঙ্গে বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদের মিলন ঘটে ও পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে। যেমন : সুন্দর যে পুরুষ = সুপুরুষ।
প্র : কর্মধারয় সমাস কত প্রকার, কী কী?
উ : তিন প্রকার। সাধারণ, মধ্যপদলোপী ও উপমামূলক কর্মধারয়।
প্র : উপমামূলক কর্মধারয় সমাস কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। উপমান, উপমিত, রূপক।
প্র : সাধারণ কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : বিশেষণপদ পূর্বে ও বিশেষ্যপদ পরে বসে যে সমাস হয়। যেমন :
মহাজন = মহৎ যে জন
নীলোৎপল = নীল যে উৎপল
সৎলোক = সৎ যে লোক
রক্তকমল = রক্ত যে কমল
চলচ্চিত্র = চলৎ যে চিত্র
পাণ্ডুলিপি = পাণ্ডু (চলনসই) যে লিপি
নবযৌবন = নব যে যৌবন
নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম
সুন্দরলতা = সুন্দরী যে লতা
মহাকীর্তি = মহতী যে কীর্তি
মহানবি = মহান যে নবি
কদর্থ = কু যে অর্থ
কদাচার = কু যে আচার
মহারাজ = মহান যে রাজা
নরাধম = অধম যে নর
আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আলু
প্রিয়সখা = প্রিয় যে সখা
মহাবীর = মহান যে বীর
সুখবর = সু যে খবর
শ্বেতবস্ত্র = শ্বেত যে বস্ত্র
মন্দভাগ্য = মন্দ যে ভাগ্য
প্র : মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : সে সমাসে সমাসবদ্ধ পদটির যে রূপ তাতে ব্যাসবাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক পদগুলি থাকে না। যেমন :
জ্যোৎস্নারাত্র = জ্যোৎস্না শোভিত রাত
রান্নাঘর = রান্না করার ঘর
পলান্ন = পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন
মৌমাছি = মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি
জাদুঘর = জাদু (Magic) পরিপূর্ণ ঘর
প্রীতিভোজ = প্রীতি উপলক্ষে ভোজ
সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন
আত্মজীবনী = আত্মলিখিত জীবনী
প্রাণভয় = প্রাণ যাওয়ার তরে ভয়
ভিক্ষান্ন = ভিক্ষা লব্ধ অন্ন
ধর্মকার্য = ধর্মবিহিত কার্য
এণাক্ষি = এণর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি
একবিংশতি = এক অধিক বিংশতি
বৌভাত = বৌ পরিবেশন করা ভাত
রেলগাড়ি = রেলের উপর চলে যে গাড়ি
রাষ্ট্রনীতি = রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি
আয়কর = আয়ের উপর কর
চিনিকল = চিনি নির্মাণের কল
হস্তশিল্প = হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প
গোষ্পদ = গো (ক্ষুরের) পরিমিত পদ (স্থান)
তুফানমেল = তুফান তুল্য গতিশীল যে মেল
একাদশ = এক অধিক দশ।
জীবনবিমা = জীবন নাশের আশঙ্কায় যে বিমা
হাতপাখা = হাতে চালানো পাখা
আক্কেলদাঁত = আক্কেলসূচক দাঁত
আত্মস্বাতন্ত্র্য = আত্মবিষয়ে যে স্বাতন্ত্র্য
কার্যপরিকল্পনা = কার্যসাধনের জন্য যে পরিকল্পনা
সাহিত্যসভা = সাহিত্য বিষয়ক সভা
স্মৃতিসৌধ = স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ
মোমবাতি = মোমনির্মিত বাতি
ঘরজামাই = ঘরে আশ্রিত জামাই
মানিব্যাগ = মানি (টাকা) রাখার ব্যাগ
গীতিনাট্য = গীতিপূর্ণ যে নাট্য
ঘোষণাপত্র = ঘোষণা সম্বলিত যে পত্র
প্র : উপমান উপমেয় কাকে বলে?
উ : যার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান, যাকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয় বলে। একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য উপমান ও উপমেয়র মধ্যে কল্পনা করা হয়। আর উপমান ও উপমেয়র মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে একটি সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যেমন:
নরসিংহ = নর সিংহের ন্যায় (বলশালী)
এখানে নর> উপমেয়; সিংহ > উপমান;
ন্যায়> সাদৃশ্যবাচক শব্দ;
বলশালী (উহ্য আছে) > সাধারণ ধর্ম।
প্র : উপমান কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমা বাচক পদের যে সমাস হয়। যার সঙ্গে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে। যেমন :
কুন্দশুভ্র = কুন্দের মতো শুভ্র
ফুটিফাটা = ফুটির মতো ফাটা
তুষারশুভ্র = তুষারের ন্যায় শুভ্র
ঘনশ্যাম = ঘনের (মেঘের) ন্যায় শ্যাম
বকধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক
হরিণচপল = হরিণের ন্যায় চপল
গজমূর্খ = গজের ন্যায় মূর্খ
কুসুমকোমল = কুসুমের ন্যায় কোমল
অরুণরাঙা = অরুণের ন্যায় রাঙা
বিড়ালতপস্বী = বিড়ালের ন্যায় তপস্বী
কাজলকালো = কাজলের ন্যায় কালো
তুষারধবল = তুষারের ন্যায় ধবল
বজ্রকঠোর = বজ্রের ন্যায় কঠোর
প্রস্তরকঠিন = প্রস্তরের ন্যায় কঠিন
অগ্নিশর্মা = অগ্নির ন্যায় শর্মা

হিমশীতল = হিমের ন্যায় শীতল
শপব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত
নবনীতকোমল = নবনীতের (নবনি) ন্যায় কোমল
গোবেচারী = গো-র ন্যায় বেচারী
তমাললতা = তমালের (কালো বা ছায়াদানকারী অর্থে) লতা
মিশকালো = মিশির (গোড়া তামাক) মতো কালো।

প্র : উপমিত কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : সাধারণ পদের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সঙ্গে উপমানের যে সমাস হয় তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন :
চরণকমল = চরণ কমলের ন্যায়
পুরুষসিংহ = পুরুষ সিংহের ন্যায়
অধরপল্লব = অধর পল্লবের ন্যায়
চরণপদ্ম = চরণ পদ্মের ন্যায়
মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়
কথামৃত = কথা অমৃতের ন্যায়
নয়নপদ্ম = নয়ন পদ্মের ন্যায়
করকমল = কর কমলের ন্যায়
বীরসিংহ = বীর সিংহের ন্যায়
বাহুলতা = বাহু লতার ন্যায়
নরসিংহ = নর সিংহের ন্যায়
করপল্লব = কর পল্লবের ন্যায়
পাদপদ্ম = পাদ পদ্মের ন্যায়।
ফুলকুমারী = কুমারী ফুলের ন্যায়
(দ্র. ষষ্ঠী তৎপুরুষ)

প্র : রূপক কর্মধারয় সমাস কাকে বলে?
উ : যেখানে উপমেয় ও উপমান পদে সমাস হয় এবং উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয়। এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, রূপক কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদটি সাধারণত কোনো বস্তু হয় না, হয় কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অবস্তু। পূর্বপদের সেই বিমূর্ততাকে পরপদের বস্তুর সঙ্গে একমানে তুলনা করা হয় রূপক কর্মধারয় সমাসে। যেমন :
বিদ্যাধন = বিদ্যা রূপ ধন
চন্দ্রমুখ = চন্দ্র রূপ মুখ
মনমাঝি = মন রূপ মাঝি
বিষাদসিন্ধু = বিষাদ রূপ সিন্ধু
ক্রোধানল = ক্রোধ রূপ অনল
সংসারসাগর = সংসার রূপ সাগর
হৃদয়মন্দির = হৃদয় রূপ মন্দির
আনন্দসাগর = আনন্দ রূপ সাগর
ভবনদী = ভব (বিশ্বসৃষ্টি) রূপ নদী
পরানপাখি = পরান রূপ পাখি
চিত্তচকোর = চিত্ত রূপ চকোর
আকাশগাঙ = আকাশ রূপ গাঙ
যৌবনবন = যৌবন রূপ বন
ক্ষুধানল = ক্ষুধা রূপ অনল
জীবনপ্রদীপ = জীবন রূপ প্রদীপ
শোকসাগর = শোক রূপ সাগর
বিদ্যাসাগর = বিদ্যা রূপ সাগর (টীকা : বিদ্যার সাগর : এটি ষষ্ঠী তৎপুরুষও বটে।)
শোকানল = শোক রূপ অনল
সুখসাগর = সুখ রূপ সাগর
জ্ঞানবৃক্ষ = জ্ঞান রূপ বৃক্ষ
মোহনিদ্রা = মোহ রূপ নিদ্রা
দেহপিঞ্জর = দেহ রূপ পিঞ্জর
জীবনস্রোত = জীবন রূপ স্রোত
জীবনতরী = জীবন রূপ তরী

প্র : চন্দ্রমুখ, চাঁদমুখ, মুখচন্দ্র এই সমার্থক তিনটির সমাস নিয়ে বিভ্রান্তি দূর কর।
উ : চন্দ্র শব্দের তদ্ভব রূপ চাঁদ। অর্থাৎ যা চন্দ্রমুখ, তা-ই চাঁদমুখ। চাঁদমুখ / চন্দ্রমুখ রূপক কর্মধারয় এবং মুখচন্দ্র উপমিত কর্মধারয় সমাস। 'চন্দ্রমুখ'-এ চন্দ্র বা চাঁদের সৌন্দর্যের (অবস্তু) সঙ্গে মুখের (বস্তু) সৌন্দর্যের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। চাঁদের আকারের সঙ্গে (অবশ্য চাঁদের আকার পৃথিবী থেকে কাস্তে, অর্ধবৃত্ত, গোল ইত্যাদি নানারূপ দেখা যায়।) তুলনা করা হয় নি। অন্যদিকে 'মুখচন্দ্র' বলতে 'মুখ চন্দ্রের ন্যায়' সুন্দর বোঝায়। এখানে চন্দ্র সৌন্দর্যের (বিশেষ্য) প্রতীক। গোল বা কাস্তের আকৃতি এখানে বোঝানো হচ্ছে না। অনেক গ্রন্থে 'মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়' 'চাঁদমুখ = চাঁদের ন্যায় মুখ' লিখে উভয়ই উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : হরলাল রায় : 'উচ্চতর ব্যাকরণ ও ভাষা')। কিন্তু এ দুটো তো এক হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ঘোষ রচিত 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণে' (১৯৪০) সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'চন্দ্রমুখ' রূপক কর্মধারয় সমাস। তিনি বরং 'মুখচন্দ্র' কে ব্যবহার ভেদে উপমিতের সঙ্গে রূপকও বলেছেন। তাঁর উল্লেখকৃত উদ্ধৃতিটি এ রকম: 'রমণী যে মুখচন্দ্র (উপমিত) দর্পণে দেখিয়া একটু হাসিল, তাহার সেই মুখচন্দ্র (রূপক) আমার হৃদয়ের গভীর অন্ধকার বিদূরিত করিল।'

দ্বন্দ্ব সমাস

প্র : দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে সমাসে দুই বা বহুপদ মিলে এক পদ এবং প্রত্যেক পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : জাতা ও পতি = জাতাপতি > জম্পতি > দম্পতি।

প্র : দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখ।
উ : ১. দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্ত পদে প্রত্যেক বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন : সাত-সতের, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
২. সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা স্ত্রীবাচক পদ পূর্বে বসে। যেমন : শিক্ষক-ছাত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারী, মা-বাবা ইত্যাদি।
৩. দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর এই তিনটিমাত্র অব্যয়পদ ব্যবহার হয়। যেমন : আয় ও ব্যয়; ভাল এবং মন্দ; চা আর বিস্কুট।

প্র : সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : বাংলা ভাষায় বহু যুগ্মশব্দ প্রচলিত আছে। এগুলো সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : জন-মানব, কাজ-কর্ম, লজ্জা-শরম, নাম-ডাক, খাতা-পত্র, হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার ইত্যাদি।

প্র : অলুক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি সমস্তপদে অক্ষুণ্ন থাকে, লোপ পায় না। যেমন : কলে-কারখানায়; দেশে-বিদেশে; নয়ে-ছয়ে, হাতে-কলমে, জলে-স্থলে, দুধে-ভাতে ইত্যাদি।

প্র : বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : তিন বা তার বেশি পদের সমন্বয়ে সমাস সংঘটিত হলে। যেমন :
কায়মনোবাক্য = কায় ও মন ও বাক্য
সাহেববিবিগোলাম = সাহেব ও বিবি ও গোলাম
ইটসুরকিচুনকাঠ = ইট ও সুরকি ও চুন ও কাঠ।

প্র : বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদের মধ্যে আপাত বিরোধ আছে বলে মনে হয়। যেমন: আকাশ-পাতাল, দা-কুমড়ো, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।

প্র : মিলনার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদের মধ্যে আপাত বিরোধ থাকে। যেমন : কুড়ি-চিল্লি, চাল-চিলা, মা-বাবা, মাটি-দিশি ইত্যাদি।

প্র : বিশেষার্থক দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্ব ও পরপদ আলাদা বিশেষার্থক পদ হয়ে। যেমন : লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়, ছোট-বড় ইত্যাদি।

প্র : উপরে উল্লেখকৃত বৈশিষ্ট্যের আলো আর কত রকমের দ্বন্দ্ব সমাস হতে পারে?
উ : অসমার্থক শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : নাক-কান, মাথা-মুণ্ড)। সংখ্যাবাচক শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : সাত-সতের, নয়-ছয়)। সমার্থ বা প্রায় সমার্থক শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : মাথা-মাথা, ধুতি-চাদর)। শুধু সর্বনাম সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : যথা-তথা, এখানে-সেখানে)। শুধু ক্রিয়াপদ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : দেবা-পেলা, ধরা-মেরা)। শুধু ক্রিয়া-বিশেষণ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : আগে-পাছে, ধীরে-সুস্থে)। ধ্বনি বোঝা শব্দ সহযোগে দ্বন্দ্ব সমাস (যেমন : রোজ-রূপা, রাত-দিন)।

প্র : বিশেষ্য এবং বিশেষণ স্থানীয় দ্বন্দ্ব সমাস কী?
উ : পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই বিশেষ্য হলে বিশেষ্য স্থানীয় আর বিশেষণ হলে বিশেষণ স্থানীয় দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: বিশেষ্য স্থানীয় : মাবাবা > মা ও বাবা; আদিমধ্যান্ত > আদি ও মধ্য ও অন্ত। বিশেষণ স্থানীয় : শীতোষ্ণ > শীত ও উষ্ণ; নরমগরম > নরম ও গরম। আসলনকল > আসল ও নকল; ভালোমন্দ > ভালো ও মন্দ।

প্র : একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
উ : যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্তপদ একটি একক শব্দ হিসেবে দেখা দেয়; যে সমস্তপদে ব্যাস বাক্যের একাধিক শব্দ একপদে যুক্ত থাকে; যে সমাসের সমস্তপদ সর্বদা বহুবচন হয় (একবচন নয়), তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। একশেষে ব্যাসবাক্যে 'সমাহার' হবে না। বাংলায় এর উদাহরণ বেশি নেই, সংস্কৃতে প্রচুর। যেমন : নরশ্চ নরশ্চ নরশ্চ = নরাঃ (মানুষ মানুষ মানুষ = বহুমানুষ) আবার নরশ্চ নরশ্চ = নরৌ (মানুষ মানুষ = দুজন মানুষ)। এখানে নরাঃ বা নরৌ একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস। বাংলায় 'আমরা'কে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা

যায় (যে পূর্ব আর্য = আগে)। অবশ্য 'অনবচ্ছে বিদ্যাসাগরের অনুকরণে করা হয়। (ট্রেইন : ভিন্ন সমাস)

বহুব্রীহি সমাস

প্র : বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে?

উ : যে সমাসে পূর্ব বা পর পদ কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে তদ্ভিন্ন কোনো তৃতীয় অর্থ প্রকাশ করে, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

প্র : বহুব্রীহি শব্দটি কোন সমাস?

উ : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার > বহুব্রীহি সমাস।

প্র : কয়েকটি উদাহরণসহ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ দাও।

উ : দশানন = দশ আনন যার
মহাত্মা = মহান আত্মা যার
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান
বিপত্নীক = বিগত পত্নী যার
উর্ধ্বনাচ = উর্ধ্ব নাচিতে যার
যুবজানি = যুবতী জায়া যার
চন্দ্রচূড় = চন্দ্র চূড়ায় যার
সহকর্মী = সমান কর্মী যে
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা
মৎস্যগন্ধা = মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার
পদ্মগন্ধি = পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার
নীলবসনা = নীল বসন যার
স্থিরপ্রতিজ্ঞ = স্থিরপ্রতিজ্ঞ যার
সবান্ধব = বান্ধবসহ বর্তমান
নদীমাতৃক = নদী মাতা (মাতৃ) যার
কমলাক্ষ = কমলের ন্যায় অক্ষি যার
পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার
বিশ্বামিত্র = বিশ্ব মিত্র যার
সমবর্ণ = সমান বর্ণ যার
আটপৌরে = আট প্রহরের উপযুক্ত
সতীর্থ = সমান তীর্থ যার
অপত্য = পত্য নাই যার
সবেগ = বেগের সঙ্গে বর্তমান
নির্মল = নাই মল (দোষ) যাতে
নীলাম্বর = নীল অম্বর যার
বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার
শূলপাণি = শূল পাণিতে যার
হতভাগা = হত ভাগ্য যার
গৌরাঙ্গ = গৌর অঙ্গ যার
রাশভারি = রাশ ভারি যার
সজল = জলের সহিত বর্তমান
বিচিত্রকর্মা = বিচিত্র কর্ম যার
সমুখীন = সম্মুখ [হাত] বিশিষ্ট যার
চতুষ্পদ = চার পা বিশিষ্ট প্রাণী
সমানন = সম উনর হাতের বা সমান উনর হলের

প্র : বহুব্রীহি সমাস কত প্রকার ও কী কী?

উ : নয় প্রকার। যথা : সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, মধ্যপদলোপী, নঞর্থক, সহার্থক, প্রত্যয়ান্ত, সংখ্যাবাচক ও অলুক বহুব্রীহি। তবে নিষ্পাঠনে সিদ্ধ বলে আর একপ্রকার বহুব্রীহি সমাস আছে।

প্র : সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে বিশেষণ ও পরপদে বিশেষ্য থাকে। যেমন :
হৃতসর্বস্ব = হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার
খোশমেজাজ = খোশ মেজাজ যার
হৃতশ্রী = হৃত হয়েছে শ্রী যার
নীলকণ্ঠ = নীল কণ্ঠ যার
পক্বকেশ = পক্ব কেশ যার।

প্র : ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদ কোনোটিই সাধারণত বিশেষণ নয় (অন্যপদ)। যেমন :
আশীবিষ = আশীতে বিষ যার
বজ্রদেহ = বজ্রতে দেহ যার
বীণাপাণি = বীণা পাণিতে যার
পরনাভ = পর নাভিতে যার
কথাসর্বস্ব = কথা সর্বস্ব যার
বোঁটাকাটা = বোঁটা কেটেছে যার
দুকানকাটা = দুই কান কাটা যার
হাপোষা = ঘা পোষা যার।

প্র : ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়া করা বোঝালে এ সমাস হয়। এতে পূর্বপদে আ এবং উত্তরপদে ই যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন:
ঘুষাঘুষি = ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই
কানাকানি = কানে কানে যে কথা
লাঠালাঠি = লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ
কেশাকেশি = কেশে কেশে ধরে যে যুদ্ধ
দেখাদেখি = দেখাদেখি যে ক্রিয়া
হাসাহাসি = হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : মধ্যপদের সঙ্গে বিশেষ্যের যে সমাস হয় তাই মধ্য বহুব্রীহি সমাস। যেমন :
বেওয়ারিশ = যে (নাই) ওয়ারিশ যার
বেকার = যে (নাই) কাজ যার
নিঃশব্দ = নাই শব্দ যার
নিষ্কলঙ্ক = নাই কলঙ্ক যার
বিপত্নীক = বিগত পত্নী যার
বেকার = কর্ম নাই যার
নিরক্ষর = অক্ষরজ্ঞান নেই যার
অজানা = না (নয়) জানা যা।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাস ন্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত কোনো পদকে লোপ করে বা গ্রহণ না করেই তৈরি হয়। যেমন :
দশবছরে = দশ বছর বয়স যার
কমলাক্ষ = কমলের মতো অক্ষি যার
বিড়ালচোখী = বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যে নারীর
কাঞ্চনপ্রভ = কাঞ্চন বা সোনার মতো প্রভা যার
শূর্পণখা = শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর।

প্র : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাসের আর দুটো নাম কী?

উ : উপমাগর্ভ বহুব্রীহি ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি।

প্র : প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত হয়। যেমন :
দোটানা = দুই দিকে টান যার
নিখরচে = নেই খরচ যার
অকেজো = কোনো কাজে লাগে না যা
ঘরমুখো = ঘরের দিকে মুখ যার
দোমনা = দুই দিকে মন যার।

প্র : সহার্থক বহুব্রীহি কী?

উ : অনেকে বহুব্রীহি সমাসের আর এক প্রকারকে মান্য করেন। তাদের বিবেচনায় সহার্থক পূর্বপদের সঙ্গে বিশেষ্য উত্তরপদের বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হলে তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলা হয়। যেমন :
সর্বশস্য = শস্যের সহিত বর্তমান
সকর্মক = কর্মের সহিত বর্তমান
সবান্ধব = বান্ধবের সহিত বর্তমান
সঙ্গিত = ক্রিয়ার সহিত বর্তমান
সজল = জলের সহিত বর্তমান

প্র : অলুক বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : বহুব্রীহির সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি থাকলে এবং কোনো পদের পরিবর্তন না হলে অলুক বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন :
মাথাপাগলা = মাথায় পাগলা যার
গলাধাক্কা = গলায় ধাক্কা যার
দুধেভাত = দুধে ভাত (শিশুকে) দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
হাতেখড়ি = হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
গায়েহলুদ = গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে।
(নোট : মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্য খ্যাতিমান বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে 'গায়েহলুদ'কে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস দেখানো হয়েছে। এটা ঠিক নয়।)

প্র : সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য। যেমন :
দশানন = দশ আনন (মুখ) যার
দশভুজা = দশ ভুজ (হাত) যার
দোনলা = দুটি নল যার
সহস্রলোচন = সহস্র লোচন যার
দশগজি = দশ গজ পরিমাণ যা
চৌচালা = চার চাল যে ঘরের
সেতার = সে (তিন) তার যে যন্ত্রের
চারহাতি = চার হাত পরিমাণ যা
তেপায়া = তিন পা বিশিষ্ট যা।

প্র : নিষ্পাঠনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : কোনো নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না, অথচ বহুব্রীহি সমাস বলে ধরা। যেমন :
সুহৃদ = সু (শোভন) হৃদয় যার
নিষ্কপাট = নিঃ (নাই) উপায় যার
বেহায়া = হায়া নাই যার
বেপরোয়া = নাই পরোয়া যার
দ্বীপ = দুই দিকে জল যার

অন্তর্দীপ = অন্তর্গত জল যার
জীবন্মৃত = জীবিত থেকেও যে মৃত
পণ্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত হয়েও মূর্খ।

অন্যান্য সমাস আলোচনা

প্র : অলুক সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে সমাসে কখনো পূর্বপদে বিভক্তি লোপ হয় না। অলুক সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়, যে কোনো শ্রেণির সমাস অলুক হতে পারে। যেমন :
যুধিষ্ঠির = যুদ্ধে স্থির যে
তেলেভাজা = তেলে ভাজা যা
পরস্পর = পর হতে পর।

প্র : নিত্য সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : যে সমস্ত সমসমান পদগুলো সবসময় একসঙ্গে থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। নিত্য সমাস কোনো স্বতন্ত্র সমাস নয়। ব্যাসবাক্য না থাকলে অন্য শ্রেণির সমাসকেও নিত্য সমাস বলে। যেমন : কাঁচাকলা (ব্যাসবাক্য : এক বয়সের কলা যা কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া হয়): গ্রামান্তর = অন্যগ্রাম:
কৃষ্ণসর্প = এক জাতীয় সাপ যা কৃষ্ণ (কালো):
গৃহান্তর = অন্যগৃহ:
দর্শনমাত্র = কেবল দর্শন:
কালনাগ = বিষাক্ত কাল (যম) তুল্য সাপ:
বিরানব্বই = দুই এবং নব্বই:
আমরা = সে তুমি ও আমি ('আমরা' একশেষ দ্বন্দ্বসমাসও হয়)।

প্র : প্রাদি সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : প্র, পরা ইত্যাদি উপসর্গ পূর্বপদে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়। প্র+আদি = প্রাদি। অব্যয়ীভাব সমাস ও প্রাদি সমাস এক পর্যায়ভুক্ত। ব্যাসবাক্য নেই বলে প্রাদি সমাসকে নিত্য সমাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন :
অনুতাপ = অনু (পশ্চাৎ) তাপ
উদ্বেল = উৎ (উৎক্রান্ত) বেলা।

প্র : সুপ্‌সুপা সমাস কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উ : এই সমাস বাংলা নয়, সংস্কৃতে আলোচ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত শব্দের সুবন্ত পদ বলে। একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে আর একটি সুবন্ত পদের যে সমাস হয় অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের যে সমাস হয় তাকে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা সমাস বলে। বাংলায় তৎপুরুষ বা কর্মধারয় পর্যায়ের কিছু ধরনের সমাস আলোচিত হয়। যেমন
ভূতপূর্ব > পূর্বে ভূত:
পূর্বগত > পূর্বে গত:
প্রত্যক্ষদৃষ্ট > প্রত্যকে দৃষ্ট।

প্র : ছন্দবেশী সমাস কাকে বলে?

উ : প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'ছন্দবেশী সমাস' বলে বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত কিছু নেই। সমাসের কোনো কোনো সমস্তপদ অতি ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততর হয়ে পড়ে। তখন তাদের চেনাই কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্তপদের সমাসকে ছন্দবেশী সমাস বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ ('এগুলোকে ছন্দবেশী সমাস বলতে ইচ্ছে করে।'–জ্যোতিভূষণ চাকী)। উদাহরণ : অঘ্রান, বাসর, আমানি, পোলাও।
অঘ্রান এসেছে অঘ্রহায়ণ (হায়নের অঘ্র : ষষ্ঠী তৎপুরুষ) থেকে:
বাসর এসেছে বাসগৃহ (বাসের জন্য গৃহ : নিমিত্তার্থে চতুর্থী) থেকে:
আমানি এসেছে অম্লান্ন-(অম্ল মিশ্রিত যে অন্ন : মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) থেকে:
পোলাও এসেছে পলান্ন (পল মিশ্রিত যে অন্ন : মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) থেকে।
এগুলো পৃথক পৃথক সমাস হলেও এ জাতীয় সমস্তপদ বিশিষ্ট সমাসকে ছন্দবেশী সমাস বলা হয়েছে।

প্র : একই পদের বিভিন্ন সমাস হতে পারে; উদাহরণ?

উ : পীতাম্বর (কৃষ্ণ অর্থে) > পীত অম্বর যাঁর (বহুব্রীহি) কিন্তু পীতাম্বর (পীতবর্ণ বস্ত্র অর্থে) > পীত যে অম্বর (কর্মধারয়)।
গরমিল > মিল নেই যাতে (বহুব্রীহি) কিন্তু গরমিল > মিলের অভাব (নঞ তৎপুরুষ / অব্যয়ীভাব)।
আমরা > একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস ও নিত্য সমাস উভয়েরই উদাহরণ।

Partho Kumar Hira
Dept of EEE
Varendra University.

প্র : শব্দ কী?

উ : কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে যা কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে তার যদি কোন নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে শব্দ বলে। শব্দ হচ্ছে ভাষার প্রাণ।

প্র : শব্দ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তা কী?

উ : আধুনিক চিন্তা থেকে বলা যায়, শব্দ একটি ধারণা বা ইমেজ। শব্দ মানুষের মনোজগতে পৃথক পৃথক ইমেজ সৃষ্টি করে। যেমন : 'লোকটি ফ্লুরে ছটফট করছে।' এই বাক্যটি বললে যে-কোনো বাঙালি বুঝবেন যে, একটি মানুষ একটি নির্দিষ্ট অসুস্থতায় এখনো কাতরাচ্ছে। প্রতিটি বঙ্গভাষী এর একই অর্থ বুঝবেন। কেউ কিন্তু মনে করবেন না যে, কোনো সাপ বা কোনো বাঘ ঘুমিয়ে আছে বা অন্য কিছু। অর্থাৎ 'লোক' বললে 'মানুষ' কল্পনায় আসবে, কোনো সাপ, গাছ, মাছ, বাঘ ইত্যাদি নয়। অনুরূপভাবে 'ফ্লু' বললে একটি নির্দিষ্ট রোগই বোঝাবে অন্য কিছু নয়। অতএব, শব্দ হলো আইডিয়া বা মানুষের জ্ঞানরাজ্য বা অভিজ্ঞতায় বিস্তৃত। শব্দই ব্রহ্ম- সংস্কৃত পণ্ডিতদের এই বক্তব্যের সঙ্গে আধুনিক 'ওয়ার্ড ইজ আইডিয়া'র মিল পাওয়া যায়।

প্র : সর্বজনীন শব্দ বলে কি কিছু আছে?

উ : পাঁচটি মহাদেশে ব্যবহৃত হয় এমন একটি শব্দের খোঁজ পেয়েছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, নেদারল্যান্ডসের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইন্সটিটিউট ফর সাইকোলিঙ্গুইস্টিকসের বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, উচ্চারণে সামান্য একটু হেরফের হলেও এ রকম একটি শব্দ তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। এটিকে আসলে শব্দ না বলে বরং ধ্বনি বলাই ভালো। সেটি হলো 'হাহ্' (ইংরেজি বানানে এইচইউএইচ)। কখনো প্রশ্নবোধক, কখনো-বা অনিশ্চয়তাসূচক এই ধ্বনিটিই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করে বলে দাবি করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর অর্থ

অনেকটাই 'হাহ্' বা-এর মতো। এই ধ্বনিকণার আর যে উৎসের সন্ধান আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক পরে পাওয়া গেছে সেখানে আমরা আগেকার কোনো প্রাথমিকভাবে মেনে চলার প্রবণতা আছে বলে মনে করে, সেখানে এই বিশেষজ্ঞরা বলছেন- সর্বজনীন নির্ভরযোগ্য সবচেয়ে উচ্চারণে 'হাহ্' সার্বজনীন উচ্চারণ 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' অনুসারে এই ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, না বা অনুরূপ শব্দ ব্যবহারে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্নতা আছে, পিতা বা পাপা শব্দেও সেই ভিন্নতা লক্ষণীয়। কিন্তু 'হাহ্'-এর ব্যবহারে বিশ্বব্যাপী ভিন্নতা অনেক কম। তাই একে সর্বজনীন শব্দ বলাই যায়।

প্র : শব্দ গঠনের উপায়সমূহ দেখ।

উ : মৌলিক শব্দ বাংলা ভাষা কেন, যে-কোনো ভাষাতেই অপেক্ষাকৃত কম। যে-কোনো ভাষার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন উপায়ে শব্দ গঠনের মাধ্যমে। বাংলা ভাষাতেও সে-রকম ঘটে। নিম্নে বাংলা শব্দ গঠনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো :

১. সন্ধির মাধ্যমে : হিম + আলয় = হিমালয়
২. সমাসের মাধ্যমে : জায়া ও পতি = দম্পতি
৩. বহুবচনের মাধ্যমে : (গ্রন্থ থেকে) গ্রন্থাবলি
৪. বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে : লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
৫. পদ-পরিবর্তনের মাধ্যমে : সুন্দর > সৌন্দর্য
৬. উপসর্গ সহযোগে : দুর্ + অবস্থা = দুরবস্থা
৭. প্রত্যয় সহযোগে : ঘর + আমি = ঘরামি
৮. দ্বিরুক্তি শব্দের সহায়তায় : টক্ টক্, খান্ খান্

শব্দ : উৎপত্তিগত দিক

প্র : উৎপত্তিগত দিক থেকে বাংলা ভাষার শব্দরাজি প্রধানতঃ কয়ভাগে বিভক্ত?

উ : পাঁচ ভাগে। যথা। তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি।

প্র : বাংলা ভাষার শব্দরাজি নিয়ে অন্য মতগুলো কী?

উ : বাংলা ভাষায় কত প্রকার শব্দ আছে, এ সম্পর্কে এক শতাব্দী আগে বলা হতো, এই ভাষায় চার প্রকার শব্দ আছে। ব্যাকরণবিদ জগদীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ' (১৯৪০) গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি শব্দের সমন্বয়ে বর্তমানের বাংলা ভাষা। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ইব্রাহিম খলিল, কাজী দীন মুহম্মদ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী তাঁদের যৌথভাবে রচিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে প্রথাগত পাঁচ প্রকার শব্দের সঙ্গে আরও এক প্রকার শব্দের কথা বলেছেন এবং সেটা হলো 'মিশ্রশব্দ'। উদাহরণ দিয়েছেন : হেডপণ্ডিত (ইংরেজি+সংস্কৃত), হেডমৌলবি (ইংরেজি+আরবি) ইত্যাদি।

প্র : বাংলা শব্দভাণ্ডার বা শব্দরাজি নিয়ে আধুনিক মত কী হতে পারে?

উ : বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা মনে করেন, বাংলা ভাষাকে সাবলীল রাখতে এবং এর ব্যাকরণবিধিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বহুদিন আগে তৈরি করা শব্দরাজির এই ভাগসমূহ আজ অচল। কেননা, বাংলা ভাষার প্রায় দুলক্ষ শব্দের মধ্যে কতটি অর্ধতৎসম শব্দ আছে? কোনগুলো? সেগুলো চিহ্নিত করে পৃথক একটি বিভাগ করা ভাষার জন্য কতটা সমীচীন তা ভেবে দেখা দরকার। অন্যদিকে 'মিশ্রশব্দ' শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে কোনো পৃথক ভাগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ, এগুলো শব্দ নয় শব্দবন্ধ। এদের উদ্ভব- ভাষাও এক নয়। এগুলো অনেকটা শব্দবন্ধ সমাসের মতো। সাতসমুদ্র, চন্দ্রমুখ, বসতবাড়ি ইত্যাদি যেমন শব্দবন্ধ, হেডপণ্ডিত বা হাফহাতাও তেমনি। এগুলো বন্ধনমুক্ত করে বিশ্লেষণ করলেই এই শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। অর্ধ শতাব্দী আগে ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত বাংলা অভিধান অবলম্বনে হিসেব করে জানিয়েছিলেন যে, বাংলা ভাষায় ৬৯% তৎসম, ৪.৫৫% বিদেশি, ৫১.৪৫% দেশি ও অন্যান্য শব্দ রয়েছে। অবশ্য শতভাগ এই হিসেবটি সামান্য কম-বেশি হতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বাংলা শব্দভাইমবারে কয় প্রকার শব্দ আছে তার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এখানে দিয়েছেন। সেই ইঙ্গিতানুসারে বলতে পারি :

১. তৎসম
২. বিদেশি
৩. নিজস্ব (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি)

এই তিন প্রকার শব্দ নিয়ে আজকের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার গঠিত। এভাবে শব্দের উৎপত্তিগত শ্রেণিবিন্যাস করা হলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। আজকের ব্যাকরণবিদদের এ বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

প্র : উৎপত্তিগত দিক থেকে শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি সম্পর্কে লেখ।

উ : তৎসম : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দাবলি তৎসম শব্দ নামে পরিচিত। যেমন : নক্ষত্র, ক্ষুধা, সূর্য, পক্ষ, ক্ষমা, অন্ন, নিমন্ত্রণ, চন্দ্র, স্বামী, পুত্র, খাদ্য ইত্যাদি।

বিদেশি : বহু বছর আগে থেকে বঙ্গদেশে বিদেশি ভাষার শব্দ প্রবেশ করছে। এই শব্দাবলি এখন বাংলা ভাষার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে আবশ্যক শব্দে পরিণত হয়েছে। যেমন : রিক্সা, চিনি ইত্যাদি।

নিজস্ব শব্দ :

অর্ধতৎসম : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু সংস্কৃত শব্দ বানান ও উচ্চারণ উভয় ক্ষেত্রে আদিরূপ বিচ্যুত হয়েছে। কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত এই সংস্কৃত শব্দাবলিকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যেমন : চর্মকার > চম্মআর।

তদ্ভব : বাংলা শব্দভাণ্ডারের আদি সম্পদ তদ্ভব শব্দ। বলা হয়, সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলায় যেসব শব্দ স্থান করে নিয়েছে

সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : হস্ত > হত্থ > হাত।

দেশি : বাংলাদেশের আদি অধিবাসীদের ভাষার যে শাব্দিক উপাদান একদা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে। যেমন : কুড়ি, চুলা ইত্যাদি।

প্র : তদ্ভব শব্দ সম্পর্কে আধুনিক মত কী?

উ : বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও সরলীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হলে তদ্ভব শব্দ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। সংস্কৃত থেকে বিচ্যুতিপ্রাপ্ত শব্দাবলি প্রাকৃতের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেই তদ্ভব শব্দ হবে- প্রথাগত এই সংজ্ঞার পরিবর্তন আবশ্যক। কেননা, বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ আছে, যেগুলো পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন: মুটই (তামিল শব্দ) > মুটক > মুতঅ > মোট (বোঝা অর্থে)। সুরিংগ্স (গ্রিক)> সুরুঙ্গ > সুরঙ্গ > সুড়ং (মাটির নিচে গর্ত বিশেষ)।

পোত্ত (পাহলবি শব্দ) > পুস্তিকা > পুস্থিঅ > পুথি (বই অর্থে)। মোট কথা: পুথি ইত্যাদিকে তদ্ভব শব্দ হিসেবে ধরা হচ্ছে, যদিও এগুলোর মূলে সংস্কৃত ভাষা নেই। এরকম আরো শব্দ আছে। যদি তাই হয়, তবে ইংরেজি থেকে আগত বক্স > বাক্স, হসপিটাল > হাসপাতাল ইত্যাদি তদ্ভব শব্দ হবে না কেন? এরকম বহু শব্দ পাওয়া যাবে। তাহলে তদ্ভব শব্দের সংজ্ঞার্থ দেওয়া যায় এভাবে : অন্য ভাষার যে শব্দ অর্থ ঠিক রেখে বানান ও উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং একটি নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে তাকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন : হাত, চামার, আফিম, বোতল ইত্যাদি।

প্র : বাংলা ভাষার 'নিজস্ব শব্দ' কাকে বলা হচ্ছে?

উ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম ও বিদেশি শব্দাবলি ছাড়া আর সব শব্দকে 'নিজস্ব' শব্দ বলা হবে। প্রথাগত ব্যাকরণের অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি শব্দাবলি 'নিজস্ব' শব্দভুক্ত। তাছাড়া যে-সব বিদেশি শব্দ বানান ও শব্দবন্ধে যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেগুলোও বাংলার 'নিজস্ব শব্দ' হিসেবে গৃহীত। তাহলে নিজস্ব শব্দ হচ্ছে যে-কোনো ভাষা থেকে আগত শব্দ যা বাংলা ভাষায় এসে নিজস্ব রূপ ধারণ করেছে। এভাবে নিজস্ব শব্দের সংজ্ঞা দিলে এই শব্দগুলো ভাষার শব্দভাণ্ডারে কোন ভাগে পড়বে তা নিয়ে অযথা কাটাকাটির অবসান ঘটবে বলে মনে করি।

প্র : কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 'নিজস্ব শব্দ' উদ্ধৃত কর।

উ : 'নিজস্ব শব্দ' একটি শব্দগুচ্ছ। অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি শব্দ থেকে যে শব্দগুলি এখানে আলোচিত এগুলো তদ্ভব করা হলো :

অর্ধতৎসম :

কৃষ্ণ > কেষ্ট
ক্ষুধা > খিদে
গৃহিণী > গিন্নি
চন্দ্র > চন্দর
জ্যোৎস্না > জ্যোছনা
নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন
পত্র > পত্তর
পুরোহিত > পুরুত
প্রীতি > পিরিতি
বৈষ্ণব > বোষ্টম
মহোৎসব > মোচ্ছব
মিত্র > মিত্তির
সূর্য > সরজ
শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ

তদ্ভব :

তৎসম	অর্ধতৎসম	তদ্ভব
অদ্য >	অজ্জি >	আজে
অন্য >	অজ্জ >	আজ
অর্ধ >	অদ্ধ >	আদে
ইন্দ্রাণী >	ইন্দ্রাঅর >	ইন্দাণী
উপাধ্যায় >	উবজ্ঝায় >	ওঝা
উদ্ঘাপন >	উন্দাবন >	উজান
করোতি >	করোই >	করে
কথয়তি >	কহই >	কহে
কফোনিকা >	কহোনিআ >	কনুই
ক্রীণাতি >	কিনই >	কিনে

কার্য >	কজ্জ >	কাজ
গৃহ >	ঘর >	ঘর
চক্র >	চক্ক >	চাকা
চর্মকার >	চম্মআর >	চামার
ভূমি >	ভুম্মি >	ভুমি
দোষ >	দুসঅ >	দোষ
মৃত্তিকা >	পত্তিই >	মাটে
চক্ষু >	চাক্খু >	চাক
প্রস্তর >	পত্থর >	পাথর
বৃদ্ধ >	বুড্ঢ >	বুড়া
বর্দ্ধতে >	বড্ঢই >	বাড়ে
বধূ >	বহু >	বৌ
ভক্ত >	ভত্ত >	ভাত
মধ্য >	মজ্ঝ >	মাঝ
মিথ্যা >	মিচ্ছা >	মিছা
লবণ >	লোণ >	নুন / নুন
বহ্নি >	বহ্নি >	বাহা
ষোড়শ >	ষোলহ >	ষোল
সন্ধ্যা >	সঞ্ঝা >	সাঁঝ
ধান্য >	ধঞ্ঞ >	ধান
লগ্ন >	লগ্গ >	লাগ
হস্ত >	হত্থ >	হাত

দেশি :
আড়ং, আলু, কুড়ি, পেট, চুলা, আঁটা, ঝোল, ডিঙা, ডিঙি, কুলা, টোপর, ডাব, ডাগর, টেকি, ঢেউ, টিন, ভাহা, গরু, চোলা ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ থেকে সৃষ্ট শব্দ :
খ্রিষ্ট (Christ)
আফিম (Opium)
বাক্স (Box)
গেলাস (Glass)
হাসপাতাল (Hospital)
লণ্ঠন (Lantern)
বোতল (Bottle)
ফেরি (ঘাট) (Ferry)
লাট (Lord)
গারদ (Guard)
সান্ত্রি (Sentry)
ইংরেজি (English) ইত্যাদি।

(নোট : পর্তুগিজ Engrez ও ফরাসি Anglaisa থেকে এসেছে English. 'ইংরেজি' এর পরিবর্তিত রূপ।)

প্র : বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ কিভাবে এসেছে?

উ : তিনভাবে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ এসেছে:

১. প্রতিবেশী ভাষার শব্দ স্বাভাবিক প্রবেশ ঘটেছে মানুষের সম্পর্কের মাধ্যমে;

২. বহির্দেশীয়দের বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশীয়দের বহির্দেশে বসতির কারণে বিদেশি শব্দের সমাগম ঘটেছে;

৩. এদেশে বিদেশিদের ক্ষমতা দখল এবং দীর্ঘদিন দেশ শাসনের কারণে তাদের ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কিদের আক্রমণ ও ক্ষমতাদখল থেকে আরম্ভ করে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিতাড়নের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের বাঙালিরা বিদেশি শাসনাধীন ছিলেন। দীর্ঘদিন ব্যবহার করার কারণে বাংলাভাষীরা এই প্রবেশ-সমাগম-অনুপ্রবিষ্ট বিদেশি শব্দাবলি নিজের ভাষার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি শব্দাবলি কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়?

উ : দুইভাগে :
১. ধর্মসংক্রান্ত
২. ধর্ম-বহির্ভূত।

ধর্মসংক্রান্ত বিদেশি শব্দসমূহ নির্দিষ্ট ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করেন না বা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ধর্ম-বহির্ভূত ব্যবহারিক জীবনকেন্দ্রিক বিদেশি শব্দসমূহ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ ব্যবহার করে থাকেন।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ইংরেজি ভিন্ন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি শব্দ লেখ।

উ : জাপানি শব্দ : রিক্সা, হাস্‌নাহেনা, ক্যারাটে, জুডো, হারিকিরি।
চিনা শব্দ : চা, চিনি, সাম্পান, লিচু, লুচি।

ফরাসি শব্দ : ওলন্দাজ, দিনেমার, কাফে, রেস্তরাঁ, আঁতাত, ডিপো, কার্তুজ, কুপন, বুর্জোয়া, রেনেসাঁস।

ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কুপ, তুরুপ, টেক্কা, হরতন, রুইতন, ইস্কাপন।

স্পেনিশ শব্দ : সিয়েস্তা (অর্থ : ঘোর)
গ্রিক শব্দ : ধাম (গ্রাথমে), সেমাই (সেমাদালিম), সুচা (সুবিয়ন), ইউনর্জন (আইওনিয়ন)।
ওজরাটি শব্দ : চরকাল, খদর।

পর্তুগিজ শব্দ : আলপিন, আউকটি, ইস্তেজ, আবান, তোয়ালে, বালতি, নিলাম, আলকাতরা, মার্চা, চাবালা, পেরেক, ক্রশ, পরাত (বৃহৎ থালা), আরাকা, লোনা, গিত, বেহালা, পেঁপে, পাচার, পেয়ারা, পোরাম, আলমারি, মিস্ত্রি, গামলা, ফিতা, সেমিজ, কামিজ, গির্জা, চাবি, পাদ্রি, আনারস, টুপি, বোমা, কেরানি, কামরা, আতা, তামাক, ইস্পাত, আয়া, আচার, পিস্তল, বেহালা, মাস্তুল, মাইরি, ওদাম।

ইতালীয় শব্দ : মাফিয়া।
অস্ট্রেলীয় শব্দ : বুমেরাং, কাঙারু।
মালয় শব্দ : কিবিচ, কাকাতোয়া, আইবা (অর্থ : ওলন্দাজ আতীয় কিছু)।
বর্মি শব্দ : লুঙ্গি, ফুঙ্গি।
মেক্সিকান শব্দ : চকোলেট।
দক্ষিণ আফ্রিকান শব্দ : ভেল্ড।
পেরুর শব্দ : কুইনাইন।
জার্মান ভাষা : নাৎসি।
তামিল : চুরুট বা চুরট।

হিন্দি শব্দ : আগড়ম-বাগড়ম, আচ্ছা, কাহারি, কাহিনি, কুত্তা, খান (খুঁটি অর্থে), খুজলি, খেলনা, গলি, ঘাবড়ানো, ঘুষাঘুষি, চাঁদোয়া, চাচা, চাটনি, চাটা, চাটাই, চানা (চানাচুর), চাপাতি (রুটি বিশেষ), চিড়িয়া, চোট্টা, ছাতি (বুক অর্থে), ছালুন, জায়গা, জিলাপি, ঝাড়া, ঝামেলা, টক্কা, ঠিকানা, ঠক্কর, ঢিলা, তার, দাদা, দাদি, দুলা, ধোলাই, পানি, ফুফা, ফুফি, বড়াই, বেটা, ভরসা, সুজি, ওয়ালা, ছিনতাই, ডেরা, টহল, ডেমরা, ইত্তক।

তুর্কি শব্দ : উজবুক, কোর্মা, তুরুক, তোশক, বন্দুক, বাইজি (মূলশব্দ বাজি), বারুদ, বেগম, সওগাত, তোপ, কাবু, তকমা, কাঁচি, খাতুন, খাঁ, বিবি, মুচলেকা, আলখেল্লা, চাকু, লাশ, বাবা, ঠাকুর, উর্দি, উর্দু, কুলি, কুরনিশ, খোকা, বাবুর্চি।

উর্দু শব্দ : আপ্পু, কলিজা, মামলা, দুশ্চিন্তা (কাঁচা অর্থ), চুরি, কলম, চাকু

পার্সিয় (ফার্সি) শব্দ : আয়না, কাপড়, আজাদ, আফসোস, বাগানো, আমির, আবহাওয়া, আমলনামা, আমলা, ইয়ার, ইয়েমেন, ইসবগুল, কবুতর, কয়দ, কারসাজি, কিমা, কারেন্ট, খরচ, গোলাপ, গেরস্থালি, চাদর, চালাক, চুক্তি, জবর, জরিমানা, জাদুকর, জরিপ, চালাক, জেলখানা, জেরবার, দস্তুর, দরিদ্র, দরদাম, দলিল, দেওয়ান, দোকান, দোকানদার, ধরিয়াদ, বর্ণনা, বরবাদ, বন্দর, বদমাশ, বাজার, বাজারদর, বা, জুমার, পকেট, পলাশ, পালংশাক, পোলাওয়ার, পরওয়ানা, পরিষ্কার, পয়সা, নিখুঁত, নুন, পলিসা, পেরেক, পুরস্কার, ফরমান, ফারসি, ফালাদা, বাহাদুর, ফালতুমার্কা, ফাজলামি, ফালুদা, বিয়ে, ফারসি, জিন্দেগানি, বাদ, খাদ, বিল, বন্দর, পেরেশান, কারবালা, কারসাজি, ভারবহ, বিহারি, বিনামা, বেজা, বুদ্ধি, বেয়াদপ, জবানবন্দি, জেনানা, ফেরেশতাদের, মারেফা, পয়জার, পরি, পরিচ্ছন্ন, পয়জার, পায়োরান, পোশাকি, বুঁচকি, বরখাস্ত, বিমা, মগজ, মজুর, মেহের, মেহেরবান, রোঁদা, লাস্করখানা, লাহাজ, লাহোর, লুঙ্গি, সেতার, হাতেখড়ি, হিজ, হুঁশ, হুঁশিয়ার, খতরনাক, ফৌজদারি।

আরবি শব্দ : অখর, আজগুবি, আসবাব, আদালত, আমদানি, আমলনামা, আরজি, আদায়ি, ইজারা, ইস্তিল, ইমন, ইমারত, ইশারা, ইশতেহার, উকিল, উজির, এখতিয়ার, এতিম, এলাকা, ওয়াকিফ, কদর, কলম, কলম, কলিজা, কুমকুম, কুসুম, খবর, খারাপ, খারাস, খরিদ, জলসা, জেলা, তালিকা, তহবিল, তুফান, তুলকালাম, দালাল, নকল, নকশা, নিকাশ, ফসল, বকেয়া, মফস্বল, মহাজন, মশলা, মসলা, মুনাফা, মুলতবি, মোকাবেলা, লেবাস, লোকসান, শহিদ, দুনিয়া, সবুর, তকলিফ, নকল, তদারক, শতরঞ্জ, আলিয়াতি, মুশকিল, ওয়াকিফ, কবুল, মুহিম, নেয়ামত, মোকাবেলা, মামলা।

তকবির, তকদির, [illegible], শরিফ, হামলা, মহকুমা, মৌলুভি, হারাম, ওজন, হুজুরের, হাওয়া, [illegible], হোটেল, সফর, হাকিম, হাওলা, কানুন, মুসাফির, মুনাফা, [illegible], খেয়াল, মুজরুম, [illegible], জমিন, হাকিম, [illegible], [illegible], আসল, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], খলিফা, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], মৌলবি, [illegible], [illegible], [illegible]।

শব্দ : গঠনগত দিক

প্র : গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দাবলি কয় ভাগে বিভক্ত?
উ : দুইভাগে। মৌলিক ও সাধিত।
প্র : মৌলিক শব্দ কাকে বলে?
উ : যে শব্দকে আর কোনোভাবে বিশ্লেষণ করা বা ভাঙা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। এই শব্দগুলোকে সিদ্ধ শব্দ বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দও বলা হয়। যেমন : মা, লাল, তিন, পা ইত্যাদি।
প্র : সাধিত শব্দ কাকে বলে?
উ : মৌলিক শব্দ ছাড়া অন্য যেকোনো শব্দই সাধিত। একাধিক শব্দের সমাস হয়ে বা ধাতু ও শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ হয়ে যে শব্দ তৈরি হয়, তা-ই সাধিত শব্দ। যেমন : দয়ালু, জমিদার, নাতিদীর্ঘ ইত্যাদি।
প্র : সাধিত শব্দ কীভাবে গঠিত হয়?
উ : সাধারণত প্রত্যয়যোগে ও সমাসবদ্ধ হয়ে। যেমন :
প্রত্যয়যোগে>সরস্ + বতী = সরস্বতী
সমাসবদ্ধ হয়ে>পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন (শিবকে বোঝায়)।

শব্দ : অর্থগত দিক

প্র : অর্থগত বিচারে বাংলা শব্দ কয়ভাগে বিভক্ত?
উ : তিনভাগে। যথা : যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ।
প্র : যৌগিক শব্দ কাকে বলে?
উ : যে সব সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে মিল রয়েছে, তথা, এ শব্দগুলো প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে হয়। নবগঠিত শব্দটির প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের কোনো বিকৃতি হয় না। যেমন :
নায়ক > নৈ + অক
নয়ন > নে + অন
শয়ন > শে + অন
বাঁদরামি > বাঁদর + আমি
কর্তব্য > কৃ + তব্য ইত্যাদি।
তাছাড়া আরো কিছু যৌগিক শব্দ হচ্ছে : গায়ক, বাবুয়ানা, দৌহিত্র, [illegible], চিকামারা, গুণবান, পাঠক, মিতালি, ভাড়াটে, মেয়েলি।
প্র : রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ কাকে বলে?
উ : রূঢ় শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত। যখন কোনো শব্দ সৃষ্টির সময় কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তখন সেটি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের মধ্যে পড়ে। এ-বিচারে বলা যায়, যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের পার্থক্য থাকে তাকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে। অর্থাৎ প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগকৃত শব্দ যখন মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : প্রবীণ অর্থ যে প্রকৃষ্টভাবে বীণা বাজায় (প্র+বীণ)। কিন্তু এখন প্রবীণ অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন। অনুরূপ :
হস্ত+ইন> হস্তী;
বাঁশ+ই> বাঁশি;
তিল+অ > তৈল;
কুশ (এক প্রকার তৃণ) + অল > কুশল।
অন্যভাবে, যে হরণ করে > হরিণ;
নিজ কন্যা > ঝি (চাকরানি),
খবরাখবর> সন্দেশ (মিষ্টিবিশেষ);
পাঞ্জাবের অধিবাসী > পাঞ্জাবি (পোশাক বিশেষ)।
এছাড়াও রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দের আর কিছু উদাহরণ হলো :
গবেষণা, মন্দির, ফলাহার, থ, কারচুপি, তৈলা, বৎস, রাখাল, কদর্য।
প্র : যোগরূঢ় শব্দ কাকে বলে?
উ : এই জাতীয় শব্দ একই সঙ্গে যৌগিক ও রূঢ় উভয় জাতীয় শব্দের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। অর্থাৎ এ ধরনের শব্দ সৃজনে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা উভয়ের সম্মিলন দেখা যায়। সেজন্যে বলা যায়, সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন হলেও অর্থগত দিক থেকে কোনো নির্দিষ্ট একটিকেই যখন বোঝায় বা বিশেষার্থ প্রকাশ করে তখন তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ এক্ষেত্রে বেশ মিলে যায়। যেমন : পঙ্কজ > পঙ্কে জন্মে যা। কিন্তু এখন তা পদ্মফুলকে বোঝায়। এরূপ :
আদিত্য (অদিতির পুত্র বা সব দেবতা) > সূর্য;
তুরঙ্গম (যা তাড়াতাড়ি যায়) > ঘোড়া;
রাজপুত (রাজার পুত্র) > জাতিবিশেষ;
মহাযাত্রা (ধুমধাম করে গমন) > মৃত্যু;
জলধি (জল ধারণ করে এমন জলধি)> সমুদ্র।
এছাড়াও যোগরূঢ় শব্দের আর কিছু উদাহরণ হলো : জলদ, দশানন, পরিবার, বহুব্রীহি, গোঁফখেজুরে, অসুখ (এখানে সুখ-এর অভাব না বুঝিয়ে রোগ বোঝায়)।

দ্বিরুক্ত শব্দ / ধ্বন্যাত্মক শব্দ

প্র : দ্বিরুক্ত শব্দ কাকে বলে?
উ : একটি শব্দ পরপর দুবার উক্ত বা বলা বা ব্যবহার হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। যেমন : দিন দিন, বারে বারে।
প্র : কেন দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার হয়?
উ : প্রতিটি শব্দ এক একটি পৃথক ইমেজ। এগুলোর ভিন্ন অর্থ আছে। যখন ওই নির্দিষ্ট ইমেজ বা অর্থের কম বা বেশি বোঝানো হয়, তখন ব্যবহার হয় দ্বিরুক্ত শব্দ। যেমন:'স্বপনের গরম লেগেছে।' এই বাক্য যদি এভাবে লেখা হয় : 'স্বপনের গরম গরম লাগছে।' তাহলে গরম শব্দের দ্বিরুক্তি ব্যবহার করে গরমের মাত্রা কম বোঝায়। আবার, 'বাগান ফুলে ছেয়ে গেছে' এই বাক্যকে যদি 'বাগান ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে' লেখা হয়, তাহলে বাগানে ফুলের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য উভয়েরই বৃদ্ধি বোঝায়। এসব কারণে সাধারণত দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়।
প্র : দ্বিরুক্ত কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার :
শব্দের দ্বিরুক্তি (রোজ রোজ, কেউ কেউ);
পদের দ্বিরুক্তি ([illegible], [illegible]);
অনুকার দ্বিরুক্তি ([illegible], [illegible])।
প্র : দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে কত প্রকারের হতে পারে?
উ : চার প্রকারের। যথা
অর্থদ্বিরুক্ত :
একই মূল শব্দের অর্থের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, শব্দের অর্থ বিকৃত হয় না। যেমন : [illegible]।
সমার্থক দ্বিরুক্ত
কোনো শব্দের সঙ্গে ওই শব্দের দ্বিরুক্তি না হয়ে, সমার্থক বা সমার্থ জ্ঞাপক অন্য কোনো শব্দের দ্বিরুক্তি হয়। যেমন : [illegible]।
অনুকার বা অনুকার-দ্বিরুক্ত :
এক্ষেত্রে প্রথম শব্দের অর্থ যথাযথ থাকলেও দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ যথার্থ থাকে না। প্রথম শব্দের অনুকরণে বা অনুকার হিসেবে দ্বিতীয় শব্দটি তৈরি হয়। যেমন : [illegible] বই-টই নিয়ে পড়তে বসো। এই বাক্যে '[illegible]' ও 'টই' [illegible]।
বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত :
শব্দদ্বয়ের নির্দিষ্ট অর্থ থাকে, তবে তা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : বেচা-কেনার পর আয়-ব্যয় হিসাব করা দরকার।
প্র : সমার্থক ও বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত নিয়ে ভিন্ন মত কী?
উ : অনেক ব্যাকরণবিদ সমার্থক দ্বিরুক্ত ও বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত শব্দকে 'দ্বিরুক্ত' শব্দ বলতে চান না; বলেন 'শব্দ-জোড়'। তাঁরা এক্ষেত্রে 'বিপরীতার্থক শব্দ-জোড়' বলে আরো একটি বিভাগও সংযোজন করেন। যেমন : চন্দ্র-সূর্য, আহার-বিহার, [illegible] ইত্যাদি।
প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ কাকে বলে?
উ : শব্দ একটি ইমেজ। কখনো ধ্বনি থেকে অনুকরণ করে শব্দ তৈরি করা হয়। এসব শব্দকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন :
খিল্ খিল্ = হাসির শব্দ
ভেউ ভেউ = মানুষের উচ্চ কান্নার শব্দ
ঘেউ ঘেউ = কুকুরের উচ্চ ডাক
ঝম্ ঝম্ = বৃষ্টি পতনের শব্দ।

প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ কি শুধু ধ্বনির অনুকরণেই সৃষ্টি হয়?

উ : না। মানুষের শারীরিক অনুভূতি, যেমন : ভয়, হর্ষ ও বিস্ময়ে বলা, বিস্তৃতা, ক্লান্তি ও পুলকে ইত্যাদি অনুভবযোগ্য ধারণা প্রকাশক শব্দসমূহও ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন :
ধাঁ ধাঁ = মাথাটাও কিছু পুলকা
দুরু দুরু = ভয় / ভক্তা
ঝিকিমিকি = উজ্জ্বলা
শিট শিট = বহুবার শাসন
চাঁ চাঁ = গরমের তীব্রতা
ঘুম ঘুম = হালকা ভাব।

প্র : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার দ্বিরুক্তির সম্পর্ক কী?

উ : ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও অনুকার দ্বিরুক্তি মূলত একই। উভয়ই নিছক অর্থবহ শব্দ নয়, ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার দুই শব্দ মিলে একটি অর্থ প্রকাশ করে। অনুকার শব্দদ্বিত্বগুলো মূলত অবধারণাত্মক শব্দ। সে দিক থেকে বলা যায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দসমূহ বিশেষণ রূপেও ব্যবহার হয়। যেমন :
অবধারণাত্মক অনুকার দ্বিরুক্তি > টক্ টক্ (উজ্জ্বল অর্থে)।
বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দ > গোলাপটি টক্-টকে লাল।

প্র : পদাত্মক দ্বিরুক্তি কাকে বলে?

উ : বিচ্ছিন্নভাবে শব্দ দুই বা ততোধিক বার ব্যবহৃত হলে তাকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। যেমন : গানে গানে ভরিয়ে দেবো মন।

প্র : পদাত্মক দ্বিরুক্তি কতভাবে সম্পন্ন হতে পারে?

উ : দুইভাবে হতে পারে :
১. যথাদ্বিরুক্তি;
২. পুনরীতি বা অনুসর-দ্বিরুক্তি।
উদাহরণ :
পদাত্মক যথাদ্বিরুক্তি :
জনে জনে আজকে আমি জানিয়ে যাব সব।
পদাত্মক পুনরীতি বা অনুসর দ্বিরুক্তি :
হাতে-নাতে পড়লে ধরা দলে-বলে জেলে যাবে।

প্র : কোনো শব্দ কি একাধিক ধ্বন্যাত্মক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?

উ : পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাধারণ বিশেষ্য হবেই, এমন নয়। বিশেষ্য হতে পারে, তবে একাধিকভাবেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন :
ঘৃঘুরিত > হাতির ডাক
কলরব > বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি
গুঞ্জন > ভ্রমরের শব্দ
নিক্কণ > নূপুরের ধ্বনি
কাকলি/কূজন > পাখির শব্দ / ডাক
মর্মর > শুকনো পাতার শব্দ
কল্লোল > সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ
কেকা > ময়ূরের ডাক
রেষা > অশ্বের ডাক
হুঙ্কার > বীরের গর্জন।
কূহু > কোকিলের ডাক
ক্রেষার > রাজহাঁসের ডাক
হুঙ্কার > সিংহের নাদ (ডাক)
শিঞ্জন > অলঙ্কারের ধ্বনি
• আরো উদাহরণ এই বইয়ের একেকখায় প্রকাশ অংশে পাওয়া যাবে।

শব্দের শুদ্ধরূপ

প্র : শব্দের শুদ্ধরূপ কী?

উ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দই কোনো না কোনো নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা বা উল্লেখ করা যায়। বানানের এই নিয়ম-কেন্দ্রিকতাকেই শব্দের শুদ্ধরূপ বলে। অনেক ভুল বানান প্রচলিত থাকলেও পরিশুদ্ধবাদীগণ সর্বদা শুদ্ধ বানানের পক্ষে। শুধু সে-কারণেও নয়। ভাষাকে পুস্তকাবদ্ধ রাখতে হলে শুদ্ধভাবে শব্দ লিখতেই হবে।

প্র : সাক্ষর ও সাক্ষর এর কোনটি শুদ্ধ?

উ : দুটোই। সাক্ষর অর্থ শিক্ষিত বা অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন, আর সাক্ষর অর্থ সহি বা দস্তখত।

প্র : অক্ষরজ্ঞ ও অক্ষরজ্ঞান এ দুটি বানানের শুদ্ধ কোনটি?

উ : দুটোই। অক্ষরজ্ঞ অর্থ যিনি অক্ষর (বিদ্যা) সম্পর্কে জ্ঞানী (যে অর্থে বিশেষজ্ঞ) আর অক্ষরজ্ঞান অর্থ যিনি অক্ষর সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যাহীন।

প্র : 'অত্র বিদ্যালয়' বানানের শুদ্ধ কি না।

উ : ভুল। কারণ, অত্র অর্থ এইখানে। বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য কিছুর আগে অত্র ব্যবহার করলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'এইখানে বিদ্যালয়'। কিন্তু বোঝাতে চাওয়া হয় 'এই বিদ্যালয়'।

প্র : বঁধু ও বন্ধু কোন বানানটি শুদ্ধ?

উ : দুটোই সঠিক। বঁধু অর্থ বন্ধু আর বন্ধু অর্থ বট।

প্র : প্রফুল্লন ও প্রোফুল্ল বানান দুটো কি সঠিক?

উ : হ্যাঁ। কারণ, প্র+ফুল্লন= প্রফুল্লন আবার প্র+উফুল্ল= প্রোফুল্ল।

প্র : বন্দোপাধ্যায় বানানটি কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। বন্দ্য+উপাধ্যায়= বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : কৌতুক ও কৌতূহল বানান কি সঠিক?

উ : কৌতুক বানানে 'উ-কার' হলেও কৌতূহলে 'ঊ-কার'।

প্র : 'বিভিষীকা' বানানটি কি শুদ্ধ?

উ : না, ভুল। এর শুদ্ধরূপ 'বিভীষিকা'।

প্র : আপোষ বানানটি শুদ্ধ নয় কেন?

উ : শব্দটি পারসি। তাই ষ হবে না। হবে আপোস বা আপস।

প্র : শ্রেণি বানান শুদ্ধ কিনা?

উ : সংস্কৃতে শ্রেণী ও শ্রেণি উভয় বানানই শুদ্ধ ও এক অর্থ।

প্র : 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' বানানটি কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। 'অঞ্জলি' অর্থ 'জোড়হস্ত'। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে অঞ্জলি, সেটা শ্রদ্ধা+অঞ্জলি = শ্রদ্ধাঞ্জলি। অনুরূপ, প্রেমাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, জলাঞ্জলি ইত্যাদি।

প্র : উপরোক্ত শব্দের সঠিক রূপ কী?

উ : উপরিউক্ত ও উপর্যুক্ত।

প্র : উল্লেখিত শব্দ কি ভুল?

উ : কোথাও বা কখনও উল্লেখ হয়েছে এমন অর্থে উল্লেখিত ভুল, শুদ্ধ হবে উল্লেখকৃত। তবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে এমন অর্থে উল্লিখিত শুদ্ধ।

প্র : ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে শব্দ দুটি কি শুদ্ধ?

উ : ভুল। এই শব্দ দুটি প্রচলিত হলেও এর শুদ্ধ হবে ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে।

প্র : প্রবধারা কি শুদ্ধ?

উ : না, ভুল বানান। শব্দের নিয়ম অনুসারে প্রবাহধারা শুদ্ধ বানান।

প্র : পাঞ্জলা বানানে ভুল কোথায়?

উ : এটি হচ্ছে এক শব্দ যার এক বা একাধিক হরফে কোনো অর্থ বোঝায় না তাকে ধ্বনি বলে। শব্দ এক-অর্থে একাধিক বোঝাতে পারে। তবে উচ্চারণ বানানের শব্দ এবং এ দুয়ের কোনোটাতেই শুদ্ধ নয়।

প্র : এমতাবস্থায় শব্দটির ব্যবহারে কি ভুল?

উ : হ্যাঁ। কারণ, এখানে 'এই' ও অবস্থায় দুটি শব্দ আছে। অথচ বলা হচ্ছে একটি। তাই হবে। এই অবস্থায় বা এই মতে।

প্র : সেক্টিস হোস্টেল অর্থে ছাত্রীবাস কথাটি শুদ্ধ কি?

উ : ছাত্রীবাস বলতে ছাত্রীদের পরিবহনের জন্য বাস (Bus) বোঝাবে। আর Hostel অর্থ নিবাস হবে ছাত্রীনিবাস বা ছাত্রী-আবাস।

প্র : 'মুহুর্মুহু' শব্দের বানানটি কি শুদ্ধ?

উ : ভুল। এর সঠিক উচ্চারণ চারটি উ-কার হবে এবং একটি হবে যেমন : 'মুহুর্মুহু' সঠিক বানান।

প্র : সহসা অর্থ শীঘ্র কেমন?

উ : সহসা অর্থ হঠাৎ। শীঘ্র বোঝাতে ভুল।

প্র : পরিষ্কার অবিষ্কার কিন্তু পুরস্কার তিরস্কার কোন বিধানে বানান চারটি শুদ্ধ?

উ : ষ-ত্ব বিধান অনুসারে।

প্র : কল্যাণীয়েষু কিন্তু কল্যাণীয়াসু কোন নিয়মে শুদ্ধ?

উ : ষ-ত্ব বিধান অনুসারে।

প্র : পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ—এই বানানে কোথায় ভুল আছে?

উ : পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ণ। (এখানে হ্ + ন = হ্ণ; হ্ + ণ = হ্ণ)

প্র : দুরাবস্থা বানানটি শুদ্ধ কিনা?

উ : ভুল। এটি সন্ধিঘটিত বানান। এর শুদ্ধরূপ দুর্+অবস্থা=দুরবস্থা।

প্র : কোনো কিছু ভেঙে পড়া অর্থে ধস না ধ্বস কোনটি শুদ্ধ?

উ : ধস।

প্র : 'নিশ্চেষ্ট' বানান 'নিশ্চেষ্টে' কেন বানান শুদ্ধ?

উ : নিশ্চেষ্ট : এখানে 'অলস' অর্থের মূলে শব্দের শেষ ই-কার দ্বারা স্ত্রীত্ব বোঝানো হয়েছে।

প্র : ঈর্ষা বা ঈর্ষা কোন বানান শুদ্ধ?

উ : ঈর্ষা।

প্র : বাস্তবিক হবে নাকি বাস্তব? কোনটি শুদ্ধ?

উ : বাস্তব। বাস্তব শব্দের অর্থ ক্ষেত্র। তাই ক্ষেত্রের সাথে সেরকমভাবে অর্থের সাথে মিল রেখে অর্থ পরিবর্তিত হবে শুদ্ধ।

প্র : প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শব্দটি কি সঠিক?

উ : শব্দটি পুংলিঙ্গে প্রধানমন্ত্রী, স্ত্রীলিঙ্গে প্রধানমন্ত্রী। অনুরূপভাবে, জনপ্রতিনিধি (পু) জনপ্রতিনিধি (স্ত্রী), জনপ্রতিনিধি (পু) জনপ্রতিনিধি (স্ত্রী)।

প্র : শ্রেষ্ঠীর, শ্রেষ্ঠীর বানান শুদ্ধ কি না?

উ : ভুল। 'অতিশয়' অর্থে অতীয়ান। যে নিক থেকে শ্রেষ্ঠ+অতিশয় = শ্রেষ্ঠাতিশয়, শ্রেষ্ঠ+অতিশয় = শ্রেষ্ঠাতিশয় শুদ্ধ।

প্র : অনুচ্চারিত বানান ভুল না শুদ্ধ?

উ : ভুল। শুদ্ধ হবে অনুচ্চরিত।
অনু+চর= অনুচর+ইত=অনুচরিত।

প্র : মুহূর্ত বানানের অন্তরূপ কি?

উ : মুহূর্ত (মুহূর্ত থেকে যা)।

প্র : ঊর্ধ্বমুখী বানান ভুল কেন?

উ : ঊর্ধ্ব বিশেষ্য পদের সঙ্গে তা প্রত্যয়যুক্ত হয় না। ঊর্ধ্ব লিখতে হবে অথবা ঊর্ধ্বগতি।

প্র : অভ্যন্তরীণ/আভ্যন্তরীণ কোন বানান শুদ্ধ?

উ : দুটো শুদ্ধ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা ভাষার অভিধানে বলা হয়েছে, অভ্যন্তর বিশেষণ অর্থে অভ্যন্তরীণ এবং অভ্যন্তর থেকে উৎপন্ন বা জাত অর্থে আভ্যন্তরীণ সঠিক।

প্র : সর্বজনীন/সার্বজনীন কোন বানান শুদ্ধ?

উ : দুটোই শুদ্ধ। সবার জন্য অনুষ্ঠিত বা মঙ্গলকর অর্থে সর্বজনীন এবং সকলের যোগ্য অর্থে সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার হয়।

প্র : নিরোগ না নীরোগ কোনটি শুদ্ধ?

উ : নীরোগ শুদ্ধ (নিঃ+রোগ = নীরোগ)।

প্র : বিসর্গ সন্ধিযুক্ত কয়েকটি শব্দ বানান নির্দেশ কর।

উ : শিরঃপীড়া (মাথা ব্যথা), বিঃ দ্রঃ (দ্রষ্টব্য) কিন্তু মনোযোগ, মনোরম, মনোহর, মনোযোগ।

প্র : পরপর দুটি ঈ-কার ব্যবহার হয় এমন কয়েকটি শব্দ লিখ।

উ : নদীতীর, উদীচী (উত্তর দিক), প্রতীচী (পশ্চিম দিক)।

প্র : মুহ্যমান শব্দটি প্রচলিত কিন্তু ভুল। শুদ্ধরূপ কী?

উ : মোহ্যমান।

প্র : মুমূর্ষু এবং শুশ্রূষা বানান দুটির অর্থ কী?

উ : মুমূর্ষু এবং শুশ্রূষা।

প্র : ভূত, ঊর্ধ্বত, অদ্ভুত ইত্যাদি বানান শুদ্ধ না?

উ : একটি সরল কথা মনে রাখলেই এ ধরনের বানান শুদ্ধ রাখা যায়। কথাটি হলো যতো রকমের ভূত আছে (যেমন : ভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব, ঊর্ধ্বত, সম্ভূত, প্রভূত, আবির্ভূত ইত্যাদি) সর্বত্র ভূত বানানে ঊ-কার হবে। ব্যতিক্রম : অদ্ভুত। ভুতুড়ে। এ বানান দুটোই অদ্ভুত, তাই মনে রাখি।

প্র : মুহূর্ত বানানটি শুদ্ধ রূপ কোনটি?

উ : মুহূর্ত। 'হ' রূপটি হ + ঊ বোঝায়। তাই মুহূর্ত লিখলে বানানটি ভুল হবে।

প্র : জোৎস্না বানানটির ভুল কোথায়?

উ : ৎ-ফলা ব্যবহারে। এর শুদ্ধরূপ : জ্যোৎস্না।

প্র : পুরুষ ও পরুষ শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?

উ : পুরুষ হলো নর; পরুষ অর্থ কর্কশ। যেমন: কোনো কোনো পুরুষ পরুষ কণ্ঠে চিৎকার করে সারাদিন কথা বলে।

প্র : স্বাধীনতাত্তোর ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর-বানান গুলো শুদ্ধ কী?

উ : স্বাধীনতাত্তোর ভুল, শুদ্ধ হবে স্বাধীনতা-উত্তর। মুক্তিযুদ্ধোত্তর শুদ্ধ।

প্র : প্রায় শতাধিক বা প্রায় সহস্রাধিক শুদ্ধ কি-না?

উ : ভুল। 'প্রায়' অনুমান নির্ভরতা বোঝায়, অধিক৩ অনুমাননির্ভর। দুটো অনুমাননির্ভর শব্দ ব্যবহার অনুচিত। হবে

প্র : ক্রমিকসংখ্যা এবং ক্রমিকবাচকতা শব্দ দুটোর অর্থ কী?

উ : দুটোর শব্দের অর্থই পরিবর্তিত।

প্র : স্বাদুকরণ কি শুদ্ধ বানান?

উ : ভুল। স্বাদের অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর। অতএব, স্বাদ+আয়ন = স্বাদায়ন+করণ = স্বাদায়নকরণ শুদ্ধ বানান। অনুরূপ, বর্ণ + আয়ন = বর্ণায়ন, বাড়ি + আয়ন = বাড়িয়ন ইত্যাদি।

প্র : চন্দ্রিমা শব্দটি কি শুদ্ধ?

উ : চন্দ্রিমা বাক্যবিশ্লেষ দিক থেকে ভুল। সংস্কৃত চন্দ্রমস এবং চন্দ্রিকা শব্দ দুটির মিশ্রণে চন্দ্রিমা শব্দের সৃষ্টি। চন্দ্রিমা অর্থে জোছনা বোঝান হয়।

প্র : বনজ এবং ফলজ বৃক্ষ শব্দ দুটোর প্রয়োগ কি ঠিক?

উ : যদি বলা হয় : 'বনজ বৃক্ষ' এবং 'ফলজ বৃক্ষ' তাহলে বোঝায়, বনে জন্মে যে গাছ এবং ফলে জন্মে যে গাছ। 'জ' এখানে জাত বা জন্ম অর্থে ব্যবহৃত। যদি প্রধানকারী গাছ বোঝাতে 'ফলজ বৃক্ষ' ব্যবহার ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে লিখতে হবে : 'ফলদ বৃক্ষ।' যেমন : বৃক্ষমেলা উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নিম্ন হাতে একটি করে বনজ ও ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন।

প্র : পরিসেবা নাকি পরিষেবা- কোনটি ঠিক?

উ : 'সেবা' বানান ঠিক হলেও 'পরিষেবা' শুদ্ধ বানান, 'পরিসেবা' নয়।

প্র : 'প্রাতরাশ' বানানটি শুদ্ধ কিনা?

উ : ভুল। সংস্কৃত 'প্রাতঃ' অর্থ প্রভাত এবং 'আশ' অর্থ 'খাদ্য'। সন্ধিতে প্রাতঃ+আশ মিলে 'প্রাতরাশ' হয়। 'প্রাতরাশ' বানানে বিসর্গ নেই। আবার সন্ধির সময় মনে রাখতে হবে, শব্দটি 'আশ' (খাদ্য) 'বাশ' নয়।

প্র : কতিপয় উল্লেখযোগ্য অশুদ্ধ > শুদ্ধ চিহ্নিত কর।

উ :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পিপিলিকা	পিপীলিকা
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ
সামর্থ	সামর্থ্য
বিদ্যান	বিদ্বান
ত্রাহস্পর্শ	ত্রাহস্পর্শ

প্রতীচি	প্রতীচী
উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাস
সমিচীন	সমীচীন
জীপজিবী	জীপজীবী
নিহারিকা	নীহারিকা
উজ্জ্বল্য	ঔজ্জ্বল্য
ঘান্ত্রাসিক	ষাণ্মাসিক
মুহূর্ত	মুহূর্ত
শরিরী	শরীরী
মূয়মান	ম্রিয়মাণ
শান্তনা	সান্ত্বনা
জৈষ্ঠ্য	জ্যৈষ্ঠ
উপন্যাসিক	ঔপন্যাসিক
ঐকতান	ঐকতান
ইদানিংকাল	ইদানীং
উদাসীন্য	ঔদাসীন্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য
সম্ভব	সম্ভবপর
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
রজকিনী	রজকী
পৌরহিত্য	পৌরহিত্য
নিরীহ	নিরিহ
ছার্থ	ছার্থ
গভুস	গভূষ
নিশীত	নিশীথ
যক্ষা	যক্ষ্মা
শ্রুষা	শুশ্রূষা
সখ্যতা	সখ্য/সখিত্ব
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
বাহুল্যতা	বাহুল্য।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যবহারের সময় প্রায়শ ভুল হয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ উল্লেখ কর।

উ : বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো লেখার সময় অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ভুল করেন। সেগুলোর শুদ্ধ বানান নিচে উল্লেখ করা হলো :

অগ্ন্যাশয়	উচ্চৈঃস্বর
অগ্ন্যুৎপাত	উচ্ছ্বাস
অচিন্ত্য	উজ্জ্বল
অধ্যাত্ম	উদ্ভাক্ত
অনিন্দ্য	উদ্ভিজ্জ
অনূর্ধ্ব	এতদ্ব্যতীত
অন্তঃসত্ত্বা	ঔজ্জ্বল্য
অন্তর্জ্বালা	ঔদ্ধত্য
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	কাঙ্ক্ষিত
অমর্ত্য	কৃচ্ছ্র
অলঙ্ঘ্য	ক্ষুন্নিবৃত্তি
গার্হস্থ্য	বিশ্বকিন্ডার্গ
ঘূর্ণ্যমান	বৈচিত্র্য
জলোচ্ছ্বাস	সৌদর্য্য
জাকুলমান	বাত্যাহত
ঝলঝল	ব্যপদেশ
জ্যোতিষী	ব্যবচ্ছেদ
জ্যোতিষ্ক	বাদধ্যায়
টীকাটিপ্পনি	ব্যুৎপত্তি
তদ্ভবীত	ব্যূহ
তীক্ষ্ণ	ব্রাহ্মণ
তুচ্ছীভাব	ভৌগোলিক
তুরণ	ভ্রাতৃত্ব
তুরান্বিত	মধুসূদন
তুরিত	মনন্তত্ত্ব
ত্যক্ত	মন্বন্তর
দয়ার্দ্র	মর্ত্য
দুরাকাঙ্ক্ষা	মহত্ত্ব
দুর্নিরীক্ষ্য	মাহাত্ম্য
দৌরাত্ম্য	যশস্বী
দ্বেষ	যাচ্ঞা
দ্বৈত	যাবার্থ্য
দ্বার্থ	লক্ষ্মণ
দ্যূতক্রীড়া	লক্ষ্মী
ধ্বজা	লক্ষ্য
ধ্বন্যাত্মক	শাশ্বত
নঞর্থক	শিরশ্ছেদ
নির্দ্বন্দ্ব	শ্বশুর
নির্দ্বিধা	শ্বশ্রূ
নীরব	শ্বাপদ
নৈর্ঋত	শ্মশান
ন্যুব্জ	শ্মশ্রু
ন্যূন	শ্রীমতী
পঙ্‌ক্তি	শ্যেন
পদ্ম	শ্লেষ্মা
পরাঙ্মুখ	সংবর্ধনা
পরিস্রাবণ	সন্ধ্যা
প্রত্যুষ	সন্ন্যাস
প্রাতঃকৃত্য	সন্ন্যাসী
প্রাতর্ভ্রমণ	সরস্বতী
পৌরোহিত্য	সাত্ত্বিক
বক্ষ্যমাণ	সান্ত্বনা
বন্দ্যোপাধ্যায়	সৌহার্দ্য
বন্ধ্যা	স্বতঃস্ফূর্ত
বয়োজ্যেষ্ঠ	স্বাচ্ছন্দ্য
বর্ত্ম	স্বাতন্ত্র্য
বাল্মীকি	স্বায়ত্তশাসন
বিদ্বজ্জন	হীনম্মন্যতা।
বিভীষিকা	

প্র : 'বুদ্ধিজীবি' বানানটি শুদ্ধ কি?

উ : 'বুদ্ধিজীবি' ভুল বানান। এর শুদ্ধরূপ 'বুদ্ধিজীবী'। মনে রাখতে হবে : 'জীবিকা' বানানে একটি ঈ-কার এবং একটি ই-কার। কিন্তু 'জীবী' বানানে দুটোই ঈ-কার। যে-কোনো 'জীবী' লিখতে দুটো ঈ-কার প্রয়োগ করতে হবে। যেমন : আইনজীবী, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, পেশাজীবী ইত্যাদি।

প্র : 'বিবিধপ্রকার' শব্দটি শুদ্ধ কি-না?

উ : ভুল। এর শুদ্ধরূপ 'বিবিধ'। বিবিধ অর্থই বহু প্রকার। বিবিধ-এরপর তাই 'প্রকার' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।

প্র : 'দারিদ্র্য' বানানে য-ফলা থাকবে কি-না?

উ : পদ হিসেবে বিশেষণ 'দরিদ্র'-এর বিশেষ্যরূপ 'দারিদ্র্য'। এই বানানে য-ফলা দিতেই হবে। তবে দারিদ্র্য এবং দরিদ্রতা একই অর্থ বহন করে। 'দরিদ্রতা' লিখতে য-ফলা লাগে না। অনেকে 'দারিদ্র্যতা' লেখেন। সেটা ভুল।

প্র : 'জ্যেষ্ঠ্য' বানানটি কি ভুল?

উ : ভুল। 'বড়' অর্থে 'জ্যেষ্ঠ' বানান হবে।

মাসের নাম হবে 'জ্যৈষ্ঠ'। যেমন : 'জ্যৈষ্ঠ মাসে জোর সন্তানের জন্ম হলো।'

প্র : পার্সি না ফার্সি কোন বানান ঠিক?

উ : আজকের ইরানের ভাষা এটি। ইরানের নাম ছিল পারস্য। পারস্যের ভাষা পার্সি। সে দেশের ভাষায় 'প'-এর ব্যবহার উচ্চারণে না থাকায় 'পার্সি' হয়ে যায় 'ফার্সি'। কিন্তু বাংলায় 'প'-এর উচ্চারণ আছে। তাই পার্সি-ই ঠিক। তবে বলা প্রচলিত ফার্সি বা বাংলাভাষায় ফার্সি।

প্র : 'মার্কিন' শব্দটি 'আমেরিকা' অর্থে কিভাবে হয়েছে?

উ : 'আমেরিকান' বর্ণটির হিব্রি অপভ্রংশে হলো 'মার্কিন'। ধ্বনিসংকোচের মাধ্যমে আমেরিকান > মার্কিন > মার্কিন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকা থেকে সাদা মোটা কাপড় আসতো বলে ক্যানভাস বা মোটা সাদা কাপড়কে মার্কিন কাপড়ও বলা হয়। হিব্রি থেকে শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

পদ-প্রকরণ

প্র : পদ কাকে বলে?
উ : বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।

প্র : বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে পদ বলা কেন?
উ : বাক্যে ব্যবহার হওয়ামাত্র শব্দসমূহে বিভক্তিযুক্ত হয়। যে শব্দে বিভক্তি দেখা যায় না, সেই শব্দে শূন্য বিভক্তি থাকে। তাই বাক্যের প্রতিটি শব্দই পদ।

প্র : পদ প্রধানত কত প্রকার?
উ : দুই প্রকার। নামপদ ও ক্রিয়াপদ।

প্র : নামপদ কাকে বলে?
উ : বাক্যে ক্রিয়াপদ ভিন্ন সব পদই (যেমন: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়) নামপদ।

প্র : ক্রিয়াপদকে বাক্যের আবশ্যিক পদ বলা হয় কেন?
উ : বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ক্রিয়াপদ ভিন্ন কোনো বাংলা বাক্য গঠিত হয় না। প্রকাশ্য না থাকলেও উহ্য অবস্থায় ক্রিয়াপদ বাক্যে থাকে বলে একে আবশ্যিক পদ বলে। যেমন : রাম ও রহিম বন্ধু। এখানে 'হয়' উহ্য।

প্র : বিশেষ্য কাকে বলে, কত প্রকার?
উ : যে পদে কোনো কিছুর নাম বোঝায়। ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিশেষ্য পাঁচ, ব্যাকরণবিদ জগদীশচন্দ্র ঘোষের মতে সাত কিন্তু সাধারণত ছয় প্রকার বিশেষ্যের কথা জানা যায়।

প্র : বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ্যের উদাহরণ দাও।
উ : নাম বা সংজ্ঞার্থবাচক > অমর, ইমরুল, পদ্মা, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদি।
বস্তুবাচক > লেখনী, কাগজ, চাল, চিনি ইত্যাদি।
ভাববাচক (বিশেষ্যের মনোগত বা অবস্থাগত ভাব প্রকাশক) > গমন, আনন্দ, সুখ, শয়ন, দুঃখ, উন্মাদনা, তৃপ্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি।
জাতিবাচক > মানুষ, পশু, বাঙালি, জার্মান, ইংরেজ ইত্যাদি।
সমষ্টিবাচক > ঝাঁক, গোষ্ঠী, শ্রেণি, সংঘ, জনতা, সমিতি, দল ইত্যাদি।
গুণবাচক (বিশেষ্যপদে গুণ, দোষ, ধর্ম ইত্যাদির ভাব বা নাম বোঝায়) > তারুণ্য, সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব, ভীরুতা, ক্ষমা, সাহস, সৌরভ ইত্যাদি।

প্র : বিশেষণ কাকে বলে?
উ : বাক্যস্থিত কোনো পদের গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত পদকে।

প্র : বিশেষণ প্রধানত কত প্রকার?
উ : দুই প্রকার। নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ।

প্র : নাম বিশেষণ কাকে বলে?
উ : বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিশেষণকে।

প্র : ভাব বিশেষণ কাকে বলে?
উ : বাক্যে বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া বিশেষণকে।

প্র : বিশেষণের বিশেষণ কাকে বলে?
উ : বাক্যের বিশেষণ পদকে বিশেষায়িত করে যে বিশেষণ। যেমন : খুব মিষ্টি দই। এখানে 'খুব' বিশেষণের বিশেষণ।

প্র : ক্রিয়া-বিশেষণ কাকে বলে?
উ : যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদের গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি চিহ্নিত করে। যেমন : গুনগুনিয়ে > ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে; হনহনিয়ে > আসছে কারা হনহনিয়ে; সহাস্যে > তিনি সহাস্যে সব খবর দিলেন; ধীরে > বায়ু ধীরে বয় ইত্যাদি।

প্র : অব্যয়-বিশেষণ কাকে বলে?
উ : যে পদে বাক্যে অব্যয় পদকে বিশেষায়িত করা হয়। অব্যয় পদের বিশেষণ সাধারণত কম দেখা যায়। যেমন।
১. 'তুমি তো প্রায় পাগলের মতো দৌড়াচ্ছ।' এই বাক্যে 'মতো' পদাশ্রয়ী অব্যয়। 'প্রায়' অব্যয় বিশেষণ। কারণ, 'প্রায়' দিয়ে 'কতটুক মতো' তা প্রকাশ করা হয়েছে।
২. 'ঠিক যেন তোর মতো, তোর নামে নাম।' এই বাক্যে 'যেন' সমুচ্চয়ী অব্যয়। 'ঠিক' অব্যয় বিশেষণ। 'ঠিক' দিয়ে 'কতটুকু যেন' তা বোঝানো হয়েছে।
৩. 'শত ধিক্! জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?' এখানে অনন্বয়ী অব্যয় 'ধিক্'। 'শত' অব্যয় বিশেষণ।

প্র : বাক্যের বিশেষণ বলে কিছু আছে কি?
উ : বাক্যের বিশেষণ বলে একটি ধারণা আছে। বিশেষণ শুধু পদকে পৃথকভাবে বিশেষায়িত করে না, অনেক সময় পুরো বাক্যকেও বিশেষায়িত করে এবং তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন :
ঘটনাচক্রে তারা চোর সন্দেহে জেলে গেছে।
দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে অপশক্তির উত্থান ঘটেছে।
বাস্তবিকই তোমাদের সামনে দেশরক্ষার কঠিন সংগ্রাম উপস্থিত।

প্র : বিশেষণের অতিশায়ন কাকে বলে।
উ : বিশেষণ পদ যখন একের চেয়ে অন্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন: (১) কাঞ্চন ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলে। এখানে 'চেয়ে' বিশেষণকে অতিশায়ন করে 'সবচেয়ে' করা হয়েছে। (২) পিতামহ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্থ। এখানে 'অধিক' বিশেষণ এবং 'অধিকতর' বিশেষণের অতিশায়ন।

প্র : সর্বনাম কাকে বলে?
উ : বিশেষ্যের পরিবর্তে বাক্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন : সে, তারা, তুমি ইত্যাদি।

প্র : সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লেখ।
উ : বিভিন্ন প্রকারের সর্বনাম দেখা যায়। তবে এগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থানীয় :
১. ব্যক্তি বা পুরুষবাচক : আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।
২. আত্মবাচক : স্বয়ং, খোদ, আপনি (নিজ) ইত্যাদি।
৩. সামীপ্যবাচক : এ, এই, এরা ইত্যাদি।
৪. দূরত্ববাচক : ওই, ওইসব, ওইগুলো ইত্যাদি।
৫. সাকুল্যবাচক : সব, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।
৬. প্রশ্নবাচক : কী, কে, কার ইত্যাদি।
৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : কোন, কেউ, কেহ ইত্যাদি।
৮. ব্যতিহারিক : আপনা-আপনি, নিজে-নিজে ইত্যাদি।
৯. সংযোগজ্ঞাপক : যে, যিনি, যারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।

প্র : সর্বনামে সম্ভ্রমার্থে বিশেষ কী ব্যবহার হয়?
উ : চন্দ্রবিন্দু। যেমন : খুবলাল মালি তার পরিশ্রম অনুপাতে অর্থ উপার্জন করতে পারত না। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে প্রাপ্ত তাঁর কিছু টাকা বিশ্বভারতীকে দান করেন।

প্র : সব্যয় ও অব্যয় শব্দ কাকে বলে?
উ : কতগুলি শব্দ আছে, যেগুলির লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিযোগে কোনোরূপ ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না। এগুলিকে বলে অব্যয় পদ। যথা : বাঃ, মরি মরি, টপ টপ, যেন, ওহে, তথা, যথা ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দ ছাড়া সব শব্দই সব্যয়।

প্র : অব্যয় পদ কাকে বলে?
উ : যে পদ বাক্যে ব্যবহার হয় কিন্তু কোনো বিভক্তি বা প্রত্যয় দিয়ে সংযুক্ত হয় না, একই রকম থাকে।

প্র : অব্যয় কত প্রকার ও কী কী?

উ : চার প্রকার। সমুচ্চয়ী বা সম্বন্ধবাচক, অনন্বয়ী, অনুসর্গ, অনুকার অব্যয়।

প্র : সমুচ্চয়ী বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যে অন্যপদগুলোকে সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়। এখানে সাধারণত একই ধরনের পদে বা বাক্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন : সংযোজক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সিদ্ধার্থ ও আলি দুই বন্ধু। বিয়োজক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সুরুজ অথবা শেফালি আজ রান্না করবে। সংকোচক সমুচ্চয়ী অব্যয় > সাগর অল্প পড়ে, বলেও কম কিন্তু খুব মেধাবী।

প্র : পদান্বয়ী অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যের দুটি পদের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করে। এসব ক্ষেত্রে এক প্রকার কারকবাচকতা দেখা যায়। যেমন : সুখের জন্য এ ঘর বেঁধেছি; তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে; পাগলের মতো কী বকছ?

প্র : অনুসর্গ অব্যয় কাকে বলে?

উ : পদান্বয়ী অব্যয়কেই অনুসর্গ অব্যয় বলে।

প্র : অনন্বয়ী অব্যয় কাকে বলে?

উ : যে অব্যয় বাক্যের অন্যপদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। সাধারণ বাক্যের বিস্ময়াত্মক শব্দরাজি এর অন্তর্গত। যেমন : আহা, আজি এ বসন্তে কত ফুল ফোটে; হ্যাঁ, আমার যাওয়া উচিত; বাহ, কি সুন্দর সকাল!

প্র : অনুকার অব্যয় কাকে বলে?

উ : বাংলায় যে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো বাক্যে অব্যয় হিসেবে ব্যবহার হয় তাকে অনুকার অব্যয় বলে। এগুলোকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ও বলে। যেমন : খাঁ খাঁ (শূন্যতা অর্থে) > বাড়িটি খাঁ খাঁ করছে। এরূপ :
কোকিলের রব > কুহু কুহু;
ঘোড়ার ডাক > চিহিঁ চিহিঁ;
নূপুরে নৃত্যধ্বনি > রুমঝুম;
স্রোতের ধ্বনি > কলকল;
মানুষের কান্না > ভেউ ভেউ ইত্যাদি।

প্র : ক্রিয়াপদ কাকে বলে?

উ : বাক্যে যে পদে কোনো কিছু করা, ঘটা, হওয়া অর্থাৎ কোনো কার্য সম্পাদন বোঝায়। যথা : আমি পড়ি।

প্র : অনুক্ত ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে বাক্য গঠনে ক্রিয়াপদ থাকতে হয়। এ কারণে ক্রিয়া পদকে আবশ্যিক পদও বলে। কিন্তু যখন বাক্যে ক্রিয়াপদ প্রকাশ্যে থাকে না, তখন তাকে অনুক্ত ক্রিয়া বলে। যথা : তোমার শরীর কেমন? (অনুক্ত ক্রিয়া > আছে)

প্র : ভাবপ্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়া কত ভাগে বিভক্ত?

উ : দুই ভাগে।
১. সমাপিকা ক্রিয়া,
২. অসমাপিকা ক্রিয়া।

প্র : সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়া প্রয়োগ করলে বাক্যের কথা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, অন্য ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।
যেমন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব।

প্র : অসমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়া প্রয়োগ করলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন : তুমি ভাত খেয়ে ... ।

প্র : অর্থভেদে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া কয়ভাগে বিভক্ত?

উ : দুইভাগে।
১. সকর্মক, ২. অকর্মক।

প্র : সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তাকে সকর্মক, যে ক্রিয়ার কর্মপদ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : সকর্মক ক্রিয়া > সে বই পড়ে। অকর্মক ক্রিয়া > আমি যাচ্ছি।

প্র : দ্বিকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : কতিপয় ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্যকর্ম, ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণকর্ম বলে। দুটি কর্মই ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক হলে ক্রিয়া দ্বিকর্মক হবে না। যেমন : স্বপনকে সংবাদ দাও। এখানে স্বপনকে গৌণ ও সংবাদ মুখ্য কর্ম। এরূপ, কাজল তোমাকে একটি গল্প বলেছে।/ শিবম চমৎকার ছবি আঁকে।/ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে ছুটি দিয়েছেন।

প্র : দুটি কর্মই ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক হলে ক্রিয়া কি দ্বিকর্মক হবে?

উ : না। যেমন : মা ছেলে ও মেয়েকে আদর করছেন। অথবা মালি গোলাপ ও জবা ফুল তুলছে। এই বাক্য দুটোতে করছেন ও তুলছে ক্রিয়া দুটো দ্বিকর্মক নয়। আসলে এখানে দুটো করে বাক্য। যেমন : মা ছেলেকে আদর করছেন। মা মেয়েকে আদর করছেন। তেমনি, মালি গোলাপ ফুল তুলছে। মালি জবা ফুল তুলছে।

প্র : সমধাতুজ কর্ম কাকে বলে?

উ : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ওই কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাতুর্থক কর্মপদ বলে। যেমন :
প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে।
—রবীন্দ্রনাথ

এমন খেলা সে খেলেছে!

প্র : প্রযোজক ক্রিয়া কাকে বলে?

উ : যে ক্রিয়ায় অন্যকে দিয়ে করানো বা সংঘটন বোঝায়। সংস্কৃতে একে নিজন্ত ক্রিয়া বলে। যেমন : মা শিশুকে পড়াচ্ছেন। সে ঝাড়ুদার দিয়ে মাঠ পরিষ্কার করাবে।

প্র : জাদুকর জাদু দেখায়।—এই বাক্যের প্রযোজক পদ বিশ্লেষণ কর।

উ : প্রযোজক কর্তা জাদুকর/ প্রযোজ্য কর্তা জাদু/ প্রযোজক ক্রিয়া দেখায়।

Scanned with CamScanner

পদ এবং Parts of Speech : সম্পর্ক

বাংলা ব্যাকরণের পদ প্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা থাকলে ইংরেজি Parts of Speech-এ তা কাজে লাগানো যায়। বাংলার বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া এবং ইংরেজির Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, Conjunction, Interjection-কে সমন্বিত করে নিচে পদ ও Parts of Speech-এর সম্পর্ক উল্লেখ করা হলো :

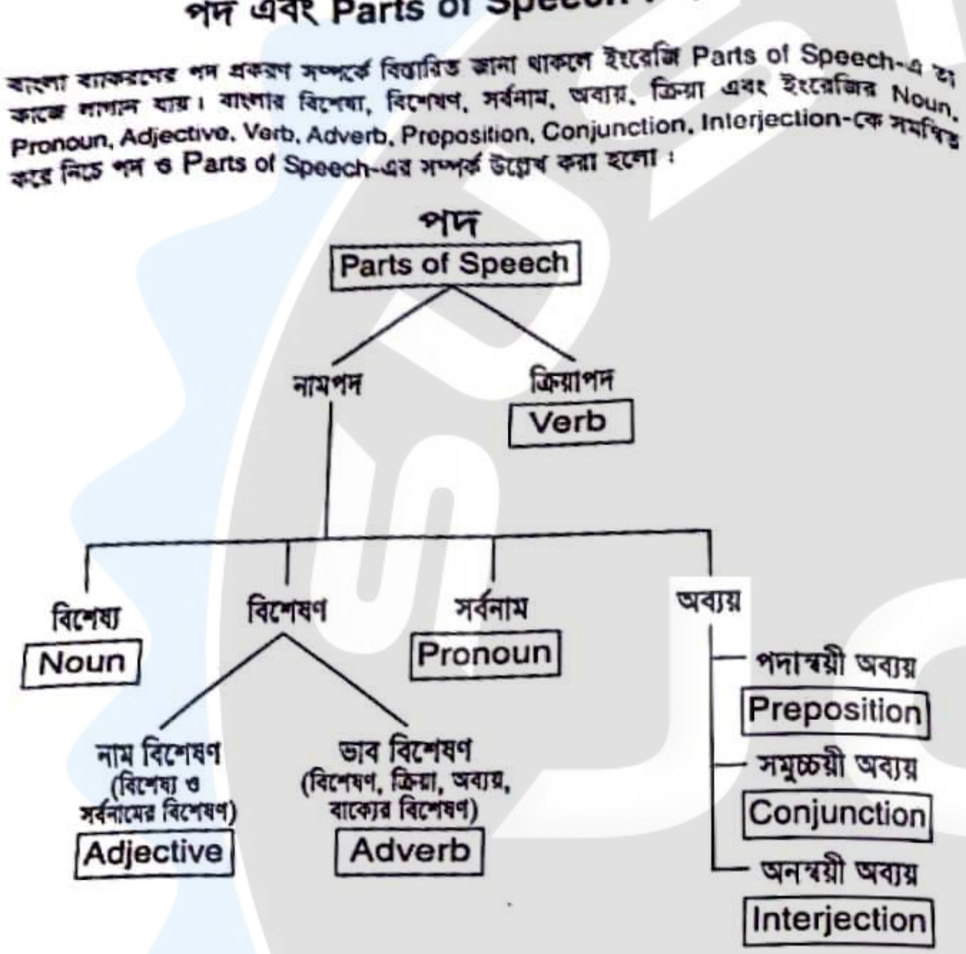

১. বিশেষ্য > Noun
২. বিশেষণ > Adjective – বিশেষ্য ও সর্বনামের বিশেষণ
Adverb – বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া ও বাক্যের বিশেষণ
৩. সর্বনাম > Pronoun
৪. অব্যয় > Conjunction – সমুচ্চয়ী
Preposition – পদান্বয়ী
Interjection – অনন্বয়ী
৫. ক্রিয়া > Verb

বি. দ্র. Parts of Speech-এ বাংলার অনুকার অব্যয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

অতএব, বাংলায় পদ ৫ প্রকার এবং ইংরেজিতে Parts of Speech ৮ প্রকার হলেও আসলে এ দুয়ের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো সূত্রবদ্ধ করলে দাঁড়ায় —

বিশেষ্য
NOUN

বাক্যে ব্যবহার হয়ে যে Word দিয়ে সাধারণত কোনো কিছুর নাম বোঝায়। তাকে Noun বা বিশেষ্য বলে। বিভিন্ন রকমের বিশেষ্য হতে পারে। বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়:

১. নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (Proper Noun) : Swapan, Alisha, Kajal, Sunday, January, Dhaka etc.
২. বস্তুবাচক বিশেষ্য (Material Noun) : Chair, Table, Wood, Sugar, Ball, Pen, Book, Cap, Rice, Jute, Paddy, Tea etc.
৩. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun) : Army, Team, Gang, Flock (পশু বা পাখির সমষ্টি) etc.
৪. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun) : Poet, Doctor, Novel, Flower, Fish, Man, Mother, Teacher, Young, King, Begger, Agent etc.
৫. গুণবাচক বিশেষ্য [Abstract Noun (From Adjective & Common Noun)]:
Adjective থেকে > Kindness, Honesty, Poverty, Pride, Wisdom, Darkness, Lenght, Justice etc.
Common Noun থেকে > Childhood, Kingship, Heroism, Youth, Motherhood, Friendship, Beggary etc.
৬. ভাববাচক বিশেষ্য [Abstract Noun (From Verb)] :
Action (Act থেকে)
Choice (Choose থেকে)
Belief (Believe থেকে)
Growth (Grow থেকে)
Knowledge (Know থেকে) etc.

সর্বনাম
PRONOUN

Noun-এর পরিবর্তে যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে Pronoun বা সর্বনাম বলা হয়। যেমন :

আমি	: I (আই)
আমাকে	: Me (মি)
আমার	: Mine (মাইন)
আমরা	: We (উই)
আমাদের	: Our (আওয়ার)
আমাদেরকে	: Us (আস)
আমাদের	: Ours (আওয়ারস)
ইহা, এটা	: It (ইট)
এই	: This (দিস)
এটা	: Its (ইটস)
এগুলো	: Those (দিজ)
ঐগুলো	: Those (দৌজ)
ওই	: That (দ্যাট)
কি	: What (হোয়াট)
কার, কাহার	: Whose (হুজ)
কাকে	: Whom (হোম)
কে, কারা	: Who (হু)
কোনটি	: Which (হুইচ)
তুমি	: You (ইউ)
তোমার	: Your (ইউর)
তার/তাহার (পুং)	: His (হিজ)
তাকে/তাহাকে	: Him (হিম)
তার/তাহার (স্ত্রী)	: Her (হ্যার)
তোমাদের	: Your (ইউর)
তারা	: They (দে)
তাদেরকে	: Them (দেম)
তাদের	: Their (দেয়ার)
তোমরা	: You (ইউ)
সে (পুং)	: He (হি)
সে (স্ত্রী)	: She (শি)

নাম-বিশেষণ
ADJECTIVE

যে Word কোনো Noun বা Pronoun-এর অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, দোষগুণ, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বোঝায় তাকে Adjective বা নাম বিশেষণ বলে। যেমন :

অনেক	: Many (ম্যানি)
অলস	: Lazy (লেজি)
অন্ধ	: Blind (ব্লাইন্ড)
উঁচু	: High (হাই)
উজ্জ্বল	: Bright (ব্রাইট)
কুৎসিত	: Ugly (আগলি)
কাল	: Black (ব্লাক)
খোড়া	: Lame (লেইম)
গরম	: Hot (হট)

Scanned with CamScanner

গোলাকার	: Round (রাউন্ড)
জ্ঞানী	: Wise (ওয়াইজ)
তরুণ	: Young (ইয়ং)
তিন	: Three (থ্রী)
দুই	: Two (টু)
দ্রুত	: Rapid (রেপিড)
দুর্বল	: Weak (উইক)
দয়ালু	: Kind (কাইন্ড)
ধনী	: Rich (রিচ)
ধারাল	: Sharp (শার্প)
নতুন	: New (নিউ)
নোংরা	: Dirty (ডার্টি)
নরম	: Soft (সফট)
ঠান্ডা	: Cold (কোল্ড)
পীড়িত	: Sick (সিক)
পরিষ্কার	: Clean (ক্লিন)
পুরাতন	: Old (ওল্ড)
পূর্ণ	: Full (ফুল)
পাতলা	: Thin (থিন)
পাকা	: Ripe (রাইপ)
প্রশস্ত	: Wide (ওয়াইড)
বৃহৎ	: Large (লার্জ)
বিখ্যাত	: Famous (ফেমাস)
ভালো	: Good (গুড)
মন্দ	: Bad (ব্যাড)
লম্বা	: Long (লং)
শক্ত	: Hard (হার্ড)
সুন্দর	: Fair (ফেয়ার)
সহজ	: Easy (ইজি)
সৎ	: Honest (অনেস্ট)
সুন্দর	: Nice (নাইস)
হলদে	: Yellow (ইয়েলো)

ভাব-বিশেষণ
ADVERB

যে সব Word Verb, Adjective, Preposition, Conjuction, Interjuction-এর ধরন, রকম বা প্রকৃতি প্রকাশ করে তাদেরকে Adverb বা ভাব বিশেষণ বলা হয়। যেমন :

অবশ্য	: Must (মাস্ট)
অধিক	: More (মোর)
অধিক	: Much (মাচ)
আজ	: Today (টুডে)
আগে	: Before (বিফোর)
ইতোমধ্যে	: Already (অলরেডি)
এখন	: Now (নাউ)
এখানে	: Here (হিয়ার)
উপরে	: Up (আপ)
উপরে	: Above (আবাভ)
ও, অতি	: Too (টু)
কখন, যখন	: When (হোয়েন)
কেন	: Why (হোয়াই)
কিরূপে	: How (হাউ)
কম	: Less (লেছ)
কঠোর	: Hard (হার্ড)
খুব	: Very (ভেরি)
গভীরভাবে	: Deeply (ডিপলি)
ছোট	: Little (লিটল)
জন্য	: For (ফর)
তখন	: Then (দেন)
দূরে	: Far (ফার)
দূরে	: Off (অফ)
দূরে	: Away (এওয়ে)
দ্রুত	: Fast (ফাস্ট)
দৈনিক	: Daily (ডেইলি)
নিকটে	: Near (নিয়ার)
নিচে	: Down (ডাউন)
না	: No (নো)
পেছনে	: Behind (বিহাইন্ড)
ব্যতীত	: Without (উইদাউট)
ভালো	: Well (ওয়েল)
মাত্র / কেবল	: Only (অনলি)
শীঘ্র	: Soon (সুন)
সকালে	: Early (আর্লি)
সহজভাবে	: Easily (ইজিলি)
সর্বদা	: Always (অলওয়েজ)
সেখানে	: There (দেয়ার)
হাঁ	: Yes (ইয়েস)

ক্রিয়া
VERB

যে Word দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে Verb বা ক্রিয়া বলা হয়। যেমন :

অন্বেষণ করা	: Seek (সিক)
অনুভব করা	: Feel (ফিল)
অপেক্ষা করা	: Wait (ওয়েট)
আবেদন করা	: Apply (অ্যাপলাই)
আঘাত করা	: Knock (নক)
আসা	: Come (কাম)
আঘাত করা	: Hit (হিট)
উড়া	: Fly (ফ্লাই)
ওঠা	: Rise (রাইজ)
কল্পনা করা	: Think (থিংক)
কথা বলা	: Speak (স্পিক)
কাটা	: Cut (কাট)
কাজ করা	: Work (ওয়ার্ক)
ক্রয় করা	: Buy (বাই)
করা	: Do (ডু)
কাজ করা	: Act (এ্যাকট)
খাওয়ানো	: Feed (ফিড)
খাওয়া	: Eat (ইট)
খনন করা	: Dig (গিড)
খোলা	: Open (ওপেন)
ঘুমান	: Sleep (স্লিপ)
ঘৃণা করা	: Hate (হেইট)
চিন্তা করা	: Think (থিঙ্ক)
চেষ্টা করা	: Try (ট্রাই)
চুম্বন করা	: Kiss (কিস)
চালনা করা	: Guide (গাইড)
জন্মান	: Grow (গ্রো)
জয় লাভ করা	: Win (উইন)
তাকান	: Look (লুক)
তৈরি করা	: Make (মেক)
ত্যাগ করা	: Leave (লিভ)
দৌড়ান	: Run (রান)
দাঁড়ান	: Stand (স্ট্যান্ড)
দেখা	: See (সি)
দেওয়া	: Give (গিভ)
ধরা	: Catch (ক্যাচ)
ধরা	: Hold (হোল্ড)
নিক্ষেপ করা	: Throw (থ্রো)
নড়াচড়া	: Move (মুভ)
টানা	: Draw (ড্র)
ডাকা	: Call (কল)
পানকরা	: Drink (ড্রিঙ্ক)
পড়া	: Read (রিড)

পরীক্ষা করা	: Test (টেস্ট)
প্রার্থনা করা	: Pray (প্রে)
প্রবেশ করা	: Enter (এন্টার)
পরিধান	: Dress (ড্রেস)
পাওয়া	: Get (গেট)
পরিচালনা করা	: Visit (ভিজিট)
প্রতীক্ষা করা	: Wait (ওয়েট)
পাশ করা	: Pass (পাস)
পছন্দ করা	: Like (লাইক)
পছন্দ করা	: Like (লাইক)
বলা	: Say (সে)
বলা	: Tell (টেল)
বসা	: Sit (সিট)
বন্ধ করা	: Shut (শাট)
বহন করা	: Carry (ক্যারি)
বাস করা	: Dwell (ডোয়েল)
বাধা দেওয়া	: Bar (বার)
বহন করা	: Bear (বিয়র)
বন্ধ করা	: Close (ক্লোজ)
বোনা	: Knit (নিট)
বাস করা	: Live (লিভ)
ব্যবহার করা	: Use (ইউজ)
বপন করা	: Sow (সৌ)
ভালোবাসা	: Love (লাভ)
ভাগ করা	: Divide (ডিভাইড)
মান্য করা	: Obey (ওবে)
মরা	: Die (ডাই)
মনে করা	: Mind (মাইন্ড)
যাওয়া	: Go (গউ)
যুদ্ধ করা	: Fight (ফাইট)
রাখা	: Put (পুট)
রাখা	: Lay (লে)
লেখা	: Write (রাইট)
শয়নকরা	: Lie (লাই)
শিক্ষা দেওয়া	: Teach (টিচ)
শ্রবণ করা	: Listen (লিসন)
শিক্ষা করা	: Learn (লার্ন)
শোনা	: Hear (হিয়ার)
স্থাপন করা	: Set (সেট)
সাক্ষাৎ করা	: Meet (মিট)
সাহায্য করা	: Help (হেল্প)
হিংসা করা	: Envey (এনভি)

Scanned with CamScanner

পদান্বয়ী অব্যয়
PREPOSITION

যে শব্দ কোনো Noun অথবা Pronoun-এর আগে বসে Sentence-এর অন্য শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, তাকে Preposition বলা হয়। Pre অর্থ পূর্বে, Position অর্থ অবস্থান- অর্থাৎ আগে অবস্থান। যেমন :

অনেকের মধ্যে	: Among (এমং)
এ, প্রতি	: At (এট)
এর	: Of (অফ)
উপরে	: Upon (আপন)
উপর দিয়ে	: Over (ওভার)
উপরে	: Above (এবাভ)
চারদিক	: About (এবাউট)
জন্য	: For (ফর)
থেকে, হতে	: From (ফ্রম)
থেকে, যেহেতু	: Since (সিনস্)
দিকে, প্রতি	: To (টু)
দ্বারা	: By (বাই)
দুয়ের মধ্যে	: Between (বিটুইন)
নিম্নে	: Below (বিলো)
নিচে	: Under (আন্ডার)
পাশে	: Beside (বিসাইড)
পরে	: After (আফটার)
পূর্বে	: Before (বিফোর)
ভিতরে	: Into (ইনটু)
মধ্যে	: In (ইন)
মধ্য দিয়ে	: Through (থ্রু)
মধ্যে	: Within (উইদিন)
সাথে, সঙ্গে	: With (উইথ)

সংযোজক অব্যয়
CONJUNCTION

যে Word দুটি Word বা তার অধিক Word কে যুক্ত করে অথবা দুটি Sentence যুক্ত করে তাকে Conjunction বা সংযোজক অব্যয় বলা হয়। যেমন :

অথবা	: Or (অর)
অতএব	: Therefore (দেয়ারফোর)
এবং	: And (এ্যান্ড)
এখনও, তথাপি	: Yet (ইয়েট)
একটিওনা	: Neither (নিদার)
উভয়	: Both (বোথ)
কারণ	: Because (বিকজ)
কিন্তু	: But (বাট)
চেয়ে, থেকে	: Than (দ্যান)
তাই	: So (সো)
দুয়ের মধ্যে একটি	: Either (ইদার)
নতুবা, নয়	: Nor (নর)
পরে	: After (আফটার)
যা হউক	: However (হাউয়েভার)
যে পর্যন্ত	: Until (আনটিল)
যেমন, যেহেতু	: As (এজ)
যদি	: If (ইফ)
যদিও	: Though (দো)
যতক্ষণ	: While (হোয়াইল)

অনন্বয়ী অব্যয়
INTERJECTION

যে সব Word দ্বারা দুঃখ, আনন্দ, হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় প্রভৃতি মনের আকস্মিক ভাব ও আবেগ প্রকাশ হয়, তাকে Interjection বলা হয়। যেমন:

আরে	: Oh (ওহ্)
ইস্	: Pooh (পুহ)
ওহে	: Hallo (হ্যালো)
কি মজা	: Hurrah (হুররা)
ঘোড়ার ডিম	: Dam Shite (ড্যাম সাইট)
চমৎকার	: Capital (ক্যাপিটাল)
চমৎকার	: Excellent (একসিলেন্ট)
ছিঃ ছিঃ	: Fie (ফাই)
থাম	: Tush (টাশ)
দেখা	: Lo (লো)
ধুর ছাই	: Dam (ড্যাম)
বিস্ময়, করুণা	: Ah (আহ্)
বাঃ বেশ	: Marvellous (মার্ভেলাস)
লজ্জা	: Shame (শেম)
শুন	: Hark (হার্ক)
সাবাস	: Bravo (ব্রাভো)
সুন্দর	: Beautiful (বিউটিফুল)
সাবাস	: Well done (ওয়েল ডান)
হে ঈশ্বর	: Oh God (ওহ্ গড)
হায় কপাল	: Oh! my godness (ওহ্! মাই গুডনেস)
হায়	: Alas (এলাস)

বাক্য-প্রকরণ

প্র : ভাষার প্রাণ কী?
উ : অর্থবোধক বাক্য।
প্র : বাক্যের গুণসমূহ কী?
উ : বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্য দর্পণে' বলেছেন : 'বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ।' অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা তিনটি বাক্যের গুণ।
প্র : বাক্যের আকাঙ্ক্ষা কাকে বলে?
উ : বাক্যের অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য এক পদের পর অন্যপদের যে সংস্থাপন, বাক্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতার যে না-মেটা কৌতূহল, তাকে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন : 'কাজল নিয়মিত লেখাপড়া।' এই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি।
প্র : আসত্তি কাকে বলে?
উ : বাক্যের পদগুলিকে অর্থসঙ্গতিক্রমে পূর্বাপর সন্নিবিষ্ট করার নাম আসত্তি। যেমন : করে ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সালে অর্জন। এই বাক্য আসত্তিহীন। '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।' আসত্তিপূর্ণ বাক্য।
প্র : আসত্তি অর্থ কী?
উ : আসত্তি অর্থ মিলন বা নৈকট্য বা পারস্পরিক সংযোগ।
প্র : যোগ্যতা কী?
উ : বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের বিশ্বাসযোগ্য ভাবসম্মিলনের নাম যোগ্যতা। সাধারণ গদ্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন : 'চাঁদে বসে মা শিশুকে ছাদ দেখাচ্ছেন।' এই বাক্য গদ্যে যোগ্যতাহীন। তবে কাব্যে ভুল নয়। অনুরূপভাবে, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'– এ পঙ্‌ক্তি কবিতায় মান্য হলেও গদ্যে যোগ্যতাহীন বলে বিবেচিত।
প্র : বাক্যে কী কী থাকলে তা যোগ্যতাহীন বলে বিবেচিত হয়?
উ : রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা, দুর্বোধ্যতা, উপমার ভুল প্রয়োগ, বাহুল্যদোষ, বাগধারার রদবদল, গুরুচণ্ডালী দোষ ইত্যাদি।
প্র : গুরুচণ্ডালী দোষ কাকে বলে?
উ : তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের একত্র ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। যেমন : 'ঘোড়াশকট' গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। হবে ঘোড়াগাড়ি বা অশ্বশকট। একইভাবে, 'শবপোড়া' হবে না। হবে 'শবদাহ' বা 'মড়াপোড়া'।
প্র : বাক্য কত প্রকার?
উ : তিন প্রকার। সরল, মিশ্র বা জটিল, যৌগিক বাক্য।
প্র : সরল বাক্য কাকে বলে?
উ : যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এবং যা অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত কিংবা সম্পর্কিত নয়। সরল বাক্যকে সাধারণ বাক্যও বলে। যেমন : বিমল খুব ভাল ছাত্র।
প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্য কাকে বলে?
উ : একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত এক বা একাধিক খণ্ড বাক্য সাধারণভাবে বা কোনো অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সাপেক্ষ সর্বনাম দিয়ে যুক্ত হয়ে পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হলে তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন : 'কাকলি বলল যে, শম্পাই কাজটি করেছে।' এখানে 'কাকলি বলল যে' প্রধান বাক্য আর অপ্রধান বাক্য হলো, 'শম্পাই কাজটি করেছে'।
প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দাও।
উ : মিশ্র বা জটিল বাক্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১. যে পরিশ্রম করে, সেই সুখলাভ করে।
২. যে ব্যক্তির মাথায় বুদ্ধি নেই, সে পরের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়।
৩. সবাই জানেন যে, কালো টাকার মালিকগণ সুখী হন না।
৪. লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না।
৫. যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে।

৬. আমি মাঠে গিয়ে দেখলাম, খেলা শেষ হয়ে গিয়েছে।
৭. তিনি বাড়ি আছেন কিনা আমি জানি না।
৮. লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।
৯. খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি, আমার দেশের মাটি।
১০. ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।
১১. যতই করিবে দান, ততই যাবে বেড়ে।
১২. তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, সখিনা বিবির কপাল ভাঙল।
১৩. তুমি ঢাকায় যাবে বলে, আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।
১৪. যারা ভালো ছাত্র, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে।
১৫. যে ভিক্ষা চায়, তাকে দান কর।
১৬. যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।
১৭. যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এ ঋণ স্বীকার করব।
১৮. যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাবো।
১৯. যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যেহেতু, সেহেতু প্রয়োগেও জটিল বাক্য হতে পারে। যেমন :

২০. যেহেতু তুমি প্রথম হয়েছ, সেহেতু পুরস্কার তুমিই পাবে।
২১. যেহেতু পড়াশোনা করেছ, সেহেতু কৃতকার্য হবেই।
২২. যেহেতু বৃষ্টিতে ভিজেছ, সেহেতু সর্দি তোমার হবেই।
২৩. যেহেতু নির্বাচন হয়েছে, সেহেতু দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবেই।

প্র : যৌগিক বাক্য কাকে বলে?

উ : সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরপেক্ষ একাধিক খণ্ডবাক্য সংযোগবাচক অব্যয়ের সাহায্যে (যেমন : ও, অথবা, এবং, কিন্তু, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি) যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ অর্থপ্রকাশ করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন : 'জয়দেবপুরের ভাওয়াল রাজারা কার্জন হলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তাঁরা হলের নির্মাণ ব্যয় সম্পূর্ণ বহন করেন'।

প্র : যৌগিক বাক্যের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দাও।

উ : যৌগিক বাক্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

১. মানুষ সূর্যোদয়ে আনন্দিত হয় এবং রাত্রির আগমনে পুলকিত হয়ে থাকে।
২. মোহিতলাল মজুমদার ভালো অধ্যাপক ছিলেন এবং তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।
৩. উদয়াস্ত পরিশ্রম করব, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।
৪. গিয়াস পড়াশোনা করেছিল প্রচুর কিন্তু পরীক্ষায় পাস করে নি।
৫. জননেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু কোনো পথ দেখাতে পারলেন না।
৬. তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয় নি।
৭. তিনি অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ।
৮. তাঁর টাকা আছে, কিন্তু তিনি দান করেন না।
৯. তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।
১০. আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।
১১. মিথ্যা কথা বলি নি, তাই বিপদে পড়েছি।
১২. তার বয়স বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নি।
১৩. মেঘ গর্জন করে, তবে ময়ূর নৃত্য করে।
১৪. বিপদ এবং দুঃখ এক সময়ে আসে।
১৫. মন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে যাবেন ও বন্যার্তদের তিনি সাহায্য দেবেন।
১৬. সে না এলে তুমি যাবে না, কিন্তু সে বলে পাঠিয়েছে যে তার আসতে দেরি হবে।
১৭. তারা দুজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্তু একজন যদি খাবার জন্য একটি বার্গার পায় দুজনে ভাগ করে খায়।
১৮. সে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না, এদিকে টাকা অভাব হলেই যার তার কাছে আত্মসম্মান বলি দিয়ে হাত পাতে।

প্র : সরল থেকে যৌগিক বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ : **সরল :** ভোর হলে, সে ব্যক্তি, ঐ ইউরোপীয়ের সঙ্গে কিছুটা দূরে গেল।
যৌগিক : যখন ভোর হলো তখন সে ব্যক্তি ঐ ইউরোপীয়ের সঙ্গে কিছুটা দূরে গেল।
সরল : গৃহস্বামী তার কাছে গিয়ে নিজের দুরবস্থা জানাল।
যৌগিক : সে গৃহস্বামীর কাছে গেল এবং নিজের দুরবস্থা জানাল।
সরল : তুমি আমাকে আমার বাড়িতে পৌছে দাও।
যৌগিক : যে স্থানে আমার বাড়ি তুমি আমায় সেখানে পৌছে দাও।
সরল : ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে।
যৌগিক : ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া লাগে এবং শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ যেন ঘনিয়ে তোলে।
সরল : শিমুল গাছটা বড় হলে চারদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।
যৌগিক : শিমুল গাছটা একদিন বড় হবে এবং চারিদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্থির করে দেবে।
সরল : গফুর কত কী চিন্তা করিয়া হঠাৎ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল।
যৌগিক : গফুর কত কী চিন্তা করিল এবং হঠাৎ সেই সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিল।
সরল : তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া পাষাণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে।
যৌগিক : তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে এবং পাষাণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে।

প্র : যৌগিক থেকে সরল বাক্য পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।

উ : **যৌগিক :** এখন পরকালের কর্ম করিব নাতো কবে করিব?
সরল : এখন পরকালের কর্ম না করিলে কবে করিব?
যৌগিক : সেইটে দেখে, আর বলাইয়ের মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে।
সরল : সেইটে দেখে বলাইয়ের মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে।
যৌগিক : আমার এক চাকর ছিল, তার নাম আবদুর রহিম।
সরল : আবদুর রহিম নামে আমার এক চাকর ছিল।
যৌগিক : বৈশাখ শেষ হইয়া আসে কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই।
সরল : বৈশাখ শেষ হইয়া আসিলেও মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই।
যৌগিক : কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না।
সরল : কবিত্ব আমার আসে না বলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না।

প্র : সরল থেকে মিশ্র বা জটিল বাক্যে পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

উ : **সরল :** রৌদ্রতাপ কমে এলে পরামর্শ করা যাবে।
মিশ্র বা জটিল : যখন রৌদ্রতাপ কমবে তখন পরামর্শ করা যাবে।
সরল : শোনামাত্র তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।
মিশ্র বা জটিল : যখনই তারা শুনল তখনই তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।
সরল : গণ্ডির বাইরে গেলেই বিষম বিপদ।
মিশ্র বা জটিল : যখনই গণ্ডির বাইরে যাবে তখনই বিষম বিপদে পড়বে।
সরল : এই-সব প্রকাণ্ড গাছের ভিতরকার মানুষকেও যেন বলাই দেখতে পায়।
মিশ্র বা জটিল : এইসব প্রকাণ্ড গাছের ভিতর যে মানুষ আছে, তাকে বলাই যেন দেখতে পায়।
সরল : গোড়ায় বলাই শিমুল গাছটা না দেখালে ওটা আমার হয়তো লক্ষ্যই হতো না।
মিশ্র বা জটিল : গোড়ায় বলাই শিমুল গাছটা না যদি দেখাত হবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হতো না।
সরল : ইহারই সীমানার পথের ধারে গফুরের বাড়ি।

মিশ্র বা জটিল : ইহার সীমানার পত্তের ধারে গফুরের বাড়ি।

সরল : চোখ বেঁধে দিলেও ঠিক বের করতে পারব কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান।

মিশ্র বা জটিল : যদি চোখ বেঁধে দাও তবু ঠিক বের করতে পারব কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান।

সরল : পয়লা পয়লা কাজে নেমে সবাই ভিরমি খায়।

মিশ্র বা জটিল : পয়লা পয়লা যারা কাজে নামে তারা সবাই ভিরমি খায়।

প্র : মিশ্র বা জটিল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্য পরিবর্তনের উদাহরণ দাও।

উ : মিশ্র বা জটিল : বাইরে এসে দেখলাম যে প্রায় প্রভাত হয়েছে।

যৌগিক : বাইরে এলাম এবং প্রায় প্রভাত হয়েছে দেখলাম।

মিশ্র বা জটিল : তারা যদিও কথা কয় না, কিন্তু বলাই সমস্ত কথাই যেন জানে।

যৌগিক : তারা কথা কয় না, কিন্তু বলাই সমস্তই যেন জানে।

যতি বা ছেদ-চিহ্ন

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন কী?

উ : বাক্য লেখার সময় যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করে লেখক নিজের আনন্দ-আবেগ, জিজ্ঞাসা-প্রশ্ন ইত্যাদি প্রকাশ করেন এবং যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করে ভাব প্রকাশের বিরতি বা সমাপ্তি বুঝিয়ে থাকেন, সেই চিহ্নসমূহকে যতি বা ছেদ-চিহ্ন বলা হয়।

প্র : প্রাচীন বাংলায় কোনো ছেদ-চিহ্ন ছিল কি?

উ : আজকের মতো বিচিত্র ছেদ-চিহ্ন ছিল না। এক দাঁড়ি (।) এবং দুই দাঁড়ি (॥) ছিল। এক দাঁড়ি দিয়ে কমার মতো অল্প বিরাম এবং দুই দাঁড়ি দিয়ে অধিক বিরাম বোঝাতো। যেমন :

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥'

প্র : বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রবর্তক কে?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্য বা কবিতা কোথাও যথাযথ যতিচিহ্ন ব্যবহার হতো না। শুধু পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়িজ্ঞাপক চিহ্নটি (এক দাঁড়ি / দুই দাঁড়ি) ছিল। বিদ্যাসাগর গদ্য রচনাকালে বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন তিনি গদ্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব ভাগ করে ইংরেজি গদ্য থেকে সবগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন বাংলায় ব্যবহার করেন। যেহেতু বাংলায় পূর্ণচ্ছেদ জ্ঞাপক দাঁড়ি(।) আগেই ছিল, সেহেতু তিনি ফুলস্টপ (.) গ্রহণ না-করে বাংলার নিজস্ব সম্পদ দাঁড়ি (।)কেই রক্ষা করলেন। বিদ্যাসাগর যে যতিচিহ্নসমূহ বাংলায় ব্যবহার করেন আজো এর সবগুলোর বাংলা-নাম হয় নি। কোনোটির বাংলা নাম হলেও তা ইংরেজি নামেই বেশি পরিচিত।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্নসমূহ উল্লেখ কর।

উ :

নাম	চিহ্ন	বিরতি-কাল
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	(।)	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসাচিহ্ন	(?)	ওই
বিস্ময়চিহ্ন	(!)	ওই
কোলন	(:)	ওই
কোলন-ড্যাস	(:-)	ওই
ড্যাস	(-)	ওই
কমা	(,)	১ উচ্চারণের সময়
সেমিকোলন	(;)	১ উচ্চারণের দ্বিগুণ সময়
উদ্ধরণ চিহ্ন	(" ")	'এক' উচ্চারণের সময়
হাইফেন	(-)	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক্ বা	(')	ওই লোপচিহ্ন
একটি ডট্ বা শব্দসংক্ষেপ	(.)	ওই
তিনটি ডট্ বা পূর্ণলোপ	(...)	ওই
প্রথম বন্ধনী	(( ))	ওই
দ্বিতীয় বন্ধনী	([ ])	ওই
তৃতীয় বন্ধনী	([ ])	ওই

(নোট : অনেকে কোলন-ড্যাসকে পৃথক যতিচিহ্ন হিসেবে স্বীকার করেন না।)

প্র : যতিচিহ্নসমূহের বিরতি-কাল সূত্রবদ্ধ কর।

উ : থামার প্রয়োজন নেই : হাইফেন, ইলেক, ডট, ব্রাকেট।

১ সেকেন্ড থামতে হবে : দাঁড়ি, বিস্ময়, প্রশ্নবোধক, কোলন, কোলন-ড্যাস, ড্যাস।

১ (এক) বলতে যে-সময় : কমা, উদ্ধরণচিহ্ন।

১ বলার দ্বিগুণ সময় : সেমিকোলন।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্নগুলোকে কী কী বাংলা পারিভাষিক নামে চিহ্নিত করা যায়?

উ : Comma (,) > পাদচ্ছেদ; Semi-Colon (;) > অর্ধচ্ছেদ; Colon (:) > দৃষ্টান্তচ্ছেদ;
Note of interrogation (?) > প্রশ্নবোধক বা প্রশ্নচিহ্ন; Note of exclamation (!) > বিস্ময়চিহ্ন; Dash (–) > রেখাচিহ্ন; Inverted Commas (' ') > উদ্ধরণচিহ্ন বা উদ্ধৃতিচিহ্ন; Hyphen (-) > পদযোজক চিহ্ন ইত্যাদি। পরিভাষা তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। একে লোকপ্রিয় করতে প্রচুর ব্যবহার করতে হয়। এজন্য চাই দেশপ্রেমের গরজ এবং একাগ্রতা।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন কেন?

উ : দাঁড়ি (।) : বাক্যের অর্থ সমাপনান্তে পরিসমাপ্তি বোঝাতে।
যেমন : রহিম ঘরে ঢুকে করুণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল।

জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?) : বাক্যে কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা বুঝাতে।
যেমন : তুমি কি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেছ?

বিস্ময়চিহ্ন (!) : হৃদয়ের বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশার্থে। অবশ্য সম্বোধনে আবেগ বোঝালেও এই চিহ্ন বসে।
যেমন : আহ! কী করুণ দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

কোলন (:) : বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্য জ্ঞাপনের সময়।
যেমন : কমিটিতে সিদ্ধান্ত হলো : আগামী মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ড্যাস (—) :

ক. কোনো কথার উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বুঝাতে।
যেমন : পঠনানুসারে শব্দ দুই প্রকার — মৌলিক শব্দ, সাধিত শব্দ।

খ. পৃথক স্বাধীন একাধিক বাক্য এক বাক্যে স্থাপনের সময়।
যেমন : তোমরা কায়িক শ্রম কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না — বাড়বে।

কমা (,) :

ক. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে।
যেমন : স্যার, আমাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেবেন?

খ. সমজাতীয় পদ পাশাপাশি বসলে তাদের পর কমা বসে।
যেমন : হাঁস, মুরগি, ভেড়া, ছাগল গৃহপালিত পশু। (বিশেষ্য অর্থে); অর্ক চালাক, চতুর, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ। (বিশেষণ অর্থে)।

গ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসে।
যেমন : লেখাপড়া করে যে, বাড়ি গাড়ি করে সে।

ঘ. তারিখ লেখার সময় মাস ও দিনের পর কমা বসে।
যেমন : সোমবার, ২৫শে জুন, ১৯৮৭ সাল।

ঙ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে।
যেমন : ৮৩, নিউপল্টন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।

সেমিকোলন (;) :

ক. কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির জন্য সেমিকোলন বসে।

খ. কমার বারংবার ব্যবহারের পর কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারের আগে সেমিকোলন বসে।

গ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি স্বাধীন বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।
যেমন : তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

হাইফেন (-) : একাধিক শব্দ বা পদ সংযোগ দেবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন : আমার মা-বাবা গ্রামে থাকেন।

ইলেক বা লোপ চিহ্ন (') : এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণের লোপ বোঝাতে।
যেমন : দুরন্ত বেগে যাচ্ছে কা'রা (এখানে 'কা'রা' কাহারা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 'হা' লোপ পেয়েছে।)

উদ্ধরণ চিহ্ন (" ") : কোনো বক্তব্য বা তথ্য প্রত্যক্ষ বা হুবহুভাবে ব্যবহারকালে।
যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।"

একটি ডট বা শব্দসংক্ষেপ (.) : কোনো শব্দ সংক্ষেপ করতে হলে ব্যবহার হয়।
যেমন : ডক্টর > ড.; মোহম্মদ > মো.।

তিনটি ডট বা পূর্ণলোপ (...) : বাক্যের কোনো অংশ বা শব্দাবলি বিলোপ বা উল্লেখ না-করার প্রয়োজনে।

বন্ধনী চিহ্ন ((), {}, []) : এগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন নয়। তবে বাক্যে বিশেষ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হলে বাক্যের ভেতর এর ব্যবহার হয়।

প্র : যতি বা ছেদ-চিহ্ন ছাড়াও কতিপয় চিহ্ন বাংলা ব্যাকরণ বা গদ্যে ব্যবহার হয়, সেগুলো কী?
উ : √ : ধাতুর চিহ্ন
< : পরবর্তী থেকে পূর্ববর্তী
> : পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী
= : সমস্বয় বোঝাতে।

সমার্থক ও প্রতিশব্দ

মূলশব্দ	সমার্থক ও প্রতিশব্দ
অগ্নি	অনল, বহ্নি, হুতাশন, পাবক, বৈশ্বানর, আশুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হোমাগ্নি, কৃশানু, সর্বতচি, বিভাবসু।
অশ্ব	ঘোড়া, বাজী, হয়, তুরগ, ঘোটক, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, ত্রেষা।
অন্ধকার	আঁধার, তিমির, তমঃ, তমিস্র, আঁধিয়ার, আন্ধার।
অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্র, অধিক, অত্যন্ত, একান্ত, নিতান্ত, পরম, সাতিশয়, অত্যধিক।
অনঙ্গ	ফুলশর, মনোজ, পুষ্পধনু, মনসিজ, মদন, ফুলধনু, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, মন্মথ, পঞ্চশর, স্মর, রতিপতি, মনোভব, মকরকেতু, মকরধ্বজ, মকরকেতন, মীনকেতন, মীনধ্বজ।
অন্ন	ভাত, ওদন, আহার, দব্য, তণ্ডুল।
অন্নদা	পার্বতী, দুর্গা, অন্নদাত্রী, ভগবতী, অন্নপূর্ণা, শিবপত্নী, জগদম্বা, উমা, অপর্ণা, জগন্মাতা।
অপবাদ	দুর্নাম, বদনাম, কুৎসা, নিন্দা।
আনন্দ	হর্ষ, পুলক, আহ্লাদ, সুখ, খুশি, তৃপ্তি, সন্তোষ।
আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, উপদেশ, অনুশাসন, অনুজ্ঞা, নির্দেশ।
আকাশ	খ, গগন, নভঃ, অন্তরিক্ষ, ব্যোম, শূন্য, দ্যুলোক, ছায়ালোক, অনন্ত, আসমান, অম্বর, নভোমণ্ডল, দ্যু।
ইচ্ছা	অভিলাষ, বাঞ্ছা, অভিপ্রায়, স্পৃহা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিরুচি. সাধ, মনোরথ, আকিঞ্চন, আগ্রহ, লালসা।
ইতি	শেষ, যবনিকা, সমাপ্তি, রফা, অন্তিম, সাঙ্গ, অবশিষ্ট, অবসান।
ঈশ্বর	ইষ্ট, ভগবান, বিধাতা, ধাতা, আল্লাহ, খোদা, জগন্নাথ, ঈশ, সৃষ্টিকর্তা, অনন্ত, বিশ্বপতি, বিভু, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর, বিধি, জগদীশ, জগৎপতি, জগবন্ধু, ধাতা, স্রষ্টা, প্রজাপতি, স্বয়ম্ভু, প্রভু, জগদাধিপতি।
ঈর্ষা	বিরাগ, হিংসা, অপ্রীতি, বৈরভাব, দ্বেষ, অসূয়া, বিদ্বেষ, বৈরিতা, পরশ্রীকাতরতা।
ঊর্মি	ঢেউ, তরঙ্গ, বীচি।
উচ্ছেদ	বিনাশ, উৎপাটন, উন্মূলন, স্থানচ্যুতি।
উগ্র	রূঢ়, নিষ্ঠুর, তীক্ষ্ণ, প্রখর, ভয়ানক, কোপন, প্রচণ্ড, কর্কশ, তীব্র, ক্রুদ্ধ
উজ্জ্বল	আলোকিত, উদ্ভাসিত, ঝলমলে, দীপ্ত, দীপ্তিমান, প্রদীপ্ত, চকচকে, শোভমান, প্রজ্বলিত।
কর্ণ	শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কান, শ্রবণপথ, শ্রোত্র, শ্রুতিপথ, শ্রবণবিবর।
কেশ	চুল, কুন্তল, অলক, চিকুর, কেশপাশ, কেশদাম, কবরী।
কিরণ	কর, প্রভা, দীপ্তি, জ্যোতি, অংশু, রশ্মি, আলো, আলোক, বিভা, ময়ূখ।
কোরক	কুঁড়ি, মুকুল, কলি, কলিকা, বউল (আমের মুকুল)।
কোকিল	কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, কলকণ্ঠ, পিক, পরভৃত, বসন্তদূত, অন্যপুষ্ট, মধুস্বর, মধুসখা।
কপাল	ভাল, ভাগ্য, ললাট, অলিক, নিয়তি, অদৃষ্ট, দৈব।
কুল	গোত্র, গোষ্ঠী, কৌলীন্য, বংশ, সমাজ, আভিজাত্য, জাতি, বর্ণ।
কন্যা	নন্দিনী, আত্মজা, দুহিতা, মেয়ে, সুতা, তনয়া, দুলালী।
কুহক	মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি, প্রতারণা, ছল, ধোঁকা।
কথা	উক্তি, বচন, বিবৃতি, বক্তব্য, অঙ্গীকার, গদ্য, পরামর্শ, আখ্যান, গল্প, ভাষণ, বাক্য।
কালো	অসিত, শ্যাম, শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ।
খবর	সংবাদ, বার্তা, ফরমান, সন্দেশ, সন্ধান, তথ্য, সমাচার।
খড়্গ	তলোয়ার, কৃপাণ, তরবারি, অসি।
গঙ্গা	সুরধুনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী, জহ্নুকন্যা।
গরু	ধেনু, গো, গাভি, পয়স্বিনী।
গৃহ	আলয়, ভবন, নিলয়, নিকেতন, সদন, আগার, ঘর, বাড়ি, আবাস, ধাম, বাটী, নিবাস, কক্ষ, নিকেত, আশ্রয়, বাসস্থান।
ঘন	মেঘ, বারিদ, জলধর, অম্বুদ, পয়োধর, নীরদ, জলদ, জীমূত, তোয়দ, পর্জন্য, পয়োদ, বলাহক, তোয়ধর।
চন্দ্র	চাঁদ, সুধাংশু, সুধাকর, শশাঙ্ক, শশধর, শশী, হিমাংশু, বিধু, নিশাকর, সোম, শীতাংশু, সুধানিধি, কলানিধি, হিমকর, ইন্দু, চন্দ্রমা, নিশাপতি, দ্বিজরাজ, নিশাকান্ত, মৃগাঙ্ক, কলাধর, কলাভৃৎ, কুমুদনাথ।
চক্ষু	দর্শন, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, চোখ, আঁখি।
জল	সলিল, বারি, অপ্, উদক, অম্বু, নীর, পয়ঃ, তোয়, পানি, অম্ভঃ, অর্ণঃ।
জ্যোৎস্না	চাঁদিনী, চন্দ্রিমা, কৌমুদী।
ঝড়	ঝটিকা, বাত্যা, প্রবলবায়ু, ঘূর্ণিবায়ু, ঝঞ্ঝা।
দেবতা	সুর, দেব, ত্রিদশ, অমর, অজর, ঠাকুর, ঈশ্বর।
দেহ	কায়া, কলেবর, গা, গাত্র, তনু, শরীর, অঙ্গ, কায়।
দোকান	আপণ, বিপণি, হাট, পণ্যশালা, পণ্যনিকেতন, পণ্যগৃহ, পণ্যবিচিত্রা।
দিবস	দিবা, দিনমান, তমসতাড়িনী, অযামিনী, অহন, দিন, অহ্ন।
দীন	নিঃস্ব, দরিদ্র, সহায়হীন, গরিব, অতি দুঃখী, অর্থহীন, কাতর, হীন, অভাবগ্রস্থ।
ধন	বিত্ত, অর্থ, সম্পদ, বিভব, বৈভব, বিভূতি, নিধি, ঐশ্বর্য, বিত্ত।
নদী	স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী, তটিনী, তরঙ্গিনী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, কলস্বিনী, কল্লোলিনী, গাঙ, পয়স্বিনী, নির্ঝরিণী, সরিৎ।
নারী	স্ত্রীজাতি, বনিতা, ভামিনী, কান্তা, সীমন্তিনী, পত্নী, বামা, রামা,

নকল	অনুকরণ, অনুসরণ, ভেজাল, প্রতিলিপি, দূষণীয় কাগজ।	
পিতা	জনক, বাপ, তাত, বাবা, জন্মদাতা, আব্বা।	
পৃথিবী	ধরা, ধরণি, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, ভূ, ভূমণ্ডল, অবনি, ক্ষিতি, মহী, বসুমতী, মেদিনী, জগৎ, মর্ত্যলোক, ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব, অখিল, ভুবন, ভূমি, পৃথ্বী, দুনিয়া, ভুবন, ভূলোক, উর্বী, মরলোক, সংসার।	
পাখি	পক্ষী, বিহগ, বিহঙ্গ, খগ, গরুড়, বিহঙ্গম, শকুন্ত, খেচর, দ্বিজ, অণ্ডজ, পতত্রী।	
পাপ	পাতক, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি।	
পদ্ম	শতদল, উৎপল, নলিনী, অরবিন্দ, সরসিজ, পঙ্কজ, সরোজ, কমল, কুবলয়, তামরস, সরোরুহ, কোকনদ, ইন্দীবর, কুমুদ, পুণ্ডরীক, রাজীব, পুষ্কর।	
পুত্র	আত্মজ, নন্দন, সুত, তনয়, ছেলে, দুলাল, সূনু, অঙ্গজ।	
পর্বত	মহীধর, পাহাড়, গিরি, অচল, শৈল, ভূধর, অদ্রি, শিখরী, শৃঙ্গী, শৃঙ্গধর, মহীধ্র, ভূভৃৎ, নগ।	
ফুল	কুসুম, পুষ্প, প্রসূন।	
বায়ু	অনিল, পবন, বাতাস, হাওয়া, সমীরণ, সমীর, বাত, মরুৎ, প্রভঞ্জন, মারুত, গন্ধবহ।	
বন	অরণ্য, জঙ্গল, অটবি, কানন, বিপিন, গহন, কুঞ্জ, কান্তার উপবন, বনানী।	
বৃক্ষ	গাছ, পাদপ, তরু, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী, শৃঙ্গী, শিখরী, পণী।	
বিদ্যুৎ	বিজলি, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, চিকুর, দামিনী, শম্পা, অচিরপ্রভা।
বধূ	স্ত্রী, পত্নী, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, কলত্র, অঙ্গনা, বনিতা, ভার্যা, জায়া, গৃহিণী, গিন্নি, দারা।
বন্ধু	সখা, মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব।
বস্ত্র	বসন, বাস, পরিধেয়, অম্বর, কাপড়, পরিচ্ছদ, পোশাক।
ভ্রমর	মধুকর, ষট্‌পদ, মধুপ, অলি, ভৃঙ্গ, শিলীমুখ, মধুলিট্, মধুলিহ, দ্বিরেফ, মধুভৃৎ, জোয়রা, মৌমাছি, মধুমক্ষিকা।
মাতা	জননী, মা, অম্বা, প্রসূতি, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী, আম্মা।
ময়ূর	কলাপী, কেকা, শিখী, শিখণ্ডী, কেকী, বর্হী।
মৃত্যু	অন্ত, ইন্তেকাল, বিনাশ, মরণ, নাশ, নিধন, নিপাত, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, দেহত্যাগ, লোকান্তরপ্রাপ্তি, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, ইহলীলা সংবরণ, চিরবিদায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।
যুদ্ধ	সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, রণ।
রাজা	নৃপেন্দ্র, নৃপতি, নরেশ, ভূপতি, ভূপ, নরপতি, ভূপাল, মহীপাল, দণ্ডধর, রাজ্যপাল, নরপাল, দণ্ডপাল, নরেন্দ্র, ক্ষিতিপ, প্রজাধিপ, ক্ষিতিপতি, নৃপ, মহীনাথ, মহীন্দ্র, মহীপ, ক্ষিতীশ, বাদশা, সম্রাট।
রাত্রি	নিশি, রাত, নিশা, রজনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী, ক্ষণদা, নিশীথিনী, ত্রিযামা।
শত্রু	অরাতি, অরি, বৈরি, অররু, রিপু, প্রতিপক্ষ।
সূর্য	রবি, ভানু, আফতাব, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, তপন, দিনমণি, মার্তণ্ড, অর্ঘমা, অংশুমালী, অর্ক, পুষা, সবিতা, সুর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান, মিহির, অরুণ, দিনেশ, দিননাথ, কিরণমালী, ময়ূখমালী, বিভাকর, বালার্ক, দিবাবসু, হরিদশ্ব।

সমুদ্র	সাগর, রত্নাকর, জলধি, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, উদধি, অর্ণব, অম্বুধি, পয়োধি, পারাবার, জলনিধি, নীলাম্বু, পাথার, পয়োনিধি, জলধর, অম্বুনিধি, তোয়নিধি, বারীশ, বারীন্দ্র।	সোনা	কনক, স্বর্ণ, কাঞ্চন, হিরণ্য, সুবর্ণ, হেম, হিরণ।
সর্প	সাপ, ফণী, ভুজঙ্গ, ভুজগ, অহি, পন্নগ, নাগ, উরগ, আশীবিষ, ভুজঙ্গম, ফণাধর, বিষধর, বায়ুভুক।	সাদা	সিত, শ্বেত, শুভ্র, সফেদ, শুভ্র, অবর্ণিত, ধবল, নির্মল, শুচি।
সুন্দর	মনোহর, মনোরম, শোভন, সুদৃশ্য, চারু, রমণীয়, রম্য।	সিংহ	পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, নৃপরাজ, হরি, হর্যক্ষ।
স্বর্গ	বেহেশ্‌ত, সুরলোক, অমরাবতী, দ্যুলোক, দেবলোক।	সমূহ	গণ, বৃন্দ, চয়, নিচয়, সুন্দর, পটল, বর্গ, মালা, রাজি, সকল।
		হস্ত	বাহু, ভুজ, কর, হাত, পাণি।
		হস্তী	হাতি, করী, দ্বিপ, মাতঙ্গ, বারণ, গজ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ।

বিপরীতার্থক শব্দ

প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ	প্রদত্ত শব্দ	বিপরীত শব্দ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	অর্জন	বর্জন
অনুলোম	প্রতিলোম	অর্পণ	গ্রহণ
অনুজ	অগ্রজ	অতিকায়	ক্ষুদ্রকায়
অন্তর	বাহির	অলীক	সত্য
অপকার	উপকার	অম্ল	মধুর
অমৃত	বিষ, গরল	অগ্র	পশ্চাৎ
অনুরক্ত	বিরক্ত	অভ্যাস	অনভ্যাস
অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ	অপরাধ	নিরপরাধ
অনুকূল	প্রতিকূল	অগ্রগামী	পশ্চাৎগামী
অনুরাগ	বিরাগ	অশন	অনশন
অণু	বৃহৎ	অন্ধকার	আলোক
অন্ত্য	আদ্য	অবনত	উন্নত
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ		
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আকুঞ্চন	বিকুঞ্চন, প্রসারণ
অর্থ	অনর্থ	আগম	লোপ
অনির্বাণ	নির্বাণ	আদর	ঘৃণা
অধিত্যকা	উপত্যকা	আদ্য	অন্ত্য
অবিরল	বিরল	আপত্তি	সম্মতি
অসীম	সসীম	আবাহন	বিসর্জন
অধম	উত্তম	আবির্ভাব	তিরোভাব
অলস	পরিশ্রমী	আশু	বিলম্ব
অর্বাচীন	প্রাচীন	আশ্লেষ	বিশ্লেষ
অগ্রজ	অনুজ	আসক্ত	বিরক্ত

আগমন	নির্গমন/প্রত্যাগমন
আলোক	অন্ধকার
আশা	নিরাশা
আচার	অনাচার
আত্মীয়	অনাত্মীয়
আবশ্যক	অনাবশ্যক
আবিল	অনাবিল
আস্থা	অনাস্থা
আস্তিক	নাস্তিক
আঁটি	শাঁস
আদান	প্রদান
আমদানি	রপ্তানি
আয়	ব্যয়
আসলে	কর্জে
আকাশ	পাতাল
আরোহণ	অবতরণ
আলস্য	শ্রম
আর্দ্র	শুষ্ক
আড়ি	ভাব
আবদ্ধ	মুক্ত
আগ্রহ	উপেক্ষা
আদিষ্ট	নিষিদ্ধ
আকস্মিক	চিরন্তন
আবৃত	অনাবৃত/উন্মুক্ত
আসামি	বাদী
আময়	নিরাময়
ইহ	পরত্র
ইতর	ভদ্র
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
ইষ্ট	অনিষ্ট
ইহকাল	পরকাল
ঈষৎ	অধিক
ঈদৃশ	তাদৃশ
ঈর্ষা	প্রীতি
ঈপ্সিত	অনীপ্সিত
উচ্চ	নীচ
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ
উত্থান	পতন
উদয়	অস্ত
উন্মুখ	বিমুখ
উন্মীলন	নিমীলন
উজান	ভাটি
উক্ত	অনুক্ত
উত্তম	অধম

উপরোধ	অনুরোধ
উপকার	অপকার
উপস্থিত	অনুপস্থিত
উগ্র	মৃদু / সৌম্য
উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উহ্য	স্পষ্ট
উজ্জ্বল	ম্লান
উন্নতি	অবনতি
উপচয়	অপচয়
উৎকৃষ্ট	অপকৃষ্ট
উপসর্গ	অনুসর্গ
উপগত	অপগত
উদ্ধত	বিনীত
উত্তরণ	অবতরণ
উদার	সংকীর্ণ
ঋজু	বক্র
ঊর্ধ্ব	অধঃ
ঊষা	সন্ধ্যা
ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী
একাল	সেকাল
এযুগ	সেযুগ
একমত	দ্বিমত
এপিঠ	ওপিঠ
ঐহিক	পারত্রিক
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক
এঁড়ে	বকনা
ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
ঐক্য	অনৈক্য/বিভেদ
ঔদ্ধত্য	বিনয়
ঔদার্য	কার্পণ্য
কুটিল	সরল
কৃত্রিম	স্বাভাবিক
কৃপণ	বদান্য
কুৎসিত	সুন্দর
কৃষ্ণ	শুক্ল, শুভ্র
কোমল	কঠিন/কর্কশ
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন
কুৎসা	প্রশংসা
করাল	সৌম্য
কপট	অকপট
কেজো	অকেজো
কৃশ	স্থূল

কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কর্কশ	কোমল
কাজ	অকাজ
কান্না	হাসি
ক্রয়	বিক্রয়
ক্রোধ	প্রীতি
ক্ষীণ	পুষ্ট
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষিপ্ত	শান্ত
ক্ষয়	বৃদ্ধি
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
খোলা	ঢাকা
খ্যাতি	অখ্যাতি
খাতক	মহাজন
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গাম্ভীর্য	চাপল্য
গুপ্ত	ব্যক্ত, প্রকাশিত
গোপন	প্রকাশ
গরল	অমৃত
গ্রহণ	বর্জন
গৌরব	লাঘব
গ্রাম্য	নাগরিক/শহুরে
গুরু	লঘু
গৃহী	সন্ন্যাসী
গঞ্জনা	প্রশংসা
গৌণ	মুখ্য
গ্রহীতা	দাতা
গুরু	শিষ্য
ঘাত	প্রতিঘাত
ঘোলা	স্বচ্ছ
ঘন	তরল
ঘরে	বাইরে
চঞ্চল	স্থির
চড়াই	উৎরাই
চেতন	জড়
চোর	সাধু
চতুর	নির্বোধ
চোখা	ভোঁতা
চেনা	অচেনা
চয়	অপচয়
চক্ষুষ্মান	অন্ধ
ছাড়া	ধরা

জঙ্গম	স্থাবর
জরা	যৌবন
জয়	পরাজয়
জুগুপ্সা	শ্রদ্ধা
জোয়ার	ভাটা
জন্ম	মৃত্যু
জীবন	মরণ
জানা	অজানা
জড়	চেতন
জাগরিত	নিদ্রিত
জাগ্রত	সুপ্ত
জটিল	সহজ
জ্ঞানী	মূর্খ
ঝানু	অপটু, আনাড়ি
ঝুটা	খাঁটি
টাটকা	বাসি
ঠকা	জেতা
ঠান্ডা (হিন্দি শব্দ)	গরম
ঠিক	বেঠিক
ঠুনকো	মজবুত
ডুবন্ত	ভাসন্ত
ডাগর	ম্লান
ঢেঙা	খাটো
ঢোলা	হালকা
তরুণ	প্রবীণ
তিক্ত	মধুর
ত্যাগ	ভোগ
ত্বরা	বিলম্ব
তিমির	আলোক
তরল	কঠিন
তিরস্কার	পুরস্কার
তৃপ্তি	অতৃপ্তি
তাপ	শৈত্য
তস্কর	সাধু
তেজি	মেদা, মন্দা
তারুণ্য	বার্ধক্য
তেজ	নিস্তেজ
তীব্র	মৃদু
তামসিক	রাজসিক
থামা	চলা

প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলা ভাষার বহু শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণ খুব কাছাকাছি। কিন্তু শব্দগুলো ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন : 'অদিন' ও 'অদীন'। প্রথমটির উচ্চারণ 'অদিন্' আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ 'অদিনো'। দ্যে একটু পার্থক্য উচ্চারণে। কিন্তু অর্থে পার্থক্য ব্যাপক। 'অদিন' অর্থ হলো 'অশুভ দিন' আর 'অদীন' অর্থ হলো 'কখনো দীন যিনি' অর্থাৎ 'ধনী'। আবার অনেক শব্দ আছে, যাদের উচ্চারণও অভিন্ন বা এক কিন্তু অর্থ আলাদা। যেমন। 'অংশ' ও 'অংস'। দুটোর উচ্চারণই হলো 'অংশো'। তবে 'অংশ' অর্থ ভাগ এবং 'অংস' অর্থ 'কাঁধ'। এমন বহু শব্দ আছে বাংলায় আর এগুলো হলো ভাষার সৌন্দর্যবর্ধক সম্পদ। নিচে এমন কিছু প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ উল্লেখ করা হলো।

- অংশ (ভাগ, অসম্পূর্ণ)
  অংস্য (ভাগ করার উপযোগী)
  অংস (কাঁধ)
- অংশগ্রহণ (শামিল হওয়া)
  অংশে গ্রহণ (নিজের ভাগ বুঝে নেওয়া)
- অকর্তৃত্ব (অকর্তার ভাব)
  অকর্মীত্ব (অকর্মীর ভাব)
- অকার (ব্রহ্মা)
  অ-কার (অ-এই বর্ণ)
- অকিঞ্চন (নিঃস্ব, দরিদ্র)
  আকিঞ্চন (লিপ্সা, দারিদ্র)
- অকুল (হীন বা নীচ বংশ, ভজনবিহীন)
  অকূল (যার কূল নাই, সমুদ্র)
- অকৃত (যা করা হয় নি)
  অক্রীত (যা কেনা হয় নি)
- অকৃতদার (অবিবাহিত)
  অকৃতাদর (যাকে যথেষ্ট আদর করা হয়নি)
- অকৃতজ্ঞ (অখণ্ডিত)
  অকৃত্য (যা করা উচিত নয়)
- অকৃষ্ট (চাষ না-করা)
  অকৃষ্য (চাষ করার পক্ষে অনুপযুক্ত)
- অক্ষিব (সামুদ্রিক লবণ)
  অক্ষীব (শজনে গাছ)
- অখণ্ড (যা খণ্ডিত নয়)
  অখণ্য (যা খণ্ডন করা যায় না)

- অখ্যাত (অপ্রসিদ্ধ)
  আখ্যাত (কথিত, প্রকাশিত)
- অগ্র (প্রধান, সম্মুখ)
  অগ্যা (আশা, শ্রেষ্ঠা)
- অঘর (যার ঘর নেই)
  অঘোর (শান্ত সম্প্রদায়-বিশেষ)
- অঘ্রান (বাংলার অষ্টম মাস)
  অঘ্রাণ (গন্ধ শোঁকা)
- অঙ্ক (কোল, গণিত)
  অঙ্কা (মৃদঙ্গ)
- অচূর্ণ (যা চূর্ণ করা হয় নি)
  অচূর্ণ্য (যা চূর্ণ করা যায় না)
- অচ্ছেদ (অনাবৃত)
  অচ্ছেদ্য (যাকে জলাশয়)
- অচ্ছন্ন (অবিভক্ত)
  আচ্ছন্ন (ঢাকা)
- অজগর (বড়ো সাপ-বিশেষ)
  অজাগর (নিদ্রাহীন, ঘুমন্ত)
- অজড় (জড় নয়, জীবন্ত)
  অজর (জরাগ্রস্ত নয়)
- অণু (ছোট, ক্ষুদ্র)
  অনু (পশ্চাৎ)
- অত (এই পরিমাণ)
  অতঃ (এর পর)
- অতর্ক (তর্কের অভাব)
  অতর্ক্য (তর্কের অনুপযুক্ত)
- অতল (যার তল বা তীর নয়)
  অতল্য (যা তলা নয়)
- অদিন (অশুভ দিন)
  অদীন (সুখস্বাধীন, ধনী)
- অদৃশ্য (যা দেখা যাচ্ছে না)
  অদৃষ্য (অপরাজেয়)
- অদৃষ্ট (ভাগ্য)
  অদৃষ্ট (অদৃষ্টবাদ)
- অধৃত (ছেঁড়া-ফাটা)
  অধৌত (ধোয়া-মাজা)
- অধরোষ্ঠ (দুই ঠোঁট)
  অধরোষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক)
- অধর্ম (পাপ, অন্যায়)
  অধর্ম্য (ধর্মবিরুদ্ধ)
- অধিশয়িত (অধিষ্ঠিত)
  অধিশয়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)
- অধিষ্ঠাতৃগণ (অধিষ্ঠাতারা)
  অধিষ্ঠাত্রীগণ (অধিষ্ঠাত্রীরা)
- অধীতি (অধ্যয়ন)
  অধীতী (অধ্যয়নকারী)
- অনর্ঘ (অতি দামি)
  অনর্ঘ্য (অপূজনীয়)
- অনর্থকরী (যা লাভজনক নয়, ক্ষতিকারক)
  অনর্থকারী (যে ক্ষতি করে, যা ক্ষতি করে)
- অনায়ত্ত (যার আয়তন কম)
  অনায়ত্ত (আয়ত্ত করা যায় নি)
- অনিল (বাতাস)
  অনীল (যা নীল নয়)
- অনিল (অনিষ্টকর)
  অনীল (শ্লীলতাপূর্ণ)
- অনিষ্ট (অশুভ)
  অনিষ্ট (নিষ্কৃষ্টতা)
- অনুক (অনুকৃত)
  অনুক (অনুকরণশীল)
- অনুকূল (অনুকূলের ক্রীলিঙ্গ)
  অনুকূলা (যে শিশুর আসছে)
- অনুদিত (উচ্চারিত না-হওয়া)
  অনুদিত (অনুদান করা)
- অনুন (উপলাভিন)
  অনূন (অপ্রাপ্ত)
- অনুবন্ধ (সংযুক্তি, ঘটিত)
  অনুবন্ধ (আবদ্ধ, সম্বন্ধ)
- অনুভব (উপলব্ধি)
  অনুভাব (বোধ, জ্ঞান)
- অনুসৃত (অনুসরণ করা)
  অনুস্যূত (সেলাই করা)
- অনুসৃতি (অনুসরণ)
  অনুস্মৃতি (পরে মনে করা)
- অন্ত (শেষ)
  অন্তর (মধ্যের)
  অন্ত্য (শেষ, প্রান্তস্থ, নীচ)
- অন্তর্বত্নী (আত্মা)
  অন্তর্বত্নী (সন্তানসম্ভবা)
- অন্তরস্থ (মাঝের)
  অন্তস্থ (শেষের)

- অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ঠ)
  অন্তরঙ্গ (অন্তরাত্মা)

- অন্তর্দেশিক (একই দেশ বিষয়ক)
  আন্তর্দেশিক (ভিন্ন দেশ বিষয়ক)

- অন্তর্দেশীয় (একই দেশের)
  আন্তর্দেশীয় (অন্য দেশের)

- অন্তর্ভেদী (দুই দিকের জল, যে জমির: সোনার)
  অন্তর্ভেদী (যিনি মন বুঝতে পারেন)
  অন্তর্ভেদী (যা অন্তরকে ছেদ করে)

- অন্ন (খাদ্য)
  অন্য (ভিন্ন)

- অন্নাভাবগ্রাস (যে কেবল খেতে চায়)
  অন্যাভাবগ্রাস (পরোপকারী)

- অন্যদা (অন্নপূর্ণা, দুর্গা)
  অন্যদা (অন্য সময়)

- অন্নপুষ্ট (অন্ন অর্থাৎ খাবার খেয়ে পুষ্ট)
  অন্যপুষ্ট (অপরের দ্বারা পালিত)

- অন্যাকৃৎ (অন্যকে যে পালন করে, রাজা)
  অন্যাকৃত (অপরের দ্বারা পালিত, কোকিল)

- অন্যান্য (অন্য সব)
  অন্যোন্য (পরস্পর)

- অপগত (বিদূরিত)
  অবগত (জানা)

- অপচয় (নষ্ট করা)
  অবচয় (চয়ন)

- অপত্য (সন্তান)
  অপথ্য (কুপথ্য)

- অপর (অন্য)
  অবর (অপ্রধান, হীন)

- অপরিশ্রুত (যা শোনা হয় নি)
  অপরিস্রুত (যা স্রবণ করা হয় নি, আবর্জনা)

- অপসরণ (সরে যাওয়া)
  অপসারণ (সরিয়ে দেওয়া)

- অপসৃত (সরিয়ে দেওয়া)
  অবসৃত (অবসরপ্রাপ্ত)
  অবসিত (অবসান হওয়া)

- অবতংস (চূড়া)
  অবদংশ (মনের চাট)

- অবতরণ (নামা)
  অবতারণ (নামিয়ে আনা)

- অবদান (কৃতি)
  অবধান (জ্ঞান)

- অবদ্ধ (বদ্ধ নয়, খোলা)
  অবদ্য (যা বলা যায় না)
  অবধ্য (যাকে বধ করা উচিত নয়)

- অবলম্ব (অবলম্বন)
  অবলম্ব্য (অবলম্বনের যোগ্য)

- অবলা (দুর্বল, নারী)
  অবোলা (যে কথা বলতে পারে না, জীবজন্তু)

- অবাচীন (দক্ষিণ বিষয়ক)
  অর্বাচীন (নবীন)

- অবি (মেষ)
  অবী (রজস্বলা)

- অবিকৃত (যা বিকৃত করা হয় নি)
  অবিক্রীত (যা বিক্রি হয় নি)

- অবিধেয় (যা করা উচিত নয়)
  অভিধেয় (নামধারী)

- অবিনীত (উদ্ধত)
  অভিনীত (অভিনয় করা)

- অবিমিশ্র (খাঁটি)
  অবিমৃশ্য (অবিবেচক)

- অবিরাম (ছেদহীন)
  অভিরাম (সুন্দর)

- অবিহিত (অশাস্ত্রীয়)
  অভিহিত (নামধারী)

- অবেক্ষমাণ (যে দেখছে)
  অপেক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)

- অব্দি (পর্যন্ত অবধি)
  অব্ধি (সমুদ্র)

- অব্যবহিত (সংলগ্ন)
  অব্যবহৃত (যা ব্যবহার করা হয় নি)

- অভিক (কামুক)
  অভীক (নির্ভীক, ভয়হীন)

- অভিনেতৃসংঘ (অভিনেতাদের সংঘ)
  অভিনেত্রীসংঘ (অভিনেত্রীদের সংঘ)

- অভিবাসন (অন্য জায়গায় গিয়ে বাস করা)
  অভিভাষণ (বক্তৃতা)

- অভিসন্ধি (ফন্দি)
  অভিসন্ধানী (অন্বেষণশীল)

- অভিসার (প্রেমাস্পদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ)

- অভ্যাশ (আবৃত্তি)
  অভ্যাস (চর্চা)

- অমর্ত (স্বর্গ)
  অমর্ত্য (স্বর্গীয়, দেবতা)

- অযরীয় (মূর্তি ইত্যাদি ভাস্কর্যের পাত্র)
  অযধীয় (সূর্যবংশীয় রাজা)

- অযাচ্য (চাওয়ার অযোগ্য)
  অযাজ্য (যজ্ঞক্রিয়ার অযোগ্য)

- অরতি (অসন্তোষ)
  অরাতি (শত্রু)

- অর্ঘ (মূল্য, দাম)
  অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ)

- অর্থ (মানে, টাকাপয়সা)
  অর্থ্য (ন্যায়সংগত, ন্যায্য)

- অর্হণ (পূজা)
  অর্হন (জৈন সন্ন্যাসী)

- অলক (চুলের গোছা)
  অলোক (নির্জন, অসাধারণ)
  অলখ (দৃষ্টির অগোচর)

- অলক্ষ (না দেয়া; লক্ষ না করা)
  অলক্ষ্য (যেটা উদ্দেশ্য নয়, অলক্ষণীয়)

- অলয় (লয়হীন)
  আলয় (বাড়ি)

- আলাত (জ্বলন্ত অঙ্গার)
  আলাত (জ্বলন্ত অঙ্গার বিষয়ক)

- অলীক (অসাধারণ, অপার্থিব)
  অলীক (অসত্য)

- অলভ্য (যার অক্ষরপরিচয় নেই)
  অলভ্য (সহজ না-করা)

- অসাড় (সাড়হীন, অবশ)
  অসার (সারবত্তাহীন)

- অস্থায়ী (বেশি দিনের জন্য নয়, ক্ষণস্থায়ী)
  আস্থায়ী (গানের প্রথম অংশ)

- অস্পর্শ (স্পর্শ না করা)
  অস্পর্শ্য (যা ছোঁয়া যায় না, যা ছোঁয়া উচিত নয়)

- অহার্য (অহরণীয়)
  আহার্য (খাবার)

- অহিংস (অহিংস্র)
  অহিংস্য (হিংসার যোগ্য নয়)

- অহিত (অনুপকার)
  আহিত (শত্রু)

- আঁশ (শল্ক)
  আঁশ (সাপের ন)

- আঁচা (ধৌত)
  আচা (শব্দ দূর্ণ)
  আচা (ছোট্ট সন্তানের ডিমিস)

- আঁচড় (শিলের জন্য বিষয়ক)
  আচড় (কলম)

- আঁধি (অন্ধকার, চুলের গুচ্ছ)
  আধি (প্রথম)
  আধি (রোগ)

- আঁশ, আইশ (চাহু)
  আঁশ, আইষ (অভিন্ন)

- আঁশটে (আঁশযুক্ত)
  আঁষটে (অভিন্ন, বিশেষত মাছ সম্পর্কিত)

- আকনের (হনুমান)
  আকনের (সিলেটিক-ভাষীর সর্বনাম)

- আনক (ছোট, অল্প)
  আনক (আনন্দ বস্তু)

- আনি (চাকার ধিল)
  আনি (ষোলো ভাগের এক ভাগ)

- আন্ন (খাদ্য, আপনার)
  আন্ত (প্রান্ত)

- আন্তগর্ব (অহংকার)
  আন্তর্গর্ব (হতগর্ব, হতদর্প

- আত্মীকরণ (আত্মীভূত করা বা আত্মসাৎ করা)
  আত্তীকরণ (দেহের মধ্যে দিয়ে নেওয়া)
- আদান (নেওয়া)
  আধান (স্থাপন)
- আদিত্ব (আদির ভাব)
  আদিত্য (সূর্য)
- আদৃত (আদরপ্রাপ্ত)
  আর্দ্রিত (যা ভেজানো হয়েছে)
  আধৃত (ধৃত)
- আধার (পাত্র)
  আঁধার (অন্ধকার)
- আধ্যান (শব্দ)
  আধ্যান (স্মরণ)
- আনকা (অভিনয়, বিচিত্র)
  আনখা (শুধু শুধু, বিনা কারণে)
- আনিল (হনুমান)
  আনীল (ঈষৎ নীল)
- আপণ (দোকান)
  আপন (নিজের)
- আবল্য (দুর্বলতা)
  আবাল্য (বাল্যকাল থেকে)
- আবরণ (আড়াল, ঢাকনা)
  আভরণ (অলংকার)
- আবাস (বাসস্থান)
  আভাষ (আলাপ, ভাষণ)
  আভাস (আড্ডা, দীপ্তি)
- আবৃত্তি (আবরণ)
  আবৃত্তি (সশব্দে পাঠ)
- আবেদ্য (আবেদনীয়)
  আভেদ্য (ভেদনযোগ্য)
- আভাষিত (যা বলা হয়েছে)
  আভাসিত (আলোয় উদ্ভাসিত)
- আমরা (আমি ও অন্যরা)
  আমড়া (ফল-বিশেষ)
- আমর্শ (স্পর্শ)
  আমর্ষ (ক্রোধ)
- আয়ত (বিস্তৃত)
  আয়ত্ত (দখলিত)
  আয়াত (কোরানের বাণী)
- আয়তি (সধবা)
  আয়ত্তি (বশ্যতা)
- আয়াস (চেষ্টা)
  আয়েশ (আরাম)
- আয়াসী (পরিশ্রমী)
  আয়েশি (আরামে অভ্যস্ত)
- আর (এবং, এর বেশি, অথবা)
  আড় (প্রস্থ, আড়াল, বাঁকা)
- আরত (কোনো কাজে লিপ্ত)
  আড়ত (পণ্য মজুত ও বিপণনের জায়গা)
- আরতি (পুজো)
  আরাতি (শত্রু)
- আরভমাণ (যে শুরু করেছে)
  আরভ্যমাণ (যা শুরু করা হয়েছে)
- আরোহণী (সিঁড়ি)
  আরোহিণী (আরোহণকারিণী)
- আর্হত (জৈন দিগম্বর)
  আহত (আঘাতপ্রাপ্ত)
- আলশে (ছাদের প্রান্ত)
  আলসে (অলস)
- আশক্ত (শক্ত, সমর্থ)
  আসক্ত (একান্ত অনুরক্ত, নেশাগ্রস্ত)
- আশয় (মন, আধার)
  আশ্রয় (থাকার জায়গা)
- আশা (আকাঙ্ক্ষা)
  আসা (আগমন)
- আশি (৮০ সংখ্যা)
  আশী (ভোজী, বিষদাঁত)
- আশিস (আশীর্বাদ)
  আশীষ (শীর্ষ পর্যন্ত)
- আশ্বিন (বাংলা মাস)
  আশ্বীন (ঘোড়ার একদিনের পথ)
- আষাঢ় (বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাস)
  আসার (প্রবল বৃষ্টি)
- আসক্তি (অনুরাগ, অনুরক্তি)
  আসত্তি (নৈকট্য)
- আহব (যুদ্ধ)
  আহাব (জলপাত্র-বিশেষ)
- আহরিৎ (ঈষৎ সবুজ)
  আহরিত, আহৃত (সংগৃহীত)
- আহিড়ি (ব্যাধ)
  আহিরি (গোপী)

- আহুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
  আহূত (যাকে ডাকা হয়েছে)
- আহুতি (যজ্ঞে সমর্পণ)
  আহূতি (ঢাকা)
- ইতি (শেষ)
  ঈতি (ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন)
- ইনাম (পুরস্কার)
  ইমান (ধর্ম, বিশ্বাস)
  ইমাম (ইসলাম ধর্মগুরু)
- ইন্দ্রিয়গোচর (ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা যায়)
  ইন্দ্রিয়াগোচর (ইন্দ্রি দিয়ে যা অনুভব করা যায় না)
- ঈশা (যিশু খ্রিষ্ট)
  ঈষা (লাঙল)
- উঁকি (আড়াল থেকে দেখা)
  উকি (হেঁচকি)
- উঁচকপালি (কপাল-উঁচু মেয়ে)
  উঁচকপালে (কপাল-উঁচু ছেলে)
- উক্থ (সামবেদ)
  উক্ত (কথিত)
- উচ্ছোষণ (শুষে নেওয়া)
  উচ্ছ্বসন (উচ্ছ্বাস)
- উচ্ছোষিত (শোষিত)
  উচ্ছ্বাসিত (স্ফীত, ভাবাবেগে আকুল)
- উৎপত (পাখি)
  উৎপথ (বিপথ)
  উৎপা (উপদ্রব)
- উদ্গীত (উচ্চকণ্ঠে গীত, নিনাদিত)
  উদ্গীথ (সামবেদের গান)
- উদর (পেট)
  উদার (মহৎ)
- উদ্দেশ (সন্ধান)
  উদ্দেশ্য (লক্ষ্য, মতলব, অভিপ্রায়)
- উদ্ধত (দুর্বিনীত)
  উদ্যত (উদ্গীব)
- উন্নাদ (জোর শব্দ, চিৎকার)
  উন্মাদ (পাগল)
- উন্নীত (উত্তোলিত)
  উন্মিত (ওজন-করা)
- উন্মীলন (খোলা, উন্মোচন)
  উন্মূলন (উৎপাটন)
- উপকণ্ঠ (কাছাকাছি জায়গা)
  উপকণ্ঠা (উপকণ্ঠ বিষয়ক)
- উপকরণ (প্রয়োজনীয় জিনিস)
  উপাকরণ (বেদ অনুশীলন আরম্ভ)
- উপগ্রহ (গ্রহের অনুষঙ্গী ছোটো গ্রহ)
  উপগ্রাহ (উপহার)
- উপধি (ছল, চাতুরী, রথের চাকা)
  উপাধি (পদবি, উপনাম)
- উপনয় (আগমন)
  উপানয় (উপহার)
- উপবৃত্ত (ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র, ইলিপস)
  উপাবৃত্ত (সাধিত, পুনরাগত, ঘূর্ণিত)
- উপযুক্ত (যোগ্য, মানানসই)
  উপর্যুক্ত (উপরিউক্ত)
- উপহার (পুরস্কার)
  উপাহার (ফলযোগ)
- উপাদান (উপকরণ)
  উপাধান (বালিশ)
- উপাদেয় (সুস্বাদু)
  উপাধেয় (নামধারী)
- উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (শিক্ষিকা, উপদেশিনী)
  উপাধ্যায়ানী (অধ্যাপকের স্ত্রী, পণ্ডিতের স্ত্রী)
- উপান্ত (প্রান্ত)
  উপান্ত্য (প্রান্তবর্তী)
- উপাসিত (পূজিত)
  উপোসিত (অভুক্ত)
- উপাস্তি (উপাসনা, লক্ষ্যভেদ, শিক্ষা)
  উপাস্থি (হাড়ের মতো অথচ নরম প্রত্যঙ্গ)
- উমান (পরিমাণ)
  উমানো (গরম করা)
- উরু (বিশাল)
  উরু (কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাংশ)
- উহ্য (ভয়ে নিয়ে যাওয়া মতো)
  উহ্য (অনুপস্থিত, অদৃ

• ছাই (সমূহ)
ছাঁই (ধূলা)

• একলা (কোনো সময়)
একবা (এক হাতের)

• ঐশিক (ঈশ্বর বিষয়ক)
ঐহিক (ধন বিশেষ)
ঐহিক (ইহকাল সম্পর্কিত বিষয়ক)

• ওজন (ভার)
ওয়েন (তিন পয়েন্টবিশিষ্ট অক্ষিরোগ জন্য)

• ওষধি (ফল পাকলে যে-গাছ মরে যায়)
ঔষধি (যেমন ঔষধি)

• ওষ্ঠ (উপরের ঠোঁট)
ওষ্ঠ্য, ঔষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক, ঠোঁট সম্পর্কিত)

• ঔক্য (ঐক্যের শব্দ)
ঔক্য (বন্ধুত্বের ব্যাপার)

• ঔপনিষদ (উপনিষদ, উপনিষদী)
ঔপনিষদিক (উপনিষদ বিষয়ক, উপনিষদের)

• কটাস (ঘাস, জোরার)
কোটাস (প্রহরী)

• কটি (কোমর)
কোটি (এক-শো লক্ষ)

• কড়কড় (কাঠ ইত্যাদির শব্দ)
কড়মড় (বাদি ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত)

• কড়কড়া (ধনক)
কড়কড়া (শিল, শিলাবৃষ্টি)

• কড়ি (টাকা-পয়সা)
কড়ী (হাড়ি)

• কণ্ঠ (গলা)
কণ্ঠ্য (কণ্ঠ বিষয়ক, কণ্ঠে উচ্চারিত)

• কাই (বৈজ্ঞানিকের পদার্থ মাত্র)
কাঁই (কদর্যত্বক)

• কাড়ন (বাদ্য পড়ার শব্দ)
কড়ান (কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র)

• কথক (ভাবভঙ্গীর নৃত্য-বিশেষ)
কত্থক (যিনি বলেন, কথকতা করেন যিনি)

• কন্দর (গুহা)
কন্দর (কাঁদর)

• কপটী (প্রবঞ্চক, ঠগ)
কপাটী (হাডুডু খেলা)

• কপাল (ললাট)
কপোল (গাল, গণ্ড)

• কপাল (মৌমাছির মাথা, মধুপ্রস্তুতকারী)
কপালী (মহাদেব)

• কপোত (পায়রা)
কপোত (বিমান)

• কপোতপালি (পায়রা রাখিবার কার্নিশ)
কপোতপালী (পায়রার ঝোপ)

• কবচ (বর্ম, শরীরত্রাণ)
কবচ (মাদুলি)

• কমঠ (কচ্ছপ)
কর্মঠ (কর্মক্ষম)

• কমনীয় (সুন্দর)
কামনীয় (কামনা)

• কমল (পদ্ম)
কোমল (পেলব, নরম)

• কর্করা (হাতির দাঁত)
কর্করা (ঝিঁঝি পোকা)

• কর্কট (কাঁকড়া)
কর্কোট (তীব্র বিষ-বিশেষ কাঁকড়োল)

• কর্ণ (কান)
কর্ণী (কান বিষয়ক)

• কর্ণি (কানের)
কর্ণী (কান বিষয়ক, কানযুক্ত)

• কর্তৃত্ব (কর্তার ভাব, ক্ষমতা)
কর্তীত্ব (কর্তীর ভাব)

• কর্দম (কাদা)
কর্দম (রাক্ষস)

• কর্দমি, কর্দমে (কাঁকড়া খাওয়ার কালে মুখ-বিশেষ)
কর্দ্দি (অবস্থায়)

• কল্প (তথাকথিত, প্রায়)
কল্পা (কল্পনার মেয়ে)

• কল্য (বাসিত)
কল্যা (কাল)

• কশ (চাবুকের পার্শ্ব)
কষ (কষায় দ্রব্য)

• কশা (চাবুক)
কষা (কষটে)

• কষায় (তিক্ত, কটু)
কষায়ে (তৈরিকে)

• কাঁই (নিকষ)
কোঁই (অনুপস্থিতিকে)

• কাঁক (বক-জাতীয় পক্ষি)
কাঁখ (কোল)
কাক (সাধারণ কাক)

• কাঁড়া (অপসৃত)
কাড়া (কাপড় ইত্যাদি জল দিয়ে ধোওয়া)

• কাঁড়া (ধানের তুষ ছাড়ানো, পরিষ্কার করা)
কাড়া (ছিনিয়ে নেওয়া)

• কাঁটা (কণ্টক)
কাটা (কর্তন)

• কাঁথা (কাপড়)
কাথা (পাক)

• কাঁধনে (যা কাঁদায়)
কাঁদুনি (কান্নাকাটি)
কাঁদুনে (যে কাঁদে)

• কাঁসা (সংকর ধাতু-বিশেষ)
কাশা (গলা খক খক করা)

• কাঁসার (কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র)
কাসর (ঘোষ)
কাসার (জলাশয়)

• কাঁসি (কাঁসার থালা)
কাশি (কাশ রোগ)
কাশী (কাশীধাম)

• কার্ক (কর্কিকা)
কার্কী (কার্কি কাজ)

• কার্পাস (শুভ্র ফাইবার-বিশেষ)
কার্পাসী (শিব)

• কার্য্য (ক্রিয়াকর্ম বিষয়ক)
কার্য্যা (কাজের মা)

• কার্ল (কোঁকড়ানো কার্ল)
কার্লী (মেয়ে কার্লিকা)

• কাশ (কাশি)
কাষ (বাড়িঘরের)

• কাশীশ (শিব)
কাশীস (ফিরাউন)

• কি (প্রশ্নবোধক অর্থে)
কী (প্রশ্নবোধক সর্বনাম)

• কিব (অপরাধ)
কীব (পুত পার্থ)

• কিল (হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত)
কীল (পেরেক, পেরেক)

• কীরণ (চরণ)
কীরণ (কর্তন)

• কীর্ত্ত (ভালো কাজ)
কৃতি (কাব্যগ্রন্থ)

• কুঁড় (ওষধিফল)
কুড় (ফুল)

• কুঁড়ি (কুঞ্চিত অংশ)
কুড়ি (টুকরো)

• কুঁড়োনো (কুঞ্চিত করা)
কুড়ানো (টুকরো করা)

• কুঁড়ি (কুড়ুল)
কুড়ি (সংখ্যা ২০)

• কুজন (খারাপ মানুষ, দুর্জন)
কূজন (পাখির ডাক)

• কুড়ি (দেশ-বিশেষ, ওই দেশের রাজা)
কুড়ী (পাশুলেখ মা)

• কুল (বংশ)
কূল (তীর)

• কুলান (পর্যাপ্ততা)
কুলানো, কুলোনো (কুলিয়ে যাওয়া)

• কুলি (মোটবাহক)
কুলী (কুলীন)

• কুলো (খলা)
কুলা (কুলবধূ)

• কুষ্ঠি (কোষ্ঠী)
কুষ্ঠী (কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত)

• কুসুম (ঊষধিফুল)
কুসুম (ফুল)

• কুহু (কোকিলের ডাক)
কুহু (অমাবস্যা)

• কৃত (যা করা হয়েছে)
কৃতী (যা করা হয়েছে)

• কৃতঘ্ন (উপকার স্বীকার যে করে না)
কৃতজ্ঞ (উপকার স্বীকারকারী)

• কৃতি (কাজ করল, সম্পাদন)
কৃতী (সফলকাম)

- কৃত (কর্তিত)
  কৃত্য (করণীয়)
- কেশ (চুল)
  কেস (মামলা, ঘটনা)
- কৈশিক (কেশ বিষয়ক, সূক্ষ্ম)
  কৌশিক (রেশমি, জনৈক মুনির নাম)
- কোঁড়া (বাঁশ বেত প্রভৃতির অঙ্কুর)
  কোড়া (চাবুক)
  কোরা (নতুন)
- কোণ (দুই সরল রেখার সংযোগস্থান)
  কোন (বিশেষ কিছু জানার জন্য প্রশ্ন)
- কোন্দল (ঝগড়া)
  কন্দল (কলাগাছ, অঙ্কুর)
- ক্রিয়মাণ (যা করা হচ্ছে)
  ক্রীয়মাণ (যা কেনা হচ্ছে)
- ক্ষতি (লোকসান)
  খতি (কাপড়ের জমি, ঘুস)
- ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রীয় রমণী)
  ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী)
- ক্ষর (ক্ষরণ)
  খড় (বিচালি)
  খর (তীব্র, প্রবল)
- ক্ষুৎ (খিদে, হাঁচি)
  খুঁত (দোষ)
- খটমট (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
  খটোমটো (জটিল, অসহজ)
- খটাশ (তাম)
  খটাস (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
- খণ্ড (টুকরো)
  খণ্ড (যা খণ্ডন করা যায়, খণ্ডনীয়)
- খস খস (ঘষার শব্দ)
  খসখস (বেনার মূল দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন কিংবা পর্দা)
- খাট (পালঙ্ক)
  খাটো (ছোটো)
- খাদি (খদ্দর)
  খাদী (খাদক)
- খাম (লেফাফা)
  ক্ষাম (কৃশ, দুর্বল)
- খিচ (দাঁত-মুখের বিকৃতি)
  খিচ (ঝগড়া, কথা কাটাকাটি)
- খুঁট (প্রান্ত)
  খুট (টোকা মারার শব্দ)
- খুঁড়ি (পঙ্গু নারী)
  খুড়ি (কাকিমা)
  খুরি (মাটির ছোটো ভাঁড়)
- খুর (গবাদি পশুর পায়ের নীচের শক্ত অংশ)
  ক্ষুর (দাড়ি-চুল কামানোর ছুরি)
- খুরা (আসবাবপত্রের ছোট পায়া)
  খুড়া (কাকা)
- খুরো (আসবাবপত্রের ছোট পায়া)
  খুড়ো (কাকা)
- খোঁজা (সন্ধান করা)
  খোজা (নপুংসক প্রহরী)
- খোঁয়াড় (গরু, মহিষ প্রভৃতি রাখার জায়গা)
  খোয়ার (দুর্গতি)
- গৎ (ধারা, নিয়ম, ধারা বা বোল)
  গত (অতীত)
- গর্ব (অহংকার)
  গর্ভ (অভ্যন্তর, উদর)
- গলৎ (যা গলছে)
  গলদ (ভুল)
- গাঁথা (গ্রন্থন করা বা নির্মাণ)
  গাথা (কাব্য, কাহিনি)
- গাঁদা (ফুল-বিশেষ)
  গাদা (স্তূপ)
- গা (শরীর)
  গাঁ (গ্রাম)
- গাং (নদী)
  গাঙ্গ (গঙ্গা বিষয়ক)
- গাজন (চড়কের সময় শিব পুজোর উৎসব)
  গাঁজন (পচে যাওয়া)
- গাদ (ময়লা)
  গাধ (অগভীর)
- গায়কি (গাইবার ঢং)
  গায়িকা (নারী গাইয়ে)
- গার্গি (গর্গমুনির সন্তান)
  গার্গী গর্গমুনির মেয়ে)
- গিরিশ (মহাদেব)
  গিরীশ (হিমালয়)

- গীতি (গান)
  গীতী (গায়ক)
- গুণ (ধর্ম, প্রকৃতি)
  গুন (চট, মোটা সুতলি)
- গুড় (মিষ্ট দ্রব্য-বিশেষ)
  গূঢ় (নিবিড়, গোপন)
- গুরুমুখি (পাঞ্জাবি ভাষার লিপি)
  গুরুমুখী (গুরুর মুখ থেকে শেখা)
- গেরিলা (গোপন যোদ্ধা)
  গোরিলা (বৃহদাকৃতি বানর-বিশেষ)
- গোঁড়া (রক্ষণশীল, অন্ধভক্ত)
  গোড়া (আদি, শুরু, শিকড়)
  গোরা (ফর্সা)
- গোলক (গোলাকৃতি ও ঘনাকৃতি বস্তু)
  গোলোক (বিষ্ণুর আলয়)
- গৌড় (বাংলার, বিশেষত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নাম)
  গৌর (ফর্সা)
- গৌরী (দুর্গা)
  গৌড়ী (সংগীতের রাগিণী-বিশেষ)
- গ্রন্থি (বন্ধন)
  গ্রন্থী (গ্রন্থকার)
- গ্রামণী (গ্রামের প্রধান)
  গ্রামীণ (গ্রামের, গ্রাম বিষয়ক)
- ঘটক (যে ঘটায়)
  ঘোটক (ঘোড়া)
- ঘটি (জল রাখার ছোটো পাত্র)
  ঘটী (আড়াই দণ্ড সময়, ঘড়ি)
- ঘণ্টি (ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টার শব্দ)
  ঘণ্টী (ছোট ঘণ্টা)
- ঘাঁটা (নাড়াচাড়া করা)
  ঘাটা (ঘাট)
- ঘাঁটি (থাকা কিংবা রাখার জায়গা)
  ঘাটি (ঘাট)
- ঘাঁটিয়াল (ঘাঁটির প্রধান)
  ঘাটিয়াল (ঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)
- ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মান (যা ঘুরছে)
  ঘূণ্যমান (যাকে ঘোরানো হচ্ছে)
- ঘেঁষ (ঘেঁষা)
  ঘেঁস (কয়লার ছাই)
- ঘোড় (ঘোড়া)
  ঘোর (আবেশ)
- চঞ্চু (পাখির ঠোঁট)
  চুঞ্চু (প্রসিদ্ধ)
- চড় (থাপ্পড়)
  চর (গোপন সংবাদদাতা)
- চড়চড়ি, চচ্চড়ি (ব্যঞ্জন-বিশেষ)
  চর্চরী (প্রাচীন সংগীত)
- চড়ন (চড়া, আরোহণ)
  চরণ (পা)
- চড়া (আরোহণ করা)
  চরা (নদীর চর, ঘুরে বেড়ানো)
- চতুষ্পদ (চৌরাস্তা)
  চতুষ্পদ (চারপেয়ে)
- চপল (অস্থির, চঞ্চল)
  চাপল (তরল, বায়বীয়)
- চর্চা (অনুশীলন)
  চর্যা (পালন, নিয়ম)
- চলচ্চিত্ত (চঞ্চলমতি)
  চলচ্চিত্র (সিনেমা)
- চাটা (লেহন)
  চাঁটা (চড়)
- চাড় (তাগিদ, তোলার চেষ্টা)
  চার (সংখ্যা ৪)
- চাড়া (বলপ্রয়োগ, তোলার চেষ্টা)
  চারা (ছোট গাছ)
- চাণক্য (চৌটিলা)
  চানক (চাঁদোয়া, শামিয়ানা)
- চাপা (ভর দেওয়া, পিষ্ট হওয়া)
  চাঁপা (ফুল-বিশেষ)
- চাষ (কৃষিকাজ)
  চাষ (নীলকণ্ঠ পাখি)
- চিড় (ফাটল)
  চির (সদা, সর্বকাল)
  চীর (ছোঁড়া কাপড়)

- চিৎ (চিত)
  চিত (চিৎ হয়ে শোওয়া)
- চুড় (হাতের গহনা-বিশেষ)
  চুর (চূর্ণ, গুঁড়ো)
- চুড়ি (হাতের গহনা-বিশেষ)
  চুরি (অপহরণ)
- চুন (জল)
  চুত (সিক্ত বা প্লাবিত)
- চূর্ণ (গুঁড়ো)
  চূণ (চূর্ণ জাতীয় খোত)
- চৈত্র (চিত্র বিষয়ক)
  চৈত্য (বুদ্ধমন্দির, বজ্রবেদি)
  চৈত্র (বসন্তের দ্বিতীয় মাস)
- ছই (দুই)
  ছ-টা (ছয় সংখ্যক)
- ছড়ি (নৌকোর ছই, খাটের ছত্রী)
  ছরী (ছাতাধারী)
- ছাঁট (টুকরো, কাটার ধরন)
  ছাট (জলের ঝাপটা)
- ছুতো (অছিলা)
  ছুত (অপবিত্র)
- ছাঁদ (আকৃতি, ধরন)
  ছাদ, ছাত (পাকা বাড়ির ওপরের আচ্ছাদন)
- ছান্দোগ্য (বেদের মধ্যে গান-যোগ্য অংশ)
  ছন্দোগ (সামবেদ গান-কর্তা)
- ছুঁচ (কিপোরী)
  ছুচি (কাটার যন্ত্র)
- ছোঁড়া (কিশোর)
  ছোড়া (নিক্ষেপ)
  ছোরা (বড়ো ছুরি)
- জওয়ান (সৈন্য, বলশালী)
  জোয়ান (উঁচুদরের মজবুত, বলশালী)
- জগতি (সিংহাসন)
  জগতী (পৃথিবী, ইহলোক)
- জড় (অচেতন, প্রাণহীন)
  জড়ো (একত্রিত)
  জুড় (শরীরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া)
- জড়া (জড়ানো)
  জরা (বার্ধক্য)
- জনি (জন্ম, উৎপত্তি)
  জনী (মা, নারী)
- জমক (আড়ম্বর)
  যমক (অর্থালঙ্কার-বিশেষ)
- জমি (ভূমি)
  যমী (সংযমী)
- জরি (সোনালি, রুপালি প্রভৃতি রঙের সুতো)
  জরী (জরাগ্রস্ত)
- জলজান (হাইড্রোজেন)
  জলযান (নৌকো ইত্যাদি)
- জলা (জলময় ভূমি)
  জ্বালা (প্রজ্বলন)
- জাঁতি (সুপরি কাটার যন্ত্র)
  জাতি (শ্রেণীয় জনসমষ্টি)
  জাতী (ফুল-বিশেষ)
- জাড় (শীত)
  জার (উপপত্নী)
- জাড়ি (কাত, যেঘাস)
  জারি (বলবৎ)
- জাত (জন্মিত)
  যাত (বিগত)
- জান (প্রাণ)
  যান (বাহন)
- জাপন (জপ করা)
  যাপন (অতিবাহন)
- জাম (ফল-বিশেষ)
  যাম (প্রহর)
- জাল (মেকি, নকল, মাছ ধরার জাল)
  জ্বাল (আগুনে তরল জিনিস গরম করা)
- জালা (মাটির বড়ো কলসি)
  জ্বালা (প্রদাহ)
- জিভ (জিহ্বা)
  জীব (প্রাণী)
- জুজুৎসু (জাপানি মল্লযুদ্ধ)
  যুযুৎসু (যুদ্ধ করতে উৎসুক)
- জুটি (সংযোগ)
  যুটি (সহচরী)
- জুড়ি (সমকক্ষ, দু-টির জোড়)
  জুরি (বিচারে সাহায্যকারী মনোনীত ব্যক্তিগণ)
- জেটি (লঞ্চ, স্টিমার ভেড়াবার জায়গা)
  জেঠি (বাবার দাদার স্ত্রী)
  জেঠী (টিকটিকি)

- জৌক (রক্ত-চোষা প্রাণী-বিশেষ)
  জোক, জোখ (মাপা, পরিমাপ করা)
- জোড় (সংলগ্ন, একমাত্র, যুটি)
  জোর (শক্তি, সামর্থ্য)
- জৈষ্ঠ (বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস)
  জ্যৈষ্ঠা (বাংলা সনের দ্বিতীয় মাস বিষয়ক)
- জ্যোতি (দীপ্তি)
  যতি (ছেদ)
  যতী (সংযমী)
- জ্যোতিষ (ভাগ্যগণনা শাস্ত্র)
  যতীশ (মুনিশ্রেষ্ঠ)
- ঝরঝর (ক্রমাগত ঝরণ কিংবা প্রবাহের শব্দ)
  ঝর্ঝর (জলপ্রবাহের শব্দ, ঝাঁকরি, হ্যতা)
- ঝাঁট (ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা)
  ঝাট (এখনই, শীঘ্র)
- ঝাড়া (পরিষ্কার করা)
  ঝারা (ছিদ্রযুক্ত পাত্র)
- ঝুড়ি (ছাঁটা)
  ঝোরা (ঝরনা)
- টন টন (অনেক টন ওজনের)
  টনটন (ব্যথা)
- টলটল (স্বচ্ছ, পরিষ্কার)
  টলো-টলো (বেসামাল)
- টাক (সেলাই)
  টাক (মাথার চুলের অভাব)
- টাকা (সেলাই)
  টাকা (অর্থ, আগেকার মুদ্রার বাংলা নাম)
- টিকা, টিকে (প্রতিষেধক)
  টীকা (ব্যাখ্যা, ভাষ্য)
- ট্যাড়া (ভেরেণ্ডা)
  ট্যারা (বক্র দৃষ্টি)
- ঠক (প্রতারক, ঠোকার শব্দ)
  ঠগ (দস্যু)
- ডানহাত (সহায়ক)
  ডান হাত (ডান দিকের হাত)
- ঢল ঢল (ঢিলা, ছবির ও চঞ্চল)
  ঢলো-ঢলো (লাবণ্যচঞ্চল)
- তড়াক (হঠাৎ লাফ)
  তড়াগ (জলাশয়)
- তড়িৎ (বিদ্যুৎ)
  ত্বরিত (খাবে নীত, যে পার হয়েছে)
  ত্বরিত (দ্রুত)
- তক (অবধি)
  ত্বক (চামড়া)
- তক্ষণী (তক্ষণাস্ত্র)
  তক্ষুনি (তখনই)
- তৎকাল (সেই সময়)
  ততকাল (ততোটা সময়)
- তৎক্ষণ (সেই মুহূর্ত)
  ততক্ষণ (ততটা সময়)
- তত্ত্ব (লক্ষ্য, গুরুত্ব)
  তত্ত্ব (খবর)
- তদ্দিন (তার, তাঁর)
  তুদ্দিন (ভেজাল)
- তদ্বুদ্ধেশে (তাকে লক্ষ্য করে)
  তদ্বুদ্ধেশে (সেই অভিপ্রায়ে)
- তমস (অন্ধকার)
  তমস (অতি-নিম্নস্তরের মন্দ)
- তরল (পাতলা)
  তুরল (যোদ্ধার অশ্বপৃষ্ঠে)
- তরা (পার হওয়া)
  তুরা (দ্রুততা)
- তরিকা (পদ্ধতি, প্রণালী)
  তারিকা (তারার বল)
- তাঁত (কাপড় বোনার যন্ত্র)
  তাত (পরম, পিতৃব্য)
- তাড়ক (তাড়নাকারী)
  তারক (উদ্ধারকারী)
- তাড়কা (রাক্ষসী, মারীচের মা)
  তারকা (তারা)
- তাড়ন (বকুনি, আঘাতন, পীড়াপীড়ি)
  তারণ (উদ্ধারকারী)
- তাড়া (গোছা, তাগাদা)
  তারা (তারকা)
- তাদৃশ (সেইরকম, সেরকম)
  ত্বাদৃশ (তোমার তুল্য)

- তালি (পটি, দুই হাত দিয়ে শব্দ করা)
  তালী (তাল গাছ)
- তির (শর)
  তীর (ফুল)
- তুড়ি (বুড়ো আঙুলের ও অনামিকার সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ)
  তুরি (তাতের মাকু)
  তূরী (রণশিঙ্গা)
- তুণ্ড (পাখির ঠোঁট)
  তুন্দ (ভুঁড়ি)
- তুলাধর (সূর্য)
  তুলাধার (ব্যাবসাদার)
- তুষ (ধানের খোসা)
  তুস (পশমি কাপড়-বিশেষ)
- তেওড় (বাঁকা)
  তেওর, তীবর (মৎস্যজীবী সম্প্রদায়)
- তেতলা (তিন তলা)
  তেতালা (তিনতালের আবদ্ধ সংগীত)
- তোটক (সংস্কৃত ছন্দ-বিশেষ)
  ত্রোটক (ছেদক, দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ)
- তোশা (আসবাবপত্র)
  তোষা (তোলন করা)
- ত্যজমান (যে ত্যাগ করছে)
  ত্যজ্যমান (যাকে ত্যাগ করা হচ্ছে)
- ত্রসন (ভয় পাওয়া)
  ত্রাসন (ভয় পাওয়ানো)
- ত্রিদশ ((দেবতা, অমর)
  ত্রিদোষ (বাত পিত্ত ও কফের দোষ)
- দড়াদড়ি (দড়িগুলি)
  দরাদরি (দরদাম করা)
- দড়ি (রজ্জু)
  দরি (গুহা)
- দণ্ড (শাস্তি, লাঠি)
  দণ্ডা (দণ্ডনীয়)
- দণ্ডি (ইতে, সরু লাঠি)
  দণ্ডী (দণ্ডীধারী)
- দত্তি (দান)
  দত্যি (দানব)
- দন্ত (দাঁত)
  দন্ত্য (দাঁত বিষয়ক)
- দয়িত (প্রিয়)
  দৈত্য (দানব)
  দ্বৈত (যুগল)
- দর (দাম)
  দড়ো (পটু, শক্ত)
- দর্ব (রাক্ষস)
  দর্ভ (ঘাস)
- দলিত (মর্দিত, নিপীড়িত)
  দোলিত (যা দুলছে)
- দশ দিক (১০ সংখ্যক দিক)
  দশদিক (নানান দিক, পরিপার্শ্ব)
- দশম (দশতম)
  দশন (দাঁত)
- দশাশ্ব (দশ ঘোড়া)
  দশাস্য (দশটি মুখ যার, রাবণ)
- দাঁড়া (দণ্ড)
  দাড়া (হুল, কাঁকড়া প্রভৃতির পা)
  দারা (পত্নী)
  দাঁড়ি (যে নৌকোর দাঁড় টানে, পূর্ণচ্ছেদ)
  দাড়ি (পুরুষের গালের দাড়ি)
- দাক্ষ (দক্ষজ)
  দাক্ষ্য (নৈপুণ্য)
- দানি (পাত্র)
  দানী (দানশীল)
- দানেশমন্দ (জ্ঞানী, পণ্ডিত)
  দানেশমন্দি (পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ)
- দাশ (ধীবর)
  দাস (ভৃত্য)
- দিন (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়)
  দীন (দরিদ্র)
- দিননাথ (সূর্য)
  দীননাথ (গরিবের ত্রাতা)
- দিনেন্দ্র (সূর্য)
  দীনেশ (গরিবের ত্রাতা)
- দিয়ড়ি (দীপাবলি)
  দিয়াড়ি (নদীর চড়া)
- দীপ্ত (উজ্জ্বল)
  দৃপ্ত (গর্বিত)
- দীপ (প্রদীপ)
  দ্বিপ (হাতি)
  দ্বীপ (জলবেষ্টিত ভূভাগ)
- দু-কূল (দুই বংশ, মাতৃকুল ও পিতৃকুল)
  দু-কূল (জলাশয়ের দুই তীর)
  দুকূল (রেশমি কাপড়)
- দুরন্বয় (বাক্য গঠনে ত্রুটি)
  দূরান্বয় (দূরের জিনিসের সঙ্গে যোগ)
- দুরবস্থ (দরিদ্র)
  দুরবস্থা (দারিদ্র্য)
- দুরন্ত (নির্ভুল, পরিপাটি, অনুযায়ী)
  দূরস্থ (দূরে অবস্থিত)
- দুরাচর (কৃচ্ছ্রসাধ্য)
  দুরাচার (দুষ্কৃতী)
- দুরালাপ (খারাপ কথা)
  দূরালাপ (দূর থেকে কথা বলা)
- দুর্বধা (যাকে বধ করা যায় না)
  দুর্বোধ্য (যা বোঝা যায় না)
- দুর্ভগ (মন্দভাগ্য)
  দুর্ভোগ (দুর্গতি)
- দুর্ভগা (অভাগিনি)
  দুর্ভাগা (মন্দভাগ্য)
- দুর্ভাষ (খারাপ কথা)
  দূরভাষ (টেলিফোন)
- দুলারি (কন্যা)
  দুলালি (আদুরে মেয়ে)
- দুষ্কৃতি (খারাপ কাজ)
  দুষ্কৃতী (যে খারাপ কাজ করে)
- দূত (খবর বহনকারী, চর)
  দ্যূত (পাশা খেলা)
- দূতী (মহিলা দূত)
  দ্যুতি (দীপ্তি)
- দেওয়া (প্রদান করা)
  দেয়া (মেঘ)
- দেবত্ব (দেবতার ভাব)
  দেবত্র (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত)
- দেশ (রাষ্ট্র, বাস করার জায়গা)
  দ্বেষ (ঈর্ষা, নিরুপভাব)
- দেশি (দেশজ)
  দ্বেষী (বিদ্বেষী)
- দৈন (দৈনিক, দিন সংক্রান্ত)
  দৈন্য (দারিদ্র্য)
- দোধারি (দুই প্রান্ত)
  দোধারী (যার দুই দিকই ধারালো)
- দ্বার (দরজা, ফটক)
  দার (যুক্ত কিংবা আছে অর্থে ব্যবহৃত অনুসর্গ, দণ্ড)
- দ্বিরশন (দু-বার খাওয়া)
  দ্বিরসন (সাপ)
- দ্বিশত (২০০)
  দ্বিষৎ (দ্বেষপূর্ণ, বিদ্বেষী)
- দ্বৈবর্ষিক (যা হতে দু-বছর লাগে)
  দ্বৈবার্ষিক (যা দু-বছর অন্তর ঘটে)
- দ্রাব (গলন)
  দ্রাবা (যা গলানো যায়)
- দ্রোণি (পাত্র, কলসি)
  দ্রৌণি (দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা)
- ধনদ (কুবের)
  ধনদা (লক্ষ্মী)
- ধন্যাত্মক (পরিজিত)
  ধ্বন্যাত্মক (ধনি-অনুসারী)
- ধনি (সুন্দরী)
  ধনী (ধনশালী)
  ধ্বনি (শব্দ)
- ধন্না (ধরনা, ধরে থাকা)
  ধন্বা (ধনুকধারী)
- ধন্ব (ধনুক)
  ধন্য (অনুগৃহীত)
- ধরণ (ধরা)
  ধরন (প্রকার)
- ধরা (পৃথিবী)
  ধড়া (কটিবস্ত্র)
- ধর্ম (ঈশ্বর বিশ্বাস, আচার-আচরণের রীতিপদ্ধতি)
  ধর্ম্য (ধর্ম সংক্রান্ত)
- ধানি (ধান বিষয়ক)
  ধানী (আবাস)
- ধান্য (ধান)
  ধান্যক, ধান্যাক (ধনে)
- ধারি (কিনারা)
  ধারী (ধারণকারী)
  ধাড়ি (বয়স্ক, প্রধান)
- ধুনি (অগ্নিপাত্র)
  ধুনী (নদী)

- ধুপ (পতনের শব্দ)
  ধূপ (ধুনো, রোদ)
- ধূম (পতনের শব্দ, আড়ম্বর)
  ধূম (ধোঁয়া)
- ধুমুল (ঢাকের বাজনা)
  ধূমল (ধোঁয়া-রং)
- ধেয় (প্রাহ্য, ধারী)
  ধ্যেয় (ধ্যানযোগ্য, স্মরণীয়)
- ধোঁয়া (ধূম)
  ধোয়া (জল প্রভৃতি দিয়ে পরিষ্কার করা)
- ধ্বান (শব্দ)
  ধ্যান (স্মরণ, চিন্তন)
- নকশি (নকশাযুক্ত)
  নকাশি (চিত্রণ, ধাতুতে খোদাইয়ের কাজ)
- নক্ত (রাত্রি)
  নক্তক (ভেঁড়া কাপড়, তুচ্ছ-বস্তু)
- নড়ি (লাঠি)
  নরি (পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি)
- নাড়ি (ধমনী)
  নারী (স্ত্রীলোক)
- নত (নীচু)
  নথ (নাকের গয়না)
- নতি (প্রণতি)
  নথি (কোনো বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র)
- নন্দ (আনন্দ)
  নন্দ্য (আনন্দদায়ক)
- নন্দিত (আনন্দিত)
  নিন্দিত (নিন্দামন্দপ্রাপ্ত)
- নাগরি (মাটির কলসি)
  নাগরী (প্রণয়িনী, রসিকা রমণী, দেবনাগরি লিপি, নগরবাসিনী)
- নাচ (নৃত্য)
  নাছ (পিছন)
- নাচানে (যে নাচায়)
  নাচুনে (যে নাচে)
- নাদি (পশুর বিষ্ঠা)
  নাদী (গর্জনকারী, শব্দকারী)
- নারাচ (বাণ)
  নারাজ (অরাজি)
- নারি (পারি না)
  নারী (স্ত্রীলোক)
  নাড়ী (শিরা)
- নাশিকা (নাশকারক)
  নাসিকা (নাক)
- নিঃসংজ্ঞ (সংজ্ঞাহীন)
  নিঃসঙ্গ (সঙ্গীহীন)
  নিষঙ্গ (তূণ)
- নিঃসত্ত্ব (অসার)
  নিঃস্বত্ব (অধিকারহীন)
- নিঃসরণ (বার হওয়া)
  নিঃসারণ (বার করে দেওয়া)
- নিঃসাড় (সাড়াহীন)
  নিঃসার (সারপদার্থহীন)
- নিকৃত (পরাভূত)
  নিকৃত্ত (কর্তিত, ছেদিত)
- নিখাত (খনন-করা)
  নিখাদ ('নি'-স্বর, নিষাদ)
- নিচুল (বেত গাছ)
  নিচোল (উত্তরীয় বস্ত্র)
- নিতি (নিত্য)
  নীতি (সুপ্রণালী, মতবাদ)
- নিদান (কারণ, সমাধান)
  নিধান (ভাণ্ডার)
- নিধন (মৃত্যু)
  নির্ধন (ধনহীন)
- নিধ্বান (ধ্বনি)
  নিধ্যান (চিন্তা)
- নিপ (জলপাত্র)
  নীপ (কদম)
  নৃপ (রাজা)
- নিপট (লম্পট)
  নিপাট (ভাঁজহীন, নিতান্ত)
- নিবর্তন (নিরতি, ক্ষান্তি)
  নির্বর্তন (কোনো কাজে সমাপ্তি)
- নিবৃত (আচ্ছাদিত)
  নির্বৃত (শান্তিপূর্ণ, মুক্ত, মৃত)
- নিবৃত্ত (ক্ষান্ত)
  নির্বৃত্ত (সম্পাতিদ, সুসম্পন্ন)
- নিবৃত্তি (নিষ্পত্তি)
  নির্বৃত্তি (সম্পাদন)
- নিবেদ্য (নিবেদনের উপযুক্ত)
  নৈবেদ্য (দেবতাকে প্রদত্ত)
- নিম্ব (নিম)
  নিম্বক, নিম্বু (লেবু)
- নিয়মিত (বিধির বিধান)
  নিয়তী (দুর্গা)
- নিরত (রত, ব্যস্ত)
  নীরত (বিরহ)
- নিরশন (অনশন, না খাওয়া)
  নিরসন (দূরীকরণ)
- নিরস্ত (বিরত)
  নিরস্ত্র (যার সঙ্গে অস্ত্র নেই)
- নিরাবরণ (আবরণহীন)
  নিরাভরণ (অলংকারহীন)
- নিরাশ (হতাশ)
  নিরাস (নিক্ষেপণ)
- নিরীক্ষমাণ (যে দেখছে)
  নিরীক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)
- নিরেস (খারাপ)
  নীরেশ (বরুণদেব)
- নির্জর (জরাহীন)
  নির্ঝর (ঝরনা)
- নির্বপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান)
  নির্বাপণ (আগুন ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলা)
- নির্বাত (বায়ুহীন)
  নির্বাদ (নিন্দা)
  নির্বাধ (বাধাহীন)
- নিশিত (শাণিত, ধারালো)
  নিশীথ (রাত্রি)
- নিষ্ঠুর (গভীর)
  নিষ্ঠুরি (ধূম, ঘুমন্ত)
- নিষধ (প্রাচীন ভারতের রাজা-বিশেষ)
  নিষাধ (ব্যাধ)
  নিষাদী (হস্তীচালক, মাহুত)
- নিহত (মৃত)
  নিহিত (স্থাপিত, গুপ্ত)
- নীড় (পাখির বাসা)
  নীর (জল)
- নুড়ি (ছোট পাথর)
  নুরি (শুক-জাতীয় পাখি-বিশেষ)
- নুন (লবণ)
  ন্যূন (কম, সামান্য)
- নৃত্ত (অভিনয়)
  নৃত্য (নাচ)
- নেতৃত্ব (নেতার কাজ, নেতার পদ)
  নেত্রীত্ব (নেত্রীর কাজ, নেত্রীর পদ)
- নৈতিক (নীতি বিষয়ক)
  নৈত্যিক (প্রতিদিনকার)
- নৈষধ (নিষেধ বিষয়ক, নল রাজা)
  নৈষাদ (ব্যাধের ছেলে)
  নৈষাদি (ব্যাধের ছেলে)
- ন্যয় (ক্ষতি, নাশ)
  ন্যায় (ঠিক, উচিত)
- ন্যাকড়া (পুরোনো কাপড়ের টুকরো)
  ন্যাকরা (হাসিতামাশা)
- পক্ষ (দল, অংশ)
  পক্ষ্ম (চোখের পাতার লোম)
- পঙ্ক (পাঁক, কাদা)
  পঙ্ক্ত (বাড়ির দেওয়ালে চুনের কারুকার্য)
- পচ্য (যা রান্না করা যেতে পারে)
  পাচ্য (হজমের যোগ্য)
- পঞ্জিকা (বাজি রেখে খেলা, জুয়া)
  পঞ্জিকা (তিথি নক্ষত্র দিন বার প্রভৃতির তথ্যসমৃদ্ধ বই)
- পটল (রাশি, সমূহ, আচ্ছাদন, ছানি)
  পটোল (ফল-বিশেষ)
- পটাশ (মৌল পটাশিয়াম, পটাশিয়াম কারবোনেট, পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত নাম)
  পটাস (তফাটার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
- পঠন (নিজে পড়া)
  পাঠন (অন্যকে পড়ানো)
- পড়শ (পল্লি)
  পরশ (স্পর্শ)
- পড়া (পাঠ করা, পতন)
  পরা (পরিধান করা)
- পণব (বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ)
  প্রণব (ওঁকার)
- পতত্র (পাখির ডানা)
  পতত্রি, পতত্রী (পাখি)

• পতন (পড়া, নীচে পড়া)
পত্তন (আরম্ভ)

• পত্তি (পদাতিক সৈন্য)
পুথ্যি (রোগীর খাবার)

• পথ (রাস্তা)
পাথ (জল)
পাত (পতন)

• পদ্ম (পদ্ম ফুল)
পদ্য (কবিতা)
পাদ্য (পা ধোয়ার জল)

• পদ্মা (লক্ষ্মী, নদী-বিশেষ)
পদ্যা (পথ)

• পদ্মালয় (পদ্ম ফুটে-থাকা জলাশয়)
পদ্মালয়া (লক্ষ্মী)

• পরক (আরশি, কাচ)
পরখ (পরীক্ষা)

• পরত্ব (ভিন্নতা)
পরত্র (পরজগতে)

• পরভৃৎ (অপরের আশ্রয়দাতা, কাক
পরভৃত (পরাশ্রিত, কোকিল)

• পরশ্ব (পরশুদিন)
পরস্ব (অন্যের সম্পদ)

• পরাবার (পরিয়ে দেওয়ার)
পারাবার (সমুদ্র)

• পরামর্শ (আলোচনা, উপদেশ)
পরামর্ষ (সহনশীলতা)

• পরাহ্ন (অন্য বেলা, বিকেল)
পরান্ন (অপরের অন্ন)

• পরিচ্ছদ (পোশাক)
পরিচ্ছেদ (অংশ, বইয়ের অংশ)

• পরিচ্ছন্ন (পরিষ্কার)
পরিচ্ছিন্ন (ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন)

• পরিদান (বসন)
পরিধান (বস্ত্র)

• পরিসেবন (বিলাপ, অনুতাপ)
পরিবেদন (বড়ো ভাইয়ের আগে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে)

• পরিযাতী (যাযাবর)
পুরোযাতী (অগ্রগামী)

• পরিষদ (সভা, গোষ্ঠী)
পারিষদ (সভ্য, সভাসদ)

• পরীক্ষিৎ (অভিমন্যুর ছেলে)
পরীক্ষিত (পরীক্ষা করা)

• পরুষ (কর্কশ, কঠোর)
পুরুষ (পুরুষ জাতি)

• পর্যয় (বিপর্যয়)
পর্যায় (ক্রম)

• পলল (মাংস)
পয়ল (জলাশয়)

• পসরা (বিক্রির জিনিস)
পসার (প্রভাব, নামডাক)

• পাঁজি (পঞ্জিকা)
পাজি (দুষ্ট)

• পাঁড় (ঘোরতর আকৃষ্ট)
পাড় (ধার, কিনার)
পার (তীর)

• পাঁতি (পঙ্‌ক্তি, সারি)
পাতি (সারি, সমুদ্রে, ছোটো)

• পাক (ঘূর্ণন, রান্না, বিপদ)
পাঁক (কাদা)

• পাকযন্ত্রী (পরিপাক যন্ত্র)
পাকস্থালী (রান্নার পাত্র)

• পাট (তন্তু)
পাঠ (পড়া)

• পাড়া (পল্লি, সমানো)
পারা (সক্ষম)

• পাণি (হাত)
পানি (জল)

• পাবনি (পবনন্দন হনুমান)
পাবনী (পবিত্রকারিণী)

• পার্থব (স্থূলতা)
পার্থিব (জাগতিক, ঐহিক)

• পাশ (বন্ধন, সাফল্য)
পাঁশ (ছাই)

• পাশক (পাশা খেলা)
পায়ক (পায়ের অলংকার-বিশেষ)

• পিঠ (বুকের উলকো দিক)
পীঠ (দেবদেবীর আসন কিংবা অধিষ্ঠানক্ষেত্র)

• পিড়ক (ফুসকুড়ি)
পীড়ক (পীড়নকারী)

• পিড়া (বেদি)
পীড়া (রোগ)

• পিন (ছুঁচোলো শলাকা)
পীন (স্থূল, বড়ো)

• পিনাস (ছোট ও দ্রুতগামী নৌকো)
পীনস (নাকের ক্ষতজনিত রোগ)
পিষ্ট (পেষিত)
পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত)

• পৃষ্ঠ (পিঠ)
পৃষ্ঠা (ঘোড়া)

• পুতি (কাচ ইত্যাদির ছোটো দানা যা দিয়ে মালা গাঁথা হয়)
পুথি (বই)
পূতি (দুর্গন্ধ)

• পুট (আবরণ)
পুট (সোনা প্রভৃতি গলাবার পাত্র)

• পুড়ন (পোড়া)
পূরণ (পূর্ণ করা)

• পুত (পুত্র)
পূত (পবিত্র)

• পুর (নগর)
পুরঃ সামনে)
পূর (পরিপূরণ, জলরাশি)

• পুরি (লুচি)
পুরী (শহর, বাড়ি)
পূরী (পূরযুক্ত খাদ্য)

• পুষ্কর (পদ্ম)
পুষ্কল (পর্যাপ্ত)

• পূর্বাভাষ (আগে থাকতে বলা)
পূর্বাভাস (আগে থাকতে আভাস দেওয়া বা জানানো)

• পূর্বাহ্ন (অগের দিন)
পূর্বাহ্ণ (সকাল)

• পেখন (দর্শন, দেখা)
পেখম (ময়ূরের পেখম)

• পেশা (বৃত্তি, ব্যবসা)
পেসা (তৈরো করা)

• পেষণ (চেপা, পিষ্ট করা)
প্রেষণ (প্রবর্তনা, নিয়োগ)

• পৌঁচ (আস্তরণ)
পৌঁছ (পরিষ্কার)
পোচ (ডিমের পোচ)

• পৌঁছা (পরিষ্কার)
পোছা (জিজ্ঞাসা করা)

• পোগণ্ড (অল্পবয়স্ক, নাবালক)
প্রগণ্ড (বাহুর কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশ)

• পোশাক (পরিচ্ছদ)
পোষক (পোষণকারী)

• পৌরুষ (বীরত্ব)
পৌরুষ (পুরুষ বিষয়ক, পুরুষোচিত)

• প্রকার (রকম)
প্রাকার (প্রাচীর)

• প্রকৃত (আসল)
প্রাকৃত (চলিত, লোক-ব্যবহারোপযোগী)

• প্রফুল (ফুলন্ত)
প্রোজ্জ্বল (অত্যন্ত উজ্জ্বল)

• প্রততি (ব্যাপ্তি)
প্রতীতি (জ্ঞান, বিশ্বাস)

• প্রতর্ক (অনুমান)
প্রতীক্ষণ (অনুমানসাধ্য)

• প্রতিক্ষণ (সবসময়)
প্রতীক্ষণ (অপেক্ষা)

• প্রতিঘাত (আঘাতের বিপরীতে)
প্রতিবাদ (বিরুদ্ধে বলা)

• প্রতিভাষণ (ভাষণের উত্তরে ভাষণ)
প্রতিভাসন (আলোয় উদ্ভাসন)

• প্রতিসরণ (গতিপথ পরিবর্তন)
প্রতিসারণ (দূরীকরণ)

• প্রতীক্ষমাণ (প্রতীক্ষাকারী)
প্রতীক্ষ্যমাণ (যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে)

• প্রত্যহ (রোজ)
প্রত্যূহ (বাধা, তর্ক)

• প্রথিত (খ্যাত)
প্রোথিত (পোঁতা)

• প্রদান (দেওয়া)
প্রধান (মুখ্য)

• প্রধি (চাকার নেমি বা রিম)
প্রধী (বুদ্ধিমান)

• প্রবাস (বিদেশে বসবাস)
প্রভাষ (ভালোভাবে বলা)
প্রভাস (দীপ্তিময়, তীর্থ-বিশেষ)

• প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী)
প্রবৃদ্ধ (বয়স্ক)

- প্রভঞ্জন (ঝড়)
  প্রাভঞ্জন (স্বাতি নক্ষত্র)
- প্রভব (উৎপত্তিস্থান)
  প্রভাব (প্রতিপত্তি)
- প্রভুত্ব (আধিপত্য)
  প্রভূত (অনেক)
- প্রমথ (শিবানুচর)
  প্রমাথ (হত্যা)
- প্রমিত (প্রমাণিত, পরিমিত)
  প্রমীত (প্রবঞ্চনা)
- প্রসক্তি (আসক্তি)
  প্রসত্তি (প্রসন্নতা)
- প্রসব (সন্তান উৎপাদন)
  প্রসভ (বলপ্রয়োগ, সহসা)
- প্রসরণ (ইতস্তত ভ্রমণ, ব্যাপ্তি)
  প্রসারণ (বিস্তার করা)
- প্রসাদ (প্রসন্নতা, দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী)
  প্রাসাদ (বড়ো এবং পাকা বাড়ি)
- প্রসাদন (সন্তুষ্ট করা)
  প্রসাধন (রূপচর্চা, সাজসজ্জা)
- প্রসাদি (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত)
  প্রসাদী (প্রসাদজনক, আনন্দের)
- প্রস্ত (দফা)
  প্রস্থ (বিস্তার)
- প্রহিত (নিরস্ত, বিক্ষিপ্ত)
  প্রহৃত (মার-খাওয়া)
- প্রাতিপথিক (বিপরীতগামী পথিক)
  প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন শব্দ)
- প্রাবর (প্রাচীর)
  প্রাবার (আবরণের কাপড়)
- প্রাশ (আহার)
  প্রাস (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)
- প্রিন্সিপল (নিয়ম, নীতি)
  প্রিন্সিপাল (প্রধান, মুখ্য, অধ্যক্ষ)
- প্রেষ (ছাপ)
  প্রেস (ছাপাখানা)
- প্রোত (প্রথিত, জড়িত)
  প্রোথ (ঘোড়ার নাসিকাগ্র, প্রসিদ্ধ)
- ফলি (ফলুই মাছ)
  ফলী (ফলবান, ফলিত)
- ফাঁড়া (বিপদ)
  ফাড়া (চিরে ফেলা)
- ফাল্গুনি (অর্জুন)
  ফাল্গুনী (ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা)
- ফুঁক (ফুৎকার)
  ফুক (অতিদ্রুততার ভাব)
- ফুসফুস (শ্বাসযন্ত্র)
  ফুস ফুস (ধ্বন্যাত্মক মৃদু শব্দ)
- ফোঁটা (টিপ, বিন্দু)
  ফোটা (প্রস্ফুটিত হওয়া)
- ফোঁড়ন (সেলাই, ছিদ্র করা)
  ফোড়ন (ব্যঞ্জনে বিশেষরকম মশলা দেওয়া)
- ফোঁড়া (বিদ্ধ করা, সেলাই)
  ফোড়া (স্ফোটক, ব্রণ)
- বংশ (পরিবার, বাঁশ)
  বংশ্য (বংশীয়, বংশ বিষয়ক)
- বংশগত (পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত)
  বংশগত (বশে-আসা, আয়ত্ত)
- বট (মাছ তরকারি কাটার যন্ত্র)
  বটি (আলজিভ)
  বটী (বড়ি, বটিকা)
- বঁধু, বঁধুয়া (বন্ধু)
  বধূ (পত্নী, স্ত্রী)
- বখরা (ভাগ)
  বখেড়া (বাধা, প্রতিবন্ধকতা)
- বঙ্ক (বাঁকা)
  বঙ্ক্য (বাঁচানোর উপযুক্ত)
- বজরা (বড়ো ও বাহারি নৌকো)
  বাজরা (গম-জাতীয় শস্য)
- বজ্র (বাজ)
  বর্জ্য (বর্জনীয়)
  বর্য (শ্রেষ্ঠ, প্রধান)
- বণ্ট (অংশ)
  বণ্ঠ (অবিবাহিত, বেঁটে)
- বদরি (কুল)
  বদরী (হিমালয়ের তীর্থস্থান-বিশেষ)
- বনাশ্রম (বনের মধ্যে আশ্রম)
  বর্ণাশ্রম (হিন্দু ধর্মের চার বর্ণ প্রথা)
- বনিতা (নারী)
  ভণিতা (কবিতার মধ্যে কবির নামোল্লেখ)
- বন্দ (বাড়ির মাপ, খণ্ড)
  বন্দ্য (বন্দনীয়, পূজ্য)
  বন্ধ (রুদ্ধ, অচল, বাঁধন)
  বন্ধ্য (বন্ধনযোগ্য)
- বন্দন (পূজা)
  বন্ধন (বাঁধন)
- বন্দি (আবদ্ধ, কারারুদ্ধ)
  বন্দী (স্তুতিগায়ক)
- বন্দিনি (কারারুদ্ধা)
  বন্দিনী (বন্দনাকারিণী)
- বয়ড়া (বহেড়া)
  বয়রা (বধির)
- বয়ন (বোনা)
  ব্যয়ন (খরচ করা)
- বরগা (ছাদের টালি পাতার জন্য ব্যবহৃত কাঠ কিংবা লোহার পাত)
  বর্গ (সমূহ, দুই সমান রাশির গুণফল)
  বর্গা (ভাগচাষি)
  বর্গ্য (বর্গভুক্ত)
- বরণ (অভ্যর্থনা)
  বরন (বর্ণ, রং)
- বরাঙ্গনা (শ্রেষ্ঠ রমণী)
  বারাঙ্গনা (বেশ্যা)
- বরাহ (শুকর)
  বারাহ (শূকর বিষয়ক)
- বর্ণ (লিপি, রং)
  বর্ণ্য (বর্ণ বিষয়ক, বর্ণনার যোগ্য)
- বর্তি (বাতি)
  বর্তী (স্থিত)
- বর্তিষ্ণু (স্থিতিশীল)
  বর্ধিষ্ণু (যা বেড়ে চলেছে)
- বর্মি (ব্রহ্মদেশবাসী)
  বর্মী (বর্মধারী)
- বর্শা (হাতিয়ার-বিশেষ)
  বর্ষা (বৃষ্টি, বৃষ্টির কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ মাস)
- বর্হি (আগুন)
  বর্হী (ময়ূর)
- বলকা (উতলোনা)
  বলাকা (স্ত্রী-জাতীয় হাঁস)
- বলি (দেবতার উদ্দেশে পশু-হত্যা)
  বলী (বলবান)
- বল্লব (গোয়ালা)
  বল্লভ (পতি, প্রিয়জন)
- বশিষ্ঠ (মুনি-বিশেষ)
  বাশিষ্ঠ (বশিষ্ঠের ছেলে)
- বসন (পরিধেয় বস্ত্র)
  ব্যসন (চারিত্রিক দোষ, পাপ)
- বহুত্ব (রকমারি)
  বহুত্ব (অনেক জায়গায়)
- বাঁচন (বেঁচে থাকা)
  বাচন (কথা, উক্তি)
- বাঁজা (বন্ধ্যা)
  বাজা (শব্দ করা)
- বাঁট (গরু ইত্যাদির স্তন)
  বাট (রাস্তা)
- বাঁটা (বণ্টন করা, ভাগ করা)
  বাটা (পেষণ করা, পান রাখার পাত্র, ছোট মাট-বিশেষ)
- বাঁদি (পরিচারিকা)
  বাদী (অভিযোগকারী)
- বাঁধন (বাঁধা)
  বাদন (বাজানো)
- বাঁধা (বন্ধক রাখা, আটকানো)
  বাধা (প্রতিবন্ধকতা, বিঘ্ন)
  বাদা (জলাভূমি)
- বাঁধানো (বাধাই করা, ফ্রেমে আটকানো)
  বাধানো (ঘটানো)
- বাঁশ (বাঁশ গাছ)
  বাস (বসবাস, গন্ধ)
- বাঁশি (সুষির যন্ত্র)
  বাসি (পচা, টাটকা নয়)
  বাসী (নিবাসী, বাসিন্দা)
- বাগুড়া (সুপারি নারকেল প্রভৃতি গাছের সবৃন্ত পাতা)
  বাগুরা (স্নাল, ফাঁদ)

- বাজি (ভেলকি, জুয়া খেলার পণ)
  বাজী (ঘোড়া)
- বাটি (কানা-উঁচু পাত্র,
  বাটী (বাড়ি)
- বাণ (শর, তির)
  বান (বন্যা)
- বাণী (কথা, উক্তি)
  বানি (স্যাকরার মজুরি)
- বাদা (বাজনা)
  বাধা (অনুগত)
- বামন (বেঁটে)
  বামুন (ব্রাহ্মণ)
- বারুণি (অপস্থা)
  বারুণী (বরুণকন্যা)
- বারোমাস (সারা বছর, সবসময়)
  বারো মাস (১২ মাস, বারো সংখ্যক মাস)
- বালি (বালুক)
  বালী (কিষ্কিন্ধার রাজা)
- বালিশ (মাথায় দেওয়ার বালিশ)
  বালীশ (পাথুরি রোগ)
- বিকৃত (বিকারপ্রাপ্ত)
  বিক্রীত (যা বিক্রি হয়ে গেছে)
- বিঘ্ন (উৎকণ্ঠিত)
  বিঘ্ন (বাধা)
- বিচি (বীজ)
  বীচি (ঢেউ)
- বিজন (নির্জন)
  বীজন (বাতাস দেওয়া)
- বিজিৎ (বিজয়ী)
  বিজিত (পরাজিত)
  বীজিত (যাকে বাতাস দেওয়া হচ্ছে)
- বিতংস (ফাঁদ, জাল)
  বিদংশ (চাট, দংশন)
- বিতত (ছড়ানো, বিস্তীর্ণ)
  বিতথ (মিথ্যা)
- বিতান (মণ্ডপ)
  বিধান (নিয়ম)
- বিত্ত (সম্পদ)
  বৃত্ত (গোলাকৃতি ক্ষেত্র)
  বৃতা (বরণীয়)
- বিত্রস্ত (ভীত)
  বিস্রস্ত (স্খলিত)
- বিদুর (ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভাই)
  বিদূর (দূরবর্তী, সম্পর্কহীন)
- বিদ্যমান (অবস্থিত)
  বিধ্যমান (যাকে বিদ্ধ করা হচ্ছে)
- বিনদ (ধ্বনি, শব্দ)
  বিনোদ (আমোদ, আনন্দ)
- বিনা (ছাড়া, ব্যতিরেকে)
  বীণা (তারযন্ত্র-বিশেষ)
- বিপ্লব (দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন)
  বিপ্লাব (প্লাবন)
- বিবক্ষা (বলার ইচ্ছে)
  বিবিক্ষা (প্রবেশের ইচ্ছা)
- বিবীত (গোচারণ ভূমি)
  বিবৃত (বর্ণিত)
  বিবৃত্ত (ঘূর্ণিত)
  বিভীত (ভয়হীন)
- বিবৃতি (বিবরণ)
  বিবৃত্তি (ঘূর্ণন)
- বিমর্শ (বিতর্ক)
  বিমর্ষ (বিষাদগ্রস্ত)
- বিম্ব (বুদবুদ)
  বিম্বু (বিম্বাকৃতি)
- বিরচন (বই ইত্যাদি লেখা)
  বিরেচন (মল নিঃসারণ)
  বিরোচন (সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র)
- বিরচিত (রচিত)
  বীরোচিত (বীরের মতো)
- বিরুত (কলরব)
  বিরুদ (গাছ)
- বিশ (কুড়ি)
  বিষ (মারক দ্রব্য)
  বিস (পদ্মের ডাঁটা)
- বিশদ (সবিস্তার)
  বিষদ (বিষদায়ক)
  বিষাদ (দুঃখ)
- বিশ্বায়ন (সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া)
  বিস্ময়ন (বিস্ময় উৎপাদন)
- বিশ্রুত (সুবিখ্যাত, প্রসিদ্ধ)
  বিস্রুত (ক্ষরিত, পতিত, পরিস্রুত, প্রবাহিত)

- বিসরণ (বিস্তার)
  বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া)
- বিসৃত (বিস্তৃত, ব্যাপ্ত)
  বিস্তৃত (ব্যাপ্ত)
  বিস্মৃত (ভুলে যাওয়া)
- বিস্তর (অনেক)
  বিস্তার (প্রসার)
- বিহারি (বিহার প্রদেশ বিষয়ক, বিহারের অধিবাসী)
  বিহারী (ভ্রমণকারী)
- বীক্ষমাণ (নিরীক্ষণরত, যে দেখছে)
  বীক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে, নিরীক্ষিত)
- বীতি (মুক্তি)
  বীথি (শ্রেণি, পথ)
- বৃক্ক (কিডনি)
  বৃক্ষ (গাছ)
- বৃতি (আবরণ)
  বৃত্তি (জীবিকা)
- বেঁড়ে (বেঁটে)
  বেড়ে (খুব ভালো)
- বেদ (জ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র)
  বেধ (পুরু, পরিমাণ)
- বেদি (পুজো কিংবা যজ্ঞের উঁচু স্থান)
  বেদী (বেত্তা)
- বেয়াড়া (বদমেজাজি)
  বেয়ারা, বেহারা (পালকির বাহক, পিয়োন)
- বেশি (অতিরিক্ত)
  বেশী (বেশধারী)
- বৈচিত্র্য (মতিভ্রম)
  বৈচিত্র (চমৎকারিত্ব)
  বৈচিত্র্য (বিভিন্নতা, রকম-ফেরতা)
- বৈয়াসকি (ব্যাসের ছেলে)
  বৈয়াসিক (ব্যাস বিষয়ক)
- ব্যগ্র (উদ্বিগ্ন)
  ব্যগ্র (ব্যাঘ)
- ব্যঙ্গ (বিদ্রূপ, ঠাট্টা)
  ব্যঙ্গ্য (গূঢ়, ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধ্য)
- ব্যঙ্গোক্তি (বিদ্রূপপূর্ণ কথা)
  ব্যঙ্গ্যোক্তি (ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য)
- ব্যবহিত (অন্তরিত, কৃত-ব্যবধান)
  ব্যবহৃত (ব্যবহার করা)
- ব্যাসক্ত (ব্যভিচারী)
  ব্যাসোক্ত (ব্যাস কথিত)
- ব্যাসক্তি (ব্যভিচার)
  ব্যাসোক্তি (ব্যাসদেবের কথা)
- ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্ম বিষয়ক)
  ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ বিষয়ক)
- ব্রাত (শ্রমিক, মজুরি)
  ব্রাত্য (সংস্কারহীন, পতিত)
- ভগবৎ (ভগবান)
  ভাগবৎ (ভগবান বিষয়ক)
- ভগবতী (দুর্গা)
  ভাগবতী (ভগবান বিষয়ক)
- ভগিনী (ভগ্নী)
  ভোগিনী (ভোগকারিণী)
- ভঙ্গ (ভাঙা)
  ভঙ্গ্য (ভাঙার যোগ্য, ভঙ্গ-প্রবণ)
- ভজমান (উপাসনারত)
  ভজ্যমান (যাকে উপাসনা করা হচ্ছে, যা বিভাজন করা যায়)
- ভড় (যে-নৌকো অনেক মাল বইতে পারে, বড়ো ও মালবাহী নৌকো)
  ভর (বস্তুর ভার, সমস্ত, পূর্ণ)
  ভোর (সকাল)
- ভয়াপহ (যিনি ভয় দূর করেন)
  ভয়াবহ (ভীতিপ্রদ)
- ভরণ (ভরা, ভরতি করা)
  ভরন (এক ধরনের সংকর ধাতু)
- ভরদ্বাজ (মুনি-বিশেষ, দ্রোণের পিতা)
  ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজবংশীয়)
- ভাঁজ (পাট, স্তর)
  ভাজ (ভাতৃবধূ)
- ভাঁজা (পাট করা, সুর অভ্যাস করা, সঞ্চালন)
  ভাজা (তেল ইত্যাদিতে রান্না করা)

- ভাঁটা (ইট ইত্যাদি পোড়ানোর চুল্লি, খেলার বল)
  ভাটা (সমুদ্রের জলস্তর নেমে যাওয়া, স্রোতের উলটো দিক)
- ভাঁড় (মাটির পাত্র, বিদূষক)
  ভার (ওজন, দায়িত্ব)
- ভাড়া (যানবাহনে চড়ার মূল্য, বাড়ি ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য দেয় টাকা)
  ভারা (উঁচু জায়গায় কাজ করার জন্য তৈরি মাচা)
  ভাণ (সংস্কৃত রূপক নাটক-বিশেষ, ভণিতা, বলা)
  ভান (ছল)
- ভদ্রপদ (ভাদ্র মাস)
  ভদ্রপদা (নক্ষত্র-বিশেষ)
- ভাবি (বউদি)
  ভাবী (ভবিষ্যতের)
- ভারি (খুব)
  ভারী (ভারযুক্ত)
- ভাল (কপাল)
  ভালো (উৎকৃষ্ট)
- ভাশুর (স্বামীর বড়ো ভাই)
  ভাসুর (দীপ্তিশীল)
- ভাষ (ভাষণ, কথা)
  ভাস (দীপ্তি)
- ভাষণ (বক্তৃতা)
  ভাসন (উদ্ভাসন)
- ভাষা (মনের ভাব বোঝানোর জন্য মানুষ যে-অর্থপূর্ণ ধ্বনি মুখ দিয়ে বার করে)
  ভাসা (জলে কিংবা বাতাসে সঞ্চরণশীল অবস্থা)
- ভাষাভাষী (কোনো ভাষার ব্যবহারকারী, ওই ভাষায় যারা কথা বলে)
  ভাসাভাসি (জলে ভাসা)
- ভাস্কর (মূর্তিশিল্পী, সূর্য)
  ভাস্বর (উজ্জ্বল)
- ভিসা (বিদেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র)
  ভীষা (ভয়গ্রস্ত)
- ভুঁড়ি (মোটা পেট)
  ভুরি (প্রচুর)
- ভূতি (কাঁঠালের ভুতি)
  ভূতি (বিভূতি)
- ভুসা (কালি)
  ভূষা (সাজ, গয়না)
- ভূপতিত (মাটিতে পড়া)
  ভূপাতিত (যাকে মাটিতে ফেলা হয়েছে)
- ভেক (ব্যাং)
  ভেখ (ছদ্মবেশ, বৈরাগির পোশাক)
- ভেড়ি (মাছ চাষের জলাশয়, স্ত্রী ভেড়া)
  ভেরি (ঢাক, দামামা)
- ভোমর (তুরপুন)
  ভ্রমর (ভোমরা)
- মঙ্গল (শুভ)
  মোঙ্গল (মধ্যএশিয়ার জাতি-বিশেষ)
- মঞ্চকৃতি (নাটকাভিনয়)
  মঞ্চাকৃতি (মঞ্চের মতো আকৃতি-বিশিষ্ট)
- মটর (ডাল-বিশেষ)
  মোটর (যন্ত্রচালিত ও রাস্তায় চলার উপযোগী যান)
- মড়ক (মারি)
  মোড়ক (আবরণ)
- মণীর (মণির মতো)
  মনির (মালিক)
- মণীশ (শ্রেষ্ঠ মণি)
  মনিষ (জনমজুর)
- মত (মনোগত ভাব, ধারণা)
  মতো (সদৃশ, অনুসারে)
- মৎস্যাশন (মাছ খাওয়া)
  মৎস্যাসন (একপ্রকার যোগাসন)
- মতি (মনোভাব, ইচ্ছা)
  মোতি (মুক্তা)
- মত্ত (মাতাল, ক্ষিপ্ত, আত্মহারা)
  মত্য (সিঁড়ি)
- মদোন্মত্ত (গর্বিত)
  মদ্যোন্মত্ত (মাতাল)
- মদ্দ (জোয়ান পুরুষ)
  মদ্য (সুরা, মদ)
- মনোভব (কামদেব)
  মনোভাব (মনের ইচ্ছা)
- মন্দর (সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত পর্বত)
  মন্দার (পারিজাত ফুল, মাদার গাছ)

- মরুদ্বিপ (মরুভূমির হাতি অর্থাৎ উট)
  মরুদ্বীপ (মরুভূমির দ্বীপ অর্থাৎ মরূদ্যান)
- মর্ত (পৃথিবী)
  মর্ত্য (পৃথিবী বিষয়ক)
- মসুরি (ডাল-বিশেষ)
  মসূরী (বসন্ত রোগ)
- মহড়া (অভিনয় অভ্যাস)
  মহলা (মহলবিশিষ্ট)
  মোহাড়া (অগ্রভাগ)
- মহিত (অর্চিত)
  মোহিত (মুগ্ধ)
- মহিষ (মোষ)
  মহীশ (ধরণিপতি, রাজা)
- মহিসুত (মঙ্গল গ্রহ)
  মহিসুতা (সীতা)
- মাকন্দ (আম)
  মাকুন্দ (যার বাড়ি-গোঁফ নেই)
- মাঘ (বঙ্গাব্দের দশম মাস)
  মাঘা (কুন্দ ফুল)
- মাঙা (চাওয়া)
  মাঙ্গা (দুর্মূল্য)
- মাড় (ভাতের ফেন)
  মার (মরণ, কামদেব, প্রহার)
- মাড়ানো (পদদলন)
  মারানো (মেরে ফেলা)
- মাড়ি (তাল, কাঁঠালের ঘন রস)
  মাঢ়ি (পাতার শিরা)
  মাঢ়ী (দাঁতের গোঁড়ার মাংস)
- মাঙাল (মদ্যপ)
  মাখাল (তাল পাতার টোকা)
- মাতৃক (মা বিষয়ক)
  মাত্রিক (মাত্রাযুক্ত)
- মানুষি (মানুষের ভাব)
  মানুষী (নারী)
- মান্দ (রাগিণীর নাম)
  মান্দা (কমতি)
- মার্গ (পথ)
  মার্গ্য (গবেষণার যোগ্য)
- মাষ (মাষকলাই)
  মাস (তিরিশ দিন, মাংস)
- মিত (পরিমিত)
  মিথঃ (পরস্পর)
- মিল (সাদৃশ্য, কারখানা)
  মীল (সংকোচ)
- মিলন (সংযোগ, একত্রিত হওয়া)
  মীলন (সংকোচন)
- মিলিত (একত্রিত, সংযুক্ত)
  মীলিত (মুদিত)
- মুখ (বদন)
  মূক (বোবা)
- মুখপত্র (কোনো দলের পত্রিকা, প্রচারপত্র)
  মুখপাত্র (প্রতিনিধি)
- মুচি (জুতোনির্মাতা)
  মুছি (ছোটো পাত্র)
- মুড়ি (ভাজা চাল)
  মুরি (নর্দমা)
- মুলা (মুলো)
  মূলা (নক্ষত্র-বিশেষ)
- মুষ্ক (অণ্ডকোষ)
  মুষকো (বলবান)
- মুসা (ইহুদি ধর্মপ্রণেতা)
  মুষা (সোনা গলানোর পাত্র)
- মূল্যবান (দামি)
  মূল্যমান (মূল্যের সূচক)
- মৃৎ (মাটি)
  মৃত (বিগতপ্রাণ)
- মেজ (টেবিল)
  মেজো (দ্বিতীয়)
- মেদ (চর্বি)
  মেধ (যজ্ঞ)
- মেষ (ভেড়া)
  মেস (একত্রে থাকার জায়গা)
- মৈত্র (বন্ধু বিষয়ক)
  মৈত্র্য (বন্ধুত্ব)
- মৈথিলি (মিথিলার ভাষা)
  মৈথিলী (সীতা)
- যজন (পুজো করা)
  যাজন (যজ্ঞ করা)
  যোজন (যোগ করা, ৫ মাইল দূরত্ব)
- যজ্ঞ (হোম, অগ্নিপূজা)
  যোগ্য (উপযুক্ত)
- যৎ (সংগীতের তাল-বিশেষ)
  যত (যে-পরিমাণ, সংযম)

- বশংবদ (বশম্বদা)
  বশেবদ (যারই সেবা যে)
- যাচক (প্রার্থী)
  যাজক (পুরোহিত)
- যাচ্ঞামান (যে প্রার্থনা করছে)
  যাচ্ঞামাণ (যা কিংবা যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে)
- যামিনী (রাত্রি)
  জামিনদার (জামিনদার)
- যুক্তি-সহ (যুক্তি দিয়ে)
  যুক্তিসহ (যা যুক্তির বিচারে টিকে যায়, যুক্তিসংগত)
- যুগ্ম (যৌত)
  যুগা (বাহন)
- যোগরূঢ় (বিশেষার্থবোধক শব্দ)
  যোগারূঢ় (যোগ বা ধ্যানে নিমগ্ন)
- রক্ষ (রাক্ষস)
  রক্ষা (যা রক্ষা করা উচিত)
- রজত (রুপো)
  রাজত (রুপোর তৈরি)
- রম্ভিত (তাড়ানো)
  রম্ভণ (দুষ্কৃতকারী)
- রত (লিপ্ত)
  রথ (বাহন, যান-বিশেষ)
- রশনা (এক ধরনের কটিভূষণ)
  রসনা (জিহ্বা)
- রশ্ম (দড়ি)
  রশ্মা (পৃথিবী, কোল)
- রসাভাস (রসের আভাস)
  রসাভাস (রসভুল্য, অপ্রিয় রস কিংবা তার বর্ণনা)
- রসিত (আস্বাদিত)
  রসিদ (প্রাপ্তিস্বীকারপত্র)
- রম্য (আস্বাদ্য)
  রুষ (ছোটো)
- রহস (সংসর্গ)
  রহস্য (গূঢ় তাৎপর্য)
- রহিত (বিহীন)
  রোহিত (রুই মাছ)
- রাঁড়ি (বিধবা)
  রাড়ি (রাঢ় অঞ্চলের)
- রাজবংশ (রাজার বংশ)
  রাজবংশ্য (রাজবংশীয়, রাজ-বংশে জাত)
- রাতদিন, রাত্রিদিন (সর্বক্ষণ)
  রাত-দিন, রাত্রি-দিন (দিন এবং রাত্রি)
- রাম (রামচন্দ্র)
  রামা (সুন্দরী)
- রাশ (লাগাম)
  রাস (কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব)
- রাষ্ট্রীকরণ (প্রচার করা)
  রাষ্ট্রীয়করণ (রাষ্ট্রের অধীনে আনা)
- বিকৃষ (স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি)
  বিক্ত (শূন্য, দরিদ্র)
- রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, শরীরের এই ছয় শত্রু)
  রিপু (সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ)
- রিলেট (ধান থেকে কিছু ছাড়)
  রিভেট (ধাতুর পাত জোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাঁটা)
- রিষ্ট (পাপ, খড়)
  রিস্ট (কবজি)
- রুপ্য (সোনা)
  রুক্ষ (কর্কশ, অমসৃণ)
- রুপা (সাদা ধাতের ধাতু-বিশেষ)
  রূপা (রূপসুক্তা)
- রেজলা (নীচ)
  রেজালা (রান্নার-বিশেষ)
  রেসালা বা রিসালা (অশ্বারোহী সৈন্যদল)
- রেতি (উখো)
  রেতী (বেলাভূমি, তীর)
- রেশ (জের, আভাস)
  রেস (গতির প্রতিযোগিতা)
- রোঁদ (নজর রাখা, টহল-দারি)
  রোদ (রোদ্দুর)
  রোধ (বাধা)
- রোঁয়া (লোম)
  রোয়া (বপন)
- রোক (নগদ)
  রোখ (জেদ)
- রোকা (চিরকুট)
  রোখা (আটকানো)
- রাজকার (প্রতিদিনের)
  রোজগার (উপার্জন)
- রোহি (গাছ)
  রোহী (আরোহী)
- লক্ষ (দেখা, ১০০০০০)
  লক্ষ্য (উদ্দেশ্য)
- লক্ষণ (চিহ্ন)
  লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ভাই)
- লক্ষেশ্বর (লক্ষপতি)
  লক্ষ্মীশ্বর (নারায়ণ)
- লতিকা (লতা)
  লতিকা (গিরগিটি)
- লব্ধ (প্রাপ্ত)
  লভ্য (যা লাভ করা সম্ভব)
- ললিত (সুন্দর)
  লোলিত (শিথিল)
- লম্বিত (ঝোলানো)
  লম্বিত (উল্লম্বিত)
- লহনা (বাকি, প্রাপ্য)
  লহমা (মুহূর্ত)
- লাঙ্গলী (কৃষক)
  লাঙ্গুলী (লেজযুক্ত)
- লাশ (মৃতদেহ)
  লাস (স্ত্রীলোকের নৃত্য, বিলাস)
- লেবেল (নামলেখা কাগজ)
  লেভেল (চৌরস, সমভূমি)
- লেস (সামলা)
  লেস (ফিতে)
- লোলজিহ্ব (যার জিহ্বা লকলকে)
  লোলজিহ্বা (যে-জিহ্বা লকলকে)
- ল্যাটা (মাছ-বিশেষ)
  ল্যাঠা (উপদ্রব)
- শওয়াল (হিজরি বছরের দশম মাস)
  সওয়াল (প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা)
- শংকর (শিব)
  সংকর (মিশ্রণ)
- শংস্থ (সুস্থ)
  সংস্থ (অবস্থিত)
- সংস্থা (সুস্থা)
  সংস্থা (প্রতিষ্ঠান)
- শকল (মাছের আঁশ)
  সকল (সব)
- শক্ত (দৃঢ়, কঠিন)
  সক্ত (আসক্ত, সংলগ্ন)
- শক্তাশক্ত (শক্ত এবং অশক্ত)
  শক্যাশক্তি (শক্তি এবং অশক্তি)
- শক্তি (ক্ষমতা, বল)
  সক্তি (আসক্তি)
- শঙ্খক (শাঁখা)
  সংখ্যক (সংখ্যা বিষয়ক)
- শড়া (পচা)
  সরা (মাটির সরা)
- শল (পাট-জাতীয় তন্তু)
  সন (বছর)
  শন (শব্দ)
- শণ্ড (নপুংসক)
  ষণ্ড (ষাঁড়)
- শণ্ড (শূন্যস্থল)
  সণ্ড (৭)
- শব (মৃতদেহ)
  সব (সমস্ত)
- শবল (নানা বর্ণযুক্ত, চিত্র-বিচিত্র)
  সবল (বলশালী)
  শ্ববল (নিজের বল)
- শম (মোক)
  সম (সমান, সংগীতে তালের প্রথম মাত্রা)
- শমতা (নিবৃত্তি)
  সমতা (সমানে ভাব)
- শমন (যম)
  সমন (আদালতে পরোয়ানা)
- শমি, শম্মী (বাবলা শ্রেণির মাছ-বিশেষ)
  শম্মী (শান্ত, সংযমী)
- শমীক (মুনি-বিশেষ)
  সমিক (বেধনাস্ত্র-বিশেষ)
  সমীক (যুদ্ধ)
  স্যমীক (উই পোকা)
- শঙ্খ (বজ্র)
  সঙ্খ (উলটো দিকে হালচালানো)
- শম্বু (ছোটো শঙ্খ)
  শম্ভু (শিব)
  স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা)

- শয্যা (বিছানা)
  সজ্জা (সাজ)
- শয়ন (শোয়া)
  শয়ান (শোয়ানো)
- শয়িত (যে শুয়ে আছে)
  শায়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)
- শর (তির)
  সর (দুধের সর)
  স্বর (শব্দ)
  স্মর (মদন)
- শরণ (আশ্রয়, ভরসা)
  সরণ (সরে যাওয়া)
  স্মরণ (মনে করা)
- শরবৎ (তিরের মতো)
  শরবত (মিষ্টি পানীয়)
- শরাব (মদ)
  সরাব (কলসি)
- শরু (বাণ)
  সরু (শীর্ণ, কৃশ)
- শর্ব (শিব)
  সর্ব (সব, সকল)
- শলা (শলাকা)
  সলা (পরামর্শ)
- শল্য (অস্ত্র)
  শল্ল (আঁশ)
- শল্যক (গজার)
  শল্লক (আঁশ)
- শশা (ফল-বিশেষ)
  স্বসা (বোন)
- শস্ত (সুখী, মঙ্গলজনক)
  শস্ত্র (প্রহরণ)
- শস্য (ধান ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য)
  সস্য (ফলের ভেতরের অংশ)
- শাঁখা (শঙ্খ থেকে তৈরি হাতের গয়না)
  শাখা (গাছের ডাল, অংশ)
- শাকুনিক (ব্যাধ)
  শাকুলিক (মৎস্যজীবী)
- শাখ্য (শাখা বিষয়ক)
  সাক্ষ্য (আদালতে-দেওয়া বিবৃতি)
- শাঙ্খ (শঙ্খ বিষয়ক)
  সাংখ্য (কাপিল দর্শন)
- শাট (ধুতি)
  ষাট (৬০)
  সাঁট (সলাপরামর্শ)
  সাট (ছাপার কাজে ব্যবহৃত হরফসমষ্টি)
- শাড়ি (লম্বা কাপড় যা ভারতীয় মেয়েরা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে)
  শারি (শালিখ পাখি)
  সারি (লাইন)
- সাত (শাণিত, সুন্দর, ক্ষীণ)
  সাত (৭)
- শাদ (কচি ঘাস)
  সাদ (আরোহী)
  সাধ (সখ)
  স্বাদ (জিভে খাদ্যাদির অনুভূতি)
- শাদি (বিয়ে)
  সাদি (আরোহী)
- শান (পাথর)
  সান (চেতনা)
  স্বান (শব্দ)
- শানানো (ধার দেওয়া)
  সানানো (চটকে-মাখা)
- শান্ত (ধীর, স্থির)
  সান্ত (সসীম)
  সান্ত্ব (প্রবোধবাক্য)
  স্বান্ত (নিজের, মন)
- শাপ (অভিশাপ)
  সাপ (সর্প)
- শাবান (হিজরি বছরের অষ্টম মাস)
  সাবান (পরিষ্কার করার দ্রব্য-বিশেষ)
- শামা (বাতি, প্রদীপ)
  শ্যামা (কালী, কালো)
- শামি (লাঠির সরু মুখ)
  স্বামী (প্রভু, পতি)
- শায়ক (বাণ)
  সায়ক (খড়্গ)
- শারদা (দুর্গা)
  সারদা (সরস্বতী)
- শারীরক (জীবনধারী জীবাত্মার স্বরূপনির্ণয়)
  শারীরিক (শরীর বিষয়ক)
- শাল, সাল (পশমের চাদর, গাছ-বিশেষ)
  সাল (বছর)
- শিউলি (শেফালি ফুল)
  সিউলি (যারা গুড় তৈরি করে)
- শিক (শলাকা)
  শিখ (ধর্ম সম্প্রদায়-বিশেষ)
- শিকড় (মূল)
  শিখর (শীর্ষ)
  শীকর (জলবিন্দু)
  শেখর (মাথার অলংকার)
- শিকার (পশুহত্যা)
  স্বীকার (মেনে নেওয়া)
- শিট (কাগজ, চাদর)
  সিট (বসার জায়গা, আসন)
- শিত (শানিত, ক্ষীণ)
  শীত (ঠাণ্ডা)
  সিত (সাদা)
- শির (মাথা)
  শীর (অজগর)
  সীর (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)
- শিরীষ (গাছ-বিশেষ)
  শ্রীশ (নারায়ণ)
  সিরিশ (আঠা, বালি কাগজ)
- শিল (পাথর, শিলা)
  শীল (স্বভাব)
  সিল (ছাপ)
- শিলি (ব্যাঙের ছাতা, ভূর্জ-পত্র)
  শিলী (কেঁচো)
- শিশা (কাচ)
  সিসা (ধাতু-বিশেষ)
- শিশি (কাচের ছোটো বোতল)
  সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার)
- শিষ (শীর্ষ, পেনসিলের ডগার লেড)
  শিস (জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ যা শুনতে বাঁশির শব্দের মতো)
- শীতাংশু (ঠাণ্ডা রশ্মি, চাঁদ)
  সিতাংশু (চাঁদ, সাদা রশ্মি)
- শুক (শুকপাখি)
  শূক (শূককীট)
- শুক্ত (পর্যুসিত)
  সুক্তো (তিক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ)
  সূক্ত (ঋকের সমষ্টি)
- শুক্তি (ঝিনুক)
  সুক্তি (সদ্‌বাক্য, সুভাষিত)
- শুচি (পবিত্র)
  সূচি, সূচী (সারণি)
- শুদ্ধ (পবিত্র, ঠিক)
  সুদ্ধ (সহিত)
- শুধা (প্রশ্ন করা)
  সুধা (অমৃত)
- শুবা (সন্দেহ)
  সুবা (প্রদেশ)
- শুলফা, শুলফো (মৌরি-জাতীয় শাক)
  সুলফা (শুকনো তামাক-বিশেষ)
- শূকর (শুয়োর)
  সুকর (সুসাধ্য)
- শূর (বলবান)
  সুর (দেবতা, গানের সুর)
  সূর (সূর্য)
- শেজ (দীপাধার)
  সেজো (তৃতীয়)
- শৈত্য (শীতের ভাব)
  শ্বৈত্য (সাদার ভাব, শুক্লতা)
- শোট (মাতগুড়)
  শোঠ (অলস, মূর্খ)
- শোনা (শ্রবণ)
  সোনা (মূল্যবান ধাতু-বিশেষ)
- শৌভিক (সুন্দর, শোভা)
  শৌভিক (জানুকর)
- শোয়া (শয়ন)
  সোয়া (একের চার ভাগ)
- শৌকর্য (শুয়োর বিষয়ক)
  সৌকর্য (সৌন্দর্য)
- শৌনক (পুরাণোক্ত মুনি-বিশেষ)
  শৌনিক (কসাই, হরিণ শিকারকারী)
- শৌরি (কৃষ্ণ)
  সৌরি (যম)
- শৌর্য (বলবত্তা, বীর্য)
  সৌর্য (সূর্য বিষয়ক)
- শ্ব (কুকুর, পরের দিন)
  স্ব (স্বয়ং, নিজের)
  স্বর্গ (স্বর্গ)

- শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
  শ্মশ্রু (দাড়ি)
- শ্যাম (সবুজ)
  সাম (চতুর্বেদের অন্যতম)
- শ্রুত (যা শোনা হয়েছে)
  স্রুত (ক্ষরিত)
- শ্রুতি (শোনা)
  স্রুতি (ক্ষরণ)
- শ্রোতা (যে শুনছে)
  স্রোতা (স্রোতযুক্ত)
- শ্রোত্র (কান)
  শ্রৌত্র (বেদবিহিত)
- ষড়যন্ত্র (চক্রান্ত)
  স্বরযন্ত্র (কণ্ঠনালি)
- ষণ্মুখ (ছয় মুখবিশিষ্ট)
  সম্মুখ (সামনের দিক)
- ষষ্টি (৬০)
  ষষ্ঠী (সন্তানের রক্ষাকারিণী দেবী)
- সংজ্ঞান (চৈতন্য)
  সজ্ঞান (সচেতন)
- সংবরা (সংবরণ করা)
  সম্বরা (তেল, মশলা প্রভৃতি মিশিয়ে ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করা)
- সংবাদ (খবর)
  সম্বাধ (সম্যক বাধা)
- সংবিৎ (চেতনা)
  সংবীত (বেষ্টিত)
  সংবৃত (আবৃত, আচ্ছাদিত)
  সংবৃত্ত (জাত, নিষ্পন্ন)
- সংবিত্তি (অনুভব, বোধ)
  সংবৃতি (আচ্ছাদন, আবরণ)
  সংবৃত্তি (সম্পাদন, জন্ম)
- সংযাত (অনুগমন)
  সঞ্জাত (জাত, উৎপন্ন)
- সংরাধন (আরাধনা)
  সংরোধন (প্রতিরোধ)
- সংশয় (সন্দেহ)
  সংশ্রয় (আশ্রয়)
- সংসদ (প্রতিষ্ঠান, আইনসভা)
  সাংসদ (সংসদের সদস্য)
- সকৃৎ (এক বার)
  স্বকৃত (নিজের করা)
- সখিত্ব (বন্ধুত্ব)
  সখীত্ব (বান্ধবীর ভাব)
- সজন (লোকজন-সহ)
  সর্জন (সৃষ্টি)
  স্বজন (আত্মীয়)
- সঞ্চলন (চলন, আন্দোলন)
  সঞ্চালন (চালানো, পরিচালনা)
- সত্তর (৭০)
  সত্বর (তাড়াতাড়ি)
- সত্তা (অস্তিত্ব)
  সত্ত্ব (সত্তা, অস্তিত্ব)
  সত্য (ঠিক, যথার্থ)
  স্বত্ব (অধিকার)
- সদ্ম (আবাস, গৃহ)
  সদ্য (এখনই, এইমাত্র)
- সন্তরণ (সাঁতার)
  সন্তলন (হালকা করে ভাজা, সাঁতলানো)
- সন্ধিক্ষণ (সংযোগকাল)
  সন্ধুক্ষণ (উদ্দীপন, উত্তেজন)
- সপক্ষ (পক্ষ বা পাখাযুক্ত, পক্ষাবলম্বী)
  স্বপক্ষ (নিজের পক্ষ)
- সপিণ্ড (একবংশীয়)
  সাপিণ্ড (জ্ঞাতিত্ব)
- সবিতৃ (পৃথিবী)
  সবিত্রী (প্রসূতি)
  সাবিত্রী (বেদমন্ত্রের উৎসব, দুর্গা)
- সব্য (বাম)
  সভ্য (শিষ্ট, সদস্য)
- সমন্বয় (সংগতি, সামঞ্জস্য)
  সমুন্নয় (সম্যক উন্নয়ন)
- সমর্থক (সমর্থনকারী)
  সমার্থক (একই অর্থের)
- সমাবৃত (সম্যকভাবে ঢাকা)
  সমাবৃত্ত (প্রত্যাগত)
- সমাসক্তি (সম্যক আসক্তি)
  সমাসোক্তি (অর্থালংকার বিশেষ)
- সমাহিত (কবর দেওয়া)
  সমাহৃত (চয়িত)
- সম্প্রতি (অধুনা, এখন)
  সম্প্রীতি (ভাব, সৌহার্দ্য)
- সম্ভূত (জাত)
  সম্ভূতি (উৎপত্তি)
- সম্মত (রাজি)
  সম্পদ (আহ্লাদ, আমোদ)
- সম্মিলন (সংযোগ, বহু লোকের একত্র হওয়া)
  সম্মীলন (ভালো করে খোলা)
- সরজ (নবনীত, ননি)
  সরোজ (জলে জন্ম যার, পদ্ম)
- সরূপ (রূপ-সহ)
  স্বরূপ (নিজের রূপ, নিজমূর্তি)
- সর্গ (পরিচ্ছেদ, ত্যাগ)
  স্বর্গ (দেবলোক)
  স্বর্গ্য (স্বর্গীয়)
- সর্পি (ঘি)
  সর্পী (সাপিনি)
- সর্বথা (সব জায়গায়)
  সর্বদা (সবসময়)
  সর্বধা (সবরকম উপায়ে)
- সলিল (জল)
  সলীল (লীলাযুক্ত)
- সসাজ (সজ্জা-সহ)
  সসেজ (এক বিশেষ ধরনের রান্না মাংস)
- সহিত (সঙ্গে)
  স্বহিত (নিজের ভালো)
- সাঁচা (সঞ্চয় করে রাখা)
  সাচা (খাঁটি)
- সাঁজা (দুইয়ের দম্বল)
  সাজা (প্রসাধন)
- সাঁঝ (সন্ধ্যা)
  সাজ (প্রসাধন)
- সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)
  স্বাক্ষর (নিজের হাতের লেখা, সই)
- সাজাত্য (এক-জাতীয়তা)
  স্বজাত্য (স্বজাতি বিষয়ক বোধ)
- সাড় (চেতনা)
  সার (শ্রেষ্ঠ অংশ)
- সাড়া (শব্দ, ডাকের উত্তর)
  সারা (শেষ, সব)
- সাতৃৎ (যদুবংশীয় লোক)
  সাতৃত (বলদেব, বিষ্ণু)
- সাদন (দূরীকরণ)
  সাধন (সাধনা)
  স্বাদন (আস্বাদন)
- সাধু (সন্ন্যাসী)
  স্বাদু (স্বাদযুক্ত)
- সাধুতা (সততা, ধার্মিকতা)
  স্বাদুতা (সুস্বাদময়তা)
- সান্দ্র (ঘন তরল)
  সান্ধ্য (সন্ধ্যাকালীন)
- সারক (বিরেচক)
  স্মারক (স্মৃতি জাগরক)
- সার্থ (অর্থ-সহ)
  স্বার্থ (নিজের লাভ)
- সাহা (সহকার জাতি)
  স্বাহা (যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মন্ত্র)
- সিঁথি (চুলের মাঝের রেখা)
  সিতি (সাদা)
- সিকতা (বালি)
  সিক্থ (মোম)
  সিক্তা (জলে-ভেজা রমণী)
- সিতা (শুভ্র, ভালোভাবে পক্ব)
  সিধ্য (কার্য সমাধাকারী)
- সীমন্ত (সিঁথি)
  সীমান্ত (শেষ প্রান্ত)
- সুঁতি (নালা, নর্দমা)
  সুতি (সুতোর তৈরি)
  সুতী (পুত্রবান, জনক)
  সূতি (জন্ম, উৎপত্তি)
  সূতি (সেলাই)
- সুকৃতি (ভালো কাজ)
  সুকৃতী (সুকর্মকারী)
- সুত (পুত্র)
  সুতো (সেলাই করার সুতো)
  সূত (সারথি)
- সুদিন (ভালো দিন, শুভ দিন)
  সুদীন (সম্যকরূপে দীন)
- সুবাসিনী (সুন্দর গন্ধযুক্ত)
  সুভাষিণী (যে-নারীর কথা সুন্দর)
- সুভাষ (ভালো কথা)
  সুভাস (ভালোভাবে আলোকিত)
- সুরতি (রতি, আলিঙ্গন)
  সুর্তি (তামাক-বিশেষ)
- সূরি (পণ্ডিত, কবি)
  সূরী (মুর্গপত্নী, কুন্তী)

- সূর্যলোক (সৌরজগৎ)
  সূর্যালোক (সূর্যকিরণ)

- সৃতি (সরণ)
  স্মৃতি (মনে রাখা)

- সৌরি (জল হেঁচবার পাত্র)
  সৌরভি (দেশি গোরোস)

- সেচ্ছা (ইচ্ছা-সহ, ইচ্ছার)
  স্বেচ্ছা (নিজের ইচ্ছা)

- সেরদা (সেজো দাদা)
  সেরদা (হাঁটু পেড়ে ও মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম)

- সেবমান (যে সেবা করছে)
  সেব্যমান (যার সেবা করা হচ্ছে)

- স্কন্দ (কার্তিক)
  স্কন্ধ (কাঁধ)

- স্টাম্প (ক্রিকেট খেলার স্টাম্প)
  স্ট্যাম্প (ছাপ, ডাকটিকিট)

- স্তব (ধান ইত্যাদি গাছের ডাঁটা)
  স্তম্ভ (থাম, খুঁটি)

- স্তবক (গুচ্ছ)
  স্তাবক (খোশামোদকারী)

- স্তুত (কীর্তিত, প্রশংসিত)
  স্তুত্য (প্রশংসনীয়)

- স্তৈন (চুরি)
  স্ত্রৈণ (স্ত্রীর বাধ্য)

- স্থূলি (হাতের জন্য তৈরি রান্নার)
  স্থূলি (হাতুড়িতে শব্দকারী ব্রতী)

- স্থূবির (সামর্থ্যহীন, বৃদ্ধ)
  স্থবির, স্থাবির্য (বার্ধক্য, স্থবিরত্ব)

- স্পন্দ (কম্পন)
  স্পন্দ্য (কম্পিত)

- স্ফটক (কোলাস)
  স্ফটিক (কোলাস বিষয়ক)

- স্মৃত (আস্মৃত)
  স্মর্ত (পরলোকগত)

- স্মর্দ্ধতি (কুঠার)
  স্মর্দ্ধীতি (বেদপাঠ)

- স্বয়ংবর (নিজের বর বাছাইয়ের প্রথা)
  স্বয়ম্বর (স্বাবলম্বী)

- স্মিত (হাস্যযুক্ত)
  স্মৃত (স্মরণ-করা)

- হরিতাশ্ম (মরকত মণি)
  হরিদশ্ব (সূর্য)

- হর্ম (হাই, জৃম্ভণ)
  হর্ম্য (হলধর, কৃষক)

- হস্ত (হাত)
  হস্ত্য (হস্তনির্মিত)

- হাঁ (মুখ হাঁ)
  হ্যাঁ (সায় দেওয়া)

- হাঁড়ি (রন্ধন পাত্র-বিশেষ)
  হাড়ি (হিন্দু জাতি-বিশেষ)

- হাঁসি (মাটি হাঁস)
  হাসি (হাস্য)

- হাড় (অস্থি)
  হার (পরাজয় বা গলার অলঙ্কার বিশেষ)

- হিংস্য (হিংসার উপযোগী, বনা)
  হিংস্র (প্রাণহারক, হিংসাশীল)

- হিজড়া (একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গযুক্ত)
  হিজরি (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গণিত চান্দ্র অব্দ)

- হিমাদ্রি (হিমালয়)
  হেমাদ্রি (সুমেরু পর্বত)

- হিরোয়িন (নায়িকা)
  হেরোয়িন (মাদক দ্রব্য-বিশেষ)

- হুঁশ (জ্ঞান, চেতনা)
  হুস (উড়ে যাওয়া, ধোঁয়া বার ইত্যাদিবোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

- হুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
  হূত (যাকে ডাকা হয়েছে)

- হৃৎ (হৃদয়, মন)
  হৃত (লুণ্ঠিত)
  হ্রিত (লজ্জিত)

- হ্লাদ (ধ্বনি)
  হ্লাদ (আহ্লাদ)

- হ্লাদিনী (বিদ্যুৎ, বজ্র)
  হ্লাদিনী (আনন্দিতা)

অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধকরণ

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
০১।	তোমার সাথে আমার একটি গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
০২।	আবশ্যকীয় বাবে কার্পণ্যতা অনুচিৎ	আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
০৩।	আমি বড় অপমান হইয়াছি	আমি বড় অপমানিত হইয়াছি।
০৪।	সকল সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন	সুধীমণ্ডলী উপস্থিত আছেন।
০৫।	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্টিত নহে	এ বিষয়ে তাহারা সচেষ্ট নহে।
০৬।	তাহারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে	তারা যেন ভুল করার প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
০৭।	আশাকরি তুমি আরোগ্য হইবায়	আশাকরি তুমি আরোগ্য লাভ করিবায়।
০৮।	ইহা প্রমাণ হইয়াছে	ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
০৯।	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন	তিনি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
১০।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য	অন্যায়ের প্রতিফলন অনিবার্য।
১১।	অন্যাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	অন্যায়ভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
১২।	একের লাঠি দশের বোঝা	দশের লাঠি একের বোঝা।
১৩।	ইহার আবশ্যক নাই	ইহার আবশ্যকতা নাই।
১৪।	হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম	চরিত্রহীন লোক পশুধম।
১৫।	তার অন্তর অজান সমুদ্রে আচ্ছন্ন	তার অন্তর তিমিরাচ্ছন্ন।
১৬।	মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ	মাতৃহীন শিশুর কি দুঃখ!
১৭।	সবিনয় পূর্বক নিবেদন করি	বিনয়পূর্বক নিবেদন করি।
১৮।	সব মাছগুলোর দাম কত	মাছগুলোর দাম কত।
১৯।	বিদ্বান হইতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়	বিদ্বান হতে হলে নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হয়।
২০।	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে	দিবারাত্র পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।
২১।	তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে	তার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
২২।	দুর্বিসহ বনানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।	দুর্বিষহ বানানটি অধিকাংশ ব্যক্তি ভুল লেখে।
২৩।	বিদ্যান লোকেরা মনে করেন আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যায়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যাথা আকাঙ্খা মুহূর্ত প্রতিযোগীতা দরিদ্র্যতা ইত্যাদি বানান ভুল করে।	বিদ্বান লোকেরা মনে করেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন ছেড়েছে বলেই তারা ব্যথা, আকাঙ্ক্ষা, মুহূর্ত, প্রতিযোগিতা, দরিদ্রতা ইত্যাদি বানান ভুল করে।
২৪।	ছেলেটি নিস্পাপী নিরপরাধী কিন্তু সেই সেষ বংশের মাথায় চূণকালী দিল।	ছেলেটি নিষ্পাপ, নিরপরাধ কিন্তু সেই শেষ পর্যন্ত বংশের মুখে চুনকালি দিল।
২৫।	আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন ভাল নয়	আকণ্ঠ ভোজন ভাল নয়।
২৬।	আমি সন্তোষ হইলাম	আমি সন্তুষ্ট হইলাম।
২৭।	আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই	আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
২৮।	এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটবে তাহা কদাপিও চিন্তা করিনি	এমন লজ্জাকর ব্যাপার যে ঘটবে তা কখনও চিন্তা করি নি।
২৯।	ক্ষমা একটি মহানগুণ	ক্ষমা একটি মহৎ গুণ।

৩০। ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী	৩০। ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।	৩০। ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৩১। দেনতা সব সময় ভাল না	৩১। দীনতা সব সময় ভাল না।	৩১। দীনতা সব সময় ভাল না।
৩২। তিনি সস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন	৩২। তিনি সস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।	৩২। তিনি সস্ত্রীক বাজারে গিয়েছেন।
৩৩। সে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে	৩৩। সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে।	৩৩। সে ক্রোধান্ধ হইয়াছে।
৩৪। সশঙ্কিত চিত্তে সে বলল	৩৪। শঙ্কিত চিত্তে সে বলল।	৩৪। শঙ্কিত চিত্তে সে বলল।
৩৫। বাংলা দেশ একটি উন্নতশীল দেশ	৩৫। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।	৩৫। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
৩৬। উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন	৩৬। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	৩৬। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
৩৭। তুমি, করিম ও আমি আজ পড়িতে যাইব	৩৭। করিম, তুমি ও আমি আজ পড়িতে যাইব।	৩৭। করিম, তুমি ও আমি আজ পড়িতে যাইব।
৩৮। আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না।	৩৮। আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না।	৩৮। আইনত তিনি একাজ করতে পারেন না।
৩৯। এটা অপক্ক হাতের লেখা	৩৯। এটা কাঁচা হাতের লেখা।	৩৯। এটা কাঁচা হাতের লেখা।
৪০। বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে	৪০। বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	৪০। বৃক্ষটি মূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।
৪১। মেয়েটি সুকেশিনী ও সুহাসি	৪১। মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী।	৪১। মেয়েটি সুকেশী ও সুহাসিনী।
৪২। আমার এ কাজে মনোযোগীতা নাই	৪২। আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।	৪২। আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
৪৩। আমরা বাংলা দেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপিও না ভুলি	৪৩। আমরা বাংলাদেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপি না ভুলি।	৪৩। আমরা বাংলাদেশের সুসন্তান এই কথা যেন কদাপি না ভুলি।
৪৪। সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন	৪৪। সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	৪৪। সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।
৪৫। প্রায়ই অর্থ কথাগুলো বড় হয়ে থাকে অস্পষ্ট	৪৫। বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে।	৪৫। বড় কথাগুলোর অর্থ প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে।
৪৬। রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য	৪৬। রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।	৪৬। রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
৪৭। সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করিবে	৪৭। সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।	৪৭। সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করিবে।
৪৮। জোৎস্না রাত বড়ই মাধুর্যময়া	৪৮। জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর।	৪৮। জ্যোৎস্না রাত বড়ই মধুর।
৪৯। তুমি নির্দোষী নও	৪৯। তুমি নির্দোষ নও।	৪৯। তুমি নির্দোষ নও।
৫০। বিপন্মাতুকে সাহায্য কর	৫০। বিপন্মাতৃকে সাহায্য কর।	৫০। বিপন্মাতৃকে সাহায্য কর।
৫১। তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল	৫১। তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।	৫১। তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
৫২। এ রূপ জীবন কল্পনা করিতেও আমাদের আতঙ্কিত হয়েছিল।	৫২। এরূপ জীবন কল্পনা করিতেও আমাদের আতঙ্ক হয়েছিল।	৫২। এরূপ জীবন কল্পনা করিতেও আমাদের আতঙ্ক হয়েছিল।
৫৩। শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই	৫৩। অসুস্থতার জন্য আমি কল্য আসিতে পারি নাই।	৫৩। অসুস্থতার জন্য আমি কল্য আসিতে পারি নাই।
৫৪। তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন	৫৪। তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।	৫৪। তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
৫৫। দরিদ্রকে দয়া কর	৫৫। দরিদ্রকে দয়া কর।	৫৫। দরিদ্রকে দয়া কর।
৫৬। আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই	৫৬। আমার আর বাঁচার সাধ নেই।	৫৬। আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
৫৭। মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রসা কর।	৫৭। মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।	৫৭। মুমূর্ষু রোগীকে শুশ্রূষা কর।
৫৮। ইহা একটি কিম্বদন্তী	৫৮। ইহা একটি কিংবদন্তি।	৫৮। ইহা একটি কিংবদন্তি।
৫৯। লালসু খুব পুষ্টিকর	৫৯। লাল আলু খুব পুষ্টিকর।	৫৯। লাল আলু খুব পুষ্টিকর।
৬০। অশ্রুর জলে বুকে ভেসে গেল	৬০। চোখের জলে বুক ভেসে গেল।	৬০। চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
৬১। সে শৈশবেই মাতা বাপ হারিয়েছে	৬১। সে শৈশবেই মা-বাপ হারিয়েছে।	৬১। সে শৈশবেই মা-বাপ হারিয়েছে।
৬২। তার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখী হয়	৬২। তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।	৬২। তার দুরবস্থা দেখলে দুঃখ হয়।
৬৩। শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না	৬৩। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।	৬৩। শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
৬৪। এই কাজে সার্থকতা লাভ করিতে চাইলে আরো মনযোগ করিতে হইবে	৬৪। এই কাজে সার্থকতা লাভ করতে চাইলে আরো মনোযোগ দিতে হবে।	৬৪। এই কাজে সার্থকতা লাভ করতে চাইলে আরো মনোযোগ দিতে হবে।
৬৫। আমি এখন ভীষণ ব্যাস্ত	৬৫। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।	৬৫। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।
৬৬। হাতে ব্যাথা পেয়েছি	৬৬। হাতে ব্যথা পেয়েছি।	৬৬। হাতে ব্যথা পেয়েছি।
৬৭। শশান ঘাট কোথায়	৬৭। শ্মশান ঘাট কোথায়?	৬৭। শ্মশান ঘাট কোথায়?
৬৮। এর একটা ব্যাবস্থা কর	৬৮। এর একটা ব্যবস্থা কর।	৬৮। এর একটা ব্যবস্থা কর।
৬৯। সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করিতে পারিল না	৬৯। সে কৌতুক করার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না।	৬৯। সে কৌতুক করার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না।
৭০। তার সব ছেলেরাই কৃতি	৭০। তার সব ছেলেই কৃতি।	৭০। তার সব ছেলেই কৃতি।
৭১। বাজী করের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্লিত হল।	৭১। যাদুকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা আনন্দিত হল।	৭১। যাদুকরের অদ্ভুত খেলা দেখে ছাত্ররা আনন্দিত হল।
৭২। এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না	৭২। এক মাঘে শীত যায় না।	৭২। এক মাঘে শীত যায় না।
৭৩। হে ত্রি নয়নী আমাকে রক্ষা কর	৭৩। হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।	৭৩। হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা কর।
৭৪। ইতিপূর্বে তার সাথে হয় নাই।	৭৪। ইতঃপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয় নি।	৭৪। ইতঃপূর্বে তার সঙ্গে দেখা হয় নি।
৭৫। কায়কবাদ মহাশয়ান যেখেন।	৭৫। কায়কোবাদ 'মহাপুণ্যবান' ছেখেন।	৭৫। কায়কোবাদ 'মহাপুণ্যবান' ছেখেন।
৭৬। শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।	৭৬। শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) হইতে পারে।	৭৬। শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) হইতে পারে।
৭৭। উহার উল্লতপূর্ণ আচারণে বাধিত হইয়াছি।	৭৭। তাহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে বাধিত হইয়াছি।	৭৭। তাহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে বাধিত হইয়াছি।
৭৮। তাহার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়।	৭৮। তাহার অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়।	৭৮। তাহার অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়।
৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল আধুনিক রাষ্ট্র।	৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল (বা উন্নয়নশীল) আধুনিক রাষ্ট্র।	৭৯। বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল (বা উন্নয়নশীল) আধুনিক রাষ্ট্র।
৮০। আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।	৮০। আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি (বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)।	৮০। আমি এই ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়াছি (বা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)।
৮১। তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।	৮১। তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।	৮১। তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
৮২। শশীভূষণ কি আসে নাই?	৮২। শশিভূষণ কি আসে নাই?	৮২। শশিভূষণ কি আসে নাই?
৮৩। শওকত ওসমানের কৃতদাসের হাসি একটি আদমজি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস।	৮৩। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আদমজি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।	৮৩। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আদমজি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস।
৮৪। স্নেহভাজন পুরুষলোককে পত্রের আদিতে কল্যানীয়াসু বলিয়া সম্বোধন করিবে।	৮৪। স্নেহভাজন পুরুষলোককে লিখিত পত্রের আদিতে 'কল্যাণীয়েষু' বলিয়া সম্বোধন করিবে।	৮৪। স্নেহভাজন পুরুষলোককে লিখিত পত্রের আদিতে 'কল্যাণীয়েষু' বলিয়া সম্বোধন করিবে।
৮৫। কুপুরুষের মত কথা বল কেন?	৮৫। কাপুরুষের মতো কথা বল কেন?	৮৫। কাপুরুষের মতো কথা বল কেন?
৮৬। এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাংগীন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।	৮৬। এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কথা বলা করেছেন।	৮৬। এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কথা বলা করেছেন।
৮৭। কালীদাস বিখ্যাত কবি।	৮৭। কালিদাস বিখ্যাত কবি।	৮৭। কালিদাস বিখ্যাত কবি।
৮৮। উহার আবশ্যক নাই।	৮৮। ইহার আবশ্যকতা নাই।	৮৮। ইহার আবশ্যকতা নাই।
৮৯। হস্তীটি অপরিসীম স্থূল।	৮৯। হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল।	৮৯। হস্তীটি অত্যন্ত স্থূল।
৯০। তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	৯০। তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।	৯০। তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
৯১। বংকিমচন্দ্রের ভয়ানক প্রতিভা ছিল।	৯১। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।	৯১। বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
৯২। তারকাবৃন্দ আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।	৯২। তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।	৯২। তারকারাজি আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে।
৯৩। অধ্যাপনাই ছাত্রদের তাপস্যা।	৯৩। অধ্যয়নই ছাত্রদের তাপস্যা।	৯৩। অধ্যয়নই ছাত্রদের তাপস্যা।
৯৪। প্রাতকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।	৯৪। প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।	৯৪। প্রাতঃকালে লোকটি গাত্রোত্থান করে।
৯৫। ছোট নাটকটি সবাইকে মুগ্ধ করল।	৯৫। নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল।	৯৫। নাটিকাটি সবাইকে মুগ্ধ করল।
৯৬। তাহার বৈমাত্রেয় সহোদর অসুস্থ।	৯৬। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।	৯৬। তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অসুস্থ।
৯৭। সে এমন রূপসী যেন অপ্সরী।	৯৭। সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।	৯৭। সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
৯৮। দারিদ্র্যতার মধ্যেই মহত্ব আছে।	৯৮। দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ব আছে।	৯৮। দারিদ্র্যের মধ্যেই মহত্ব আছে।
৯৯। মেয়েটি স্বয়ম্বর।	৯৯। মেয়েটি স্বয়ম্বরা।	৯৯। মেয়েটি স্বয়ম্বরা।

১০০। আবাল্য হতে তিনি কাব্য প্রিয়।
১০১। মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই।
১০২। এখানে খাটি গরুর দুধ পাওয়া যায়।
১০৩। কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ণ রচনা করেছিলেন।
১০৪। প্রেমগঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?
১০৫। সারা জীবন ভূতের মজুরী খেটে মরলাম।
১০৬। বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল।
১০৭। উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
১০৮। পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।
১০৯। যার লাঠি, তার মাটি।
১১০। শুধু ভাতে নুন জোটে না, ঠাণ্ডা ভাতে ঘি।
১১১। ভাত ছড়ালে শালিখের অভাব হয় না।
১১২। শুধুমাত্র গায়ের জোরে সব হয় না।
১১৩। তার দুচোখ অশ্রুজলে ভেসে গেল।
১১৪। এ মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
১১৫। এ প্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।
১১৬। আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর।
১১৭। যাদুঘরে কিন্তু যাদু দেখানো হয় না।
১১৮। বাংলো বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।
১১৯। যাবতীয় লোক সমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।
১২০। এমন অবহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।
১২১। বমালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।
১২২। মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপ ভুগছে।
১২৩। পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
১২৪। রাত্রিতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি গেলাম শয়ন করতে ভাল নিদ্রা না হলেপাছে অসুখ-বিসুখ হতে পারে এই ভয়ে।
২৫। নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মরাদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া আঁধার করে তুলিছিল যে আমাদের নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল।

১০০। বালা হতেই তিনি কাব্য প্রিয়।
১০১। মনোরঞ্জন মনোমোহনের বড় ভাই।
১০২। এখানে গরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
১০৩। কৃত্তিবাস বাংলা 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন।
১০৪। প্রেমযমুনা আজ এমন উদ্বেল হইল কেন?
১০৫। সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম।
১০৬। বুনো ওল, বাঘা তেঁতুল।
১০৭। উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
১০৮। পরের কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার।
১০৯। যার লাঠি, তার মাটি।
১১০। শুধু ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।
১১১। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।
১১২। শুধু গায়ের জোরে সব হয় না।
১১৩। তার দুচোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
১১৪। এই মহিয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
১১৫। এ পরিপ্রেক্ষিতে (প্রেক্ষাপটে) আমরা ঘটনাটি ঘটিয়েছি।
১১৬। আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর।
১১৭। জাদুঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না।
১১৮। বাংলা বানান আয়ত্ত করা কঠিন নয়।
১১৯। যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
১২০। এমন অসহ্য ব্যথা কখনো অনুভব করি নি।
১২১। বমাল বা মালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে।
১২২। মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
১২৩। পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
১২৪। পাছে রাতে ভাল ঘুম না হলে অসুখ-বিসুখ হতে পারে এই ভয়ে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলাম।
১২৫। নদীর তীরে যাইয়া আমরা শবদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতার ধূমে সমস্ত স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল যে আমাদের নিঃশ্বাস রোধ হইয়া যাইতেছিল।

সংক্ষেপে বাক্যশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তোমার পত্র পাইয়া পরম সন্তোষ হইলাম >	সন্তুষ্ট হইলাম
এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত আশ্চর্য হইল >	আশ্চর্যান্বিত হইল
এই কথা শুনিয়া সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন >	মৌনী হইলেন/ মৌনাবলম্বন করিলেন
এখন আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যক নাই >	আবশ্যকতা নাই
তদ্দৃষ্টে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল >	তদ্দর্শনে
তাহার একটুও সাবকাশ নাই >	অবকাশ নাই
তিনি আরোগ্য হইয়াছেন >	আরোগ্যলাভ করিয়াছেন
সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছে >	সাক্ষ্য দিয়াছে
দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন >	অন্তর্হিত
এ কথা প্রমাণ হইয়াছে >	প্রমাণিত বা সপ্রমাণ
অপমান হইবার ভয় নাই >	অপমানিত
নদীর জলহ্রাস হইয়াছে >	পাইয়াছে (কিন্তু বহু-প্রচলিত হইয়াছে)
গৌরব লোপ হইয়াছে >	পাইয়াছে
সঙ্কট অবস্থায় পড়িলাম >	সঙ্কটাপন্ন, সঙ্কটজনক
যুদ্ধ শেষ হইল >	সমাপ্ত
একথা আমার মনে উদয় হইল >	উদিত হইল
গোপন কথাটা শুন >	গোপনীয়
ইহা আমার পক্ষে সম্ভব নহে >	সম্ভবপর
বিশেষ প্রয়োজনে আসিল >	সবিশেষ
অতিশয় দুঃখ হইল >	সাতিশয়
তাহার বিস্তর দেনা >	অনেক
তাহারা একত্রে গমন করিল >	একত্র গমন করিল
অত্রস্থানের সকলেই ভাল আছেন >	এই স্থানের
বুদ্ধিমতী রমণীগণ >	বুদ্ধিমতী রমণীরা
সেখানে সকল বালকেরাই উপস্থিত হইয়াছিল >	সকল বালকই বা বালকেরা
এই বৃক্ষে নানাবিধ পক্ষীগণ বাস করে >	নানাবিধ পক্ষী বাস করে
এই শ্রেণিতে ২৫টি বালক আছে, তাহার মধ্যে	
এই বালকটি সকলের চাইতে ভাল >	তাহাদের মধ্যে
বালকটি আমার পানে চাহিয়া রহিল >	আমার দিকে
বালক যুবার সঙ্গে সমানে যুঝিতে পারে না >	যুদ্ধ করিতে
তাহার এইরূপ দুর্দশা হেরিয়া	
সকলেই মর্মাহত হইল >	দেখিয়া, দর্শন করিয়া
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলিল >	বিস্তার করিয়া
সে আমাকে সম্বোধন করি এই কথা কৈল >	সম্বোধন করিয়া এই কথা কহিল
যাহার ভকতি নাই তাহার ধরম করম কিছু হয় না >	ভক্তি, ধর্মকর্ম।

বানানের নিয়ম

প্র : বানান কাকে বলে?

উ : ব্যঞ্জন বর্ণে স্বরবর্ণ যোগ করাকে বানান বলে। দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র মিলিত হলে তাদের সংযুক্তবর্ণ বলে। এভাবে বানান নিষ্পন্ন হয়।

প্র : বাংলা বানানের নিয়ম প্রণীত হয় কিভাবে?

উ : উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যরচনা আরম্ভ হলে বাংলা বানানে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বানান-রীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ প্রস্তাব সমর্থন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' গঠন করে এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে প্রথম বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে। যুগের প্রয়োজনে পরে এই নিয়ম নানা সময় সংশোধিত হয়েছে। অবশ্য, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথ অনুমোদিত একটি বানান-রীতি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করে (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৬)।

প্র : কয়েকটি বানান-সূত্র লেখ।

উ : বানানের সূত্র পৃথকভাব মনে রাখা যায়। তবে বর্তমানগ্রন্থের লেখক কতিপয় সূত্রকে সমিল পদ্যবদ্ধ করেছেন। নিচের পদ্যটি মনে রাখলে বহু বানান শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভবপর :

বানান-সূত্র

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় 'ই'
অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি,
উভয় ক্ষেত্রে ই-কার নিশ্চিত জানি
সংস্কৃতের স্ত্রী ঈ-কার মানি।
বিদেশি শব্দে 'ষ' হবে না কখনো
তৎসম ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় জেনো,
রেফ থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না-হয়
অন্তে বিসর্গ বর্জন জানিবে নিশ্চয়।
জগৎ-বাচক-বিদ্যা-ত্ব-তা-নী-ণী হলে
শব্দান্তের 'ঈ' ই-কার হয় সৌমিত্র বলে।

প্র : বানান-সূত্রটি ব্যাখ্যা কর এবং উদাহরণ দাও।

উ : ১. যে-কোনো দেশ, ভাষা ও জাতির নাম লিখতে ই/ঈ-কার দেয়ার প্রশ্ন এলে তাতে নিশ্চিন্তে ই-কার (ি) দেয়া যাবে। যেমন :
দেশ : গ্রিস, জার্মানি, চিন, ইতালি, হাঙ্গেরি ইত্যাদি। (ব্যতিক্রম : শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ)
ভাষা : হিন্দি, সাঁওতালি, আরবি, পারসি ইত্যাদি।
জাতি : বাঙালি, পর্তুগিজ, তুর্কি ইত্যাদি।

২. অপ্রাণিবাচক শব্দ ও ইতরপ্রাণিবাচক অতৎসম শব্দের শেষে ই/ঈ-কারের মধ্যে ই-কার হবে। যেমন :
অপ্রাণিবাচক শব্দ : বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, চাবি ইত্যাদি।
ইতরপ্রাণিবাচক শব্দ : পাখি, হাতি, চড়ুই, মুরগি ইত্যাদি।

৩. সংস্কৃত বা তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার হবে। যেমন : জননী, স্ত্রী, নারী, সাধ্বী ইত্যাদি।

৪. বিদেশি শব্দের বানান বাংলায় লেখার সময় কখনো 'ষ' লেখা যাবে না। যেমন : ষ্টেশন হবে না, হবে স্টেশন। ষ্টুডিও হবে না, হবে স্টুডিও। ফটোষ্ট্যাট হবে না, হবে ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।

৫. তৎসম বা সংস্কৃত কতিপয় শব্দ ছাড়া অন্য সব শব্দের বানানে 'ণ' হবে না, হবে 'ন'। যেমন : কর্ণার হবে না, হবে কর্নার। কর্ণেল হবে না, হবে কর্নেল। বামুণ হবে না, হবে বামুন ইত্যাদি।

৬. বানানে যে বর্ণের উপর রেফ থাকবে, সেই বর্ণে দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কার্য্যালয় হবে না, হবে কার্যালয়, নির্দ্দিষ্ট হবে না, হবে নির্দিষ্ট, ধর্ম্মসভা হবে না, হবে ধর্মসভা, পর্ব্বত হবে না, হবে পর্বত ইত্যাদি।

৭. বিস্ময়সূচক অব্যয় (যেমন : বাঃ / ছিঃ / উঃ ইত্যাদি) ছাড়া বাংলা কোনো শব্দের শেষে বিসর্গ রাখা যাবে না। যেমন : প্রায়শঃ / বিশেষতঃ / কার্যতঃ / প্রথমতঃ ইত্যাদি লেখা যাবে না, লিখতে হবে প্রায়শ / বিশেষত / কার্যত / প্রথমত ইত্যাদি।

৮. কোনো শব্দের শেষে যদি ঈ-কার থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে পরিণত হয়। যেমন :
প্রাণী+বিদ্যা = প্রাণিবিদ্যা
প্রাণী+জগৎ = প্রাণিজগৎ
প্রাণী+বাচক = প্রাণিবাচক
মন্ত্রী+সভা = মন্ত্রিসভা
মন্ত্রী+পরিষদ = মন্ত্রিপরিষদ
কৃতী+ত্ব = কৃতিত্ব
স্থায়ী+ত্ব = স্থায়িত্ব
দায়ী+ত্ব = দায়িত্ব
প্রতিদ্বন্দ্বী+তা = প্রতিদ্বন্দ্বিতা
সহমর্মী+তা = সহমর্মিতা
বাগ্মী+তা = বাগ্মিতা
সঙ্গী+নী = সঙ্গিনী
তপস্বী+নী = তপস্বিনী
অধিকারী+ণী = অধিকারিণী
[illegible]
আদরী + ণী = আদরিণী ইত্যাদি।

৯. শব্দে উর্ধ্বকমা লেখা যাবে না। যেমন : আগে লেখা হতো (হ'ল) এখন (হল); আগে (দু'টি) এখন (দুটি); আগে (তা'র) এখন (তার) ইত্যাদি।

১০. বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে একই নীতিমালায় বাংলা বানান লেখা কর্তব্য। 'ধর্মীয় কারণ', 'বিশেষ বিবেচনা', 'বহুল প্রচলিত' ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে বিদেশি শব্দের বানান-নীতিমালা জটিল না-করা। যেমন :
আযান > আজান,
রোযা > রোজা,
নবী > নবি,
খুশী > খুশি,
ঈদ > ইদ,
শহীদ > শহিদ,
স্পীকার > স্পিকার ইত্যাদি লেখা উচিত।

প্র : স্ক / ষ্ক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান লেখ।

উ : এই সমস্যা ব্যাকরণ সংক্রান্ত। সূত্র মনে রাখলে কিছু বানানে এর সমাধান সম্ভব। যেমন : বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে বর্ণে সাধারণত 'স' যুক্ত হয় (পুরঃ + কার = পুরস্কার) এবং বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনির সঙ্গে সন্ধি হলে সাধারণত 'ষ' যুক্ত হয় (বহিঃ + কার = বহিষ্কার)। তবে স্ক / ষ্ক সংক্রান্ত সমস্যার সহজ সমাধানকল্পে বলা যায় : অ-যুক্ত বা মুক্ত বর্ণের পরে সাধারণত 'স' হবে। যেমন : নমস্কার, পুরস্কার, বনস্পতি, তিরস্কার, বাচস্পতি ইত্যাদি। অন্যদিকে ই-যুক্ত বর্ণের পর সাধারণত 'ষ' হবে। যেমন : আবিষ্কার, নিষ্কলঙ্ক, পরিষ্কার, নিষ্ফল, নিষ্প্রভ, নিষ্পাপ, নিষ্পন্ন, নিষ্কর, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি। (স্প / স্ত / ষ্ণ থাকলে 'ষ' হয় না। যেমন : নিস্পন্দ / নিস্তব্ধ / দুষ্ট [illegible]

প্র : বাংলা একাডেমি প্রণীত (১৯৯২) প্রমিত বাংলা বানানের কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ কর।

উ : ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের বেশ কয়েকটি নিয়ম প্রণয়ন করেছে। নিচে এর কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো:

ক) তৎসম শব্দগুলো সংস্কৃতের যথাযথ বানানে লিখতে হবে। তবে, যে-সব বানানে মূল সংস্কৃত ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কার উভয়ই শুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে, সে বানানগুলোতে শুধু ই-কার এবং উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : সংস্কৃতে পদবী ও পদবি দুটোই শুদ্ধ বানান। এক্ষেত্রে বাংলায় 'পদবি' গৃহীত হবে। সংস্কৃতে ঊষা ও উষা দুটোই শুদ্ধ বানান। এক্ষেত্রে 'উষা' গৃহীত হবে। এ-রকম আরো উদাহরণ: কিংবদন্তি, শ্রেণি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, ভঙ্গি, মঞ্জুরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচি, উর্ণা ইত্যাদি।

খ) ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন : আকাঙ্ক্ষা।

গ) অতৎসম অর্থাৎ নিজস্ব (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ইত্যাদি) ও বিদেশি শব্দে সর্বদা ঈ-কার এবং ঊ-কার বর্জিত হবে। যেমন : তরকারি, মুলা, দিঘি, সরকারি, শাড়ি, পশমি, ইমান, কুরান, নিচু, ভুখা ইত্যাদি।

ঘ) -আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : সোনালী হবে না, হবে সোনালি, মিতালী হবে না, হবে মিতালি। অনুরূপভাবে, বর্ণালি, খেয়ালি, রূপালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

ঙ) তৎসম শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধানের শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। অতৎসম শব্দে 'ণ' হবে না, তার বদলে হবে 'ন'। যেমন : অঘ্রান, কান, গুনতি, ঝরনা, ইরান, কুরান, ধরন, সোনা ইত্যাদি।

চ) তৎসম শব্দের বানানে ষ-ত্ব বিধানের শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে ষ-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ তা নয়। যেমন : সাল, শহর, হিসাব, শখ, শৌখিন, পোশাক। কিন্তু বোষ্টমি, খ্রিষ্টান ইত্যাদি।

ছ) ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে S-এর জন্য 'স' এবং Sh, -sion, -ssion, -tion ইত্যাদির জন্য সাধারণত 'শ' ব্যবহার হবে। যেমন: স্টেশন, কমিশন, শার্ট, ফটোস্ট্যাট ইত্যাদি।

প্র : 'কী' এবং 'কি' কখন, বসবে?

উ : ১. সর্বনাম ২. বিশেষণ ৩. ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে বসলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন: কী বলছো তুমি? কী করছো? কী পড়ছো? কী খেলে? কী আর বলবো? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কীভাবে যাবো? কী বুদ্ধি তোমার! কী আনন্দ! কী দুরাশা! পদ কত প্রকার ও কী কী? কী ছায়া কী মায়া গো!

কিন্তু অব্যয় পদ হিসেবে যদি ব্যবহার হয় তাহলে 'কি' লিখতে হবে। যেমন : তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হতে চাও? তুমি কি বিসিএস পরীক্ষা দিতে চাও? সে কি ঢাকায় এসেছিলো? বাংলা কি শ্রুতিমধুর ভাষা?

কি / কী-এর ব্যবহার : উদাহরণ–

সর্বনাম হিসেবে : 'কী'

ক. তুমি কী খাবে? (What will you eat?) : খাদ্য-নামের পরিবর্তে প্রশ্নসূচক 'কী' একটি সর্বনাম।

খ. আপনার নাম কী? : ব্যক্তি-নামের পরিবর্তে প্রশ্নসূচক 'কী' একটি সর্বনাম।

গ. তুমি কীভাবে যাবে? : প্রশ্নসূচক 'কীভাবে' (কেমন করে) পদটি সর্বনাম।

বিশেষণ হিসেবে : 'কী'

ক. কী শোভা কী মায়া গো– : অপূর্ব শোভা ও পরিপূর্ণ মায়া অর্থে।

খ. বাবা মেয়েকে কী আদর করেন! : খুব আদর অর্থে।

অব্যয় হিসেবে : 'কি'

ক. তুমি কি খাবে? (Will you eat?) : খেতে ইচ্ছুক অথবা অনিচ্ছুক তা জানতে।

খ. তুমি যাবে কি?

গ. জান কি? (কিন্তু 'কী জান'?)

সংশয়সূচক প্রশ্নে অব্যয় হিসেবে 'কি'–

খ. কি জানি!

ঙ. তাতে আমার সন্দেহ কি!

চ. কি ধনী কি নির্ধন!

টীকা : সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ, অব্যয় এভাবে চিহ্নিত করে অনেকের পক্ষেই কী এবং কি শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভব হয় না। যারা কী এবং কি ঠিকভাবে লিখতে পারেন না তাদের জন্য একটি ছোট্ট পরামর্শ দিই : খেয়াল রাখবেন– 'কি / কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে যদি মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে সন্তুষ্ট করা যায় তাহলে 'কি' লিখতে হবে। যদি মুখ খুলে উত্তর দিতে হয় তাহলে 'কী' লিখতে হবে। যেমন : 'আপনার নাম কি / কী'? এখানে 'কী' হবে। কারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনাকে মুখ খুলতেই হবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় 'আপনি বাড়ি যাবেন কি / কী'? এখানে 'কি' হবে। কারণ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বা না প্রকাশ করে আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেন।

প্র : 'বাংলা' এবং 'বাঙলা' কোন বানান গ্রহণযোগ্য?

উ : শব্দটির বিবর্তনের ধারা পণ্ডিতজনের মতো মান্য করলে বাঙ্গালা > বাঙলা হয়েছে সে কথাই মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন বানানে 'বাঙ্গালা' থাকলেও পরবর্তীকালে এই বানানে 'ঙ' অক্ষুণ্ণ থাকে নি। পুরোনো পাণ্ডুলিপিগুলো তার প্রমাণ। বাংলা ভাষার প্রধান লেখকগণ, যেমন : বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, জীবনানন্দ, শামসুর রাহমান প্রমুখের লেখাতেও 'বাঙলা' বানান নেই, সবাই 'বাংলা' বানান ব্যবহার করেছেন। অতএব বলা যায়, বাঙ্গালা বানানটি বিবর্তনের সময় পণ্ডিতদের মত অনুসারে আঙ্কিক নিয়ম না মেনে অনুস্বর (ং) গ্রহণ করেছে। স্বাধীন 'বাংলাদেশ' বানানেও 'ং' গৃহীত। সংবিধানেও 'ং' দিয়ে 'বাংলা' লেখা। অতএব 'বাংলা' বানানই মান্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশের বাইরেও 'বাংলা' বানান গৃহীত। বাংলাদেশে এখনো অনেকে শব্দটির পণ্ডিতী বিবর্তন মান্য করে 'বাঙলা' বানান লেখেন। সেই ধারা এখন ক্ষীণতর থেকে ক্ষীণতম।

ভাষাবিজ্ঞান

পরিচয়

প্র : ভাষাবিজ্ঞান কী?

উ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার বিকাশ খুবই আধুনিককালের বিষয়। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষের মনে ভাষাজিজ্ঞাসা বহু প্রাচীন কালেই শুরু হয়েছিল। এমন কি, প্রাচীন ভারতে পাণিনি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রমুখ মনীষী তাঁদের ভাষাবিষয়ক আলোচনায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময়ে 'ভাষাবিজ্ঞান', 'ভাষাতত্ত্ব' প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয়নি। তখনকার ভাষাবিষয়ক আলোচনার নীতি-পদ্ধতিও ছিল এখনকার থেকে কিছু আলাদা। ভারতবর্ষে সে সময়ে ভাষাবিষয়ক আলোচনাকে বলা হতো 'ব্যাকরণ'। কেউ কেউ তাকে 'শব্দবিদ্যা'ও বলেছেন। আর পাশ্চাত্যে ভাষা আলোচনার ওই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হতো 'Grammar'। আজও আমরা 'Grammar'-কে ব্যাকরণের প্রতিশব্দ রূপেই জানি। তাই বলা চলে, Grammar বা ব্যাকরণের বিস্তৃতি, বিজ্ঞানসম্মত ভাষাবিশ্লেষণ প্রণালীই হলো ভাষাবিজ্ঞান।

প্র : ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোচনায় পার্থক্য কী?

উ : ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা একান্তভাবেই একটা নির্দিষ্ট কালে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ব্যাকরণের আলোচনায় সেই কালসীমা কিছুটা প্রসারিত হয়। ভাষার প্রাচীন ইতিহাসও এখানে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন-বসিতে, বসিব, বসিয়া শব্দগুলিকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বিশ্লিষ্ট করা হবে সম্পূর্ণভাবে তার ব্যবহারিক গঠনরীতির দিক থেকে, যেমন- বসিতে = বসি + তে, বসিব = বসি + ব, বসিয়া = বসি + য়া।

কিন্তু ব্যাকরণে মূল ধাতুটি খুঁজে বের করে তার প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে- বসিতে = বস্ + ইতে, বসিব = বস্ + ইব, বসিয়া = বস + ইয়া।

এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের মাত্র দুটো শাখাই কল্পনা করা হয়। যেমন- ১. ধ্বনিতত্ত্ব; ২. রূপতত্ত্ব (পদপ্রকরণ)।

ভারতে উৎপত্তি : প্রাচীন ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহামনীষী পাণিনির হাত ধরে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম হয়। পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ গ্রন্থেই ধরা পড়েছে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতিপদ্ধতি। পাণিনির পরবর্তীকালে কাত্যায়ণ, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, বামন, কৈয়্যট প্রমুখ বর্ণনামূলক ভাষাচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উৎপত্তি : ভাষাবিজ্ঞানী ওটো ব্যোয়েটলিঙ্ক পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণের একটি সংস্করণ প্রকাশ করতেই সারা পৃথিবীতে বর্ণনামূলক ভাষাচর্চা শুরু হয়ে যায়। পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য স্যোসুর পাণিনির ব্যাকরণ এবং হুইটনির 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' পড়েই ভাষাবিজ্ঞানে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'Course in General Linguistics' (1915)। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে একই সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রসার ঘটে। এই ধারার কয়েকজন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও তাঁদের গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো-

* ফ্রানৎস বোয়েস- 'Handbook of American Indian Language' (1911)
* এডওয়ার্ড স্যাপির- 'Language' (1915)
* লুই ইয়েল্‌স্লেভ- 'Principles of General Grammar' (1928)
* লিওনার্দ ব্লুমফিল্ড- 'Language' (1933)
* হেনরি এ. গ্লিসন- 'An Introduction to Linguistics Structures'
* চার্লস এফ হকেট- 'A Curse in Modern Linguistics'

বাংলা ভাষায় চর্চার সূত্রপাত : বাংলা ভাষায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুটি হলো-

১. 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' (1921).

২. 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৯৩৯)।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও বিকাশ সম্পর্কে লেখ।

উ : মানুষের উচ্চারিত ভাষা নিয়ে ভাষাবিষয়ক পণ্ডিতদের চিন্তাভাবনা ও গবেষণাই হলো ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)। অর্থাৎ, ভাষাবিজ্ঞান হলো মানুষের ভাষার বিজ্ঞানসম্মত চর্চা (The scientific study or language)।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা সমগ্র জগৎকে অখণ্ডরূপে গ্রহণ না করে তার এক-একটা দিক বা অংশকে বিজ্ঞানের এক-এক শাখায় বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কিংবা রসায়ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় একে অপরের থেকে আলাদা। একই রকমভাবে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ও আলাদা। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো ভাষা। ভাষার গঠনপ্রক্রিয়া ও অগ্রগামিতার সূত্র সন্ধান ভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

বিকাশ : যুগ যুগ ধরে ভাষার আলোচনা হয়ে এলেও একটা স্বাধীন বিদ্যা হিসেবে ভাষার চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে, তবে তখন তাকে বলা হতো ভাষাতত্ত্ব (Philology)। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রটি হলো ভাষাবিশেষের আলোচনা, কোনো এক বা একাধিক ভাষার পুঁথি বা গ্রন্থপাঠ, তার ভাষার বিশ্লেষণ ও টীকা রচনা এবং তা থেকে তার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির রহস্য সন্ধান। ভাষাবিজ্ঞানেও বিশেষ বিশেষ ভাষার আলোচনা হতে পারে, তবে তার লক্ষ্য হলো বিশেষ ভাষাটিকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। উভয়ের মধ্যেকার এই লক্ষ্যমূলক ভিন্নতার কারণেই ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য গড়ে ওঠে।

প্র : ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের পার্থক্য লেখ।

উ : ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics)

১. ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো ভাষাবিশেষকে বিশ্লেষণ করে ভাষার সাধারণ সূত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

২. ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত আধুনিক ভাষার, বিশেষত জীবন্ত কথ্যভাষার বিশ্লেষণে এবং ভাষার সাধারণ তত্ত্ব অনুসন্ধানে মনোযোগী হন।

৩. ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত ভাষার গঠন ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন।

৪. ভাষাবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীতে, যার প্রধান কেন্দ্র হলো আমেরিকা।

ভাষাতত্ত্ব (Philology)

১. ভাষাতত্ত্বের লক্ষ্য হলো ভাষাবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি প্রয়োগ করে এক বা একাধিক ভাষার বিশেষ রূপ ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ বিশেষ থেকে বিশেষের গভীরে যাওয়া।

২. ভাষাতত্ত্ববিদেরা প্রধানত প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, পথিক, হিট্টি, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসিক প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও

...ভাষিক পরিবেশের কাজে যেভাবে ব্যবহৃত হয়ে
...ভাষাবিজ্ঞানীরা ঐ ভাষার উপর ...
...ভাষাবিজ্ঞানের শাখাসমূহ কী?
উ: আধুনিক যুগে ভাষার স্বরূপ, উৎপত্তি, ঐতিহাসিক বিকাশ ইত্যাদি বোঝার জন্য ভাষাবিজ্ঞানে আজকে অনেকগুলি শাখা গড়ে উঠেছে। আমরা সেগুলিকে আলাদা আলাদা শাখা বলতে পারি। যেমন-
১) বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Descriptive Linguistics)।
২ ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Historical Linguistics)।
৩ তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারা (Comparative Linguistics)।

৫ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও:
উ: ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার বিভিন্ন কালের রূপ, গঠন ইত্যাদি অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ করা হয় এবং তা যদি একটি কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সম্পন্ন হয়, তবে তাকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলে। বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় কোনো ভাষার বর্ণনাই মূখ্য।

প্র: ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও।
উ: ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় কোনো ভাষার উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা কালক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান।
পর্যালোচনার বিষয় : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে সামগ্রিকভাবে যে পর্যালোচনাগুলি করা হয়, তা হলো-
১. বিভিন্ন সময়ে ভাষা বিবর্তনের কালানুক্রমিক ইতিহাস।
২. বিবর্তনের ফলে ভাষার পূর্বরূপের গঠনগত পরিবর্তন।
৩ ভাষার অভিব্যক্তির গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে।
ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : ভাষা প্রবাহমান পরিবর্তনশীল। তাই ভাষার পরিবর্তন কোনোভাবেই বিশৃঙ্খলভাবে ঘটে না। একটা নিয়মানুযায়ী ভাষার বাহ্যিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন সূত্রাকারে সাহায্যেই নির্দেশ করা সম্ভব বিভিন্ন সময়ে ভাষার গঠনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা সূত্রাকারে বর্ণনা করাই হলো ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য।
দৃষ্টিভঙ্গি : এখন আমরা সংস্কৃত থেকে আজ বাংলা শব্দের পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করলে সহজেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারব। যেমন- বাংলায় প্রচলিত সর্বনাম শব্দ 'আমি'। এখন 'অস্মদ' শব্দটির বিবর্তনের ধারা বিচার করা যাক-
আমি
আমিকল্প- অম্মাদিয় (সংস্কৃত 'অস্মদ' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ)
প্রাকৃতরূপ- অম্হাহি
অপভ্রংশরূপ- অম্হহি
প্রাচীন বাংলারূপ- আম্হে
মধ্যবাংলারূপ- আমি
আধুনিক বাংলা- আমি

প্র: তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারার পরিচয় দাও।
উ: ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করে তার উৎস, অতীত রূপ, প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশের রূপরেখা অঙ্কন করা যায়, তাকে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান বলে।
আলোচনার পরিধি : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে কোনো একটি ভাষার ইতিহাস, উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারা আলোচিত হয়, কিন্তু তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সেই ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ইতিহাসের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করে। যেমন- আমরা যদি তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে বাংলা ভাষার আলোচনা করি, তবে সে প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্পর্কযুক্ত ও একই ভাষাবংশ-গোষ্ঠীভুক্ত যে-সকল ভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার করা হবে, সেই ভাষাগুলি কী কী এবং কোন ভাষার সঙ্গে কোন ভাষার তুলনা করা হবে, তা নির্দেশ করা হয়।
উদ্ভব : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম ভারতবর্ষে। এই বিষয়ের কৃতিত্বের দাবিদার বিশ্বনাথ উইলকিন্স। কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে (১৭৮৬) তাঁর ভাষণে (আমরা একটি বক্তৃতা বলে জানি) তিনি সংস্কৃত, গ্রিক ও লাতিন ভাষার তুলনা করে বলেন যে, এই তিন ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। সেই মিল এতই বিস্ময়কর যে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই তিনটি ভাষাই জন্ম নিয়েছে একই উৎস থেকে। তাছাড়া জার্মান, কেলটিক, লাটিন পারসিক ভাষার উৎসও সেই একই ভাষা। তবে জোনসের আগেও কেউ কেউ সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক ও লাতিনের মিল লক্ষ করেছিলেন, যেমন- নাথিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। কিন্তু জোনসের এই মন্তব্যে ইউরোপজুড়ে ব্যাপকভাবে সংস্কৃতচর্চা শুরু হয়। আর অনিবার্যভাবে সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মান, প্রাচীন স্লাভ ভাষার মিল লক্ষ করলেন বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা। এর মধ্যে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রানৎস, বপ নামে এক জার্মান পণ্ডিত সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, প্রাচীন জার্মান ও প্রাচীন পারসিক ভাষার ক্রিয়ার রূপতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে একটি বই রচনা করেন। আর এর সঙ্গেই জন্ম হলো এক নতুন শাস্ত্রের, যার নাম তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান।
জার্মানিতে উদ্ভব : ফ্রানৎস্ বপের পূর্বসূরি ফ্রেডরিখ ফন শ্লেগেল জার্মানিতে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রবর্তন ঘটান। শ্লেগেল প্রবর্তিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে বিধিবদ্ধ রূপদানে বপ্ ছাড়াও রাস্ক এবং জ্যাকব গ্রিমও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তবে ফ্রানৎস্ বপই যে সর্বপ্রথম এ বিষয়ক

...ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে ...
...তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ...
...বিশেষ উদ্দেশ্য ও আজ পর্যন্ত এর অগ্রগতি : তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য হলো- ভাষার ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভাষা ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ভাষাগুলির ইতিহাস উদ্ধার করা এবং ভাষার গঠন ও প্রকৃতির ক্রম-বিবর্তনের ধারা নির্ণয় করা। এই সম্প্রতি আমরা তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষার বাহ্যিক রূপের তুলনা করেছি। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের তুলনা করা হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের তুলনা করা হয়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার ধ্বনি ও রূপতত্ত্বের তুলনা করা হয়।
...ঐতিহাসিক শব্দতত্ত্বের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপযোগিতা : প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঐতিহাসিক শব্দতত্ত্বের ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের উপযোগিতা রয়েছে অনেক, অনেক সময় কোনো ভাষার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য তার সঙ্গে আর কয়েকটি কিংবা অনেক ভাষার তুলনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে আলাদাভাবে আলোচনা না করে ভাষাবিজ্ঞানে এদের প্রয়োগ

আলোচনা করা হয়। তাই এই ধারাটিকে অনেকে সাধারণভাবে 'কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান' রূপে অভিহিত করতে চান।

প্র। ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচ্য বিষয় ও বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক কী?

উ। আধুনিককালে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি বহু প্রসারিত। ফলে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্বের (Philology) অনেক প্রসঙ্গই বিশুদ্ধ ভাষাবিজ্ঞানে (Linguistics) এসে পড়েছে। তাছাড়া ভাষাতত্ত্বে যেমন গণিতশাস্ত্র, দর্শন ও মনোবিদ্যার বিভিন্ন স্তরের সাহায্যে ধ্বনি, রূপ, বাক্য ও অর্থগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়, তেমনি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন প্রয়োগগত রূপের ব্যবহার অন্যান্য শাস্ত্রেও লক্ষ করা যায়। এর ফলে এখন ভাষার ইতিহাস, ভাষার সঙ্গে জাতিতত্ত্বের সম্পর্ক, ভাষার সামাজিক দিক এবং ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের কিংবা অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্কও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই হিসেবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের শাখাগুলিও বৈচিত্র্যময়। এগুলি হলো–

১. মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycholinguistics)।
২. সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics)।
৩. নৃ-ভাষাবিজ্ঞান (Anthropological linguistics)।
৪. স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান (Neurolinguistics)।
৫. শৈলীবিজ্ঞান (Stylistics)।
৬. অভিধানবিজ্ঞান (Lexicography) ইত্যাদি।

এই শাখাগুলির আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

মনোভাষাবিজ্ঞান : ভাষাশিক্ষায় এবং ভাষাব্যবহারে মনের ভূমিকাই মনোভাষাবিজ্ঞানের উপজীব্য। স্বভাবতই কোন কোন মানসিক উপাদান ভাষাশিক্ষার সহায়ক বা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তারই চর্চা করে মনোভাষাবিজ্ঞান।

সমাজভাষাবিজ্ঞান : ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা যেখানে সমাজনির্ভর এবং সামাজিক শ্রেণি, শিক্ষার স্তর ও প্রণালী, বয়স, লিঙ্গভেদ প্রভৃতি ভাষার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই বিষয়টি সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত হয়ে পড়ে। এককথায়, ভাষা ও সমাজের সম্পর্কই সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

নৃ-ভাষাবিজ্ঞান : নৃ-ভাষাবিজ্ঞান হলো ভাষাবিজ্ঞানের সেই শাখা, যেখানে মানুষেরা একই ভাষায় ভাব বিনিময় করে এমন সমাজে ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক আলোচিত হয়। অর্থাৎ, সেই সমাজের ঐতিহ্য, বিশ্বাস, প্রথা, পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে ভাষার সম্পর্কই নৃ-ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়।

স্নায়ুভাষাবিজ্ঞান : মানব মস্তিষ্ক তার স্নায়ুতন্ত্রীয় কার্যকলাপের মধ্যে নিয়ে কিভাবে ভাষাকে আয়ত্ত করে, কিভাবে তার মধ্যে ভাষার বোধ জন্মায় এবং কিভাবে ভাষা নির্মাণ করে, এ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক আলোচনাই হলো স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের একটি অন্তঃসম্পর্ক আছে। কারণ, মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় ভাষার ধ্বনি, শব্দ, শব্দের অর্থ সম্পর্কে যেমন বোধ জন্মায় তেমনি তার আয়ত্তীকরণও ঘটে। Aphosiology, Brain imaging, Electrophysiology এবং Computer modeling ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বিচার করে দেখা হয় যে, আমাদের মস্তিষ্ক কিভাবে ভাষার তথ্য সংগ্রহ করে তাকে মূল্যায়ন করে। এই ধরনের মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলিও স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

শৈলীবিজ্ঞান : সাহিত্যের ভাষা ও শৈলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণকেই বলে শৈলীবিজ্ঞান। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতির সাহিত্যিক বিচারের প্রতিযোগী হিসেবেই শৈলীবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে।

অভিধানবিজ্ঞান : অভিধান রচনার নীতি ও পদ্ধতিই হলো অভিধানবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অভিধানকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানের একটি সংযোগমূলক বিভাগ বলতে পারি। এর কারণ, অভিধান ভাষার প্রকাশগত দিক এবং বিষয়গত দিকের মধ্যে অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে সংযোগ ব্যাখ্যা করে। এটিই হচ্ছে অভিধানের প্রধান ভূমিকা।

প্র। অভিধান কত রকমের হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উ। অভিধানের নানান শ্রেণি বা ধরন। তবে সমস্ত অভিধানেরই দুটি প্রধান শ্রেণি হলো ব্যবহারিক অভিধান এবং তাত্ত্বিক অভিধান।

ব্যবহারিক অভিধান : সহজ কথায় বলতে গেলে, যে-কোনো কাজের বা কেজো অভিধানই হলো ব্যবহারিক অভিধান। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রিলিচ ব্যবহারিক অভিধানকে বলেছেন 'Flesh-and-blood' dictionary। বাংলা ভাষায় 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত 'সংসদ বাংলা অভিধান' প্রভৃতি হলো ব্যবহারিক অভিধানের উদাহরণ।

তাত্ত্বিক অভিধান : তাত্ত্বিক অভিধানকে বলা যেতে পারে অভিধানের মডেল বা আদর্শরূপ। অভিধান তাত্ত্বিকরা ব্যবহারিক অভিধানকে তত্ত্বগতভাবে নিখুঁত বলে মনে করেন না, কিন্তু সেটিকে সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে উপযোগী বলে স্বীকার করেন। তাঁরা এমন একটি মডেল বা আদর্শের কথা বলেন, যা ব্যবহারিক অভিধানের চেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত। তবে তা সাধারণ ব্যবহারকারীর পক্ষে সহজবোধ্য না-ও হতে পারে। এই ধরনের অভিধানকে তাঁরা লেক্সিকন (Lexicon) বলেন।

একভাষিক অভিধান : অভিধানের একটি অতি-পরিচিত শ্রেণি হলো একভাষিক অভিধান, যাতে একটি ভাষার শব্দকে সেই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন– ইংরেজি থেকে ইংরেজি, বাংলা থেকে বাংলা ইত্যাদি।

দ্বিভাষিক অভিধান : অভিধান দ্বিভাষিকও হতে পারে। অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি, সংস্কৃত থেকে বাংলা ইত্যাদি।

ইতিহাসভিত্তিক অভিধান : আর এরকম অভিধান হলো ইতিহাসভিত্তিক অভিধান। তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত "The Shorter Oxford English Dictionary"। একটি শব্দের প্রথম প্রচলন কবে হয়েছিল, প্রথম প্রচলনের সময় তার অর্থ কী ছিল, পরে কখন কিভাবে অর্থবদল ঘটল এবং শব্দটির বর্তমান রূপ কী, অর্থই বা কী–এই হল ইতিহাসভিত্তিক অভিধানের উপজীব্য।

অন্যান্য : এছাড়াও বিষয় অভিধান, চরিতাভিধান, সমার্থক শব্দের অভিধান ইত্যাদি নানা শ্রেণির অভিধান রচিত হয়।

প্র : 'থিসরাস' কাকে বলে?

উ : শব্দের অর্থ, ভাব বা বিষয় অনুযায়ী এক-একটি 'শব্দ পরিমণ্ডল' গড়ে নিয়ে তার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের বিন্যাস করে যে অভিধান রচিত হয়, তাকে 'থিসরাস' বা সমার্থ শব্দকোষ বলা হয়।

প্র : একটি বাংলা থিসরাসের উদাহরণ দাও।

উ : প্রথম বাংলা থিসরাস হলো অশোক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'সমার্থ শব্দকোষ'। অন্য একটি হলো : মুহম্মদ হাবিবুর রহমান সংকলিত 'যথাশব্দ'।

প্র : Linguistics-কে বাংলায় 'ভাষাবিজ্ঞান' বলা হয় কেন?

উ : Linguistics-কে বাংলায় 'ভাষাবিজ্ঞান' বলার কারণ হলো Linguistics শব্দের অর্থ Science of Linguistics বা ভাষার বিজ্ঞান। অর্থাৎ, এখানে ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়।

প্র : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপটি উল্লেখ কর।

উ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সম্পর্কে আলোচনার প্রথম ধাপ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে নথিভুক্ত করা। প্রয়োজনবোধে কথা ও লেখা উভয় প্রকার ভাষা থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্র : ভাষা বিশ্লেষণে কী কী ধরনের যন্ত্রের সাহায্য লাগে?

উ : ভাষার ধ্বনিসমূহের রেখাচিত্র, উচ্চারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় কাইমোগ্রাফ, কৃত্রিম তালু, এক্স-রে ফোটোগ্রাফ প্রভৃতির সাহায্যে।

প্র : বর্ণনামূলক ব্যাকরণের সঙ্গে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের পার্থক্য সম্বন্ধে ড. সুকুমার সেনের মতটি লেখ।

উ : এ বিষয়ে ড. সুকুমার সেনের মতটি হলো এই যে, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার অতীত ইতিহাস নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা থাকে না, এখানে শুধু ব্যবহারিক দিক দিয়েই ভাষার গঠনরীতি বিশ্লেষণ করা হয়।

প্র : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উ : ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতিতে ভাষাবিশেষের উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়।

প্র : 'মনের এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে ত্রিবিধ ক্রিয়ায়'– ত্রিবিধ ক্রিয়া কী?

উ : যে মন মানুষের অনন্যসুলভ সম্পদ, সেই মনের ত্রিধা বৃত্তি হল চিন্তা, সংকল্প ও অনুভব। এই ত্রিধা বৃত্তির প্রকাশ ঘটে অন্বেষণ, কর্মসাধনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির তিনটি ক্রিয়ায়।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট নির্দেশিত ভাষার সংজ্ঞার্থ দাও।

উ : ভাষা হলো মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি, যা দিয়ে মানুষ তার সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও যোগাযোগ স্থাপন করে।

প্র : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

উ : এই পদ্ধতিতে ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ইত্যাদি বিশ্লেষণের সময় তার ইতিহাস বা অতীতকালের রূপ নির্ণয় করা হয় না, শুধুমাত্র এগুলির স্বরূপ ও গঠনগত দিকই বিশ্লেষিত হয়।

প্র : বিশ্বে সর্বপ্রথম কার হাত ধরে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতি চালু হয়?

উ : প্রাচীন ভারতে মহামনীষী পাণিনির হাত ধরে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্ম। পাণিনি যে 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাতেই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের রীতি প্রকৃতি ধরা পড়েছে।

প্র : পাণিনির পরবর্তীকালে কারা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উ : পাণিনির পরবর্তীকালে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, চন্দ্রগোমী, ভর্তৃহরি, জয়াদিত্য, বামন, কৈয়ট প্রমুখ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্র : ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বর্ণনামূলক ভাষাবিষয়ক দুটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্ণনামূলক ভাষাবিষয়ক যে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হলো–

১. 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics'

২. 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'।

প্র : পাশ্চাত্যে কে প্রথম বর্ণনামূলক ধারার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দা সোসুর পাশ্চাত্যে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম বর্ণনামূলক ধারার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্র : 'Handbook of American Indian Language' গ্রন্থটি বিখ্যাত কেন?

উ : আমেরিকান ভাষাবিজ্ঞানী ফ্রানৎস বোয়েস এই গ্রন্থে দেখান যে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অনুন্নত যে সব ভাষা আছে, তার এক ভাষার রূপ অন্য ভাষার ওপর আরোপ করা সম্ভব নয়। এই সাধারণ সূত্রটি প্রতিষ্ঠার জন্যই আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্যার উইলিয়াম জোনস বিখ্যাত কেন?

উ : স্যার উইলিয়াম জোনসের হাত ধরেই ভাষার তুলনামূলক চর্চা শুরু হয়। তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক, গথিক, কেলটিক, ইতালীয় ইত্যাদি ভাষার তুলনা করে বলেন যে, এইসব ভাষা আদিতে একটি ভাষাবংশ থেকে সৃষ্ট হয়েছিল।

প্র : তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উ : এই পদ্ধতিতে মূলত রূপগত বৈপরীত্য, ধ্বনিগত ঐক্য, বিন্যাসগত সাদৃশ্য ও সমতার উপর ভিত্তি করে একাধিক ভাষার মধ্যে তুলনা করা হয়।

প্র : তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনায় জ্যাকব গ্রিমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : জ্যাকব গ্রিম তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, তার নাম 'Deutsche Grammatik'। এই গ্রন্থে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি সূত্রাকারে প্রথম প্রকাশ করেন।

প্র : 'নিঘণ্টু' কী?

উ : প্রাচীন ভারতীয় বাক্যবিদ যাস্ক হলেন প্রথম ভারতীয় অভিধানকার। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'নিরুক্ত'-এর শেষে তিনি বৈদিক শব্দাবলির একটি তালিকা নির্মাণ করেন। এই অংশটিকেই বলা হয় 'নিঘণ্টু'। নিঘণ্টু থেকে এখন নির্ঘণ্ট।

প্র : অমরসিংহ রচিত অভিধান গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : অমরসিংহ রচিত 'অমরকোষ' বা 'নাম-লিঙ্গানুশাসন' প্রাচীন ভারতের একটি উন্নত অভিধান গ্রন্থ।

প্র : 'শব্দকল্পদ্রুম' কী?

উ : উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেবের পৃষ্ঠপোষকতায় সংকলিত 'শব্দকল্পদ্রুম' হলো ভারতীয় অভিধান ধারার এক সমৃদ্ধ সংযোজন। এটি শুধু অভিধান নয়, এটি একটি বিশ্বকোষ।

প্র : বিশ্ববিখ্যাত 'Oxford English Dictionary'-র আদি পরিচয় দাও।

উ : আলোচ্য অভিধানের আদি নাম ছিল 'A New English Dictionary on Histirical Principles'। এখানে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিরূপণের নতুন ধারা লক্ষণীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে অভিজাত অথচ প্রয়োজনীয় শব্দাবলি নিয়ে মোট ১৩খণ্ডে এটি রচিত।

প্র : সমাজভাষাবিজ্ঞান কাকে বলে?

উ : সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভাষা কিভাবে সমাজে কাজ করে এবং সমাজ কিভাবে ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তা যে শাস্ত্র আলোচনা করে, সেটিই সমাজভাষাবিজ্ঞান।

প্র : দূ-ভাষাবিজ্ঞানের কাজ কী?

উ : দূ-ভাষাবিজ্ঞানের কাজ হলো একটি ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সম্পর্ক নির্ণয়, এ সম্পর্কের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা, দুটি ভাষার সমস্যা সমাধানে ভাষিক সম্পর্ক আলোচনা করা।

প্র : ভাষাতত্ত্বে ভাষাভাষীর সমাজটিকে কেন নিজের ওপর কর্তৃত্বের ওপর জোর আরোপ করা হয়?

উ : সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কোনোকোন সমাজের ভাষা যেহেতু অন্য সমাজের ভাষা থেকে কিছু পার্থক্য বজায় রাখে, সেহেতু ভাষাভাষীর সমাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্র : ভৌগোলিকবিজ্ঞানী যেসব প্রকরণ (Tool) ব্যবহার করেন, সেগুলি কী কী?

উ : ভৌগোলিকবিজ্ঞানে যে প্রকরণগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো–

১. প্রমুখন (Foregrounding)

২. বিচ্যুতি (Deviation)

৩. সমান্তরালতা (Parallelism)

৪. কোড-বদল (Code-switching)

৫. বহু-ধ্বনিমূলতা (Polyphony)

ধ্বনিতত্ত্ব

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে, সেইসব বাগধ্বনির চর্চা।

প্র : বাগযন্ত্র কাকে বলে?

উ : ভাষার বাগধ্বনিগুলি মানুষের মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ ইত্যাদি যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাদের বাগযন্ত্র বলে।

প্র : ধ্বনির উচ্চারণ ঘটে কিভাবে?

উ : বক্তার বাগযন্ত্রগুলি শ্বাসবায়ুতে সমভাবে যখন নানা রকমের তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তখনই ধ্বনির উচ্চারণ হয়।

প্র : উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান (Articulatory Phonetics) কাকে বলে?

উ : ধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখা আলোচনা করে, তাকে বাকযন্ত্র বলে উচ্চারণমূলক ধ্বনিবিজ্ঞান।

প্র : ধ্বনিবিচারে (Phonemics) কোন বিষয়টি আলোচিত হয়?

উ : কোনো ভাষার কোন কোন ধ্বনিকে মূলধ্বনি বা ধ্বনিম বলা যায়, তা বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করাই হলো ধ্বনিবিচারের আলোচ্য বিষয়।

প্র : ধ্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞানের নিজস্ব বিষয় বলতে কী বোঝ?

উ : ভাষায় ধ্বনিমের ভূমিকা, একটি ধ্বনিমের সঙ্গে অন্য ধ্বনিমের সংযোগের নিয়ম এবং শব্দের আদি-মধ্য-অন্তে ধ্বনিমের অবস্থানবিধি বিশ্লেষণ ও সূত্রবদ্ধ করাই হলো ধ্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞানের (Phonology) নিজস্ব বিষয়।

প্র : ধ্বনিতত্ত্বের শাখাগুলির উল্লেখ কর।

উ : আলোচ্য বিষয়ের প্রকারভেদ অনুসারে ধ্বনিতত্ত্বের তিনটি শাখা। যেমন- ধ্বনি-বিজ্ঞান, ধ্বনিমবিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার ও ধ্বনিম প্রক্রিয়াবিজ্ঞান।

প্র : কোন দুটি দিক দিয়ে ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচিত হয়?

উ : ভাষার ধ্বনিসমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের দুটি দিক আছে-

১. শব্দমধ্যে ধ্বনির অবস্থান (Distribution of sound) এবং

২. একটি ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির সংযোগ বা ধ্বনির সমাবেশ (Combination of sound)।

প্র : বাংলায় 'অ্যা' ধ্বনির অবস্থান নির্ণয় কর।

উ : 'অ্যা' ধ্বনিটি শব্দের সব অবস্থানেই বসতে পারে। তবে শব্দের অন্তে 'অ্যা' বসলে তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জন দ্বৈত উচ্চারিত হয়। যেমন- বন্যা = বোন্না। কিন্তু এটাই একমাত্র নিয়ম নয় কারণ, বাংলায় শব্দের শেষে 'অ্যা'-এর পূর্ণাঙ্গ উচ্চারণও হয়। যেমন- 'জ্যা' (ধনুকের ছিলা)।

প্র : শব্দের আদিতে বসে না, এমন দুটি বাংলা ধ্বনি কী কী?

উ : বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে 'ঙ' এবং 'ড়' ধ্বনি দুটোকে কখনও পাওয়া যায় না।

প্র : ধ্বনিম কাকে বলে?

উ : ধ্বনিম হলো একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। যেমন- 'কাল' ও 'খাল' শব্দের অন্তর্গত ক্ষুদ্রতম ধ্বনি 'ক' এবং 'খ' দুটিকে পৃথক অর্থদান করেছে। তাই 'ক' ও 'খ' হলো ধ্বনিম বা ধ্বনিমূল।

প্র : পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি কাকে বলে?

উ : একটি মূল ধ্বনির যেসব উচ্চারণ বৈচিত্র্য যখন শব্দের মধ্যে তার অবস্থান বা অন্য ধ্বনির সমাবেশের শব্দের অধীন হয়, বক্তার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না, তাদের সেই উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলিকে পূরকধ্বনি বা উপধ্বনি।

প্র : ধ্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারক কে?

উ : ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ত্রুবেৎস্কয় (Trubetzkoy)-এর রচনায় ধ্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের ধারণাটি স্পষ্ট ব্যক্ত হয়।

প্র : ইয়াকপসন কথিত ধ্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা কটি?

উ : ইয়াকপসন ধ্বনিমের ১২টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্র : বাংলা ভাষায় ধ্বনিমের একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর।

উ : স্বর ও ব্যঞ্জন- এই দুটি বিভাগে বাংলা ভাষার ধ্বনিমগুলিকে ভাগ করলেই এর একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। যেমন-

যাও = য + আ + ও (স্বর)

যান = য + আ + ন (ব্যঞ্জন)

উপরের উদাহরণে 'ও' এবং 'ন' ব্যঞ্জন প্রভাবে শব্দ দুটি আলাদা অর্থ বহন করছে।

প্র : সন্দেহভাজন জোড় (Suspicious pair) কাকে বলে?

উ : প্রায় সমোচ্চারিত যেসব ধ্বনিকে একই ধ্বনিমের পূরকধ্বনি সন্দেহকরে শব্দের মধ্যে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিচার করা হয়, তাদের সন্দেহভাজন জোড় বলে। যেমন- শারদা-সারদা।

প্র : 'মুক্ত বৈচিত্র্য' কী?

উ : ভাষাবিজ্ঞানী গ্লিসন উল্লেখ করেছেন যে একই 'key' শব্দ যদি কেউ একশো বার উচ্চারণ করে তবে প্রত্যেকবারই তার উচ্চারণে L ধ্বনির একটু-আধটু পার্থক্য হবে। এইভাবে কোনো ধ্বনিমের সকল স্বাধীন, পরিবেশ উচ্চারণ বৈচিত্র্য পাবে, তখন তাকে মুক্ত বৈচিত্র্য (free variation) বলে।

প্র : ন্যূনতম শব্দজোড় কাকে বলে?

উ : যখন দুটি শব্দ গঠনে সবচেয়ে ছোটো হয় এবং তাদের মধ্যে সবদিক দিয়ে মিল থাকে, শুধু প্রত্যেক শব্দের একটি করে ধ্বনি আলাদা বলে শব্দ দুটির অর্থ পৃথক হয়, তখন সেই শব্দ দুটিকে ন্যূনতম শব্দজোড় বা Minimal pair বলে। যেমন-

কাল = ক্ + আ + ল

বাল = ব্ + আ + ল

অমিল মিল

রূপতত্ত্ব

প্র : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উ : রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হলো কোনো ভাষায় উচ্চারিত সমস্ত শব্দের নানা দিক, অর্থাৎ তার গঠন, রূপবৈচিত্র্য, রূপবৈচিত্র্য সাধনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন- প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি।

প্র : 'আমসত্ত্ব' কথাটি একটি রূপিম নয় কেন?

উ : কারণ, এটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি নয়। একে ক্ষুদ্রতর দুটি অর্থপূর্ণ ধ্বনিসমষ্টিতে ভাগ করা যায়, যেমন- 'আম' ও 'সত্ত্ব'। তাই 'আমসত্ত্ব' রূপিম নয়, এটি একটি সমস্তপদ।

প্র : 'বাঘের' শব্দটির রূপিম বিভাগ করে দেখাও কোনটি কী ধরনের রূপিম?

উ : 'বাঘের' শব্দটিকে ভাঙলে দুটি রূপিম পাওয়া যাবে। 'বাঘ' ও 'এর'। 'বাঘ' হলো মুক্ত রূপিম এবং 'এর' হলো বদ্ধ রূপিম।

প্র : শব্দের সঙ্গে রূপিমের একটা পার্থক্যের সূত্র নির্দেশ কর।

উ : সব শব্দই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সব রূপিমই একা একা ব্যবহৃত হতে পারে না।

প্র : মুক্ত রূপিম কাকে বলে?

উ : যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি বাক্যে অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকে মুক্ত রূপিম বলে। যেমন- আম, জল, বলদ ইত্যাদি।

প্র : বদ্ধ রূপিম বলতে কী বোঝ?

উ : যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম ধ্বনিসমষ্টি বাক্যে অন্য ধ্বনিসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, কখনও স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তাকে বদ্ধ রূপিম বলে। যেমন- 'ছেলেটি' শব্দের 'টি' হলো বদ্ধ রূপিম।

প্র : Unique Morpheme বা অনন্য সাধারণ রূপিম কাকে বলে?

উ : যে রূপিম পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত না হয়ে শুধুমাত্র একটি শব্দগুচ্ছে সীমাবদ্ধ, তাকেই অনন্য সাধারণ রূপিম বা Unique Morpheme বলে। যেমন- ইংরেজিতে 'Cranberry' শব্দের 'Cran' রূপিমটি ইংরেজি ভাষায় আর কোথাও ব্যবহৃত না হয়ে শুধুমাত্র 'Cranberry' শব্দেই ব্যবহৃত হয়।

প্র : 'সমধ্বনিরূপ' কাকে বলে?

উ : যদি এমন হয় যে, দুটি ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই, তবে সেই শব্দ বা শব্দাংশগুলিকে রূপিম বলা হয় না। এদের বলা হয় 'সমধ্বনিরূপ'। যেমন- 'বই পড়ে' ও 'জল পড়ে' বাক্য দুটির 'পড়ে' শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থগত সাদৃশ্য নেই। তাই এরা পরস্পরের সমধ্বনিরূপ।

প্র : মিশ্র রূপমূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ : দুটি মুক্ত রূপমূল সহযোগে যখন একটি মিশ্র রূপমূল গঠিত হয়, তখন মুক্ত রূপমূল দুটির পূর্ব অর্থের বদলে একটি নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন- 'গায়চিল'। এখানে 'গায়' ও 'চিল'-এর অর্থ বদলে গিয়ে একটি বিশেষ ধরনের পাখিকে বোঝাচ্ছে।

প্র : জটিল রূপমূলের সংজ্ঞার্থসহ উদাহরণ দাও।

উ : দুইয়ের বেশি মুক্ত রূপমূলের সংযোগে যে রূপমূল গঠিত হয়, তাকে জটিল রূপমূল বলা হয়। বাংলায় এই ধরনের জটিল রূপমূল হলো- বহুবর্ণশাখর।

প্র : বাংলা ভাষায় ব্যাকরণিক সংবর্গ বলতে কাদের বোঝানো হয়?

উ : বাংলা শব্দের রূপবৈচিত্র্যের মুখ্য কারিগর হল বিভক্তি। এই বিভক্তি বচন, লিঙ্গ, পুরুষ, কারক, কাল, ভাব-প্রকার প্রভৃতি শব্দের রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে বলে এদের ব্যাকরণিক সংবর্গ বলা হয়।

প্র : 'মা' শব্দটিকে আমরা মৌলিক শব্দ বলি কেন?

উ : আমরা জানি, যে শব্দ একটি মাত্র রূপিম নিয়ে গঠিত, সেই শব্দকে মৌলিক শব্দ বলে। 'মা' শব্দটিও একটি মাত্র রূপিম দ্বারা গঠিত, কারণ 'মা'-কে ভাঙলে আমরা পাব 'ম'+ 'আ', যার কোনো অর্থ নেই, তাই 'মা' শব্দটি একটি মৌলিক শব্দ।

প্র : জটিল শব্দ কাকে বলে?

উ : যে শব্দ এক বা একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে অথবা শুধুই একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে গঠিত হয়, তাকে জটিল শব্দ বলে। যেমন- ছেলে + মি = ছেলেমি।

প্র : দেশ + বিদেশ = দেশবিদেশ। এই ধরনের শব্দগঠনকে ব্যাকরণের ভাষায় কী বলে?

উ : প্রশ্নের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, 'দেশ' ও 'বিদেশ' দুটি পৃথক শব্দ মিলে 'দেশবিদেশ' শব্দটি তৈরি হয়েছে। আমরা জানি, যে শব্দ একাধিক মুক্ত রূপিম বা একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত, তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে। এক্ষেত্রে তাই বলতে পারি যে, 'দেশবিদেশ' শব্দটি সমাসবদ্ধ শব্দ।

প্র : স্বনিম ও রূপিমের দুটি পার্থক্য কী?

উ : ১. স্বনিম হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম একক, কিন্তু রূপিম বা রূপমূল তা না-ও হতে পারে।
২. স্বনিমের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু রূপিমের নিজস্ব একটা অর্থ থাকবেই।

বাক্যতত্ত্ব

প্র : ভাষাবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপির তাঁর 'Language' গ্রন্থে 'বাক্য' সম্বন্ধে কী লেখেন?

উ : আলোচ্য গ্রন্থে বাক্যের সংজ্ঞা হিসেবে লেখা হয়েছে যে, 'It is the linguistic expression of a proposition' অর্থাৎ, বাক্য কোনো একটি বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করে।

প্র : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রাথমিকভাবে প্রধান যে দুটি অংশে বাক্যকে বিশ্লেষণ করা হয়, তা উল্লেখ কর।

উ : আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান মতে বাক্যের প্রথম দুটি অংশ হল কর্তাখণ্ড এবং ক্রিয়াখণ্ড। এই দুটি অংশকে কেউ কেউ আবার যথাক্রমে বিশেষ্যখণ্ড এবং ক্রিয়াখণ্ড রূপেও বিশ্লেষণ করেন।

প্র : বাক্যের 'উদ্দেশ্য' অংশ বলতে কী বোঝ?

উ : কোনো একটি বিষয়, বস্তু-ভাব বা ক্রিয়াকে অবলম্বন করে বক্তা তার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে মনোভাব প্রকাশকারী বক্তাই হলেন বাক্যের উদ্দেশ্য। অন্যভাবে বললে, বাক্যে যার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হয় বা ভাব প্রকাশ করা হয় তা-ই উদ্দেশ্য।

প্র : বাক্যের বিধেয় অংশ কাকে বলে?

উ : বাক্যের উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে যা কিছু বলা হয়, অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তা-ই হলো বাক্যের 'বিধেয়' অংশ।

প্র : বাক্যের বিশেষ্যখণ্ডে কী কী ধরনের পদ থাকতে পারে?

উ : 'বিশেষ্যখণ্ড' নামে বিশেষ্য হলেও এতে যেমন বিশেষ্য পদ থাকে, তেমনি সর্বনামও থাকতে পারে। এরা কর্তৃস্থানীয় অর্থাৎ, বিশেষ্য বা সর্বনাম কর্তার স্থান দখল করে। এ ছাড়া, বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, নির্দেশক এবং সংযোজক পদও থাকতে পারে।

প্র : বাক্যের 'ক্রিয়াখণ্ডে' কোন কোন পদ থাকতে পারে?

উ : ক্রিয়াখণ্ডে অবশ্যই ক্রিয়াপদ থাকে। এছাড়া এর সঙ্গে গৌণ কর্ম, মুখ্য কর্ম, ক্রিয়াবিশেষণ, কালবাচক পদ ইত্যাদি থাকতে পারে।

প্র : বাক্যের অধোগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

উ : চমস্কির মতে বাক্যের অধোগঠনের অর্থ অপরিবর্তনীয়। এই অপরিবর্তনীয়তাই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'অধিগঠন' বলতে কী বোঝ?

উ : চমস্কির 'সংবর্তনী-সঞ্জননী' ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো বাক্যের 'অধিগঠন'। তাঁর মতে, বাক্যের অন্তর্গত গঠনের স্তরটিই হলো অধিগঠন যাকে পরিবর্তন করা যায়। এছাড়া তিনি অধিগঠনকে বাক্যের 'প্রকাশভঙ্গি' রূপে অভিহিত করেছেন।

প্র : বাক্যের 'অব্যবহিত উপাদান' কাকে বলে?

উ : বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যকে ধাপে ধাপে ক্রমশ বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর উপাদানে ভাগ করা হয়। এদের এক-একটি উপাদান সমষ্টিকে বলা হয় গঠন। এই যে-কোনো গঠনকে আমরা যে দুটি বা যে কটি বৃহত্তম অর্থপূর্ণ উপাদানে ভাগ করতে পারি, তাদের অব্যবহিত উপাদান বলে।

প্র : বাক্যবিধির প্রধান দুটি দিক উল্লেখ কর।

উ : বাক্যবিধির প্রধান দুটি দিক হলো-
১. বাক্যের মধ্যে শব্দগুলিকে সাজাবার বা বিন্যাসের নিয়ম, এবং
২. বাক্যের প্রয়োজন অনুসারে শব্দের রূপ পরিবর্তনের নিয়ম।

প্র : ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দিওনুসিওস থ্রাক্স বিখ্যাত কেন?

উ : গ্রিক বাকরণবিদ দিওনসিওস থ্রাক্স বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাক্যকে পদের 'একক বিন্যাস' রূপে অভিহিত করেন, গ্রিক ভাষায় একে বলা হয় Syntaxis। এই শব্দটি থেকেই পরবর্তীকালে ইংরেজি Syntax শব্দের উৎপত্তি। যার বাংলা প্রতিশব্দ হল 'বাক্যতত্ত্ব'। সেই অর্থে বাক্যতত্ত্বের জনকরূপে এই গ্রিক ব্যাকরণবিদ আধুনিকালের ইতিহাসে বিখ্যাত।

প্র : বাক্যের এক পদের সঙ্গে অপর পদের সম্পর্ক বোঝানোর জন্য পদের সঙ্গে কোন বিভক্তি দুটি যুক্ত থাকে?

উ : বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের সঙ্গে হয় শব্দবিভক্তি নয়তো ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত থাকে। নাম পদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় শব্দ বিভক্তি এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিকে বলা হয় ক্রিয়াবিভক্তি।

প্র : গঠন-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে বাক্যের স্বীকৃত চারটি রূপ কী কী?

উ : গঠন-বৈচিত্র্য অনুযায়ী বাক্যের যে চারটি রূপ স্বীকৃত, সেগুলি হলো-
১. অসমবায়ী বা অযোগাত্মক (Isolating)
২. সমবায়ী বা প্রশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Incorporation)
৩. যৌগিক বা অশ্লিষ্ট যোগাত্মক (Agglutinating)
৪. সনস্বয়ী বা শ্লিষ্ট যোগাত্মক (Infectional)।

প্র : গঠনগতভাবে বাংলা বাক্যের শ্রেণিবিভাগ গুলি কী কী?

উ : বাক্যের গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বাংলা বাক্যকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
১. সরল বাক্য (Simple sentence)
২. জটিল বাক্য (Complex sentence) এবং
৩. যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compund sentence)।

প্র : অর্থগত দিক থেকে বাংলা বাক্যকে মূল কটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?

উ : অর্থের দিক থেকে বাংলা বাক্যকে নানা

শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। সেগুলির মধ্যে মূল চারটি শ্রেণি হলো–

১. নির্দেশক বা উক্তিবাচক বাক্য (Indicative sen[illegible]e)

২. প্রশ্নবাচক বাক্য (Interrogative sentence)

৩. বিস্ময়বাচক বা উচ্ছ্বাসবাচক বাক্য (Interjective sentence)।

৪. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য (Imperative sentence)।

প্র : বাক্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তিনটি কী কী?

উ : প্রথাগত ব্যাকরণের আলোচনায় ভাষাবিদরা বাক্যের তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা উল্লেখ করেন, সেগুলির অভাবে বাক্যের গঠন ত্রুটিপূর্ণ হয়। এই লক্ষণগুলো হলো– ১. আকাঙ্ক্ষা, ২. যোগ্যতা, ৩. আসত্তি।

প্র : 'বাক্যতত্ত্ব' (Syntax) কাকে বলে?

উ : বাক্যে অবস্থিত শব্দগুলির বিন্যাস অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে কোন শব্দ কোথায় বসবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী রকম হবে তা ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে বলে বাক্যতত্ত্ব।

শব্দার্থতত্ত্ব

প্র : 'শব্দার্থতত্ত্ব' কথাটির অর্থ কী?

উ : শব্দার্থতত্ত্ব বা Semantics কথাটির অর্থ হলো The stydy of meaning অর্থাৎ ভাষায় শব্দ ইত্যাদির অর্থের চর্চা।

প্র : শব্দের অর্থ আলোচনায় প্লেটোর প্রকৃতিবাদী মতটি কী?

উ : প্লেটো ও তাঁর অনুগামীদের মতে, শব্দের ধ্বনি ও অর্থের মধ্যে স্বাভাবিক ও অন্তর্লীন সম্পর্ক আছে।

প্র : শব্দার্থতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : শব্দের অর্থ সম্পর্কিত আলোচনাই শব্দার্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তবে, একটি শব্দ যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে, তেমনি আবার অর্থেরও অর্থ থাকতে পারে। অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক, অর্থের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক শব্দার্থতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

প্র : শব্দার্থ সম্পর্কে ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচের মতামতটি লেখ।

উ : ভাষাবিজ্ঞানী জেফ্রি লিচের মতে, শব্দের অর্থের একাধিক দিক বা ভাব থাকে। শব্দের অর্থকে বুঝতে হলে নানাভাবে বুঝতে হয়। কারণ শব্দের যেমন বোধমূলক অর্থ থাকে, তেমনি ইঙ্গিতময় অর্থও থাকে কিংবা আবেগচালিত অর্থও থাকতে পারে।

প্র : সিমিয়ন পটার শব্দার্থের যে তিনটি দিকের কথা বলেছেন সেগুলি কী কী?

উ : ইংরেজ ভাষাতাত্ত্বিক সিমিয়ন পটার সহজ ভাষায় শব্দার্থের তিনটি দিকের কথা বলেছেন। এগুলি হলো– ১. নিছক অর্থগত, ২. শব্দগত, ৩. প্রসঙ্গগত।

প্র : শব্দগত অর্থ বোঝাবার তিনটি উপায় কী কী?

উ : শব্দগত অর্থ জ্ঞাপন করা বা বোঝাবার সাধারণত তিন রকম উপায় রয়েছে। এগুলি হলো– ১. ইশারায় বা ইঙ্গিতে বা নির্দেশ করে, ২. ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে, ৩. অনুবাদের মাধ্যমে।

প্র : শব্দের 'প্রসঙ্গগত' অর্থ সম্পর্কে ভিগেনস্টাইন (Wittgenstein)-এর মতামতটি লেখ।

উ : শব্দের 'প্রসঙ্গগত' অর্থ সম্পর্কে অস্ট্রীয় দার্শনিক ভিগেনস্টাইন বলেছেন– 'The meaning of a word is it's use in the language'। অর্থাৎ একটা শব্দের অর্থ বোঝা যায় ভাষায় তার প্রয়োগ থেকে।

প্র : শব্দার্থতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণাগুলির উল্লেখ কর।

উ : শব্দের অর্থ ও তার প্রয়োগের তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রকৃতি অনুসারে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তিনটি তাত্ত্বিক ধারণা প্রচলিত আছে। এগুলি হলো– ১. উপাদানমূলক তত্ত্ব, ২. সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্ব, ৩. বিষয়মূলক তত্ত্ব।

প্র : শব্দার্থের সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্বটির মূল কথা কী?

উ : যখন আমরা কোনো বাক্যকে সত্য বলে জ্ঞান করি বা বাস্তব সত্যের ভিত্তিতে রচিত বলে মনে করি, খন সেই বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি অর্থের বোধ গড়ে ওঠে। এটাই হল সত্তা-সাপেক্ষ তত্ত্বের মূল কথা।

প্র : শব্দার্থ নির্ণয়ে উপাদানমূলক তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি কী?

উ : শব্দের মূর্ত প্রতিরূপ ছাড়াও তার সাধারণ ধর্মটিকে কল্পনা করাই হলো উপাদানমূলক তত্ত্বের দার্শনিক ভিত্তি।

প্র : বিষয়মূলক শব্দার্থতত্ত্বে শব্দের যে দু-রকম অর্থের কথা বলা হয় সেগুলি লেখ।

উ : বিষয়মূলক শব্দার্থ তাত্ত্বিকদের মতে, শব্দের অর্থ দু-রকম হতে পারে। যেমন–

১. সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট অভিধানিক অর্থ বা মুখ্য অর্থ।

২. মুখ্য অর্থ থেকে জাত আলংকারিক ব্যবহারে প্রযুক্ত গৌণ অর্থ বা ব্যঙ্গার্থ।

প্র : অর্থগত দিক থেকে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক কী কী রূপে হতে পারে?

উ : শব্দের সঙ্গে শব্দের যে অর্থ সম্পর্ক তা মূলত তিনটি রূপে হতে পারে। এগুলি হলো–

১. সমার্থকতা,

২. বিপরীতার্থকতা,

৩. ব্যাপকতার্থকতা।

প্র : গঠনগত সাদৃশ্য আছে অথচ অর্থে বিপরীতধর্মী, এমন বাংলা শব্দের উদাহরণ দাও।

উ : সমান-অসমান, জয়-পরাজয়, আদর-অনাদর ইত্যাদি শব্দজোড়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য আছে, অথচ অর্থের দিক থেকে এরা একে অন্যের বিপরীত।

প্র : শব্দার্থ বিশ্লেষণে প্রয়োগবাদীদের প্রধান লক্ষ্য কী?

উ : শব্দার্থ বিশ্লেষণে প্রয়োগবাদীদের প্রধান লক্ষ্য হলো ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্কের বাইরে জ্ঞান ও বিশ্বাসের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অবিচার। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন, কোনো বক্তার কথনভঙ্গি ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার বক্তব্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জনই প্রয়োগবাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্র : ক্ষুদ্র শস্য > খুদ, এই অর্থ পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ কর।

উ : আমরা ভাষা ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রেই শিথিলতা প্রকাশ করি বা কখনো-কখনো শব্দ বা বাক্যাংশকে ছোট করে নিই। এক্ষেত্রেও তাই ক্ষুদ্র শস্য এবং অর্থের অনুরূপে শস্যের ক্ষুদ্র অংশটি 'খুদ' রূপে পরিবর্তিত হয়েছে। তবে ক্ষুদ্র শস্য থেকে 'শস্য' শব্দটি বাদ গেলেও 'খুদ' শব্দে শস্যের অনুষঙ্গ রয়ে গেছে।

ছন্দ-প্রকরণ

প্র : ছন্দ কাকে বলে?

উ : যেসব বিশিষ্ট ধ্বনি পরিমিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষম ও যৌক্তিক বিন্যাসের দ্বারা শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে তাকে ছন্দ বলে। তবে সাধারণভাবে ছোট একটা কথা বলা যায়। 'ছন্দের প্রধানতম কাজ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখসৃষ্টি ও সুনির্মিত ছন্দের বন্ধনের আবশ্যকতা নেই।

প্র : অক্ষর (Syllable) কাকে বলে?

উ : ইংরেজি Letter বলতে বাংলায় বর্ণ বোঝায়, অক্ষর বোঝায় না। অক্ষর বলতে বোঝায় Syllable. অক্ষর ছন্দ-বিচারে প্রাথমিক এক প্রকৃতি।

শব্দমূলের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর (Syllable)। যেমন : রবি বার। এখানে (র) (বি) (বার) এই তিনটি অক্ষর। আবার, সোম বার। এখানে অক্ষর দুটি : (সোম্) (বার)।

প্র : অক্ষর (Syllable) কত প্রকার ও কী কী?

উ : অক্ষর (Syllable) দু প্রকার। যথা : মুক্তাক্ষর (Open Syllable), বদ্ধাক্ষর (Close Syllable).

প্র : মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের পরিচয় দাও।

উ : অযুগ্ম বা মুক্ত স্বরান্ত ধ্বনিকে মুক্তাক্ষর (Open Syllable) বলে। যেমন : 'ভালোবাসো যদি বলিবে না কেন?' এখানে (ভা) (লো) (বা) (সো) (য) (দি) (ব) (লি) (বে) (না) (কে) (ন) এই সবগুলোই (১২টি) মুক্তাক্ষর। মুক্তাক্ষর ∪ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।

বদ্ধ অর্থাৎ যুগ্মস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বদ্ধাক্ষর (Close Syllable) বলে। যেমন : 'সোম বার দিনান্তে চলিয়া যায়' (সোম্) (বার্) (দিন্) (তে) (চলি) (য়া) (যায়্) এই সবগুলোই (৭টি) বদ্ধাক্ষর। চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।

প্র : পঙ্‌ক্তি ও ছত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?

উ : কবিতায় পূর্ণযতি দিয়ে বিভক্ত ছন্দোবিভাগের নাম পঙ্‌ক্তি। আর ছত্র যতিচিহ্নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন : ত্রিপদীতে একটি পঙ্‌ক্তি তিন ছত্রে সাজানো থাকে। উদাহরণ :

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর। —বিদ্যাপতি

প্র : যতি, পূর্ণপর্ব, অতিপর্ব, অপূর্ণপর্ব কাকে বলে?

উ : একটি কবিতা পাঠ করার সময় পাঠক সুতালে থামেন। কবিতাংশে বাক্য বা অর্থ সমাপনান্তে একবার, অন্যবার কবিতা পাঠকালে নিঃশ্বাস পতন ও শ্বাসগ্রহণ কালে। কবিতায় পর্ব নির্ণয়েও সময় পাঠকের নিঃশ্বাস পতন ও শ্বাসগ্রহণের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিবেচনা করা হয়। কবিতা পাঠের সুবিধার্থে কবিতার প্রতি ছত্রে এক বা একাধিক বিশ্রামস্থান সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বিশ্রামস্থানকে যতি বলা হয়। কবিতার ছত্রে 'যতি' পতনের পূর্ব অংশকে পর্ব বলে। বিভিন্ন ছন্দে নির্দিষ্ট মাত্রার পর্বগুলোকে পূর্ণপর্ব, নির্দিষ্টমাত্রার চেয়ে কম কিন্তু ছত্রের শেষে উপস্থিত এমন পর্বকে অপূর্ণপর্ব, নির্দিষ্টমাত্রার চেয়ে কম কিন্তু ছত্রের প্রারম্ভে বর্তমান এমন পর্বকে অতিপর্ব বলা হয়। যেমন : (মাত্রাবৃত্ত ছন্দে)

'খাঁচার পাখি ছিল / সোনার খাঁচাটিতে /
বনের পাখি ছিল / বনে।' /
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'বনে' অপূর্ণ পর্ব। বাকি তিনটি পূর্ণপর্বের উদাহরণ। নিচের উদাহরণে 'বল' অতিপর্ব :

'বল / উন্নত মম / শির'।
—নজরুল

প্র : যতিপতন কাকে বলে?

উ : পর্ব বিভাগের প্রয়োজনে কবি কোনো শব্দকে বিভক্ত করে উচ্চারণ করেন তখন সেই শব্দখণ্ডের ছন্দটিকে যতিপতন বলে। যেমন : (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

'বাতাস ঘরে / প্রবেশ করে / বাদল উচ্ছ্বাসে।'
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'উচ্ছ্বাসে' শব্দের মধ্যযতি হয়েছে।

প্র : বাংলা ছন্দ-বিচার কোন নিয়মে করা হয়?

উ : পর্বের গঠনরীতিগত পার্থক্য অনুসারে বাংলা ছন্দ-বিচার করা হয়।

প্র : বাংলা ছন্দ কত প্রকার ও কী কী?

উ : তিন প্রকার। যথা : অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত।

প্র : অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের একটির নাম আছে, সেগুলো কী?

উ : অক্ষরবৃত্ত > জটিল কলামাত্রিক, মিশ্রকলামাত্রিক, যৌগিক ছন্দ;
মাত্রাবৃত্ত > কলাবৃত্ত ছন্দ > ধ্বনিপ্রধান ছন্দ;
স্বরবৃত্ত > দলবৃত্ত ছন্দ > ছড়ার ছন্দ > লৌকিক ছন্দ।

প্র : 'লয়' কী? কোন ছন্দ কোন লয়ের?

উ : 'লয়' অর্থ ছন্দের গতি। সাধারণত ধীর, মধ্য, দ্রুত এই তিন লয়ে কাব্যপাঠ হয়ে থাকে। অক্ষরবৃত্ত ধীর, মাত্রাবৃত্ত মধ্য, স্বরবৃত্ত দ্রুত লয়ের ছন্দ।

প্র : বিভিন্ন ছন্দে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের মাত্রা কত?

উ : স্বরবৃত্তে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর সর্বত্র একমাত্রা। মাত্রাবৃত্তে মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা। অক্ষরবৃত্তে মুক্তাক্ষর একমাত্রা ও বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা; কিন্তু বদ্ধাক্ষর যদি শব্দের প্রথমে বা মধ্যে থাকে তবে একমাত্রা।

প্র : স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : স্বরধ্বনির সংখ্যার উপর পর্বের মাত্রা-সংখ্যা নির্ভরশীল যে ছন্দের, তার নাম স্বরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পর্বে চারটি অক্ষর থাকে। এর লয় হবে দ্রুত। যেমন :

'আবার যদি / ইচ্ছা কর / আবার আসি / ফিরে (৪+৪+৪+২)
দুঃখসুখের / ঢেউখেলানো / এই সাগরের / তীরে।' (৪+৪+৪+২)

প্র : স্বরবৃত্ত ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ বলা হয় কেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরবৃত্তকে ছড়ার ছন্দ বলেছেন। ছান্দসিকগণ একে লৌকিক ছন্দও বলেন। কারণ একই। এই ছন্দে

প্র : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : যে ছন্দে [illegible] উচ্চারিত হয় [illegible] মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলে। [illegible] ধ্বনি-প্রধান। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে [illegible] পর্বে [illegible] মাত্রার পর্ব ও ছন্দে পড়া হয়, যেমন :

'সোনার পাখি ফিরে / সোনার খাঁচাটির
(৬+৬)
কাছে পাখি ফিরে / ফিরে '
(৬+৬)
—রবীন্দ্রনাথ

'দুরন্তরাতে ঘোর ঘন মেঘ (৮+৬)
নরলোকে বাঁধে ভয় ভয় (৮+৬)
এল মহাতমসা / রাহু ' (৮+৬)
—রবীন্দ্রনাথ

প্র : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখ।

উ : মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

১. একই পর্বের অন্তর্গত মুক্তাক্ষরকে পূর্ববৎ দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক।
২. হসন্ত অক্ষর বা বদ্ধাক্ষরকে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক।
৩. অনুস্বর ও বিসর্গের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ।
৪. যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর (যেমন : ঐ, ঔ) দ্বিমাত্রিক।
৫. অবশিষ্ট সমস্ত স্বরান্ত বা এককমাত্রিক।

প্র : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

উ : যে ছন্দের পর্বে শব্দের আদি ও মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংকুচিত ও একমাত্রা, শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি সম্প্রসারিত ও দুইমাত্রা হয় তাকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বলে। এই ছন্দে

মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রা হয় এবং শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা তান থাকে। এই ছন্দ সুর প্রধান। যেমন।

'মধ্য দিনে যবে গান / বন্ধ করে পাখি
(৮+৬)
হে রাখাল বেণু তব / বাজাও একাকি'।
(৮+৬) –রবীন্দ্রনাথ

প্র : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে লেখ।

উ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

১. মূল পর্ব আট বা দশ মাত্রার হয়।
২. শব্দধ্বনির অতিরিক্ত তান বা সুর থাকে।
৩. শব্দান্তের হলন্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর দ্বিমাত্রিক হয়। একাক্ষর শব্দের অক্ষরটি ব্যঞ্জনান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত (ঐ, ঔ) হলে দুই মাত্রা হয়।
৪. সমাসবদ্ধ শব্দের আদিতে যদি হলন্ত অক্ষর থাকে এবং তা যদি একটি শব্দ হয় তবে কখনো কখনো দুমাত্রা ধরা হয়।
৫. যুক্তব্যঞ্জনের সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয়। তাই পূর্ববর্তী অক্ষর দীর্ঘ ও দ্বিমাত্রিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।
৬. ছন্দটিতে দীর্ঘ লয় থাকে।

প্র : অমিত্রাক্ষর ছন্দের (Blank Verse) পরিচয় দাও।

উ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক। এই ছন্দ অক্ষরবৃত্তের পয়ার অবলম্বন করেই তৈরি। প্রতি ছত্রেই এখানে ১৪ মাত্রা। প্রথম ৮ মাত্রায় অর্ধযতি, শেষ ৬ মাত্রায় পূর্ণ যতি। এখানে গম্ভীর ও ধ্বনি-মাধুর্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার হয়। ভাবের গভীরতা অতলস্পর্শী। এই ছন্দে অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাস নেই। ছন্দটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, কত মাত্রার পর যতি পড়বে তা এখানে সুনির্দিষ্ট নয়। ভাবের প্রয়োজন অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে এখানে যতির পতন হয়। যেমন :

'দানব-নন্দিনী আমি/রক্ষঃকুলবধূ (৮+৬)
রাবণ শ্বশুর মম/মেঘনাদ স্বামী, (৮+৬)
আমি কি ডরাই, সখি / ভিখারী রাঘবে?'
(৮+৬) –মধুসূদন

প্র : সনেট-এর পরিচয় দাও।

উ : সনেট পাশ্চাত্য ধারার কাব্য প্রকরণ। মধুসূদন দত্ত এর নাম দিয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতা। তিনিই বাংলা সনেটের জনক। সনেটের আদি ধারা ইতালীয় কবি পেত্রার্ক (Francesco Petrurca # 130-1374 A.D) এবং আধুনিক ধারা ইংরেজ কবি শেক্সপিয়র (William Shakespeare 1564-1616 A.D) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। একটি আদর্শ সনেটের মধ্যে দুটি ভাগ থাকে। ১৪ ছত্র বিশিষ্ট এই কবিতার প্রথম ৮ ছত্রকে বলে Octave বা অষ্টক, পরবর্তী ৬ ছত্রকে বলে Sestet বা ষট্‌ক।

প্র : পেত্রার্কীয় ও শেক্সপিয়রীয় সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিন্যাসের বৈচিত্র্য কোথায়?

উ : পেত্রার্কীয় সনেট :
অষ্টকের মিল বিন্যাস হবে।
AB, BA, AB, BA #
ষট্‌কের মিল বিন্যাস হবে : CDE, CDE
(ষট্‌ক CD CD CD-ও হতে পারে)
শেক্সপিয়রীয় সনেট :
অষ্টকের মিল বিন্যাস হবে : ABAB, CDCD #
ষট্‌কের মিল বিন্যাস হবে : EFEF, GG
পেত্রার্কীয় সনেটে যেমন ৮ পঙ্‌ক্তি পর Turn বা আবর্তন (ইতালীয় শব্দ volta) আছে, শেক্সপিয়রীয় সনেটে ১২ পঙ্‌ক্তির পর সেই আবর্তন। এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তি জোড় বা Cuplet.

প্র : গদ্যছন্দের পরিচয় দাও।

উ : শুধু কবিতাই ছন্দে রচিত হয় এমন নয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে। গদ্যের এই ছন্দকে কবিতায় ব্যবহার করা হয়। এটাই গদ্যছন্দ। গদ্যকবিতার ছন্দ পদ্যছন্দের মত বাঁধাধরা কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত না হলেও কবির ছন্দোবোধের দ্বারা তা সংযমিত। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করেছেন, গদ্যছন্দের চাল স্বাভাবিক চলন আর পদ্যছন্দের চাল নাচের চলন। গদ্যকবিতার পর্ব বিভাজন হয় অর্থকে অবলম্বন করে কিন্তু এই পর্বগুলি বিন্যস্ত হয় ভাবানুযায়ী। গদ্যছন্দ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী। এই স্বাচ্ছন্দ্য ও অন্তরঙ্গতা গদ্যছন্দের বাহুল্য বর্জনেরই ফল। এই ছন্দ প্রচলিতভাবে অক্ষরবৃত্তের রকমফের মাত্র। নিচে একটি গদ্যকবিতার উদাহরণ দেয়া হলো:

'একটুকু রইলেম চুপ করে (১০)
তারপর বললেম (৬)
রাতের সব তারাই আছে (১০)
দিনের আলোর গভীরে।' (৯)
–রবীন্দ্রনাথ

অলঙ্কার সোপান

প্র : অলঙ্কার কাকে বলে? অলঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উ : কৌষিতকী উপনিষদে প্রথম 'অলঙ্কার' শব্দটি পাওয়া যায় : 'ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলঙ্কৃত।' তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী প্রথম অলঙ্কারের সংজ্ঞার্থ দেন। তাঁর মতে : 'কাব্য শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত অভীষ্ট অর্থ সংবলিত পদ বিন্যাসই অলঙ্কার।' কাব্যকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য করার জন্য কবি যেসব কৌশল অবলম্বন করেন, তাকে অলঙ্কার বলে। যথা :

'ঘন গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পাসরি গেলি'
–বিদ্যাপতি

এখানে মূলকথা হলো, গোধূলি বেলায় নায়িকা মন্দির থেকে বের হয়ে গেল। এ সামান্য ঘটনাটিকেই কবি রূপময় করে তুললেন। বললেন– মেয়েটি চলে গেল, মনে হল, নবীন মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ রেখার চমক খেলে গেল। এ রূপারূপই হলো অলঙ্কার। অলঙ্কার দুই প্রকার। যথা : শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

প্র : শব্দালঙ্কার কাকে বলে?

উ : বলা হয় 'শব্দই ব্রহ্ম'। শব্দের ধ্বনি বা Sound অলঙ্কারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে সমস্ত অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলা হয়। শব্দালঙ্কার শব্দের ধ্বনির পরিবর্তন সহ্য করে না। যেমন :

'কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত।'
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ক-এর অনুপ্রাস)

এখানে 'কাতর' এর স্থলে 'ভীত' লিখলে অর্থ ঠিক থাকলেও শব্দালঙ্কার ক্ষুণ্ণ হবে।
'ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'
এখানে 'ভারত ইন্ডিয়া খ্যাত আপনার গুণে' লিখলে শব্দালঙ্কার ক্ষুণ্ণ হবে।

প্র : উল্লেখযোগ্য শব্দালঙ্কারের নাম লেখ।

উ : শব্দালঙ্কারের মধ্যে
১. অনুপ্রাস
২. যমক
৩. শ্লেষ
৪. বক্রোক্তি
৫. পুনরুক্তবদাভাস
৬. বন্যুক্তিই প্রধান।

প্র : ১. অনুপ্রাস কাকে বলে? অনুপ্রাস কত প্রকার ও কী কী?

উ : একই ব্যঞ্জনধ্বনির বাক্যের মধ্যে পৌনঃপৌনিক ব্যবহারকে অনুপ্রাস বলে। অর্থাৎ একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে একাধিকবার ধ্বনিত হলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। যথা :

'কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ।' – লোক ছড়া
'বাজে বায়ু আসি বিদ্রূপ বাঁশি জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে' –যতীন্দ্রনাথ
(ক এবং ব-ধ্বনির অনুপ্রাস)

অনুপ্রাস ছয় রকমের। যথা :
১.ক) সরল
১.খ) অন্ত্য
১.গ) গুচ্ছ
১.ঘ) ছেক
১.ঙ) শ্রুতি
১.চ) মালা।

প্র : প্রত্যেক প্রকার অনুপ্রাসের পরিচয় দাও।

উ : ১.ক) সরল অনুপ্রাস : কবিতার কোনো ছত্রে এক / দুটি বর্ণ একাধিকবার ধ্বনিত হলে তাকে সরল অনুপ্রাস বলে। যেমন :

'পেলব প্রাণের প্রথম পশরা নিয়ে।'
–রবীন্দ্রনাথ
(প-এর অনুপ্রাস)

১.খ) অন্ত্যানুপ্রাস : কবিতার প্রতি চরণান্তে যে মিল, তাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে। যেমন :
'খসড়া খবরে মেঘ, মন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'
-রবীন্দ্রনাথ
(বরষা/ভরসা-এর মিল)

১.গ) ওষ্ঠ্যানুপ্রাস : একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যখন মুখের বেশি হাত একই ছত্র বা কবিতায় ব্যবহার হয় তখন তাকে ওষ্ঠ্যানুপ্রাস বলে। যেমন:
'মা মানে শান্তি, মমতা বাসনা অশন আসন বস্ত্র।' - রবীন্দ্রনাথ
(এখানে '-মন' ধ্বনির ওষ্ঠ্যানুপ্রাস)

১.ঘ) ছেকানুপ্রাস : একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি যদি মাত্র দুবার (এর বেশি হলে গুচ্ছানুপ্রাস হবে। কবিতার ছত্রে ব্যবহার হয়, তখন তাকে ছেকানুপ্রাস বলে। যেমন: 'এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।'
-রবীন্দ্রনাথ
('ন্ধ'-এর ছেকানুপ্রাস)

১.ঙ) শ্রুতি অনুপ্রাস বা শ্রুত্যানুপ্রাস : একই স্থান থেকে ধ্বনির উৎপত্তি নয় কিন্তু শুনতে মনে হয় এগুলো যেন পারস্পরিক। এমন শ্রুতিসুখকর ধ্বনির অনুপ্রাসকে শ্রুতি অনুপ্রাস বা শ্রুত্যানুপ্রাস বলে। যেমন:
'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে।'
-রবীন্দ্রনাথ
(এখানে ন্ধ, ন্দ, ন্থ-এর শ্রুত্যানুপ্রাস)

১.চ) মালানুপ্রাস : অনুপ্রাসের পর অনুপ্রাস অর্থাৎ অনুপ্রাসের মালা যখন একই ছত্র বা কবিতায় সৃষ্টি হয়, তখন তাকে মালানুপ্রাস বলে। যেমন : 'দেশ দেশ দিশি দিশি দৌড়িছে দিবা নিশি'
-যতীন্দ্রনাথ
(এখানে দ / শ-এর মালানুপ্রাস)

প্র : ২. 'যমক' কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার যমকের পরিচয় দাও।

উ : যমক শব্দের অর্থ 'যুগ্ম'। একই শব্দ বা প্রায় একই রকম উচ্চার্য শব্দ যদি নির্দিষ্টক্রমে দুই বা তার বেশিবার আলাদা, আলাদা অর্থে বসে, তবে সে অলঙ্কার হবে যমক : যথা :
'চরু কাছে সব চরু দুখ।'
-রবীন্দ্রনাথ

১ম চরু = পুরোহিত
২য় চরু = কাঁসর / পাত্র

যমক প্রধানত তিন প্রকার :
২.ক) আদ্যযমক
২.খ) মধ্যযমক
২.গ) অন্ত্যযমক :

২.ক) আদ্যযমক : ছত্র বা চরণের অন্তিমে যে যমক তাই আদ্যযমক। যথা:
'ভারত, ভারত খ্যাত আপনার গুণে।'
-ভারতচন্দ্র
১ম ভারত = কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
২য় ভারত = ভারতবর্ষ

২.খ) মধ্যযমক : শব্দের মধ্যে যে যমক তাকে মধ্যযমক বলে। যথা :
'প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।'
-ঈশ্বর গুপ্ত
১ম প্রভাত = ভোরবেলা
২য় প্রভাত = প্রকৃষ্টরূপে দেখা যাওয়া

২.গ) অন্ত্যযমক : কবিতার পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দে যে যমক অলঙ্কার হয় তাকে অন্ত্যযমক বলে। যথা :
'দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ
নিশ্চই আমি ত্যজিব দেহ।'
-ঈশ্বর গুপ্ত
১ম দেহ = দেয়া
২য় দেহ = শরীর

প্র : ৩. শ্লেষ কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার শ্লেষের পরিচয় দাও।

উ : চরণে একটিমাত্র শব্দ একাধিক অর্থ প্রকাশ করলে এবং পাঠকও যদি একাধিক অর্থই তাকে গ্রহণ করে তবে তাকে শ্লেষ বলে। যথা :
'মধুহীন করোনা মা তব মনঃ কোকনদে।'
-মধুসূদন
(এখানে 'মধুহীন' বলতে মিষ্টিহীন ও মধুসূদনহীন-এ দুই অর্থ প্রকাশিত)
শ্লেষ দুই প্রকার। যথা :
৩.ক) অভঙ্গ শ্লেষ
৩.খ) সভঙ্গ শ্লেষ।

৩. ক) অভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে যখন না ভেঙে কাঙ্ক্ষিত অর্থ বের করা যায় তখন তাকে অভঙ্গ শ্লেষ বলে। যথা:
'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ চরাচর
বাসাদে প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'
-ঈশ্বর গুপ্ত
(এখানে ঈশ্বর গুপ্ত দুই অর্থে। ভগবান নেশা নেন না এবং কবি ঈশ্বর গুপ্ত। প্রভাকরও দুই অর্থে। সূর্য এবং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা।)

৩. খ) সভঙ্গ শ্লেষ : শব্দকে যখন ভেঙে কাঙ্ক্ষিত অর্থ পাওয়া যায় তখন তাকে সভঙ্গ শ্লেষ বলে। যথা:
'ভূগোল টা কার বলো?' - প্রচলিত
(এখানে পৃথিবী 'কার' অথবা 'টাকার' উভয় অর্থে ব্যবহার হয়েছে)।

প্র : ৪. বক্রোক্তি কাকে বলে? বক্রোক্তির পরিচয় দাও।

উ : কবিতায় এক অর্থে ব্যবহার করা কোনো শব্দকে যদি প্রশ্ন বা স্বর বিকৃতির দ্বারা অন্য অর্থে সংযোজন করে ব্যাখ্যা করা যায়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। বক্তা এখানে বলতে চান এক, শ্রোতা তাকে বেঁকিয়ে অর্থ করেন অন্য। যেমন :
'দেয়ালে প্রশ্রাব করবেন না করলে দিতে হবে টাকা।' -প্রচলিত
(এখানে প্রশ্রাব করলে নাকি না-করলে জরিমানার টাকা দিতে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। সে অর্থ নির্ভর করে বাকাটি পাঠকের পড়ার কৌকের উপর।)

প্র : ৫. পুনরুক্তবদাভাসের পরিচয় দাও।

উ : একই চরণে একার্থক একাধিক শব্দ যদি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু বিশ্লেষণে যদি সেই পুনরাবৃত্তির বিভিন্ন অর্থ প্রতীয়মান হয় তাহলে তাকে পুনরুক্তবদাভাস বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত অল্প।
'নিশীথ রাতে একা বসে গান গাই।'
-রবীন্দ্রনাথ
(এখানে নিশীথ ও রাত একার্থ হলেও নিশীথ 'গভীর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)
'তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।' -রবীন্দ্রনাথ
(এখানে তনু ও দেহ একার্থ হলেও তনু 'ছিপছিপে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

প্র : ৬. ধ্বন্যুক্তি কাকে বলে?

উ : ধ্বনির উচ্চারণে যদি বিষয়বস্তুকে দৃশ্যমান করা যায়, তবে তাকে ধ্বন্যুক্তি বলে। যেমন:
'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান।
টাপুর-টুপুর পানুর-ডুমুর
পানুর-ডুমুর টাপুর-টুপুর।
ঝাপুর-ঝুপুর ঝাপুর-ঝুপুর
ঝাপুর-ঝুপুর ঝাপুর-ঝুপুর।'
-অবনীন্দ্রনাথ
(এখানে শব্দ দিয়ে এমন ধ্বনিসৃজন হয়েছে, যেন দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে।)

অর্থালঙ্কার

প্র : অর্থালঙ্কার কাকে বলে? অর্থালঙ্কার কত প্রকার ও কী কী?

উ : অর্থালঙ্কার : যে অলঙ্কার একান্তভাবে শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে; অর্থ-প্রকাশক শব্দ বা শব্দাবলিকে পরিবর্তিত করে সেখানে সমার্থক অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে অলঙ্কার অক্ষুণ্ন থাকে তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থাৎ অর্থালঙ্কারে শব্দের অর্থের উপর নির্ভরশীল। যথা :
'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।' -জীবনানন্দ
এতে একটি উপমা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে যদি শব্দ পরিবর্তন করে 'পক্ষির বাসার মতো আঁখি তুলে নাটোরের বনলতা সেন' লেখা হয় তাহলেও অলঙ্কার ম্লান হয় না, অটুটই থাকে। অর্থালঙ্কারকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :
১. সাদৃশ্য মূল
২. বিরোধ মূল
৩. শৃঙ্খলা মূল
৪. ন্যায় মূল
৫. গূঢ়ার্থ মূল।

প্র : ১. সাদৃশ্য মূল অর্থালঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সাদৃশ্য মূল অলঙ্কার : দুটো বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কোনোরকম ঐক্য, সম্মতি

কিংবা সাদৃশ্য নির্মাণে যেসব অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়, তাকে সাদৃশ্য মূল অলঙ্কার বলে। সাদৃশ্য মূল অলঙ্কারের মধ্যে

১.ক) উপমা
১.খ) রূপক
১.গ) উৎপ্রেক্ষা
১.ঘ) ভ্রান্তিমান
১.ঙ) অতিশয়োক্তি
১.চ) সমাসোক্তি ইত্যাদি প্রধান।

প্র : ১.ক) উপমা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : Aristotle-এর মতানুসারে, উপমা হলো: 'বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা।' স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের বিসদৃশ কোনো ধর্মের উল্লেখ না করে যদি বস্তুদুটোর মধ্যে শুধু সাদৃশ্য বা সামান্যাপক গুণগুলো উল্লেখ করা হয়, তবে তাকে উপমা অলঙ্কার বলে।

উপমা অলঙ্কারে সাধারণত ৪টি অঙ্গ থাকে। যথা :

* উপমান
* উপমেয়
* সাধারণ ধর্ম
* সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

যে বস্তু বা যার তুলনা করা হয় তাকে উপমেয়, যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে উপমান, যে গুণ বা ধর্ম দিয়ে তুলনা করা হয় তাকে সাধারণ ধর্ম, যে ধরনের শব্দ দিয়ে (যেমন : মতো, সম, যেন, ন্যায়) তুলনা সংঘটিত হয় তাকে সাদৃশ্যবাচক শব্দ বলে। যথা :

'বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ মনে আসে।'
—জীবনানন্দ

এখানে উপমান = বেতের ফল
উপমেয় = চোখ
সাধারণ ধর্ম = ম্লান
সাদৃশ্যবাচক শব্দ = মত

উপমা প্রধানত পাঁচ প্রকার :
পূর্ণোপমা, লুপ্তপোমা, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা, মালোপমা।

প্র : ১.খ) রূপক অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমান ও উপমেয়ের তুলনা করার [illegible] যখন তাদের অভেদ কল্পনা করা হয় [illegible] তাকে রূপক বলে। যথা :

'জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে কেহ [illegible] অমৃত বারি।'
—[illegible]

এখানে 'জীবন' উপমেয়, 'সিন্ধু' উপমান। রূপক অলঙ্কারে উপমেয় সাধারণত অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত এবং উপমান অপেক্ষাকৃত মূর্ত থাকে। যেমন : [illegible] সিন্ধু, মনমাঝি, যৌবনবন, [illegible] ইত্যাদি। রূপক অনেক রকম। এর মধ্যে প্রধান তিনটি হলো : নিরঙ্গ, সঙ্গ পরম্পরিত।

প্র : ১.গ) উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : প্রবল সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে যদি উপমান বলে ভুল বা সংশয় হয় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। এ অলঙ্কারে যেন, বুঝি, মনে হয়, প্রায় ইত্যাদি সম্ভাবনাবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে। উৎপ্রেক্ষা দুপ্রকার। যথা :

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা
প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দে উল্লেখ থাকে তাকে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা :

'হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো।'
—সত্যেন্দ্রনাথ

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষায় সম্ভাবনাবাচক শব্দ অনুপস্থিত অথচ অর্থ থেকে সম্ভাবনার ভাবটি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, তাকে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা বলে। যথা :

'আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে, পাঁচটি রঙের ফুল।' —জসীমউদ্দীন

(পাঁচটি মেয়েতো আর প্রকৃত ফুল নয়, যেন পাঁচটি রঙের ফুল। এখানে 'যেন' অনুক্ত কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না।)

প্র : ১.ঘ) ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : প্রবল সাদৃশ্যবশত এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল হলে এবং সে ভুল যদি সাধারণ না হয়ে কবি-কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তবে তাকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার বলে। যথা :

'নিদ্রায় আকুল রাধা হল অচেতন।
চরণ-পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ।'
—মুকুন্দরাম

(রাধা গভীর নিদ্রায়। রাধার পা পরফুল বলে ভুল করে মৌমাছি সেখানে বসছে।)

প্র : ১.ঙ) অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তি। উপমেয়কে উল্লেখ না করে উপমানকে উপমেয় রূপে উল্লেখ করলে তাকে অতিশয়োক্তি বলে। যথা :

'মায়ের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।' —বিষ্ণু দে

(সোনার মতো রোদ। রোদ এখানে লুপ্ত।)

বিশ্বনাথ কবিরাজ পাঁচ ভাগে অতিশয়োক্তি বিভক্ত করেছেন। যথা :

ভেদে অভেদে, অভেদে ভেদে, সম্বন্ধে অসম্বন্ধে, অসম্বন্ধে সম্বন্ধে, কার্যকারণে পৌর্বাপর্যনাশ।

প্র : ১.চ) সমাসোক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : উপমেয়র উপর উপমানের ব্যবহার সমারোপিত হলে তাকে সমাসোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। অর্থাৎ বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে যখন সজীব পদার্থের সমান কাজ, সমান বিশেষণের দ্বারা আরোপ করা হয়, তখন সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা :

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' —রবীন্দ্রনাথ

(এখানে নিশ্চল পর্বতে চলিষ্ণু মেঘের গতিময়তা আরোপিত।)

প্র : ২. বিরোধমূল অলঙ্কার কাকে বলে? প্রধান প্রধান বিরোধমূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : বক্তব্যকে সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য কবি তাঁর উক্তিতে আপাত বিরোধের সৃষ্টি করতে পারেন। যদি এই কল্পিত বিরোধকে কেন্দ্র করে কোনো অলঙ্কার গড়ে ওঠে- তখন তাকে বিরোধমূল অলঙ্কার বলে। বিরোধমূল অলঙ্কার কয়েক প্রকার রয়েছে। তবে এ শ্রেণির অলঙ্কারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে :

২.ক) বিরোধাভাস
২.খ) বিষম
২.গ) বিভাবনা
২.ঘ) বিশেষোক্তি
২.ঙ) অসঙ্গতি

প্র : ২.ক) বিরোধাভাস অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : যদি দুটি বস্তুর মধ্যে আপাত বিরোধ দেখা যায়, ওই বিরোধে যদি কোনো [illegible] বা উৎকর্ষের সৃষ্টি হয়- তবে তাকে বিরোধাভাস অলঙ্কার বলে। যেমন :

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।'
—রবীন্দ্রনাথ

(সীমার মধ্যে অসীমের স্থিতি আপাত বিরোধের চিন্তা। কিন্তু অসীম ঈশ্বর সীমিত বিশ্বেও বিরাজমান। সুতরাং বিরোধ এখানে যথার্থ নয়, কারো দ্বারাত্ব ঈশ্বর করার জন্য।)

প্র : ২.খ) বিষম অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কার্য ও কারণের মধ্যে যদি কোনো বৈষম্য দেখা যায়, কিংবা কারণ থেকে যে ফল পাবার কথা, তার বদলে অবস্থিত ফল দেখা দেয় কিংবা একই স্থানে দুটি অসম্ভব ঘটনার মিলন ঘটে তখন তাকে বিষম অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'যমুনার জলে যদি দিই গিয়া ঝাঁপ
পরাণ জুড়াবে কি, অধিক উঠে তাপ।'
—প্রচলিত

(এখানে যমুনার জলে প্রাণ শীতল হবার কথা। কিন্তু এর উল্টো ঘটছে।)

প্র : ২.গ) বিভাবনা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সাধারণত কারণ ছাড়া কোনো কার্য হয় না। একে কার্যকারণ বলে। কিন্তু কারো কারণ ছাড়াও কার্য হতে পারে। আর এমন হলে তাকে বিভাবনা বলে। তবে প্রচলিত কারণের বাইরে এখানে কোনো গূঢ় কারণ অবশ্যই থাকবে। যেমন :

'মদ না খেয়েও মাতাল তুমি টাকার গরমে।'
—গুহ্যসত্ত্ব বসু

(এখানে মাতাল হবার গূঢ় কারণ অর্থের গর্ব।)

HT Bcj Math

প্র : ২.খ) বিশেষোক্তি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীত অলঙ্কার হলো বিশেষোক্তি। অর্থাৎ কারণ থাকা সত্ত্বেও যেখানে কার্য বা ফল কিছু ঘটে না তাকে বিশেষোক্তি অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'আছে চক্ষু, কিন্তু তার দেখা নাহি যায়।
আছে অর্থ, কিন্তু তা কভু নাহি ধায়।'

-ঈশ্বর গুপ্ত

(এখানে বাধ্যতা বোঝাতে বলা হয়েছে।)

প্র : ২.ঙ) অসঙ্গতি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কার্য এবং কারণের ঘটনাস্থান যদি ভিন্ন হয় অর্থাৎ এক জায়গায় কারণ ঘটছে আর অন্যত্র তার ফল দেখা যাচ্ছে, তখন তাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার বলে। যেমন :

'শ্রাবণের কালো মেঘ ছাইল গগনে
আঁখি জল বরষিল রাধিকা নয়নে।'

-অজ্ঞাত

(আকাশ মেঘে কালো হয়েছে কিন্তু জল ঝরছে রাধার নয়ন হতে।)

প্র : ৩. শৃঙ্খলামূল অলঙ্কার কাকে বলে? শৃঙ্খলামূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি তাঁর কবিতা রচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাক্য এমনভাবে সংযোজন করেন, যাতে এক বাক্যের একটি কাজ অন্য বাক্যের কারণ হয়, এবং সেই কারণের কাজ আবার অন্য কারণের কারণ হয়। এভাবে উৎকর্ষবাচক শব্দ সবার শেষে বসে এবং কবিতাটি একটি পারম্পর্যের অংশ হয়। এরূপ অলঙ্কারকে শৃঙ্খলামূল অলঙ্কার বলে। শৃঙ্খলামূল অলঙ্কারের মধ্যে তিনটি প্রধান :

৩.ক) কারণমালা
৩.খ) একাবলি
৩.গ) সার।

প্র : ৩.ক) কারণমালা অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কোনো কাব্যের বাক্যে কারণের কাজ যদি পরের বাক্যে কারণরূপে মনে হয় এবং ওই কারণের কাজ যদি তার পরের বাক্যের কারণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে কারণমালা অলঙ্কার বলে। যেমন :

'বিদ্যা হতে মান হয়, মান হতে ধন,
ধন হতে ধর্ম হয়, এই সার তত্ত্ব।'

-ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্র : ৩.খ) একাবলি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : একই শৃঙ্খলাক্রমে যখন একটি বাক্যের বিশেষণপদ তার আগের বাক্যের বিশেষ্যরূপে বসে তখন তাকে একাবলি অলঙ্কার বলে। যেমন :

'সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল সলিল
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জন ধরাতল।'

-যতীন্দ্রনাথ

('গাছে গাছে ফুল' বিশেষণের ভাব নিয়ে বসেছে, পরে ফুল বিশেষ্যপদ হিসেবে বসেছে।)

প্র : ৩.গ) সার অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : আগে বর্ণিত পদার্থগুলোর চেয়ে পরে বর্ণিত পদার্থগুলোতে যখন উৎকর্ষ বোঝানো হয়, তখন তাকে সার অলঙ্কার বলে। এ অলঙ্কারকে কোনো কোনো অলঙ্কারিক 'উদার' নামেও অভিহিত করেছেন। যেমন :

'আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ
গৃহপালিত, পত্নী চালিত, মাতৃলালিত।'

-প্রচলিত

(এখানে স্ত্রীর চালনা ও মাতার লালনই মূল।)

প্র : ৪. ন্যায়মূল অলঙ্কার কাকে বলে? ন্যায়মূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি যখন কোনো বক্তব্যের মধ্যে ন্যায়বাচক উক্তি করেন এবং ওই উক্তি দিয়ে বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেন তখন তাকে ন্যায়মূল অলঙ্কার বলে। ন্যায়মূল অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দুটি :

৪.ক) অর্থান্তরন্যাস
৪.খ) কাব্যলিঙ্গ।

প্র : ৪.ক) অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : সামান্যের দ্বারা বিশেষ অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্য যখন সমর্থিত হয় এবং কার্যের দ্বারা কারণ অথবা কারণের দ্বারা

কার্য যখন সমর্থিত হয় তখন তাকে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলে। যেমন :

'চির সুখী জন,
ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

-কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

(সুখী ব্যক্তি ব্যথিতের বেদনা বোঝে না, এটা সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু সাপের বিষের জ্বালা কিভাবে মানুষ বুঝবে? এখানে একটির অর্থ অন্যটিতে প্রয়োগ করা হয়েছে।)

প্র : ৪.খ) কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : যখন কোনো পদ বা বাক্যের অর্থ বাক্যস্থ দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের কারণ বলে মনে হয় তখন তাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার বলে। যেমন :

'তুমি আমায় ভালোবাসো তাই ত আমি কবি।'

-নজরুল

(প্রেমিকা ভালোবাসে বলেই কি নজরুল কবি হয়েছেন? কবি বলেছেন, বিশ্বাসও হচ্ছে পাঠকের। আসলে সে কারণে তিনি কবি হন নি।)

প্র : ৫. গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার কাকে বলে? প্রধান প্রধান গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : কবি তাঁর কাব্যে যখন কোনো বাক্যের আসল বক্তব্য বা গূঢ়ার্থ লুকিয়ে রাখেন অন্য বাচ্যার্থের আড়ালে, তখন তাকে গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার বলে। গূঢ়ার্থমূল অলঙ্কার অনেক প্রকার। তবে–

৫.ক) ব্যাজস্তুতি
৫.খ) অপ্রস্তুত
৫.গ) প্রশংসা
৫.ঘ) সূক্ষ্ম
৫.ঙ) অর্থাপত্তি
৫.চ) স্বভাবোক্তি
৫.ছ) আক্ষেপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্র : ৫.ক) ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের পরিচয় দাও।

উ : যে অলঙ্কারে নিন্দার স্থলে স্তুতি বা স্তুতির ছলে নিন্দা বোঝানো হয় তাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
তেঁই তব লাজ হাস এ কথা কহিলে।'

-ভারতচন্দ্র

(এখানে ভবানন্দের সিদ্ধি করা, ভাঙ খাওয়া, বুড়ো, নিপুণ ইত্যাদি শব্দ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।)

প্র : ৫.খ) অপ্রস্তুত অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : বক্তব্য-অপ্রস্তুত এমন কিছু বা এই ধরনের সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না, তবে গুণীজনের প্রখর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। এবার কবি তাঁর কবিতায় মূল কিছু পাল্টে দেন। কোনো পদার্থের অপ্রস্তুত সূক্ষ্মদৃষ্টিগ্রাহ্য সম্বন্ধের মধ্যে চমৎকার বর্ণনাকে অপ্রস্তুত অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা
চতুর্দিকে বাঁধা জল করিছে খেলা
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসী মাখা,
এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।'

-রবীন্দ্রনাথ

(মানবজীবনের একটা সূক্ষ্ম বর্ণনা, কবির গভীর দৃষ্টির প্রকাশ।)

প্র : ৫.গ) অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : অপ্রস্তুত (অবর্ণনীয়) বিষয়ের উপর ভর করে যখন প্রস্তুত (আসল বক্তব্য) বিষয়কে বোঝানো হয় তখন তাকে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার বলে। যেমন :

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরে কামড়ানো ফিরে
মানুষের শোভা পায়?'

-সত্যেন্দ্রনাথ

(কুকুর মানুষকে কামড়ালেও মানুষের কুকুরকে ফিরে কামড়ানো সম্ভব নয়। এ বিশেষ অপ্রস্তুতের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে উত্তম ব্যক্তি অধম ব্যক্তির আচরণকে অনুরূপভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে না।)

প্র : ৫.ঘ) সূক্ষ্ম অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : কোনো সূক্ষ্ম অথবা অপরিস্ফুট অর্থ ভাবভঙ্গি দিয়ে বা আকারে ইঙ্গিতে কিংবা

কোনো শব্দের দ্ব্যর্থ প্রকাশ করা হলে তাকে শ্লিষ্ট অলঙ্কার বলা হয়। যেমন :

'কখন মিলন হবে তারো মধু যামে,
হাসি ছিয়া নীলাম্বর মৌন নিমীলন।'

-শ্যামাপদ চক্রবর্তী

(রাতে পদ্ম নিমীলিত হয়, মিলনের সময়টিকে পদ্ম নিমীলনের সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হলো।)

প্র : ৫.৪) অর্থাপত্তি অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : একটি বিষয়ের উল্লেখে সেই বিষয়টি এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের জোরে তার সঙ্গতি অন্য বিষয়গুলোর যদি অর্থবোধ জন্মায়, তখন তাকে অর্থাপত্তি অলঙ্কার বলে। যেমন:

'হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল।'

-প্রচলিত

(যা শক্তিশালীরা করতে পারে না, দুর্বলের সহমিকা সেখানে তুচ্ছ।)

প্র : ৫.৫) আক্ষেপ অলঙ্কার কাকে বলে?

উ : বলতে ইচ্ছুক বিষয়ে সৌন্দর্যারোপ করার জন্য বক্তা যখন ঐ বিষয়ের উপর নিষেধাভাস আরোপ করে তখন তাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলে। যেমন :

কোনো সংসদসদস্য যদি স্পিকারের কাছে প্রশ্ন করে জানতে চান 'মাননীয় স্পিকার, আমি কি বাণিজ্যমন্ত্রীকে চিনি চোর বলতে পারি?' এর উত্তরে স্পিকার হয়তো বলবেন : 'না পারেন না। কারণ তিনি দেশের সম্মানিত মন্ত্রী।' তাহলেও কিন্তু মন্ত্রীকে অকাতরে 'চিনি চোর' বলাই হলো। উল্লেখ্য এই এরশাদের শাসনামলে জাতীয় সংসদে এমনটি ঘটেছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে আছে।

'নিজগৃহ পথ, তাত, দেখাও সত্বরে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃ-তুল্য।'

-মধুসূদন

(মেঘনাদ তার পিতৃব্য বিভীষণকে তিরস্কার করেছে এভাবে যে, বিভীষণ চোর ও চণ্ডালকে রাজার সিংহাসন দেখিয়ে দিয়েছেন। একথা বলার পর পরই মেঘনাদ আবার বলছে যে, তুমি আমার পিতৃব্য, পিতার তুল্য তোমাকে গঞ্জনা করব না। আসলে তিরস্কার বা গঞ্জনা যতটুকু করার তা করা হয়ে গেছে।)

সাহিত্যের তত্ত্ব এবং রূপ-রীতি

প্র : তত্ত্বভিত্তির বিশ্বপরিধি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : যারা সাহিত্যচর্চা করেন তাদের মানসজগৎ সৃষ্টির প্রথম দিকে আনন্দজাত ছিল শুধু, কোনো তাত্ত্বিকতার ধার ধারেন নি তারা। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যারা পৃথিবীতে মানুষকে নতুন করে ভাবালো। সাহিত্য ও শিল্পস্রষ্টারা যেহেতু প্রাগ্রসর মানুষ, সেহেতু তাদের চিন্তা হলো, যদি এরপরও মহাযুদ্ধ বেঁধে যায় তাহলে কী হবে? এই চিন্তা থেকে কেউ আশার আলো দেখলেন, অন্যকে দেখাতে চাইলেন; কেউ কেউ নিরাশ হলেন, অন্যের মধ্যে সে নৈরাশ্য ছড়িয়ে দিলেন; কেউ কেউ সংশয়লোকে আস্থা রাখলেন, অন্যকেও সংশয়িত করে তুললেন। এগুলো এলো তাদের সৃষ্টির মধ্যে আর জন্ম নিল নানা তত্ত্ব। পাশ্চাত্যে এই তত্ত্বের আধার বেশি পাওয়া গেল। মূলত নানামুখী চিন্তা ও এর প্রকাশ থেকেই এসব তত্ত্বের জন্ম। সমালোচনা বা তত্ত্বভিত্তিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার ইতিহাসে প্রথমেই গ্রিক পণ্ডিত প্লেটো আর এরিস্টটলের নাম করতে হয়। প্লেটো তাঁর 'দা রিপাবলিক' গ্রন্থে কাব্যকলার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করেছেন নিজের মতো করে এবং বলেছেন, কাব্যসৃষ্টি পাগলের কাজ। এই মতের বিরোধিতা করেন তাঁরই শিষ্য এরিস্টটল। রোমান তাত্ত্বিক হোরেস ও লংগিনাসও তত্ত্বের জগতে প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরা প্লেটো ও এরিস্টটলেরও আগে। এরপর জন ড্রাইডেন, এডমন্ড বার্ক, স্তেফান মালার্মে, এমিল জোলা, বেনেদেত্তো ক্রোচের হাত ধরে শিল্পসাহিত্যের তাত্ত্বিক বিশ্ব প্রসারিত হয়েছে। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তত্ত্ব নির্ভর সাহিত্যচর্চা করেছেন। তবে অধিকাংশের কাজের শাসনের 'চাবুক অনুপস্থিত। তাঁদের কর্মকাণ্ড থেকে তাঁদের অবিচল স্পষ্ট হয়। তাঁদের কারো কারো লোকবিশ্বাস বা লোক ঐতিহ্যের অনুসারীরা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি করেছেন।

আধুনিককালে, বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নিত্য নতুন ধারণা, জ্ঞান বৈচিত্র্য, জ্ঞানের শাখা, জ্ঞানকাণ্ডে কুলীন, নোংরা দুর্গন্ধ, বিশেষ দৃষ্টিকোণ, এডওয়ার্ড সাইদ বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির মর্যাদা পেয়েছেন। গৌতম ভদ্র, সুকান্ত চক্রবর্তী স্পিভাক, তাপসীদের ইরীগারে প্রমুখ বাঙালিও এ বিষয়ে নিজের নাম লিখিয়েছেন।

প্র : ক্লাসিসিজম (Classicism) কী?

উ : ইংরেজি Classic শব্দের অর্থ ধ্রুপদ। এই পরিভাষাটি বাংলায় প্রথম ব্যবহার করেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সে সূত্রেই Classical অর্থ ধ্রুপদী আর Classicism ধ্রুপদবাদ। সাধারণভাবে শব্দটি দ্বারা প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ রচনার প্রধানসমূহ ও বিষয়বস্তু প্রভৃতির কথা বোঝানো হয়, যার আবেদন রয়েছে সর্বপ্রতিষ্ঠালেও। তবে এই অবিধা ভিন্ন ভিন্ন অর্থও ধারণ করে। টি.এস এলিয়টের মতে, 'ক্লাসিক হলো সাহিত্যের সু-পরিণত ও পরিশুদ্ধতা, যা সভ্যতার সুপরিণত পর্যায়ের মননশীল ধারণা থেকে উদ্ভূত।' যে সাহিত্য কালজয়ী, যে সাহিত্য সংযত ভাষায় ও সুসংহত চিন্তার সম্ভ্রম ও ঔজ্জ্বল্যে রচিত, তার রীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করার প্রবণতাই ক্ল্যাসিসিজম। ক্লাসিকাল তকমা কোনো বিশেষ যুগ বা সময়পর্বের গায়ে এঁটে দেয়া বোধ হয় সঙ্গত নয়। সুচারু নির্মিত, সুসংগঠিত, সুদৃঢ় সংহতি এবং খণ্ড ও সমগ্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ক্লাসিক বা ধ্রুপদ সাহিত্যের মৌল

বৈশিষ্ট্য। বস্তুনিষ্ঠ রচিত সাহিত্যে মানুষেরা 'বামন', দেহবাদ রচিত 'মহামানব', হেগেল রচিত 'ইতিহাস' ও 'ট্রাজেডি', সোফোক্লিস রচিত 'ইডিপাস' প্রভৃতি সর্বাংশের উদাহরণ দিলেন। আবার সঙ্গীত, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্যেও ক্লাসিক ধারণা রয়েছে। মোটকথা, ক্লাসিক একটি ধারণামাত্র, যে ধারণার ফলে বিশ্বের সমস্ত কালোত্তীর্ণ সৃষ্টিগুলোকে সমান ভাগিতে ভাগ করা হয়। ইউরোপের গ্রিক ও রোমান শিল্প-সাহিত্যে ও ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরিস্টটলের ভাষায়, "There are elements which can together in a concord of equilibrium and such concord such a health is classicism." মোট কথা, শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতিতে আবদ্ধ উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যকে ক্লাসিক বৈশিষ্ট্য বলে। যে তাত্ত্বিক প্রণোদনায় এই বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা, পর্যালোচনা বা সমালোচনা করা হয় তাকেই বলে Classicism বা ক্লাসিকবাদ।

প্র : নব্য-ক্লাসিকবাদ (Neo-classism) কী?

উ : নিওক্লাসিক যুগ হচ্ছে ১৬৬০ সালের রেস্টোরেশনের সময় থেকে প্রায় একশ চল্লিশ বছর। বিগত যুগের সাহিত্যরীতি বিশেষত ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সমূহের পুনরুজ্জীবন ঘটানোই এই সাহিত্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল। নিওক্লাসিক লেখকরা তাঁদের কালের দার্শনিকদের মতোই মানুষকে দেখেছেন সীমিত সাধ্য ও সম্ভাবনার প্রাণীরূপে। এ যুগের অনেক রচনায়, বাস্তবমুখী এবং উপদেশনুখী আকর্ষণের বিষয় হচ্ছে মানুষের অহমিকা, মাত্রাতিরিক্ত মানুষকে তাই সীমারেখা মেনে চলতে হবে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যকর্মে। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম তাঁরা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। যেমন কবিতার ক্ষেত্রে Closed couplet. ইংরেজি সাহিত্যে ড্রাইডেন, আলেকজান্ডার পোপ, জনসন সুইফট এবং ফরাসি সাহিত্যে নাট্যকার কর্নেই ও রাসিনের রচনাকে নব্য ক্লাসিকবাদী আন্দোলনের অঙ্গ বলা হয়। ইংরেজ কবি-সমালোচক বোয়ালো (Boileau) ১৬৭৪ সালে তাঁর 'এপোস্টিক' গ্রন্থে নব্য ক্লাসিকবাদী তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

প্র : রোমান্টিসিজম (Romanticism) কী?

উ : 'রোমান্টিক' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'আজগুবী' কথাটি অনেকে ব্যবহার করলেও আমাদের বিবেচনায় এ ধরনের শব্দ দুয়ে শব্দের বাহুল্যকে প্রশ্রয় দেয়। 'রোমান্টিক' শব্দের যে প্রতিশব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন তাতে মূলশব্দের 'রোমান্টিকতা' নষ্ট হয়। যুক্তিবাদী দর্শন, বস্তুতান্ত্রিক চাহিদা ও নব্য-ক্লাসিক সাহিত্যাদর্শে আবদ্ধ ও অতিরিক্ত কঠোর নিয়মানুগত্যের বিরুদ্ধে একটি বিকল্প নন্দনতাত্ত্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত। রোমান্টিক কল্পনা মানব-চিন্তাকে আন্দোলিত, উদ্বেলিত, উদ্বোধিত ও সমৃদ্ধ করে তোলে। কেননা, রোমান্টিক সৃষ্টি অসীমের সন্ধানী, রহস্যের অনুসারী, অতীতের পূজারী, ভবিষ্যতের অভিসারী, অঘটনঘটনপটীয়সী, অশান্ত, বিদ্রোহী, ভাবাবেগমুক্ত ও রহস্যবিহার। Herford-এর ভাষায়, 'An extraordinary development of imagination Sensibility.' রোমান্টিকতার স্বরূপ নির্ণয়ে এত বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে যে, জেরোম হ্যামিলটন বাকলের- 'The Victorin Temper' গ্রন্থের 'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable' কথাটিই ঠিক। ওয়ালটার পেটার বলেন, 'রোমান্টিকতা হলো সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহলবোধের সংযোগ।'- The addition of strangeness of beauty. কোলরিজের 'Kubla Khan' বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিসিজম মুখ্য।

প্র : পরাবাস্তববাদ (Surrealism) কী?

উ : সুররিয়েলিজম বা সারর্রিয়েলিজম শব্দটির প্রথম প্রবক্তা- গুরাসাম্বুবন্ধ গুরুসি ছবি বিষয়ক ম্যানিফেস্টোতে ১৯১৭ সালে প্রথম সুররিয়েলিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। সাঁইত্রা ও শিল্পকলার স্বপ্ন ও কর্ম বাস্তবতার অনুকরণ হলেও সুররিয়েলিস্ট শিল্পীগণ। ইলাসী অস্থির, অসমঞ্জস্য, আন্তর্জাতিক-তার ইত্যাদি বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান একটা সাধারণ ও জনপ্রিয় ধারণা থাকলে মতোই প্রতিষ্ঠাতার মাধ্যমে মনস্তত্ত্বকে প্রতিফলিত করতে চাইলেন সুররিয়েলিস্ট কবি ও শিল্পীরা। স্বপ্নের মতোই একটি প্রতীক বা ছবি চলচ্চিত্রে পরিণত নিয়ে অন্য একটিকে, অনুভব ও চিন্তার বৈপরীত্যে বোঝা অর্থনাশতা। Replacement ও ambiguity হলো পরাবাস্তবতার কুশলতম। সিগমন্ড ফ্রয়েডের স্বপ্ন-তত্ত্ব ছিল পরাবাস্তবতার মূলাধার। পরাবাস্তববাদীরা বলেছেন যে, জাগ্রত ও প্রচলিত চিন্তা যখন শিথিল হয়, তখনই মগ্ন চৈতন্য থেকে আমাদের অন্তরের শিশু ও পাগল জেগে ওঠে মনের রাজ্যে আধিপত্য করে। স্বপ্ন, যৌন ইচ্ছা প্রভৃতির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে অনুধাবন করাও সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের বিশেষ প্রবণতা। জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে পরাবাস্তবতার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

"আমরা যাইনি মরে আজো- তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে;
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন- এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে। –
'ঘোড়া'

প্র : মিস্টিসিজম (Mysticism) বা মরমিয়াবাদ কী?

উ : মিস্টিসিজম কোনো বিশেষ আন্দোলন নয়, এ এক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রবণতা যা পৃথিবীর। এর শব্দার্থ গোপন বা অদৃশ্যের বহস্যোদ্ঘাটন করা, যাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবলমাত্র অনুভূতি দিয়ে যা উপলব্ধি করা যায়, তাকেই বলা হয় মরমিয়াবাদ। অধ্যাপক বলা যায় : যে অদৃশ্য সৃষ্টির সাহায্যে কবি ইন্দ্রিয় বহির্ভূত বিষয়কে ব্যক্ত করে- এমনভাবে পরে আমরা লাভ করতে পারি, তাকেই বলে রোমান্টিক। সাধারণত আমরা মিস্টিসিজমের মাঝে অতিরিক্ত করতে পারি। Oxford অভিধানে এই মিস্টিসিজম এর সন্ধান পাওয়া যায়, One who believes in spiritual apprehension of truths beyond understanding demanding. ইংরেজ কবি ব্লেকের ভাষায়-

'হৃদয় আমি নেব কেমনে যেন খুলি
ভাল আমি দেখা করিতে কোনোকালি'

কিংবা,

'বৃষ্টি যেন স্বপ্নে চাল কথা কবিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি।'

বিহারীলাল চক্রবর্তীকে পরম নিশ্চিত কবি বলা যেতে পারে। অক্ষয়কুমার ইন্দিরাদেবীর 'খেয়ালি', 'ভাল স্বপ্ন, স্বপ্নের ভাল' গ্রন্থগুলোর বেশ কিছু লেখক গদ্যে মরমিয়াবাদ লক্ষণীয়। উত্তর ভারতে রামানন্দ, তুলসীদাস, নানক, কবির ও দাদু, পশ্চিমে তুকারাম ও মারাঠী ভক্ত সম্প্রদায়, দক্ষিণাঞ্চলে শৈবসম্প্রদায় এবং বাংলায় মরমিয়া সাধক গোষ্ঠী মিস্টিসিজমের উপলব্ধি চিরন্তনীয় করে রেখে গেছেন।

প্র : দাদাবাদ বা দাদাইজম (Dadaism) কী?

উ : ডাডা ফরাসি শব্দ যার অর্থ কাঠের ঘোড়া। এই শব্দটিকে বেছে নিয়েছিলেন একদল কবি ও শিল্পী যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও বিনাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত, প্রথা, রীতি, বক্তব্য-সব কিছুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আক্রমণে বিপর্যস্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন

মেঘা হলো
'এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চলে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন এর জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা
এসে।
উটের চিত্রকল্পে নিস্তব্ধতার ভয়ানকতা
আশ্চর্যরকমভাবে দৃশ্যমান হয়।

প্র : কলাকৈবল্যবাদ (Art for Art's Sake) কী?

২. ইংরেজি Art for Art's Sake এর তাত্ত্বিক

বাস্তবরূপবাদ, যার লক্ষ্য ছিল মানুষ প্রত্যক্ষচিত্রা ব্যতিরেকে প্রথম দৃষ্টিপাতে বস্তু ও জগৎকে যেভাবে দেখবে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করা। চিত্রাঙ্কনের বস্তুনুগতিকতা উপেক্ষা করা, রোমান্টিকতাব মূল স্বীকার্য যে শিল্প কর্তৃগত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ তাকে লক্ষ্য করে, প্রাকৃতিক দৃশ্যপট ও ব্যক্তিত্বের পারিপার্শ্বিকতা এবং বিশেষ করে রং ও আলোর যথার্থ ব্যবহার ছিল ভাবপ্রেক্ষণবাদের উদ্দেশ্য। ১৮৭৪ সালে ফরাসি চিত্রশিল্পী ক্লে. মেনের ছবি 'ইম্প্রেসি ওঁসলেইল লর্ডো'র আলোচনায় সম্ভবত ইম্প্রেশন শব্দটা সর্বপ্রথম উদ্ধৃত হয়। আধুনিক উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে কোনো চরিত্রের অন্তর্জীবনকে চিত্রায়নকেই ইম্প্রেশনিজম-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশসহ ত্রিশোত্তর ও তৎপরবর্তী যুগের কবিদের অনেকের রচনায় ভাবপ্রেক্ষণরীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নমুনা থেকে বিষয়টি বুঝে নেয়া যাক :

'তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়-
মাঠের ভিতরে।'

– 'কুড়ি বছর পরে', জীবনানন্দ দাশ

এই 'হলুদ' বর্ণটি ইম্প্রেশনিস্ট। অপরাহ্নের আলোয় নদীর রং এখন নরম ও হলুদ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পরে তার রূপ বদলে যাবে।

প্র : জাদু বাস্তববাদ (Magic Realism) কী?

উ : বাস্তব ঘটনা নয় কিংবা বাস্তবে আদৌ সম্ভব নয়, বরং অভিনব বর্ণনা, উপস্থাপনা, চরিত্র সৃজন ও রসপরিণতি সম্বলিত উপন্যাসে কোনো অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাসের মতো করে প্রকাশ করাকে জাদু বাস্তববাদ বা Magic Realism বলে। এ জাতীয় রচনা অর্বাচীনকালের সৃষ্টি। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জার্মান ঔপন্যাসিকদের হাতে এই ধারার প্রবর্তন ঘটে। আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকেজ এবং কারপেনতিয়ের প্রমুখ তাঁদের উপন্যাসে জাদু বাস্তববাদ প্রয়োগ করেছেন। সাহিত্যে জাদু বাস্তববাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : ১. কাহিনি পরিকল্পনায় জটিলতা সৃষ্টি;

২. বাস্তববাদ ও অলৌকিকের সহাবস্থান ঘটানো;

৩. সময়ের অদ্ভুত বিন্যাস ও সামুজ্য রক্ষা;

৪. স্বপ্ন ও মিথ-এর ব্যবহার;

৫. পরাবাস্তববাদী বর্ণনা;

৬. ব্যাখ্যাতীত বিষয়ের অবতারণা।

প্রকৃতপক্ষে, প্রচলিত বাস্তববাদের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতাই জাদু বাস্তববাদের মূল উপজীব্য। জাদু বাস্তববাদ বা Magic Realism শব্দটা জার্মান ঔপন্যাসিক Franz Roh (ফ্রানৎস রহ)-ই ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম তাঁর লেখা একটা বইয়ের শিরোনামে প্রয়োগ করেছিলেন।

প্র : ফবিজম (Fauvism) কী?

উ : বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় (১৯০৬) প্যারিসে গড়ে ওঠা এক প্রকার আর্ট, বিশেষত চিত্রশিল্প-আন্দোলন। নিউ ইম্প্রেশনিস্ট আর্টের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ফল শব্দের অর্থ 'বুনো জন্তু'। এদের কর্মকাণ্ড বা আন্দোলনকে ফবিজম বা বন্যজন্তুবাদ আখ্যায়িত করা হয়। আর এ জাতীয় শিল্পকে ফবিস্ট বলা হয়। চিত্র-শিল্পের নিয়ম-নীতিবর্জিত কিংবা বাস্তবধর্মী কলা-কৌশলের বিরুদ্ধে নকশার ছন্দে সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ ঘটানোই ছিল 'ফবিস্ট' শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য। ইমপ্রেশনিজম-এর পরবর্তী অধ্যায়ে কেতাবি শিল্পের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় প্রাণবন্ত ও বর্ণোজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনের সংস্কারমুক্ত আদিমতা নিয়ে এসেছিলেন যেসব 'ফবিস্ট' শিল্পীরা ভিরেইন, ভ্লামিঙ্ক ও মাতিস তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শিল্পে আদিমতা ফিরে আনার জন্য আফ্রিকান জানিয়েছিলেন পণ্যা এবং তাঁরই উত্তরে এসেছিলেন একদল শিল্পী নিজস্ব সাহস্য ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে। অকৃত্রিম হাতের সরল-স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে নিজেদের আবেগময় অভিঘাতকে তাঁরা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। ফবিস্ট শিল্পীদের মাঝে সবচাইতে কীর্তিমান ঔরি মাতিস। উজ্জ্বল রংকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন আবেগ ও প্রতীকের অবদান ব্যক্ত করার কাজে। মূলত বাস্তববাদী কলাকৌশলের বিরুদ্ধে বন্ধিম নকশার ছন্দে সৌন্দর্যানুভূতি সঞ্চার করাই ছিল মাতিসের লক্ষ্য। স্পষ্টতা ও প্রাবল্য, রং ও নকশার জৌলুস দিয়ে প্রচলিত বর্ণনাত্মক ধারার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ফবিজমে। নিয়মনীতি ভঙ্গকারী, এই অর্থে মাতিস ও অপরাপর চিত্রশিল্পীদের ফবিস্ট বলা হলো। দীপ্তি ত্রিপাঠী, জীবনানন্দের এই পঙক্তি ফবিজমের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন :

'হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে'। (–'দুজন')

এখানে 'হলুদ' বর্ণটি ফবিস্ট। হলুদ কঠিন ঠ্যাং বাক্যাংশের মধ্যেই আছে একটি কর্কশ ভাব– এ লক্ষণ ফবিস্টদের।

প্র : ন্যাচারালিজম (Naturalism) কী?

উ : বাস্তবধর্মী রচনা ও সমালোচনার ধারা হলো ন্যাচারালিজম। এর আক্ষরিক অর্থ যথাস্থিতবাদ। যদিও শব্দটা বাংলা ব্যবহৃত না হয়ে ন্যাচারালিজম পারিভাষিক শব্দ হিসেবে প্রচলিত। এটা বাস্তবধর্মিতার সমার্থক তবু বাস্তববাদের সাথে এর সূক্ষ্ম-পার্থক্য বিদ্যমান। এ জাতীয় বিষয় একদিকে যেমন– সাহিত্যের, বিশেষত গল্প-নাটক-উপন্যাসের কাহিনি সংস্থাপনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে, তেমনি সমালোচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ধারা হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। ফরাসি ঔপন্যাসিক গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম উপন্যাসে সাহিত্যে ন্যাচারালিজম আন্দোলনের সূচনা করেন। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু প্রমুখ নাম্বারলিস্ট কথাসাহিত্যিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সামাজিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি-বিপর্যয় ও পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলার সূক্ষ্ম রূপায়ণের পাশাপাশি যৌনজীবনের নানা দিক এ জাতীয় রচনায় ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত।

প্র : বাস্তববাদ (Realism) কী?

উ : জগৎ, জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তবনিষ্ঠ ও যথাযথরূপে চিত্রিত করাই বাস্তববাদ। রোমান্টিক ভাবকল্পনা, আদর্শবাদ, দূরগামী ও অতিলৌকিক বিস্ময় ও রহস্য ইত্যাদির পরিবর্তে বস্তুজগতের বহিরঙ্গের নিখুঁত ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কনই বাস্তববাদী লেখক-শিল্পীদের অভিপ্রায়। বৃহত্তর অর্থে বাস্তববাদী বলতে বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন ভাষার অনেক লেখককেই চিহ্নিত করা যায়, যেমন- চতুর্দশ শতকের ইংরেজ কবি চসার, যাঁর- The canterbury Tales সমাজবাস্তবতার এক অসামান্য উদাহরণ। কিংবা রবিনসন ক্রুশোর অভিযান কাহিনির রচয়িতা ড্যানিয়েল ডেফো। ১৮৫০-এর দশকে ফ্রান্সে 'রিয়ালিজম' শব্দটি প্রথম সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় জীবনের রূঢ় ও কঠিন বাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্রণ বোঝাতে। বালজাককে এই বাস্তববাদের মুখ্য প্রবর্তক বলে চিহ্নিত করা হয় তাঁর চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, পরিপ্রেক্ষিত ও পরিবেশ রচনায় নিখুঁত পারিপাট্য, পর্যবেক্ষণ ও চিত্রণে বিশ্বাসযোগ্যতা, অনুপুঙ্খের ব্যবহার জীবনধর্মিতা ইত্যাদির কারণে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবতাকে গভীর আগ্রহে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলাই ছিল বাস্তববাদীদের কাজ। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখায় বাস্তববাদের দৃষ্টান্ত মেলে।

প্র : পদ্যছন্দের (Language) কী?

উ : পদ্যছন্দের পদ্যরা ধারার একটা সাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবক্তা স্পেনীয় কবি দুই ১৯ পদ্যরাই আন্দোলনের হোল খরকে কবি দুই পদ্যরাই পদ্যরা কাব্যজগতে এক ধরনের ঝড়ে, উল্টে কবিতা রচনার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এতে ভাষা, ভঙ্গীর ও দুরূহ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে এক ধরনের অদ্ভুত, উদ্ভট, ও চটকদার কবিতা রচনা করেন, যাতে বক্তব্য-বাহুল্য, কৃত্রিমতা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ ঘটে। এ জাতীয় কবিতায় মেটাফিজিক্যাল পর্যবেক্ষণ শক্তিশালী আকারে ফুটে উঠে। তবে এ ধরনের কবিতা কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি বলে সমসাময়িককালে কিছুটা হুজুগ সৃষ্টি করে আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া কতিপয় প্রধান কবি ছাড়া শক্তিশালী কোনো কবি এই রীতি অবলম্বন না করায় তা অচিরেই বিলোপ ঘটে। টমাস গ্রাভনিং ও রিচার্ড ক্রাশের রচনায় এর কিছুটা প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে এর তেমন কোনো প্রভাব নেই।

প্র : সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা (Socialistic Realism) কী?

উ : আধুনিকতাবাদী বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যের নানা 'উৎকেন্দ্রিকতা ও বিচ্যুতির' বিরুদ্ধে শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিরঙ্কুশ গুরুত্ব দিতে ১৯৩৪-এ সোভিয়েত রাশিয়ায় যে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র তত্ত্ব গৃহীত হয়েছিল তার আদর্শ প্রতিনিধি লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি। উনিশ শতকে প্রবর্তিত বাস্তববাদের শিল্প-প্রকরণসমূহকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবী আন্দোলনের পুষ্টি ও প্রসারে সচেতনভাবে প্রয়োগ করাই ছিল 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র সারকথা। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সার্থক্যা বলে মনে করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যতত্ত্ব নিছক বাস্তবতার অনুকৃতি, পাপবোধ ও পাশবিকতার যথাস্থিত চিত্রণ নয়, শিল্পের জন্য শিল্প বা এই জাতীয় কলাকৈবল্যবাদ শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যমূলক, সমাজবাদ আদর্শ ও দৃষ্টিকোণ।

ডুমোনিয়, গোগল, চেকভ প্রমুখ লেখকও গোর্কির মতো এই শ্রেণিভুক্ত। গোর্কির সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল মানুষ, অসংখ্য দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে লেখককে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত হতে হবে শ্রমের সঙ্গে, জাগিয়ে তুলতে হবে সমষ্টিগত দায়িত্বের চেতনা। মানুষের জন্যই শিল্প, জীবনের জন্যই শিল্প। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী' উপন্যাস বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাতত্ত্বের দৃষ্টান্ত।

প্র : বাক্প্রতিমা (Imagery) কী?

উ : শব্দটি আধুনিক সমালোচনার ক্ষেত্রে অতিপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ নিয়ে অস্পষ্টতা আছে। সবার কাছে এর মানে এক নয়। একজন পাঠকের মনে একটি কবিতা পড়ার পর যেসব উপাদান মিলে গোটা কবিতাটি যে ভাব তৈরি করে তার সমগ্রতাকেও অনেকে ওই শব্দে অভিহিত করেন। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্প্রতিমাকে তিনভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যেতে পারে :

১. প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়-বেদ্য, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী;
২. মানব-গ্রাহ্য, অনুভব-সংবেদ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, বাঞ্জনাশ্রয়ী;
৩. ইন্দ্রিয়-নির্ভর অথচ মনোগ্রাহী, রূপাশ্রয়ী অথচ অনুভব সংবেদ্য।

সি. ডে. লিউইস তাঁর 'পোয়েটিক ইমেজ' (১৯৪৮) গ্রন্থে বলেছেন—

'A picture made out of words' আর 'a poem may itself be an image composed from a multiplicity of images.'

তিনি দেখিয়েছেন যে, শেক্সপিয়ারের নাটকে মাঝে মাঝেই এক জাতীয় একগুচ্ছ চিত্রকল্প (Image clusters) পরিলক্ষিত হয়। (যেমন 'কিং লিয়ার' নাটকে জীবজন্তুর চিত্রকল্প, 'হ্যামলেটে'

রোগ, অবক্ষয়, পচন ও মৃত্যুর চিত্রের। যার ফলে গোটা নাটক এক বিশেষ দুঃখ ও আবহ অর্জন করে। আরও উদাহরণ

• 'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না'। (মানসমায়া)। — রবীন্দ্রনাথ

• 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা আসে'। (রূপকথা)।

— জীবনানন্দ

প্র : কিউবিজম (Cubism) কী?

উ : ১৯০৭ থেকে ১৯১৪-র মধ্যে ফরাসি চিত্রকর জর্জ ব্রাক ও পারিসে আগত স্পেনীয় শিল্পী পাবলো পিকাসো এক নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ করেন যা কিউবিজম বা আকৃতিবিন্যাসবাদ নামে খ্যাত। বাইরের জড়ত্ব থেকে চিত্রের আত্মিক রূপ প্রকাশই এ জাতীয় চিত্রকর্মের মূল উদ্দেশ্য। শিল্পীর তুলিতে চিত্রের বাহ্যিক রূপটা ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে অন্তরিহিত রূপের প্রকাশ ঘটানোই এর উদ্দেশ্য। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুভূত শিল্পীর সূক্ষ্ম কল্পনা প্রসূত টুকরো টুকরো চিত্রের সমাবেশে একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে তোলাই এ জাতীয় চিত্রের বৈশিষ্ট্য। চিত্রের জড়ত্ব মুক্তিদানই এই চিত্রশিল্পীদের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ। এদেরকে 'কিউবিস্ট' শিল্পী অভিহিত করা হয়। পিকাসোর মতো শক্তিমান মহান শিল্পীর হাতে কিউবিজম রীতি চিত্রকলার ক্ষেত্রে বিশেষ মাত্রা ও স্থায়ী রূপকল্প সৃষ্টির সহায়ক হয়।

প্র : অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism) কী?

উ : সাহিত্যে ও চিত্রকলায় বাহ্যিক জীবনের চেয়ে অভ্যন্তরীণ জীবনের মর্মোদঘাটন-ই হলো অভিব্যক্তিবাদ। একটি সুসংহত আন্দোলন না হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগেই জার্মানিতে অভিব্যক্তিবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল। মঞ্চসজ্জা, প্লটের গঠন, চরিত্র-চিত্রণ ও সংলাপ রচনায় ধ্বনির প্রয়োগ ও আলোক সম্পাতের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিব্যক্তিবাদী নাট্যকারেরা বাস্তবতন্ত্রী ও প্রকৃতিবাদী ভাবনা ও কৌশলের

প্র : আবসার্ড বা উদ্ভট তত্ত্ব (Absurdism) কী?

উ : আবসার্ড অর্থাৎ উদ্ভট বা অদ্ভুত বা অর্থহীন। অনেকে বলেন এটি 'কিমিতিবাদী' তত্ত্ব। কিমিতি অর্থ 'তো কী হলো'। এই শব্দটি ও তার সংশ্লিষ্ট ভাবনা প্রথম এসেছে আলবেয়ার কামুর 'The Myth of Sisyphus' (১৯৪২) গ্রন্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপে সর্বনাশা সামাজিক, রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষ যখন হারিয়ে ফেলেছিল তার যাবতীয় বিশ্বাস, একনিষ্ঠতার বোধ ও ভয় যখন তাকে করেছিল অস্থির, তখনই অর্থহীনতার এই বোধ জন্মিয়ে বসে। সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের মধ্যে হতাশ ও বিচ্ছিন্ন মানুষ হারিয়ে ফেলে যুক্তি পরম্পরার শৃঙ্খলা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কৌশলে যান্ত্রিকতার উন্নতি মানুষের জীবনের বহিরঙ্গ যতই চাকচিক্য করুক না কেন, অন্তিত্বগত নানা প্রশ্ন ও সমস্যা অসমাধেয় বলে প্রতিপন্ন হয় তার কাছে। জীবনকে মনে হয় উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থহীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-সাহিত্যেও স্বকালগ্রস্ত

...ধর্ম। জীবন যেখানে অর্থহীন, শিল্প-সাহিত্যও সেখানে অর্থহীন। মূলত ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস, অর্থহীন জীবন পরিকল্পনার বোধ থেকেই এই অন্তের উদ্ভব। আলবেয়ার কামুর বক্তব্য স্মরণ করে বলা যায় : "Absurd originally means 'Out of harmony', in a musical context." অসঙ্গতি বলছে। এটি 'Out of harmony with reason or propriety, incongruous, unreasonable, illogical' জীবনের সংগীতময়তা যেখানে ক্ষুণ্ন, সেখানেই অ্যাবসার্ডবাদের জন্ম। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবসার্ডে শুরু যেখানে, শেষও সেখানে। নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপের কোনো পারম্পর্য থাকে না। কাম্যু, বেকেট, পিন্টার, আয়োনেস্কো প্রমুখের নাটকে এই অ্যাবসার্ডিটি চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল। নাটকে অ্যাবসার্ডিটি তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছিলেন স্যামুয়েল বেকেট তাঁর 'Waiting for Godot' নাটকে। বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'তরঙ্গ-ভঙ্গ', সাঈদ আহমদ 'কালবেলা', 'মাইল পোস্ট', 'তৃষ্ণা' নাটকে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

প্র : অবক্ষয়বাদ (Decadentism) কী?

উ : সাধারণত মূল্যবোধের ক্রমাবনতি ও অভাবই 'অবক্ষয়' শব্দের সমার্থক। সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কিংবা এ থেকে উত্তরণের চিত্র প্রতিফলিত হওয়া এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করাকে অবক্ষয়বাদ বলা হয়। শিল্প-সাহিত্যে নানান যুগে কোনো না কোনো ভাবে এর প্রতিফলন ঘটেই। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে লোভ, হিংসা, লালসা, অর্থনৈতিক মন্দা, শোষণ, বঞ্চনা, শ্রেণিসংগ্রাম, হত্যা, শঠতা, ধর্মহীনতা, ধর্মান্ধতা সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী চিরায়ত মূল্যবোধের যে ওলটপালট বিপর্যয় সংঘটিত হতে থাকে তা থেকেই বিশ শতকের প্রথম দশকের শেষ পর্যায় থেকে শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিষয় নানা বাঁধতে শুরু করে। বিশ্বসাহিত্যে টি. এস. এলিয়ট, জেমস পাইক, ইয়েটস, মালার্মে প্রমুখ কবির কবিতায় অবক্ষয়ের নানা রূপ প্রতিফলিত হতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ প্রমুখের রচনায় অল্প-বিস্তর অবক্ষয়ের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়।

প্র : অস্তিত্ববাদ (Existentialism) কী?

উ : অস্তিত্বের সংগ্রাম থেকেই অস্তিত্ববাদ বা অস্তিত্ববাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। জার্মান রোমান্টিসিজমের ভেতরে ছিল এর বীজ এবং আধুনিককালে জার্মান এডমুন্ড হুসার্লের মানস ঘটনাবাদ থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে। সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের রচনার মধ্যে অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রথম উন্মেষ ঘটেছে বলে ধরা হয়। বিংশ শতাব্দীতে আলবেয়ার কামু, জাঁপল সার্ত্রে প্রমুখ লেখক তাঁদের সাহিত্যকর্মে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে বিশেষভাবে সাবধান করেন। এ দর্শনের মূল কথা হচ্ছে, ব্যক্তিরূপে মানুষের বিশেষ মূল্য আছে এবং নিজের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তির স্বাধীন ক্ষমতা ও দায়িত্ব আছে। মানুষ অচেতন বস্তুসমূহের মতো কতকগুলি দৈবী বা প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় না, সে স্বাধীন এবং আপন কর্মের মধ্য দিয়েই তার সারধর্ম গড়ে তোলে। শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছবার লক্ষ্যে নিজের অবস্থার উন্নয়নে মানুষকে তাই পরিবেশকে ছাড়িয়ে যাবার সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। এই সংগ্রামই অস্তিত্ববাদী সংগ্রাম বলে বিবেচিত। এ থেকে দুটো ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

১. মানবিকসত্তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা;

২. সত্তা জিজ্ঞাসায় বহিরঙ্গের পরিবর্তে অন্তরঙ্গ একাত্মতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার।

অস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণ ভাগ্যের হাতে জীবনকে সঁপে দেয়ার বিরোধী বরং তাঁদের মত হলো- সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলার মাধ্যমে মানব-অস্তিত্ব নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। ভাগ্যের হাতে অসহায় আত্মসমর্পণকে তাঁরা প্রশ্রয়হীনতা বিবেচনা করেছেন। তাঁরা ছিলেন মূলত আদর্শবাদী দর্শনের বিপক্ষীতে। বিশ্বসাহিত্যে দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'দ্য ইডিয়ট', 'আলবেয়ার কামুর 'দ্য প্লেগ', 'দ্য আউট সাইডার'; বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো' সার্থক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস।

প্র : নবজাগরণ (Renaissance) কী?

উ : নবজাগরণ বা Renaissance একটি ইউরোপীয় ধারণা। মধ্যযুগে নানাবিধ কুসংস্কার ধর্মের নামে অমানবিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির বিরুদ্ধে জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অক্ষুণ্ন রাখার যে প্রচেষ্টা তাকেই অভিহিত করা হয় Renaissance বা নবজাগরণ বলে। 'রেনেশাঁস' ফরাসি শব্দ। ইংরেজিতে লেখা হয় Renaissance। ইতালি ভাষায় লেখে Rinascita এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'পুনর্জন্ম'। তবে বাংলায় একে 'নবজাগরণ'ও বলা হয়ে থাকে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতালিতে এই নবজাগরণের শুরু। এরপর প্রায় দুশো বছর ধরে সমগ্র ইউরোপের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্যসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা ঐশ্বর্যময় সৃজনশীলতার জোয়ার দেখা দেয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ শৈল্পিক ও বৌদ্ধিক শক্তির উন্মেষ, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের পরিধির ব্যাপ্তি, ব্যক্তিবাদের সূচনা প্রভৃতি নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার, দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও নব-রূপায়ণ, বাংলা গদ্যের প্রচলন, ধর্মীয়-সংস্কার মুক্তি ও মুক্ত মনোভাবের প্রকাশই ছিল এই বাংলার নবজাগরণ বা রেনেশাঁসের মূল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। মূলত উনিশ শতক ছিল বাংলার রেনেশাঁসকাল।

প্র : সনেটকবিতা বা (Sonnet) কী?

উ : সনেটকবিতা বা ইতালিয়ান সনেট বলতে ...
...বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'বঙ্গ-বিয়োগ' লিখিত সনেটকবিতা। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত : 'এসেছিল নামে কেহ মৃত্যুহীন প্রাণ / মরণে তাই তুমি হতে গেলে দান।' চতুর্দশপদ ও ক্ষুদ্র গেয়-কবিতা হিসেবে বাঙালি পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়ে।

প্র : মহাকাব্য (Epic) কী?

উ : Epic বলতে বোঝায় এক সুদীর্ঘ বীরগাথা যা এক বা একাধিক নায়কের অসামান্য কীর্তির মহিমা উজ্জ্বল আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে একটি দেশ বা জাতির সমগ্র ঐতিহ্য ও আদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলে। ব্রাইডেন মহাকাব্যের সংজ্ঞার্থ নিরূপণে-

'A heroic poem which epitomises the feeling of many ages and voices the aspiration and imaginations of all people.' গ্রিক epicos বা epos থেকে Epic শব্দের উদ্ভব। মহাকাব্যের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য :

১. মহাকাব্যের আখ্যান হবে পৌরাণিক;

২. মহাকাব্যের নায়ক বীরোদাত্ত গুণসমন্বিত কোনো দেবতা বা উচ্চবংশজাত বীর বা নৃপতি;

৩. কমপক্ষে ৯টি, সর্বাধিক ৩০টি সর্গে মহাকাব্য বিভক্ত হবে। প্রতি পর্বের শেষে পরের পর্বের সূচনা থাকবে;

৪. মহাকাব্যের পটভূমি হবে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রসারী;

৩. মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ।

মহাকাব্য যুগে যুগে সর্বসাধারণের জীবন ও সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মুকুর হয়ে ওঠে। মুখে মুখে গীত ও পঠিত হয়ে, শ্রুতির পথ ধরে এই জাতীয় কাব্য বিধৃত হয় স্মৃতিতে। হোমারের 'ইলিয়ড', 'ওডেসি'; বাল্মীকিকৃত 'রামায়ণ', ব্যাসদেবের 'মহাভারত' জাত মহাকাব্যের উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার'; নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস'; কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য।

প্র : প্রহসন (Farce) কী?

উ : সামাজিক দুর্নীতি, কপটতা, অনাচারকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে মূল হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা এক ধরনের সংক্ষিপ্ত নাটককে প্রহসন বা Farce বলে। অন্য কথায় সামাজিক অপকীর্তির উদ্‌ঘাটন ও শোধনার্থে যে ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্ক নাটক তাই প্রহসন। সরস ও সজীব সংলাপ, ধারালো রঙ্গব্যঙ্গ, চটুল তামাশা, সর্বোপরি ঘটনা চরিত্রসমূহের চমকপ্রদ সংযোগে প্রহসন রচয়িতা ভণ্ডামি ও স্বেচ্ছাচারিতার মুখোশ খুলে দিতে চান।

ল্যাটিন Farsus থেকে এই Farce শব্দটির উৎপত্তি। শ্রেষ্ঠ প্রহসন হিসেবে স্মরণীয় ব্রানডন টমাস কৃত 'Charley Gunt', বাংলায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে অনেকেই প্রহসন বলেন আখ্যা দেন। এছাড়া মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু' প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত।

রম্যরচনা (Belle Letter) কী

রম্যরচনা নামটা হাল আমলের হলেও 'বেল লেটর' নামটা অনেক দিনের। ফরাসি এই অভিধায় এক ধরনের রচনাকে বোঝাতো যা সুচারু পরিমার্জিত, সুললিত গদ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনার থেকে স্বাদে-স্বভাবে আলাদা। উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় এই ধরনের হাল্কা প্রবন্ধধর্মী রচনা ইংরেজি সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। বাংলা গদ্যের জন্মলগ্ন থেকে দুটি সমান্তরাল ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। একটি পণ্ডিতী, অন্যটি ঘরেয়া। বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক-রহস্য', বাংলা রম্যরচনার অনন্য দৃষ্টান্ত। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', 'চাচা-কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র' রম্য রচনার দৃষ্টান্ত।

প্র : জীবনীসাহিত্য কী?

উ : জীবনী বা Biography বলতে সাধারণভাবে আমরা কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনবৃত্তান্তকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করা ও তার চরিত্রের বিশ্লেষণ, এই বুঝে থাকি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবনের আদ্যোপান্ত যাবতীয় ঘটনা ও তথ্য স্তূপীকৃত করলেই জীবনচরিত হয় না। লিটন স্ট্র্যাচি তাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন– 'A mase of notes and documents is no more a biography than a mountain of eggs an omelette'. ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের দৃষ্টিতে জীবনী নিছক ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস নয়– 'Biography is not only history can also be good literature'. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বাইরের ও ভেতরের সমগ্র সত্তাকে শিল্পসম্মতভাবে উদ্‌ঘাটিত করার দায়িত্ব জীবনীকারের। জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মানবাত্মার দুঃসাহসিক অভিযানের আলেখ্য নির্মাণ প্রকৃতই দুরূহ এক সৃজনীকর্ম, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ও শৈল্পিক দক্ষতার সার্থক পরিণতি ব্যতীত যা অসম্ভব। একজন জীবনীকারকে একাধারে হতে হবে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও চিত্রকর। শুধু জীবনের ঘটনাবলিই নয়, তাঁকে উদ্‌ঘাটিত করতে হবে জীবনরহস্যকেও। বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের সুষমাঘটনা নির্মাণ, ইতিহাসের শিল্পসম্মত রসায়ন ব্যতিরেকে কোনো জীবনচরিতই সার্থক হতে পারে না। জীবনচরিত যাঁকে নিয়ে লেখা হবে তাঁর জীবনের আনুপূর্বিক পরিচয় জীবনীকারকে পেতে হবে। জীবনচরিত তো সে কারণেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যসৃষ্টি।

প্র : ভ্রমণ-সাহিত্য কী?

উ : পাঠকারীর মানসভ্রমণ না হলে সার্থক ভ্রমণসাহিত্য হয় না। অর্থাৎ বইটি পাঠ করে পাঠক যেন মনে মনে ঘুরে আসতে পারেন। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের অনুসন্ধিৎসা তাকে তার পরিচিত ভৌগোলিক, সামাজিক জীবনবৃত্তের বাইরে বার বার ঠেলে দিয়েছে। কেউ পাহাড়ে, কেউ জঙ্গলে, কেউবা সাগরে বা মরুভূমিতে পাড়ি দিয়েছে। এইসব ভ্রমণ ও পর্যটন, নানা দুঃসাহসিক অভিযান ইত্যাদি থেকে জন্ম নিচ্ছে 'ভ্রমণ সাহিত্যে'র নানা স্বাদের লেখা। ভ্রমণ বৃত্তান্ত যিনি সাহিত্যমূল্যে মূল্যবান করতে চান তাকে এক নিরপেক্ষ ও সহৃদয় মানসিকতা নিয়ে স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রীদের দেখতে হয়। বাংলায় এ ভ্রমণ কাহিনির প্রথম ও বিশেষ দৃষ্টান্ত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং পরে অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেকেই এই শাখাটিকে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি', নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্র', জলধর সেনের 'হিমালয়' প্রভৃতি বাংলায় লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা কাহিনির জনপ্রিয় কয়েকটি উদাহরণ।

প্র : ব্যঙ্গরচনা (Satire) কী?

উ : যে রচনা আলোচ্য বিষয়কে লঘু ও তুচ্ছ করে তার প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা, ক্রোধ বা কৌতুকের মনোভাব জাগিয়ে তোলে তাকে 'স্যাটায়ার' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কমিক রচনা থেকে এর পার্থক্য এখানে যে কমিক রচনায় নিছক হাস্যরসই প্রধান, তার পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু স্যাটায়ার হাস্যরসকে ব্যবহার করে অস্ত্রের মতো, তার উদ্দেশ্য-পরিহাসাত্মক চুরি চালিয়ে কোনো অন্যায়, অবিচার বা অসঙ্গতিকে আক্রমণ করা। এই আক্রমণের পাত্র কোনো বিশেষ ব্যক্তি হতে পারেন, একটি বিশেষ ধরনের টাইপের মানুষ কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা জাতি হতে পারে। এমনকি সমগ্র মানবজাতিও হতে পারে। যেমন জোনাথন সুইফটের 'গ্যালিভারের সফরনামা'। কমিক এবং স্যাটায়ারের মাঝে পার্থক্য সর্বদা খুব তীক্ষ্ণ নয়। জনসন তাঁর 'ভলপোনি' নাটকে স্পষ্টতই এক শ্রেণির ধূর্ত অর্থগৃধ্নু মানুষকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। ব্যঙ্গরচনার রচয়িতাগণ 'স্যাটায়ার'কে বিবেচনা করেছেন মানুষের নির্বুদ্ধিতা ও অন্যায় আচার-আচরণের সংশোধক রূপে। অষ্টাদশ শতককেই ইংরেজি ব্যঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলে অভিহিত করা হয়। বাংলা ভাষায় প্রমথ চৌধুরী হলেন সার্থক স্যাটায়ার গদ্য রচয়িতা। তাঁর রচিত 'ভাষা মানুষের মুখ থেকেই কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখ শুধু কালিই পড়ে।'– স্যাটায়ারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্র : উত্তর-আধুনিকতাবাদ বা Postmodernism কী?

উ : উত্তর-আধুনিকবাদ মতটি সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, স্থাপত্য, সমালোচনার ক্ষেত্রে Deconstruction ও Post-structuralism-এর সঙ্গে অনেকটাই সংশ্লিষ্ট। Postmodernism শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৭০ সালে। জন ওয়াটকিনস চ্যাপম্যান ফরাসি Impressionism থেকে চিত্রকলাকে পৃথক করার জন্য প্রথম এটি

ধারার চিত্রের কথা বলেন। সাইয়েদ ওয়ের Postmodern বইটি প্রথম আসে ১৯৭২ সালে আমেরিকার 'বীকন প্রেস' (Beacon P.) প্রকাশের মাধ্যমে। ওয়েস্ট এটিন, চার্লস জেনস, টম স্টুইস বর্ষ প্রমুখ এই ধারাকে বেগবান করেন। আরব-আমেরিকার লেখক ইহাব হাসান ১৯৭১ সালে উত্তর-আধুনিক ধারায় সাহিত্য সমালোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। উত্তর-আধুনিকতার মূলকথা হচ্ছে : 'সব কিছুই বহমান ও খণ্ডিত। সত্যের কোনো বস্তুগত রূপ নেই। সমস্ত নৈতিক, সামাজিক রীতি-নীতি কৃত্রিম, বিধি বহির্ভূত অকারণ ও বাইরে থেকে চাপানো; সত্য কেবল বিশেষত ও আধারভিত্তিক।' জ্যানেট টেলেনি, আর্থিং হো, হ্যারি লেভিন, এডওয়ার্ড সাইড প্রমুখ উত্তর-আধুনিক ধারার সমর্থক। এই ধারা মূলত আধুনিকতার বিপরীতে পথসন্ধান করে এবং মধ্যযুগের মূল্যবোধে ফিরিয়ে নিতে যায়। মধ্যযুগ ব্যাখ্যায় বৈজ্ঞানিকতার বদলে অনেকে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় স্থিত হন। এখানেই উত্তর-আধুনিকতার সীমাবদ্ধতা। মূলত নৈরাশ্য থেকে এ পথে তারা সর্বসমস্যার সমাধান খোঁজেন। তখন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারাকে পাশ কাটিয়ে তারা পতিত হন ধর্মমোহে।

প্র : কারা-সাহিত্য কী?

উ : কারাগারে প্রস্তুত [illegible] সাহিত্য সাধারণত কারা-সাহিত্য হিসেবে স্বীকৃত। তবে কারাগার থেকে বাইরে গিয়েও এ ধরনের লেখা হতে পারে। সেখানে কারাগারের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সার্বিক ধারণার প্রকাশ থাকতে হবে। বর্ণনাতার জেলজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কারাগারের সংকীর্ণ জীবনের বাইরে কল্পনার বিস্তার তিনি ঘটাবেন সত্য কিন্তু কারাজীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ থাকবে তার রচনায়। অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেমন কারাসাহিত্য লিখেছেন তেমনি অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকও কারা-সাহিত্য রচনা করেছেন। চারণকবি মুকুন্দ দাস 'ছিল ধান গোলাভরা, খেত ইদুরে করল সারা' গান রচনার জন্যে ব্রিটিশদের জেলে যান; জেলে গিয়েও তিনি এই ধারার ধান দেখেন। কাজী নজরুল ইসলাম জেলে বসে লেখেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'; সত্যেন সেন লেখেন 'অভিশপ্ত নগরী' ও 'পাপের সন্তান'; মুনীর চৌধুরীর 'কবর' এগুলো কারা-সাহিত্য হিসেবে গণ্য। রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বা 'কারাগারের রোজনামচা', মতিয়া চৌধুরীর 'দেয়াল দিয়ে ঘেরা' ইত্যাদিও এই ধারার গ্রন্থ।

একথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন

অতীত সম্বন্ধীয় = সাম্প্রত
প্রতির অভিমুখে = প্রত্যক
প্রতির অগোচরে = পরোক্ষ
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত = চাক্ষুষ
প্রতি পত্রের (চোখের পাতা) লোম = প্রতিপক্ষ
চোখের কোণ = অপাঙ্গ
প্রতিতে কাম যার (যে নারীর) = কামাক্ষী
পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ = পুণ্ডরীকাক্ষ

পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = রজত জয়ন্তী
পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = সুবর্ণ জয়ন্তী
ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উৎসব = হীরক জয়ন্তী
একশত পঞ্চাশ বছর = সার্ধশতবর্ষ

সৃষ্টি করার ইচ্ছা = সিসৃক্ষা
যে রূপ ইচ্ছা = যদৃচ্ছা
দেখবার ইচ্ছা = দিদৃক্ষা
জানবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা
হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা
সেবা করার ইচ্ছা = শুশ্রূষা
ভোজন করার ইচ্ছা = বুভুক্ষা
লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
প্রবেশ করার ইচ্ছা = বিবক্ষা
পান করার ইচ্ছা = পিপাসা
নিন্দা করার ইচ্ছা = জুগুপ্সা
বধের ইচ্ছা = রিরংসা
করার ইচ্ছা = চিকীর্ষা
প্রতিকার করার ইচ্ছা = প্রতিচিকীর্ষা
অনুকরণ করার ইচ্ছা = অনুচিকীর্ষা
অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা = অনুসন্ধিৎসা
জয় করার ইচ্ছা = জিগীষা
বিজয় লাভের ইচ্ছা = বিজিগীষা
গমন করার ইচ্ছা = জিগমিষা
উদক (জল) পানের ইচ্ছা = উদন্যা
ক্ষমা করার ইচ্ছা = চিক্ষমিষা
বেঁচে থাকার ইচ্ছা = জিজীবিষা
ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা = তিতীর্ষা
দান করার ইচ্ছা = দিৎসা
রোদন করতে ইচ্ছা = রুরুদিষা

নিক্ষেপ করার ইচ্ছা = [illegible]
ছিন্ন করার ইচ্ছা = [illegible]
ধর্ষণ করার ইচ্ছা = [illegible]
লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
মুক্তি পেতে ইচ্ছা = মুমুক্ষা
স্থির করার ইচ্ছা = চিকীর্ষা

মানুষের ডাক = কেকা
কোকিলের ডাক = কূজন
সিংহের নাদ (ডাক) = গর্জন
বায়সের (পক্ষীর) কর্কশ ডাক = ক্রোশন
হরিণের ডাক = বৃংহণ বা বৃংহিত
কুকুরের ডাক = ঘুরণ
অশ্বের ডাক = হ্রেষা
পেঁচা বা উলূকের ডাক = ঘুঘুকার
মোরগের ডাক = শব্দকুলিকা

আনন্দজনক ধ্বনি = মঞ্জুঘোষ
আনন্দের আতিশয্যে সৃষ্ট কোলাহল = হরষ
গম্ভীর ধ্বনি = মন্দ্র
অলঙ্কারের ধ্বনি = শিঞ্জন
ঝনঝন শব্দ = ঝনৎকার
বিহঙ্গের ধ্বনি = কাকলি
বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি = ঝংকার
নূপুরের ধ্বনি = নিক্কণ
ধনুকের ধ্বনি = টঙ্কার
শুকনো পাতার শব্দ = মর্মর
ভ্রমরের শব্দ = গুঞ্জন
সমুদ্রের ঢেউ = ঊর্মি
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ = কল্লোল
বীরের গর্জন = হুঙ্কার

বাঘের চর্ম = কৃত্তি
হরিণের চর্ম = অজিন
হরিণের চর্মের আসন = অজিনাসন

হাতির শাবক (বাচ্চা) = করভ
ব্যাঙের ছানা = ব্যাঙাচি
সাপের খোলস = [illegible]

বুকের সাহায্যে (এঁকে বেঁকে) চলে যে = বুকস্/বুকস্থ(সর্প)
পা দিয়ে যে চলে না = পদ্গ (সর্প)
উরস (বক্ষ) দিয়ে হাঁটে যে = উরগ (সর্প)
লাফিয়ে চলে যে = প্লবগ (ব্যাঙ/বানর)
দ্রুত গমন করতে পারে যে = দ্রুবগ (ঘোড়া)
বিহায়সে (আকাশে) বিচরণ করে যে = বিহগ/বিহঙ্গ
পরকে (কোকিল পালক) পালন করে যে = পরভৃৎ (কাক)
পরের (কাকের) দ্বারা প্রতিপালিত যে = পরভৃত (কোকিল)
যে নারী অতি উজ্জ্বল ও কর্সা = মহাশ্বেতা
যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী
যে নারী কলহপ্রিয় = খাণ্ডনী
যে নারী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী = চিরণ্টী
যে নারীর সহবাসে মৃত্যু হয় = বিষকন্যকা
যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা
যে নারী বীর (সমূহ) গামিনী = বীরাঙ্গনা
যে নারী শিশুসন্তানসহ বিধবা = বালপুত্রিকা
যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী = অঘটনঘটনপটিয়সী
যে নারী সূর্যকে দেখে না (অন্তঃপুরে থাকে) = অসূর্যম্পশ্যা
যে নারী একবার সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = অন্যপূর্বা
যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা = চিত্রার্পিতা
যে নারী (বা গাভী) দুগ্ধবতী = পয়স্বিনী
যে নারী প্রিয় বাক্য বলে = প্রিয়ংবদা
যে নারী স্বয়ং পতি বরণ করে = স্বয়ংবরা
যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ
যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না = অঙ্গনা
যে নারী সুন্দরী = রামা
যে নারী সাগরে বিচরণ করে = সাগরিকা
যে নারী অপরের দ্বারা প্রতিপালিতা = পরভৃতা বা পরভৃতিকা
যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত = বীরা বা পুত্রী
যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা
যে নারীর (মেয়ের) বিয়ে হয় নি = কুমারী
যে নারীর বিয়ে হয়েছে = উঢ়া
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = নবোঢ়া
যে নারীর বিয়ে হয় না = অনূঢ়া (আইবুড়ো মেয়ে)
যে নারীর নখ পূর্ণের (কুনা) মত = পূর্ণশশা
যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = অনসূয়া
যে নারীর মাত্র পুত্র = দ্বিপুত্রিকা
যে নারীর স্বামী (ভর্তা) বিদেশে থাকে = প্রোষিতভর্তৃকা
যে নারীর পঞ্চ স্বামী = পঞ্চভর্তৃকা
যে নারীর সতীন/শত্রু নেই = নিঃসপত্ন
যে নারীর সন্তান হয় না = বন্ধ্যা
যে নারীর সন্তান বাঁচে না = মৃতবৎসা
যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে = অধিবিন্না
যে নারীর হাসি সুন্দর = সুস্মিতা
যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = অচ্ছিদ্রহাসিনী
যে মেয়ের বয়স দশ বৎসর = কন্যকা
কুমারীর পুত্র = কানীন
নারীর লীলাময়ী নৃত্য = লাস্য
উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত নটীগণের নৃত্য = গৌষ্ঠ
অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয় = অগ্রেদিধিষূ
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য = তাণ্ডব
যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করে নি = অকৃতদার
যে (পুরুষ) দ্বার পরিগ্রহ করেছে = কৃতদার
যে (পুরুষ) প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছে = অধিবেত্তা
(যে পুরুষ) পত্নী সহ বর্তমান = সপত্নীক
(যে পুরুষ) স্ত্রীর বশীভূত = স্ত্রৈণ
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে = প্রোষিতপত্নীক বা প্রোষিতভার্য
যে পুত্রের মাতা কুমারী = কানীন
যে বৃক্ষের ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না = বনস্পতি
যে গাভি প্রসবও করে না, দুধও দেয় না = গোবশা
যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় = সংবর্ত
দিনের পূর্ব ভাগ = পূর্বাহ্ণ
দিনের মধ্য ভাগ = মধ্যাহ্ন
দিনের অপর ভাগ = অপরাহ্ণ
দিনের সায় (অবসান) ভাগ = সায়াহ্ন
প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন = প্রভাতকল্প
রাত্রির প্রথম ভাগ = পূর্বরাত্র
রাত্রির মধ্যভাগ = মহর্নিশা
রাত্রির শেষভাগ = পররাত্র
রাত্রির তিনভাগ একত্রে = ত্রিযামা
রাত্রিকালীন যুদ্ধ = নৌদ্ধিক
যার চড়া (চেরা) নেই = নিরীহ
যার দেশবাস সংবৃত নয় = অসংবৃত
যার অন্য কোনো উপায় নেই = অনন্যোপায়
যার দাঁড়ি গোঁফ উঠে নি = অজাতশ্মশ্রু
যার পুত্র নেই = অপুত্রক
যার দুটি মাত্র দাঁত = দ্বিরদ (হাতি)
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে = প্রত্যুৎপন্নমতি
যার বয়সের (শুকর) মতো মুখ = বরাহমুখ
যার সব কিছু হারিয়েছে = হৃতসর্বস্ব
যার দুবার জন্ম হয় = দ্বিজ
যার দুহাত সমান চলে = সব্যসাচী
যার শুভ ক্ষণে জন্ম = ক্ষণজন্মা
যার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ আছে = জাতিস্মর
যার দুই দিক বা চার দিকে জল = দ্বীপ
যার চারদিকে হ্রদ = হ্রদ
যার বংশ পরিচয় বা স্বভাব কেউই জানে না = অজ্ঞাতকুলশীল
যার কোনো তিথি নেই = অতিথি
যার অর্থ নেই = অর্থহীন
যিনি অতিশয় হিসাবি = পাটোয়ারি
যিনি বক্তৃতা দানে পটু = বাগ্মী
যাকে আদর করা হচ্ছে = আদ্রিয়মাণ
যাকে পীড়া দেয়া হয়েছে = পীড্যমান
অন্যের অপেক্ষা করতে হয় না যাকে = অনপেক্ষ
দমন করা যায় না যাকে = অদম্য
দমন করা কষ্টকর যাকে = দুর্দমনীয়
দেখে চোখের আশা মেটে না যাকে = অতৃপ্তদৃশ
যে পরের গুণেও দোষ ধরে = অসূয়ক
যে অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না-করে কাজ করে = অবিমৃশ্যকারী
যে সমাজের (বর্ণের) অন্তর্দেশে জন্মে = অন্তাজ
যে-শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে = আটমাসে
যে আপনাকে হত্যা করে = আত্মঘাতী
যে সুপথ থেকে কুপথে যায় = উন্মার্গগামী
যে আকৃষ্ট হচ্ছে = কৃষ্যমাণ
যে অপরের লেখা চুরি করে নিজনামে চালায় = কুম্ভীলক
যে দিন তিন তিথির মিলন ঘটে = ত্র্যহস্পর্শ
যে ভিন্ন নিক্ষেপে পটু = বিকর্ণক
যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে = পণ্ডিতম্মন্য
যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে = কৃতার্থম্মন্য
যে অন্য দিকে মন দেয় না = অনন্যমনা
যে বিদ্যা লাভ করেছে = কৃতবিদ্য
যে গমন করে না = নগ (পাহাড়)
যে সন্তান পিতার মৃত্যুর পর জন্মে = মরণপরজাতক
যে রোগ নিজে করেছে চাকরিতে যোগ = স্বকৃত
যে ক্রমাগত ভোজন করছে = ভোজনরত
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ = শ্বাপদসঙ্কুল
যে বন ভেঙে এসেছে = বনাঢ্য
যে সর্বত্র গমন করে = সর্বগ
যে পুরের বাহিরে বাটিকাপণ করছে = ভাড়াবাসে = পরপুরঞ্জয়
যে জমিতে ফসল জন্মায় না = উষর
যে জমিতে দুবার ফসল হয় = দ্বৈ-ফসলি
যেখানে মৃতজন্তু ফেলা হয় = শ্মশান / উপলা
যে আলো বস্তুসমূহে অভিজ্ঞতার পার্থক্যে কমে স্থাপন করা হয় = পরপ্রকাশ
যে আলোতে কুমুদ ফোটে = কৌমুদী (জোছনা)
যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই = অবিসংবাদী
যে গাঁজায় নেশা করে = গাঁজেল
যা অতিক্রম করা যায় না = অনতিক্রম্য
যা অস্ত যাচ্ছে = অস্তায়মান
যা বচন / বাক্যে প্রকাশযোগ্য নয় = অনির্বচনীয়
যা পূর্বে দেখা যায় নি = অদৃষ্টপূর্ব
যা পূর্বে ছিল এখন নেই = ভূতপূর্ব
যা পূর্বে কখনো হয় নি = অভূতপূর্ব
যা অপনয়ন (দূর) করা যায় না = অনপনেয়
যা অপনয়ন (দূর) করা কষ্টকর = দুরপনেয়
যা পূর্বে শোনা যায় নি = অশ্রুতপূর্ব
যা পূর্বে চিন্তা করা যায় নি = অচিন্তিতপূর্ব
যা প্রতিরোধ করা যায় না = অপ্রতিরোধ্য
যা উচ্চারণ করা যায় না = অনুচ্চার্য
যা উচ্চারণ করা কঠিন = দুরুচ্চার্য
যা অনুভব করা হচ্ছে = অনুভূয়মান
যা আগুনে পোড়ে না = অগ্নিসহ
যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে = অপসৃয়মাণ
যা বহন করা হচ্ছে = নীয়মান
যা বলা হচ্ছে = বক্ষ্যমাণ
যা উপলব্ধি করা যাচ্ছে = উপলভ্যমান

যা ক্রয় করবার যোগ্য = ক্রেয়
যা বিক্রয় করবার যোগ্য = বিক্রেয়
যা জন্ম দেয় = জনন (মেঘ)
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে = বর্ধিষ্ণু
যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে = ক্ষীয়মাণ
যা ক্রমশ বিস্তীর্ণ হচ্ছে = ক্রমবিস্তার্যমান
যা চুষে খাবার যোগ্য = চোষ্য
যা চিবিয়ে খাবার যোগ্য = চর্ব্য
যা চেটে খাবার যোগ্য = লেহ্য
যা পূর্ণ করার যোগ্য = পেয়
যা মুছে ফেলা যায় না = মুর্মোচ্য
যা সহজে জানা যায় না = দুর্জ্ঞেয়
যা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
যা পুনঃ পুনঃ দুলছে = দোদুল্যমান
যা পলা-বাধা দূরীকৃত করে = বিশল্যকরণী
যা প্রমাণ করা যায় না = অপ্রমেয়
যা মাটি ভেদ করে ওঠে = উদ্ভিদ
যা আঘাত পায় নি = অনাহত
যা আহূত (ডাকা) হয় নি = অনাহূত
যা দীপ্তি পাচ্ছে = দেদীপ্যমান
যা কষ্টে জয় করা যায় = দুর্জয়
যা কষ্টে লাভ করা যায় = দুর্লভ
যা বলা হয় নি = অনুক্ত
যা বলার যোগ্য নয় = অকথ্য
যা প্রকাশ করা হয় নি = অব্যক্ত
যা অতি দীর্ঘ নয় = নাতিদীর্ঘ
যা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু = বন্ধুর
যা খুব শীতল বা উষ্ণ নয় = নাতিশীতোষ্ণ
যা ধারণ বা পোষণ করে = ধর্ম
যা নিজের দ্বারা অর্জিত = স্বোপার্জিত

অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখার স্থান = পিঞ্জরাপোল
অকালে উৎপন্ন কুমড়া = অকালকুষ্মাণ্ড
অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালীন ব্রত (কুমারীদের) = সেঁজুতি
অতিশয় ঘটা বা জাঁকজমক = বহ্বাড়ম্বর
অধর-প্রান্তের হাসি = বক্রোষ্ঠিকা
অনশনে মৃত্যু = প্রায়
অভ্রান্ত জ্ঞান = প্রমা
অন্যের মনোরঞ্জনের জন্য অসত্য ভাষণ = উপচার
আশীর্বাদ ও অভয়দানসূচক হাতের মুদ্রা = বরাভয়
আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা তিথি = কোজাগর

ইতস্তত গমনশীল বা সঞ্চারণশীল = বিপণি
উচ্চস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র কুটির = টঙি
কণ শোধের জন্য যে ক্ষণ করা হয় = ক্ষণার
এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা = অধ্যাস
ঐতিহাসিককালেরও আগের = প্রাগৈতিহাসিক
কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রকরণাদি = প্রাসঙ্গ
কাচের তৈরি বাড়ি = শিশমহল
প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা = সংজ্ঞাশ
কণ্ঠক বা তিক্ত ঘোড়ার অনুশীলনের জন্য স্থান = শিক্ষা
হস্ত, অশ্ব, রথ, পদাতিকের সমাহার = চতুরঙ্গ
সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত = সাবন
সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল = ব্রাহ্মমুহূর্ত
পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য শুভ দিন = পুণ্যাহ
আকাশ ও পৃথিবী বা স্বর্গ ও মর্ত্য = দ্যাবাপৃ
আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল = রোদসী
ভুলহীন কথি বাকা = আপ্তবাক্য
ঘোলে তকোনো আন = আনশি
নীল বর্ণ পদ্ম = ইন্দিবর
রক্ত বর্ণ পদ্ম = কোকনদ
শ্বেত বর্ণ পদ্ম = পুণ্ডরীক
পদ্মের ডাঁটা বা নাল = মৃণাল
পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ = মৃণালিনী
ইন্দ্রের অশ্ব = উচ্চৈঃশ্রবা
ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ
প্রশংসার যোগ্য = প্রশংসার্হ
স্মরণের যোগ্য = স্মরণার্হ
ধন্যবাদের যোগ্য = ধন্যবাদার্হ
ঈষৎ উষ্ণ = কবোষ্ণ
গুরুর বাসগৃহ = গুরুকুল
ঘ্রাণের যোগ্য = ঘ্রেয়
গদ্যপদ্যময় কাব্য = চম্পূ
সদ্য দোহনকৃত উষ্ণ দুধ = ধারোষ্ণ
পূর্ব ও পরের অবস্থা = পৌর্বাপর্য
পুরুষের কর্ণভূষণ = বীরবৌলি
নারীর কটিভূষণ = রশনা
নারীর কোমরবেষ্টনিভূষণ = মেখলা
পুরুষের কটিবন্ধ = সরাসন
গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হামাগুড়ি প্রদান = হুমড়ি
রাহু বা রাত্তায় ডাকাতি = রাহাজানি
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি = শাদ্বল
মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি

দেহাতিরিক্ত বিশ্রাম (নিধন = অপাবাদ
ঘুম হতে জাত = ঘুমন্ত
হিংসাত্মক দৃষ্টি যে সমস্ত (মানুষকে) = নিদায়
ভয় (ঘৃণা)কে গ্রাস করে যা = অভয়ন
ভয় (স্নেহ) দেখান / স্পর্শ করে যা = অভয়দায়ি
অকালোপক্ক হয়েছে যে = অকালপক্ক
প্রহরার শেষ যার = নিশাবসান
অন্যের (পা পশ্চাতে) অন্তরালে যে = অনুগ
প্রতিমাসে অজার আসে যার = অনৃতুমা
অল্প গতি যাই যার = অগতা
রথ-অশ্ব-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ
গবাদি পশুর চর্বিত চর্বণ বা রোমন্থন = জাবর
গ্রীষ্মপ্রধান (সারা দিন) রাত্রিযাপন যা = আতপৌষে
প্রস্তরে ভরা আছে এমন যে (নদী) = অস্তরসলিলা
প্রস্তরে যা ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য = অন্তরিক্ষ
অভিজাতাপূর্ণ মনে হলেও আসলে অর্থহীন ও নিষ্প্রাভিকর = হিংটিংছট
আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
আপনাকে কেন্দ্র করে চিন্তা = আত্মকেন্দ্রিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত

মুখের মধ্যে একটি = অন্যতর
ঘরে থাকে যে = গৌরবিক
চুরি করার ভীষণ বাতিক = চৌর্যোন্মাদ

আগবাড়িকে অভ্যর্থনার জন্য কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া = প্রত্যুদ্গমন
যাত্রাকালে বিদায়কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়া = অনুব্রজন
মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে এমন = উপাবৃত
মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত = মৃন্ময়

ইন্দ্রকে জয় করেন যিনি = ইন্দ্রজিৎ
ইন্দ্রিয়কে জয় করেন যিনি = জিতেন্দ্রিয়
ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা
স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুষ) = উপদা

উপদেশ ছাড়া লব্ধ প্রথম জ্ঞান = উপজ্ঞা
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে = অকৃতজ্ঞ

উপকারের অপকার করে যে = কৃতঘ্ন

কি করতে হবে তা বুঝতে না পারা = বিংকর্তব্যবিমূঢ়
কোনো কিছু থেকেই যার ভয় নেই = অকুতোভয়
কর্ম সম্পাদনে পটিয়সী = কর্মঠ
কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না = অনিবার্য
কাজে যার অতিমাত্রা আছে = কর্মবাতুল
গভীর ঘুমে চিহ্নিত স্থান = ঘোলপল

ঘরের অন্তর = বা-ঘর

চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল = চৈতালি
পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল = পৌষালি
হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল = হৈমন্তিক
ফুলানো যে মাটি (শিবা) = ফুলদাঁটি
পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বিবাহ = অধিবেদন
পত্নীর সাথে বর্তমান = সপত্নীক
পড়তিতে বসবে অনুপযুক্ত = অপাঙ্‌ক্তেয়
পা ধোয়ার জল = পাদ্য
পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক

স্বপ্নে (ঘুমে) শিশুর স্বগত হাসি-কান্না = দোয়েলা
মাছও প্রবেশ করে না যেখানে = নির্মীক্ষিক
বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের বিয়ে = পরিবেদন
পেনামাত্র যার মনে থাকে = শ্রুতিধর
স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা = সহমরণ
স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে এমন = স্বাদিত
ধর্মীয় কাজ করার জন্য তীর্থভ্রমণ = প্রব্রজ্যা
ধর্মপুরুষ বা সন্ন্যাসীর পর্যটন = পরিব্রাজন
যুদ্ধ থেকে যে বীর পালায় না = সংগুপ্তক
জয়ের জন্য যে উৎসব = জয়ন্তী
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় = ওষধি
যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয় = ঔষধি
ফেলে দেবার যোগ্য = ফেল্গু
ছেঁকে পরিষ্কার বা শোধন করা হয়েছে = পরিস্রুত

বহু গৃহ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করা = মাধুকরী/মধুকরী

Shaikh Kamrul Hasan
Dept. of EEE
Varendra University

বাগধারা

অঞ্জলি দেওয়া (মাটি বা সময় শেষ করা) : শ্রীরামপুরের বর্ষণ ঐসবের ওপর দৃষ্টি হলেন পৃথিবী থেকে মানুষের সবরে অঞ্জলি দেই না।

অষ্টমঙ্গলা (আনন্দের বেশ থাকাবস্থা) : অষ্টমঙ্গলার আগেই নববধূ দৌড়কের বলি হলো।

অকটবিকট (ছটফটানি) : বিপদ আসার আগেই এমন অকটবিকট করলে চলবে কেন?

অকড়িয়া (ধনহীন) : তার মতো অকড়িয়া লোকের কাছে ধার চেয়ে লাভ নেই।

অকালকুসুম (অসময়ের জিনিস) : অকালকুসুম আশা কোরো না, তাতে তোমার দুঃখই বাড়বে।

অকালপক্ব (ইঁচড়ে পাকা) : এমন অকালপক্ব ছেলেকে যে সবাই অপছন্দ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

অকাল বোধন (অসময়ে আবির্ভাব) : তার আসার কথা আগামী দিন, আজ এলেছে: এমন অকাল বোধনের কারণ কী?

অগত্যা মধুসূদন (অনন্যোপায় হয়ে) : তার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না: অগত্যা মধুসূদন, যেতেই হলো।

অগস্ত্য যাত্রা (শেষ বিদায়) : পরীক্ষায় ফেল করার পর তামান্না মাথা নত করে সেই যে গেল, সেটাই তার অগস্ত্য যাত্রা হলো।

অঙ্কুশ-তাড়না (অন্তর্গত আঘাত) : সব সময়ই বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়না অনুভব করছি।

অজগর বৃত্তি (আলসেমি) : এই অজগর বৃত্তির জন্যেই তার কোনো উন্নতি হলো না।

অঞ্চলপ্রভাব (স্ত্রীর প্রভাব) : যতই দাপট দেখাক, ঘরে অঞ্চলপ্রভাব সে মোটেই কাটিয়ে উঠতে পারে না।

অনন্তশয্যা (শেষ শয্যা) : আমাকে ডাকলেই হতো- আমি তো আর অনন্ত শয্যায় শুয়ে ছিলাম না।

অন্ধিসন্ধি (ফাঁকফোকর) : এই ব্যবসার অন্ধিসন্ধি কেবল তারই জানা আছে।

অপোগণ্ড (অকর্মণ্য/অপ্রাপ্ত বয়স্ক) : এমন অপোগণ্ড লোকের উপর নির্ভর করা যায় না।

অবরেসবরে (কালে-ভদ্রে) : সে অবরেসবরে গ্রামের বাড়িতে যায়।

অন্ধের যষ্টি (অপরিহার্য অবলম্বন) : শেষ বয়সে নাতিটাই বুড়ির অন্ধের যষ্টি হয়ে রইল।

অকালের বাদলা (অপ্রত্যাশিত বাধা) : অকালের বাদলার মতো বৈদ্যুতিক আলো চলে গিয়ে সমস্ত আনন্দটাই নষ্ট করে দিল।

অক্ষয় বট (প্রাচীন ব্যক্তি) : বুড়ো বেঁচে আছে অক্ষয় বট হয়ে।

আগড়ম বাগড়ম (অর্থহীন কথা) : তোমার আগড়ম বাগড়ম বন্ধ করো, আসল কথা বলো।

অগ্নিশর্মা (ক্ষিপ্ত) : ছেলের অকৃতকার্যতার কথা শুনে বাবা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

অঙ্গ জল হওয়া (শীতল) : গরমকাল মোসাহেবিতে সাহেবের অঙ্গ জল হলো।

অতি দর্পে হত লঙ্কা (অহংকারে পতন) : শক্তিতে বড়াই করা ঠিক না, তাতে আছে অতি দর্পে হত লঙ্কা।

যেখানে কথা বলে যে = বাচাল
শুধুই মুখো একটি = অপোগণ্ড

এক থেকে ছক করে = একেবারেতে
মূল শব্দ বলা যায় যে = ১ = অব্যয়শব্দ
যেটিদের বেশাতে আলপাশের ঘাস বা ছাড়া = পাতছাড়ি

না হওয়া যাওয়ার ভাব = অভাব
মাথা (চুল) কামে যে যে = অর্ধচন্দ্রক
অল্পতে অল্পতে যারা কথনে তিনি = অল্পিক
অবস্থায় নাক উঁচু করেন তিনি = উন্নাসিক
ভাল ও চুলে চরে যে = উদ্ভিদ
অল্প-বাক্যে ছাড়া অন্য আহারে = ফলাহার
ফলাহারের জন্য যেসা অর্থ = ফলাহারি (বৃত্তি)
চুল কুল করছে যা = জাজ্বল্যমান
জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত

বাক্যালাপ (ক-তে) চরে যে = কথোপকথন
আক্যালাপ (খ-তে) চরে যে = খেয়া / খচনা
আক্যালাপ (খ-তে) ওস্তে যে বাজি = খ-খুশ
ছেড়িয়ে ছাকাতি করে যারা = ঠাঙারে
ধুব (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ধারণ করে যে = ধুবন্ধর
নায় শাস্ত্র জানেন যিনি = নৈয়ায়িক
শত্রুকে জয় করেন যিনি = পরন্তপ বা শত্রুজিৎ
শত্রুকে হত্যা করেন যিনি = শত্রুঘ্ন
সকলের মধ্যে প্রধান বা জ্যেষ্ঠ = সার্বজনীন
সকলের জন্য হিতকর বা মঙ্গলজনক = সর্বজনীন
সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল
সূর্য হতে কোনো গ্রহকক্ষের সর্বদূরবর্তী বিন্দু = অপসূর
স্বমত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় যে = বৈরাচারী

সরোবরে জন্মে যা = সরোজ
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই যার = নাস্তিক
সব কিছু সহ্য করেন যিনি = সর্বংসহা
যুদ্ধে স্থির থাকেন যিনি = যুধিষ্ঠির
অরিকে দমন করে যে = অরিন্দম
বিশেষ খ্যাতি আছে যার = বিখ্যাত
আয়ুর পক্ষে হিতকর = আয়ুষ্য
স্তন্য পান করে যে = স্তন্যপায়ী
সর্বত্র গমন করেন যিনি = সর্বগ
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁষটে

ইন্দ্রজাল (জাদু) বিদ্যায় পারদর্শী = ঐন্দ্রজালিক
মিলনের ইচ্ছায় যাচক বা প্রার্থনার ভাবে = মিলনাকাঙ্ক্ষী
ছাদে থাকা = ছাদনা
পৃথিবীর ভ্রমণপথের অংশ বা পরিমাপ = অক্ষাংশ
বেলন দিয়ে নির্মিত = বেলনীয়
নকল জন্ম দেওয়া হয়েছে এমন = অজাতজ
হাতির পিঠে আরোহী বসার স্থান = হাওদা
হিত ইচ্ছা করে যে = হিতৈষী
হবেক রকম বলে যে = হরেকরাম

ক্ষুদ্র হাঁস = পাতিহাঁস
ক্ষুদ্র শিয়াল = খেঁকশিয়াল
ক্ষুদ্র নেবু = পাতিলেবু
ক্ষুদ্র লতা = লতিকা
ক্ষুদ্র রাজা = রাজড়া
ক্ষুদ্র বধ = বধার্হক
ক্ষুদ্র প্রলয় = খণ্ডপ্রলয়
ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র = ভাঁড়
ক্ষুদ্র চিহ্ন = বিন্দু
ক্ষুদ্র বিন্দু = ফুটকি
ক্ষুদ্র বাগান = বাগিচা
ক্ষুদ্র ফোঁড়া = ফুসকুড়ি
ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড = নুড়ি
ক্ষুদ্র নালা = নালি
ক্ষুদ্র নাটক = নাটিকা
ক্ষুদ্র নদী =সারণি
ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র = নাকাড়া
ক্ষুদ্র জাতীয় বক = বলাক
ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি = বলাকা
ক্ষুদ্র গ্রাম = পল্লি
ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
ক্ষুদ্র কূপ = পাতকুয়া
ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া = টাট্টু
ক্ষুদ্র বা নিচু কাঠের আসন = পিঁড়ি
ক্ষুদ্র অঙ্গ = উপাঙ্গ

হাতের প্রথম আঙুল (গুড়ো আঙুল) = অঙ্গুষ্ঠ
হাতের দ্বিতীয় আঙুল = তর্জনী
হাতের তৃতীয় আঙুল = মধ্যমা
হাতের চতুর্থ আঙুল = অনামিকা
হাতের পঞ্চম আঙুল = কনিষ্ঠা
হাতের তেলো বা তালু = করতল
হাতের কব্জি = মণিবন্ধ
হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ = প্রকোষ্ঠ
হাতের কব্জি থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত = পাণি

অদূরেই পর্বতের (চলার বিঘ্নকর)। অদূরেই পর্বতের, মুহূর্তের মধ্যেই দার্জিলিং যাবো-না দুজনেই ঘর ছাড়লেন।

অয়ঃ টিপ্পনি (শেষ ইশারা)। সুমের কথার মধ্যে টিপ্পনি কেটে কথা বলার মানুষ নেই।

অরি চলাকের পরে ঘড়ি (বেশি চালাকির ফল পর্যন্ত)। সব কাজেই তোমার তাড়া দেখার ধরায়, তাতে তো অতি চালাকের গলায় ঘড়ি পড়ে।

অর্থচন্দ্র দেয়া (ধাক্কাধাক্কা)। বেয়াদবটাকে অর্থচন্দ্র দিয়ে বের করে দাও।

অমাবস্যার চাঁদ (দুর্লভ বস্তু)। আমার বন্ধু নীলিমার দেখা পাওয়াতো অমাবস্যার চাঁদ হয়ে পড়েছে।

অষ্টরম্ভা সম্মিলন (প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ)। নজরুল জয়ন্তীর অষ্টরম্ভা সম্মিলনে সংগীতের মানসিক নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে।

অসবাস্ত/অমতাউ/অমহান (নির্বোধ, নিরেট বোকা) : তোমার মতো অসাবাস্ত-কে দিয়ে এ কাজ হবে না।

অহকারে ঢিল ছোঁড়া (পুরোপুরি আশাহত কাজ করা) : অহকারে ঢিল ছুঁড়ে কোনো কাজেই সুফল সচরাচর আসে না।

আঁখ জল (প্রীতির বিষয়)। ব্যবসায় ক্ষতি হয়ে নিতাই সাহেব আঁখ জলে পড়েছেন।

অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (পরের অনুরোধে কষ্ট পাওয়া) : অনুরোধে ঢেঁকি গিলে কি ফলাটাই না করেছি।

আকাশকুসুম বোধাচাক (অসম্ভব ব্যাপার) : আকাশকুসুম বোধাচাকের মত পুকুর চুরাট করে রাতারাতি ধর্মঘটিকা তোলা হলো।

আকাশাগাড়ি করা (প্রশংসা প্রশংসা করা) : এমপি সাহেবকে আকাশাগাড়ি করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় হয়েছে।

আকাশ ধরা (বৃষ্টি বন্ধ হওয়া) : এতক্ষণে আকাশ ধরেছে, এবার বাড়ি যাই।

আকাশে থুথু ফেলা (নিজেরই ক্ষতি করা) : এ কাজ করলে তো আকাশে থুথু ফেলা হবে।

আকেলমন্দ, আকেলমন্দ (বিবেচনা করে এমন) : আকেলমন্দ লোকের উপর ভরসা করা যায়।

আখাখা (বেখাল্লা) : লোকটা একটা আখাখা কাঁপ নিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

আটকপালে (হতভাগা) : তোমার মতো আটকপালের ভাগ্যে কি এই চাকরি জুটবে?

আটখান করা, আটখানা করা (টুকরো টুকরো করা) : যে বাঘের ছোট্ট পুতুলটাকে ছেলে আটখানা করেছে।

আটাশে ছেলে (দুর্বল ছেলে) : সে তো তার আটাশে ছেলে নয় যে তোমাকে ভয় পাবে।

আঠারো আনা (বাড়াবাড়ি) : কারোর কাজ কিছু না করলেও মনগড়া করে যোগো আনার উপর আঠারো আনা।

আঠারো মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা) : সরকারি অফিসে তো আঠারো মাসে বছর, কাজ তাড়াতাড়ি হবে কী করে?

আড়ং ঘাটা (খেয়াঘাট) : আড়ংঘাটায় রোজ কত শত যাত্রী এপার-ওপার করে।

আড়াআড়ে পড়া (বিপদে পড়া) : খুটো মাতালের ছেলেকে নিয়ে অসহায় বিধবা কী আড়াআড়েই না পড়েছে।

আড়ারি কাড়ারি (ছটফটে ভাব) : যে পেটের ব্যথায় আড়ারি কাড়ারি করছে।

আদমের কাল (পুরাতন কাল) : এটা তো চলে আসছে সেই আদমের কাল থেকে।

আদায় কাঁচকলায় (শত্রুভাবাপন্ন) : কেউ কারও কথাটি সহ্য করতে পারে না, তাদের সম্পর্ক যেন আদায় কাঁচকলায়।

আদার ব্যাপারি (সাধারণ লোক) : আমি তার আদার ব্যাপারি, ওসব বড় বড় অনুষ্ঠানে আমি নেই।

আদাড়ের হাঁড়ি (সামান্য লোক) : আমার কথা বাদ দাও ভাই, আমি তো একটা আদাড়ের হাঁড়ি ছাড়া কিছু না।

আমগন্ধি (কাঁচাগন্ধযুক্ত) : এমন আমগন্ধি মাংস কি খাওয়া যায়!

আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অকেজো লোক) : এমন আমড়া কাঠের ঢেঁকি আমার কোনো কাজে লাগবে?

আমি-আমি করা (আত্মপ্রশংসা করা) : ভদ্রলোক বড্ড আমি-আমি করেন বলে ওঁকে সবাই এড়িয়ে চলে।

আয়োসুয়ো (সধবা স্ত্রীলোকের দল) : বিয়ে বাড়িতে আয়োসুয়োর দল খুব হইচই বাঁধিয়ে দিয়েছে।

আর আর (অন্যান্য) : দেখতে হবে আর আর লোকে কী বলে।

আলোর আলো (দুর্লভ বস্তু) : তুমি তো আলোয়ার আলোর পিছনে ছুটে সারাটা জীবন নষ্ট করলে।

আল্লাদে ফুটকড়াই (হেসে কুটিকুটি) : মেয়েটা দেখি আল্লাদে ফুটকড়াই- কী এমন হলো?

আঁকুপাঁকু করা (ছটফটানি) : এত আঁকুপাঁকু না করে একটু ঠান্ডা হয়ে বস তো।

আঁচল ধরে বেড়ানো (বাধ্যিতবাধ্যতা) : যারা আঁচল ধরে বেড়ায়, সে সংসারের কী পরামর্শ দেবে!

আকাট মূর্খ (নিরেট বোকা) : আকাট মূর্খের হাতে পড়ে মেয়েটার দুর্গতির শেষ নেই।

আকাশ থেকে পড়া (অপ্রত্যাশিত) : পরীক্ষায় ফেলের খবর শুনে পলাশ আকাশ থেকে পড়ল।

আকাশ-পাতাল (বিশাল ব্যবধান) : এই ছেলের মাঠের ভাষণ আর বাস্তব কাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

আকাশের চাঁদ (দুর্লভ বস্তু) : হারানো মেয়েকে ফিরে পেয়ে বুড়ো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি হওয়া) : মেধাবী পুত্রের অকৃতকার্যতার কথা শুনে পিতার আক্কেল গুড়ুম!

আগুনে ঘি ঢালা (রাগ বাড়ানো) : গ্রাম প্রধানের দুর্নীতির বিবরণ ছেপে অনেক পত্রিকা আগুনে ঘি ঢালছে।

আক্কেল সেলামি (ভুলের মাশুল) : বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে গিয়ে কাইয়ুমকে আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

আদ্রে (আদ্রাদে) পুতুল (আদুরে অকর্মণ্য) : সে তো আমার তোমার মতো আদ্রাদে পুতুল নয়, তাকে রীতি মতো খাটতে হয়।

আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) : বোকারাই আকাশ কুসুম চিন্তা করে।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক) : চোরাকারবারি করে অনেকেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

আদা জল খেয়ে লাগা (প্রাণপণ চেষ্টা করা) : বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আদা জল খেয়ে লাগতে হবে।

আমতা আমতা করা (ইতস্তত করা, দ্বিধা করা) : আমতা আমতা কর কেন? আসল কথা বলে ফেল।

আদালের ঘরের দুলাল (অতি আদুরে নষ্ট ছেলে)। করিম সাহেবের আদালের ঘরের দুলালটি সকল নষ্টের মূল।

আকাশে তোলা (অতিরিক্ত প্রশংসা করা) : তোষামুদে লোকেরা ধনী ব্যক্তিদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।

আঁতে ঘা (প্রাণে আঘাত) : এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললে কার না রাগ হয়!

আদিখ্যেতা (ন্যাকামি) : তোমার এমন আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়।

আনাড়ি (অপটু, অনভিজ্ঞ) : তুমি যে আনাড়ি তা কথা শুনলেই বোঝা যায়।

আটকুড়ো (নিঃসন্তান) : আটকুড়ো বুড়ি কাউকেই সহ্য করতে পারে না।

ইন্দ্রপতন (বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু) : শামসুর রাহমানের মৃত্যুতে বাংলাদেশে ইন্দ্রপতন ঘটল।

ইউনাম জপা (ভ্রমকে স্বীকার) : সেন্টমার্টিন বেড়াতে গিয়ে ঝড়ের কবলে পড়লে বড়রা সবে ইউনাম জপেছে।

ইতুদিদকুঁড়ে (অলস) : কথায় যতই চটপটে হোক, কাজের বেলায় মেয়েটা একেবারেই ইতুদিদকুঁড়ে।

ইচড়ে পাকা (অকালপক্ব) : সবজোয়ে অনেক ছেলেই ইচড়ে পাকা হয়ে যায়।

ইলশে গুঁড়ি (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি) : কী যে ইলশে গুঁড়ি শুরু হয়েছে সকাল থেকে, অসহ্য!

ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) : টিটু এম.এ পাস করেও চাকরি পেল না, এমন ইঁদুর কপালে আর দেখি নি।

ইতর বিশেষ (প্রভেদ বা পার্থক্য) : পড়া-লেখা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও রূপে-গুণে রহিম এবং করিমের মাঝে ইতর বিশেষ নেই।

ইদের চাঁদ (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) : ছেলে ফিরে আসায় মা যেন ইদের চাঁদ হাতে পেলো।

উড়ো কথা (গুজব) : উড়ো কথায় কান দিতে নেই।

উড়নচণ্ডী (উচ্ছৃঙ্খল) : এমন উড়নচণ্ডী ছেলের কাছে উন্নতি আশা করা যায় না।

উকর-ধাকর (এলোপাথাড়ি) : উকর-ধাকর নাচ দিয়ে আসর মাতানো যাবে না।

উনিশ-বিশ (সামান্য, পার্থক্য) : যত জিনিস, ঠিকই আছে একটুও উনিশ-বিশ হয় নি।

উজলপাঁজল (উথালপাথাল) : ঢেউয়ের উজলপাঁজল দেখে নৌকারোহীরা ভীত হলো।

উজানের কৈ (সহজ লভ্য) : পরীক্ষার ভালো ফল কি উজানের কৈ যে চাইলেই পাওয়া যায়?

উড়নপেকে (অপব্যয়ী) : উড়নপেকের মতো দুহাতে টাকা খরচ করলে দুদিনে সব শেষ হয়ে যাবে।

উপোসি ছারপোকা (অভাবগ্রস্ত লোক) : ও তো উপোসি ছারপোকা, তাই ওর আমাদটা বেশি।

উলুখাগড়া (গুরুত্বহীন লোক) : আমরা ভাই উলুখাগড়া, আমাদের কথায় ওঁরা গুরুত্ব দেবেন কেন?

উলুবনে মুক্তো ছড়ান (বৃথা আয়োজন) : রাজনকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তো ছড়ান একই কথা।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একের দোষ অপরের ওপর) : দুষ্টামি করল প্রীতু, শাস্তি পেল বিধু, একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে!

উত্তম মধ্যম (পিটুনি, প্রহার) : পকেটমারদের মাঝেমধ্যে উত্তম মধ্যম খেতে হয়।

উড়ো চিঠি (বেনামি পত্র) : আকবর সাহেবের ঠিকানায় প্রায়শ উড়ো চিঠি আসে।

উড়ে এসে জুড়ে বসা (অকস্মাৎ আবির্ভাব) : বড় ভাই সংসার সাজালো, কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসল ছোট ভাই।

উনপাঁজরে (অপদার্থ) : মলির মতো উনপাঁজরে মেয়ে আর দেখি নি।

উনপঞ্চাশ বায়ু (পাগলামি) : পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে, আর তার মাথায় উনপঞ্চাশ বায়ু দেখা দিয়েছে।

উনকোটি চৌষট্টি (প্রায় সম্পূর্ণ) : উনকোটি চৌষট্টি আয়োজন হবার পর সব স্থগিত করা হলো।

উনো বর্ষা দুনো শীত (যে বছর বৃষ্টি কম হয়, সে বছর শীত বেশি পড়ে) : উনো বর্ষা দুনো শীত তাই গরিব মানুষের এত কষ্ট।

ঊর্মিমালী (সমুদ্র) : ঊর্মিমালী-তে স্নান করার আনন্দই আলাদা।

এণ্ডায় গণ্ডায় (গোঁজামিল দেওয়া) : তরুণ বয়সেই এণ্ডায় গণ্ডায় কর্ম শিখলে ভবিষ্যত ভালো হয় না।

এক লহমায় (এক মুহূর্তে) : এক লহমায় ব্যাপারটা বুঝে নাও।

এলেবেলে (নিকৃষ্ট) : এলেবেলে খেলা দেখতে ভালো লাগে না।

এক ডাকের পথ (কাছাকাছি) : সুজনের বাড়ি থেকে স্কুল হচ্ছে এক ডাকের পথ।

এককে একুশ করা (অযথা বাড়ানো) : সার কথা বল, এককে একুশ করছ কেন?

এক গোয়ালের গরু (এক শ্রেণিভুক্ত) : তারা এক গোয়ালের গরু, ওই আড্ডাতেই পাবে।

এক হাত লওয়া (জব্দ করা) : তবারক সুযোগ পেয়েই হাসানের উপর এক হাত নিয়ে ছাড়ল।

এক চোখা (পক্ষপাত দুষ্ট) : তার ওই এক চোখা ব্যবহারের জন্যে সবাই তাকে অপছন্দ করে।

এক ছাঁচে ঢালা (সাদৃশ্য) : কাজল আর সজল হচ্ছে এক ছাঁচে ঢালা, তাই পরীক্ষার ফলও হয়েছে একরকম।

একাদশে বৃহস্পতি (মহাসৌভাগ্য) : ব্যবসায় লাভ, ছেলের বিদেশ যাত্রা, এ বছর চৌধুরির একাদশ বৃহস্পতি।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো (এক দলভুক্ত) : সবাই এক ক্ষুরে মাথা মুড়ায় বলে একটাকে ধরলে অন্যদেরও পাওয়া যাবে।

এক বনে দুই বাঘ (প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী) : 'লালসালু' উপন্যাসের দুই পির এক বনে দুই বাঘের মতো ছিলেন।

এক কথার মানুষ (দৃঢ় সংকল্প ব্যক্তি) : নজরুল সাহেব এক কথার মানুষ, কোনো লোভই তাঁকে নাড়াতে পারবে না।

এক যাত্রায় পৃথক ফল (একই কাজের ভিন্ন প্রাপ্তি) : দুজনেই রাত জেগে মাছ ধরেছি। তুমি তিন ভাগ নিয়ে আমাকে দিলে এক ভাগ? এক যাত্রার পৃথক ফল হতে পারে না।

এসপার ওসপার (মীমাংসা) : ঝগড়া করে লাভ কি, এসপার ওসপার করাটাই উত্তম।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) : একমাত্র ছেলের বিয়েতে ফজলুল সাহেব এলাহি কাণ্ড করেছেন।

ওলা-ওঠা প্রতি ঘরে (মহামারি) : বন্যা-উত্তরকালে গ্রামে ওলা-ওঠা প্রতি ঘরের অবস্থা হয়।

ওষুধ করা (বশ করা) : কেউ হয়ত ওষুধ করেছে, তাই রাবেয়া চুপচাপ।

ওষুধ পড়া (সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া) : ওষুধ পড়েছে- এবার যদি পাহানার লেখাপড়া হয়।

ওঝার ঘাড়ে ভূত (বিপদগ্রস্ত কাণ্ডারি) : আমি খেলাম ডাক্তারের কাছে জন্ডিস চিকিৎসার আশায়, দেখি ডাক্তারেরই জন্ডিস। এ যে ওঝার ঘাড়ে ভূত।

কতশত (অসংখ্য) : কতশত শহিদের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে আমাদের।

কথার ফুলঝুরি (বাক্‌পটুতা) : আজকের নেতারা দেশের কাজ না করে শুধু কথার ফুলঝুরিতে জনগণের মন ভরাতে চান।

কানি খাওয়া (পক্ষপাতিত্ব) : ছেলে ও ভাইপোর মধ্যে জমি বণ্টনের প্রশ্নে পিতারা সাধারণত ছেলের দিকেই কানি খান।

ক-অক্ষর গোমাংস (সম্পূর্ণ মূর্খ) : তাকে এইসব তত্ত্বকথা বোঝাতে গেছ- সে তো ক-অক্ষর গোমাংস!

কলমির ঝাড় (বংশে বহু লোক) : চৌধুরি বাড়িতে কলমির ঝাড়।

কচু পোড়া (অখাদ্য) : লেখাপড়া না করে কি কচু পোড়া খেয়ে জীবন কাটাবে?

কচ্ছপের কামড় (যা সহজে ছাড়ে না) : জাফর পেছনে লাগার অর্থ কচ্ছপের কামড়। টাকা তোমাকে দিতেই হবে।

কড়ার ভিখারি (দীন) : এমন কড়ার ভিখারির কাছে দয়া প্রত্যাশা করি না।

কড়ি কপালে (ভাগ্যবান) : রাতারাতি বড়লোক, এমন কড়ি কপালে লোক দেখি নি।

কড়িকাঠ গনা (কাজ না করে কালহরণ) : ফেল করেছ, এবার শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনতে থাক।

কথার মানুষ (কথা ঠিক রাখে এমন) : তিনি কথার মানুষ, তাঁর কাছ থেকে ন্যায় বিচার পাবে।

কপাল ঠুকে লাগা (প্রত্যয় নিয়ে) : কপাল ঠুকে লেগেছি, দেখি কী ফল পাই।

করে খাওয়া (জীবিকার উপায় পাওয়া) : লেখাপড়া শিখলে যা হোক কিছু একটা করে খাওয়া যাবে।

কটু কাটব্য (তিরস্কার) : রেগে গিয়ে ওকে অযথা অনেক কটু কাটব্য করে ফেলেছি।

কপোল-কল্পনা (মনগড়া কথা) : তোমার এই কপোল-কল্পনায় কেউ গুরুত্ব দেবে না।

করাতের দাঁত (উভয়-সংকট) : করাতের দাঁতের মধ্যে পড়ে তার এখন যাই যাই অবস্থা।

কলির সন্ধ্যা (দুর্দিনের সূত্রপাত) : সবে তো কলির সন্ধ্যে, অনেক দুঃখ এখনও বাকি আছে।

কলমি কাপ্তেন (দরিদ্র কিন্তু বিলাসী) : ওর বাবুয়ানি দেখে চমকে যেও না। সে স্বভাবী কলমি কাপ্তেন।

কলমের খোঁচা (অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ) : ঘুষ গ্রহণ করায় মন্ত্রীর কলমের খোঁচাতেই সালামের চাকরি চলে গেল।

কমলি ছাড়ে না (নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া) : আমি তো রেহাই পেতে চাই, কিন্তু কমলি ছাড়ে নাতো।

কানখড়কে (যার কান খুব সজাগ) : যা কানখড়কে লোক সে, আগেড় বললেও শুনে ফেলে।

কাগুজে বাঘ (মিথ্যা জুজু) : সাম্রাজ্যবাদ মোটেই কাগুজে বাঘ নয়।

কাজের থই (কাজের সীমা) : সকাল থেকে খেটে চলেছি, কাজের থই নেই।

কায়দা হওয়া (বশে আসা) : এতদিন এড়িয়ে এড়িয়ে এবারে কায়দা হয়ে গেছি।

কার্তিকে ঝড় (অসময়ের ঝড়) : এই কার্তিকে ঝড়ে ফসলের খুব ক্ষতি হয়ে গেল।

কাক ভেজা (সম্পূর্ণ ভেজা) : ঝড়জলের রাতে একেবারে কাক ভেজা হয়ে বাড়ি ফিরলে।

কাট-গোঁয়ার (অত্যন্ত একগুঁয়ে) : এমনই কাট-গোঁয়ার লোক যে শত অনুরোধেও পিছিয়ে আসতে রাজি নয়।

কাটনার কড়ি (উপার্জন সামান্য) : কাটনার কড়ি দিয়ে সংসার চালানো বড়ই কঠিন।

কানু ছাড়া গীত নাই (একমাত্র অবলম্বন) : এই শর্মাকে সব কাজে ডাকতেই হবে। জানই তো, কানু ছাড়া গীত নাই।

কাবুতে পাওয়া (বাগে পাওয়া) : এবারে ওকে কাবুতে পেয়েছি- আর যায় কোথায়!

কালাপানি পার (দ্বীপান্তরে যাওয়া) : ব্রিটিশ বিরোধীদের কালাপানি পার করে দেয়া হতো।

কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালা (হতভাগ্য) : গফুর জমি চাষ করলে কী হবে, কাঁজি ভক্ষণ নামে গোয়ালার মতো সে ধান যায় জমিদারের গোলায়।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব (অলীক বস্তু) : ওই হাড় কিপটের কাছে দুহাজার টাকা চাওয়াও যা কাঁঠালের আমসত্ত্ব চাওয়াও তা।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে (আহতকে আরও আঘাত দেওয়া) : তোমার সমালোচনা তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো কাজ করেছে।

কানাগরুর ভিন্ন পথ (অস্থানে সুনিদেশনা) : যতই সৎ পরামর্শ দাও না কেন ও চলবে ওর মতো। সাধে কি বলে কানাগরুর ভিন্ন পথ?

কায়েতের ঘরের ঢেঁকি (অপদার্থ লোক) : ওই হতভাগা কায়েতের ঘরের ঢেঁকিকে নিয়ে আমার সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি হবে।

কিপটের জাসু (অত্যন্ত কৃপণ) : যতই টাকা থাকুক, লোকটা একেবারে কিপটের জাসু।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড (তুমুল হট্টগোল) : গোলমাল শুনে রাস্তায় বেরিয়ে দেখি এক কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বেধে গেছে।

কিম্ভূতকিমাকার (অদ্ভুত ও কুৎসিত) : লোকটার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা আর বিচিত্র বেশবাস দেখে একটু হকচকিয়ে যেতে হয় বই কি!

কিল খেয়ে কিল হজম (অপমান গোপন করা) : কিল খেয়ে কিল হজম করেছি, যাতে আবার অপদস্থ হতে না হয়।

কুঁচো বাসন (ছোটখাটো থালাবাটি) : হাঁড়ি কলসি তুমি নাও, কুঁচো বাসনগুলো আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব।

কুঁজড়োপনা (ঝগড়াটে স্বভাব) : তার এই কুঁজড়োপনার জন্যেই কেউ তাকে দেখতে পারে না।

কুবেরের ভাণ্ডার (অফুরন্ত ঐশ্বর্য) : ঘরে কি কুবেরের ভাণ্ডার রয়েছে, যে সারাজীবন বসে খাবে।

কুমড়ো কাটা বটঠাকুর (অকর্মণ্য লোক) : পিকনিকে তোমাকে নেব না, তুমি তো একটি কুমড়ো কাটা বটঠাকুর।

কুমিরের সন্নিপাত (অসম্ভব ব্যাপার) : পুলিশের সোর্স জাফরচোরাকে পুলিশের ধরেছে? এযে কুমিরের সন্নিপাতের মতো।

কুল কাঠের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী মনঃকষ্ট) : আমার ভেতর জ্বলছে কুল কাঠের আগুন।

কুলোপানা চক্কর (সারহীন আড়ম্বর) : আজকাল শহরের অনেকেই কুলোপানা চক্করের দলে পড়েছেন।

কেঁচে যাওয়া (পণ্ড হয়ে যাওয়া) : এত চেষ্টা এত পরিশ্রম সবই কেঁচে গেল।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনো (তুচ্ছ ব্যাপার থেকে গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ) : চোরের পিছনে ধাওয়া করে পুলিশ একটি বিরাট চোরাচালানকারী চক্র ধরে ফেলেছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।

কেতাদুরস্ত (ফ্যাশনবাগিশ/পরিপাটি) : চালচলন আর পোশাকে সে খুবই কেতাদুরস্ত লোক।

কেস কেরোসিন (ব্যাপার গুরুতর) : এদিকে তো কেস কেরোসিন- এবার কীভাবে সামলাবে?

কেল-ফতে (জয়লাভ) : এত যে কেল্লাফতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

কেঁচে গণ্ডূষ (গোড়া থেকে শুরু) : অনেকখানি করার পর জানা গেল এ পর্যন্ত সবই ভুল হয়েছে। আবার কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে।

কলুর বলদ (একটানা খাটুনি) : কলুর বলদের মতো সংসারের চাকায় ঘুরে কী লাভ?

কপাল ফেরা (সৌভাগ্য লাভ) : কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কপাল ফেরানো সম্ভব।

কত ধানে কত চাল (হিসেব করে চলা) : নিজেতো শুধু খরচই কর, কত ধানে কত চাল বুঝবে কেমন করে।

কড়ায় গণ্ডায় (সম্পূর্ণ, পুরোপুরি) : আমিনুল সাহেব কড়ায় গণ্ডায় তার পাওনা বুঝে নিলেন।

কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) : কাঁচা পয়সা থাকতেই সঞ্চয় করা উচিত।

কূপমণ্ডূক (ঘরকুনো/সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্পন্ন) : তোমার মতো কূপমণ্ডূক লোক দিয়ে কিছুই হবে না।

কথায় চিঁড়ে ভেজা (ফাঁকা বুলিতে কার্যসাধন) : কাজটি করানোর জন্য নগদ কিছু ঢালতে হবে, কারণ শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

কেউ কেটা (সামান্য) : ও কেউ কেটা ধরনের লোক নয়, ওর সাথে পেরে উঠবে না।

কচু বনের কালাচাঁদ (অপদার্থ) : রাহাতের মতো কচু বনের কালাচাঁদ আর একজন নেই।

কংস মামা (নির্মম আত্মীয়) : ভাইঝিকে বিক্রি করে দেয় যে চাচা, সে আসলে কংস মামা।

কেবলা হাকিম (অনভিজ্ঞ) : তার মতো কেবলা হাকিম দিয়ে কোনো কাজ হবে না, অন্য চেষ্টা করলেই ভাল।

কালে ভদ্রে (কদাচিৎ) : কালে ভদ্রে আমাদের সুবন্ধুর দেখা হয়।

কলা দেখানো (ফাঁকি দেয়া) : যার জন্য তুমি এতো কিছু করলে, আর সেই শেষ পর্যন্ত কলা দেখালো।

কুম্ভীরাশ্রু (মায়াকান্না, কপট অশ্রু) : প্রতারকের কুম্ভীরাশ্রু দেখে ভুলতে নেই।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা (দীর্ঘদিনের আলসা) : পরীক্ষার বাকি তো এক মাস। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে লেখাপড়ায় মন দাও।

কেষ্ট-বিষ্টু (বিশিষ্ট ব্যক্তি) : ইদানীং রাজনৈতিক ময়দানে কেষ্ট-বিষ্টু লোকের অভাব নেই।

কাষ্ঠ হাসি (কপট হাসি) : মহাজনের কাষ্ঠ হাসি দেখে লাভ নেই — সময় হলেই টের পাবে।

কাকস্নান (অসম্পূর্ণ গোসল) : শীতের দিনে কাকস্নান করতে অনেকেই অভ্যস্ত।

খেউর গাওয়া (গালাগালি করা) : ভদ্রলোক হলে সে এভাবে খেউর গাইত না।

খাংরাকাঠি (বিসদৃশরকম রোগা) : রফিক বিদেশে থেকে অর্থ জমিয়েছে ঠিকই, কিন্তু খাংরাকাঠিও হয়ে এসেছে।

খামকাজ (ভুলকাজ) : তোমার খামকাজের খোঁজ নিতেই সময় গেল, নিজের কাজ করব কখন?

খুদে রাক্ষস (পেটুক মানুষ) : ওর খাওয়া দেখে ওকে একটা খুদে রাক্ষসই মনে হয়।

খুরে খুরে দণ্ডবৎ (হার স্বীকার) : তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ, এবার আমাকে কাজ করার অনুমতি দাও।

খেজুরে আলাপ (অকাজের কথা) : অকারণে খেজুরে আলাপ করতে ভালো লাগে না।

খেরো খাতা (বাজে হিসাবের খাতা) : আমার এই খেরো খাতায় তুমি সবই পাবে।

খোদার উপর খোদকারি (অসংগত হস্তক্ষেপ) : মিস্তিরি তো ওটাকে সারিয়েই দিয়েছিল, তুমি আবার খোদার উপর খোদকারি করে নাড়াচাড়া করতে গেলে কেন?

খোল নলচে বদলানো (আমূল পরিবর্তন) : গাড়িটার খোল নলচে বদলানো দরকার।

খয়ের খাঁ (চাটুকার) : খয়ের খাঁ হয়ে ভাগ্য ফেরানো যায় না।

খাতির জমা (নিরুদ্বিগ্ন) : খাতির জমিয়ে বসলে যে, আর কোনো কাজ নেই?

খিচুড়ি পাকানো (জটিল করা) : সহজ কথায় জবাব দাও, খিচুড়ি পাকিয়ো না।

খণ্ডকপাল (দুর্ভাগা) : আমরা খণ্ডকপালে মানুষ, আমাদের দ্বারা কি আর সংসার হবে?

খণ্ডপ্রলয় (তুমুলকাণ্ড, ভীষণ ব্যাপার) : এইটুকু ঘটনাতে খণ্ডপ্রলয় ঘটানোর কী আছে?

খোদার খাসি (হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি) : কাজ কর্মের নামে ছাই, খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়, একদম খোদার খাসি।

খাবি খাওয়া (ছটফট করা) : খাবি খেয়ে লাভ নেই, যা কিছু কর ভেবে চিন্তে কর।

গঙ্গা পাওয়া (মারা যাওয়া) : শেষ বয়সে মামের বাড়িতে থেকেই তিনি গঙ্গা পেয়েছেন।

গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ (শক্তিধর দুই পক্ষের লড়াই) : সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের লড়াইতো নয়, যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। (ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ)

গোড়িমওয়ালা শিশু (দুধের বাচ্চা) : এযুগের অনেক আধুনিক মা গোড়িমওয়ালা শিশুকে বাসায় একা রেখে বেড়াতে বের হতে দ্বিধা করে না।

গয়ংগচ্ছ (ঢিলেমি) : এমন গয়ংগচ্ছ ভাব করছ যেন তোমার হাতে এক বছর সময় আছে।

গলবস্ত্র হওয়া (বিনীতভাবে অনুরোধ) : গলবস্ত্র হয়ে তাঁকে বলেছি।

গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধভাবে অনুসরণ) : গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলেই সমাজের উন্নতি হবে না।

গদাই লস্করি চাল (মন্থর গতি) : এমন গদাই লস্করি চালে চললে জীবনেও উন্নতি করতে পারবে না।

গরজ বড় বালাই (প্রয়োজনে গুরুত্ব) : যেতেই হল শেষ পর্যন্ত, কী আর করা, গরজ বড় বালাই।

গরিবের ঘোড়া রোগ (অবস্থার অতিরিক্ত অন্যায় ইচ্ছা) : কোনো মতে পাশ করেছ, এখন পড়তে চাও ইংরেজি স্কুলে, গরিবের ঘোড়া রোগ হয়েছে আর কি।

গরু মেরে জুতো দান (বড় ক্ষতি করে সামান্য পূরণ) : মোড়ল বিধবার লাখ টাকার সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে শেষকালে তাকে দুমুঠো খেতে দিচ্ছে- এ যে গরু মেরে জুতো দান।

পকাকল পকাকুলা (পরে পড়ে দেখবেন) : অতিথিরা যে যাটির হাঁড়ি নিয়ে এসেছিল, তাই দিয়েই তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা- পকাকল পকাকুলা অং কী?

পলায় পা দেওয়া (শীড়ন করা) : পরিবারের পলায় পা দিয়ে টাকা আদায় করতে তাঁর একটুও হাত হয় না।

পা ভোলা (ত্যাগ) : অভ্যাস অনেক হয়েছে, এবার পা তোল।

পায়ে কাঁটা দেওয়া (ভোজন হওয়া) : ভূতের গল্প শুনে অনেকের পায়ে কাঁটা দেয়।

পায়ে কুঁড়াল মেরে তেল (ভবিষ্যৎ আগেই অন্ধকারের প্রত্যাশা) : যাটির জন্য টাকা জমা দেবে বলেছো, অথচ যখনই তো বের হতে দি- এ যে দেখছি পায়ে কুঁড়াল মেরে তেল।

পায়ে দুঁ দিয়ে বেড়ানো (আরামে সময় কাটানো) : কথা যে দিন বেঁচে ছিলেন সেদিন যতদিন বেশ পায়ে দুঁ দিয়ে বেড়িয়েছে।

পায়ে তুলে মই কেড়ে নেওয়া (আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা) : তোমাদের কথাতেই দায়িত্ব নিয়েছি। এখনকে পায়ে তুলে এখন মই কেড়ে নিলে চলবে না।

পোড়ায় গলদ (প্রথমেই ত্রুটি) : বই না কিনেই স্কুলে এসেছ, তোমার তো দেখছি পোড়াতেই গলদ।

গোবর গণেশ (অকর্মণ্য) : তোমার মতো গোবর গণেশকে নিয়ে কোনো কাজ হবে না।

গোঁপ-খেজুরে (অত্যন্ত কুঁড়ে) : তোমার মতো গোঁপ-খেজুরে লোকের সঙ্গে একযোগে ব্যবসা করতে আমি রাজি নই ভাই।

গোদের উপর বিষফোঁড়া (যন্ত্রণার উপর আরও যন্ত্রণা) : একে চাকরি নেই, আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া এই দেনা!

গুরুচণ্ডালী (উঁচু-নিচুর সহাবস্থান) : মন্ত্রী ও নায়েবানকে একই ধরনের চেয়ারে বসতে দিলে গুরুচণ্ডালী দোষ হবে।

গলগ্রহ (পরের বোঝা হয়ে থাকা) : গলগ্রহ মরজামাইদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) : আশা করে ছিলাম চাচার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি তা গুড়ে বালি।

গর্দভরাগিণী (কর্কশ সুর) : আজকাল গর্দভ রাগিণী সমৃদ্ধ শিল্পীর অভাব নেই।

গো-মূর্খ (নিরেট মূর্খ বা বর্ণজ্ঞানহীন) : তার ভাগ্যটাই ভাল, এমন গো-মূর্খ লোকের রূপবতী বউ!

গোয়ার গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানহীন) : গোয়ার গোবিন্দ হলে কেনো কাজই ঠিকভাবে এগুতে পারবে না।

গৌরীসেনের টাকা (অফুরন্ত অর্থ) : আমাদের রাজনীতিবিদগণ গৌরীসেনের টাকা ছেড়ে হাতানোতো দেশের টাকা খরচ করে থাকেন।

গো-বৈদ্য (হাতুড়ে) : গো-বৈদ্য দিয়ে কি আর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলে?

গৌরচন্দ্রিকা (ভূমিকা) : গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল কথা বলো।

গণ্ডগ্রাম (বড় গ্রাম) : রহিমদের বাড়ি উত্তরবঙ্গের এক গণ্ডগ্রামে।

ঘাটি-চোর (ছিচকে চোর) : বড় বড় ডাকাত ধরা পড়ছে, তোমার মতো ঘাটি-চোরকে পাকড়াও করতে কোনো কষ্টই হবে না আমার।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো (ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কর্ম করা) : ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো কিছু মানুষের জন্য না হলে সমাজ এগিয়ে যায় না।

ঘরভেদী বিভীষণ (কপট স্বজন) : পরিবারে ঘরভেদী বিভীষণ থাকলে সে পরিবারের উন্নতি হয় না।

ঘুমঘড়ে (ঘুমকাতুরে) : রাত্রিতে বাবু ঘুমঘড়ে লোক।

ঘাট মানা (অন্যায় স্বীকার করা) : ঘাট মানছি, এবার আমাকে রেহাই দাও।

ঘাড়ে-গর্দানে (অত্যন্ত মোটা) : কী খাও যে এমন ঘাড়ে-গর্দানে হয়েছ?

ঘুণ হওয়া (দক্ষতা লাভ করা) : অল্প দিনেই মেরামতির কাজে সে ঘুণ হয়ে গেছে।

ঘোড়ার ডিম (অবাস্তব) : পরিকল্পনা না ঘোড়ার ডিম, উন্নতি তো কিছুই হয় নি।

ঘুঘু চরানো (সর্বনাশ করা) : তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তবে আমার শান্তি।

ঘর ভাঙা (ঐক্য নষ্ট করা) : দলের মধ্যে ঘর ভাঙানো লোকের অভাব নেই।

ঘা খাওয়া (আঘাত পাওয়া) : প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় সে বেশ ঘা খেয়েছে।

ঘোড়ার ঘাস কাটা (অকাজে সময় নষ্ট) : পড়া হয় নি কেন, এতক্ষণ কি ঘোড়ার ঘাস কেটেছ?

ঘোড়ার কাবড় (দুই পণ) : ওর যা ঘোড়ার কাবড়, শেষ অবধি তোমার কাছ থেকে ওটা আদায় করেই ছাড়বে।

ঘন্টাকর্ণ (অকর্মণ্য লোক) : একটি পেটমোটা ঘন্টাকর্ণের মতো চল্লিশ ঘন্টা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ, যে মরতে বসেছে) : বড় লোক বলেই কি ঘাটের মড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া (আরামের সন্ধানে পরিশ্রম ভাগ) : এতক্ষণ তো বন্ধুদের আড্ডায় বেশ কাজ করছিলে, এখন বিজ্ঞাপনবাতি দেখেই বিগড়ে গেলে? এভাবে ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলেই তো মুশকিল।

ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া (পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা) : আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পাঠাবে- ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ো না।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজা (সুযোগ থাকতে কষ্ট) : টাকা আছে অথচ ছাতা না কিনে বৃষ্টিতে ভিজাছো, ঘর থাকতে বাবুই ভিজা কেন?

ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ) : চার হাজার টাকা মাসিক বেতন পেয়ে দৈনিক পোলাও খেতে চাও, একেই বলে গরিবের ঘোড়া রোগ।

ঘরপোড়া গরু (বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি) : ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।

চটকের মাংস (সামান্য জিনিস) : মৌচাক ভেঙে যে মধু পাওয়া গেল, সে-তো চটকের মাংস- পড়শিদের বিলাবে কী?

চড়কগাছ (অত্যন্ত দীর্ঘকায়) : বোকা-বোকা ভাবে থাকা ছেলেটির কুকীর্তির কথা শুনে অভিভাবকদের চক্ষুতো চড়কগাছ!

চক্ষুদান করা (চুরি করা) : আমার পেনসিলটা আবার কে চক্ষুদান করল?

চশমখোর (সম্পূর্ণ বেহায়া) : আত্মসম্মানহীন লোকই চশমখোর হতে পারে।

চাঁদ-কপালে (ভাগ্যবান) : এমন চাঁদ-কপালে ছেলে খুব কমই দেখেছি।

চতুর্ভুজ হওয়া (উৎফুল্ল হওয়া) : প্রশংসা শুনেই এমন চতুর্ভুজ হয়ে যাও কেন?

চোখের চামড়া/পর্দা (লজ্জাশরম) : চোখের চামড়া থাকলে ও কাজ কেউ করতে পারে না।

চোখের বালি (চক্ষুশূল) : আমি তো তার চোখের বালি, আমি তার কাছে যাব না।

চক্ষের পুতলি (আদরের ধন) : ছেলেটি তার চক্ষের পুতলি, এক মুহূর্ত চোখে থাকে না।

চতুর্ভুজ পরির ধ্যান (ঔৎসুক্যহীন ভাব) : পুরোর চতুর্ভুজ পরির ধ্যানটা এই বয়সে না ধরা ভাল।

চিনির পুতুল (প্রেমকাতর) : চিনির পুতুল কাজ করতে পারবে না। চিনির পুতুল নাকি তুমি?

চর্বিত চর্বণ (পুনরাবৃত্তি) : বড় সাহেবের অনেক লেকচারেই আমরা চর্বিত চর্বণ করেছি।

চড়া আগুন ধ্বনি বাঁয়া (অযোগ্য) : তবলা বাজে চড়া আগুন ধ্বনি বাঁয়া, প্রতিযোগিতায় শেষ আসার পড়ছে কেউ আসে না।

চিনির বলদ (ভারবাহী) : সারা জীবন চিনির বলদের মত খাটালে, কিন্তু চিনি তো করতে পারলে না।

চক্ষু চড়কগাছ (বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যাওয়া) : আবদা মূর্তিটিকে দেখেই তো তাদের চক্ষু চড়কগাছ।

চোখবুড়ি (প্রচুর) : টাকে হেট করলে কিছু গেলায় অমনি সে আমাকে চোখবুড়ি কথা শুনিয়ে দিল। (বি. দ্র. শব্দটি 'চৌকবুড়ি' নয় 'চোখবুড়ি')।

চুনোপুঁটি (সামান্য লোক) : বাড়ল বড়লোক হয়েছে, এখন আমাদের মত চুনো পুঁটিদের সঙ্গে আর মিশবে কেন?

চোখ কপালে তোলা (বিস্মিত হওয়া) : পরীক্ষায় অকৃতকার্যের কথা শুনে তাদের চোখ কপালে তুলল।

চোখ নাচা (অভাবিতের লক্ষণ) : বাবার চোখ নাচছিল বলে সে খুব চিন্তায় আছে, কী জানি কী হয়!

চুলের টিকি না দেখা যাওয়া (অদর্শন হওয়া) : সেই যে গেছ, আর তো তোমার চুলের টিকি দেখা যায় না।

চেটেনেটে (কমবয়সী বধূ) : চেটেনেটে কেন একা ঘাটে যায়?

চোখে সরষে ফুল দেখা (বিপদে দিশাহারা হয়ে পড়া) : হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়ায় ছোকরাটি চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন (মিলমিশ হওয়া) : ঐ মাছে চন, সেখানে গিয়ে বাসনটা দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এসি।

চড় মেরে গড় করা (অল্পে প্রসন্ন করে দেখে শুনে)। চুরাশি বর্ষে এখন মাত্র চারিয়ে এসেছ? এইভাবে চড় মেরে গড় নিইয়া করলে।

চাপান-উতোর (পারস্পরিক সন্দেহ)। বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। আসলে দুই পরিবারে চাপান-উতোর সম্পর্ক।

চিত্রগুপ্তের খাতা (যে খাতায় সবকিছু পাওয়া যায়)। তোমার এই চিত্রগুপ্তের খাতা থেকে আমি কিছুই বাদ করতে পারছি না।

চোরা বাত (চুরি করার পক্ষে সুপ্রস্তুত)। একে অন্ধকার, তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আজকের এই চোরা বাতটায় একটু সজাগ থাকতে হবে।

চাঁদের হাট (ঝামেলাহীন পরিপূর্ণ সংসার) : ছেলে-মেয়েরা সবাই প্রতিষ্ঠিত, বিবাহিত– এখন তোমার সংসার তো চাঁদের হাট।

চিচিং ফাঁক (গোপন রহস্যের প্রকাশ) : তোমাকে আর বলতে হবে না, অনেক আগেই সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে।

চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকানো)। চোখে ধুলা দিয়ে মুদাস আমার কাছ থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে।

চিনে জোঁক (নাছোড়বান্দা) : করিমের মতো এমন চিনে জোঁক আর দেখি নি বাপু!

ছাগল টাঙানো (লম্বা জায়গা নেওয়া) : ছাগল টাঙানোর মতো করে বিছানায় শুয়েছ কেন?

ছাঁদনাতলা (বিবাহের মণ্ডপ) : আর যাই করি ছাঁদনাতলায় যাচ্ছি না।

ছামনি নাড়া (বুদ্ধি বিনিময়) : ছুটে আয়, বর-কনের ছামনি নাড়া দেখবি আয়।

ছারেখারে যাওয়া (ধ্বংস হওয়া) : তার বদ স্বভাবের জন্যেই এমন সংসারটা ছারেখারে গেল।

ছুঁচোর কেত্তন (অবিরাম কলহ) : ও বাড়িতে সব সময় ছুঁচোর কেত্তন লেগেই আছে।

ছাই চাপা আগুন (অপ্রকাশিত প্রতিভা) : মানিক হচ্ছে ছাই চাপা আগুন, তার উন্নতি হবেই।

ছেলের হাতের মোয়া (সামান্য বস্তু, সহজলভ্য) : সমস্যা হওয়া ছেলের হাতের মোয়া নয় যে সবাই হতে পারে।

ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা (সামান্য স্বার্থে দুর্নীতি অর্জন) : ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে কে বলেছে?

ছক্কা পাঞ্জা করা (বড় গড় কথা বলা) : পড়ালেখার খোঁজ নেই, ছক্কা পাঞ্জা করার ওস্তাদ।

ছিঁচ কাঁদুনে (অল্পেই কাঁদে এমন) : খেঁদির মতো ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ের কাছে কী আশা করা যায়?

ছা-পোষা (পোষ্য জনসমন্বিত/অল্পআয় পরিবার) : ছা-পোষা লোক দেশের কথা কী ভাববে?

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (সামান্যের বিশেষ প্রয়োজন) : করিম হচ্ছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো, তাকে দিয়ে এরাজ করানো যায়।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা (পরকে আপন করার চেষ্টা করা) : হঠাৎ ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধার শখ হল কেন আপনার? আগে তো এসব দেখি নি।

হু কড়া ন কড়া (অপচয়া/অবহেলা করা) : দামি জিনিসটা হু কড়া ন কড়া করে বেচে ফেললে?

হয়কে নয় নয়কে হয় (অপচয় করা) : রোজগার করতে পারো না, অথচ টাকা দিয়ে হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে খুব শিখেছ।

ছাতা দিয়ে মাথা রাখা (বিপদে সাহায্য করা)। তিনি ছাতা দিয়ে আমার মাথা রেখেছেন, আমি তাঁর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।

ছিনিমিনি খেলা (নষ্ট করা) : আমরা সহজে পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে পছন্দ করি।

জবড়জং (এলোমেলো) : পড়ার টেবিল জবড়জং অবস্থায় রাখা ভালো শিক্ষার্থীর লক্ষণ নয়।

জলভাত (সহজসাধ্য) : এসব অঙ্ক তাঁর কাছে জলভাত।

জলযোগ (হালকা খাবার) : দশটা বাজে, এখন জলযোগ হয় নি?

জলপান (হালকা খাবার) : জলপান যে করতে দেব শালিধানের চিঁড়ে।

জলপানি (বৃত্তি) : পরীক্ষায় ভালো ফল করে দশ টাকা জলপানি পেয়েছে।

জল (জপ) দেওয়া (ঠকানো) : সবাই মিলে ওই বোচারাকে দশ টাকা জল দিয়েছে।

জলগ্রহণ না করা (সম্পর্ক না রাখা) : ওর বাড়িতে আমি আর জলগ্রহণ করব না।

জলের দাগ (ক্ষণস্থায়ী) : আমাকে কি আর মনে থাকবে? আমার কথা নিশ্চয় জলের দাগের মতো মিলিয়ে যাবে।

জামাই-আদর (প্রচুর আদর-যত্ন) : শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যে যা জামাই-আদর পেল তা আবার যায় না।

জিলিপির প্যাঁচ (জটিলতা সৃষ্টি) : ধর্মের জিলিপির মতো সাম্প্রদায়িক ঐক্য নষ্ট করার ফন্দি হলো সুপ্রচেষ্টাপ্রসূত।

জীবন্তে-মরা (জীবন্মৃত) : বেচারি দুঃখে দুঃখে লোকটা এক রকম জীবন্তে-মরা হয়ে আছে।

জোড়ের পায়রা (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) : দুটিতে যেন ঠিক জোড়ের পায়রা, সব সময়ই একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

জগা খিচুড়ি (বিশৃঙ্খল) : সব জগা খিচুড়ি না পাকিয়ে এক দিক থেকে গুছিয়ে পড়ো।

জগদ্দল পাথর (গুরুভার) : অনেক কুসংস্কার সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে।

জিলাপির প্যাঁচ (কূটবুদ্ধি) : পেটে জিলাপির প্যাঁচ রেখে তুমি আর ভাল মানুষ সাজতে চেয়ো না।

জাহান্নামে যাওয়া (উচ্ছন্নে যাওয়া) : মায়ের আদরে আদরে ছেলেটা জাহান্নামে যাচ্ছে।

জলাঞ্জলি দেওয়া (বিসর্জন দেওয়া) : গিয়াস সাহেবের মান সম্মান জলাঞ্জলি দিতে হল নিজের ছেলের জন্যে।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ (ছোটবড় সব কাজ) : জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই ওই একজনকেই করতে হয়।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ (উভয় সঙ্কট) : ধরা পড়লে শাস্তির ভয়, অন্যদিকে মালিকের আদেশ, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, যাই কোন দিকে?

ঝাঁকি দর্শন (ক্ষণিক দেখা) : কুমিল্লায় বেড়াতে গিয়ে ঝাঁকি দর্শনের জন্য হলেও মনামতি যাবে।

ঝাড়েবংশে (সবসুদ্ধ) : ওরা একেবারে ঝাড়েবংশে বদমাশ।

ঝাঁকের কৈ (এক দলভুক্ত) : ওরা সব ঝাঁকের কই, এক কথা তো বলবেই।

ঝাড়ে কোপে ঝগড়া (সর্বত্র বিবাদ)। পাড়া ঝাড়ে কোপে ঝগড়া সৃষ্টিতে আছে।

ঝড়ো কাক (বিপর্যস্ত)। সারাদিন বাজার ঘুরে ঘুরে ঝড়ো কাক হয়ে বিপদ বাসায় ফিরল।

ঝড়তি-পড়তি (ফেলনাযোগ্য অংশ)। ঝড়তি-পড়তি যা হয় তিপদের জন্য রেখে দিও।

ঝিমেধরা ঘোড়া (অল্প খাটিয়ে কাজ)। ঘোড়া আর কতদিন বা খাটি। আমার তো ঝিমেধরা বুড়ি গেল।

ঝোলের সাথি অম্বলের বন্ধু (সব সময়ের সঙ্গী হিসেবে ধরা)। ওকে বিশ্বাস করে না। সব সময়ই ঝোলের সাথি অম্বলের বন্ধু।

ঝোলে অম্বলে এক করা (নিশ্চিহ্ন ফেলা)। ওকে এক করে ছাড়ব। ঝোলে অম্বলে এক করে ফেলব না।

ঝরাপাতা (জীর্ণশীর্ণ লোক)। আমরা ঝরাপাতার দল, হাওয়া আমাদের কখনো-বা তোলে ঝড় করে, কখনো-বা ছড়িয়ে দেয়।

ঝিকে মেরে বউকে শেখানো (একজনের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষাদান)। চতুর শাশুড়ি ঝাঁটার ঘায়ে সংসারে অনেককে ঝিকে মেরে বউকে শেখায়।

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ মতো কাজ করা) : ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলেই সফলতা পাওয়া যায়।

টুলো পণ্ডিত (পুঁথিগত বিদ্যাসার)। বিশ্বমানব হতে হলে বহু কিছু জানা চাই, টুলো পণ্ডিত হলে চলবে না।

টই টম্বুর (কানায় কানায় পূর্ণ) : পুকুরটা জলে টই টম্বুর হয়ে আছে।

টনক নড়া (সজাগ হওয়া) : পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেখে বাবার টনক নড়ল।

টাকার আন্ডিল (বিপুল টাকার মালিক) : লোকটা একটা আস্ত টাকার আন্ডিল।

টাকার কুমির (ধনী ব্যক্তি) : বিবেকানন্দ চৌধুরি টাকার কুমির, কিন্তু ভীষণ কৃপণ।

টাকাটা সিকিটা (খুব সামান্য টাকা) : টাকাটা সিকিটা যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

টুপ ডুজঙ্গ (নেশায় বিভোর) : সব সময় টুপ ডুজঙ্গ হয়ে থাকলে কোনো আশা নেই।

টেডাই-মেডাই (আস্ফালন) : এখন যত টেডাই-মেডাই, আসল কাজের সময় পালাবে।

টানা পোড়েন (বিরক্তিকর যাতায়াত) : দুই পক্ষের টানা পোড়েনে আমার প্রাণ যায় যায়।

টেঁকে গোঁজা (আত্মসাৎ করা) : আমার পাঁচশ টাকা অমন নির্বিকারভাবে টেঁকে গুঁজে নিলে?

টুপি পরানো (খোসামোদ করা) : লোকটা তোমাকে টুপি পরিয়ে একগাদা টাকা খরচ করিয়ে নিয়ে গেল?

টাল সামলানো (বিপদ হতে মুক্তি) : আকবর সাহেব ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে টাল সামলে উঠলেন।

টীকা ভাষ্য (নীর্ঘ আলোচনা) : বিষয়ের উপর টীকা ভাষ্য থাকলে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হয়।

ঠোলাপাতি (বনভোজন) : ফুল ছুটি হলে ছেলেমেয়েরা ঠোলাপাতিতে মেতেছে।

ঠক বাছতে গাঁ উজাড় (পরিণামে শূন্য লাভ) : এযুগে আদর্শ খুঁজতে যেও না, তাহলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

ঠারে ঠারে (ইঙ্গিতে) : ঠারে ঠারে না বলে যা বলার সরাসরি বল।

ঠান্ডা লড়াই (গোপনে বিরোধিতা) : তাদের মধ্যে এমন ঠান্ডা লড়াই চলছে যে তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

ঠোঁট কাটা (স্পষ্টভাষী) : এমন ঠোঁট কাটা লোক আর দেখি নি, গুরুজনদের সামনেও মুখে কিছু আটকায় না।

ঠেকা মেয়ে (চিরকুমারী) : জাফর সাহেবের ঠেকা মেয়েটিই তার সমস্যা।

ঠুঁটো জগন্নাথ (অকর্মণ্য) : অমন ঠুঁটো জগন্নাথ হলে সংসার চলবে কেমন করে?

ঠাঁট বজায় রাখা (অভাব চাপা রাখা) : বংশের গৌরব রক্ষার্থে অনেকেই ঠাঁট বজায় রেখে চলেন।

ডানাকাটা পরি (বাঙ্গার্থে: পরমা সুন্দরী) : আবু জাফর মিয়া তার ডানাকাটা পরি মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রই খুঁজে পাচ্ছে না।

ডিমে রোগা (চির-রুগ্ণ) : ওই ডিমে রোগা ছেলেটা আবার কী খেলবে?

ডান হাতের ব্যাপার (খাওয়া) : আগে ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নিতে দাও।

ডামাডোল (গোলযোগ) : রাজনীতির ডামাডোলে অনেকেই আখের ঢঙ্গাতে ব্যস্ত।

ডকে ওঠা (নষ্ট হওয়া) : তার ব্যবসা তো টাকার অভাবে কবেই ডকে উঠে গেছে।

ডুমুরের ফুল (বিরল বা দুর্লভ) : পরীক্ষায় ভাল করে ফরিদ এখন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে কাজ করা) : তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ- সেটা সবাই জেনে গেছে।

ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা (ভক্ষককেই রক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া) : ওই মেয়েটা তো আস্ত চোর। ওকে চালের বস্তা পাহারা দিতে বলা তো ডাইনির কোলে ছেলে সঁপা।

ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না (আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি) : সংসারে একগাদা খাইয়ে। এমনিতেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তার উপর মাইনে পেতেও এত দেরি। কী করব বুঝতে পারছি না।

ঢেঁটরা পেটা (ব্যাপক প্রচার) : রহিম এসএসসি পরীক্ষায় বি-প্লাস পেয়েও আনন্দে সে খবর গ্রামময় ঢেঁটরা পেটা করেছে।

ঢক্কা-নিনাদ (উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা) : নিজের গুণপনা নিয়ে ঢক্কা-নিনাদ করা শোভা পায় না।

ঢাকের কাঠি (তোষামুদে) : মিজান হচ্ছে মান্না সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলে তা শোনে।

ঢাক ঢাক গুড় গুড় (লুকোচুরি) : তোমার ঢাক ঢাক গুড় গুড় কাজ আমার ভাল লাগে না।

ঢাকের বাঁয়া (অপ্রয়োজনীয়) : তোমার মতো ঢাকের বাঁয়া সঙ্গে থাকাও যা, না থাকাও তাই।

ঢাকে কাঠি পড়া (সূচনা হওয়া) : আর দুচার দিনের মধ্যেই ভোটের ঢাকে কাঠি পড়বে।

ঢেঁকি অবতার (নির্বোধ লোক) : এমন ঢেঁকি অবতারের খাওয়া জুটবে কী করে?

ঢেরা সই (নিরক্ষর লোকের সই) : লিখতে জানো না তো কী হয়েছে? ঢেরা সই দিয়ে টাকা নেবে।

ঢেউ গনা (বাজে কাজে সময় নষ্ট) : তীরে বসে ঢেউ গুনে লাভ নেই- ঝাঁপিয়ে পড়।

ঢেঁকি না কুলো, না ঢেঁকি না কুলো (অন্নসংস্থানের উপায় না থাকা) : দুমাস মাইনে পায় নি, তার এখন না ঢেঁকি না কুলো অবস্থা।

ঢেউগোনা (অকাজে সময় নষ্ট) : ঢেউ গুনে দিন কাটানো উচিত নয়।

ঢেঁকির কুমির (অপদার্থ) : তোমার মতো ঢেঁকির কুমির দিয়ে কোনো কাজই হবে না।

ঢি ঢি পড়া (কলঙ্ক) : তার কুকর্মের জন্য সমাজে ঢি ঢি পড়ে গেছে।

তয়নাত করা (স্থির করা) : গ্রামের লোক সবাই মিলেই পুকুর খননের স্থান তয়নাত করেছে।

তেল-কাজলা (চকচকে) : রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি রূপে নিশ্চয়ই তেল-কাজলা ছিল।

ত-খরচ (বাজে খরচা) : হাতে আছে ত-খরচের জন্যে সামান্য কিছু টাকা।

তক্কে তক্কে থাকা (গোপনে সতর্ক থাকা) : তৌফিক তক্কে তক্কে আছে, কখন যে ধরে বলা যায় না।

তালগাছের আড়াই হাত (শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ) : প্রথমটা ভালোয় ভালোয় উতরে গেল, এখনও ও কাজের তালগাছের আড়াই হাত বাকি।

তাল পাতার সেপাই (ক্ষীণজীবী) : রবিনের মত তালপাতার সেপাই দিয়ে কাজ হবে না।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী ঘর) : ছেলেটা ফেল করায় মায়ের সব স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙে গেল।

তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) : তোমাকে তামার বিষে পেয়েছে বলে মানুষকে মানুষ মনে কর না।

তারে নাচন (দুরবস্থার একশেষ) : তোমাকে এমন তারে নাচন নাচাবো, তখন বুঝবে শঠতার পরিণাম কী।

তেল-নুন-লকড়ি (মৌলিক প্রয়োজন) : সব কিছুর আগে আমাদের ভাবতে হয় তেল-নুন-লকড়ির সংস্থানের কথা।

তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) : মঙ্গার সময় সাহায্যের আশায় তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকে অনেক ক্ষুধার্ত।

তিন মাথা এক হওয়া (খুব বৃদ্ধ হওয়া) : তার তিন মাথা এক হয়ে গেছে, এখন আর পোশাক-আশাকের চাহিদা নেই।

ত্রিশঙ্কু অবস্থা (মধ্যাবস্থা) : দুই অফিস কর্তার দুই বিপরীত আদেশের ফলে আমার এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

তিনঠেঙে (লাঠিহাতে বুড়ো) : তিনঠেঙে বুড়োটা আবার আসছে।

তুর্কি নাচন (নাজেহাল অবস্থা) : একবিংশ শতাব্দীতেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যে তুর্কি নাচন চলছে, এ কারণে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না।

তুষের আগুন (নীর্ঘস্থায়ী মানসিক যন্ত্রণা) : পরীক্ষায় ফেলের জন্য বাবার তিরস্কারে রতনের মনে তুষের আগুন জ্বলছে।

তুলসী বনের বাঘ (সুবেশে দুর্বৃত্ত) : সোজা মনে হলেও আসলে বিবেকানন্দ চৌধুরী তুলসী বনের বাঘ।

তালকানা (বেতাল হওয়া) : এমন তালকানা হলে কি চলবে? একটু হুশ করে কাজ কর বাপু।

তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) : ঠুনকো বন্ধুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।

তুবড়ি ছোটা (বেশি কথা বলা) : আমাদের বন্ধুদের মাঝে মনির ছিল তুবড়ি ছোটাতে ওস্তাদ।

তোলা হাঁড়ি (গম্ভীর) : মনি স্বামীর সাথে রাগ করে মুখখানা তোলা হাঁড়ি করে বসে আছে।

থুরে দেওয়া (জব্দ করা) : অন্যের পারিবারিক বিষয়ে নাক গলাতে এলে আবু জাফর মিয়াকে থুরে দেওয়া হয়েছে।

থ হওয়া (স্তম্ভিত হওয়া) : কর্তার চাকরি গেছে শুনে গিন্নি থ হয়ে গেল।

থ পাতা (স্থায়ীভাবে কিছু করা) : অনেকদিন তো ঘুরে বেড়ালে, এবার একটু থ পেতে বসো।

থোড়াই কেয়ার করা (গ্রাহ্য না করা) : ও আমার কী করবে? ওকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

থরহরি কম্প (ভয়ে প্রচণ্ড কাঁপা) : সামনে বাঘ দেখে চন্দনার থরহরি কম্প শুরু হয়ে গেল।

দক্ষযজ্ঞ (ব্যাপক আয়োজন) : ব্যাপারির বাড়িতে মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে দক্ষযজ্ঞের সূচনা হলো।

দানোয় পাওয়া (ভূতে পাওয়া) : কোনো ব্যক্তির মধ্যে অসঙ্গতি দেখলেই গ্রামের লোক ভাবে লোকটিকে দানোয় পেয়েছে।

দিশুবেড়েলা (বেয়াদপ ছেলেদের সর্দার) : নিজের ছোটো বোন খুন করে দিশুবেড়েলা এক মেয়েকে জেলে পাঠিয়েছে।

দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (ঘোরালো) : দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।

দড়ি-কলসি (অত্যুৎসাহের ঠ্যালায়) : দড়ি-কলসিও ছোটো না তোমার?

দফা নিকেশ (সমূহ সর্বনাশ) : পুরুষ মানুষের দফা নিকেশ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে।

দহলা-নহলা করা (উত্তমরূপ করা) : বউমা হবার আগের দুই পর্বে সে খুব দহলা-নহলা করেছে।

দহরম মহরম (অন্তরঙ্গতা) : বড়লোকের সঙ্গে এত দহরম মহরম ভালো নয়।

দা-কুমড়ো সম্বন্ধ (শত্রুতা) : বাবাদের মুভাইয়ের মধ্যে দা-কুমড়ো সম্বন্ধ।

দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা (অনাহারে থাকা) : সারাদিন এইভাবে দাঁতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ (অনুকরণের হাস্যকর চেষ্টা) : দোকানের কর্মচারী মানিকের মতো ঘন ঘন পোশাক পরিবর্তন করলে তাকে দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ ছাড়া আর কী বলা যাবে?

দুধে ভাতে থাকা (সুখে থাকা) : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

দেঁতো হাসি (কৃত্রিম হাসি) : তোমার দেঁতো হাসি দেখে আর যেই ভুলুক, আমি ভুলছি না।

দুধ-ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা (অপব্যয়) : বিয়ে উপলক্ষে তারা সেদিন দুধ ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে।

দোজবরে (দ্বিতীয়বার যে ছেলে বিয়ে করতে চায়) : আমার মেয়েকে আমি দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দেব না।

দুধের সাধ ঘোলে মিটানো (ভালর অভাব মন্দ দিয়ে পূরণ) : তুমি কলম চেয়েছিলে আমি পেনসিল এসেছি- আপাতত দুধের সাধ ঘোলে মেটাও।

দিন ফুরানো (আয়ু শেষ) : প্রভু, দিন ফুরানো অধম আমি, কৃপা কর আমাকে।

দুধের মাছি (সুসময়ে বন্ধু) : সুদিনে দুধের মাছির অভাব হয় না, কিন্তু দুর্দিনে একজনও মিলে না।

দু নৌকায় পা (উভয় সংকট) : দু নৌকায় পা দিয়ে কোনো কাজেই উন্নতি লাভ করা যায় না।

দক্ষিণার জোরে (টাকা পয়সা দিয়ে) : দক্ষিণার জোরে অনেকেই বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করে।

ধোয়া তুলসীপাতা (নির্দোষ) : আমাদের দেশের রাজনীতিবিদগণ দুর্নীতির প্রশ্নে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নন।

ধুয়ো তোলা (অযুহাত বের করা) : সিলেবাস শেষ হয় নি- এমন ধুয়ো তুলে পরীক্ষা পেছানো ছাত্রদেরই অভ্যাস হয়।

ধর্মের কল (সত্য) : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

ধরতাই বুলি (চালু কথা) : গণতন্ত্র হো একটা ধরতাই বুলি, কথাটার মানে কেউ জানে?

ধড়া-চূড়া (সাজপোশাক) : অফিস থেকে বাড়ি এসে ধড়া-চূড়া ছেড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ধর্মের ষাঁড় (যথেচ্ছাচারী) : তোমার ছেলে হয়েছে ধর্মের ষাঁড়- কে তাকে বশে রাখবে?

ধামাধরা (তোষামোদকারী) : তোমার মতো এমন ধামাধরা লোক আর একজনও দেখি নি।

ধেয়ে নাচনি (ঘিসি মেয়ে) : আমার কাজের মেয়েটা একটা ধেয়ে নাচনি, সারাদিন কোথায় যে টহল দেয়।

ধোপা নাপিত বন্ধ করা (একঘরে করা) : তুমি কি এমন অপরাধ করেছ, যে তারা তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ করল?

ধোপার গাধা (পরের জন্য খাটা) : সারাজীবন ধোপার গাধা হয়ে কাটালাম— কেউ কি তার দাম দিল?

ধড়ে প্রাণ আসা (বিপদ থেকে উদ্ধার) : মাস্তান লোকটা চলে যাওয়ায় ধড়ে প্রাণ এল।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা (অহঙ্কারে সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করা) : টাকা হয়েছে বলে কি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে হবে নাকি?

ধান ভানতে শিবের গীত (অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতরণা) : কেমন আছ জানতে চেয়েই তো মুশকিল হল দেখছি। তুমি যে এখন ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করলে।

ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা (নামমাত্র খরচ) : তুমি তো ধান দিয়ে লেখাপড়া শিখেছ, এর চেয়ে বেশি আর এগোতে পারবে কী করে?

ধনুক-ভাঙা পণ (সুকঠিন প্রতিজ্ঞা) : আমরা অনেক অনুরোধ করেছি, কিন্তু সে যে ধনুক-ভাঙা পণ-কখন কিছুতেই নিয়ে করবে না।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (সাধুজন) : দেখতে মনে হয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাষণ্ডদের হাড়।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কৌশলে কার্যোদ্ধার) : ধরি মাছ না ছুঁই পানি নীতি অবলম্বন করে সফল হয়েছে।

নকুলদানা (মূর্খ) : নাড়াবুদ্ধিদের স্বর্গে বসবার জায়গা নেই।

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা (নিজের অনিষ্ট করেও পরের ক্ষতি করা) : সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে আনন্দ পায়।

নখদর্পণে (পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আয়ত্তে) : এই শহরের সবকিছু আমার নখদর্পণে।

নবমী দশা (মূর্ছা) : কথাটা শুনেই সে নবমী দশা প্রাপ্ত হল।

নমাসে-ছমাসে (কালে-ভদ্রে) : সে আমার বাড়ি নমাসে-ছমাসে একবার আসে।

নয়-দুয়ারি (ন-দুয়ারি) (দ্বারে দ্বারে) : নয়-দুয়ারি হয়ে না ঘুরে এবার সংসারী হও।

নরক গুলজার (অনেকে জুটে সরগরম) : এখানে বসে তোমরা তো বেশ নরক গুলজার করছ দেখছি।

নাচতে নেমে ঘোমটা (বৃথা লজ্জা) : ব্যবসা করতে এসে ওসব ভাবলে চলে না, নাচতে নেমে ঘোমটা!

নরদের ঢেঁকি (বিবাদের বিষয়) : ওই নারদের ঢেঁকি সম্পত্তি নিয়ে কাজ নেই— আমি শান্তিতে থাকতে চাই।

নিজের ঢাক নিজে পেটানো (আত্মপ্রকাশ) : এ যুগে নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে হবে।

নুড়ো জ্বেলে দেওয়া (মৃত্যু কামনা করা) : অমন স্বামীর মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে হয়।

নোলা বাড়ানো (লোভ করা) : খাবার দেখলেই অমন করে নোলা বাড়াও কেন?

নকড়া ছকড়া করা (হেলা ফেলা করা) : কাজের জিনিস নকড়া ছকড়া করা ঠিক নয়।

নগদ নারায়ণ (নগদ অর্থ) : লোকটাকে নগদ নারায়ণ দিয়ে বিদায় করো।

নজর দেওয়া (দৃষ্টি) : ওখানে নজর দেওয়া ঠিক নয়।

নলিন পুতুল (সহজে কাবু, অনুরূপ মানুষ) : তোমার মতো নলিন পুতুলের থাকা ও কাজ হবে না।

নয় ছয় (তছরূপ) : অফিসে ফুলের চাঁদা নয়ছয় করে দশ হাজার টাকা বছর বছর গায়েব।

নিরক্ষরভট্টাচের পাঞ্জা (সর্বজনে স্বীকৃত, তবুও তার নিরক্ষরভট্টাচের পাঞ্জা যে ভুয়া তা প্রমাণ করতে হবে।

নিজের চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মন দেওয়া) : অফিসে সবসময় না বলে তুমি বরং নিজের চরকায় তেল দাও।

নেই আঁকড়া (একগুঁয়ে স্বভাবের) : তোমার মতো নেই আঁকড়াকে দিয়ে কিছুই হবে না।

নিরবচ্ছিন্ন (অবিরাম ধারায় বয়ে) : অনেক কষ্টের পর বাকিটা জন্য তাকে নিরবচ্ছিন্ন করতে পারলাম।

পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা (বিনা পরিশ্রমে লাভ) : পৈতৃকসূত্রে পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা ভদ্রলোক বিক্রি করতে রাজিদের কোনোই সময়ে হচ্ছে না।

পরদানসিন (অতি চমৎকার) : মেয়ের জন্য পরদানসিন কানা ছেলে হয়েছে।

পকুর-চুরি (বড় রকমের চুরি) : ব্যাঙ্কিং ব্যাংক-পাড়ায় ঘরবাড়ি পকুর-চুরি হয়েছে।

পক্কাঘাত প্রাপ্ত (মারা যাওয়া) : কোটিপতির পো এক ঘাতেই পক্কাঘাত পেলেন।

পই পই করে (বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া) : পই পই করে বলার পরও তুমি বইটি আনলে না।

পরঘড়ি পাল্লা মারি (হাড়হাভাতে লোক) : সে তো আর তোমাদের মতো পরঘড়ি পাল্লা মারি নয় যে না ডাকতেও নেমন্তন্ন খেতে যাবে।

পর্বতের মূষিক প্রসব (বিরাট সম্ভাবনার সামান্য প্রাপ্তি) : এত আলোচনা এত প্রতিশ্রুতির পরে এইটুকু পেলাম? এ তো পর্বতের মূষিক প্রসব হলো।

পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠা (অসম্ভব ব্যাপার) : জামাই কিপটে যেদিন একশো টাকা দান করবে সেদিন পশ্চিম দিকে সূর্য উঠবে।

পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) : দয়া করে আপনার পায়ে রাখুন, নইলে এই অভাগা কোথায় যাবে?

পাকে-প্রকারে (কলে-কৌশলে) : তাকে একবার পাকে-প্রকারে রা[illegible] করাতে হবে।

পাণ্ডববর্জিত (সভ্য লোকে[illegible] বাসের অযোগ্য) : কে যাবে ওই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়?

পাথরে পাঁচ কিল (অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন) : ফটিকের লটারি জেতার খবর এল। এখন ফটিকের পাথরে পাঁচ কিল।

পান থেকে চুন খসা (সামান্য ত্রুটি হওয়া) : তাঁর সঙ্গে কাজ করে শান্তি নেই, পান থেকে চুন খসলেই বকুনি।

পান্তা ভাতে ঘি (অপব্যবহার) : কিসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি।

পায়াভারি (অহংকার) : ভালো চাকরি পেয়ে ওর খুব পায়াভারি হয়েছে।

পাষাণ ভাঙা (দাঁড়িপাল্লায় ফের ভাঙা) : আগে তোমার পাষাণ ভাঙো, তারপর ওজন করো।

পিঁপড়ের পেট টেপা (অত্যধিক হিসাব করে চলা) : ওভাবে পিঁপড়ের টেপ টিপে সংসার চালাতে পারে না সবাই।

পুঁটিমাছের প্রাণ (ক্ষীণজীবী লোক) : একটু পরিশ্রমেই আমাদের পুঁটিমাছের প্রাণ যেন যায় যায়।

পুথি বাড়ানো (ফেনিয়ে বর্ণনা করা) : আর পুথি না বাড়িয়ে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলো।

পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা (অপ্রীতিকর আলোচনা) : আর পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কাজ নেই, অন্য কথা বলো।

পঞ্চমুখ হওয়া (অতিরিক্ত কথা বলা) : জামানের লেখা পড়ে শিক্ষক পঞ্চমুখ হয়ে প্রশংসা করলেন।

পটল তোলা (মারা যাওয়া) : বুড়ো আজ বাদে কাল পটল তুলবে অথচ রাগ কমে না।

পটের বিবি (সুসজ্জিত) : পটের বিবি হয়ে বসে থাকলে সংসার চলবে কেমন করে?

পত্রপাঠ (তৎক্ষণাৎ) : তার কথা শুনে পত্রপাঠ জাহিদকে বিদায় করা হলো।

পালের গোদা (দলপতি) : পালের গোদা দক্ষ না হলে তো দলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবেই।

পগারপার (পালানো) : বাবু জাত চোর, টের পাওয়া মাত্রই পগারপার করেছে।

ফেকলু পার্টি (কদরহীন লোক) : খাওয়ার আশায় বিয়ে বাড়িতে ইদানীং ফেকলু পার্টি হানা দিচ্ছে।

ফোপর-দালাল (উপযাচক হয়ে অন্যের ব্যাপারে কথা বলা) : পারিবারিক কলহ মীমাংসা করতে রফিকে না ডাকা হলেও সে ফোপর-দালাল সেজে বসেছে।

ফতো নবাব (সম্বলহীনের বড়লোকিভাব) : আজাদের পোশাক ও ব্যবহার ফতো নবাবের মতো মনে হয়।

ফুটিফাটা (চৌচির) : প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাটি একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেছে।

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া (সামান্য পরিশ্রমে কাতর) : আমি তো আর তোমার মতো ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাই না, আমাকে খেটে খেতে হয়।

ফোঁস মনসা (ক্রোধী লোক) : ওকে আমি বলতে পারব না, ও তো একেবারে ফোঁস মনসা।

ফপর দালালি (অতিরিক্ত চালবাজি) : সব জায়গায় ফপর দালালি করতে গেলে ধরা খেতে হয়।

ব্যস্তঘুঘু (অতি ধূর্ত লোক) : ঠান্ডু মিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সাবধান থেকো। জানো তো, তার মত ব্যস্তঘুঘু দ্বিতীয়টি নেই।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা (বিপদের ঝুঁকি নেওয়া) : অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে গেলেই ছুটি পাওয়া যাবে সত্য। কিন্তু তাঁর কাছে যাওয়া আর বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা একই কথা।

বিন্দু বিসর্গ (সামান্য অংশ) : এই ব্যাপারে আমি বিন্দু বিসর্গ জানি না।

বউ-কাঁটকি (পুত্রবধূকে যন্ত্রণা দেয়) : মেয়েটাকে তার বউ-কাঁটকি শাশুড়ি এমনই জ্বালায় যে সে এখন বাপের বাড়ি আসতে পারলে বাঁচে।

বক দেখানো (অশোভনভাবে বিদ্রূপ করা) : আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত আমাকে বক দেখাতে লাগল।

বচনবাগীশ (কথায় পটু) : কেবল বচনবাগীশ হলে তো চলবে না, কাজও করে দেখাতে হবে।

বয়সের গাছ-পাথর না থাকা (অত্যন্ত বৃদ্ধ) : তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন তোমার বয়সের গাছ-পাথর নেই।

বইয়ের পোকা (পড়ুয়া) : বাপু হচ্ছে বইয়ের পোকা; বই পেলে হাতছাড়া করে না।

বর্ণচোরা আম (বহিরঙ্গ একমাত্র পরিচয় নয়/কপট ব্যক্তি) : সে তো একটা বর্ণচোরা আম, তার আসল পরিচয় তোমরা কেউই জান না।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া (ক্ষমতা প্রদর্শন) : বড় কর্তার দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়।

বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো (সরল লোককে প্রতারণা) : আমাকে বাঙাল ভেবে হাইকোর্ট দেখাতে চাও নাকি? সুবিধা হবে না।

বাড়া ভাতে ছাই দেওয়া (সফল হওয়ার মুখে বাধা) : কেউ তার বাড়া ভাতে ছাই দেয় নি। তাহলে তার এত রাগ কিসের?

বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া (অসম্ভব কিছু পাবার চেষ্টা) : বড় লোক হবার শখ মিটেছে তো? কেন বাপু বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলে?

বামনের গরু (যে অল্প পারিশ্রমিকে বেশি কাজ করে) : ভেবে লাভ নেই। খাটতে তো হবেই। তুমি যে বামুনের গরু হয়ে জন্মেছ।

বারো সতেরো (খুঁটিনাটি) : আমার অবসর কোথায়? সারাদিন বারো সতেরো লেগেই আছে।

বারো মাস ত্রিশ দিন (প্রতিদিন) : বারো মাস ত্রিশ দিন এই হাঁড়ি ঠেলা কার ভালো লাগে?

বারো মাসে তেরো পার্বণ (উৎসবের আধিক্য) : পাড়াগাঁয়ে বারো মাসে তেরো পার্বণ তো লেগেই আছে।

বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) : বড়লোকের দয়ার উপর ভরসা করা যায় না- সে তো বালির বাঁধ।

বাহাত্তরে ধরা (মতিচ্ছন্ন হওয়া) : কী আবোল-তাবোল বলছ, তোমায় কি বাহাত্তরে ধরেছে?

বিড়াল-তপস্বী (ভণ্ড লোক) : সাধু সেজে থাকলেও সে যে আসলে একটি বিড়াল-তপস্বী তা এখন সবাই বুঝে গেছে।

বিড়ালের আড়াই পা (ক্ষণস্থায়ী রাগ) : তাঁর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন? তাঁর রাগ তো বিড়ালের আড়াই পা।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (অপ্রত্যাশিত বিপদ) : হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো বাবার মৃত্যু হল।

বিরাশি সিক্কা ওজন (বিপুল ওজন) : সে বসিয়ে দিল বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড়।

বুড়ি ছোঁয়া (নামমাত্র নিয়ম পালন) : অফিসের কাজে তার আর তেমন মন দেখি না, কেবল বুড়ি ছোঁয়া যায়।

বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ (বোকামি) : বুড়ো বয়সে তোমার এই চূড়াকরণ মানায় না।

বুদ্ধির ঢেঁকি (নির্বোধ লোক) : ও যা বুদ্ধির ঢেঁকি, ওর ওপর নির্ভর করা যায় না।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো (অপাত্রে মূল্যবান জিনিস) : এক ঘণ্টা ধরে এই যে দামি দামি কথা শোনালে ওদের, এতে কিছু লাভ হবে? ওরা কি তোমার কথামতো কাজ করবে? কী হবে বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে?

বোঝার উপর শাকের আঁটি (অতিরিক্তের অতিরিক্ত) : আমার এত জিনিসের মধ্যে তোমার ওই বইগুলো তো বোঝার উপর শাকের আঁটি।

ব্যাঙের আধুলি (সামান্য পুঁজি হলেও যা গর্বের) : স্বামীর রেখে যাওয়া ওই কটি টাকা এখন বিধবার ব্যাঙের আধুলি হয়েছে।

ব্যাঙের লাথি (নগণ্য লোকের দ্বারা অপমান) : না হয় বয়স হয়েছে, তাই বলে কি আজ ব্যাঙের লাথি খেতে হবে?

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব ব্যাপার) : ব্রজবাবু টাকা দান করেছেন? এ ব্যাঙের সর্দি ছাড়া আর কী?

বকধার্মিক (ভণ্ড) : সমাজে বকধার্মিকের অভাব নেই।

বগল বাজানো (আনন্দ প্রকাশ করা) : পরকে বিপদে পড়তে দেখলে বগল বাজিয়ো না।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো (বাইরে আড়ম্বর ভেতরে শূন্যতা) : কাজের আয়োজনের সময়ে খুব আঁটাআঁটি, কিন্তু শেষ দিকে যত শিথিলতা- এযে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো।

বয়ে যাওয়া (ক্ষতিবৃদ্ধি জ্ঞান না করা) : তোমার পাশের মিষ্টি না খেলে আমার বয়েই গেল।

বসন্তের কোকিল (সুসময়ের বন্ধু)। ইহাকে তো বসন্তের কোকিল, দুঃখের দিনে সে পাশে থাকবে না।

ঘুঘুর ঘুম রাম নাম (স্বভাবটি বিচিত্রতম)। গভীরনিশুত রাত্রি যখন কারো প্রশংসা করে তখন সেটা ঘুঘুর ঘুম রাম নামের মত শোনায়।

ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকা (ভয়ে জড়সড় হওয়া)। ওই বোম-পটকা শোকটার ভয়েই তুমি কেঁচো হয়ে আছ!

ভাঁড়ে মা ভবানী (একেবারে নিঃস্ব)। টাকা দেবে কোত্থেকে? ভাঁড়ে যে মা ভবানী।

ভিজেলের চাকে ঢোঁড়া দেওয়া (উদ্যমি দেয়া)। কী দরকার ভিজেলের চাকে ঢোঁড়া দিয়ে? চুপচাপ সরে যাও।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা (অনড় সংকল্প)। ও যদি বলে যাবে না তো যাবেই না, ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা থেকে ওকে কেউ নড়াতে পারবে না।

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (অপচয়জনক ব্যাপার) : একে লোডশেডিং তার উপর তুমুল বৃষ্টি। এত ভালো আয়োজন সত্ত্বেও সব ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হল।

ভালুক ঝুর (এই আসে, এই যায়) : নতুন প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের ভালুক ঝুর ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

ভূষণ্ডির কাক (বিচক্ষণ ব্যক্তি) : সব অধ্যাপকই ভূষণ্ডির কাক হতে পারেন না। (বি. দ্র. পুরাণে ভূষণ্ডি নামের এক ত্রিকালজ্ঞ কাকের নাম পাওয়া যায়।)

ভস্মে ঘি ঢালা (নিষ্ফল কাজ) : মাস্তান কামলাকে উপদেশ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

ভাদ্র মাসের ডাল (প্রচণ্ড কিল) : পিঠে ভাদ্র মাসের ডাল পড়লেই ঠিক হবে।

ভানুমতীর খেল (অবিশ্বাস্য ব্যাপার) : না পড়ে প্রথম বিভাগে পাস করে সে ভানুমতীর খেল দেখিয়েছে।

ম বিড়াল (কপটচারী) : মনে করেছিলাম শিরিন ভিজে বিড়াল, এখন দেখি তা না।

ম ঘুঘু চরানো (সর্বস্বান্ত করা) : আগের দিনে অনেক জমিদারই প্রজার ভিটেয় ঘুঘু চরাতেন।

ভূত ঝাড়া (নির্দয়ভাবে মারার বা পরীক্ষা নেওয়া) : শিক্ষক এমন ভূত ঝাড়া ঝাড়লেন যে ছাত্রেরা পড়া শিখে ক্লাসে আসতে বাধ্য হলো।

ভূতের বেগার খাটা (নিষ্ফল পরিশ্রম করা) : করলাম তবু নাম হলো না- শুধু ভূতের বেগার খাটা হলো।

ভরাডুবি (সর্বনাশ) : কারো ভরাডুবি করতে গেলে নিজেকেই ভরাডুবিতে পড়তে হয়।

ভেরেন্ডা ভাজা (অভ্যাসে সমস্যা নয় কথা) : সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত, ভেরেন্ডা ভাজা ঠিক নয়।

ভূইফোড় (নতুন আগমন) : ভূইফোড়দের আগমনে পুরাতনদের কদর কমে যায়।

মুখে ফুল-চন্দন পড়া (ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হওয়ার কামনা) : তুমি বলছ, আমি গোল্ডেন এ প্লাস পাবো?- তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

মামদোবাজি (প্রতারণা) : শহরের রাস্তায় কিছু লোক মামদোবাজি করে জীবন চালায়।

ম-ম করা (সুগন্ধে ভরে যাওয়া) : ঘরটা গোলাপের গন্ধে একেবারে ম-ম করছে।

মকশো করা (অভ্যাস করা) : দুদিন ধরে সে কাদোটা মকশো করছে।

মণিকাঞ্চন যোগ (উপযুক্ত মিলন) : যেমন পাত্র তেমনি পাত্রী- একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

মণিহারা ফণী (প্রিয়জনের জন্য অস্থির লোক) : একটা সামান্য কলম হারিয়েই সে এমন মণিহারা ফণীর মতো ভাব করছে?

মন উচাটন হওয়া (অস্থির হওয়া) : ছেলে দূরে থাকে, তাকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে মন একটু উচাটন হয় বইকি!

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য কাজে বিরাট আয়োজন) : একটা ছিঁচকে চোর ধরতে এত আয়োজন? এ তো মশা মারতে কামান দাগার ব্যবস্থা।

ময়ূর ছাড়া কার্তিক (রূপবান পুরুষ) : সুন্দর পোশাকে সালামকে দেখাচ্ছে একেবারে ময়ূর ছাড়া কার্তিকের মতো।

মহাভারত অশুদ্ধ (বড় রকমের অপরাধ) : না হয় তাঁকে নেমন্তন্ন করা হয় নি- তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হল?

ঘরের ছেলে ঘরে ডাকা (পরে পরে বারোবার) : বহিত সুন্দর টাকায় দোকান কিনে ঘরের ছেলে ঘরে ডাকলেন।

ঘরের ঘরের পুরুষোক (লোক-দেখানো শোক) : খুকুমণি খুকুমণি, তোমাকে আর মায়ের ঘরের পুরুষোক দেখাতে হবে না, আমার দুঃখ তোমার মরণ কত তা জানা আছে।

ঘাড়ে আকাশ ভেঙে পড়া (আকস্মিক বিপদে) : এই দুর্ঘটনায় তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

ঘরের ঘরে কুকুর পাগল (ভীষণ বিপদে অস্থির অবস্থা) : একদিকে চাকরি নেই, অন্যদিকে বাড়িতে অসুখ লেগেই আছে, তার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা।

ঘরের গুড়ে বালি (সর্বনাশসাধন) : মানের গুড়ে বালি দিয়ে মেয়েটা ডোবাচ্ছে।

ঘরোয়ার আমল (অতি প্রাচীনকাল) : এ কী পরেছ? এ তো সেই মান্ধাতার আমলের পোশাক?

ঘিয়ের ছুরি (আপাতমধুর কিন্তু তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী) : কথা তো নয় যেন ঘিয়ের ছুরি!

চেয়ে না চাইতে জল (আশাতীত ফল) : চাইলাম চা, এনে দিলে এক প্লেট লুচি-হালুয়া: এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

চেয়ে মেপে বেলা হওয়া (বয়স বাড়া) : তাকে মোটেই ছোট মনে করো না, মেপে মেপে বেলা কম হয় নি।

চৌতাল চড়ানো (নেশা করা) : শত তাকাতাকি করলেও তিনি এখন আসবেন না; তিনি এখন চৌতাল চড়াচ্ছেন।

চরে মুল্লুক (অরাজক দেশ) : চাঁদা চাইলেই দিতে হবে, মগের মুল্লুক পেয়েছ নাকি?

চালকুমড়া (উচ্চকণ্ঠে শোক প্রকাশ) : ছেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শুনে মা চালকুমড়া জুড়ে দিল।

চড়ের ওপর ঘাঁড়ার ঘা (বিপন্ন লোকের উপর অত্যাচার) : চাকরি গিয়ে রক্ষা নেই, জরিমানা লক্ষ টাকা- এ যে চড়ের ওপর ঘাঁড়ার ঘা।

চালকল (অন্তঃসারশূন্য) : চালকল ফল সম্পন্ন লোককে কেউ পছন্দ করে না।

চাঁই ধরা (দায়িত্ব নেওয়া) : না বুঝে চ্যাও ধরা ঠিক না।

চোদ্দোর চৌষট্টি কলিজা পর্যন্ত (ভিরকুটে) : চমন, খান্না, চৌধুরি, তিনের যে তিনের আসল চেহারা এখন বেরিয়ে পড়েছে। চোদ্দোর চৌষট্টি কলিজা পর্যন্ত।

চখন-তখন অবস্থা (দুর্বল অবস্থা) : বোন দিয়ার চখন-তখন অবস্থা, যে কোন মুহূর্তে বাড়ি চলে যাবে।

চড়ের কই (বেশিক্ষণ মধুর নয় এমন ভাব, মুখের কথার সঙ্গে যার মনের কোন যোগ নাই) : চড়ের কই মাগো ডাকে না।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা (খুব সমস্যা হলে) : তোমরা এখন নিজের কথা ভাবো। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

চক্ষের পানি (দুঃখের কান্না) : বুড়ো চক্ষের পানে মত তার সম্পত্তি আমাকে দেবেন।

যমের অরুচি (যে সহজে মরে না) : দুষ্টুর তো যমেরও অরুচি, নইলে এতোর কেউ নাই।

যম যন্ত্রণা (খুব কষ্ট) : মহাযুদ্ধের সময়ে বাড়িতলের যম যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু দেয় নি।

যমের দোসর (নিষ্ঠুর ব্যক্তি) : লোকটা যমের দোসর, তার দ্বারা না মারাটাই স্বাভাবিক।

যমের ভুল (যার মরণ হয় না) : কষ্টের সংসারে আমি কি তাহলে যমের ভুল হয়ে বেঁচে আছি?

রথ দেখা কলা বেচা (উভয়কর্ম সাধন) : অফিসের কাজে কক্সবাজার গিয়ে সমুদ্র-স্নানও করে এলাম। একই সঙ্গে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হলো।

রাম ভক্তি কি রহিম ভক্তি (উভয় সংকট) : একই দিনে পড়েছে বিসিএস (প্রিলিমিনারি) এবং এমএ পরীক্ষা। আমার তো রাম ভক্তি কি রহিম ভক্তি অবস্থা।

রক্তের অক্ষরে লেখা (সাংগ্রামের কাহিনি) : এই সব বীর দেশপ্রেমিকের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে।

রগচটা (অল্পেই রাগ) : আহসানকে বাঁচাতে চাইলে রগচটাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভালো।

রাঙা শুক্রবার (কোনো দিনই নয়) : করে আর ওটা আমাকে দেবে? রাঙা শুক্রবারে?

না রাম না গঙ্গা (ভালো মন্দ কিছুই না) : আমি যতই প্রশ্ন করি সে না রাম না গঙ্গা কিছুই বলে না।

রাম রাজত্ব (শান্তিপূর্ণরাজত্ব রাজা) : মুখে রাম রাজত্বের কথা বললেও চালাচ্ছে এখন দেশটাকে।

রামশরণের ছানা (গোবেচারামুখো লোক) : কী ব্যাপার, তখন থেকে রামশরণের ছানা হয়ে আছ যে?

রুই-কাতলা (প্রতিপত্তিশালী লোকজন) : আমরা তো চুনোপুটি, ধরতে যাও, তো রুই-কাতলাদের ধরো।

রাই কুড়িয়ে বেল (তুচ্ছ সম্বলে বৃহৎ) : ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও একদিন দেখবে রাই কুড়িয়ে বেল করেছ।

রাবণ বোয়াল (সর্বগ্রাসী ব্যক্তি) : সমাজের রাবণ বোয়ালরাই সব লুটে খায়।

রাঙা মুলো (প্রিয়দর্শন কিন্তু গুণহীন) : এমন রাঙা মুলো দিয়ে এ কঠিন কাজ হবে না।

রাজা উজির মারা (আড়ম্বরপূর্ণ গালগল্প) : লেখাপড়ায় নাম নেই কেবল রাজা উজির মারা হচ্ছে।

রাবণের গোষ্ঠী (বড় পরিবার) : রাবণের গোষ্ঠীকে পালতে গিয়েই আমার জীবন শেষ।

রাবণের চিতা (চির অশান্তি) : একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে বুড়ির বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে।

রাশভারি (গম্ভীর প্রকৃতির) : রাশভারি লোকের সহ্যশক্তি একটু বেশিই হয়।

লবেজান করা (নাজেহাল করা) : চিড়িয়াখানায় কিছু দুষ্ট মানুষ কাজনকে লবেজান করে ছেড়েছে।

লক্কা পায়রা (ফুল বাবু) : বেকার মানুষ তুমি। অথচ লক্কা পায়রা হয়ে ঘুরে বেড়াও কেন?

লঘুপাপে গুরুদণ্ড (সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তি) : সামান্য একটা ফুলের জন্যে ছেলেটাকে এমনভাবে মারলে? লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল না?

লোটাকম্বল (সামান্য সংগতি) : লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

লোহার কার্তিক (কালো সুদর্শন) : লোহার কার্তিক হলেও সমাদরযোগ্য কিন্তু নদীর পুতুল আমার প্রয়োজন নেই।

লগন চাঁদা (ভাগ্যবান) : নিজের তো আছেই, স্ত্রীর সম্পত্তিও পেয়েছে, জামাইর মত লগন চাঁদা আর কে?

লেজে গোবরে করা (বিপর্যস্ত করা) : যোগ্যতা না থাকলে কাজ তো লেজে গোবরে করবেই।

লেজে পা পড়া (আত্মাভিমানে আঘাত লাগা) : ভালোকাজ হোক, লেজে পা পড়লে কেউ তা সহ্য করে না।

লেফাফা দুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) : ভেতরে যাই থাকুক না কেন, সে আচরণে বেশ লেফাফা দুরস্ত।

উঁচির সাক্ষী মাতাল (অসৎ লোকের অসৎ বন্ধু) : উঁচির সাক্ষী মাতালের মতো চোরকে থানা থেকে ছাড়াতে এসেছে তারের পকেটমার।

ঊর্ধ্ব-নিম্নের যুদ্ধ (ভীষণ লড়াই) : আমাদের রাজনীতিতে বন্ধুত্বের চেয়ে নেতাদের ঊর্ধ্ব-নিম্নের লড়াই যেন বেড়েই চলেছে।

শবরীর প্রতীক্ষা (দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা) : ছুটি ফিরে এসেছে, তোমার শবরীর প্রতীক্ষাও শেষ হল।

শালগ্রামের শোয়া বসা (নির্বিকার লোকের অসহ অবস্থা) : তাঁর মনের কথা জানব কী করে? দুখেও হা-হুতাশ নেই, সুখেও হই চই নেই। শালগ্রামের শোয়া বসা বোঝা ভার।

শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র বংশধর) : আমার ওই শিবরাত্রির সলতেকে কি দূরে যেতে দিতে পারি?

শিয়রে শমন (মৃত্যু আসন্ন) : আমার এখন শিয়রে শমন, তাই মাথারও ঠিক নেই।

শিয়ালের যুক্তি (অসম্ভব যুক্তি) : তোমার ওই শিয়ালের যুক্তি রাখো তো, কাজের কথা কিছু বলো।

শিরে সংক্রান্তি (সামনেই বিপদ) : আমার এখন শিরে-সংক্রান্তি, কিভাবে সব সামলাব তাই ভাবছি।

শুঁড় বার করা (লোভ করা) : আমার কলমটাকে অমনি শুঁড় বার করছ কেন?

শুয়োরের গোঁ (ভয়ানক) : তোমার ওই শুয়োরের গোঁ ছাড়তে হবে- নইলে আমি কথাই বলব না।

শ্মশান-বৈরাগ্য (সাময়িক বৈরাগ্য) : ও রকম শ্মশান বৈরাগ্য তো অনেকেই দেখছি, সত্যিকার ত্যাগ করতে পারে কজন?

শ্যাম রাখি না কুল রাখি (উভয়সংকট) : ঘরে গৃহিণীর অভিমান আর অফিসে বড়বাবুর রাগ। আমার এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা।

শকুনি মামা (অনিষ্টকর আত্মীয়) : শকুনি মামাদের কাছে থেকে যত দূরে থাকবে ততই মঙ্গল।

শনির দশা (দুঃসময়) : আমার শনির দশা কবে যে কাটবে!

শাঁখের করাত (উভয় সংকট) : সত্য কথা বললে লোকটির চাকরি যাবে, আর গোপন করলে অন্যায়ের শরিক- এ যে শাঁখের করাত।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (দোষ গোপনের বৃথা চেষ্টা) : লেখাপড়া না করে, শাক দিয়ে মাছ ঢাক কেন?

শালে বর (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ) : তার উপকার করতে গিয়ে বরং চাকরি টাকা লাভ হলো, একেই বলে শালে বর।

শ্রীঘর (জেলখানা) : দুর্নীতির দায়ে রাজনীতিবিদদেরও শ্রীঘরে যেতে হয়।

শিকায় তোলা (স্থগিত) : পরীক্ষা শিকায় তোলা হলে লাভ থেকে বরং ক্ষতির বেশি।

ষাঁড়ের গোবর (অপদার্থ লোক) : ছেলেগুলো সব ষাঁড়ের গোবর, পড়ে পড়ে মার খায়।

ষড় গণ্ড জ্ঞান (কাণ্ডজ্ঞান) : ষড় গণ্ড জ্ঞান নেই যার এমন লোক হল সভাপতি!

ষোল কড়াই কানা (সম্পূর্ণ বিনষ্ট) : অপদার্থের হাতে পড়ে সংসারের ষোল কড়াই কানা হল দেখছি।

ষাটের কোলে (অধিক বয়স) : ষাটের কোলে এসেও তোমার পরকালের চৈতন্য হল না।

সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপ (চরম অমনোযোগ ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয়) : 'বনলতা সেন' কবিতা নিয়ে এতো বিস্তৃত আলোচনা শোনার পর জিজ্ঞেস করছো : বিদিশার বাড়ি কোথায়? এ যে সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাপের মতো প্রশ্ন!

সবেধন নীলমণি (একমাত্র সম্পদ) : পরপর তিন সন্তান মৃত্যুর পর এই অন্ধ সন্তানই মাতাপিতার কাছে সবেধন নীলমণি।

সপ্তমে চড়া (প্রচণ্ড উত্তেজনা) : এসব অনাচার দেখে তাঁর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল।

সবুরে মেওয়া (ধৈর্যে সুফল) : সবুরে মেওয়া ফলে মনে রেখেই দুঃখের দিন কাটাচ্ছি।

সাজ করতে দোল ফুরানো (প্রস্তুতির জন্য অত্যধিক সময় নেওয়া) : আর যাবে কখন? তোমার দেখছি সাজ করতে দোল ফুরাল।

সাপের ছুঁচো গেলা (উভয়সংকটে পড়া) : যাকে ঘরে থাকতে দিয়েছি সেই এখন আমার

সর্বনাশ করে দাঁড়িয়েছে। আমার এখন সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা হয়েছে

সাতকালে (বহুদিন পরে) : সে নিজের মুখের কথা সাতকালে কখনো ফিরিয়ে নেয় না।

সাপের পাঁচ পা দেখা (মরণকালে উপস্থিত) : বাবার টাকা কবে সাপের পাঁচ পা দেখবে না কি?

সুখে থাকতে ভূতে কিলায় (অকারণে দুঃখ ডেকে আনা) : এই বয়সে বুড়ি ফেলে বিয়ে করতে গেলে কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

সুবের পায়রা (বিলাসের বন্ধু) : এই সুখের পায়রারা কতদিন তোমার কাছে কাছে থাকবে?

সুবুক-সন্তান (গৌরবহীন) : সাধের সুবুক সন্তান তার কেন মুখোশের ভক্ত হবে

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি (বিপরীতের মিলন) : আমাকে ও সহজে ঘায়েল করা যাবে না, ওর ব্যবসার সোনার কাঠি রূপার কাঠি যে আমার হাতে!

সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব বস্তু) : তখন সাধে কুলোবে কিন্তু এখন কিছু টাকা এখন সোনার পাথর বাটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বর্গে বাতি দেওয়া (বংশ রক্ষা করা) : ওই কুলাঙ্গার ছেলের স্বর্গে বাতি দেবে কে আশা করি না।

সাক্ষিগোপাল (বাক্তিত্বহীন নিষ্ক্রিয় দর্শক) : সংসার এখন বিধির হাতে, কর্তা তো সাক্ষিগোপাল মাত্র।

সাত খুন মাফ (অত্যধিক প্রশ্রয়) : বন্ধুর সাত খুন মাফ, বড় আশার কাছে অভিযোগ করে লাভ নেই।

সাত সতের (বিচিত্র বকমের) : এই বকম সারাদিন সাত সতের কাজে জড়িয়ে থাকে।

সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিল) : বর সুপুরুষ তদুপরি সুন্দরী, একেবারে সোনায় সোহাগা।

সের দরে (সামান্য মূল্যে/সস্তায়) : ঘরে এতো পুরনো পত্রিকা রেখে কী হবে? সের দরে হলেও বেচে দাও।

চকলা মরিচ	: Chili (চিলি)
সরিষা	: Mustard (মাস্টার্ড)
হলুদ	: Turmeric (টারমেরিক)

পোশাক-পরিচ্ছদ
CLOTHES AND GARMENTS

আলখাল্লা	: Mantle (ম্যান্টল)
এতুনা	: Scarf (স্কার্ফ)
কাঁথা	: Quilt (কুইল্ট)
কাপড়	: Cloth (ক্লথ)
কম্বল	: Blanket (ব্লাঙ্কেট)
কম্বল	: Rug (রাগ)
কোট	: Coat (কোট)
কোমরবন্ধ	: Belt (বেল্ট)
গলাবন্ধনী	: Neck-tie (নেক-টাই)
গামছা	: Napkin (ন্যাপকিন)
চাদর	: Wrapper (র‍্যাপার)
চটিজুতা	: Slipper (স্লিপার)
জামা	: Petticoat (পেটিকোট)
জামা	: Shirt (শার্ট)
জ্যাকেট	: Jacket (জ্যাকেট)
জুতা	: Shoe (শু)
টুপি	: Cap (ক্যাপ)
তোয়ালে	: Towel (টাওয়েল)
দস্তানা	: Gloves (গ্লাভস)
পোশাক	: Dress (ড্রেস)
পাজামা	: Trouser (ট্রাউজার)
প্যান্ট	: Pant (প্যান্ট)
পাগড়ি	: Turban (টার্বান)
ফিতা (পরিমাপের)	: Lace (লেস)
ফিতা	: Tape (টেপ)
বক্ষবন্ধনী	: Bra (ব্রা)
বুট জুতা	: Boot (বুট)
মখমল	: Velvet (ভেলভেট)
মোজা	: Stocking (স্টোকিং)
মোজা (খাটো)	: Socks (সক্স)
শাড়ি	: Sari (সারি)

অলংকার
ORNAMENTS

অলংকার	: Ornament (অর্নামেন্ট)
আংটি	: Ring (রিং)
চুড়ি	: Wristlet (রিস্টলেট)
চুড়ি	: Bracelet (ব্রেসলেট)
তাজ, টায়রা	: Tiara (টাইয়ারা)
দুল/ছোট লকেট	: Pendant (পেন্ডেন্ট)
লকেট	: Locket (লকেট)
নথ	: Nose ring (নোজ রিং)
বুতাম	: Button (বাটন)
বালা	: Bangle (ব্যাঙ্গল)
মুকুট	: Crown (ক্রাউন)
মাদুলি	: Amulet (অ্যামুলেট)
হার	: Necklace (নেকলেস)
হার	: Chain (চেইন)

রোগ
DISEASES

অসুস্থ	: Ill (ইল)
অসুস্থতা	: Illness (ইলনেস)
অর্শ	: Piles (পাইলস)
আমাশয়	: Dysentery (ডিসেন্ট্রি)
আঁচিল	: Wart (ওয়ার্ট)
আঘাত	: Wound (উন্ড)
ওলাওঠা	: Cholera (কলেরা)
কাঁপুনি	: Shivering (শিভরিং)
কাশি	: Cough (কফ)
কোষ্ঠকাঠিন্য	: Constipation (কনস্টিপেশন)
কৃমি	: Worm (ওয়ার্ম)
কুষ্ঠ	: Leprosy (লেপ্রোসি)
কালাজ্বর	: Black-fever (ব্ল্যাক-ফিভার)
খোস-পাচড়া	: Scabies (স্কেবিস)
খিলধরা	: Cramp (ক্রাম্প)
খিচুনি	: Convulsion (কনভালশন)
খিচুনি	: Spasm (স্পাজম)
গর্ভপাত	: Abortion (এ্যাবোরশন)
গুটিবসন্ত	: Small-pox (স্মল-পক্স)
গলগণ্ড	: Goitre (গইটার)
ঘামাচি	: Prickly-heat (প্রিকলি হিট)
ঘা	: Sore (সোর)
চোখওঠা	: Ophthalmia (অপথালমিয়া)
চর্মরোগ	: Skin-diseases (স্কিন-ডিজিজ)
চুলকানি	: Itch (ইচ)
জলবসন্ত	: Chicken pox (চিকেন পক্স)
জ্বর	: Fever (ফিবার)
ন্যাপথলিন	: Naphtha (ন্যাপথা)
পোড়াপোড়া	: Roasted (রোস্টেড)
টাক	: Baldness (বাল্ডনেস)
তিল	: Mole (মোল)
দাঁতব্যথা	: Toothache (টুথ এক)
দাগ	: Mark (মার্ক)
দাদ	: Ring worm (রিংওয়ার্ম)
নালিঘা	: Sinus (সাইনাস)
পীড়িত	: Sick (সিক)
প্রদাহ	: Inflammation (ইনফ্ল্যামেশন)
পালাজ্বর	: Ague (এ্যাগু)
প্লীহা	: Spleen (স্প্লিন)
পচা ঘা	: Gangreen (গ্যাংগ্রিন)
পুঁজ	: Pus (পাস)
পূতব্রণ	: Carbuncle (কারবাঙ্কল)
পাণ্ডুরোগ	: Jaundice (জন্ডিস)
প্লেগ	: Plague (প্লেগ)
ফুসফুস প্রদাহ	: Pneumonia (নিউমোনিয়া)
ফাঁপা	: Hollow (হলো)
ফুসকুড়ি	: Pimple (পিম্পল)
বিরামজ্বর	: Remission (রিমিসন)
বদহজম	: Indigestion (ইনডাইজেশন)
বমি	: Vomit (ভমিট)
বহুমূত্র	: Diabetes (ডায়াবেটিস)
ব্যথা	: Pain (পেইন)
বাসি	: Stale (স্টেল)
বিষফোড়া	: Boil (বয়েল)
বেদনা	: Ache (এক)
বাত	: Gout (গাউট)
মাথা ধরা	: Headache (হেডেক)
মেচেতা, আঁচিল	: Acne (একনি)
ম্যালেরিয়া জ্বর	: Malaria (ম্যালেরিয়া)
মৃগীরোগ	: Hysteria (হিস্টেরিয়া)
যকৃত	: Liver (লিভার)
রোগজীবাণু	: Germ (জার্ম)
শোথ	: Dropsy (ড্রপসি)
সর্দি	: Cold (কোল্ড)
হাঁপানি	: Asthma (অ্যাজমা)
হৃদরোগ	: Heart diseases (হার্ট ডিজিজ)
হাম	: Measles (মিজলস)

ওষুধ এবং চিকিৎসা
MEDICINES & TREATMENT

অনুপান	: Antacid (এন্টাসিড)
অস্ত্র চিকিৎসা	: Surgery (সার্জারি)
অস্ত্র চিকিৎসক	: Surgeon (সার্জন)
অস্ত্রোপচার	: Operation (অপারেশন)
আরোগ্য	: Cure (কিউর)
ওষুধ	: Drug (ড্রাগ)
গুঁড়া	: Powder (পাউডার)
চিকিৎসক	: Physician (ফিজিশিয়ান)
চোখের মলিশ	: Eye-ointment (আই-অয়েন্টমেন্ট)
ঢেঁক	: Fomentation (ফোমেন্টেশন)
ট্যাবলেট	: Tablet (ট্যাবলেট)
ডাক্তার	: Doctor (ডক্টর)
তাপমান যন্ত্র	: Thermometer (থার্মোমিটার)
তরল	: Liquid (লিকুইড)
দন্ত চিকিৎসক	: Dentist (ডেন্টিস্ট)
দন্ত চিকিৎসা	: Dentistry (ডেন্টিস্ট্রি)
ধাত্রী	: Midwife (মিডওয়াইফ)
প্রলেপ	: Poultice (পল্টিস)
পথ্য	: Diet (ডায়েট)
পট্টি বাঁধা	: Dressing (ড্রেসিং)
পিচকারি	: Syringe (সিরিঞ্জ)
ফোঁটা	: Drop (ড্রপ)
বোতল	: Bottle (বোটল)
বড়ি	: Pill (পিল)
মলিশ	: Ointment (অয়েন্টমেন্ট)
মাত্রা	: Dose (ডোজ)
রোগী	: Patient (পেশেন্ট)
শিশি	: Phial (ফাইল)
সিরাপ	: Syrup (সিরাপ)
হাসপাতাল	: Hospital (হসপিটাল)

পেশা
OCCUPATIONS

অধ্যক্ষ	: Principal (প্রিন্সিপাল)
অধ্যাপক	: Professor (প্রফেসর)
অর্থনীতিবিদ	: Economist (ইকোনমিস্ট)
আইনজীবী	: Lawyer (লইয়ার)
উপদেষ্টা	: Adviser (এ্যাডভাইজার)

হরিষে বিষাদ (আনন্দে হঠাৎ দুঃখ)। বিয়ের দিন বরযাত্রীর বাস দুর্ঘটনায় পতিত হলে বিয়ে বাড়িতে হরিষে বিষাদ দেখা দেয়।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (সুযোগ নষ্ট করা) : সমিতি থেকে বিনা সুদে ঋণ নিয়ে কাঞ্চনকে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হতে বলা হলেও বেকার ও অলস কাঞ্চন ঋণগ্রহণ করে নি। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার জন্য একদিন তাকে দুঃখ করতে হবে।

হরিহর আত্মা (অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব)। ওরা দুজন তো হরিহর আত্মা, একজন যা করবে, অন্যজনও তাই করবে।

হলুদের গুঁড়ো (সমস্ত ব্যাপারে যে উপস্থিত) : সে তো হলুদের গুঁড়ো হয়ে সর্বত্র হাজির।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া) : আমাকে চটালে কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব।

হাড়ে মাসে জ্বালানো (অত্যন্ত উত্যক্ত করা) : ছেলেটা কি শুধু ওর বাপ-মাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে? পাড়াসুদ্ধ সবাইকে জ্বালাচ্ছে।

হাড়ে বাতাস লাগা (স্বস্তি পাওয়া) : বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ শুনে জনি হাড়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়াচ্ছে।

হাতে আকাশ পাওয়া (অভাবিতভাবে কিছু লাভ) : সে একটা সময় ছিল, যখন একটা কলম পেলেই মনে হত হাতে আকাশ পেলাম।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার (প্রকৃত প্রমাণ দেয়া) : তর্কাতর্কি করে কী হবে? হাত পাঁজি মঙ্গলবার, অভিধান খোলো, সব তর্কের অবসান হবে।

হাতির গলায় ঘণ্টা (বয়স্ক বরের বালিকা বধূ) : বাবা বেঁচে থাকলে মেয়েটাকে হাতির গলার ঘণ্টা হতে হত না।

হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা (সমাজচ্যুত করা) : গ্রামের লোকেরা একজোট হয়ে নিরাপরাধ লোকটির হুঁকো-নাপিত বন্ধ করে দিল।

হচ্ছে হবে (দীর্ঘসূত্রিতা) : হচ্ছে হবে বলে তো অনেক সময় চলে গেল, এবার কিছু একটা কর।

হদিস পাওয়া (সঠিক সংবাদ পাওয়া) : অনেক চেষ্টায় হারানো ছেলেটার হদিস পাওয়া গেছে।

হ য ব র ল (বিশৃঙ্খল) : পড়ার টেবিলটা হ য ব র ল হয়ে আছে।

হরি ঘোষের গোয়াল (বহু অপদার্থ ব্যক্তির সমাবেশ) : ছাত্রাবাসটা হয়েছে হরি ঘোষের গোয়াল।

হরিলুট (অপচয়) : পরের টাকা পেলে হরিলুট দেওয়া যায়।

হস্তিমূর্খ (ভীষণ বোকা) : সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না, তুমি তো একটা হস্তিমূর্খ দেখছি।

হাঁটুর বয়স (নিতান্ত শিশু) : ওই হাঁটুর বয়সের ছেলেটার সঙ্গে পারলে না?

হেস্তনেস্ত (মীমাংসা) : এ বিরোধের একটা হেস্তনেস্ত না করলে বিপদ হবে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (হেলায় সুযোগ নষ্ট করা) : এমন ভাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে তো তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে!

হাতে খড়ি (শিক্ষার সূচনা) : মনি তার সন্তানের হাতে খড়িতে ভীষণ খুশি।

হাপিত্যেশ (ব্যাকুল কামনা) : তোমার জন্য হাপিত্যেশ করে আমার সমস্ত সময়টা নষ্ট হল।

হা-ঘরে (গৃহহীন) : তোমার তো হা-ঘরে হবার মতো অবস্থা ছিল না।

হাতটান (চুরির অভ্যাস) : তার হাতটানটা আর বুঝি গেল না।

হাড় হাভাতে (হতভাগা) : একেবারে হাড় হাভাতে মেয়ে, একে দিয়ে কোনো কিছু হবে না।

হালে পানি পাওয়া (সুবিধা করা) : রাজনীতির মাঠে সবাই কি আর হালে পানি পায়!

প্রবাদ-প্রবচন থেকে Proverbs

প্রত্যেক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রবাদ-প্রবচন। যে ভাষায় যত বেশি প্রবাদ-প্রবচন থাকবে সে ভাষা ততো বেশি ঋদ্ধ এবং প্রাচীন। নতুন ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন কম থাকে। কারণ প্রবাদ-প্রবচন গড়ে ওঠে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। ঐতিহ্যগতভাবেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রবাদ-প্রবচন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করেছে। কিছু হুবহু আছে, কিছু সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে (যেমন : মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ > নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ)। ইংরেজি ভাষাতেও Proverbs আছে। সেগুলো গড়ে উঠেছে সে দেশের পরিবেশ ও সময়ের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার সহযোগে। তাই বাংলা প্রবাদের শব্দ আর ইংরেজি Proverbs-এর word অনেকক্ষেত্রেই হয়তো মিলবে না। কিন্তু প্রবাদ-প্রবচন এবং Proverb-এর লক্ষ্য যেহেতু নির্দিষ্ট শব্দসমূহের বাইরে অনেক বেশি অর্থ প্রকাশ করা, সেহেতু এই চেতনার দিক থেকে প্রবাদ-প্রবচন এবং Proverb মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। তবে লক্ষ করেছি, Proverbs-এ অনেক বেশি পিতৃতান্ত্রিক মনোভঙ্গি ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত। Proverbs-এ 'সে' বা 'তার' অর্থে সব সময় He, His ব্যবহার হয়েছে, কখনো She বা Her ব্যবহার হয় নি। আবার একটি Proverb হলো : An Ethiopian will not change his skin. দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বর্ণবাদী হলে এ ধরনের Proverb-এর সৃষ্টি হতে পারে। সে দিক থেকে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনসমূহ অনেক বেশি উদার দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এ অধ্যায়ে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের আলোকে সমঅর্থজ্ঞাপক ইংরেজি Proverbগুলো ইংরেজি উচ্চারণ সহযোগে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

বাংলা ভাষা ব্যবহারের সময় উপযুক্ত স্থানে প্রবাদ-প্রবচন এবং ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের সময় উপযুক্ত স্থানে Proverb ব্যবহার করলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

১. অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু – A friend in need is a friend indeed (এ ফ্রেন্ড ইন নিড্ ইজ এ ফ্রেন্ড ইন্‌ডিড)।

২. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী – A little learning is a dangerous thing (এ লিট্‌ল্ লার্নিং ইজ্ এ ডেনজারাস্ থিং)।

৩. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – All covet, all lost (অল কাভেট অল লস্ট্)।

৪. অভিজ্ঞ লোক সহজে বোকা বনে না – An old bird is not to be caught with chaff (অ্যান্ ওল্ড বার্ড ইজ্ নট্ টু বি কট্ উইথ্ চাফ্)।

৫. অসির চেয়ে মসী শক্তিশালী – The pen is mighter than the sword (দা পেন ইজ মাইটার দ্যান দা সোর্ড)।

৬. অন্ধকারে ঢিল মারা – Beat about the bush (বিট্ অ্যাবাউট্ দা বুশ্)।

৭. অতিযত্নে মরণফাঁদ – Care killed the cat (কেয়ার কিল্ড দা ক্যাট্)।

৮. অনুগত বন্ধুদ্বয় – David and Jonathan (ডেভিড অ্যান্ড জোনাথন্)।

৯. অযথা বিপদের মধ্যে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয় – Discretion is the better part of valour (ডিস্‌ক্রেশন্ ইজ্ দা বেটার পার্ট অফ ভ্যালার্)।

১০. অসারের তর্জন গর্জনই সার – Empty vessels sound much (এম্‌প্টি ভেসেলস্ সাউন্ড মাচ্)।

১১. অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে – Every shoe fits not every foot (এভরি শু ফিটস্ নট্ এভরি ফুট্)।

১২. অতি চালাকের গলায় গড়ি – Every fox must pay his skin to the furrier (এভরি ফক্স মাস্ট পে হিজ্ স্কিন্ টু দা ফারয়ার্)। বা To much cunning over-reaches itself (টু মাচ কানিং ওভাররিচেস ইটসেল্ফ)।

১৩. অতিলোভে তাঁতি নষ্ট – Grasp all lose all (গ্র্যাস্প অল লস্ অল্)।

১৪. অভ্যাসই স্বভাবে দাঁড়ায় – Habit is second nature (হ্যাবিট ইজ সেকেন্ড নেচার্)।

১৫. অসৎ পথে আয় অসৎ পথেই যায় – Ill got ill spent (ইল্ গট্ ইল্ স্পেন্ট)।

১৬. অতীতের কথা তুলে দুঃখ করে লাভ নেই – It is no use crying over spilt milk (ইট্ ইজ্ নো ইউজ ক্রাইং ওভার স্পিল্ট মিল্ক)।

১৭. অভাবে স্বভাব নষ্ট – Necessity hath no law or knows no law (নেসেসিটি হ্যাথ নো ল অর নোজ নো ল)।

১৮. অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে; বা অতি দর্পে হতো লঙ্কা – Pride growth before destruction (প্রাইড গ্রোথ বিফোর ডিস্ট্রাকসান)।

১৯. অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিত পরিত্যাগ করিও না – Quit not certainty for hope (কোয়াইট নট সার্টেনটি ফর হোপ)।

২০. "অধিকন্তু ন দোষায়" – The more, the merrier (দা মোর, দা মেরিয়ার)।

২১. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট – Too many cooks spoil the broth (টু মেনি কুকস স্পয়েল দা ব্রথ)।

২২. অধ্যবসায়ের ফলেই সাফল্যলাভ ঘটে – Slow and steady wins the race (স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন দা রেস)।

২৩. অবলার মুখই বল – Arthur could not tame a woman's tongue (আর্থার কুড নট্ টেম্ এ ওম্যানস্ টাং)।

২৪. অপচয় করো না, অভাবও হবে না – Waste not, want not (ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট)।

২৫. আঙুর ফল টক – The grapes are sour (দা গ্রেপস আর সাওয়ার)।

২৬. আরম্ভ করলে আর শেষ করতে কতক্ষণ, উঠোন পেরোলেই অর্ধেক সফর – A thing begun is half done (এ দিং বিগান্ ইজ্ হাফ ডান্)।

২৭. আকাশকুসুম রচনা করা বা অলীক কল্পনা করা – Build castles in the air (বিল্ ক্যাসল্ ইন দা এয়ার্)।

২৮. আগে ঘর, তবে তো পর – Charity begins at home (চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট্ হোম্)।

২৯. আয় বুঝে ব্যয় কর – Cut your coat according to your cloth (কাট্ ইওর কোট্ অ্যাকরডিং টু ইওর ক্লথ্)।

৩০. আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শংকরাকে ডাকে– He who has nothing to spare must not keep a dog (হি হু হ্যাজ্ নাথিং টু স্পেয়ার মাস্ট নট কিপ এ ডগ্)।

৩১. আকাশের দিকে থুতু ফেললে আপনার গায়েই লাগে – He who spits against the wind spits against his own face (হি হু স্পিটস এগেনস্ট দা উইন্ড স্পিটস এগেনস্ট হিজ ওন ফেস্)।

৩২. আত্মনং বিদ্ধি বা নিজেকে জানো – Know thyself (নো দাইসেল্ফ)।

৩৩. আপন চরকায় তেল দাও – Oil your own machine (অয়েল ইওর ওন মেশিন)।

৩৪. আপ ভালা তো জগৎ ভালা – To the pure all things are pure (টু দা পিওর অল থিংস আর পিওর)।

৩৫. আলস্যই দারিদ্র্যের মূল – Indolence is the mother of poverty (ইনডোলেন্স ইজ দা মাদার অব্ পোভার্টি)।

৩৬. আমরা কাজেই বাঁচি, বয়সে নয় – We live in deeds, not in years (উই লিভ ইন ডিডস নট ইন ইয়ারস)।

৩৭. ইট মারলে পাটকেল – Tit for tat (টিট ফর ট্যাট)।

৩৮. ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় – Where there is a will, there is a way (হোয়্যার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে)।

৩৯. ইহা বলাই বাহুল্য – It goes without saying (ইট্ গোজ্ উইদাউট সেয়িং)।

৪০. ঈশ্বর না করুন – God forbid (গড ফরবিড্)।

৪১. উলু (বেনা) বনে মুক্তা ছড়ানো – Cast pearls before swine (কাস্ট পার্লস্ বিফোর সুইন্)।

৪২. উপদেশ দেওয়ার চেয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা বেশি ভালো – Example is better than precept (এগজ্যামপেল্ ইজ্ বেটার দ্যান্ প্রিসেপ্ট্)।

৪৩. উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায় বা সকালেই দিন বোঝা যায় – Morning shows the day (মরনিং শোজ দা ডে)।

৪৪. একাই একশো – A host in himself (এ হোস্ট ইন্ হিমসেলফ্)।

৪৫. এক পয়সা জমানো মানে এক পয়সা রোজগার করা – A penny saved is a penny earned (এ পেনি সেভড্ ইজ্ এ পেনি আরন্ড)।

৪৬. একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভালো – Better late than never (বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার)।

৪৭. এক হাতে তালি বাজে না – It takes two to make a quarrel (ইট টেকস্ টু টু মেক্ এ কোয়ারল্)।

৪৮. এক ঢিলে দুই পাখি মারা – Kill two birds with one stone (কিল্ টু বার্ডস উইদ্ ওয়ান স্টোন)।

৪৯. এক মাঘে শীত পালায় না – One swallow does not make a summer (ওয়ান শোয়ালো ডাজ নট মেক এ সামার)।

৫০. একতায় উত্থান, বিভেদে পতন – United we stand, divided we fall (ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল)।

৫১. একতাই বল – Unity is strength (ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ)।

৫২. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাস ট্যাস – A pet lamb makes a cross ram (এ পেট ল্যাম মেকস এ ক্রস র‍্যাম)।

৫৩. কুঁড়ে লোক জীবনে কোনোকাজ করতে পারে না – A sleeping fox catches no poultry (এ স্লিপিং ফক্স ক্যাচেস নো পোলট্রি)।

৫৪. কই মাছের প্রাণ (বড় কষ্ট সহিষ্ণু) – A cat has nine lives (এ ক্যাট হ্যাজ লাইন্ লাইভস)।

৫৫. কথার চেয়ে কাজের দাম বেশি – Action speaks louder than words (এ্যাকশন স্পিকস্ লাইডার দ্যান্ ওয়ার্ডস)।

৫৬. কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না – An Ethiopian will not change his skin (অ্যান্ ইথিওপেন্ উইল নট্ চেঞ্জ হিজ্ স্কিন্)।

৫৭. কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি – Give a dog a bad name and hang him (গিভ্ এ ডগ্ এ ব্যাড নেম অ্যান্ড হ্যাং হিম্)।

৫৮. কাদা ঘেঁটো না – Let sleeping dogs lie (লেট স্লিপিং ডগস্ লাই)।

৫৯. কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ – Nero fiddles while Rome burns (নেরো ফিডলস হোয়াইল রোম বার্নস)।

৬০. কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে – No pains, no gains (নো পেনস, নো গেনস্)।

৬১. কারণ বিনা কার্য হয় না – No smoke without fire (নো স্মোক উইদাউট ফায়ার)।

৬২. কুসঙ্গে থাকার চেয়ে একা থাকাও ভাল – Better alone than in bad company (বেটার অ্যালোন্ দ্যান, ইন ব্যাড্ কমপানি)।

৬৩. কর্জ নাই, কইত নাই – Out of debt, out of danger (আউট অভ ডেট, আউট অভ ডেনজার)।

৬৪. কাছে থুবি পোড়ে মন, দূরে গেলে ঠনঠন – Out of sight, out of mind (আউট অভ সাইট, আউট অভ মাইন্ড)।

৬৫. কোনো বৃহৎ কার্য রাতারাতি সম্পন্ন হয় না – Rome was not built in a day (রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে)।

৬৬. কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে – What is everybody's business is nobody's business (হোয়াট ইজ এভরিবডিস বিজনেস ইজ নোবডিস বিজনেস)।

৬৭. ক্ষমাই পরম ধর্ম – Forgive and forget (ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট)।

৬৮. ক্ষুধা পেলে বাসও ধান খায় – Hunger is the best sauce (হাঙ্গার ইজ দা বেস্ট সস)।

৬৯. গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন – Practice makes perfect (প্র্যাকটিস মেকস পারফেক্ট)।

৭০. গাং ডিঙোলে কুমিরকে কলা – When the danger is gone, God is forgotten (হোয়েন দা ডেনজার ইজ গন, গড ইজ ফরগটন)।

৭১. গুজব খুব দ্রুত ছড়ায় – Rumour is a great traveller (রিউমার ইজ এ গ্রেট ট্রাভেলার)।

৭২. গোঁফ তো নয় যেন তেঁয়োপোকা – The moustache is look like caterpiller (দা মুস্টাশ ইজ লুক লাইক কাটারপিলার)।

৭৩. ঘোড়ার আগে গাড়ি – To put the cart before the horse (টু পুট দা কার্ট বিফোর দা হর্স)।

৭৪. ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায় বা ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায় – A burnt child fears the fire (এ বার্নট চাইল্ড ফিয়ারস দ্যা ফায়ার অর ড্রেডস দা ফায়ার)।

৭৫. চকচক করলেই সোনা হয় না – All that glitters is not gold (অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড)।

৭৬. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – After death comes the doctor (আফটার ডেথ কামস দা ডক্টর)।

৭৭. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – When the cat is away the mice will play (হোয়েন দা ক্যাট ইজ অ্যাওয়ে দা মাইস উইল প্লে)।

৭৮. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই – Birds of a feather flock together (বার্ডস অভ এ ফেদার ফ্লক টুগেদার)।

৭৯. চাচা আপন প্রাণ বাঁচা – Every man is for himself (এভরি ম্যান ইজ ফর হিমসেল্ফ)।

৮০. চেনা বামুনের পৈতার দরকার হয় না – Good wine needs no bush (গুড ওয়াইন নিডস নো বুশ)।

৮১. চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা – Physician heal thyself (ফিজিসিয়ান হিল দাইসেলফ)।

৮২. চোরকে বল চুরি করতে গৃহস্থকে বল সজাগ থাকতে – Run with the hare and hunt with the bound (রান উইদ দা হেয়ার অ্যান্ড হান্ট উইদ দা হাউন্ড)।

৮৩. চোর না শুনে ধর্মের কাহিনি – The devil would not listen to the scripture (দা ডেভিল উইল নট লিসেন টু দা স্ক্রিপচার)।

৮৪. চালুনি বলে, ছুঁচ, তোর তলা কেন ছেঁদা – The pot calls the kettle black (দা পট কলস দা কেটেল ব্ল্যাক)।

৮৫. চাঁদেও কলঙ্ক আছে – There are lees to every wine (দেয়ার আর লেস টু এভরি ওয়াইন)।

৮৬. জলেই জল বাঁধে – Nothing succeeds like success (নাথিং সাকসেডস লাইক সাকসেস)।

৮৭. জোর যার মুলুক তার – Might is right (মাইট ইজ রাইট)।

৮৮. জীবন থাকলেই আশ থাকবে – While there is life, there is hope (হোয়াইল দেয়ার ইজ লাইফ, দেয়ার ইজ হোপ)।

৮৯. ঘুতো মেরে গরু দান – Rob Peter to pay Paul (রব পিটার টু পে পল)।

৯০. জ্ঞানই বল – Knowledge is power (নলেজ ইজ পাওয়ার)।

৯১. জ্ঞানহীন উৎসাহ লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো – Zeal without knowledge is a runaway horse (জিল উইদাউট নলেজ ইজ এ রানঅ্যাওয়ে হর্স)।

৯২. ঝোপ বুঝে কোপ মার – Make hay while the sun shines (মেক হে হোয়াইল দা সান সাইনস)।

৯৩. ঝুঁকি না নিলে লাভ হয় না – Nothing venture, Nothing have (নাথিং ভেনচার, নাথিং হ্যাভ)।

৯৪. ঝোপ বুঝে কোপ মারো বা সময় থাকতে থাকতে কাজ গুছিয়ে নাও – As the wind blows, you must set your sail (অ্যাজ দা উইন্ড ব্লোস ইউ মাস্ট সেট্ ইওর সেল্)।

৯৫. টাকায় টাকা হয় – Money begets money (মানি বিগেটস মানি)।

৯৬. ঠাকুরঘরে কে? আমি কলা খাই নি – A guilty conscience needs no accuser (এ গিলটি কন্শ্যান্স নিডস নো অ্যাকিউসার)।

৯৭. ঠেলার নাম বাবাজি – Nothing like force (নাথিং লাইক ফোর্স)।

৯৮. ঠ্যাং থাকতে ক্যান্ নিবি লাঠি? – Fingers were made before forks (ফিংগারস ওয়্যার মেড্ বিফোর ফর্কস)।

৯৯. তোমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নিজেকে উপযুক্ত কর – First deserve, then desire (ফার্স্ট ডিসার্ভ, দ্যান ডিজায়ার)।

১০০. তাড়াতাড়িতে বিয়ে শাদল হয় – Haste makes waste (হেস্ট মেকস ওয়েস্ট)।

১০১. তার সাথে আর – We can't fare, keep the wolf from the door (উই ক্যান্ট ফেয়ার, কিপ দা উল্ফ ফ্রম দা ডোর)।

১০২. যেই লো সিলো পরায় তা সে যেমন সেই সে অযোধ্যার পতি – Or the times! On the manners (ও দ্য টাইমস, অন দা ম্যানার্স)।

১০৩. তেল মারার তেল বেচা – Carry coal to Newcastle (ক্যারি কোল টু নিউক্যাসল)।

১০৪. তিলকে তাল করা – To make a mountain of a molehill (টু মেক এ মাউন্টেন অভ এ মোলহিল)।

১০৫. দুঃখের পরিশেষে সুখ – Adversity often leads to prosperity (অ্যাডভার্সিটি অফেন লিডস টু প্রসপারিটি)।

১০৬. দুঃখের পরে আসে সুখ – After coluds comes fair weather (আফটার ক্লাউডস কামস ফেয়ার ওয়েদার)।

১০৭. দুই গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো – Better an empty house than an ill tenant (বেটার অ্যান এমপ্টি হাউস দ্যান, অ্যান ইল্ টেনান্ট)।

১০৮. দূরের জিনিস ভালো মনে হয় – Blue are the hills that are far from us (ব্লু আর দা হিলস্ দ্যাট আর ফার ফ্রম আস)।

১০৯. দশের লাঠি একের বোঝা – Many a little makes a mickle (মেনি এ লিটল মেকস এ মিকল্)।

১১০. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি? – No paints, no gains (নো পেনস, নো গেনস্)।

১১১. দীর্ঘসূত্রীতাই সময় চোরে আসিক - Procrastination is the thief of time (প্রোক্রাস্টিনেশন ইজ দ থিফ অফ টাইম)।

১১২. দশ দিশ করে কাজ, হবে তাঁত মাঝি লাজ - Two heads are better than one (টু হেডস আর বেটার দ্যান ওয়ান)।

১১৩. মুকের বন্ধুত্ব হয়, চিল্লাকে তরল হয় - Tact is constant, thief is none (টু ইজ কনস্টান্ট, থিফ ইজ নান)।

১১৪. যাঁর থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা যায় না - He never knows the worth of water till the well is dry (হি নেভার নোজ দ ওয়ার্থ অফ ওয়াটার টিল দ ওয়েল ইজ ড্রাই)।

১১৫. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে - Virtue proclaims itself (ভার্চু প্রক্লেইমস ইটসেল্ফ)।

১১৬. নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা - A bad workman quarrels with his tools (এ ব্যাড ওয়ার্কম্যান কোয়ারেলস উইথ হিজ টুলস্)।

১১৭. ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয় - A beggar may sing before a pickpocket (এ বেগার মে সিং বিফোর এ পিকপকেট)।

১১৮. নানা মুনির নানা মত - All feet thread not in one shoe (অল ফিট থ্রেড নট ইন ওয়ান শু)।

১১৯. নিজের জিনিস সকলেই ভালো দেখে বা সব গোয়ালা নিজের দই মিষ্টি বলে - All his geese are swans (অল হিজ গিস্ আর সোয়ানস্)।

১২০. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা - Cut off one's nose to spite one's face (কাট অফ ওয়ানস্ নোজ টু স্পিট ওয়ানস্ ফেস্)।

১২১. নিজের হাতে অল্পও ভালো, পরের হাতের বেশিও কিছু নয় - A bird in the hand is worth two in the bush (এ বার্ড ইন দ হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টুন ইন দ্যা বুশ)।

১২২. আশা ছুনির বশে মত - Many men, many minds (মেনি মেন মেনি মাইন্ডস)।

১২৩. খেপার মরে খাই - One begs a bush another catches (এখন ভিক্ষা না দুক, আসছে বছর পাবে)।

১২৪. নুন আনতে পান্তা ফুরোয় - As meat comes mustard (অ্যাজ মিট কামস মাস্টার্ড)।

১২৫. সেই সময়ের চেয়ে কাল আসা ভালো - Something is better than nothing (সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং)।

১২৬. না আঁচালে বিশ্বাস নেই (ভোজনে আমন্ত্রণ) - There's many a slip between the cup and the lip (দেয়ারস মেনি এ স্লিপ বিটুইন দ কাপ অ্যান্ড দ লিপ)।

১২৭. পরহিতার্থে কর্ম প্রতিদান চায় না - Virtue is it's reward (ভার্চু ইজ ইটস্ রিওয়ার্ড)।

১২৮. পক্ষপাতদুষ্ট লোকের নিকট সবই মন্দ - All seems yellow to the jaundiced eye (অল সিমস্ ইয়েলো টু দ জন্ডিসড্ আই)।

১২৯. প্রেম অন্ধ - Love is blind (লাভ ইজ ব্লাইন্ড)।

১৩০. প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি - Necessity is the mother of invention (নেসেসিটি ইজ দ মাদার অফ ইনভেনশন)।

১৩১. "পর্বেতো বহ্নিমান ধুমাৎ"; কারণ কিনা কার্য হয় না - Where there is smoke, there is fire (হোয়ার দেয়ার ইজ স্মোক, দেয়ার ইজ ফায়ার)।

১৩২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাই মানুষকে দেবতা করে বা পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতাই ইমানের অংশ - Cleanliness is next to Godliness (ক্লিনলিনেস্ ইজ নেকস্ট টু গডলিনেস্)।

১৩৩. সাহসেই সৌভাগ্যের প্রসূতি (দুঃ) - Boldness is the mother of good luck (বোল্ডনেস ইজ দ মাদার অফ গুড লাক)।

১৩৪. হাতের পাঁচ মুতোর ফেলা দেখতা - Cast pearls before swine (কাস্ট পার্লস বিফোর সুইন)।

১৩৫. বিদ্যা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত - Art is long, life is short (আর্ট ইজ লং, লাইফ ইজ শর্ট)।

১৩৬. বিয়ে করতে কড়ি, আর ঘর বাঁধতে দড়ি - Before you marry, be sure of a house wherein to tarry (বিফোর ইউ ম্যারি বি সিওর অফ এ হাউস হোয়ারইন টু টারি)।

১৩৭. বলা সহজ, করা কঠিন - Easier said than done (ইজিয়ার সেড দ্যান ডান)।

১৩৮. বল্প আঁটুনি ফস্কা গেরো - Penny-wise, Pound-foolish (পেনিওয়াইজ, পাউন্ড ফুলিশ)।

১৩৯. ব্যর্থতা সাফল্যেরই ভিত্তিভূমি - Failures are but pillars of success (ফেলিওর আর বাট পিলারস্ অফ সাকসেস্)।

১৪০. বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বা ভাগ্য সাহসীকে অনুসরণ করে - Fortune favours the brave (ফরচুন ফেভার দ ব্রেভ)।

১৪১. বিন্দু জলে সিন্ধু হয় - Many drops make a shower (মেনি ড্রপস মেক এ সাওয়ার)।

১৪২. বিপদ কখনও একা আসে না - Misfortune never comes alone (মিসফরচুন নেভার কামস অ্যালন)।

১৪৩. "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" (বেশি আড়ম্বরে কাজ হয় না) - Much ado about nothing (মাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং)।

১৪৪. বিপদ আসবার আগেই সাবধান হওয়া ভালো - Prevention is better than cure (প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর)।

১৪৫. বিপদে অবিচলিত মন, অধীরতা - Sweet are the uses of adversity (সুইট আর দ ইউজেস অফ অ্যাডভার্সিটি)।

১৪৬. বাবার প্রতিজ্ঞাতে পুত্র না পুঁথিতে কথা লিখে লিখে মরে লিখেই পড়তে - The child is the father to the man (দ চাইল্ড ইজ দ ফাদার টু দ ম্যান)।

১৪৭. বিপদের মধ্যেই ধর্মের পরীক্ষা হয় - Virtue thrives best in adversity (ভার্চু থ্রাইভস বেস্ট ইন অ্যাডভার্সিটি)।

১৪৮. বাঘের গেল ঘর তো লাগল তুক ঘর - When the cat is away, the mice will play (হোয়েন দ ক্যাট ইজ অ্যাওয়ে, দ মাইস উইল প্লে)।

১৪৯. আরম্ভতাতে ঘুষ আরম্ভ করলে জয়ের পরিষ্কার আশা পাওয়া যায় - A good beginning is half of the battle (এ গুড বিগিনিং ইজ হাফ অফ দ ব্যাটল)।

১৫০. আলের মা পরা পাত না - An ass that is a common property (এন অ্যাস দ্যাট ইজ এ কমন প্রপার্টি)।

১৫১. ভিক্ষার চাল, কাঁড়া আর আকাড়া - Beggars must not be choosers (বেগারস মাস্ট নট বি চুজারস)।

১৫২. ভীরুরা মরার আগেই মরেলা মরে - Cowards die many times before their deaths (কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ্)।

১৫৩. অন্ন করলে অন্ন আপনি এসে পড়ে - Harm watch, harm catch (হার্ম ওয়াচ, হার্ম ক্যাচ)।

১৫৪. মাথা নেই, আবার মাথা ব্যথা - A begger can never be bankrupt (এ বেগার ক্যান নেভার বি ব্যাঙ্করাপ্ট)।

১৫৫. মানিকের খানিক ভালো - Brevity is the soul of wit (ব্রেভিটি ইজ দ সোল অফ উইট)।

১৫৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন - Do or die (ডু অর ডাই)।

১৫৭. মিষ্টি কথায় চিড়ে ভিজে না – (Fine or) Fair words butter no parsnips (ফায়ার ওয়ার্ডস্ বাটার নো পারসনিপস্)।

১৫৮. মহৎ লোকেরা এক রকম চিন্তা করেন – Great minds think alike (গ্রেড মাইন্ডস থিঙ্ক অ্যালাইক্)।

১৫৯. মুখে বুলি লম্বা, কাজে অষ্টরম্ভা – Great talkers are little doers (গ্রেড টকারস আর লিটিল ডুয়ারস্)।

১৬০. মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে – Man is the architect of his own fortune (ম্যান ইজ দা আরকিটেক্ট অফ হিজ ওন ফরচুন্)।

১৬১. মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় – None but a fool is always right (নান বাট এ ফুল ইজ অলওয়েজ রাইট্)।

১৬২. মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ বা নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ – Silence gives consent (সাইলেন্স গিবস কনসেন্ট)।

১৬৩. মায়ের হাতে গড়া শিশুই জগতের ভাগ্যবিধাতা – The hand that rocks the cradle rules the world (দা হ্যান্ড দ্যাট রকস দা ক্রেডল রুলস দা ওয়ার্ল্ড)।

১৬৪. "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" – To err is human (টু আর ইজ হিউম্যান)।

১৬৫. মরা হাতি লাখ টাকা দাম – The very ruins of greatness are great (দা ভেরি রুইনস অফ গ্রেটনেস আর গ্রেট)।

১৬৬. মুকুট না আগুনের ডালা – Uneasy lies the head that wears a crown (আনইজি লাইস দা হেড দ্যান ওয়ারস এ ক্রাউন)।

১৬৭. মশা মারতে কামান দাগা – To break a butterfly on a wheel (টু ব্রেক এ বাটারফ্লাই অন এ হুইল)।

১৬৮. "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" বা যে দেশে যে বাউ – When in Rome, do as the Romans do (হোয়েন ইন রোম ডু অ্যাজ দা রোমানস ডু)।

১৬৯. যেমন কর্ম তেমনি ফল – As you make your bed, so you must lie on it (অ্যাজ ইউ মেক ইওর বেড, সো ইউ মাস্ট লাই অন ইট)। অথবা, As you sow, so you reap (অ্যাজ ইউ সো, সো ইউ রিপ্)।

১৭০. যত গর্জে, তত বর্ষে না; পচা আলুর ঝাল বেশি– Barking dogs seldom bite (বারকিং ডগস্ সেল্ডম্ বাইট্)।

১৭১. যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল – As is the evil, so is the remedy (অ্যাস্ ইজ দা ইভিল্, সো ইজ দা রিমেডি)।

১৭২. যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্মা – After sweetmeat comes sour sauce (আফটার সুইটমিট কাম সাওয়ার সস্)।

১৭৩. যত মত ততো পথ – So many ways and so many disciplines (সো মেনি ওয়েজ এ্যান্ড সো মেনি ডিসিপ্লিন)।

১৭৪. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – Faults are thick where love is thin (ফল্টস্ আর্ থিক্ হোয়্যার লাভ ইজ থিন্)।

১৭৫. যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ – Hope springs eternal in the human breast (হোপ্ স্প্রিংস্ ইটারন্যাল্ ইন্ দা হিউম্যান ব্রেস্ট)।

১৭৬. রোজ একটা ফল খাও, বদ্যির কাছে না যাও – An apple a day keeps the doctor away (অ্যান্ অ্যাপেল্ এ ডে কিপস্ দা ডক্টর অ্যাওয়ে)।

১৭৭. লাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে; বা বসতে দিলে শুতে চায় – Give him an inch and he'll take an ell (গিভ্ হিম্ অ্যান্ ইঞ্চ অ্যান্ড হি উইল টেক্ অ্যান্ এল্)।

১৭৮. লাভের গুড় পিঁপড়ে খায় – Ill got ill spent (ইল গট ইল স্পেন্ট্)।

১৭৯. লক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা – Riches have wings (রিচেস হ্যাভ উইঙ্গস্)।

১৮০. লড়াই কর ঘর সামলে – Those who live in glass should not pell stones at others (দোজ হু লিভ ইন গ্লাস হাউসেস সুড নট পেল্ট স্টোনস অ্যাট আদার্)।

১৮১. শয়তানকেও তার ন্যায্য পাওনা দিও – Give the devil his due (গিভ দা ডেভিল হিজ ডিউ)।

১৮২. সব ভালো, যার শেষ ভালো বা শেষ রফাই রফা– All's well that ends well (অল্স্ ওয়েল দ্যাট্ এন্ডস্ ওয়েল্)।

১৮৩. সবুরে মেওয়া ফলে – All things come to him who waits (অল্ থিঙ্গস্ কাম টু হিম্ হু ওয়েটস্)।

১৮৪. সঙ্গ দেখে লোক চেনা যায় – A man is known by the company he keeps (এ ম্যান ইজ্ নো বাই দা কমপ্যানি হি কিপস্)।

১৮৫. স্থিরমস্তিষ্ক না হলে উন্নতি হয় না (চঞ্চলমতি ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্থসঞ্চয় হয় না) – A rolling stone gathers no moss (এ রোলিং স্টোন গেদারস্ নো মস্)।

১৮৬. সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় – A stitch in time saves nine (এ স্টিচ্ ইন, টাইম্ সেভস নাইন্)।

১৮৭. স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলা – Call a spade a spade (কল্ এ স্পেড্ এ স্পেড্)।

১৮৮. সস্তার তিন অবস্থা – Cheap goods are dear in the long run (চিপ্ গুডস্ আর ডিয়ার ইন্ দা লং রান্)।

১৮৯. সুখ-সৌভাগ্যের দিন কারও চিরস্থায়ী হয় না – Every dog has his day (এভরি ডগ্ হ্যাজ হিজ ডে)।

১৯০. স্বাবলম্বী লোকদের ঈশ্বর সাহায্য করেন – God helps those who help themselves (গড হেল্পস দোজ হু হেল্প দেমসেল্ফ)।

১৯১. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা; সৎ হলে ফল ভালো হয় – Honesty is the best policy (অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি)।

১৯২. সবজান্তা অষ্টরম্ভা – Jack of all trades, master of none (জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ নান্)।

১৯৩. সহিষ্ণু হও – Live and let live (লিভ অ্যান্ড লেট লিভ্)।

১৯৪. সবুরে মেওয়া ফলে – Patience is bitter, but its fruit is sweet (পেসেন্স ইজ বিটার বাট ইটস ফ্রুট ইজ সুইট)।

১৯৫. স্বাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন – Self-help is the best help (সেল্ফ-হেল্প ইজ দা বেস্ট হেল্প)।

১৯৬. সুযোগ হারালে আর পাবে না – Strike the iron while it is hot (স্ট্রাইক দা আইরন হোয়াইলইট ইজ হট্)।

১৯৭. স্বভাব যায় না মরলে, আর ইল্লৎ যায় না ধুলে – The leopard can't change its spots (দা লেপার্ড ক্যানট চেঞ্জ ইটস স্পটস)।

১৯৮. সময়েই ক্ষত শুকোয় – Time cures more than the doctor (টাইম কিওরস মোর দ্যান দা ডক্টর)।

১৯৯. সকল রোগীর এক পথ্য নহে; সব রোগের এক ওষুধ নয় – What is sauce for the gander is not sauce for the goose (হোয়াট ইজ সস ফর দা গ্যানডার ইজ নট সস ফর দা গুজ)।

২০০. হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল – Fools rush in where angels fear to tread (ফুলস্ রাশ ইন্ হোয়ার্ অ্যাঙ্গলস্ ফিয়ার টু ট্রেড)।

বাংলা থেকে ইংরেজি : প্রয়োজনীয় শব্দ

ভাষা ব্যবহার বা অনুবাদ করার জন্য বাক্যের পদসমূহ সম্পর্কে যেমন ধারণা থাকা দরকার, তেমনি প্রয়োজন কতিপয় অত্যাবশ্যক শব্দ জানা। সেগুলো জানা থাকলে বাংলা বা ইংরেজি যে-কোনো বাক্য বলা কিংবা লেখা সহজ হয়। শব্দই যে-কোনো ভাষার প্রাণ। বক্তব্যের মূলকথা প্রকাশ করার জন্য সে কারণে কোনো ভাষার শব্দজ্ঞান জরুরি। শব্দ জানা থাকলে বাক্যগঠন নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বিস্তৃত না জেনেও কথারীতিতে বক্তব্য প্রকাশে তেমন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নিচে কিছু প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দের উচ্চারণসহ উল্লেখ করা হলো :

মানব-শরীর
HUMAN BODY

অধর	: Nether-lip (নেদার-লিপ)
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ	: Limb (লিম্ব)
আঙুল	: Finger (ফিঙ্গার)
আলজিহ্বা	: Uvula (ইউভিউলা)
ইন্দ্রিয়সমূহ	: Senses (সেন্সেস)
উরু	: Thigh (থাই)
কপাল	: Forehead (ফোরহেড)
কান	: Ear (ইয়ার)
কাঁধ	: Shoulder (শোল্ডার)
কনুই	: Elbow (এলবো)
কবজি	: Wrist (রিস্ট)
কপোল (গাল)	: Cheek (চিক)
কোমর	: Waist (ওয়েস্ট)
কঙ্কাল	: Skeleton (স্কেলিটন)
কুচকি	: Groin (গ্রোইন)
গলা	: Throat (থ্রট)
গোড়ালি	: Heel (হিল)
গোঁফ	: Moustache (মাসটাশ)
ঘাড়	: Neck (নেক)
ঘাম	: Sweat (সোয়েট)
চুল	: Hair (হেয়ার)
চক্ষু	: Eye (আই)
চোখের তারা	: Eye-ball (আইবল)
চোখের পাতা	: Eyelid (আইলিড)
চোখের ভ্রূ	: Eyebrow (আইব্রো)
চামড়া	: Skin (স্কিন)
চিবুক	: Chin (চিন)
চোখের জল	: Tear (টিয়ার)
জিহ্বা	: Tongue (টাং)
জরায়ু	: Womb (উম্ব)
জানু	: Knee (নি)
তলপেট	: Abdomen (অ্যাবডমেন)
তালু	: Palate (প্যালেট)
থুথু	: Spittle (স্পিটল)
ধমনি	: Artery (আর্টারি)
দাড়ি	: Beard (বিয়ার্ড)
দাঁত	: Tooth (টুথ)
নাক	: Nose (নোজ)
নাসারন্ধ্র	: Nostril (নস্ট্রিল)
নখ	: Nail (নেইল)
নাভি	: Navel (নাভল)
নাড়িভুঁড়ি	: Bowels (বাওয়েলস)
ঠোঁট	: Lip (লিপ)
পিঠ	: Back (ব্যাক)
পেট	: Belly (বেলি)
পায়ের পাতা	: Foot (ফুট)
পাঁজর	: Ribs (রিবস)
পা	: Leg (লেগ)
পায়ের আঙুল	: Toe (টো)
বুক	: Chest (চেস্ট)
বগল	: Armpit (আরমপিট)
মানুষ	: Man (ম্যান)
মানবজাতি	: Human being (হিউম্যান বিইং)
মাথা	: Head (হেড)
মুখ	: Mouth (মাউথ)
মুষ্টি	: Grip (গ্রাইপ)
মুখমণ্ডল	: Face (ফেস)
মূত্রাধার	: Bladder (ব্লাডার)
মাংস	: Flesh (ফ্লেশ)
ভক্ষ্য পশুমাংস	: Meat (মিট)
মাথার খুলি	: Skull (স্কাল)
মাড়ি	: Gum (গাম)
মজ্জা	: Marrow (ম্যারো)
মস্তিষ্ক	: Brain (ব্রেইন)
মূত্র	: Urine (ইউরিন)
মল	: Stool (স্টুল)
মেরুদণ্ড	: Backbone (ব্যাকবোন)
লালা	: Saliva (সেলিভা)
লিঙ্গ	: Penis (পেনিস্)
শিরা	: Vein (ভেইন)
শরীর	: Body (বডি)
স্তন	: Breast (ব্রেস্ট)
স্তনের বোঁটা	: Nipple (নিপল)
স্ত্রীলোক	: Woman (উম্যান)
স্নায়ু	: Nerve (নার্ভ)
হাড়	: Bone (বোন)
হাত	: Hand (হ্যান্ড)

আত্মীয়-স্বজন
RELATIONS

অভিভাবক	: Guardian (গার্ডিয়ান)
আত্মীয়	: Relative (রিলেটিভ)
এক সহচর	: Room-mate (রুমমেট)
এপত্নী	: Co-wife (কো-ওয়াইফ)
উত্তরাধিকারী	: Heir (এয়ার)
কন্যা	: Daughter (ডটার)
কাকা, মামা, চাচা	: Uncle (আঙ্কল)
কাকি, মামি, চাচি	: Aunt (আন্ট)
কাকাতো, মামাতো, খালাতো ভাই	: Cousin (কাজিন)
গুরু	: Preceptor (প্রিসেপ্টর)
ছেলেবন্ধু	: Boy friend (বয়ফ্রেন্ড)
জ্ঞাতিত্ব	: Kinship (কিনশিপ)
দুগ্ধমাতা	: Wet-nurse (ওয়েটনার্স)
দাদা/ঠাকুরদা	: Grandfather (গ্রান্ডফাদার)
দাদি/ঠাকুরমা	: Grandmother (গ্রান্ডমাদার)
নাতি	: Grand-son (গ্রান্ডসন)
নাতনি	: Grand-daughter (গ্রান্ডডটার)
পিতা	: Father (ফাদার)
প্রতিপাল্য	: Ward (ওয়ার্ড)
পথপ্রদর্শক	: Guide (গাইড)
পুত্র	: Son (সান)
প্রতিবেশী	: Neighbour (নেইবার)
বিমাতা	: Step mother (স্টেপ মাদার)
বৈমাত্রেয় ভাই	: Step brother (স্টেপ ব্রাদার)
বৈমাত্রেয় বোন	: Step sister (স্টেপ সিস্টার)
বিধবা	: Widow (উইডো)
বাবা/আব্বা	: Daddy (ডেডি)/Papa (পাপা)
বন্ধু	: Friend (ফ্রেন্ড)
বংশধর	: Descendant (ডিসেন্ডান্ট)
ভ্রাতা, ভাই	: Brother (ব্রাদার)
ভগ্নি, বোন	: Sister (সিস্টার)
ভাইপো	: Nephew (নেফিউ)
ভাগ্নী	: Niece (নিস)
মাতা	: Mother (মাদার)
মা/আম্মা	: Maa (মা) / Mammy (মমি)
মাতাপিতা	: Parents (প্যারেন্টস)
মেয়েবন্ধু	: Girl friend (গার্লফ্রেন্ড)
শ্যালক, ভগ্নিপতি	: Brother-in-law (ব্রাদার-ইন-ল)
শ্যালিকা, ভাবি	: Sister-in-law (সিস্টার-ইন-ল)
শত্রু	: Foe (ফো)
শত্রু	: Enemy (এনিমি)
শিক্ষক	: Teacher (টিচার)
শিশু	: Child (চাইল্ড)
শ্বশুর	: Father-in-law (ফাদার-ইন-ল)
শাশুড়ি	: Mother-in-law (মাদার-ইন-ল)
সেবক	: Waiter (ওয়েটার)
সহকর্মী	: Colleague (কলিগ)
সহপাঠী	: Class-mate (ক্লাসমেট)
স্ত্রী	: Wife (ওয়াইফ)
স্বামী	: Husband (হাজব্যান্ড)

গৃহসামগ্রী
HOUSEHOLD ARTICLES

আলমারি	: Almirah (আলমিরা)
আলমারি	: Cupboard (কাপবোর্ড)
আয়না	: Mirror (মিরর)
আলনা	: Dress-holder (ড্রেসহোল্ডার)

উকিল	: Pleader (প্লিডার)	নাপিত	: Barber (বারবার)
উকিল	: Advocate (এ্যাডভোকেট)	নাবিক	: Sailor (সেইলর)
		নায়ক	: Actor (এক্টর)
কর্জদাতা	: Lender (লেন্ডার)	নকল লেখক	: Copy-writer (কপি-রাইটার)
কর্জগ্রহীতা	: Borrower (বোরোয়ার)	নৈশ প্রহরী	: Night-guard (নাইট গার্ড)
কলু	: Oilman (অয়েলম্যান)		
কেরানি	: Clark (ক্লার্ক)		
কুমার	: Potter (পটার)	নির্মাতা	: Builder (বিল্ডার)
কৃষক	: Peasant (পেজেন্ট)	নির্মাতা	: Maker (মেকার)
	Farmer (ফারমার)	নায়িকা	: Actress (এক্ট্রেস)
কাপারি	: Brazier (ব্রেজিয়ার)	নিয়ন্ত্রক	: Controller (কন্ট্রোলার)
কর্মকর্তা	: Officer (অফিসার)	প্রভাষক	: Lecturer (লেকচারার)
কোষাধ্যক্ষ	: Treasurer (ট্রেজারার)	পেয়াদা	: Peon (পিয়ন)
ক্রয়কারী	: Buyer (বায়ার)	পুরোহিত	: Priest (প্রিস্ট)
ক্রেতা	: Purchaser (পারচেজার)	পাদ্রি	: Parson (পার্সন)
কসাই	: Butcher (বুচার)	প্রকাশক	: Publisher (পাবলিশার)
গৃহশিক্ষক	: Tutor (টিউটর)	পাঠক	: Reader (রিডার)
গায়ক	: Singer (সিঙ্গার)	প্রযোজক	: Producer (প্রোডিউসার)
গ্রন্থকার	: Author (অথার)	প্রশিক্ষক	: Instructor (ইনস্ট্রাক্টর)
গোয়ালা	: Milkman (মিল্কম্যান)	পরিচালক	: Director (ডিরেক্টর)
গ্রন্থাগারিক	: Libranian (লাইব্রেরিয়ান)	পরীক্ষক	: Examiner (এক্সামিনার)
চাকর	: Servant (সার্ভেন্ট)	প্রতিবেদক	: Reporter (রিপোর্টার)
চাষি	: Ploughman (প্লাউম্যান)	পরামর্শক	: Consultant (কনসালটেন্ট)
	Cultivator (কালটিভেটর)		
	Tiller (টিলার)	পেশা	: Profession (প্রফেশন)
চিত্রকর	: Painter (পেইন্টার)	পাচক	: Cook (কুক)
চোর	: Thief (থিফ)	প্রকৌশলী	: Engineer (এনজিনিয়ার)
চিকিৎসক	: Surgeon (সার্জন)	ফেরিওয়ালা	: Hawker (হকার)
	Physician (ফিজিসিয়ান)	বিচারক	: Judge (জাজ)
চালক	: Driver (ড্রাইভার)	ব্যারিস্টার	: Barrister (ব্যারিস্টার)
জলদস্যু	: Pirate (পাইরেট)	বাজিকর	: Juggler (জাগলার)
জেলে	: Fsherman (ফিশারম্যান)	বক্তা	: Orator (অরেটর)
জরিপকারক	: Surveyor (সার্ভেইয়ার)	বিমানচালক	: Pilot (পাইলট)
জমিদার	: Landlord (ল্যান্ডলর্ড)	বণিক	: Trader (ট্রেডার)
ডাক্তার	: Doctor (ডক্টর)	বিক্রয়কারী	: Seller (সেলার)
তাঁতি	: Weaver (ওয়েভার)	বক্তা	: Speaker (স্পিকার)
দর্জি	: Tailor (টেইলর)	বিশেষজ্ঞ	: Expert (এক্সপার্ট)
দালাল	: Broker (ব্রোকার)	ব্যাংকার	: Banker (ব্যাংকার)
দস্যু	: Robber (রবার)	ব্যবসায়ী	: Businessman (বিজনেসম্যান)
দারোয়ান	: Guard (গার্ড)		
দোকানদার	: Shop-keeper (শপ-কিপার)	বিশ্লেষক	: Analyst (এ্যানালিস্ট)
		ব্যবস্থাপক	: Manager (ম্যানেজার)
দন্ত চিকিৎসক	: Dentist (ডেন্টিস্ট)	বাহক	: Courier (কোরিয়ার)
ধোপা	: Washerman (ওয়াশারম্যান)	বার্তাবাহক	: Messenger (মেসেঞ্জার)
		ভিক্ষুক	: Beggar (বেগার)
ধোপানি	: Laundress (লন্ড্রেস)	ভ্রমণকারী	: Traveler (ট্রাভেলার)

ভূতত্ত্ববিদ	: Geologist (জিওলজিস্ট)	অংশীদার	: Partnership (পার্টনারশিপ)
ঝেরে, ঝাড়ুদার	: Sweeper (সুইপার)	অবাধ বাণিজ্য	: Free trade (ফ্রি ট্রেড)
মুদি	: Grocer (গ্রোসার)	অর্থ	: Sector (সেক্টর)
মুচি	: Cobbler (কবলার)	অর্থনীতি	: Economics (ইকোনমিকস)
মুদ্রাকার	: Jeweler (জুয়েলার)	অংশ	: Share (শেয়ার)
মাঝি	: Boatman (বোটম্যান)	অংশীদার	: Shareholder (শেয়ারহোল্ডার)
মেষপালক	: Shepherd (শেপার্ড)	অগ্রক্রয়	: Preemption (প্রিএম্পশন)
মালি	: Gardener (গার্ডেনার)	আর্থিক	: Fiscal (ফিসকাল)
মুদ্রাকর	: Printer (প্রিন্টার)	আয়	: Income (ইনকাম)
যাদুকর	: Magician (ম্যাজিসিয়ান)	আমদানি	: Import (ইম্পোর্ট)
রাজমিস্ত্রি	: Mason (মেসন)	আমদানি শুল্ক	: Tariff (টারিফ)
রুটিওয়ালা	: Baker (বেকার)	ইজারা দেওয়া	: Lease (লিজ)
রাখাল	: Cowboy (কাউবয়)	উৎপাদনকারী	: Producer (প্রোডিউসার)
রাষ্ট্রদূত	: Ambassador (অ্যাম্বাসাডর)	উদ্বৃত্ত	: Surplus (সারপ্লাস)
রসায়নবিদ	: Chemist (কেমিস্ট)	ঋণ	: Loan (লোন)
রংকর	: Dyer (ডাইয়ার)	কর্মগ্রহীতা	: Lonee (লোনি)
লেখক	: Writer (রাইটার)	একমাত্র প্রতিনিধি	: Sole agent (সোল এজেন্ট)
শিক্ষক	: Teacher (টিচার)	একচেটিয়া	: Monopoly (মনোপলি)
	Master (মাস্টার)	কর্তব্য	: Duty (ডিউটি)
শ্রমিক	: Labour (লেবার)	ক্রেতা	: Purchaser (পারচেজার)
শিকারি	: Hunter (হান্টার)	কার্টেল	: Cartel (কার্টেল)
শুশ্রূষাকারী	: Nurse (নার্স)	কমপক্ষে	: Minimum (মিনিমাম)
শিল্পী	: Artist (আর্টিস্ট)	কর	: Tax (ট্যাক্স)
সুতার	: Carpenter (কার্পেন্টার)	করদাতা	: Tax Payee (ট্যাক্স পেয়ি)
স্বর্ণকার	: Goldsmith (গোল্ডস্মিথ)	কৌশল	: Technology (টেকনোলজি)
সঙ্গীতবিদ	: Musician (মিউজিসিয়ান)	খরচ	: Cost (কস্ট)
সুদখোর	: Usurer (ইউজারার)	খুচরা	: Retail (রিটেইল)
সৈনিক	: Soldier (সোলজার)	খরচ	: Expenditure (এক্সপেন্ডিচার)
সন্ন্যাসী	: Mendicant (মেনডিক্যান্ট)	খাজাঞ্চি	: Treasurer (ট্রেজারার)
সওদাগর	: Merchant (মার্চেন্ট)	খসড়া	: Draft (ড্রাফট)
সম্পাদক	: Editor (এডিটর)	ক্ষতিপূরণ	: Penalty (পেনাল্টি / জরিমানা)
সচিব	: Secretary (সেক্রেটারি)	ক্ষতিপূরণ	: Compensation (কমপেনসেশন/ক্ষতিপূরণ)
সভাপতি	: Chairperson (চেয়ারপার্সন)	গুদাম	: Store (স্টোর)
	Chairman (চেয়ারম্যান)	ঘাটতি	: Deficit (ডেফিসিট)
সাংবাদিক	: Journalist (জার্নালিস্ট)	ঘাটতি	: Deduction (ডিডাকশন)
স্থপতি	: Architect (আর্কিটেক্ট)	চুক্তি	: Contract (কন্ট্রাক্ট)
সংগঠক	: Organizer (অর্গানাইজার)	চেক	: Check (চেক)

ব্যবসা-বাণিজ্য
TRADE AND COMMERCE

অর্থ সংক্রান্ত	: Finance (ফাইন্যান্স)

চোরাচালান	: Smuggling (স্মাগলিং)
চাহিদা	: Demand (ডিমান্ড)
চালান	: Invoice (ইনভয়েজ)
জের	: Balance (ব্যালান্স)
জোত	: Holding (হোল্ডিং)
জমা	: Deposit (ডিপোজিট)
ঝুঁকি	: Risk (রিসক)
তহবিল	: Fund (ফান্ড)
দোকান	: Shop (সপ)
দালাল	: Broker (ব্রোকার)
দাবি	: Claim (ক্লেইম)
দলিল	: Deed (ডিড)
দাম	: Price (প্রাইস)
দরপত্র	: Tender (টেন্ডার)
নিরীক্ষক	: Auditor (অডিটর)
নিট আয়	: Net income (নিট ইনকাম)
নিশ্চয়তা প্রদানকারী	: Grantor (গ্র্যান্টর)
প্রতিনিধি	: Agent (এজেন্ট)
পাইকারি বিক্রয়	: Wholesale (হোলসেল)
প্রতিযোগিতা	: Competition (কমপিটিশন)
প্রকল্প	: Project (প্রোজেক্ট)
ফেরত	: Refund (রিফান্ড)
ফেরত	: Repayment (রিপেমেন্ট)
ফেরত	: Return (রিটার্ন)
বাজার	: Market (মার্কেট)
বিক্রেতা	: Seller (সেলার)
বিমা	: Insurance (ইনসিউরেন্স)
বন্ধক	: Mortgage (মর্টগেজ)
ব্যবসায়ী	: Dealer (ডিলার)
বেতন	: Salary (সেলারি)
বণিক	: Merchant (মার্চেন্ট)
বেশি হলে	: Maximum (মেক্সিমাম)
বিক্রি	: Sale (সেল)
বিমার কিস্তির টাকা	: Premium (প্রিমিয়াম)
বাদ, বাট্টা	: Discount (ডিসকাউন্ট)
বন্ধ	: Lay-off (লে-অফ)
বিনিয়োগ	: Investment (ইনভেস্টমেন্ট)
বর্ধিতকরণ	: Extension (এক্সটেনশন)
ভাড়াটে প্রজা	: Tenant (ট্যানেন্ট)
মূলধন	: Capital (ক্যাপিটাল)
মক্কেল	: Client (ক্লাইন্ট)
মজুদ	: Stock (স্টক)
মালিকানা	: Ownership (ওনারশিপ)
মোট আয়	: Gross income (গ্রোস ইনকাম)
মূল্য	: Value (ভ্যালু)
মূল্য সংযোজন কর	: Value added tax (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স)
মন্দা	: Depression (ডিপ্রেশন)
মুনাফা	: Dividend (ডিভিডেন্ট)
মূল্য তালিকা	: Price Schedule (প্রাইজ সিডিউল)
মোট	: Gross (গ্রোস)
মালিক	: Proprietor (প্রোপ্রাইটর)
যোগান	: Supply (সাপ্লাই)
রপ্তানি	: Export (এক্সপোর্ট)
রাজস্ব	: Revenue (রেভিনিউ)
লাভ	: Profit (প্রোফিট)
লোকসান	: Loss (লস)
লেনা	: Credit (ক্রেডিট)
শ্রমিক সংঘ	: Trade Union (ট্রেড ইউনিয়ন)
সুদ	: Interest (ইন্টারেস্ট)
সম্পত্তি	: Asset (অ্যাসেট)
সংস্থা	: Corporation (করপোরেশন)
সামগ্রী	: Goods (গুডস)
সম্পদ	: Resources (রিসোর্স)
সুবিধা	: Provision (প্রভিশিয়ন)
সংরক্ষণ করা	: Reserve (রিজার্ভ)
হুন্ডি	: Bond (বন্ড)
হার	: Rate (রেট)
হ্রাস পাওয়া	: Decrease (ডিক্রিজ)

কৃষিকাজ
CULTIVATION

আগাছা	: Weed (উইড)
উর্বর	: Fertile (ফার্টাইল)
কৃষক	: Ploughman (প্লাউম্যান) Cultivator (কাল্টিভেটর) Farmer (ফার্মার)
কোদাল	: Spade (স্পেইড)
কাদা মাটি	: Muddy (মাডি)
কাস্তে	: Sickle (সিকল)
কলের লাঙ্গল	: Tractor (ট্রাকটর)
কীটনাশক	: Pesticide (পেস্টিসাইড)
চারা	: Plant (প্লান্ট)
জোয়াল	: Yoke (ইয়োক)
জলাভূমি	: Marsh (মারশ)
নিড়ান	: Weeding (উইডিং)
পাহাড়ি, পর্বতময়	: Hilly (হিলি)
পাকা	: Ripe (রাই)
বৃষ্টিপাত	: Rainfall (রেইনফল)
ভূমি বা জমি	: Land (ল্যান্ড)
মৃত্তিকা	: Soil (সয়েল)
মই	: Ladder (ল্যাডার)
মৌসুমি বায়ু	: Monsoon (মনসুন)
মাটি	: Clay (ক্লেই)
রোপণ	: Plantation (প্লান্টেশন)
লাঙ্গল	: Plough (প্লাউ)
সম্পত্তি	: Estate (এস্টেট)
সার	: Fertilizer (ফার্টিলাইজার)

খেলাধুলা
GAMES AND SPORTS

ক্রীড়া	: Sports (স্পোর্টস)
ক্রিকেট	: Cricket (ক্রিকেট)
কাবাডি	: Ha-do-do (হা-ডু-ডু)
কুস্তি	: Wrestling (রেসলিং)
খেলোয়াড়	: Player (প্লেয়ার)
খেলার সাথি	: Playmate (প্লেমেট)
খেলার ব্যাট	: Bat (ব্যাট)
ঘুড়ি	: Kite (কাইট)
জাল	: Net (নেট)
ঝাঁপ, লাফ	: Jump (জাম্প)
টেনিস	: Tennis (টেনিস)
তাস	: Card (কার্ড)
দোষ	: Foul (ফাউল)
দাবা	: Chess (চেস)
দৌড়	: Run (রান)
নাটাই	: Reel (রিল)
ফুটবল	: Football (ফুটবল)
ব্যায়াম	: Exercies (এক্সারসাইজ)
মাঠ	: Ground (গ্রাউন্ড)
মাঠ (নির্দিষ্ট)	: Field (ফিল্ড)
মুষ্টিযুদ্ধ	: Boxing (বক্সিং)
মধ্যস্থতাকারী	: Referee (রেফারি)
লাটিম	: Top (টপ)
লুডু	: Ludo (লুডু)
লাথি	: Kick (কিক)
সাঁতার	: Swimming (সুইমিং)
হকি খেলা	: Hockey (হকি)

শিক্ষা
EDUCATION

অধ্যক্ষ	: Principal (প্রিন্সিপাল)
অঙ্ক	: Sum (সাম)
অভিধান	: Dictionary (ডিক্সনারি)
অনুপস্থিত	: Absent (অ্যাবসেন্ট)
আদর্শলিপি	: Copy book (কপি বুক)
ইতিহাস	: History (হিস্টোরি)
উত্তর	: Answer (আনসার)
উপস্থিত	: Present (প্রেজেন্ট)
উত্তীর্ণ	: Promotion (প্রমোশন)
কাগজ	: Paper (পেপার)
কলম	: Pen (পেন)
কালি	: Ink (ইঙ্ক)
কেদারা	: Chair (চেয়ার)
গৃহশিক্ষক	: Tutor (টিউটর)
গ্রন্থকার	: Author (অথার)
গদ্য	: Prose (প্রোজ)
ঘড়ি	: Clock (ক্লক)
ঘণ্টা	: Bell (বেল)
ছুটি	: Leave (লিভ)
ছাত্র	: Student (স্টুডেন্ট)
ছবি	: Picture (পিকচার)
ছুরি	: Knife (নাইফ)
ছাত্রাবাস	: Boarding house (বোর্ডিং হাউস)
জরিমানা	: Fine (ফাইন)
তাক	: Rack (র‍্যাক)
দোয়াত	: Ink-pot (ইঙ্ক-পট)
নকশা	: Design (ডিজাইন)
ন্যাকড়া	: Duster (ডাস্টার)
নিব	: Nib (নিব)
নাম ডাকা	: Roll call (রোল কল)
পাকা খাতা	: Register (রেজিস্টার)
প্রধান শিক্ষক	: Headmaster (হেডমাস্টার)
পুরস্কার	: Prize (প্রাইজ)
পদক	: Medal (মেডেল)
পরীক্ষক	: Examiner (একজামিনার)
পরীক্ষার্থী	: Examinee (একজামিনি)
পাঠক	: Reader (রিডার)
পুস্তকালয়	: Library (লাইব্রেরি)
পুস্তক	: Book (বুক)
পেন্সিল	: Pencil (পেন্সিল)
পাতা	: Leaf (লিফ)

পদ্য	: Poetry (পয়েট্রি)
পড়া	: Lesson (লেসন)
পাঠ্যবই	: Text book (টেক্সট-বুক)
প্রশ্ন	: Question (কোয়েশ্চন)
পরীক্ষা	: Examination (এক্সামিনেশন)
বেঞ্চ	: Bench (বেঞ্চ)
বীজগণিত	: Algebra (আলজেবরা)
বেতন	: Fee (ফি)
বিষয়	: Subject (সাবজেক্ট)
বিজ্ঞান	: Science (সায়েন্স)
ব্যাকরণ	: Grammar (গ্রামার)
বাক্য	: Sentence (সেনটেন্স)
বৃত্তি	: Scholarship (স্কলারশিপ)
ভর্তি	: Admission (আডমিশন)
ভাষা	: Language (ল্যাংগোয়েজ)
ভুল	: Mistake (মিসটেক)
ভূগোল	: Geography (জিওগ্রাফি)
ভূগোলক	: Globe (গ্লোব)
মলাট	: Cover (কভার)
মানচিত্র	: Map (ম্যাপ)
শাস্তি	: Punishment (পানিশমেন্ট)
শ্রেণি	: Class (ক্লাস)
শ্রুতলিপি	: Dictation (ডিকটেশন)
শিক্ষক	: Teacher (টিচার)
শব্দ	: Word (ওয়ার্ড)
সাহিত্য	: Literature (লিটারেচার)
স্কুল-পরিদর্শক	: Inspector of Schools (ইন্সপেক্টর অব স্কুলস)

ধর্ম
RELIGIONS

অলৌকিক	: Miracle (মিরাক্‌ল)
আত্মা	: Soul (সোল)
আস্তিক	: Theist (থিস্ট)
ইসলাম ধর্ম	: Islam (ইসলাম)
খোদা, ভগবান	: God (গড)
গির্জা	: Church (চার্চ)
গুণ	: Virtue (ভারচু)
তপস্বী	: Hermit (হার্মিট)
দেবী	: Goddess (গডেস)
ধার্মিক	: Pious (পিয়াস)
ধর্মোপদেশ	: Sermon (সার্মন)
ধর্মগ্রন্থ	: Scripture (স্ক্রিপচার)
ধর্মপ্রচারক	: Preacher (প্রিচার)
ধর্মীয় মতবিশ্বাস	: Creed (ক্রিড)
ধর্মমন্দির	: Abbey (এবি)
ধর্মযাজক	: Bishop (বিশপ)
নরক, দোজখ	: Hell (হেল)
নবি	: Prophet (প্রোফেট)
নৈতিক	: Moral (মরাল)
পবিত্র	: Holy (হলি)
পাপ	: Sin (সিন)
প্রার্থনা করা	: Pray (প্রে)
পাপ	: Vice (ভাইস)
পবিত্র কুরআন	: Quran (কুরআন)
প্রতিমা	: Image (ইমেজ)
পাদ্রি	: Parson (পার্সন)
প্রভু	: Lord (লর্ড)
পূজা	: Worship (ওরশিপ)
ফেরেশতা	: Angel (এঞ্জেল)
বিশ্বাস	: Credence (ক্রিডেন্স)
বিধাতা	: Providence (প্রভিডেন্স)
বিশ্বাস	: Faith (ফেইথ)
বাইবেল	: Bible (বাইবেল)
মসজিদ	: Mosque (মস্ক)
মন্দির	: Temple (টেম্পল)
মন্ত্র	: Charm (চার্ম)
মঠবাসী, সন্ন্যাসী	: Monk (মঙ্ক)
জাকাত	: Poor-tax (পোর ট্যাক্স)
রোজা/উপবাস	: Fasting (ফাস্টিং)
শয়তান	: Devil (ডেভিল)
শিষ্য	: Disciple (ডিসাইপল)
শয়তান	: Evil (ইভিল)
শপথ	: Oath (ওউথ)
সর্বশক্তিমান	: Almighty (অলমাইটি)
স্বর্গ / বেহেশত	: Paradise (প্যারাডাইস) Heaven (হেবেন)
সৃষ্টিকর্তা	: Creator (ক্রিয়েটর)
স্বর্গীয়	: Divine (ডাইভিন)
সাধু	: Saint (সেইন্ট)
স্বর্গীয়	: Elysian (ইলিজিয়ান)
হজ্ব	: Pilgrimage (পিলগ্রিমেজ)
হাদিস	: Tradition (ট্রেডিশন)

আইন ও বিচার
LAW AND JUDICIAL

অপরাধ	: Crime (ক্রাইম)
অপরাধী	: Criminal (ক্রিমিনাল)
অধিকার	: Right (রাইট)
অপহরণ	: Slander (স্লান্ডার)
অপহরণ	: Kidnap (কিডনাপ)
আইনজীবী	: Lawyer (ল'ইয়ার)
আইনসঙ্গত	: Lawful (ল'ফুল)
আটকাদেশ	: Detention (ডিটেনশন)
আপিল	: Appeal (আপিল)
আইনসঙ্গত	: Legal (লিগাল)
অভিযুক্ত	: Accused (আকুসড)
আক্রমণ	: Assault (আসল্ট)
আবেদন	: Petition (পিটিশন)
আত্মহত্যা	: Suicide (সুইসাইড)
আদেশ	: Order (অর্ডার)
আইনজীবী	: Surrender (সারেন্ডার)
উচ্ছেদ	: Attorney (এটর্নি)
উহ্য	: Eviction (ইভিকশন)
ওরফে	: Alias (এলিয়াস)
ওজর, অনুহাত	: Plea (প্লি)
কাঠগড়া	: Dock (ডক)
কুচকাওয়াজ	: Parade (প্যারেইড)
খালাস	: Acquital (এ্যাকুইটাল)
ক্ষমা	: Pardon (পার্ডন)
ক্ষতি	: Damage (ড্যামেইজ)
খুন	: Murder (মার্ডার)
গ্রেফতারি পরোয়ানা	: Warrant (ওয়ারেন্ট)
গ্রেফতার করা	: Arrest (অ্যারেস্ট)
গঠন করা	: Frame (ফ্রেম)
গোপন সংবাদদাতা	: Informer (ইনফরমার)
গুণ, ভাল দিক	: Merits (মেরিটস)
গোপন করা	: Conceal (কনসিল)
চুরি	: Larceny (লারসিনি)
ছিনতাই	: Hijack (হাইজ্যাক)
জরিমানা	: Fine (ফাইন)
জামিন	: Bail (বেইল)
জিজ্ঞাসাবাদ	: Interrogation (ইন্টারোগেশন)
জবানবন্দি	: Deposition (ডিপজিশন)
জালিয়াতি	: Forgery (ফোজারি)
জেরা	: Cross (ক্রোস)
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত	: Verdict (ভার্ডিক্ট)
তদন্ত	: Inquiry (ইনকোয়ারি)
তালাক	: Divorce (ডিভোর্স)
তদন্ত	: Investigation (ইনভেস্টিগেশন)
তলবনামা	: Summon (সমন)
দোষ	: Guilt (গিল্ট)
দুর্ঘটনা	: Accident (অ্যাকসিডেন্ট)
দলিল, চুক্তি	: Deed (ডিড)
দোষ	: Offence (অফেন্স)
দেওয়ানি	: Civil (সিভিল)
দেওয়ানি আদালত	: Civil Court (সিভিল কোর্ট)
দোষী	: Guilty (গিল্টি)
ধর্ষণ	: Rape (রেপ)
নাগরিক	: Citizen (সিটিজেন)
নাগরিকত্ব	: Citizenship (সিটিজেনশিপ)
ন্যায়বিচার	: Justice (জাস্টিস)
নিরপরাধ	: Innocent (ইনোসেন্ট)
নির্বাহ	: Execution (এক্সিকিউশন)
নিবেদন	: Submission (সাবমিশন)
নাবালক	: Minor (মাইনর)
নির্জন	: Solitary (সলিটারি)
নাকচ করা	: Reject (রিজেক্ট)
নিষেধাজ্ঞা	: Injunction (ইঞ্জাংশন)
ডাকাতি	: Robbery (রোবারি)
প্রাপ্তবয়স্ক	: Adult (অ্যাডাল্ট)
প্রত্যক্ষ সাক্ষী	: Eye-witness (আই-উইটনেস)
পরীক্ষা	: Testify (টেস্টিফাই)
ফৌজদারি আদালত	: Criminal Court (ক্রিমিনাল কোর্ট)
বিচারক	: Judge (জজ)
বিচার	: Judgement (জাজমেন্ট)
বিচার	Trial (ট্রেইল)
বাতিল	: Ban (বান)
বিবাদি	: Defendant (ডিফেন্ডেন্ট)
বৈধকরণ	: Legalize (লিগালাইজ)
বিচারকমণ্ডলী	: Jury (জুরি)
বেআইনি আটক	: Confinement (কনফাইনমেন্ট)
বিশ্বাস করা	: Trust (ট্রাস্ট)
বন্দি	: Prison (প্রিজন)
বাতিল করা	: Nullify (নালিফাই)
বাদি	: Prosecutor (প্রসিকিউটর)
মামলা	: Case (কেইস)
মৃত্যুদণ্ড	: Capital Punishment (ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট)

মুলতবি	: Abeyance (অ্যাবিএন্স)
মামলা	: Suit (সুট)
রায়	: Judgement (জাজমেন্ট)
শপথ	: Oath (ওউথ)
শুনানি	: Hearing (হিয়ারিং)
বাদির নিষ্পত্তিকরণ	: Arbitration (আর্বিট্রেশন)
শাস্তি	: Punishment (পানিশমান্ট)
শাস্তিযোগ্য	: Punishable (পানিশএ্যাবল)
ষড়যন্ত্র	: Conspiracy (কনসপাইরেসি)
সংবিধান	: Constitution (কনস্টিটিউশন)
সংশোধন	: Amendment (অ্যামেন্ডমেন্ট)
সাজা প্রদান	: Convict (কনভিক্ট)
সাক্ষী	: Witness (উইটনেস)
সন্দেহ করা	: Suspect (সাসপেক্ট)
সাক্ষ্য	: Evidence (ইভিডেন্স)
সিনেল চুরি	: Burglary (বার্গলারি)
সিদ্ধান্ত	: Decision (ডিসিশন)
সত্য ঘটনা	: Fact (ফ্যাক্ট)
হাতকড়া	: Handcuff (হ্যান্ডকাফ)
হত্যা	: Homicide (হোমিসাইড)
হত্যা করা	: Kill (কিল)

প্রতিরক্ষা
DEFENCE

অস্ত্রশস্ত্র	: Arms (আর্মস)
অবরোধ	: Siege (সিজ)
আণবিক বোমা	: Atom bomb (অ্যাটম বোম)
আক্রমণ	: Attack (এ্যাটাক)
কামান	: Cannon (ক্যানন)
কামানের গোলা	: Ball (বল)
ক্যাপ্টেন	: Captain (ক্যাপ্টেইন)
কর্নেল	: Colonel (কর্নেল)
যুদ্ধ	: Battle (ব্যাটল)
শেল	: Shell (শেল)
গুপ্তচর	: Spy (স্পাই)
গোলন্দাজ বাহিনী	: Artillery (আর্টিলারি)
ছোরা	: Dagger (ড্যাগার)
গুলি	: Shot (শট)
ছত্রভঙ্গ	: Rout (রাউট)
যুদ্ধবিমান	: Fighter (ফাইটার)
জয়	: Win (উইন)
ঢাল	: Shield (শিল্ড)
তির	: Arrow (অ্যারো)
তরবারি	: Sword (সোর্ড)
তাঁবু	: Tent (টেন্ট)
দুর্গ	: Fort (ফোর্ট)
ধনুক	: Bow (বো)
নৌসেনা	: Naval force (নেভাল ফোর্স)
নৌবাহিনী	: Navy (নেভি)
পিস্তল	: Pistol (পিস্তল)
প্রধান সেনাপতি	: Commander-in-Chief (কমান্ডার ইন চিফ)
পরাজয়	: Defeat (ডিফিট)
পলায়ন	: Retreat (রিট্রিট)
পতাকা	: Flag (ফ্লাগ)
পত্রবাহক দূত	: Messenger (মেসেঞ্জার)
পদাতিক সেনাবাহিনী	: Infantry (ইনফ্যান্ট্রি)
বারুদ	: Powder (পাউডার)
বিস্ফোরক	: Explosion (এক্সপ্লোশন)
বন্দুক	: Gun (গান)
বোমা	: Bomb (বোম)
বেয়নেট	: Bayonet (বেয়নেট)
বর্শা	: Lance (লেন্স)
বল্লম	: Spear (স্পিয়ার)
বর্ম	: Armour (আর্মার)
বন্দুকের গোলা	: Bullet (বুলেট)
ব্রিগেডিয়ার	: Brigadier (ব্রিগেডিয়ার)
বিজয়	: Victory (ভিক্টরি)
বিমান বাহিনী	: Airforce (এয়ারফোর্স)
বীর	: Hero (হিরো)
বন্দি	: Prisoner (প্রিজনার)
মেজর	: Major (মেজর)
যুদ্ধাস্ত্র	: War-weapons (ওয়ার-উইপনস)
যুদ্ধ	: War (ওয়ার)
যুদ্ধবন্দি	: War prisoner (ওয়ার প্রিজনার)
রণতরী	: Fleet (ফ্লিট)
লেফটেন্যান্ট	: Lieutenant (লেফটেন্যান্ট)
শিবির	: Camp (ক্যাম্প)
শান্তি	: Peace (পিস)
সহযোদ্ধা	: Comrade (কমরেড)
সেনাপতি	: Commander (কমান্ডার)
সন্ধি	: Treaty (ট্রিএটি)
সৈন্য	: Soldier (সোলজার)

পশু
BEASTS

ইঁদুর	: Mouse (মাউস)
উট	: Camel (ক্যামেল)
কুকুর	: Dog (ডগ)
কাঠবিড়ালি	: Squirrel (স্কুইরিল)
খরগোশ	: Hare (হেয়ার)
খচ্চর	: Mule (মিউল)
খেঁকশিয়াল	: Fox (ফক্স)
গাধা	: Ass (এ্যাস)
গরু	: Cow (কাউ)
ঘোড়া	: Horse (হর্স)
চিতাবাঘ	: Leopard (লেপার্ড)
ছাগল	: Goat (গোট)
ছাগল ছানা	: Kid (কিড)
জেব্রা	: Zebra (জেব্রা)
টাট্টু ঘোড়া	: Pony (পনি)
নেকড়ে বাঘ	: Woll (উলফ)
বিড়াল	: Cat (ক্যাট)
বন মানুষ	: Orang-utan (ওরাং-ওটাং)
বাঘের বাচ্চা	: Cub (কাব)
বলদ (ষাঁড়)	: Bull (বুল)
বলদ	: Bullock (বুলক)
বন্য শূকর	: Boar (বোর)
বাছুর	: Calf (কাফ)
বাঘ	: Tiger (টাইগার)
বাঘিনী	: Tigress (টাইগ্রিস)
বড় ইঁদুর	: Rat (র‍্যাট)
ভেড়া	: Ram (র‍্যাম)
ভেড়ি	: Ewe (ইউ)
ভেড়ার বাচ্চা	: Lamb (ল্যাম্)
ভল্লুক	: Bear (বেয়ার)
মহিষ	: Buffalo (বাফেলো)
মেষ	: Sheep (শিপ)
শৃগাল	: Jackal (জ্যাকল)
শূকর	: Hog (হগ)
শূকর ছানা	: Pig (পিগ)
ষাঁড়	: Ox (অক্স)
সিংহ	: Lion (লায়ন)
সিংহী	: Lioness (লায়নেস)
হরিণ	: Deer (ডিয়ার)
হরিণ শাবক	: Fawn (ফন)
হরিণী	: Doe (ডো)
হরিণী	: Hind (হাইন্ড)
হাতি	: Elephant (আলিফান্ট)

পাখি
BIRDS

ইগল পাখি	: Eagle (ইগল)
উটপাখি	: Ostrich (অস্ট্রিচ)
কাকাতুয়া	: Cockatoo (ককাটু)
কোকিল	: Cuckoo (কুকু)
কাক	: Crow (ক্রো)
গাং চিল	: Seagull (সিগাল)
ঘুঘু	: Dove (ডাভ)
চিল	: Kite (কাইট)
চাতক	: Skylark (স্কাইলার্ক)
চড়ুই	: Sparrow (স্পারো)
তোতাপাখি	: Parrot (প্যারোট)
দোয়েল	: Magpie Robin (মেগপাই রবিন)
দাঁড়কাক	: Rook (রুক)
দাঁড়কাক	: Raven (রাভেন)
টিয়াপাখি	: Parakeet (প্যারাকিট)
পাখি	: Bird (বার্ড)
পেঁচা	: Owl (আউল)
পাতিহাঁস	: Drake (ড্রেক)
পানকৌড়ি	: Pelican (পেলিকান)
পায়রা	: Pigeon (পিজিওন)
বাজপাখি	: Hawk (হোক)
বুলবুলি	: Nightingale (নাইটিঙ্গেল)
বাবুই	: Swallow (সোয়ালো)
বাদুড়	: Bat (ব্যাট)
বক	: Heron (হেরন)
বাজপাখি	: Falcon (ফালকন)
মুনিয়া	: Munia (মুনিয়া)
ময়ূর	: Peacock (পিকক)
ময়ূরী	: Peahen (পিহেন)
মোরগ	: Cock (কক)
মুরগি	: Hen (হেন)
মুরগির বাচ্চা	: Chicken (চিকেন)
মাছরাঙা	: Kingfisher (কিংফিশার)
রাজহংসী	: Goose (গুজ)
রাজহাঁস	: Gander (গ্যান্ডার)
শালিক	: Martin (মার্টিন)
শকুন	: Vulture (ভালচার)
সারস	: Crane (ক্রেইন)
সারস	: Stork (স্টোর্ক)
হাড়গিলা	: Adjutant (এডজুটেন্ট)
হাঁস	: Duck (ডাক)

FISHES

: Hilsha (ইলিশ)
: Coilnekey fish (কোইলনেকি ফিশ)
: Carp (কার্প)
: Crab (কাঁকড়া)
: Lobster (লবস্টার)
: Prawn (চিংড়ি)
: Shrimp (ছিংড়ি)
: Black fish (কুচ ফিশ)
: Whale (হোয়েল)
: Star fish (স্টার ফিশ)
: Small fry (পুচকে চিংড়ি)
: Flat fish (চ্যাপ্টা ফিশ)
: Sardine (সার্ডিন)
: Trout (ট্রাউট)
: Eel fish (ইল ফিশ)
: Cat fish (কাটা ফিশ)
: Scale (স্কেল)
: Gill (গিল)
: Roe (রো)
: Salmon (সালমন)
: Dry fish (শুটকি ফিশ)
: Seal fish (সিল ফিশ)
: Barbel (বার্বেল)
: Shark (শার্ক)

WORMS AND INSECTS

: Louse (লাউস)
: White ant (হোয়াইট আন্ট)
: Earth worm (আর্থওয়ার্ম)
: Toad (টোড)
: Silkworm (সিল্কওয়ার্ম)
: Cobra (কোবরা)
: Mole (মোল)
: Bug (বাগ)
: Leech (লিচ)
: Glow worm (গ্লো ওয়ার্ম)
: Cricket (ক্রিকেট)
: Lizard (লিজার্ড)
: Old beetle (অয়েল বিটল)
: Ant (আন্ট)

: Butterfly (বাটারফ্লাই)
: Wasp (ওয়াস্প)
: Mosquito (মসকুইটো)
: Frog (ফ্রগ)
: Hornet (হর্নেট)
: Mosquito (মসকুইটো)
: Fly (ফ্লাই)
: Bee (বি)
: Spider (স্পাইডার)
: Cockroach (কক্রোচ)
: Hedgehog (হেজহগ)
: Reptile (রেপ্টাইল)
: Snake (স্নেক)

FRUITS

: Apple (অ্যাপল)
: Pine apple (পাইন অ্যাপল)
: Mango (ম্যাঙ্গো)
: Hogplum (হগপ্লাম)
: Grape (গ্রেপ)
: Plum (প্লাম)
: Orange (অরেঞ্জ)
: Citron (সিট্রন)
: Jack fruit (জ্যাক ফ্রুট)
: Raisin (রেইজিন)
: Banana (ব্যানানা)
: Date (ডেট)
: Berry (বেরি)
: Olive (অলিভ)
: Green coconut (গ্রিন কোকোনাট)
: Pomo granet (পম গ্রানেট)
: Palm (পাম)
: Water melon (ওয়াটার মিলন)
: Tamarind (টামারিন্ড)
: Pear (পিয়ার)
: Coconut (কোকোনাট)
: Guava (গুয়েভা)
: Papiya (পাপিয়া)
: Pistachio (পিস্টাচিও)
: Almond (অ্যামন্ড)
: Nut (নাট)

: Wood apple (বেল)
: Bhabbra (ভাব্বরা)
: Ata (আটা)
: Lemon (লেমন)
: Cucumber (কুকুমবার)

FLOWERS

: China tree (চায়না রোজ)
: Oleander (ওলিয়েন্ডার)
: Gardenia (গার্ডেনিয়া)
: Rose (রোজ)
: Marigold (মেরিগোল্ড)
: Cherry (চেরি)
: Jasmine (জেসমিন)
: China rose (চায়না রোজ)
: Bastard teak (বাস্টার্ড টিক)
: Lotus (লোটাস)
: Crupper (ক্রোপার)
: Tulip (টিউলিপ)
: Echits (এচিটস)
: Night queen (নাইট কুইন)
: Lilly (লিলি)
: Sunflower (সান ফ্লাওয়ার)

COLORS

: Black (ব্ল্যাক)
: Orange (অরেঞ্জ)
: Puce (পিউস)
: Maroon (মারুন)
: Fair (ফেয়ার)
: Pink (পিঙ্ক)
: Ash (অ্যাশ)
: Grey (গ্রে)
: Blue (ব্লু)
: Indigo (ইন্ডিগো)
: Sky blue (স্কাই ব্লু)
: Pale (পেল)
: Brown (ব্রাউন)
: Violet (ভাইওলাট)

MATHEMATICS

: Plane (প্লেন)
: Square (স্কোয়ার)
: Cube (কিউব)
: Cuboid (কিউবয়েড)
: Cylinder (সিলিন্ডার)
: Cone (কোন)
: Sphere (স্ফিয়ার)
: Hemisphere (হেমিস্ফিয়ার)
: Angle (এঙ্গেল)
: Acute angle (একিউট এঙ্গেল)
: Obtuse angle (অবটিউস এঙ্গেল)
: Right angle (রাইট এঙ্গেল)
: Triangle (ট্রায়াঙ্গেল)
: Isosceles triangle (আইসোসেলিস ট্রায়াঙ্গেল)
: Equilateral triangle (ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল)
: Scalene triangle (স্কেলিন ট্রায়াঙ্গেল)
: Rectangle (রেক্টাঙ্গেল)
: Rhombus (রম্বাস)
: Trapezium (ট্রাপিজিয়াম)
: Parallelogram (প্যারালেলোগ্রাম)
: Pentagon (পেন্টাগন)
: Hexagon (হেক্সাগন)
: Heptagon (হেপ্টাগন)
: Octagon (অক্টাগন)
: Nonagon (নোনাগন)
: Decagon (ডেকাগন)
: Circle (সার্কেল)
: Arithmetic (এরিথমেটিক)
: Difference (ডিফারেন্স)
: Quotient (কোশেন্ট)
: System (সিস্টেম)
: Pound (পাউন্ড)
: Proof (প্রুফ)
: Measure (মেজার)
: Real (রিয়াল)
: Statistics (স্ট্যাটিস্টিক্স)
: Space (স্পেস)
: Divide (ডিভাইড)
: Algebra (অ্যালজেব্রা)
: Circle (সার্কেল)
: Distribution (ডিস্ট্রিবিউশন)
: Deduct (ডিডাক্ট)
: Minus (মাইনাস)

বর্গক্ষেত্র	: Square (স্কয়ার)
মূল	: Root (রুট)
মূল্য	: Value (ভ্যালু)
যোগ	: Plus (প্লাস)
যোগ	: Sum (সাম)
যুক্তিবিদ্যা	: Logic (লজিক)
যোগফল	: Summation (সামেশন)
রৈখিক	: Linear (লিনিয়ার)
বক্র	: Curve (কার্ব)
শীর্ষবিন্দু	: Apex (এপেক্স)
শতক	: Decimal (ডেসিমল)
শতকরা	: Percent (পার্সেন্ট)
সম্পূর্ণ	: Absolute (অ্যাবসুলুট)
সংলগ্ন	: Adjacent (অ্যাডজাসেন্ট)
সংখ্যা	: Number (নাম্বার)
সংখ্যা, রাশি	: Figure (ফিগার)
সমান	: Equal (ইকুয়াল)
সূত্র	: Formula (ফর্মুলা)
সমাধান	: Solution (সলিউশন)
সমীকরণ	: Equation (ইকোয়েশন)
সমান্তরাল	: Parallel (প্যারালেল)
হার	: Rate (রেট)

ধাতু এবং খনিজ পদার্থ
METALS AND MINERALS

অকটেন	: Octane (অকটেন)
আলকাতরা	: Tar (টার)
ইস্পাত	: Steel (স্টিল)
কয়লা	: Coal (কোল)
কাসা	: Bell metal (বেল মেটাল)
খনি	: Mine (মাইন)
গন্ধক	: Sulfur (সালফার)
চুন	: Lime (লাইম)
চুনি	: Ruby (রুবি)
তেল	: Oil (অয়েল)
তামা	: Copper (কপার)
দস্তা	: Zinc (জিঙ্ক)
টিন	: Tin (টিন)
ডিজেল	: Diesel (ডিজেল)
পিতল	: Brass (ব্রাশ)
পারদ	: Mercury (মারকারি)
পান্না	: Emerald (অ্যামারেলড)
পেট্রোল	: Patrol (পেট্রোল)
পাথর	: Stone (স্টোন)
মুক্তা	: Pearl (পার্ল)
মণি	: Gem (জেম)
রান্নার কয়লা	: Coke (কোক)
রুপা	: Silver (সিলভার)
লোহা	: Iron (আয়রন)
লবণ	: Salt (সল্ট)
সিসা	: Lead (লিড)
সোনা	: Gold (গোল্ড)

সময়, দিন ও মাস
TIMES, DAYS AND MONTHS

অপরাহ্ণ	: Afternoon (আফটারনুন)
আজ	: Today (টুডে)
আগামীকাল	: Tomorrow (টুমোরো)
আগামী মাস	: Proximo (প্রোকসিমো)
উষা	: Dawn (ডোন)
গতকাল	: Yesterday (ইয়েস্টারডে)
গোধূলি	: Dusk (ডাস্ক)
গত মাস	: Ultimo (আলটিমো)
ঘণ্টা	: Hour (আউয়ার)
তারিখ	: Date (ডেট)
দিন	: Day (ডে)
দুপুর	: Noon (নুন)
দিবলোক	: Day light (ডে লাইট)
পূর্বাহ্ণ	: Fore noon (ফোর নুন)
পরের দিন	: Morrow (মরো)
প্রত্যেক দিন	: Every day (এভরি ডে)
পক্ষ	: Fortnight (ফোর্টনাইট)
বর্তমান মাস	: Instant (ইনস্ট্যান্ট)
বছর	: Year (ইয়ার)
ভোর	: Daybreak (ডেব্রেক)
ভোর	: Morning (মর্নিং)
মধ্যাহ্ন	: Midday (মিডডে)
মুহূর্ত	: Moment (মোমেন্ট)
মিনিট	: Minute (মিনিট)
মাস	: Month (মানুথ)
যুগ	: Age (এজ)
রাত	: Night (নাইট)
শতাব্দী	: Century (সেঞ্চুরি)
সূর্যাস্ত	: Sunset (সানসেট)
সময়	: Time (টাইম)
সূর্যোদয়	: Sunrise (সানরাইজ)
সেকেন্ড	: Second (সেকেন্ড)
সপ্তাহ	: Week (উইক)
সহস্রাব্দ	: Millennium (মিলেনিয়াম)
স্বর্ণযুগ	: Golden age (গোল্ডেন এজ)

পারিভাষিক শব্দ

পরিভাষা : সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য

পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা কী তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলা অভিধান সংকলয়িতা রাজশেখর বসু বলেছেন, "অভিধানে 'পরিভাষা' অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা।" অনেক অর্থ আছে এমন কোনো শব্দ যদি বিশেষ প্রসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়, সে শব্দটি তখন পরিভাষা তৃতীয় শব্দ।

পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের গুলোচ নেই, প্রসার নেই। সাধারণত এমন শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলা হয় যার অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্মতিতে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।

শব্দ ও পরিভাষার পার্থক্য

শব্দ ও পরিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। পরিভাষা কোনো জ্ঞান-ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক ধারণার নাম বা সংজ্ঞার্থ আর শব্দ হচ্ছে ভাষায় ব্যবহৃত যে কোনো অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি। এক কথায়, সকল পরিভাষাই মূলত শব্দ, কিন্তু সকল শব্দই পরিভাষা নয়।

বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন

বাংলা ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনে বিদেশি পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির চেষ্টা শুরু হয় অনেকদিন আগে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাংলায় ধারাবাহিক ও প্রণালিবদ্ধভাবে পরিভাষা সংকলন ও নতুন পরিভাষা প্রণয়নের সূত্রপাত করেন। তার আগে পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা নেহায়েত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ঢাকার বাংলা একাডেমী এ কাজ করে।

বাংলা পরিভাষা নির্মাণ-কৌশল

সাধারণত পরিভাষা নির্মিত হয় দুটো ভিন্নতর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে: জ্ঞানের চর্চাকারী যাঁরা তাঁদের প্রয়োজনে পরিভাষা নির্মাণ করেন বা করতে বাধ্য হন এবং ক্রমশ সেটা অন্যদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে হতে এক সময় পরিভাষাটি সর্বসাধারণের কাছেও পৌঁছে যায়; সাধারণের কাছে তা কখনো গৃহীত হয়, কখনো হয় বর্জিত; কখনো সেটা অর্জন করে একটি উৎকৃষ্ট পারিভাষিক শব্দের মর্যাদা, কখনো বা শব্দটির সচেতন বর্জনের মাধ্যমে তা বিস্মৃতির অতল গর্ভে হারিয়ে যায়। ব্যক্তিক প্রচেষ্টা ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও পরিভাষা সৃষ্টি হতে পারে। ফ্রান্সে ফরাসি একাডেমি এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফরাসিরা কোন শব্দ, কোন শব্দের অর্থ, উচ্চারণ এমনকি পরিভাষা কী হবে তার জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে নির্ভর করে ফরাসি একাডেমির কর্তৃত্বের উপর, একাডেমি যে মতামত দেয় তা তাঁরা গ্রহণ করে প্রায় নির্দ্বিধায়। ইংরেজরা তেমনি ভাষা সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নেরই সদুত্তর লাভের ক্ষেত্রে নির্ভর করে অক্সফোর্ডের ওপর। বাংলাদেশে 'বাংলা একাডেমী', পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা আকাদেমি'-এ ধরনের দুটো প্রতিষ্ঠান, যারা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও নানা ধরনের প্রশাসনিক ও জ্ঞান জাগতিক পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কোন কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আজকাল এগিয়ে এসেছে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাদের মতামত নিয়ে।

যদি পরিভাষাটি সাধারণের কাছে সহজবোধ্য এবং ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে তবেই সেটি টিকে যায়, সেটা কোন প্রতিষ্ঠান না ব্যক্তি নির্মিত তা অবিবেচ্য। যেমন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় Advocate শব্দটির বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'অধিবক্তা' শব্দটি প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ শব্দটির পরিভাষা হিসেবে 'উকিল' শব্দটি সহজে গ্রহণ করায় 'অধিবক্তা' একেবারে হারিয়ে গেছে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Resident এবং Non-Resident শব্দ দুটির পরিভাষা তৈরি করেছিলেন 'আবাসিক' ও 'অনাবাসিক' — এই চমৎকার

দুটো পরিভাষা আমরা কিন্তু সহজেই গ্রহণ করে নিয়ে আজও তা স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করে চলেছি। সুতরাং পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

নিয়ম : যে কোনো পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে। সর্বজন স্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণ সম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তাছাড়া ভাষা বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না।

পদ্ধতি : যে কোন ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি দুটি হলো— ঋণ অনুবাদ ও নির্মাণ।

১. ঋণ অনুবাদ : পুরনো, ভুলে যাওয়া কোন বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিত পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ অনুবাদ হতে পারে দুধরনের। সংস্কৃত বা দেশি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ অর্থ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', 'ইতিহাস', 'পদার্থ' প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বোঝাত 'বিশেষ জ্ঞান'— তা সে যে কোনো জ্ঞানকেই বোঝাত কিন্তু এখন science-এর পরিভাষা হিসেবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটির ব্যবহার করছি।

২. নির্মাণ : শব্দ নির্মাণের মত পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা- যেমন, 'দ্রাঘিমা', 'ক্রি যুবরেখা', ল.সা.গু (পরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা গুণনীয়ক), গ.সা.গু (পরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা গুণনীয়ক) ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসাবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

সর্বস্তরে বাংলা : পরিভাষা-সমস্যা

একটি ভাষার শব্দভাণ্ডারে পরিভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিভাষাই ভাষা বিশেষের প্রকৃত সম্পদ। মাতৃভাষা বাংলাকে আমাদের জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে সমস্যাটি অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয় তা হল পরিভাষা সমস্যা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক রচনা ও অফিস-আদালতে বাংলার পূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিভাষার অভাব রয়েছে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রচুর ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে আমাদের বিশেষজ্ঞরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নতুন নতুন বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করে চলেছেন। পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সুশৃঙ্খল রূপ দেবার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথক পৃথক পরিভাষা-কোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। তবে পরিভাষা-কোষের মতো এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক কতিপয় পুস্তিকা দিয়ে পরিভাষার প্রয়োজন মেটানো সবসময় সম্ভবপর নয়। আর পরিভাষা তৈরি করলেই শুধু হবে না। প্রয়োজন এর প্রচুর ব্যবহার। সভ্যতার অগ্রগতিতে যখন কোনো নতুন বস্তু নতুন কর্ম কিংবা নতুন ধারণার আবির্ভাব ঘটে, তখন তার জন্য নতুন পরিভাষার প্রয়োজন পড়ে। কালের প্রবাহে পরিভাষা প্রণয়নের বিষয়টি তাই একটি অবিরাম প্রক্রিয়া।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গুরুত্বসম্পন্ন কিছু ইংরেজি পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ নিচে দেওয়া হলো।

A

Abeyance	- স্থগিতাবস্থা
Abolition	- বিলোপ
Abortive Coup	- ব্যর্থ অভ্যুত্থান
Abrogation	- রদ, নিরাকরণ
Absconder	- ফেরারি, পলাতক
Abstract	- সার, বিমূর্ত
Accountancy	- হিসাববিদ্যা
Accounting	- হিসাবরক্ষণ
Acting	- ভারপ্রাপ্ত
Accused	- অভিযুক্ত
Acknowledgement	- প্রাপ্তিস্বীকার
Act	- আইন
Addendum	- পরিশিষ্ট, সংযোজন
Adjournment	- মূলতবি
Ad-hoc	- তদর্থক
Adjustment	- সমন্বয়ন
Aeronautics	- বিমান বিদ্যা
Aesthetics	- নন্দনতত্ত্ব
Affidavit	- হলফনামা
Affiliation	- সম্বন্ধীকরণ
Agenda	- আলোচ্যসূচি
Aggregate	- সমষ্টি
Agitation	- আন্দোলন
Agreement	- চুক্তি
Agronomy	- কৃষিবিদ্যা
Aid	- সাহায্য
Aircraft	- বিমান
Airways	- বিমানপথ
Alien	- বিদেশি, বহিরাগত
Allegation	- অভিযোগ
Allegiance	- আনুগত্য
Allocation	- বিভাজন
Allotment	- বরাদ্দ
Allowance	- ভাতা
Almanac	- পঞ্জিকা
Alliance	- মৈত্রীজোট
Alternate	- একান্তর
Amalgamation	- সংমিশ্রণ, সংযোজন
Ambassador	- রাষ্ট্রদূত
Appropriation	- উপযোজন
Approval	- অনুমোদন
Arbiter	- মধ্যস্থ, সালিস
Archaeology	- প্রত্নতত্ত্ব
Armoury	- অস্ত্রাগার
Arsenal	- অস্ত্রাগার
Auditor	- নিরীক্ষক
Authority	- কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ
Authentic	- প্রামাণিক, যথাযথ
Ambiguous	- দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট
Analysis	- বিশ্লেষণ
Ancestor	- পূর্বপুরুষ
Animal husbandry	- পশুপালন
Annexation	- সংযোজন
Anonymous	- বেনামি, অজ্ঞাতনামা
Anthropology	- নৃতত্ত্ব
Anti-Corruption	- দুর্নীতি দমন
Antonym	- বিপরীত শব্দ
Apartheid	- বর্ণবৈষম্য
Apology	- ত্রুটি স্বীকার
Appendix	- পরিশিষ্ট
Appointment	- নিয়োগ
Apprentice	- শিক্ষানবিস
Arrear	- বকেয়া
Article	- অনুচ্ছেদ, প্রবন্ধ
Assassination	- গুপ্তহত্যা
Assembly	- পরিষদ
Assessment	- নির্ধারণ, করনির্ধারণ
Asylum	- আশ্রয়
Attachment	- ক্রোক
Attestation	- সত্যায়ন
Auction	- নিলাম
Award	- রায়, রোয়েদাদ
Autograph	- স্বাক্ষর, স্বলেখন
Astronomy	- জ্যোতির্বিদ্যা
Audience	- শ্রোতৃমণ্ডলী
Annexure	- সংলাগ, ক্রোড়পত্র
Autonomous	- স্বায়ত্তশায়িত, স্বশাসিত
Author	- লেখক, গ্রন্থকার
Airconditioned	- শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত

B

Backdoor	- পশ্চাৎ-দ্বার
Background	- পটভূমি
Bacteria	- জীবাণু
Badge	- তকমা
Bail	- জামিন
Balance	- বাকি, উদ্বৃত্ত, ভারসাম্য
Balanced diet	- সুষম খাদ্য
Bale	- গাঁট
Ballistic missile	- ক্ষেপণাস্ত্র
Ballot	- গোপন ভোট
Banishment	- নির্বাসন
Bank rate	- ব্যাংক হার
Bankrupt	- দেউলিয়া
Banned	- নিষিদ্ধ
Bank discount	- ব্যাংক বাট্টা
Banquet	- ভোজসভা
Barrage	

20/5/11 13:0

Barter - বিনিময়
Bond - প্রতিজ্ঞাপত্র, মুচলেকা
Bye-product - উপজাত
Balance-sheet - স্থিতিপত্র
Basin - অবস্থানিকা
Black-out - নিষ্প্রদীপ
Blue print - প্রতিচিত্র
Bribe, bribery - ঘুষ, উৎকোচ
Beneficiary - ঘরু-ভোগী
Basic pay - মূল বেতন
Bench - এজলাস, বেঞ্চ
Biased - পক্ষপাতদুষ্ট
Bill of exchange - হুণ্ডি, বিনিময় পত্র
Bio data - জীবন-বৃত্তান্ত
Black money - কালো টাকা
Book keeper - হিসাবরক্ষক
Boycott - বর্জন
Branch - শাখা
Break of contract - চুক্তিভঙ্গ
Break in service - কর্মবিরতি
Break of study - অধ্যয়ন-বিরতি
Broadcast - সম্প্রচার করা
Broker - দালাল
Bureau - ব্যুরো, সংস্থা
Bureaucracy - আমলাতন্ত্র
By-election - উপনির্বাচন
By order - আদেশক্রমে
Bookpost - খোলা ডাক
Booklet - পুস্তিকা
Barrack - সেনানিবাস
Bill of Lading - বহনপত্র
Bloc - শক্তিজোট
Bona fide - প্রকৃত, নিশ্চিত
Brochure - পুস্তিকা
Boxing - মুষ্টিযুদ্ধ
Bonus - অধিবৃত্তি, বোনাস
Body guard - দেহরক্ষী
Bad coin - জালমুদ্রা
Book fair - গ্রন্থমেলা, বইমেলা
Bill - বিল, মূল্যপত্র
Blockade - অবরোধ

C

Cabinet - মন্ত্রিসভা
Cable - তার
Cadre - পদাদি
Calligraphy - হস্তলিপিবিদ্যা
Call money - তলবি টাকা
Calorie - তাপাঙ্ক
Campaign - প্রচারাভিযান
Campus - অঙ্গন
Canon - নীতি
Capital - পুঁজি, মূলধন
Capitalism - পুঁজিবাদ
Care-taker - তত্ত্বাবধায়ক
Cargo - জাহাজে বহিত মাল
Cash crop - অর্থকরী ফসল
Cashier - খাজাঞ্চি
Cash register - নগদান খাতা
Casual - নৈমিত্তিক
Catalogue - তালিকা
Category - পর্যায়
Caution money - জামানত
Cease fire - যুদ্ধবিরতি
Censor - বিধায়ক
Censure - তিরস্কার
Census - আদমশুমারি
Cess - কর, উপকর
Consumer goods - ভোগ্যপণ্য
Contract - চুক্তি
Calender - ইস্ত্রি করার যন্ত্র
Convener - আহ্বায়ক
Charge - দায়, অভিযোগ
Charter - সনদ
Chronological - কালানুক্রমিক
Circulation - প্রচারণ, সংবহন
Cistern - চৌবাচ্চা
Civil action - দেওয়ানি মামলা
Clause - দফা
Claim - দাবি
Client - মক্কেল
Cognizable - আদালতগ্রাহ্য
Coin - মুদ্রা
Cold storage - হিমাগার
Colony - উপনিবেশ
Column - স্তম্ভ
Commandant - সেনানায়ক
Commentary - ভাষ্য
Commodity - পণ্য
Complaint - অভিযোগ
Compensation - ক্ষতিপূরণ
Concession - রেয়াত, সুবিধা

Conference - সম্মেলন
Confidence - আস্থা
Confiscated - চালান
Consignment - সংবিধান
Constitution - প্রভুত্বত্ব
Copyright - কৌপুলি
Counsel - সংবিধি
Criminal law - দণ্ডালয়
Consulate - শুল্কভবন
Custom house - সম্পত্তি
Consent - ঠিকাদার
Contractor - ক্রেতা, গ্রাহক
Customer - প্রধান, মুখ্য
Chief - নির্ণায়ক ভোট
Casting Vote - ষড়যন্ত্র
Conspiracy - অভ্যুত্থান
Coup d'etat - প্রত্যয়ন পত্র
Certificate - আচার্য
Chancellor - সম্প্রদায়, সমাজ
Community - গৃহযুদ্ধ
Civil war

D

Dairy - গব্যশালা
Data - উপাত্ত
Dead letter - নির্দেশ্য পত্র
Deadline - নির্দিষ্ট সময়সীমা
Deadlock - অচলাবস্থা
Discount - বাট্টা
Debenture - ঋণপত্র
Debit - খরচ
Deed - দলিল
Defence - প্রতিরক্ষা
Delegate - প্রতিনিধিবর্গ
Deposit - আমানত
Deputation - প্রেষণ
Determination - নির্ণয়
Devaluation - মূল্যহ্রাস
Diagram - নকশা, চিত্র
Dialogue - সংলাপ
Diploma - উপাধিপত্র
Diplomat - কূটনীতিক
Disallowance - নামঞ্জুর, নাকচ
Discrepancy - অসঙ্গতি
Discretion - স্ববিবেক, বিবেচনা
Dismissal - পদচ্যুতি
Disposal - নিষ্পত্তি
Distributor - বণ্টনকারী, পরিবেশক
Dividend - লভ্যাংশ
Dockyard - পোতাঙ্গন
Domicile - স্থায়ী নিবাস
Donation - দান
Draftsman - নকশাকার
Drawee - (হুণ্ডি) গ্রাহক
Drought - খরা, অনাবৃষ্টি
Drug - ঔষধ
Dual - দ্বৈত
Duet - দ্বৈত সংগীত
Dummy - প্রতিরূপ
Duplicate - দ্বিতীয়ক, প্রতিরূপ
Duplication - অনুলিপি
Duration - স্থিতিকাল
Duty - শুল্ক, কর্তব্য
Dyarchy - দ্বৈতশাসন
Dynamic - গতিশীল
Demi-official - আধা-সরকারি
Designation - পদবি
Danger-level - বিপদসীমা
Debt - ঋণ
Demotion - পদাবনতি
Delinquency - অপরাধ
Discharge - বরখাস্ত
Disarmament - নিরস্ত্রীকরণ
Discrimination - বৈষম্য
Draft - খসড়া
Delegation - প্রতিনিধিবর্গ
Defendant - প্রতিবাদী, বিবাদি
Decentralization - বিকেন্দ্রীকরণ

E

Earned leave - অর্জিত ছুটি
Economy - অর্থব্যবস্থা
Editor - সম্পাদক
Educationist - শিক্ষাবিদ
Efficiency - কর্মক্ষমতা
Ejectment - উচ্ছেদ
Elasticity - স্থিতিস্থাপকতা
Electric - বৈদ্যুতিক
Electronics - বৈদ্যুতিন
E-mail (e-mail) - বৈ-ডাক
Electoral college - নির্বাচকমণ্ডলী
Electro-magnetic - তড়িৎ চুম্বকীয়

Elevator - উত্তোলক
Emancipation - মুক্তি
Embankment - বাঁধ
Embargo - অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা
Emblem - প্রতীক
Emerald - পান্না
Emergency - জরুরি
Employee - কর্মচারী
Employment - কর্মনিয়োগ, চাকুরি
Emporium - পণ্য, বড় দোকান
Encumbrance - দায়ভার
Endorsement - পৃষ্ঠাঙ্কন
Enforcement - বলবৎকরণ
Epitaph - সমাধিফলকে খোদাই করা উক্তি
Engineer - প্রকৌশলী
Enterprise - উদ্যোগ
Epidemic - মহামারী
Epilepsy - মৃগি
Equation - সমীকরণ
Equitable distribution - সমবণ্টন
Eradication - উচ্ছেদ
Establishment - সংস্থাপন
Estate - সম্পত্তি
Estimated value - প্রাক্কলিত মূল্য
Etiquette - শিষ্টাচার
Evacuation - উদ্বাসন
Eviction - উৎখাতকরণ
Evidence - সাক্ষ্য, প্রমাণ
Evolution - অভিব্যক্তি
Exchange - বিনিময়
Executive - নির্বাহী
Exhibition - প্রদর্শনী
Expansion - প্রসারণ
Expert - বিশেষজ্ঞ
Exploitation - শোষণ
Episode - উপকাহিনি
Eye-witness - প্রত্যক্ষদর্শী
Encyclopaedia - বিশ্বকোষ
Excise duty - আবগারি শুল্ক
Evaluation - মূল্যায়ন

F

Face value - অভিহিত মূল্য
Factory - কারখানা
Faculty - অনুষদ; কর্মদক্ষতা
Fair - মুখর, ন্যায্য; মেলা
Fallow land - পতিত জমি
Falls - জলপ্রপাত
Famine - দুর্ভিক্ষ
Farce - প্রহসন
Fare - গাড়ী-ভাড়া
Federation - যুক্তরাষ্ট্র; সঙ্ঘ
Ferry - খেয়া, খেয়াঘাট
Fertilizer - কৃত্রিমসার, সার
Fibre - তন্তু
Fiction - কথাসাহিত্য
File keeper - নথি রক্ষক
Film - চলচ্চিত্র
Finance - অর্থ; অর্থসংস্থান
Finger print - আঙুলের ছাপ
Fire arm - আগ্নেয়াস্ত্র
First aid - প্রাথমিক চিকিৎসা
Fiscal policy - রাজস্ব-নীতি
Footprint - পায়ের ছাপ
Foreign exchange - বৈদেশিক মুদ্রা
Foreign policy - পররাষ্ট্রনীতি
Foreman - সর্দার, কর্মনায়ক
Foreword - পূর্বকথা, ভূমিকা
Forfeit - বাজেয়াপ্ত করা
Forgery - জালিয়াতি
Formal - লৌকিক, আনুষ্ঠানিক
Format - ফর্মা
Formula - সূত্র; সংকেত
Fortnightly - পাক্ষিক
Forward - অগ্রিম; প্রেরণ করা
Foundation - ভিত্তি, প্রতিষ্ঠান
Founder - প্রতিষ্ঠাতা
Fourth state - চতুর্থ রাষ্ট্র (সংবাদপত্র)
Framework - কাঠামো
Free harbour - অবাধ পোতাশ্রয়
Free market - খোলা বাজার
Freight - মাল ভাড়া
Frontier - সীমান্ত
Fuel - জ্বালানি
Fugitive - পলাতক
Function - কর্ম, ধর্ম
Fund - তহবিল, পুঁজি
Flora - উদ্ভিদকুল
Fauna - প্রাণিকুল
Fantasy - উদ্ভট কাহিনি
Folk song - লোকসংগীত

Fundamental - মৌলিক
Funeral - শেষকৃত্য
Furnace - চুল্লি
Fire worse - মুক্ত জখ
Fair price - ন্যায্যমূল্য

G

Gain - লাভ
Gallery - ছায়াপথ
Gamson - সেনাদল
Gazeteer - ভৌগোলিক অভিধান
Genealogy - বংশপরিচয়
General amnesty - সাধারণ ক্ষমা
Gist - সারমর্ম
Global - বিশ্বব্যাপী
Glossary - শব্দপঞ্জি
Godown - গুদাম
Gold standard - স্বর্ণমান
Goods - পণ্য, মাল
Goodwill - সুনাম; শুভেচ্ছা
Gun-powder - বারুদ
Graduate - স্নাতক
Grating - কলম; কলম করা
Granary - শস্যাগার
Grant - অনুদান, মঞ্জুরি
Graphic - লৈখিক, রৈখিক
Gratuity - আনুতোষিক, উপহার
Gravitation - মহাকর্ষ
Great Bear - সপ্তর্ষিমণ্ডল
Green room - সাজঘর
Gross income - স্থূল আয়
Group insurance - গোষ্ঠীবিমা
Guild - সঙ্ঘ
Gymnasium - ব্যায়ামাগার
Guide book - নির্দেশিকা
Gypsy - বেদে

H

Hand bill - ইশ্‌তেহার
Handcraft - হস্তশিল্প
Handloom - তাঁত
Haven - পোতাশ্রয়
Headland - অন্তরীপ
Hemisphere - গোলার্ধ
Hand note - হাতচিঠি
Hand-out - জ্ঞাপনপত্র
Hangar - বিমানাগার
Harbour - পোতাশ্রয়
Hard money - খাঁটি টাকা
Hoards - মজুতকরা
Horoscope - কোষ্ঠী
Hostage - জিম্মি
Humanism - মানবিক দিক
Hygiene - স্বাস্থ্যবিদ্যা
Hypothesis - প্রকল্প
Hypocrisy - কপটতা, ভণ্ডামি
Hidden tax - গোপন কর
High market - উচ্চ বাজার
High water - জোয়ার
Hinterland - পশ্চাদ্‌ভূমি
Holding Company - উদ্যোগের গোপনীয়
Honorary - অবৈতনিক, সম্মানসূচক
Human Rights - মানবাধিকার
Hunger strike - অনশন ধর্মঘট
Hydrology - জলবিদ্যা
Hydrosphere - বারিমণ্ডল
Highway - মহাসড়ক
Hearing - শুনানি
Husing Project - আবাসন প্রকল্প
Hospitality - অতিথেয়তা; আতিথ্য
Humanity - মানবতা

I

Idealism - ভাববাদ
Identification - শনাক্তকরণ
Idiom - বাগধারা
Illegible - দুষ্পাঠ্য, অস্পষ্ট
Illiterate - নিরক্ষর
Imitation - অনুকরণ, অনুকৃতি
Immigrant - অভিবাসী
Impeachment - অভিসংশন
Imperialism - সাম্রাজ্যবাদ
Import - আমদানি
Imprisonment - কারাদণ্ড
Instrument - যন্ত্র
Insurance - বিমা
Integer - পূর্ণ সংখ্যা
Incidental - আনুষঙ্গিক
Income-tax - আয়কর
Index - নির্দেশক, সূচক
Industry - শিল্প
Inflation - মুদ্রাস্ফীতি

15/11/13 13:01

Inheritance - উত্তরাধিকার
Initial pay - প্রারম্ভিক বেতন
Injunction - নিষেধাজ্ঞা
Inquiry - অনুসন্ধান, তদন্ত
Inspection - পরিদর্শন
Installation - স্থাপনা
Instalment - কিস্তি
Intelligentsia - বুদ্ধিজীবী সমাজ
Interview - সাক্ষাৎকার
Investigation - অনুসন্ধান, তদন্ত
Invoice - চালান
Ivory - গজদন্ত, হাতির দাঁত
Interim - মধ্যকালীন, অন্তর্বর্তীকালীন

Intrusion - অনধিকার প্রবেশ
Investment - বিনিয়োগ
Irrigation - সেচ
Indoor game - অন্তরঙ্গন ক্রীড়া
Interrogation - জিজ্ঞাসাবাদ
Interpreter - দোভাষী
Informal - অনানুষ্ঠানিক

J

Jeweller - মণিকার
Joint account - যৌথ হিসাব
Joint editor - যুগ্ম সম্পাদক
Juggler - ভোজবাজিকর
Junction - সংযোগস্থল, জংশন
Jurisdiction - এখতিয়ার
Just war - ন্যায় যুদ্ধ
Jury - নির্ণায়ক বর্গ, জুরি
Juvenile delinquency - কিশোর অপরাধ
Joint property - এজমালি সম্পত্তি
Joint venture - যৌথ প্রচেষ্টা
Journal - পত্রিকা, সাময়িক পত্রিকা
Judge - বিচারক
Judgment - রায়
Judicial enquiry - বিচার বিভাগীয় তদন্ত
Jurisprudence - আইন বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র

Juvenile literature - কিশোর সাহিত্য
Joint estate - এজমালি সম্পত্তি

K

Key industry - মূল শিল্প
Key note - মূলভাব, মর্ম

Kidnapping - অপহরণ
Knave - দুর্বৃত্ত, প্রতারক
Knavery - প্রতারণা
Knowledge - জ্ঞান
Kit-bag - সজ্জা-পেটে
Kinsman - জ্ঞাতি

L

Laboratory - পরীক্ষাগার
Labour Court - শ্রম আদালত
Labour pain - প্রসববেদনা
Labour room - প্রসব কক্ষ
Latitude - অক্ষাংশ
Lawyer - আইনজ্ঞ
Leaflet - প্রচারপত্র
Leap-year - অধিবর্ষ
Lease - ইজারা
Leave - ছুটি, অবকাশ
Lagoon - উপহ্রদ
Lake - হ্রদ
Land revenue - ভূমি রাজস্ব
Letter of credit - আকলপত্র
Lexicon - অভিধান
Life insurance - জীবনবিমা
Light house - বাতিঘর
Light year - আলোকবর্ষ
Limitation Act - তামাদি আইন
Livestock - পশুসম্পদ
Longitude - দ্রাঘিমা
Low-water - ভাটা
Legend - কিংবদন্তি
Lender - মহাজন
Liaison officer - সংযোগ অফিসার
Licence - অনুমতি পত্র
Lingua franca - মিশ্র ভাষা
Linguistics - ভাষা বিজ্ঞান
Liquid asset - চলতি সম্পত্তি
Litigation - মামলা
Livery - বৈশিষ্ট্যসূচক পোশাক
Lying-in room - সূতিকাগার, আঁতুরঘর
Liability - দায়, ঋণ, দেনা
Ledger - খতিয়ান

M

Magazine - অস্ত্রাগার; সাময়িক পত্রিকা

Magnifying glass - বিবর্ধক কাচ
Majority - সংখ্যাতরু; পূর্ণবয়স্কতা
Majesty - মহিমা
Make up - বিশ্বাসযোগ্যতাপূর্ণ
Mala fide - ক্ষুণ্নাশয়ী প্রাণী
Mammal - নির্দেশী পরিচালক
Managing Director - আইনগত আদেশ
Mandate - দুর্ঘটনার
Manifesto - মানচিত্র
Map - পাণ্ডুলিপি
Manuscript - কৃপাত্র মাত্র
Marginal cost - সামুদ্র, সামুদ্রিক
Marine - বিপণন
Marketing - মানমন্দির
Market value - মঙ্গলগ্রহ
Mars - বিল, জলা
Marsh - গণশিক্ষা
Mass education - গণমাধ্যম
Mass media - মহাপরিকল্পনা
Master plan - বস্তুবাদ
Materialism - যান্ত্রিক
Mechanical - মধ্যস্থ, সালিস
Mediator - জনশক্তি
Manpower - আবহবিদ্যা
Meteorology - রাজধানী
Metropolis - দালাল
Middleman - ছায়াপথ
Milky way - টাকশাল
Mint - ভ্রাম্যমাণ আদালত
Mobile court - মুদ্রানীতি
Monetary policy - স্মারক
Memo - প্রণালিবিদ্যা
Methodology - সংখ্যালঘু, নাবালকত্ব
Minority - ক্ষেপণাস্ত্র
Missile - রাজতন্ত্র
Monarchy - মৌসুমি বায়ু
Monsoon - পুরাণতত্ত্ব
Mythology - প্রদর্শনশালা, জাদুঘর
Museum - উপান্ত
Margin - বণিক
Merchant - ডাক
Mail - চুম্বক
Magnet - স্মারকলিপি
Memorandum

N

Name-plate - নামফলক
Nomination - মনোনয়ন
Nominee - মনোনীত ব্যক্তি
North star - ধ্রুবতারা
Notary Public - লেখ্য প্রমাণক
Nursery School - শিশুবিদ্যালয়
News Editor - বার্তাসম্পাদক
Nation - জাতি
Nautical mile - নৌ-মাইল
Nebula - নীহারিকা
Nomads - যাযাবর
Nomenclature - নামকরণ
Non-aligned - জোট-নিরপেক্ষ
Non-bailable - অ-জামিনযোগ্য
Non-cooperation - অসহযোগ
Notice - বিজ্ঞপ্তি
Notification - প্রজ্ঞাপন
News Agency - সংবাদ প্রতিষ্ঠান
Nutrition - পুষ্টি
Notify - প্রজ্ঞাপিত করা
Nationalisation - রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

O

Oath - শপথ, হলফনামা
Observatory - মানমন্দির
Occupancy right - দখলি স্বত্ব
Octroi duty - নগর শুল্ক
Opening stock - প্রারম্ভিক মজুদ
Opera House - গীতি নাট্যমঞ্চ
Ordinance - অধ্যাদেশ
Oil painting - তৈলচিত্র
Out-post - ফাঁড়ি
Oyster - ঝিনুক, শুক্তি
Optics - আলোকবিজ্ঞান
Orbit - কক্ষপথ
Ombudsman - ন্যায়পাল
Outfit allowance - সজ্জাভাতা
Ore - আকরিক
Organization - সংগঠন, সংস্থা
Osteology - অস্থিবিজ্ঞান
Overseer - উপদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক
Obligatory - বাধ্যতামূলক
Optional - ঐচ্ছিক
Overtime - অধিকাল

2020/5/11 18:0

Order cheque - ক্রমাগত চেক
Ownership Title - মালিকানা স্বত্ব
Orion - কালপুরুষ
Oral evidence - মৌখিক সাক্ষ্য

P
Pacific Ocean - প্রশান্ত মহাসাগর
Paid up - পরিশোধিত
Painter - চিত্রকর
Paleographer - প্রত্ন-লিপিবিদ্
Palaeontology - প্রত্নজীববিদ্যা
Paper currency - পত্রমুদ্রা
Parasite - পরজীবী
Penal code - দণ্ডবিধি
Pen-friend - পত্রমিতা
Perjury - মিথ্যা সাক্ষ্য
Perpetual - শাশ্বত, অবিরাম
Partnership - অংশীদারি
Part time - খণ্ডকাল
Par value - সমমূল্য
Part timer - খণ্ডকাল কর্মী
Pass certificate - উত্তরণ পত্র
Pasport - ছাড়পত্র, পাসপোর্ট
Pathology - রোগবিদ্যা
Pawn - বন্ধকী দ্রব্য
Pay-bill - বেতন-বিল
Pension - অবসর ভাতা
Permit - অনুমতিপত্র
Pestilence - মহামারী
Philanthropist - লোকহিতৈষী
Phonetics - ধ্বনিবিজ্ঞান
Plebiscite - গণভোট
Police verification - পুলিশী প্রতিপাদন
Posthumous - মরণোত্তর
Power of attorney - মোক্তারনামা
Pre-emption - অগ্রক্রয়াধিকার
Promissory note - প্রত্যর্থপত্র
Provident fund - ভবিষ্য-তহবিল
Proctor - প্ররক্ষক
Petrology - শিলাতত্ত্ব
Petty officer - ক্ষুদে অফিসার
Philatelist - ডাকটিকিট-সংগ্রহকারী
Plaint - আর্জি
Plaintiff - বাদি, ফরিয়াদি
Plan - পরিকল্পনা
Pledge - বন্ধক
Post mortem - ময়না তদন্ত
Power-loom - যান্ত্রিক তাঁত
Preamble - প্রস্তাবনা
Probation - শিক্ষানবিসি
Protocol - চুক্তির খসড়া
Pseudonym - ছদ্মনাম
Prerogative - বিশেষ অধিকার
Public works - পূর্ত

Q
Quack - হাতুড়ে
Quantitative - মাত্রাগত, পরিমাণগত
Quotation - মূল্যজ্ঞাপন
Questionnarie - প্রশ্নমালা
Queue - সারি
Quinquennial - পঞ্চবার্ষিক
Quorum - গণপূর্তি
Quotient - ভাগফল, নির্দেশক সংখ্যা

R
Race Course - ঘোড়দৌড়ের মাঠ
Racialism - জাতিবিদ্বেষ
Ready market - চলতি বাজার
Real wages - বাস্তব মজুরি
Rainbow - রামধনু, রংধনু
Rainfall - বৃষ্টিপাত
Ransom - মুক্তিপণ
Realism - বাস্তববাদ
Rebate - বাট্টা
Recurring - আবর্তক
Registration - নিবন্ধন
Rejoinder - প্রত্যুত্তর, জবাব
Relief - ত্রাণ
Report - প্রতিবেদন
Retirement - অবসর
Roof garden - ছাদ বাগিচা
Rule of law - আইনের শাসন
Referendum - গণভোট
Regulation - প্রবিধান, নিয়ম-কানুন
Relaxation - শিথিলতা
Replica - প্রতিরূপ
Republic - প্রজাতন্ত্র
Revenue - রাজস্ব
Revenue free - লাখেরাজ, রাজস্বমুক্ত
Rural bank - গ্রামীণ ব্যাংক

Undersigned	- নিম্ন স্বাক্ষরকারী
Unpaid	- অপরিশোধিত
Unprecedented	- অভূতপূর্ব
Unfairmeansz	- অসাধু উপায়
Uniform	- উর্দি; একরূপ
Unilateral	- একতরফা
Unofficial	- বেসরকারি
Unparliamentary	- অসংসদীয়
Uptodate	- হালনাগাদ
Urbanization	- নগরায়ণ
Ursa Major	- সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa minor	- শিশুমার
Universal suffrage	- সর্বজনীন ভোটাধিকার
Universal	- বিশ্বজনীন
Urban	- পৌর
Utilization	- সদ্ব্যবহার

V

Vacancy	- খালি, শূন্য
Vacation	- অবকাশ
Vagabond	- ভবঘুরে
Vague	- অস্পষ্ট
Vakalatnama	- ওকালতনামা
Valid	- বৈধ
Vertical	- উল্লম্ব, খাড়া
Vicious circle	- দুষ্টচক্র
Vocational	- বৃত্তীয়
Viva voce	- মৌখিক পরীক্ষা
Vaccination	- টিকা, টিকাদান
Vacuum	- শূন্য
Vegetarian	- নিরামিষাশী
Vendor	- বিক্রেতা
Vendee	- ক্রেতা
Verbal	- মৌখিক
Verdict	- রায়
Versus	- বনাম
Vested interest	- কায়েমি স্বার্থ
Visitor	- দর্শনার্থী, অভ্যাগত
Volunteer	- স্বেচ্ছাসেবী
Vice-chancellor	- উপাচার্য
Voucher	- রসিদ
Vibration	- কম্পন, স্পন্দন

W

Wage	- বেতন, মজুরি
Waiter	- পরিচারক
Walk-out	- সভা বর্জন
War crime	- যুদ্ধাপরাধ
Warrent	- পরোয়ানা
Windmill	- বায়ুচক্র
Withdrawal	- প্রত্যাহার
Wrestler	- কুস্তিগীর
Warship	- রণতরী
Waste land	- পতিত জমি
Water colour	- জল রং
Water fall	- জলপ্রপাত
Watertight	- জলরোধী
Water transport	- নৌপরিবহন
Weight	- ওজন
Welfare	- কল্যাণ
Will	- ইচ্ছাপত্র, উইল
Wireless	- বেতার
Witness	- সাক্ষী
Workshop	- কারখানা, কর্মশালা
Writ	- আজ্ঞালেখ, পরোয়ানা
Wit	- বুদ্ধি, রসিকতা

X

X-Ray	- রঞ্জনরশ্মি
X-mas	- ক্রিস্‌মাস্

Y

Yard	- অঙ্গন, গজকাঠি
Yarn	- সুতা
Yawn	- হাই তোলা
Youth	- তারুণ্য, যৌবন
Year book	- বর্ষপঞ্জি

Z

Zenith	- খমধ্য, সুবিন্দু
Zone	- মেখলা, কোমরবন্ধ
Zigzag	- আঁকাবাঁকা
Zodiac	- রাশিচক্র
Zoo	- চিড়িয়াখানা

বাংলা সাহিত্য

সাধারণ আলোচনা

বাংলা সাহিত্য বাঙালি জাতির প্রাণস্রোতের প্রকাশ। জাতির বিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও সমৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীনকালের নিদর্শনপ্রাপ্তি থেকে আজ অবধি বাংলা সাহিত্য নানাভাবে যে সৃষ্টি-সম্ভব হয়েছে, গবেষকগণ সময়ের প্রবণতা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার কয়েকটি ভাগ করেছেন। একেই সাহিত্যের যুগবিভাগ বলে। সে বিচারে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ এ-রকম : প্রাচীনযুগ ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০; মধ্যযুগ ১২০১ থেকে ১৮০০; আধুনিকযুগ ১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত। এই মত বাংলার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখের যুগ-সম্পর্কিত অভিমত উল্লিখিত যুগবিভাগকে সমর্থন করে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্য ও আধুনিকযুগের এই সময় মেনে নিলেও, তাঁর মতে, প্রাচীনযুগের সময়সীমা : ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। তিনি এই মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু প্রামাণিক তথ্য যথেষ্ট মেলে নি। এর প্রধান সমস্যা হলো, প্রাচীন গ্রন্থ 'চর্যা'র কোনো কবিই এত প্রাচীন ছিলেন না। অবশ্য তিনি তিব্বতি চর্যাপদের সূত্র ধরে শবরপাকে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী কবি বলে মনে করেন। অন্য গবেষকগণ এ মত সমর্থন করেন না। যুগের এই তিনটি ভাগের মধ্যে আবার ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলে। এ-সময় তুর্কিরা বাংলা দখল করে এবং এর ফলে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙালির বিপর্যয় সূচিত হয়। এ যুগেই তালেবান অধিকৃত আফগানিস্তানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৌদ্ধমূর্তি ধ্বংসের যে উন্মত্ততা বা মার্কিন বাহিনী অধিকৃত বাগদাদের প্রাচীন জাদুঘর ধ্বংসের যে সংবাদ পাওয়া যায়, আজ থেকে আটশত বছর আগে এর রূপটি কতটুকু হিংস্র ও ভয়াবহ ছিল, তা শুধু কল্পনাই করা যেতে পারে। তাই ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল বন্ধ্যা সময় বা অন্ধকার যুগ। সৃজনশীল মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে দেশত্যাগেই ছিলেন ব্যস্ত, সাহিত্য রচিত হবে কি? ১৭৬১ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধির কাল বলে মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিকযুগের সূচনালগ্নের এই শত বছরে চলেছে একটি নীরব প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতির প্রধান পুরোহিত ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

যুগবিভাগের এই তথ্যের সঙ্গে অধুনা উচ্চারিত হচ্ছে উত্তরাধুনিকতার কথা। মিশেল ফুঁকো, এডওয়ার্ড সাইড, নঅম চমস্কি প্রমুখের অনুপ্রেরণা পেয়ে বলা হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ১৮০১ থেকে শুরু হয়ে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়েছে এবং এখন উত্তরাধুনিক যুগ চলছে। ১৯৯০-এর পর বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে মর্মগত নৈরাশ্যের শিকার হয়ে অনেকেই উত্তরাধুনিক যুগের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে, বাঙালি এখনো পুরোপুরি আধুনিকই হতে পারে নি।

সাহিত্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাহিত্য' কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উ : 'সহিত' শব্দ থেকে।

প্র : এখানে 'সহিত' শব্দের অর্থ কী?

উ : হিত সহকারে বা মঙ্গলজনক অবস্থা।

প্র : "একের 'সহিত' অন্যের মিলনের মাধ্যমই হল সাহিত্য"—কে বলেছেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : বাঙালির প্রথম উত্তরাধিকার বলতে কী বোঝায়?

উ : ভারতীয় পুরাণ থেকে সাহিত্যবস্তু গ্রহণ।

প্র : বাঙালির দ্বিতীয় উত্তরাধিকার বলতে কী বোঝায়?

উ : লৌকিক ধারায় আস্থাস্থাপন।

20/5/11 13:03

প্র: বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থের নাম কী?

উ: চর্যাপদ

প্র: বাঙালি কখন থেকে আপন বিশিষ্ট স্বভাবধর্মে স্থিতি লাভ করে?

উ: পাল আমল থেকে।

প্র: প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় কার গ্রন্থে প্রথম গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে?

উ: ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।

প্র: বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগের পরিচয় দাও।

উ: বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত তিনটি যুগে বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়; এগুলি হলো-

(১) আদি যুগ: প্রাক-তুর্কি আক্রমণ যুগ ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রি.)।

(২) মধ্যযুগ: তুর্কি আক্রমণ থেকে ইউরোপ প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত (১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রি.)।

(৩) আধুনিক যুগ: ইউরোপ প্রভাবিত যুগ (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমানকাল)।

এই তিন যুগের প্রধান সাহিত্যগুলি হলো-

(১) আদি যুগের সাহিত্য: আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হলো 'চর্যাপদ' নামক সংকলিত কাব্যগ্রন্থ। তবে অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বাঙালি কবিরা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ যেসব ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার উত্তরাধিকার বর্তেছে। জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

(২) মধ্যযুগের সাহিত্য: বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের বিস্তার ছয় শতাব্দী ধরে। চৈতন্যদেবকে (জন্ম ১৪৮৬ খ্রি.) মাঝখানে রেখে এই যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়- প্রাক-চৈতন্য যুগ (১২০৩-১৫০০ খ্রি.) এবং উত্তর-চৈতন্য যুগ (১৫০০-১৭৬০ খ্রি.)। প্রাক-চৈতন্য যুগে রচিত হয়েছে কৃত্তিবাসি 'রামায়ণ', বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি এবং তিনটি আদি 'মনসামঙ্গলকাব্য'। উত্তর-চৈতন্যযুগের বিচিত্র ও প্রচুর সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-জীবন-কাব্য, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বৈষ্ণব পদাবলি; কাশীরাম দাসের মহাভারত; বহুসংখ্যক মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও অন্নদামঙ্গল কাব্য (কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি)। মুসলমান কবি দৌলত কাজী ও আলাওলের কাব্যসম্ভার এবং শাক্ত-পদাবলি উল্লেখযোগ্য। ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০ খ্রি.) থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধিক্ষণ বলা হয়।

(৩) আধুনিক যুগের সাহিত্য: ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। এই কলেজের পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করে আধুনিক যুগে। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, নাটক-প্রহসন, গীতিকাব্য এবং সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের পথ ধরে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে বাংলা সাহিত্য প্রবেশ করে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে। আধুনিক যুগের সাহিত্যকীর্তির বিস্তৃতির কারণে এ যুগের সামগ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় প্রদান প্রায় অসম্ভব। উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্যরচনা এবং আধুনিক রীতির কবিতা ও নাটকের সম্ভারে আজ বাংলা সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডার। মহাকাব্যের ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে হাল আমলের সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, কবিতায় নজরুল, সুভাষ, জীবনানন্দ দাশ থেকে শামসুর রাহমান, জয় গোস্বামী, নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে বিজন ভট্টাচার্য, সেলিম আলদীন প্রমুখ অসংখ্য রচনাকারের নামই উল্লেখ করা যায়। সর্বযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা রবীন্দ্রনাথও তো এই আধুনিক যুগেরই ফসল।

প্র: বাংলা ভাষা বিকাশের আগে বাঙালি কবিদের সাহিত্যচর্চার বিবরণ দাও।

উ: প্রাচীন যুগের (দ্বাদশ শতাব্দী অবধি) বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন হলো চর্যাপদ। মধ্যযুগের আগে অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিকাশের আগেও যে বাঙালিরা সাহিত্যচর্চা করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে বাঙালি-রচিত সে সময়কার সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে। নিচে এ সম্পর্কে বলা হলো-

(১) সংস্কৃত সাহিত্য: খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে সংস্কৃত ভাষা, স্মৃতি-পুরাণ, ন্যায়দর্শন, ব্যাকরণ-অভিধান বিশেষভাবে চর্চা করা হতো। তবে বাংলা দেশে বাঙালির লেখা প্রথম গ্রন্থ হলো জীবনের অভিনন্দের 'রামচরিত', যা রামচন্দ্রের লঙ্কাজ-পরবর্তী কাহিনি অবলম্বনে রচিত (অষ্টম শতাব্দী)। দশম শতাব্দীতে রামপালের পুত্র মদনপালের অনুচর সন্ধ্যাকর নন্দী ঐ একই নামে একটি কাব্য রচনা করেন, যাতে একাধারে রামায়ণের কাহিনি এবং রামপাল ও তাঁর বংশধরদের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের 'মেঘদূত' অনুসরণে লেখা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্য দূতকাব্যগুলির ('পদাঙ্কদূত', 'ভ্রমরদূত' ইত্যাদি) মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত কাব্য-অনুসরণে লেখা গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' কাব্য প্রায় সাতশো আদিরসাত্মক কবিতার সমষ্টি। তবে, প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি জয়দেব তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক নাট্যকাব্য 'গীতগোবিন্দম্'-এর জন্য অমর হয়ে আছেন। এ ছাড়াও বিদ্যাধর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' বা 'কবীন্দ্র-বন-সমুচ্চয়' এবং শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' (১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ) নামক সংস্কৃত সংকলনে বহু সংখ্যক বাঙালি কবির কাব্যচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্য: প্রাচীন যুগের কোনো বাঙালি কবির প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত কোনো গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'গাথাসপ্তসই' এবং 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল'-এই দুই সংকলনের বাঙালি-রচিত বেশ কিছু কবিতায় আমরা সমকালীন বাঙালি-জীবনের পরিচয় পাই। 'ডাকার্ণব', 'দোহাকোষপঞ্জিকা' প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষায় লেখা সংকলন গ্রন্থগুলির বেশিরভাগ লেখকই ছিলেন সহজিয়া-বৌদ্ধ বাঙালি।

প্রাচীন যুগের এই অ-বাংলা সাহিত্যের হাত ধরেই মধ্যযুগে এসে বাংলা সাহিত্য যথার্থভাবে বিকশিত হয়েছিল।

প্রাচীনযুগ

সংশ্লিষ্ট জিজ্ঞাসা

প্র : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শনের নাম কী?

উ : চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।

প্র : চর্যাপদ কিসের সংকলন?

উ : গানের সংকলন।

প্র : চর্যাপদের বিষয়বস্তু কী?

উ : বৌদ্ধ ধর্ম মতে সাধনভজনের তত্ত্ব প্রকাশ।

প্র : ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বলতে কী বোঝায়?

উ : মেরুদণ্ডের বাঁ দিকের একটি নাড়িকে 'ইড়া' বলা হয়। মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাড়িকে 'পিঙ্গলা' এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যস্থিত অপর একটি সূক্ষ্ম নাড়ির নাম 'সুষুম্না'। এই তিনটি নাড়ির মিলনকে 'ত্রিবেণী' বলে। তন্ত্র সাধনায় এসব নাড়ি চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির গুণবিশিষ্ট। তন্ত্র সাধকদের কাছে ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা আর সরস্বতী নামেও পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়।

প্র : চর্যাগুলো কারা রচনা করেন?

উ : বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

প্র : সহজিয়া বলতে কী বোঝায়?

উ : সহজিয়াগণ বৌদ্ধ সহজযান পন্থি। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারায় সহজিয়াদের উৎপত্তি। স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থায় সাধনা করত বলে এদের সহজিয়া বলা হয়। সহজিয়াগণ তান্ত্রিক চিন্তা ধারার দ্বারা প্রভাবিত বলেই ধর্মসাধনায় দেহকে বাদ দেন নি। কায়িক, মানবিক এবং আধ্যাত্মিক কোনো পথকেই অস্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে সমস্ত সত্তা দেহের মধ্যেই অবস্থিত, সেই সত্তাই 'সহজ'। অনেকে এই 'সহজ'-এর সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্ম, প্রাচীন বৌদ্ধদের নির্বাণ ধাতু, অশ্বঘোষের তথতার ঐক্য লক্ষ করেছেন। সরহপাদ বলেছেন, সহজের মধ্যে দ্বৈততা নেই, মনের অ-দ্বৈত অবস্থায় তা অনুভববেদ্য, সহজের অনুভবই সাধকের লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম এই নমুনা অর্থাৎ চর্যাপদগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত। বৌদ্ধদের মতো বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ও ছিল। তাঁরা বাংলায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাউলদের চিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

প্র : চর্যায় কত জন কবির পদ পাওয়া গেছে।

উ : এ নিয়ে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গ' মতে ২৩জন কবির নাম আছে। সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবির কথা বলেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন নেপাল-তিব্বতে প্রাপ্ত তালপাতার পুথিতে আরো কয়েকজন নতুন কবির চর্যাগীতি পেয়ে 'দোহা-কোশ' (১৯৫৭) গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। সে বিচারে এক কথায় বলা চলে, চর্যাপদের কবির সংখ্যা ২৩, মতান্তরে ২৪।

প্র : চর্যাপদে কয়টি পদ বা গান ছিল?

উ : এর সংখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে। সুকুমার সেনের হিসাবে ৫১টি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ৫০টি। চর্যাপদ ছিন্নাবস্থায় পাওয়া যাওয়ায় এই মতান্তরের সৃষ্টি। সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬) গ্রন্থেও ৫০জন কবির পদ উল্লেখ করেছেন। তবে আলোচনা অংশে তাঁর বক্তব্য : "[...] মুনি দত্ত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। টীকাকারের কাছে মূল চর্যার পুথিতে আরো অন্তত একটি বেশি চর্যা ছিল (একাদশ ও দ্বাদশ চর্যার মাঝখানে)। এই চর্যাটির ব্যাখ্যা না থাকায় লিপিকর উদ্ধৃত করেন নাই, শুধু 'টীকা নাই' এই মন্তব্যটুকু করিয়াছেন।" এটা ধরলে পদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১।

প্র : চর্যাপদে কোন কবি কোন কোন পদ লিখেছেন, তা উল্লেখ কর।

উ : আর্যদেবপা > পদ নং-৩১
ভাদেপা > পদ নং-৩৫
ভুসুকুপা > পদ নং- ৬/ ২১/ ২৩/ ২৭/ ৩০/ ৪১/ ৪৩/ ৪৯
চাটিল্লপা > পদ নং-৫
লাবিকপা > পদ নং-৩৪
ধর্মপা > পদ নং-৪৭
ঢেণ্ঢণপা > পদ নং-৩৩
তোষীপা > পদ নং-১৪
গুণ্ডরীপা > পদ নং-৪
জয়নন্দীপা > পদ নং-৪৬
কাহ্নপা (কৃষ্ণপা) > পদ নং- ৭/ ৯/ ১০/ ১১/ ১২/ ১৩/ ১৮/ ১৯/২৪ (পাওয়া যায় নি) / ৩৬/৪০/৪২/৪৫
কম্বলাম্বরপা > পদ নং-৮
কঙ্কণপা > পদ নং-৪৪
কুক্কুরীপা > পদ নং-২/২০/৪৮ (পাওয়া যায় নি)
লুইপা > পদ নং-১/২৯
মহীধরপা > পদ নং-১৬
শবরপা > পদ নং- ২৮/৫০
শান্তিপা > পদ নং- ১৫/২৬
সরহপা > পদ নং- ২২/৩২/৩৮/৩৯
তাড়কপা > পদ নং-৩৭
তন্ত্রীপা > পদ নং-২৫ (পাওয়া যায় নি)
বীণাপা > পদ নং-১৭
বিরূপা > পদ নং-৩
(সূত্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গ' : ১৯৬৬ : পৃ. ১৪৩)

প্র : কবিদের নামের সঙ্গে 'পা' যুক্ত কেন?

উ : তাঁরা পদ (কবিতা) রচনা করতেন বলে তাদের সম্মান করে পাদ বলা হতো; আজ যেমন বলা হয় কবি। পাদ > পা হয়েছে।

প্র : কোন কবি সর্বাপেক্ষা বেশি পদ রচনা করেন?

উ : কাহ্নপা। ১৩টি পদ রচনা করেন। ১২টি পাওয়া গেছে।

প্র : কোন কবি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ লেখেন?

উ : ভুসুকুপা; ৮টি।

প্র : কোন কবি রচিত পদটি পাওয়া যায় নি?

উ : তন্ত্রীপা (না-পাওয়া পদ নং-২৫)।

প্র : চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া যায় নি?

উ : ২৪ (কাহ্নপা রচিত), ২৫ (তন্ত্রীপা রচিত), ৪৮ (কুক্কুরীপা রচিত) সংখ্যক।

প্র : চর্যাপদ গ্রন্থে মোট কয়টি পদ পাওয়া গেছে?

উ : সাড়ে ছেচল্লিশটি (একটি পদের ছেঁড়া বা খণ্ডিত অংশসহ)।

প্র : চর্যায় কোন পদটি [illegible] গেছে?

উ : ২৩ নং পদটি। [illegible] গেছে। বাকি ৪ পদটি [illegible] এর রচয়িতা ভুসুকুপা।

প্র : চর্যার পদগুলো কোন ভাষায় রচিত?

উ : সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত।

প্র : সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা কী?

উ : যে ভাষা সুনির্দিষ্ট [illegible] অর্থও একাধিক অর্থ [illegible] মত, সে ভাষাকে [illegible] ভাষা বলেছেন।

প্র : চর্যাপদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত প্রথম পদটি কত লেখা? তা উল্লেখ কর।

উ : লুইপার।

পদ-১

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ।
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।
এড়িঅউ ছান্দ বান্ধ করণ কপটের আস
সুনু পাখ তিড়ি লাহু রে পাস।
ভণই লুই আমহে কাণে দীঠা
ধমণ চবণ বেণি পিণ্ডি বইঠা।
(মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পাঠ অনুসারে)

আধুনিক বাংলায় রূপান্তর :

কায়া তরুর মত, পাঁচটি তার ডাল,
চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করেছে।
দৃঢ় করে নাও, মহাসুখ পরিণাম
কবি লুই বলছে, গুরুকে জিজ্ঞেস করে জান।
সমস্ত সমাধিতে (সমর্পিত) কি করে,
সুখ দুঃখে নিশ্চিত মরা (অবস্থান)।
এড়িয়ে যাওয়া যায় ছন্দ ও করণের পারিপাট্য,
শূন্য পাখা পাশে চেপে ধর।
লুই বলছে, আমি স্বপনে দেখেছি,
ধমণ, চমণ দুই পিঁড়িতে আমি বসে।
(নোট : ছন্দ = বাসনা; করণ = ইন্দ্রিয়চেতনা।)

প্র : চর্যাপদের আবিষ্কারক কে?

উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই গ্রন্থের আধুনিক যুগ-পর্বে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' অংশে)।

প্র : তিনি কোন উপাধি প্রাপ্ত হন?

উ : মহামহোপাধ্যায়

প্র : কোথা থেকে, কত সালে চর্যা আবিষ্কার করা হয়?

উ : নেপালের রয়েল লাইব্রেরি থেকে, ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কার করা হয়।

প্র : চর্যাপদ কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে জনসমক্ষে আসে?

উ : ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে চর্যাপদ আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদনা করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্র : চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে কে কী বলেন?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পদগুলো রচিত। সুকুমার সেন সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পণ্ডিতই সুনীতিকুমারকে সমর্থন করেন।

প্র : চর্যাপদের নাম নিয়ে প্রস্তাবগুলো কী?

উ : কারো মতে গ্রন্থটির নাম, 'আশ্চর্য চর্যাচয়', সুকুমার সেনের মতে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়, আধুনিক পণ্ডিতদের মতে এর নাম 'চর্যাগীতিকোষ' আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। তবে 'চর্যাপদ' সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নাম।

প্র : চর্যার কবিদের মধ্যে কোন কবি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে মনে করা হয়?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, শবরপা (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ)

প্র : চর্যাপদ নিয়ে গবেষকদের প্রথম দিককার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্পর্কে লেখ।

উ : বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে, ১৯২৭ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যার তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন।

প্র : চর্যাপদ নেপালে পাওয়া যাবার কারণ কী?

উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জীবনীকার সত্যবিদ চৌধুরী লিখেছেন। 'তুর্কি আক্রমণের সময়ে পুথিপত্র নিয়ে বাংলার পণ্ডিত মানুষেরা নেপালে, তিব্বতে চলে গিয়েছিলেন'। এমতটি সর্বাধিক মান্য। তবে তারাপদ মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক সময়ে নেপালে বসবাসরত বাঙালিরা বাংলা লিপিতে পুথি লিখতেন এবং তাই 'নেপালে বাংলা অক্ষরে বাঙালি লিপিকরের লেখা পুথির অস্তিত্ব অভাবিত ব্যাপার নয়।'

প্র : চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপিটি কোথায়?

উ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পাণ্ডুলিপিটি নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে ফেরত দেন যথাসময়ে। ১৯৬৫ সালে নীলরতন সেন ঐ পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। গত শতকের ছয়ের দশকের মাঝামাঝি রাজদরবারের গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে সেটি জাদুঘরে পরিণত হয়। এর বইগুলো নেপালের জাতীয় আর্কাইভসে নেয়া হলেও চর্যাপদের মূল এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আর অক্ষত নেই। হয়তো হারিয়ে গেছে।

প্র : চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?

উ : এর পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভবপর নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীনে বিবেচ্য।

প্র : চর্যাপদে প্রাপ্ত বিচিত্র রকমের মানুষের পরিচয় দাও।

উ : চর্যাপদ বাঙালি সমাজের বিশ্বস্ত দলিল। এখানে কাপালিক (কাপালি), ব্রাহ্মণ (বামহন), যোগী (জোই), ডোম্বী ইত্যাদি নানা বর্ণের মানুষের উল্লেখ আছে। তারা নানা পদে যুক্ত। যেমন : মন্ত্রী (মতিএ), পণ্ডিত আচার্য (পণ্ডিতাচার্য), শিষ্য (সীস) ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন পেশায়, যেমন: মাঝি (কামলি), বেশ্যা (দারী), শিকারী (অহেরী), নেয়ে (নৌবাহী) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তাদের কর্মরত দেখা যায়। পদগুলোর মধ্যে মানুষের আত্মীয়-পরিজনের সম্পর্কও আছে। যেমন : মা, বাবা (বাপ), পুত্র (পূড়া), বধূ (বহুড়ী), শাশুড়ি (সাসু) ইত্যাদি।

প্র : চর্যাপদে নারীদের স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : চর্যাপদের যুগে নারীরা খুবই স্বাধীন ছিল। তারা স্বেচ্ছায় পেশা ও সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার রাখত। কুক্কুরীপা একটি পদে (২নং) লিখেছেন, গৃহবধূটি বেশ ছল জানে। সে দিনের বেলায় কাকের ডাক শুনেই ভয় পায়, কিন্তু রাতে প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে যায়। কাহ্নপা একটি পদে (১০নং) জানিয়েছেন, এক ডোমিনী নগরে তাঁত ও চেঙারি বিক্রি করে। কাহ্নপার অন্য একটি পদে (১৮নং) ডোমিনীর 'ছিনালী' করার কথা আছে। ডোম্বীপাদের ১৪নং পদে নারীদের নৌকা চালনা, নৌকার জলসিঞ্চন, লোক পারাপার ইত্যাদির মতো কর্মে যুক্ত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া নারীরা গুরুর স্থানও অধিকার করেছিল।

প্র : চর্যাপদের পদকর্তাদের সম্পর্কে ধারণা দাও।

উ : চর্যাপদের পদকর্তারা বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। তাঁরা সাধন-ভজনের জন্য যে পদগুলো রচনা করেছিলেন সেগুলোই চর্যাপদ নামে অভিহিত। পদকর্তারা একত্রে বসে এই চর্যাসমূহ রচনা করেন নি, বিভিন্ন সময়ে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। কোনো কোনো পদকর্তার বয়সের পার্থক্যও শত বছর। এই পদকর্তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করতেন, কেউ কেউ বাংলাদেশেও (আজকের) ছিলেন। যেমন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন, ভুসুকুপা বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন।

প্র : চর্যাপদে চিত্রিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিচয় দাও।

উ : চর্যাপদে যে সব মানুষের উল্লেখ আছে তাদের অনেকেই দরিদ্র। এখানে আছে কাপালিক, যোগী, ডোম্বী, মাঝি, শিকারী, নৌকাবাহী ইত্যাদি। এরা সম্পন্ন মানুষ নয়। ঢেণ্ডণপা-র একটি চর্যায় (৩৩নং) আছে: 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী। / হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী ॥' অর্থাৎ লোকশূন্য স্থানে আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী পর্যন্ত নেই। আমার ঘরে খাদ্যও নেই কিন্তু প্রেমিক এস ভিড় করে। এই চর্যা থেকেই বোঝা যায়, মানুষের দারিদ্র্য তখন কতটা তীব্র ছিল।

প্র : 'চর্যাপদ'-এ নিম্নবর্গীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেমন?

উ : 'চর্যাপদ' যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের অনেকেই নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা মানুষ ছিলেন। অতীন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত 'চর্যাপদ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: 'চর্যাপদের সিদ্ধাচার্যদের অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ শ্লোক পর্যায়ের লোক ছিলেন কিংবা বর্ণাশ্রমের মধ্যেই নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন।' তাই তাঁরা যাপিতজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চর্যা রচনা করেন এবং সেখানে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন প্রতিফলিত হয়। এই গ্রন্থে সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে যারা অধমসংকর বা অন্ত্যজ সেই মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষণকার, ঘট্টজীবী বা পাটনি, মালো এবং আরো নীচের পুক্কস, পুরিন্দ, খস, খোর, কম্বোজ, যবন, শবর- এদের জীবনের পরিচয় আছে। এদের জীবনে ছিল চরম অভাব, যন্ত্রণা, বেদনা, নিঃস্বতা, শোষণ। জীবিকা ও কর্ম হিসেবে এখানে শিকার করা, মাছ ধরা, নৌকা বাওয়া, চাঙারি বোনা, দেশজ মদ্য তৈরি, তুলোধোনা, জুয়া খেলা ইত্যাদির উল্লেখ আছে। উচ্চশ্রেণির মানুষদের থেকে দূরে প্রান্তস্থানে সামান্য ঘর বেঁধে তারা বাস করতো। বিয়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের কেউ উচ্চবর্গের কাউকে বিয়ে করতে পারতো না তবে উচ্চবর্গের পুরুষের নিম্নবর্গের নারীকে বিয়েতে কোনো বিঘ্ন ছিল না। আসলে, 'চর্যাপদ' মূলত নিম্নবর্গীয় মানুষের কাব্য আর এখানে প্রাচীনকালের বাংলার সামাজিক রূপটিই প্রকাশিত।

প্র : চর্যাপদের দার্শনিকতা এবং ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : চর্যাপদগুলি মূলত মহাজ্ঞান ধর্মশাখার অন্তর্গত সহজযান ধর্মশাখার সাধনসংগীত। 'মহাসুখ' তাদের চরম লক্ষ্য। ভুসুকুপাদ বলেছেন 'সহজানন্দ মহাসুহ লীলে'র কথা। তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের এই মহাসুখ হলো বস্তুজগতের সংস্পর্শহীন এক সর্বশূন্য অবস্থা। এই মহাসুখের অন্য নাম সহজানন্দ। দেহকে চারটি চক্রে অর্থাৎ নির্বাণকায়, সম্ভোগকায়, ধর্মকায় এবং উষ্ণীষকায়ের ভাগ করে চর্যাপদকের শেষতম ভাগে অর্থাৎ উষ্ণীষে সহজানন্দের

সন্ধান করেছেন। চর্যাপদকার লিখেছেন- "সুনে সুন মিলিআ জবে।/সকলধাম উইআ তবে।" মহাসুখের সঙ্গে যেমন শূন্যের যোগ, তেমনই যোগ বিজ্ঞানবাদেরও। চর্যানীতির শূন্যবাদ হলো অস্তিত্বময় বিজ্ঞানবাদ। এটি সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বসম্পন্ন। চর্যা সাধকেরা সহজসুখের ধারণাকে একটি 'বাক্‌পথাতীত তত্ত্ব' অর্থাৎ ভাষা বা প্রকাশের অতীত তত্ত্ব বলে বর্ণনা করেছেন।

চর্যাপদ বৌদ্ধধর্মের মূলগত ভাবনার অনুসারী হলেও এটা স্পষ্ট যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা দেশের অনার্য সংস্কৃতি এবং কৌম (গোষ্ঠী) জীবনই চর্যার প্রেক্ষাপটে রয়েছে। জীবনযাপনের অসহনীয়তা থেকে মুক্তির বাসনা চর্যাপদগুলিতে আছে। সেখানে যেমন বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে অন্যদিকে, গুরুবাদকে স্বীকার করে নিয়ে তা প্রথাগত বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেকটাই আলাদাও হয়ে গিয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চর্যাসাধকদের লেখায় সে সময়ের জীবনধারার নানা প্রবণতারই যেন মিশ্রণ দেখা যায়। এই দেহতত্ত্বনির্ভর সাধনা পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের অজস্র গুরুত্বপূর্ণ ধারার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্র : ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাসের দিক থেকে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উ : 'চর্যাপদ' হলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত ধর্মীয় সংগীত। সাধনার গূঢ় তত্ত্বকে তাঁরা নানাবিধ রূপক ও সংতের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন এই গানগুলিতে। চর্যাপদ কিন্তু কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে বাঙালির গর্বের বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই বাংলা ভাষার ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্বের দিকটি বিচার-বিবেচনা করে দেখা দরকার।

(১) 'চর্যাপদ' যেহেতু বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন, সেজন্য বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ জানার ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ'-এর ভূমিকা অপরিহার্য।

(২) 'চর্যাপদ' আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। 'চর্যাপদ' না থাকলে বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগ সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা থেকে যেত আর তার ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাসও হতো অসম্পূর্ণ।

(৩) বেশ কিছু বাংলা শব্দের বিবর্তনের ধারাপথটিকে চিনে নেওয়ার জন্য এই গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়।

(৪) বাংলা কবিতার ছন্দের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে 'চর্যাপদ' অপরিহার্য। বাংলা ছন্দের গঠনের ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ'-এর ছন্দের প্রভাবকে স্বীকার করেন ছান্দসিকরা।

(৫) বাংলা কবিতায় যে অন্ত্যমিল দেখা যায়, সেই অন্যমিলেরও উৎসব উদাহরণ হলো 'চর্যাপদ'।

(৬) 'চর্যাপদ'-এ ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ ও রূপকল্প পরবর্তীকালের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে।

(৭) প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসচর্চাতে চর্যাপদ বিকল্পহীন। প্রাচীন বাংলার সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিচয় ছড়িয়ে আছে এই গ্রন্থে।

(৮) হাজার-বারশ বছর আগেকার ধর্মীয় ইতিহাস জানতে গেলেও আমাদের শরণাপন্ন হতে হবে চর্যাপদের।

চর্যাপদের কবিদের পরিচয়

কাহ্নপা

প্র : চর্যাপদের সর্বাধিক পদরচয়িতা কোন কবি?

উ : কাহ্নপা।

প্র : তিনি কয়টি ও কোনপদগুলো রচনা করেন?

উ : ১৩ টি। পদগুলো : ৭, ৯ থেকে ১৩, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫ (২৪নং পদটি কাহ্নপা রচিত, তবে সেটি পাওয়া যায় নি)।

প্র : এই পদসমূহের বৈশিষ্ট্য কী?

উ : এই পদগুলোতে নিপুণ কবিত্বশক্তি প্রকাশের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজচিত্রও উদ্‌ঘাটিত।

প্র : ব্যক্তিগতভাবে কাহ্নপা কী ছিলেন?

উ : কাহ্নপা সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধযোগী। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও সঙ্গীত শাস্ত্র উভয় দিকেই দক্ষ ছিলেন।

প্র : চর্যাপদে যে পদগুলো পাওয়া যায় নি তার কোনটি কাহ্নপার রচনা বলে মনে করা হয়।

উ : ২৪নং পদটি।

প্র : চর্যাপদে কাহ্নপা আর কী কী নাম পাওয়া যায়?

উ : কাহ্নু, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচর্য, কৃষ্ণবজ্রপাদ।

কুক্কুরীপা

প্র : কুক্কুরীপা কি মহিলা কবি ছিলেন?

উ : কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে ড. সুকুমার সেন মনে করেন, কুক্কুরীপার ভাষার সঙ্গে নারীদের ভাষার মিল আছে।

প্র : তিনি কয়টি পদ রচনা করেন ও কী কী?

উ : ২টি। ২ ও ২০ সংখ্যক। মনে করা হয়, খুঁজে না-পাওয়া ৪৮ নং পদটিও তাঁর রচনা। সে হিসেবে ৩টি।

প্র : তিনি কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন?

উ : তিব্বতের কাছাকাছি কোন অঞ্চলের।

প্র : কোন সময় তিনি বর্তমান ছিলেন?

উ : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক।

প্র : তার পদ পর্যালোচনা করলে কী মনে হয়?

উ : চর্যার কুক্কুরীপাকৃত পদসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর ভাব ইতর, ভাষা গ্রাম্য।

প্র : কুক্কুরীপা রচিত অতিপরিচিত দুটি পঙক্তি কি?

উ : দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই। (পদ:২)
(অর্থাৎ, দিনে বউটি কাকের ভয়ে ভীত হয় কিন্তু রাত হলেই সে কামরূপ যায়।)

ধর্মপা

প্র : ধর্মপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে বিক্রমশীলায়।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : কাহ্নপা।

প্র : চর্যার কোন পদ তার রচনা?

উ : ৪৭ সংখ্যক পদ।

প্র : এই পদের বিশেষত্ব কী?

উ : এখানে অগ্নিকাণ্ডের প্রতীকে গভীর যোগতত্ত্বের কথা আছে।

ঢেণ্ডণপা

প্র : ঢেণ্ডণপা কোন সময়ের কবি ছিলেন?

উ : নবম শতকের।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?

উ : তাঁতি।

প্র : চর্যায় তিনি কয়টি পদ রচনা করেন?

উ : একটি (৩৩ সংখ্যক)।

প্র : তার এই পদটি বিখ্যাত কেন?

উ : এই একটিমাত্র পদে বাঙালি জীবনের চিরায়ত দারিদ্র্যের ছবি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন: 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী। / হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।' (পদ : ৩৩)
(অর্থাৎ লোক শূন্য স্থানে প্রতিবেশীহীন আমার বাড়ি। হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রেমিক এসে ভিড় করে।)

বিরুপা

প্র : বিরুপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : মনে করা হয় অষ্টম শতকে ত্রিপুরায়।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : জালন্ধরীপা

প্র : চর্যাপদে অন্তর্ভুক্ত তার পদের সংখ্যা কয়টি?

উ : একটি (৩ সংখ্যক)।

প্র : এই পদে কী বর্ণিত হয়েছে?

উ : শুঁড়িবাড়ির উপযুক্ত চিত্র। বলা হয়েছে, এক শুঁড়িনী দুই ঘরে ঢুকে বাকল দিয়ে মদের পাত্র বাঁধে।

বীণাপা

প্র : বীণাপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?

উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে, গৌড়ে।

প্র : তার গুরু কে ছিলেন?

উ : ভাদেপা।

প্র : সংস্কৃতগ্রন্থ বজ্রডাকিনীনিষ্পন্নক্রম কার রচনা?
উ : বীণপার।
প্র : চর্যাপদের কোন পদটি তার রচনা?
উ : ১৭ সংখ্যক
প্র : এই পদের বিশেষত্ব কী?
উ : এখানে সূর্য-চন্দ্রকে চমৎকার উপমায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ডাদেপা

প্র : ডাদেপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?
উ : খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে শ্রাবস্তী এলাকায়।
প্র : তার গুরু কে?
উ : জালন্ধরীপা, মতান্তরে কাহ্নপা
প্র : চর্যার কোন পদ তিনি রচনা করেন?
উ : ৩২ সংখ্যক পদ।
প্র : এই পদের মূলকথা কী?
উ : ধর্মীয় তত্ত্বকথার বর্ণনা।
প্র : ডাদেপা রচিত পদের প্রথম দুই পঙক্তি কী?
উ : এতকাল হউঁ অছিলোঁ সমাহেঁ। / এবেঁ মই বুঝিল সদ্ গুরু বোহেঁ ॥ (পদ : ৩২)
(অর্থাৎ এতকাল আমি সমোহে ছিলাম, এখন সদ্গুরু বুঝলাম।)

ভুসুকুপা

প্র : ভুসুকুপার সময় ও অবস্থান কোথায়?
উ : মনে করা হয় অষ্টম থেকে এগার শতকে ভুসুকুপা সৌরাষ্ট্রের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র ছিলেন।
প্র : চর্যায় পদ রচনার দিক থেকে তার অবস্থান কোথায়?
উ : দ্বিতীয়।
প্র : তিনি কয়টি পদ রচনা করেন ও কী কী?
উ : আটটি। সংখ্যা : ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯।
প্র : ভুসুকু নামটির অর্থ কী?
উ : ভুসুকু প্রথম দিকে শ্রমণ ছিলেন। মুক্তি (ভু), মুক্তি (সু), কুটিরে (কু) অবস্থান ছাড়া কিছু করতেন না বলে তাকে 'ভুসুকু' বলা হতো।
প্র : তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেছেন পূর্ববঙ্গের।
প্র : কীভাবে মনে করা যায়। তিনি পূর্ববঙ্গের?
উ : তাঁর ৪৯নং পদে পদ্মা (পঁউআ) নদীর নাম আছে। 'বঙ্গাল দেশ' ও 'বঙ্গপুর'-এর কথা আছে।
প্র : তার রচিত পদসমূহের বৈশিষ্ট্য কী?
উ : সেখানে সাঁওতালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।
প্র : ভুসুকুপা রচিত একটি উল্লেখযোগ্য পঙক্তি লেখ।
উ : অপণা মাংসে হরিণা বৈরী। (পদ : ৬)

মহীধরপা

প্র : মহীধরপার কখন ও কোথায় অবস্থান ছিল?
উ : খ্রিষ্টীয় নবম শতকে মগধ অঞ্চলে।
প্র : তিনি চর্যাপদের কোন পদটি রচনা করেন?
উ : ১৬ সংখ্যক পদ।
প্র : এই পদের বক্তব্য কী?
উ : পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

লুইপা

প্র : লুইপা কে ছিলেন?
উ : প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের কবি।
প্র : তিনি কোন সময় কোথায় অবস্থান করতেন?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অনুমান : ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লুইপা জীবিত ছিলেন।
প্র : লুইপা কোন অঞ্চলের কবি ছিলেন?
উ : তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথের মতে, লুইপা পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ধারে বাস করতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, লুইপা রাঢ় অঞ্চলের লোক।
প্র : চর্যাপদের প্রথম পদটি কার রচনা?
উ : লুইপার

প্র : এই পদের দুটি চরণ লিখ।
উ : এহো তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাঅঃ (পদ : ১)
(অর্থাৎ দেহ গাছের মতো, এর পাঁচটি ডাল। চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।)
প্র : চর্যায় তিনি মোট কতটি পদ লিখেছেন?
উ : দুটি (১ ও ২৯ সংখ্যক)
প্র : লুইপা রচিত কয়টি সংস্কৃতগ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, কী কী?
উ : ৫টি। অভিসময়া বিভঙ্গ, বজ্রস্বভাব সাধন, বুদ্ধোদয়া, ভগবদাভিসময়, তত্ত্ব স্বভাব।

শবরপা

প্র : শবরপা কোন সময়ের কবি?
উ : তার জীবনকাল ৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সেই সূত্রে শবরপা চর্যার কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে)
প্র : শবরপা কোন দেশের লোক ছিলেন?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মতে তিনি 'বাংলা দেশে'র লোক।
প্র : শবরপা কোন কবির গুরু ছিলেন?
উ : লুইপার।
প্র : তিনি কার শিষ্য ছিলেন?
উ : নাগার্জুনের।
প্র : সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি কয়টি গ্রন্থ লিখেছেন?
উ : ১৬টি
প্র : চর্যাপদের কোন পদগুলো তার রচনা?
উ : ২৮ ও ৫০ সংখ্যক
প্র : এই পদগুলোতে তিনি কী বলেছেন?
উ : এখানে কবি শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও প্রভাস্বর শূন্য– এই চার শূন্যের মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ মহাশূন্যকে উদ্যানবটিকা বলেছেন।
প্র : শবরপা রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য পঙক্তি লেখ।
উ : উআ উআ পাবত তহি সবই সবরী বালী। মোরঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥ (পদ : ২৮)
(অর্থাৎ উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার পরিধানে ময়ূরের পুচ্ছ, গলায় গুঞ্জার মালা।)
প্র : শবীদুল্লাহ্ শবরপাকে কার গুরু বলে উল্লেখ করেছেন?
উ : লুইপার।

শান্তিপা

প্র : শান্তিপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়?
উ : এগার শতকের।
প্র : তিনি কোথায় বাস করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে?
উ : বিহারের বিক্রমশীলায়।
প্র : তার নামে চর্যাপদের কয়টি পদ পাওয়া গেছে?
উ : ২টি (১৫ ও ২৬নং)।
প্র : বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে তিনি কোথায় যান?
উ : সিংহলে।

সরহপা

প্র : সরহপা কোন সময়ের কবি বলে মনে করা হয়?
উ : দশ থেকে এগার শতকের কবি।
প্র : তার নামে চর্যাপদে কোন কোন পদ পাওয়া গেছে?
উ : ২২,৩২,৩৮,৩৯, সংখ্যক; মোট ৪টি
প্র : তার পদের মূল বিষয় কী?
উ : শবর-শবরীর প্রেমকাহিনি এবং কতিপয় সহজতত্ত্ব কথা।

ডোম্বীপা

প্র : ডোম্বীপা কে ছিলেন?
উ : তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে মনে করা হয়।
প্র : ডোম্বীপার জীবৎকাল উল্লেখ কর।
উ : তিনি দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ৭৯০ থেকে ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর জীবনকাল ছিল।
প্র : ডোম্বীপার গুরু কে ছিলেন?
উ : বিরুপা।
প্র : ডোম্বীপা কোন পদ লিখেছেন?
উ : ১৪ সংখ্যক।

প্র : তাঁর রচিত পদে কোন ক্রিয়া ফুটে ওঠে?
উ : গঙ্গা ও যমুনা নদীতে নৌকা বেয়ে যাওয়ার ক্রিয়া। বাড়ি যাওয়াই এখানে নদী পার হওয়া যায়।

কমলাম্বরপা

প্র : কমলাম্বরপা কার গুরু ছিলেন?
উ : মেখলাবজ্রীপাদ।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি?
উ : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রারম্ভের।
প্র : কবিদের দিক থেকে কোন কোন কবির কাছাকাছি?
উ : তাড়পার পূর্ববর্তী, কুক্কুরীপার সমকালীন।
প্র : কবি প্রকৃতপক্ষে কী ছিলেন?
উ : তিনি তন্ত্রর মানস স্থানের রাজপুত্র ছিলেন, মতান্তরে তার জন্মস্থান ছিল উড়িষ্যা।

ওড়ীপা

প্র : ওড়ীপা আর কোন নামে পরিচিত?
উ : ওড়ীশা।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি?
উ : রাজা দেবপালের রাজত্বকালে (৮০১-৮৪১) তিনি বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা হয়।
প্র : ওড়ীপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদের রচয়িতা?
উ : চার সংখ্যক।
প্র : ওড়ীপা কি কবির সত্যিকারের নাম?
উ : এ কবির প্রকৃত নাম জানা যায় না। অনেকে মনে করেন ওড়ীপা তার বৃত্তি বা জাতিবাচক নাম (যেমন: এ যুগের কর্মকার বা সরকার)।
প্র : তিনি কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?
উ : তিনি বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ তাকে বিহারের লোক বলেও অভিহিত করেন।

চাটিল্লপা

প্র : চাটিল্লপা চর্যাপদের কত সংখ্যক পদ লেখেন?
উ : পাঁচ সংখ্যক। অবশ্য অনেকে মনে করেন, পদটি তার কোনো শিষ্যের রচনা। শহীদুল্লাহ্‌ও এ কবি সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দিতে পারেন নি।

প্র : তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : তিনি ৮৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন বলে মনে করা হয়।
প্র : তিনি কোথাকার মানুষ ছিলেন?
উ : দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
প্র : তাঁর পদে কী প্রাধান্য পেয়েছে?
উ : নদীমাতৃক অঞ্চলের উপাদান। যেমন, নদী, সাঁকো, কাদা, জলের ঢেউ, নৌ, খনন করা ইত্যাদি। এ সবের অনুষঙ্গে চাটিল্লপা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন।

আর্যদেবপা

প্র : আর্যদেবপাকে অন্য কোন নামে অভিহিত করা হয়?
উ : আরুদেব। কারণ অণিতায় তা ইঙ্গিত আছে।
প্র : আর্যদেবপা কোন সময়ের কবি?
উ : শহীদুল্লাহ্‌র মতে তিনি কম্বলাম্বরপার সমকালীন অর্থাৎ খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম দিকের কবি।
প্র : তিনি কি রাজা ছিলেন?
উ : তারনাথের মতে তিনি (আর্যদেবপা) মেবারের রাজা ছিলেন।
প্র : কে তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন?
উ : গোরক্ষনাথ।
প্র : আর্যদেবপার ভাষা কি বাংলা ছিল?
উ : শহীদুল্লাহ্‌ উল্লেখ করেছেন : 'তাঁহার ভাষা অনেকটা বাঙ্গালা বটে; কিন্তু উড়িয়া বলাই সঙ্গত।'

দারিকপা

প্র : দারিকপার পূর্বপরিচয় কী?
উ : দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে তিনি সালিপুত্র নামক স্থানের (কামরূপের কাছে) রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইন্দ্রপাল। অনেকের মতে, তিনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন।
প্র : লুইপার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : শহীদুল্লাহ্‌ বলেছেন : দারিকপা লুইপার সাক্ষাৎ শিষ্য নন, শিষ্য পরম্পরায় একজন।

প্র : কাহ্নিকপার পদ যে বাংলা ভাষায় রচিত তার প্রমাণ কী?
উ : তাঁর ভাষা প্রাচীন বাংলা। এ ভাষাতে বর্তমান 'এর', সম্বন্ধে 'এরা', সপ্তমীতে 'ত', অসমাপিকা ক্রিয়ায় 'ইআ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।
প্র : কাহ্নিকপার অন্যান্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : প্রজ্ঞাবৃত্তি, সপ্তম সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

তাড়কপা

প্র : তাড়কপা কে ছিলেন?
উ : তাড়কপা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। এমন কি তিব্বতী ভাষায় ৮৪ মহাসিদ্ধের তালিকাতেও তার নাম নেই।
প্র : এই কবিকে 'নাড়কপা' নামে কে অভিহিত করেছেন?
উ : রাহুল সাংকৃত্যায়ন। শহীদুল্লাহ্‌ একে 'ভুল' বলে অভিহিত করেছেন।
প্র : তাড়কপা চর্যাপদের কোন পদ লিখেছেন?
উ : ৩৭ সংখ্যক।

কঙ্কণপা

প্র : কঙ্কণপা কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : গবেষকদের মতে তিনি ৯৮০ থেকে ১১২০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন।
প্র : বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে তিনি কী ছিলেন?
উ : বিষ্ণুনগর (মতান্তরে নিগ্রহপুরের) রাজা ছিলেন।
প্র : কম্বলাম্বরপার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : কঙ্কণপা তাঁর শিষ্য ছিলেন।

প্র : কঙ্কণপার লেখায় বাংলার সঙ্গে কিসের মিশ্রণ আছে?
উ : বাংলার সঙ্গে প্রাকৃতের কিছু অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়।

জয়নন্দীপা

প্র : জয়নন্দীপার অন্য নাম কী?
উ : অনেকে মনে করে তাঁর নাম জয়নন্দ।
প্র : তিনি কে ছিলেন?
উ : জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কোনো রাজার মন্ত্রী ছিলেন।
প্র : তিনি কোন পদ রচনা করেন?
উ : ৪১ সংখ্যক পদ।
প্র : তাঁর ভাষা কেমন?
উ : তাঁর ভাষা গৌড় অপভ্রংশের পরবর্তী আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ।
প্র : তাঁর ভাষার সঙ্গে আর কোন কোন ভাষার নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যায়?
উ : মৈথিলী, উড়িয়া, অসমিয়া ভাষা।

তন্ত্রীপা

তন্ত্রীপা নিয়ে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (১৯৬৩) তন্ত্রীপা সম্পর্কে এক বাক্যে লিখেছেন : 'তন্ত্রীপাদের পদটি বৌদ্ধগানের খণ্ডিত অংশে থাকায় আমরা তাহা পাই নাই।' তিনি 'Buddist Mystic Songs' গ্রন্থে লিখেছেন এইটুকু : 'Tantripa is the author of the song no. 25. He was a disciple of Jalandharipa and afterwards of Kanhapa. In the ms. he is missing.'

অন্ধকারযুগ ও অন্যান্য

প্র : অন্ধকার যুগ কোন সময়কে বলে, কেন?

উ : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ হিসেবে পরিচিত। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের লিখিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তুর্কি আক্রমণে বঙ্গীয় সমাজ ও জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে মানুষ সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় রচিত যে সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে (যেমন : শূন্যপুরাণ, সেক শুভোদয়া। অবশ্য এগুলোর রচনাকাল নিয়ে মত-পার্থক্য আছে।) সেগুলো মূলত সংস্কৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ বিভাগ হয়েছে প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে। চর্যার কবিদের অস্তিত্ব দ্বাদশ শতাব্দীর (১২০০) পূর্ব পর্যন্ত ছিল বলে মনে করা হয়। তাই দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রাচীন যুগ। অন্যদিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' বা 'ইউসুফ জোলেখা'র ভাষা বৈশিষ্ট্যের বিচারেই সেগুলো ১৩৫০ সালের পরের রচনা বলে প্রমাণিত। এগুলো মধ্যযুগের নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যবর্তী ১২০১–১৩৫০ সাল, এই দেড়শ বছর শাসকদের তাণ্ডবে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত, শান্তি তিরোহিত। সমাজ ও অর্থনীতিতেও এর কুপ্রভাব পড়ে। জ্ঞানী লোকেরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদেশে মগ দস্যু আর তুর্কি বহিরাগতদের আগমন ও কৃতকর্মের উপর দুটি বাগধারার জন্ম হয়েছে : 'মগের মুল্লুক' এবং 'তুর্কি নাচন' (এই বাগধারাটি কম ব্যবহারের কারণ কী?)। 'মগের মুল্লুক' অর্থ অরাজক দেশ, আর 'তুর্কি নাচন' অর্থ নাজেহাল অবস্থা। সারা বিশ্বের যে দেশগুলো তুর্কিদের অধিকারে গেছে, সেখানেই প্রাথমিকভাবে নাজেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এদেশও তার বাইরে ছিল না। পাঠান-মোগল যুগে বাংলার এ অবস্থা উন্নতি হতে সময় লাগে। ওয়াকিল আহমদ বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত 'অন্ধকার যু.. এর ধারণার পক্ষে মত। অবশ্য, তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন : 'প্রথমে সেন ও পরে পাঠান আমলে রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়। সহজিয়া সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে তাঁদের ধর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনা রুদ্ধ হয়। সেই সাথে বাংলা সাহিত্যচর্চার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা ঐ যুগে সহজিয়ারাই বাংলা ভাষার একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন।' ('বাংলা সাহিত্যের পুনর্বৃত্ত : ২০০২ : পৃ. ৫৪) আমাদের বক্তব্য, এ রুদ্ধতার কারণেই অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। চর্যাপদের রচয়িতা সহজিয়ারা ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি পদ রচনা করেছেন, তা সেন শাসনকালের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাচীনযুগ বলে স্বীকৃত। অন্ধকার যুগের আলোচনায় এ সময় অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশ নেই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারা' সম্পর্কে আলোচনা অন্তে এক বাক্যে একটি প্যারা লিখেছেন। বাক্যটি এই : 'মুসলমান কর্তৃক বাংলা আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ধারা এইরূপ ছিল।' ('বাংলা সাহিত্যের কথা' : ১৩৭৩ : পৃ. ১৬) অর্থাৎ এরপর চর্যাপদের স্বাভাবিক ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মুসলমান আক্রমণ বলতে তুর্কি আক্রমণ বুঝিয়েছেন। তিনি তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : '১২০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিতে প্রায় ১০০ বৎসর লাগে। শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে আরও প্রায় ৫০ বৎসর কাটিয়া যায়। এই ১২০০ হইতে ১৩৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক শূন্য যুগ।' ('বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' : ১৯৬৮: পৃ. ৪৫)।

একমত শহীদুল্লাহ্ একই সভ্যতা প্রদান করেছেন। 'বাংলাদেশী বাংলার আদর্শ অভিধান : ভূমিকা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সেন রাজাদের সময় হইতে বাংলা ভাষা অনাদৃত হইয়া থাকে। তুর্কমান রাজত্বের প্রথমে প্রায় দেড়শত বৎসর কাল দেশ গুম্ফনিমগ্নের জন্য প্রস্তুতিময় থাকায় কোনও সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই।' (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত 'বাংলা ভাষা' ২য় খণ্ড: ২০০১: পৃ. ২৮২) সুকুমার সেনও একথা বলেছেন : 'মুসলমান অভিযানের পরে বাঙালা দেশে চর্যাগীতির ধারা অব্যাহত থাকে নাই।' ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড : ১৯৬৩ । পৃ. ৭৪)। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন। '১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় না বলে এ-সময়টাকে বলা হয় অন্ধকার যুগ। পণ্ডিতেরা এ-সময়টাকে নিয়ে অনেক ভেবেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু অন্ধকার সরিয়ে ফেলতে পারেন নি। এ-সময়টির দিকে তাকালে তাই চোখে কোনো আলো আসে না, কেবল আঁধার ঢাকা চারদিক।' ('লাল নীল দীপাবলি' : ২০০১: পৃ. ২৫)

এ সময় বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। মধ্যযুগে যে সাহিত্যধারাগুলো পাওয়া যায় এর প্রধান ধারাটি প্রাচীন যুগের সাহিত্য নিদর্শন চর্যাপদের ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বহির্বাংলার ব্রজবুলি ভাষা ও রাধা-কৃষ্ণকথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে প্রাচীন যুগের পরে এক বিরাট অন্ধকার বা শূন্যতার যুগ ছিল বলেই। অনেক আলোচক সমন্বয়ের পথে এসে এই সময়কে যুগসন্ধির কাল বলেছেন। যদি যুগসন্ধির কালই হবে, তাহলে মধ্যযুগে চর্যাপদের ধারা বা এর প্রভাব থাকবার কথা। কিন্তু সেটা নেই কেন? নিশ্চয়ই ছিন্ন হয়েছিল। ওয়াকিল আহমদের উদ্ধৃতি দিয়েই এর আগে সূত্র ছিন্ন হবার কারণ দেখান হয়েছে। এ সময় বহির্বাংলার ব্রজবুলি ও রাধা-কৃষ্ণকথার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে কেন পড়েছিল? নিশ্চয়ই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল বলে। আসলে শূন্যতার পথ ধরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এগুলো এসেছে। তাই ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ অভিমতের পক্ষে কারণসমূহ যুক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা।
২. এ সময়ের মধ্যে বাংলায় রচিত কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন না পাওয়া। (নিদর্শন অনুসারেই যুগবিভাগ করা হয়েছে।)
৩. মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রাচীনযুগের সাহিত্যের প্রভাব বা যোগাযোগ না পাওয়া।
৪. বহির্বাংলার ব্রজবুলি ভাষা এবং রাধা-কৃষ্ণকথার ব্যাপক প্রভাব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরিদৃষ্ট হওয়া।

প্র : অন্ধকার যুগে বাংলার কোন শাসকের রাজত্বকালে কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল?

উ : ১৩৪২ সালে ইলিয়াস শাহ্ বাংলার সিংহাসনে বসলে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনার সূচনা ঘটে। এই রাজবংশ প্রথম পর্যায়ে ৭১ বছর রাজত্ব করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সচেষ্ট হন।

প্র : ১২০১ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত কালের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উ : 'তুর্কি-বিজয়ের পরে বাংলার প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির বড় রকমের পরিবর্তন ঘটল। রাজনৈতিক অবাবস্থা চলতে লাগল। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শক্তির নেতৃত্ব চলে গেল। এই বিমূঢ় অবস্থার কোন সাহিত্য মেলেনি। তুর্কি অধিকার এবং মুসলমান ধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় দেশের ভাবনায় পরিবর্তন ঘটতে লাগল। উচ্চমার্গের সংস্কৃতির সঙ্গে লৌকিক স্তরের সমন্বয় ঘটতে শুরু হল অনেক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে। নতুন নতুন দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা ঘটল। অন্যদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের আদর্শ সমাজ রক্ষার প্রয়োজনে রামায়ণাদির অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে পরবর্তী সাহিত্যের ভিত্তি তৈরি হল এই অন্ধকার পর্বেই।'

– ক্ষেত্র গুপ্ত

গ্রন্থের নাম 'শূন্যপুরাণ'। [illegible] রচিত পির মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক কাব্য 'সেক শুভোদয়া'। এর কোনটি বাংলা ভাষায় রচিত নয়। গবেষকদের মতে, এর রচনা কাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে।

প্র : 'শূন্যপুরাণ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শূন্যপুরাণ' বিশেষভাবে ধর্মপূজাপদ্ধতি। গ্রন্থটি ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির লেখক কে তার সুনির্দিষ্ট হদিস পাওয়া যায় নি। তবে যতটুকু ভণিতা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় গ্রন্থটি রামাই পণ্ডিতের। গ্রন্থটির প্রথম ৫টি অধ্যায় সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। এই সকল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাকি সব কয়টি অধ্যায়ই বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের ধর্মপূজার পদ্ধতি বিশ্লেষণে পূর্ণ। গ্রন্থটি নামবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। 'বিশ্বকোষ' প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু তিনটি পুথির পাঠ সংগ্রহ করে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে 'শূন্যপুরাণ' নামকরণ করে প্রকাশ করেন। এই কাব্যে 'শূন্যময় দেবতা' ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতির বর্ণনা আছে। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, 'শূন্যপুরাণ' এর রচনাকাল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সুকুমার সেন মনে করেন যে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় গ্রন্থটি রচিত।

প্র : চম্পূকাব্য কাকে বলে?

উ : গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে চম্পূকাব্য বলে। 'শূন্যপুরাণ' চম্পূকাব্যের নিদর্শন।

[illegible] বাংলা ছড়া ও [illegible] ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে প্রচুর সংস্কৃত ব্যবহারও আছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে 'dog sanskrit' বলেছেন। ১৩২০-২১ বঙ্গাব্দে মণীন্দ্রমোহন বসু 'কায়স্থ' পত্রিকায় গ্রন্থটির ১৩টি পরিচ্ছেদ বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। পরে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে সুকুমার সেন সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রথম মুদ্রিত হয়। অন্যান্য একে হলায়ুধ মিশ্রের রচনা বলে মনে করেন।

নিরঞ্জনের উষ্মা

প্র : নিরঞ্জনের উষ্মার পরিচয় দাও।

উ : 'শূন্যপুরাণ' নামক কাব্যগ্রন্থের সংকলিত পণ্ডিতগণ শূন্যপুরাণের রচনাকাল [illegible] একমত নন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন, [illegible] যোগেশ চন্দ্র রায়, ড. সুকুমার সেন [illegible] ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর [illegible] কোনো এক সময় শূন্যপুরাণ রচিত [illegible] বলে মনে করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নিরঞ্জনের উষ্মা' সম্পর্কে ডঃ সেনের অভিমত, এই অংশটুকু 'তুর্কী আক্রমণ পরবর্তী কালের রচনা।' 'নিরঞ্জনের উষ্মা' অংশের মূল প্রতিপাদ্য হলো : বর্ণ-হিন্দু ধর্মসেবকদের প্রতি নানা অত্যাচার ও অবজ্ঞা করেছেন। এই অনাচারে ক্ষুব্ধ হয়ে নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর 'যবন' মুসলমান রূপ ধারণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং অত্যাচার-অবজ্ঞার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সহদেব চক্রবর্তীর 'নিরপুরাণ' (১৭৩৫) এই কাহিনি অন্তর্ভুক্ত করে

প্র : মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্বীকৃত। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিলা গ্রামে মল্লরাজতরু বৈষ্ণবমহন্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত শ্রী সেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পুথির প্রথম দুটি এবং শেষপৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কবির ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বড়ু চণ্ডীদাস' পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা হয়। কবি বাশুলি ভক্ত ছিলেন। আবিষ্কর্তা ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকদের ইঙ্গিত অনুসরণ করে গ্রন্থের নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। অবশ্য পুথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুটে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা থাকায় অনেকে গ্রন্থটিকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামকরণের পক্ষপাতী। বড়ু চণ্ডীদাস চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে জন্ম নিয়েছেন বলে ঐতিহাসিকদের মত। তবে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে মতপার্থক্য বিস্তর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমুখের মতে এই কাব্যের ভাষা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এই পুথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।' গোপাল হালদারের মতে, 'এসব পদ রচিত হয়ে থাকবে খৃঃ ১৪৫০ থেকে খৃঃ ১৫০০-এর মধ্যে।' সুকুমার সেনের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে হইতে পারে না, সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর।' পণ্ডিতগণ এসব অভিমত ব্যক্ত করেন প্রধান পুথির লিপিকে অবলম্বন করে। প্রাপ্ত পুথিটি অনুলিপিকৃত বিধায় মূলগ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে প্রাচীনত্বে সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড রয়েছে। এগুলো হলো জন্মখণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনির মধ্যে বাঙালির লৌকিক জীবনের যে প্রতিবিম্ব ধরা পরে, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষগুণ।

প্র : এ গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে লেখ।

উ : গ্রন্থের প্রথম দিকের পৃষ্ঠা ছিন্ন থাকাতে এর নাম পাওয়া যায় নি। তবে সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ব্রজসুন্দর সান্যাল রচিত 'চণ্ডীদাস চরিত', ত্রৈলোক্য আচার্যের 'বিদ্যাপতি' ইত্যাদি গ্রন্থ অবলম্বনে এর নাম দেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। একে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ও বলা হয়।

প্র : গ্রন্থটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের লিপিকাল সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রাচীনত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহ হলেও এর লিপিকাল নিয়ে মতান্তর আছে। সুকুমার সেন লিখেছেন : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [প্রাপ্ত] পুথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।' প্রত্নলিপিবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'নানা প্রত্নলিপির সঙ্গে পুথির লিপির মিল দেখে মনে হয় এ পুথি চতুর্দশ শতাব্দীর লেখা।' মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন : 'গ্রন্থটির লিপিকাল আনুমানিক ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ, বড়ু চণ্ডীদাস ইহার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ ধারে কিছুতেই হতে পারে না।'

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনি কতটুকু বর্ণিত?

উ : কৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ করে প্রেমে নিমজ্জিত ও কৃষ্ণ-কাতর রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরায় গমন পর্যন্ত।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কয় খণ্ডের?

উ : ১৩ খণ্ডের। খণ্ডগুলো : জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড, বিরহ খণ্ড।

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রতিটি খণ্ডের কাহিনি সংক্ষেপে লেখ।

উ : জন্ম খণ্ড। এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, কৃষ্ণ ও রাধা উভয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মর্ত্যে মানবরূপে জন্ম নিয়েছে। কৃষ্ণ পাপী কংস রাজাকে বধ করার জন্য দেবকী ও বাসুদেবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। কিন্তু জন্মমাত্র বাসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে অনেক দূরে বৃন্দাবনে জনৈক নন্দ গোপের ঘরে রেখে আসে। সেখানেই দৈব ইচ্ছায় আরেক গোপ সাগর গোয়ালার স্ত্রী পদ্মার গর্ভে জন্ম নেয় রাধা। দৈব নির্দেশেই বালিকা বয়সে নপুংসক (ক্লীব) অভিমন্যু বা আইহন বা আয়ান গোপের (ঘোষের) সঙ্গে রাধার বিয়ে হয়। আয়ান গোচারণ করতে গেলে বৃদ্ধা পিসি বড়ায়িকে রাধার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

তাম্বুল খণ্ড : তাম্বুল অর্থ পান। রাধা ঘর থেকে বের হয়ে অন্য গোপীদের সঙ্গে মথুরাতে দই-দুধ বিক্রি করতে যায়। বড়ায়িও যায় তার সঙ্গে। বৃদ্ধা বড়ায়ি পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলে এবং কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে (রাধার রূপের বর্ণনা দিয়ে), এমন রূপসীকে দেখেছে কিনা। এই রূপের বর্ণনা শুনে রাধার প্রতি কৃষ্ণ পূর্বরাগ অনুভব করে। সে বড়ায়িকে বুঝিয়ে রাধার জন্য পান ও ফুলের উপহারসহ প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু বিবাহিতা রাধা সেই উপহার পদদলিত করে।

দান খণ্ড : এই খণ্ডে দই-দুধ বিক্রির জন্য মথুরাগামী রাধা ও গোপীদের পথ রোধ করে কৃষ্ণ। তার দাবি নদীর ঘাটে পারাপার-দান বা শুল্ক দিতে হবে, তা না হলে রাধার সঙ্গে মিলিত হতে দিতে হবে। রাধা কোনোভাবেই এ প্রস্তাবে রাজি নয়। এদিকে তার হাতে কড়িও নেই। সে নিজের রূপ কমাবার জন্য চুল কেটে ফেলতে চাইল; কৃষ্ণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বনে দৌড় দিল। কৃষ্ণ পিছু ছাড়বার পাত্র নয়। অবশেষে কৃষ্ণের ইচ্ছায় কর্ম হয়।

নৌকা খণ্ড : এরপর থেকে রাধা কৃষ্ণকে এড়িয়ে চলে। কৃষ্ণ নদীর মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করে। একজন পার করা যায় এমন একটি নৌকাতে রাধাকে তুলে সে মাঝ নদীতে নিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেয় এবং রাধার সঙ্গ লাভ করে। নদীতীরে উঠে লোকলজ্জার ভয়ে রাধা সখীদের বলে যে, নৌকা ডুবে গিয়েছে, কৃষ্ণ না থাকলে সে নিজেও মরত, কৃষ্ণ তার জীবন বাঁচিয়েছে।

ভার খণ্ড : শরৎকাল। শুকনো পথঘাটে হেঁটেই মথুরাতে গিয়ে দুধ-দই বিক্রি করা যায়। কিন্তু রাধা আর বাড়ির বাইরে আসে না। শাশুড়ি বা স্বামীকেও সে আগের ঘটনাগুলো ভয়ে ও লজ্জায় খুলে বলে নি। রাধা অদর্শনে কৃষ্ণ কাতর। সে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার শাশুড়িকে বোঝায়, ঘরে বসে থেকে কি হবে, রাধা দুধ-দই বেচে কটি পয়সা তো আনতে পারে। শাশুড়ির নির্দেশে রাধা বাইরে বের হয়। কিন্তু প্রচণ্ড রোদে কোমল শরীরে দুধ-দই বহন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সময় কৃষ্ণ ছদ্মবেশে মজুরি করতে আসে। পরে ভার বহন অর্থাৎ মজুরির বদলে রাধার আলিঙ্গন কামনা করে। রাধা এই চতুরতা বুঝতে পারে। সেও কাজ আদায়ের লক্ষ্যে মিথ্যে আশ্বাস দেয়। কৃষ্ণ আশায় আশায় রাধার পিছু পিছু ভার নিয়ে মথুরা পর্যন্ত চলে।

ছত্র খণ্ড : দুধ-দই বেচে মথুরা থেকে এবার ফেরার পালা। কৃষ্ণ তার প্রাপ্য আলিঙ্গন চাইছে। রাধা চালাকি করে বলে, 'এখনো প্রচণ্ড রোদ। তুমি আমাদের মাথায় ছাতা ধরে বৃন্দাবন পর্যন্ত চলো। পরে দেখা যাবে।' কৃষ্ণ ছাতা ধরতে লজ্জা ও অপমান বোধ করছিল। তবু আশা নিয়ে কৃষ্ণ ছাতা ধরেই চলল। কিন্তু তার আশাপূর্ণ করে নি রাধা।

বৃন্দাবন খণ্ড : রাধার বিরুদ্ধ মনোভাব কৃষ্ণকে ভাবান্তর ঘটায়। সে অন্য পথ অবলম্বন করে। নিজে কটু বাক্য বলে না, দান বা শুল্ক আদায়ের নামে বিড়ম্বনা করে না, বরং বৃন্দাবনকে অপূর্ব শোভায় সাজিয়ে তুলল। রাধা ও গোপীরা সেই শোভা দর্শন করে কৃষ্ণের উপর রাগ ভুলে যায়। তারা পরিবর্তিত কৃষ্ণ দেখতে আগ্রহ দেখায়। কৃষ্ণ সব গোপীকে দেখা দেয়। [illegible]

কালিয়দমন খণ্ড : যমুনা নদী বৃন্দাবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। সেখানে কালিয়নাগ বাস করে। তার বিষে সেই জল বিষাক্ত। কৃষ্ণ কালিয়নাগকে তাড়াতে নদীর জলে ঝাঁপ দেন। দৈব ইচ্ছায় ও কৃষ্ণের বীরত্বে কালিয়নাগ পরাস্ত হয় এবং দক্ষিণ সাগরে বসবাস করতে যায়। কালিয়নাগের সঙ্গে কৃষ্ণ যখন জলযুদ্ধে লিপ্ত তখন রাধার বিশেষ কাতরতা প্রকাশ পায়।

যমুনা খণ্ড : রাধা ও গোপীরা যমুনাতে জল আনতে যায়। কৃষ্ণ যমুনার জলে নেমে হঠাৎ ডুব দিয়ে আর ওঠে না। সবাই মনে করে কৃষ্ণ ডুবে গেছে। এদিকে কৃষ্ণ লুকিয়ে কদম গাছে বসে থাকে। রাধা ও সখীরা জলে নেমে কৃষ্ণকে খুঁজতে থাকে। কৃষ্ণ নদীতীরে রাধার খুলে রাখা হার চুরি করে আবার গাছে গিয়ে বসে।

হার খণ্ড : পরে কৃষ্ণের চালাকি বোঝা যায়। হার না পেয়ে রাধা কৃষ্ণের পালিতা মা যশোদার কাছে নালিশ করে। কৃষ্ণও মিথ্যে বলে মাকে। সে বলে, আমি হার চুরি করব কেন, রাধাতো পাড়ার সম্পর্কে আমার মামি। এদিকে বড়ায়ি সব বুঝতে পারে এবং রাধার স্বামী আয়ান হার হারানোতে যাতে রাগান্বিত বা ক্ষুব্ধ না-হয় সেজন্য বলে যে, বনের কাঁটায় রাধার গজমোতির হার ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেছে।

বাণ খণ্ড : মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণ রাধার উপর ক্রুদ্ধ। রাধাও কৃষ্ণের প্রতি প্রসন্ন নয়। বড়ায়ি বুদ্ধি দিলো, কৃষ্ণ যেন শক্তির পথ পরিহার করে মদনবাণ বা প্রেমে রাধাকে বশীভূত করে। সে মতো কৃষ্ণ পুষ্পধনু নিয়ে কদমতলায় বসে। রাধা কৃষ্ণের প্রেমবাণে মূর্ছিত ও পতিত হয়। এরপর কৃষ্ণ রাধাকে চৈতন্য ফিরিয়ে দেয়। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে কাতর হয় এবং কৃষ্ণকে খুঁজে ফেরে।

বংশী খণ্ড : রাধাকে আকৃষ্ট করার জন্য সময়-অসময়ে কৃষ্ণ বাঁশিতে সুর তোলে। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার রান্না এলোমেলো হয়ে যায়, মন কুমারের চুল্লির মতো পুড়তে থাকে, রাত্রে ঘুম আসে না, ভোরবেলা কৃষ্ণ অদর্শনে রাধা মূর্ছা যায়। বড়ায়ি রাধাকে পরামর্শ দেয়, সারারাত বাঁশি বাজিয়ে সকালে কদমতলায় কৃষ্ণ বাঁশি শিয়রে রেখে ঘুমায়। তুমি সেই বাঁশি চুরি কোরো। তাহলেই সমস্যার সমাধান। রাধা তাই করে। কৃষ্ণ বুদ্ধিমান। বাঁশি চোর কে তা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। আর কৃষ্ণকে বলে, বড়ায়িকে সাক্ষী রেখে কৃষ্ণের কথা দিতে হবে যে, সে কখনো রাধার কথার অবাধ্য হবে না ও রাধাকে ত্যাগ করে যাবে না, তাহলেই বাঁশির সন্ধান মিলতে পারে। কৃষ্ণ কথা দেয়, বাঁশি ফিরে পায়।

বিরহ খণ্ড : কৃষ্ণ তারপরও রাধার উপর উদাসীন। এদিকে মধুমাস সমাগত। রাধা বিরহ অনুভব করে। রাধা বড়ায়িকে বলে কৃষ্ণকে এনে দিতে। দুধ-দই বিক্রির ছল করে রাধা নিজেও কৃষ্ণকে খোঁজার জন্য বের হয়। অবশেষে বৃন্দাবনে বাঁশি বাজানো অবস্থায় কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাধাকে বলে, 'তুমি আমাকে নানা সময় লাঞ্ছনা করেছো, ভার বহন করিয়েছো, মায়ের কাছে আমার নামে বিচার দিয়েছো, তাই তোমার উপর আমার মন উঠে গেছে।' রাধা বলে, 'তখন আমি বালিকা ছিলাম, আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তির্যক দৃষ্টি হলেও তুমি আমার দিকে তাকাও।' কৃষ্ণ বলে, 'বড়ায়ি যদি আমাকে বলে যে তুমি রাধাকে প্রেম দাও, তাহলে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে পারি।' অবশেষে বড়ায়ি রাধাকে সাজিয়ে দেয় এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। রাধা ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ নিদ্রিতা রাধাকে রেখে কংস বধ করার জন্য মথুরাতে চলে যায়। ঘুম থেকে উঠে কৃষ্ণকে না দেখে রাধা আবার বিরহকাতর হয়। রাধার অনুরোধে বড়ায়ি কৃষ্ণের সন্ধানে যায় এবং মথুরাতে কৃষ্ণকে গেয়ে অনুরোধ করে, 'রাধা তোমার বিরহে মৃতপ্রায়। তুমি উন্মাদিনীকে বাঁচাও।' কিন্তু কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যেতে চায় না, রাধাকে গ্রহণ করতে চায় না। কৃষ্ণ বলে, আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কটুকথা সহ্য করতে পারি না। রাধা আমাকে কটুকথা বলেছে। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য এখানে ছিন্ন। পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। তাই এ গ্রন্থের সমাপ্তি কেমন তা জানা যায় না।)

প্র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণজীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

উ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা। তখন বাংলায় গ্রাম ও শহরের পত্তন ঘটতে শুরু করেছে। বিশেষত হাট বা বেচাকেনার স্থানকে কেন্দ্র করে একদল মানুষ বাণিজ্যকেন্দ্রিক বসত গড়তে থাকে। তারপরও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রামজীবনই মুখ্য। কাব্যের ১৩টি খণ্ডে যে গৃহের বর্ণনা, পথ বর্ণনা, লতাপাতানিসর্গ বর্ণনা, কদম্ব-তমালের কথা, তৈজসপত্রের তালিকা, ধেনুকুলের বিবরণ, বাঁশির কথা সবই গ্রামজীবনকেই মূর্ত করে। তাছাড়া মানুষের জীবিকার অবলম্বনও কৃষি বা কৃষিসংশ্লিষ্ট বিষয়। ফলে এ কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বাংলার গ্রামজীবনের চমৎকার পরিচয় আছে।

প্র : মধ্যযুগের বাংলায় প্রধান সাহিত্যধারা কী কী?

উ : বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদ, অনুবাদ সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য বা চরিত সাহিত্য, লোক সাহিত্য ধারা ইত্যাদি।

প্র : মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উ : ধর্মকেন্দ্রিকতাই মুখ্য, মানবতাসহ সব কিছুই গৌণ।

প্র : এই যুগে কোন সাহিত্যধারা ব্যতিক্রম? কেন?

উ : লোকসাহিত্য ধারা। কারণ, এই ধারায় ধর্ম বা দেব-দেবী নয়, মানুষের গুরুত্ব অধিক এবং তার প্রণয় ও কামনাকে মুখ্য বিবেচনা করা হয়েছে।

প্র : 'কানু ছাড়া গীত নাই '– কোন যুগে সত্য ছিল?

উ : মধ্যযুগে।

প্র : 'কানু' কে?

উ : কৃষ্ণ।

প্র : মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারাগুলোর মধ্যে কোন ধারা পরিমাণে ও গুণে সমৃদ্ধ?

উ : বৈষ্ণব সাহিত্যধারা।

শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব পদাবলি

প্র : কোন মহাপুরুষ বাংলা সাহিত্যে একটি পঙ্‌ক্তি না লিখলেও তাঁর নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে?

উ : শ্রীচৈতন্যদেব।

প্র : চৈতন্যদেবের জন্ম ও মৃত্যু সাল লেখ।

উ : জন্ম ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, নবদ্বীপ; মৃত্যু ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, পুরী।

প্র : শ্রীচৈতন্যের পিতৃদত্ত নাম কী ছিল?

উ : বিশ্বম্ভর মিশ্র; ডাকনাম নিমাই।

প্র : শ্রীচৈতন্য স্মরণীয় কেন?

উ : সামন্তযুগের অনুদার মতাদর্শকে অস্বীকার করেই তিনি প্রচার করলেন জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং সকলের অধিকার। তাঁর কল্যাণেই বাঙালির স্বাজাত্যবোধ ও নিজসংস্কৃতি রক্ষিত হয়।

প্র : বৈষ্ণব সাহিত্য কত প্রকার ও কী কী?

উ : ৩ প্রকার। জীবনীকাব্য, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও পদাবলি।

প্র : কার জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে বাংলায় জীবনীসাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়?

উ : শ্রীচৈতন্যদেবের।

প্র : বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

উ : বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত'।

প্র : চৈতন্য-ভাগবতের পরিচয় দাও।

উ : বাংলা ভাষায় শ্রী চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনী গ্রন্থ হলো বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য-ভাগবত'। নিত্যানন্দ প্রভুর উৎসাহে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর (১৫৩৩ খ্রি.) পনের বছরের মধ্যেই গ্রন্থটি রচিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। চৈতন্যদেবের জীবিত অনুচরদের মুখ থেকে তথা বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে এই জীবনী রচিত হয়েছিলো বলে গ্রন্থটি প্রামাণিক। তবে চৈতন্যদেবকে নিয়ে ভক্ত সমাজে প্রচলিত অলৌকিক কাহিনির মিশ্রণও এতে যথেষ্ট দেখা যায়। এই গ্রন্থে স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল পয়ার ছন্দে কবি চৈতন্য-কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন সমকালীন পূজা-অর্চনা রীতি, টোল শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ, হিন্দু-মুসলিম পাস্পরিক সম্পর্ক, উভয় ধর্মীয় সমাজের পারস্পরিক প্রভাব, বৈষ্ণব সমাজের মত ও ভেদ, মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচরণ ইত্যাদি। গোপাল হালদারের মতে, "একালে যাকে আমরা বলি Human interest মানব-রস, 'চৈতন্য-ভাগবতে' তার অভাব নেই। এখানেই এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব"। এটি প্রায় পঁচিশ হাজার পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট। তিন খণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বাল্যকাল হতে গয়াধাম থেকে প্রত্যাগমন পর্যন্ত মোট

পদেরটি অধ্যায় রয়েছে এখানে। মধ্যখণ্ডে সাতাশটি অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত। আর অন্ত্যখণ্ডে মোট দশটি অধ্যায়ে ওড়িষ্যাযাত্রা মহোৎসব পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পদসমূহে রাগরাগিণীর ও উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্র : বাংলায় চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

উ : লোচন দাসের 'চৈতন্য-মঙ্গল'।

প্র : বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী কোনটি?

উ : কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (১৬১৫)।

প্র : বাংলা সাহিত্যে কোন সময়কে চৈতন্যযুগ বলে?

উ : ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : কড়চা বলতে কী বোঝায়?

উ : কড়চা কথাটির আধুনিক অর্থ দাঁড়িয়েছে দিনলিপি বা ডায়রি। তবে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কল্যাণে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ কড়চা বলে অভিহিত হয়। তাঁরা চৈতন্যজীবন কাহিনি শ্লোকে পরিবেশন করে কড়চা বলে নির্দেশ করেছেন। এ কারণে কেউ কেউ চৈতন্য জীবনগ্রন্থকে কড়চা বলে অভিহিত করেন। সুকুমার সেনের মতে, "কড়চা শব্দটি আসিয়াছে প্রাকৃত 'কটকাচ্চ', সংস্কৃত 'কৃতকৃত্য' হইতে। 'কট' শব্দটি প্রাচীন অনুশাসনে 'খসড়া লেখা' (original draft) অর্থেই পাওয়া গিয়াছে। কড়চার অর্থও এই ব্যুৎপত্তির অনুরূপ-খসড়া রচনা, স্মারকলিপি, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।" অতএব বোঝা যাচ্ছে দিনলিখন বা খসড়া লেখা কড়চা হিসাবে অধিক পরিচিত হলেও চৈতন্যজীবনীর সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এর অর্থ ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্র : ষড়গোস্বামী বলতে কাদের বোঝায়?

উ : শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং পরম ভক্তদের মধ্যে ছয়জনকে ষড়গোস্বামী বলা হয়। এঁরা হলেন : রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামী। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে তাঁরা বৃন্দাবনে বসবাস করে চৈতন্যদেবের ফেনিলতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় ও কিছু অনুশাসন সমন্বিত ধর্মমতে রূপ দেন। যেহেতু তাঁরা বৃন্দাবনে বাস করতেন, সেহেতু তাঁদের বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীও বলা হয়। কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ছয় গোঁসাই বা 'ষড়গোস্বামী' কথাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় এভাবে। 'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ। / শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥/এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।/যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥'

প্র : 'ধুয়া' কাকে বলে?

উ : একটানা নির্দিষ্ট স্তরে একটি পদ গান করলে তাকে 'ধুয়া' বলে। শব্দটি-ধ্রুবক > ধ্রুঅঅ > ধুআ > ধুয়া। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনায় নির্দিষ্ট সুর-তাল-লয়ে গেয় একটি পদ থাকত। ওই ধ্রুব পদটিকে ধুয়া বলে।

প্র : গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে?

উ : রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগানের ভূমিকা রূপে গৌরাঙ্গের জীবনেও অনুরূপ ঘটনার অনুবর্তন হয়েছিল তা স্মরণ করে রচিত গৌরলীলার পদকেই বলে গৌরচন্দ্রিকা।

প্র : গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

উ : গোবিন্দ দাস।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিকে কী কী পর্যায়ে ভাগ করা হয়?

উ : বৈষ্ণব পদাবলির পর্যায়গুলি হলো- পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মানবিরহ, মাথুর, ভাবসম্মিলন, আক্ষেপানুরাগ, নিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি।

প্র : বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম কীভাবে প্রচারিত হয়েছিল?

উ : ভাগবতধর্ম বা প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম মধ্যযুগেই বাংলায় প্রবেশ করেছিল। নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে অদ্বৈতাদি পণ্ডিতগণ গোপনে এই ধর্মাচরণ করতেন। পরে চৈতন্যদেব এই ধর্মের নতুন তাৎপর্য দিয়ে তা সারা দেশে প্রচার করেন।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা কাকে বলা যায়?

উ : বাঙালি কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যটি আদি বৈষ্ণব পদাবলির নিদর্শন। তবে তা বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃতে।

প্র : 'মৈথিল কোকিল' বলতে কাকে বোঝায় ও কেন?

উ : 'মৈথিল কোকিল' বলতে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বোঝায়। কোকিল যেমন সুললিত সুমধুর গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে, মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতিও মৈথিলি ভাষায় সুন্দর পদাবলি ও অন্যান্য গীতিকবিতা রচনা করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন বলে তাঁকে 'মৈথিল কোকিল' বলা হয়।

প্র : পূর্বরাগ কাকে বলে? পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে?

উ : রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে পূর্বরাগের সংজ্ঞার্থে বলেছেন- মিলনের পূর্বে দর্শন, নাম শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারা নায়ক-নায়িকার মনে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে, তাকে বলে পূর্বরাগ। পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে অভিসার কাকে বলে?

উ : প্রেমিক বা প্রেমিকা যখন গোপনে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রা করে, তখন তাকে অভিসার বলে। বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের নিকট রাধার অভিযাত্রা নিয়েই অধিকাংশ অভিসার পদ রচিত হয়েছে।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে কতপ্রকার অভিসার আছে এবং কী কী?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে আট প্রকার অভিসারের কথা বলা হয়েছে। যথা- জ্যোৎস্নাভিসার, তামসীঅভিসার, বর্ষাভিসার, দিবাভিসার, তুষ্টাটিকাভিসার, তীর্থযাত্রাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চরাভিসার।

প্র : 'বিরহ' কাকে বলে?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে 'বিরহ' প্রেমেরই একটি বিশেষ পর্যায় যা পূর্ণ করে তোলে মিলনের আনন্দধারাকে। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদজনিত অবস্থাকে বিরহ বলা হয় যা বৈষ্ণব পদাবলির ভাষায় 'বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার' নামে পরিচিত।

প্র : প্রেমবৈচিত্ত্য কাকে বলে?

উ : প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাবকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলা হয়। প্রেমিকের নিবিড় সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বেও প্রেমিকার মনে হয় এই বুঝি প্রেমিক চলে যাচ্ছেন, কিংবা প্রেমিককে তিনি হারাচ্ছেন। এই সংশয়পূর্ণ অনুভূতি হল 'প্রেমবৈচিত্ত্য'।

প্র : 'মাথুর' কাকে বলে?

উ : 'মাথুর' শব্দটি এসেছে 'মথুরা' শব্দ থেকে। 'মাথুর' পদাবলি চির বিরহের আর্তিমূলক পদাবলি। কংসাসুর বধের জন্য কৃষ্ণ তার প্রিয় লীলাভূমি বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরায় চলে গেলেন। রাধার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয় না। কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধা বেদনার করুণ ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছেন, এ বিষয় নিয়ে রচিত হয় মাথুর পদাবলি।

প্র : বিরহের সঙ্গে মাথুরের পার্থক্য কী?

উ : বিরহ হলো রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ আর মাথুর চিরবিচ্ছেদ। বৈষ্ণব ও মাথুর উভয় পর্যায়ের পদাবলি আছে।

প্র : 'ভাবসম্মিলন' কাকে বলে?

উ : ভাবসম্মিলন বলতে ভাবলোকের সম্মিলন বোঝায়। কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে কংসদমনার্থে চিরতরে মথুরায় চলে যান। রাধা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছেন যে কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবলোকে চলছে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন নিত্যমিলন। একেই বলে ভাবসম্মিলন।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে 'ভণিতা' কাকে বলে?

উ : প্রাচীন কাব্যে কবিতার শেষে কবিরা নিজের নাম যোজনা করে আত্মপরিচয় দিতেন। বৈষ্ণব পদাবলিতে এই রীতি অনুসৃত। বৈষ্ণব পদাবলিতে কবি পদের শেষে নিজের নামের উল্লেখ করে যে পরিচয় দেন, তাকেই বলা হয় ভণিতা। ভণিতার সাহায্যে পদাবলির কবিকে চিনে নেওয়া যায় এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়।

প্র : বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়িকা কাকে বলে? নায়িকার কয়টি অবস্থা এবং কী কী?

উ : বৈষ্ণব পদাবলিতে কৃষ্ণের প্রধান প্রেমিকা শ্রীরাধাকে নায়িকা বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়িকার আটটি অবস্থা। যথা-অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা।

প্র : 'সহজিয়া' বলতে কী বোঝায়? বৈষ্ণব দর্শনের অনুসারে এই শাখাটি কে?

উ : যে সাধনা অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষ্ণভাব জন্মে তাকে সহজ বলে। সহজের কৃষ্ণপ্রেম প্রীতি এবং সেখানে কৃষ্ণ বন্দীভূত, তাকে বলা হয় 'সহজিয়া' সাধনা। কৃষ্ণদাসের শ্রীরাধা, লালসা, বিলাসী, চন্দ্রাবলি সহজিয়া সাধনা, এদের মধ্যে শ্রীরাধা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

প্র : 'খণ্ডিতা' কী?

উ : নায়িকা সাজসজ্জা করে সারারাত কৃষ্ণকে নায়কের জন্য প্রতীক্ষারত। নায়ক প্রতিনায়িকার সান্নিধ্যে নিশিযাপন করে প্রভাতে নায়িকার নিকট আগমন করলে নায়িকা অত্যন্ত কুপিতা হন। এই অবস্থাকে বলা হয় 'খণ্ডিতা'।

প্র : 'রাগানুগা ভক্তি' কাকে বলে?

উ : গোপীদের ভক্তির অনুসরণে অন্যরা যখন কৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে।

প্র : সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শন কাকে বলে?

উ : সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শন একটি দার্শনিক মতবাদ যা সহজিয়া বৌদ্ধদর্শন থেকে মাত্র। সহজিয়া পন্থিগণ গুরু ও সাধনসঙ্গিনীকে রাধাকৃষ্ণ রূপে উপাসনা করেন। অনেকে বলেন- গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে বিকৃতি ঘটবার ফলে সহজিয়া বৈষ্ণব দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল।

মঙ্গলকাব্য

প্র : মঙ্গলকাব্য বলতে কী বোঝায়?

উ : মানুষের বিশ্বাস মতে, দেবদেবীর মাহাত্ম্য নির্ভর যে কাব্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে নিজের, প্রতিবেশীর ও সমাজের মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন হয় তাকে মঙ্গলকাব্য বলে। পনের থেকে আঠারো শতকের শেষ অবধি এই ধারার কাব্য বাংলায় রচিত হয়।

প্র : মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কী কী?

উ : ৩টি। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল।

প্র : একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত কয়টি অংশ থাকে?

উ : ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, নরখণ্ড, ফলশ্রুতি।

প্র : মঙ্গলকাব্যে কতজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়?

উ : ৬২ জন।

প্র : মঙ্গলকাব্যের সাধারণ লক্ষণগুলি উল্লেখ কর।

উ : (১) প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার আদেশে কাব্যরচনা করেছেন। (২) দেবতার সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা। (৩) কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা অলৌকিক ও অসাধারণ। (৪) মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা। শাপান্তে স্বর্গে ফিরে যান। (৫) মর্ত্যে পূজা প্রচারে সমস্ত দেবতাদের আচরণ মানুষের মতো।

প্র : বিষয়বস্তু অনুসারে মঙ্গলকাব্যকে কী ধারায় বিভক্ত করা যায়?

উ : দুটি। একটি খাঁটি মঙ্গলকাব্যের ধারা, অপরটি পুরাণাশ্রয়ী ধারা। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও কালিকামঙ্গল প্রথম ধারায় অন্তর্ভুক্ত। অন্নদামঙ্গল দ্বিতীয় শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, বাঙলীমঙ্গল প্রভৃতি। দ্বিতীয় ধারাটি বিষ্ণু পুরাণকেন্দ্রিক। যেমন-দেবীভাগবত, চণ্ডিকাবিজয়, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, গৌরীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি।

প্র : মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট কী?

উ : মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ দেবদেবী অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত আদিম লোকায়ত সমাজের। বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে ও সমাজে এদের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা। অস্ট্রিকদের দেবী হলেন শিবের মানসকন্যা মনসা, অনার্য কৃষি জাতির দেবী চণ্ডী হলেন শিবের গৃহিণী, সূর্যদেবতা হলেন কূর্মরূপী ধর্মঠাকুর।

প্র : 'সুকবি বল্লভ' কার উপাধি ছিল? তাঁর কাব্যের নাম কী ছিল?

উ : কবি নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল 'সুকবি বল্লভ'। তাঁর কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'।

প্র : মনসামঙ্গলের একমাত্র পশ্চিমবঙ্গীয় কবির নাম কী? তাঁর কাব্যের নাম কী? কবির বেশি পরিচিতির কারণ কী?

উ : কবির নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। তাঁর কাব্যের নাম 'কেতকাপুরাণ'। কেতকাদাস মনসামঙ্গল সর্বপ্রথম (১৮৪৪ খ্রি.) মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। এজন্য উনিশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত সমাজে কবি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কোন কবিকে কেন 'স্বভাবকবি' বলা হয়?

উ : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারায় কবি দ্বিজমাধবকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়?

প্র : দ্বিজমাধবের দুজন প্রধান কবির নাম উল্লেখ করে শ্রেষ্ঠ কবির নাম লেখ।

উ : দ্বিজমাধবের দুজন প্রধান কবি ওপরার ঠাকুরদাস ও ঘনরাম চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

প্র : 'বারমাসী' কাকে বলে?

উ : 'বারমাসী' বলতে বোঝায় বারোজন কবি চণ্ডীর মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন অংশের গায়েনরা কাহিনির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন কবির মঙ্গলকাব্য থেকে অংশ নিয়ে পালা গাইতেন। তবে সবসময় যে বারোজন গায়েন থাকতেন এমন নয়।

প্র : ধর্মমঙ্গল কাব্য কটি পালায় বিভক্ত?

উ : ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত-রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউ সেনের গল্প।

প্র : মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

উ : মনসা দেবীর উদ্ভব সম্পর্কে কোনো সন্দেহের প্রজনন শক্তিপূজার কথা বলা হয়, দক্ষিণ ভারতের সর্পদেবী 'মনচা আম্মা', বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী জাঙ্গুলি তারা প্রভৃতির মিশ্র প্রেরণা সক্রিয় ছিল। এই সূত্রে নিম্ব গাছ ও টোটেমের ব্যাপারটিও ছিল। পরে সর্পদেবী মনসা শিবের কন্যা পরিচয়ে অভিজাত সমাজে স্থান লাভ করে। অভিজাত শ্রেণির ওপর প্রান্তিক মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা মনসামঙ্গলের মূল কথা।

প্র : 'বারোমাসী' বা 'বারমাস্যা' কাকে বলে?

উ : 'বারোমাসী' বা 'বারমাস্যা' শব্দের অর্থ বারোমাস অর্থাৎ পুরো এক বছরের বিবরণ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লৌকিক কাহিনি বর্ণনায় নায়ক-নায়িকার বারো মাসের সুখ-দুঃখের বিবরণ প্রদানের রীতি দেখা যায়। একেই বারোমাসী বা বারমাস্যা বলে।

প্র : 'চৌতিশা' কী?

উ : বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্টদেবতার যে স্তব রচনা করে, তাকে বলে 'চৌতিশা'। ব্যঞ্জনবর্ণ ('ক' থেকে 'হ') পদের আদিতে প্রয়োগ করে এই 'চৌতিশা' রচিত হতো।

প্র : মনসামঙ্গল সম্পর্কে লেখ।

উ : সাপের দেবী মনসার স্তব, স্তুতি, কাহিনি ইত্যাদি নিয়ে রচিত কাব্য 'মনসামঙ্গল'। এতে 'লখাইয়ের বাসর' অধ্যায়টি বড় হয়। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ্য কাহিনি মূল সংস্কৃত রচনার। বাকিটা লোকায়ত। এর পশ্চিমবঙ্গীয় ঐতিহ্যের থেকে উদ্ভব ঘটেছে মনসামঙ্গলের। চাঁদ সদাগরের হাতে মিথের মনসা 'বিষহরি', পরে মনসা দেবীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে তাঁর হাতে ধরা পড়া মনসার কাহিনিসূত্রের মধ্যে আসে। এই কাহিনি চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে সমাজে পরিচিত ছিল। মানুষের কাছে কাহিনিসূত্র সমধুর হয়। মনসামঙ্গল মূলত পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক। এর কবির সংখ্যা বেশি পশ্চিমবঙ্গে, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির সংখ্যাও বহু। কবি দ্বিজবংশী মনসামঙ্গলের সৃষ্টি করি। এছাড়া বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ প্রমুখ মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্য কী?

উ : দেবী মনসার পূজা, স্তুতি ও মাহাত্ম্যের জন্য লিখিত। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ঢাকার কাছাকাছে এর প্রসার ছিল।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উ : কবি কানা হরি দত্ত।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যগুলোকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : পদ্মাপুরাণ।

প্র : মনসাবিজয় সম্পর্কে লেখ।

উ : মনসামঙ্গল কাব্য ধারাকেই মনসাবিজয় বলা হয়। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের নায়ক মনসাকে নিয়ে মনসাবিজয় রচিত হয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনসামঙ্গল কথাটি ব্যবহার করতে চান না। সুকুমার সেন মনে করেন, 'মনসা ব্রতগীতকে মঙ্গল বলা ঠিক নয়। কেননা এই ব্রত পার্বণ মঙ্গলকর্মের জন্য করা হইত না।' মনসাকে নিয়ে ব্রত রচয়িতাদের অন্যতম বিপ্রদাস পিপলাই নিজের রচনাকে মনসামঙ্গল না বলে মনসাবিজয় বলে নির্দেশ করেছেন।

প্র : মনসাবিজয় কার রচনা, কত সালে রচিত।

উ : বিপ্রদাস পিপলাই, ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্র ও প্রধান কাহিনি লিখ।

উ : চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর। [চূড়ান্ত]

দিতে অস্বীকার করায় ধনপতি চাঁদ সওদাগরকে মনসা দেবী ধ্বংসের ও তাঁর পুত্র লখিন্দরকে সর্পাঘাতে হত্যা করে পুত্র বধূ করে। বেহুলা লখিন্দরের নব পরিণীতা। পরে পুত্রের পুনর্জীবন ও ধনসায়রের বাণীজ্যে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করতে বাধ্য হয়।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তিনি কোন শতকের?

উ : কবি মানিক দত্ত; চতুর্দশ শতকের কবি।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল ধারার প্রধান কবির নাম কী? তিনি কোন শতকের?

উ : মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; ষোল শতাব্দীর কবি।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : 'চণ্ডীমঙ্গল' চণ্ডী নামক লৌকিক-পৌরাণিক দেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি অবলম্বনে লিখিত কাব্য সম্ভবত মানিক দত্ত এই কাব্যধারার প্রথম কবি। তিনি চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই তাঁর কাব্য রচনা করেন। চৈতন্য-উত্তর কালে দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজমাধব সেবক (সারদাচরিত) প্রমুখ চণ্ডীমঙ্গলের খ্যাতনামা কবি। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি উপাখ্যান রয়েছে। একটি ব্যাধ দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি, চণ্ডীর বরে কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি, নতুন রাজ্যপত্তন, ধূর্ত ভাঁড়ুদত্তের ষড়যন্ত্রে প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ, পরাজয় ও শেষ পর্যন্ত চণ্ডীর কৃপায় হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি; দ্বিতীয় উপাখ্যানের নায়ক ধনপতি সদাগর, অন্যান্য প্রধান চরিত্র তার দুই স্ত্রী সহনা ও খুল্লনা।

প্র : চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?

উ : কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত, লহনা খুল্লনা প্রমুখ।

প্র : 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : চট্টগ্রামের কবি দ্বিজ রামদেব চণ্ডী অবলম্বনে রচনা করেন 'অন্নদামঙ্গল'। গ্রন্থটির রচনাকাল ১৬৫৩, মতান্তরে ১৬৫৭-৫৯ সাল। অন্নদামঙ্গলে দ্বিজ মাধবের সকল চরিত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও কবিটির স্বাতন্ত্র্য আছে। বিশেষ করে কবি বহু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ ও ধুয়া সংযোজন করে কাব্যখানিকে অধিকতর গীতিময় করেছেন। উল্লেখ্য যে কবি রচনা মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলের' অপর নাম অভয়ামঙ্গল।

প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি কে?

উ : ভারতচন্দ্র রায়।

প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?

উ : তিনখণ্ডে। শিবনারায়ণ, কালিকামঙ্গল, মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড।

প্র : অন্নদামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কী কী?

উ : মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, হরিহোড় ইত্যাদি।

প্র : বিদ্যাসুন্দর কাব্য সম্পর্কে লেখ।

উ : কালিকামঙ্গল নামে অভিহিত কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাহিনি' বলে। সুকুমার সেনের মতে, পুরুষ কিছু খোঁজে, আর নারী প্রত্যাশা করে সুন্দর পতির। এই কাহিনির উপর ভিত্তি করে গত সহস্রাব্দের প্রারম্ভের তিন-চার শতক থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত সহ পরবর্তীকালে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনি প্রচলন। বুদ্ধিমান কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজকন্যা-প্রণয়িনীর গোপন মিলনই হচ্ছে বাংলায় প্রচলিত কাহিনির ভিত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনির ব্যাপক চর্চা হয়। কবি শেখর কবিরঞ্জন চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র রায় এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। রূপগুণ সম্পন্ন রাজকুমার সুন্দর দেবী কালিকার বরলাভ করে তার সন্ততির মাধ্যমে কিরাট রাজকন্যা বিদ্যার পাণি লাভের বর পান। রাজ অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গ খননের সাহায্যে এবং নিজের ধৈর্য, সাহসিকতা ও কৃতকর্মের ফলে অবশেষে সুন্দর বিদ্যার সান্নিধ্য ও সঙ্গ লাভ করে।

প্র : ধর্ম ঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?

উ : ধর্মমঙ্গল।

প্র : ধর্মমঙ্গল ধারার প্রথম কবি কে, তার গ্রন্থের নাম কী?

উ : ময়ূরভট্ট; হাকন্দপুরাণ।

প্র : ধর্মমঙ্গল ধারার আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উ : ঘনরাম চক্রবর্তী

প্র : তার রচিত গ্রন্থের নাম ও এর উপজীব্য কী?

উ : শ্রীধর্মমঙ্গল; লাউসেনের কাহিনি।

প্র : কালিকামঙ্গল কী?

উ : দেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক গ্রন্থ।

প্র : এই মঙ্গলকাব্যকে আর কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি।

প্র : কালিকামঙ্গলের আদি কবি কে?

উ : কবি কঙ্ক।

প্র : বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা আর দুজন কবির নাম কী?

উ : রামপ্রসাদ সেন ও সাবিরিদ খান।

রামায়ণ মহাভারত

প্র : পৃথিবীতে কয়টি জ্ঞাত মহাকাব্য আছে, কী কী?

উ : চারটি। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি।

প্র : মহাভারত কোন ভাষায় লেখা, লেখক কে?

উ : সংস্কৃত ভাষায়। মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব।

প্র : মহাভারত প্রথম বাংলায় কে অনুবাদ করেন?

উ : কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

প্র : তাঁর মহাভারতকে পরাগলী মহাভারত বলা হয় কেন?

উ : নবাব হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৮) চট্টগ্রাম শাসনের জন্য পরাগল খাঁ নামক এক লস্কর নিযুক্ত করেন। মহাভারতে বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধপ্রিয় পরাগল খাঁ মহাভারতের যুদ্ধকাহিনি শুনে গ্রন্থটি অনুবাদ করার জন্য পরমেশ্বর দাসকে নির্দেশ দেন। সে অনুসারে মহাভারত অনুবাদ করা হয় বলে একে পরাগলী মহাভারত বলে।

প্র : মহাভারতের অনুবাদক কে? তিনি কার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত রচনা করেন?

উ : মহাভারতের প্রথম অনুবাদক হিসাবে লস্করের নাম অধুনা গবেষকমহলে স্বীকৃত। তবে আজ পর্যন্ত বাংলা মহাভারতের প্রাচীন ও প্রামাণ্য যে পুথিটি হস্তগত হয়েছে, সেটি কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত। গৌড়াধিপতি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে মহাভারত অনুবাদে উৎসাহিত করেন।

প্র : কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম কী? এটি কোন সালে রচিত?

উ : কবীন্দ্র তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'বিজয়পাণ্ডবকথা' অথবা 'ভারত পাঁচালী'। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত।

প্র : পরাগলী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের নাম কী?

উ : মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় কবির হলেও কবীন্দ্রের রচনায় ইসলাম গন্ধ একেবারেই নেই বললে চলে। পরমেশ্বর কাব্যরচনার মূল দৃষ্টি থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হন নি।

প্র : 'ছুটি খাঁনী পৃষ্ঠপোষকতায় কে মহাভারত অনুবাদ ও রচনা করেন?

উ : চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সম্ভবত শ্রীকর নন্দীকে মহাভারত অনুবাদের নির্দেশ দেন- সেই মতো শ্রীকর নন্দী 'ভারত পাঁচালী' রচনা করেন। যা 'ছুটিখাঁনি মহাভারত' নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, পরাগলী মহাভারতের অশ্বমেধ সম্পূর্ণ করেছেন শ্রীকর নন্দী। কারণ গ্রন্থরচনা শেষ হবার আগেই কবীন্দ্রের মৃত্যু হয়।

প্র : কাশীরাম দাসের মহাভারতের নাম কী ছিল? রচনাকাল আনুমানিক কোন সাল বলে মনে হয়?

উ : কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী'র রচনাকাল সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মনে করেন ১৬০২-'০৪ খ্রিষ্টাব্দের। ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের নকল করা একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ও ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দের তারিখ-সংক্রান্ত পুথিও পাওয়া গেছে। তাই মনে হয় কবির কাব্য ষোড়শ শতকের শেষের দিকেই রচিত হয়ে থাকতে পারে।

প্র : মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে? তিনি মহাভারতের কটি পর্ব অনুবাদ করেছিলেন?

উ : মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের নাম কাশীরাম দাস। তিনি গ্রন্থ রচনা শেষ করে যেতে পারেন নি। মহাভারতে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব রচনার পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্র : কাশীরামের অসম্পূর্ণ রচনা কারা সম্পূর্ণ করেন?

উ : কথিত আছে কবির অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন কবির পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য স্থানীয় অনেকে। ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম রচনা করেন দ্রোণপর্ব শল্য ও নারীপর্ব সুভদ্রাহরণ

নাসের রচনা এবং অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন দ্বিজ বদুনাথ দাস। অন্যান্য পর্বের ভণিতায় নিত্যানন্দ ঘোষ, গঙ্গাদাস সেন, পদ্মাবর দাস, রাজেন্দ্র দাস ও গোপীনাথ দত্তের নাম পাওয়া যায়।

প্র : কাশীরাম দাসের কাহিনির বর্ণনায় মৌলিকত্ব কোথায়?

উ : কবি রচনার সময় মূল মহাভারতের কাহিনি গ্রহণ-বর্জন করেছেন। পর্ববিভাগ ও নামকরণে স্বাধীন পথেই চলেছেন। মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্বটি একত্রে স্বর্গারোহণ পর্ব নামে চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীবৎস-চিন্তার মধুর সম্পর্কটি কবির নিজস্ব। সুভদ্রা হরণ, পারিজাত হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত, রাজসূয় যজ্ঞে বিভীষণের অপমান প্রভৃতি কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

প্র : চৈতন্য পূর্ববর্তী চারজন বাঙালি মহাভারত অনুবাদকের নাম লেখ।

উ : কবীন্দ্রপরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পণ্ডিত প্রমুখ। এঁরা চৈতন্য পূর্বযুগের। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের অল্প কিছুকাল পরেই জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : রামায়ণ কোন ভাষার কাব্য, কবি কে?

উ : সংস্কৃত ভাষার। কবি বাল্মীকি। বাল্মীকি আগে রত্নাকর নামে দস্যুবৃত্তি করতেন।

প্র : রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন?

উ : কৃত্তিবাস ওঝা।

প্র : কৃত্তিবাস ওঝার পরিচয় দাও।

উ : রামায়ণ বা শ্রীরাম-পাঁচালির কবি কৃত্তিবাস ওঝা। ওঝা শব্দটি বাংলায় সাপের বিষ ঝাড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু সে অর্থে কৃত্তিবাস নামটির সঙ্গে ওঝা পদবিযুক্ত হয় নি। রামায়ণ গান করতেন বলে হয়তো এই পদবিটি কৃত্তিবাস নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মৈথিলি ব্রাহ্মণদের অসমিয়া ভাষায় ওঝা বলা হয়। ওঝা এসেছে উপাধ্যায় শব্দ থেকে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালি ব্রাহ্মণের ওঝা পদবি পাওয়া যায়। তারা শিক্ষক-পণ্ডিত ছিলেন। সে যাহোক, কৃত্তিবাস ওঝা রচনা, শিক্ষা, ধর্ম তথা জ্ঞানের পথের পথিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কৃত্তিবাস ওঝা চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি, শ্রীরাম-পাঁচালি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। গঙ্গার তীরে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখটি বংশে ১৩৯৮ মতান্তরে ১৪০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। কৃত্তিবাস নিজেই তাঁর আত্মকাহিনি বর্ণনা করে গেছেন। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তাঁর জন্ম, 'কৃত্তিবাস' তাঁর পিতামহ বংশের নাম। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব হলো, তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন। বাল্মীকির রামায়ণকে সামনে রেখেও তিনি মহাকাব্যটি অনুবাদ করে মূলত পুনঃরচনাই করেন। তাঁর রামায়ণ এতোটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ১৮০২-০৩ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের পাদ্রিরা তাদের নব প্রতিষ্ঠিত প্রেসে গ্রন্থটি মুদ্রণ করেন। এ কারণে গোপাল হালদার মন্তব্য করেছেন। 'বাল্মীকি যেমন সংস্কৃতের আদি কবি কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙলার আদি কবি।' কৃত্তিবাসের রামায়ণে চরিত্রগুলো বাঙালি ঘরোয়া আমেজে সকলের পরিচিত হয়ে উঠেছে। মধুসূদন একটি সনেটে কবিকে 'কীর্তিবাস তুমি' বলে শ্রদ্ধানত করেছেন।

প্র : একমাত্র মহিলাকবি রচিত 'রামায়ণ' সম্পর্কে লেখ।

উ : চন্দ্রাবতী ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা দ্বিজবংশী বা বংশীদাস এর বিদুষীকন্যা। চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র মহিলাকবি হিসেবে গৌরব অর্জন করেন। তাঁর রচিত রামায়ণের রচনাকাল কত ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবে তাঁর পিতা সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। তাই, ধারণা করা হয় তার রামায়ণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত। চন্দ্রাবতীর জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র একটি পালায় চন্দ্রাবতীর বিয়োগান্তক জীবন-পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে, চন্দ্রাবতীর জীবন বৃত্তান্ত ও তার কাব্যের অস্তিত্বকে মানতে চান না। কিন্তু যে রকম ব্যাপকভাবে চন্দ্রাবতীর জীবন ও তাঁর রচিত রামায়ণ ও দস্যু কেনারামের পালা ময়মনসিংহে প্রচলিত আছে, তার চন্দ্রাবতীর কবি ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা

যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। চন্দ্রাবতী যে রামায়ণ সম্পূর্ণ বা তার অংশ বিশেষ লিখেছিলেন তাঁর কোন পুথি পাওয়া যায় নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সংগ্রাহক ময়মনসিংহের অধিবাসী চন্দ্রকুমার দে স্থানীয় মহিলাদের গলায় এই রামায়ণ গান শুনে তা সংগ্রহ করে নেন। মেয়েরাই এর গায়ক, এর শ্রোতা এবং গায়কেরাও অধিকাংশ স্ত্রীলোক ছিলেন। মৌখিক সংগ্রহ হলেও এটি পূর্ণাঙ্গরূপে সংগৃহীত হতে পারে নি; এছাড়াও চন্দ্রকুমার গ্রামীণ মহিলাদের কণ্ঠ থেকে এ গান সংগ্রহ করলেও এর গ্রামীণ চেহারা কোথাও বজায় থাকে নি। চন্দ্রাবতীর মধ্যে যে কবি প্রতিভা ছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। এ কাব্যে নারীসুলভ কোমলতাটুকু বহু পুরুষ পরিমার্জনের চেষ্টা করলেও অনুভব করতে পারা যায়। এ কাব্যের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার রামায়ণকে ৩টি পরিচ্ছেদে ভাগ করেন।

মুসলিমরচিত সাহিত্য

প্র : 'রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' বলতে কী বোঝ?

উ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল দেব-দেবীর স্তুতিমূলক। যে-কোনোভাবেই দেবতাদের গুণ প্রকাশ করা ছিল এর লক্ষ্য। এজন্য অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করেন। তবে পনের শতক থেকেই মুসলিমদের মধ্যে আরবি-পারসি কাহিনি অবলম্বন করে কাব্যরচনার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাঁরাও মুসলিম ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে দ্বিধান্বিত হন নি। তাদের বর্ণিত কাহিনিতে নবি-পয়গম্বররা এসেছেন। শুধু তাই নয়, নবি-পয়গম্বরদের সঙ্গে প্রায় সব ক্ষেত্রে উঠে এসেছে তাদের প্রতি আকৃষ্ট বা প্রণয়াসক্ত হয়ে বিয়ের কথা। এই আকর্ষণ বা প্রণয় বর্ণনা করতে গিয়ে লেখককুল অত্যন্ত মানবিক ছিলেন। তাদের মানবিক উপস্থাপনায় মধ্যযুগে রচিত এই ধরনের প্রণয়কথাকেই 'রোম্যান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' বলে।

প্র : এই ধারার কয়েকজন কবির নাম লেখ।

উ : শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর প্রমুখ।

প্র : বিভিন্ন শতকে যে-সব মুসলিম কবি কাব্যরচনা করেছেন, তাদের নাম লেখ।

উ : পনের শতক : শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ উমীন (জৈনুদ্দীন)।

ষোল শতক : শেখ কবীর, চাঁন কাজী, শেখ ফয়জুল্লাহ, শাহ বারিদ খান, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ কবীর, সৈয়দ সুলতান, দোনা গাজি, হাজি মুহম্মদ, ফতেহ খান, শেখ চাঁদ, মনোহর।

সতের শতক : মুহম্মদ আকিল, কাজী দৌলত, আলাওল, মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুর্তজা, খান গাজান, শেখ মুত্তালিব, মুহম্মদ খান, মরদন, পরীয় শাহ, আবদুল নবী, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মুহম্মদ আকবর, মঙ্গল চাঁদ, নওয়াজিস খান খন্দকার, আবদুল করিম খন্দকার।

আঠার শতক : আলী রজা, শেখ সাদী, শেরবাজ চৌধুরী, আবদুল শকুর মাহমুদ, মুহম্মদ আলী রজা, মুহম্মদ আলী, ফাজিল, নাসির, সিরতাজ, ফকির ওয়াজ, নূর মুহম্মদ, শমশের আলী, মুহম্মদ মুকিম, হেয়াত মামুদ, বাসক ফকির, মুহম্মদ ফসীহ, শেখ মনসুর, মুহম্মদ জীবন, মুহম্মদ হাবি পণ্ডিত, ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, শেখ ইয়াকুব।

উনিশ শতক : মুহম্মদ চুহর, তমিজী, সামসুদ্দিন সিদ্দিকী, আরিফ, হামিদুল্লাহ খান বাহাদুর, কাজী হাসমত আলী চৌধুরী, নওয়াব ফয়জুন্নিসা, মালে মুহম্মদ, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ দানেশ, জোনাব আলী, মুহম্মদ বক্তার খান, বেলায়েত হোসেন, আবদুল গাফফার, মনিরুদ্দিন আহাম্মদ, আবদুর রহিম, তাজউদ্দিন মুহম্মদ, আমিরুদ্দীন, দুদু শাহ।

পাঁচশ বছরে এই কজন মুসলিম কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের অনেকের লেখাই উল্লেখ করার মতো নয়, ইতিহাসের খাতিরে কবির নাম উল্লেখ করা হলো মাত্র। অনেকের একটির বেশি গ্রন্থ কোনোভাবেই আলোচনার যোগ্যও নয়।

প্র : 'ইউসুফ-জোলেখা'র পরিচয় দাও।

উ : 'ইউসুফ-জোলেখা' একটি কাহিনি কাব্যগ্রন্থ: শাহ মুহম্মদ সগীর লিখেছেন। গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিষ্টাব্দ) এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল বলে প্রমাণ মিলেছে। সে-বিচারে কাব্যটি পঞ্চদশ

শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা এবং শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি হিসেবে গণ্য। বাইবেল ও কোরানে ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি বর্ণিত আছে। ইরানের কবি ফেরদৌসিও (মৃত্যু ১০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এই নামে কাব্য রচনা করেছেন। সগীর বাইবেল পড়েন নি। তিনি কোরানে ও ফেরদৌসির কাছ থেকেই কাহিনিসূত্র গ্রহণ করে ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি লেখেন। তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখার আজিজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ক্রীতদাস ইউসুফের (নবি) প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জোলেখা তাকে আকর্ষণ করে। নানা ঘটনায় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হয় এবং তার মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ-জোলেখার মিলন হয়। সুফিরা ইউসুফকে পরমাত্মা জোলেখাকে জীবাত্মার প্রতীক বিবেচনা করেন। সগীরও তাই করেছেন। তবে বর্ণনায় প্রেমের আবহটি প্রধান হয়েছে। সগীর ছাড়া একই কাহিনি নিয়ে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ কাব্য লিখেছেন। তবে এ কাব্য শাহ মুহম্মদ সগীরই প্রথম লেখেন।

প্র : 'ইউসুফ-জুলেখা' কাব্যের সামান্য অংশ উদ্ধৃত কর।

উ : ব্যাধি এ পীড়িত মোর বিকল শরীর।
ঔষধ দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে স্থির॥
এহেন নির্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা ভীতি কর উপভোগ॥
না জানি কেমন আছে নিষেধ কারণ।
বুঝিলু তোমার ইচ্ছা আমার মরণ॥
('জোলেখার প্রেম নিবেদন' অংশ থেকে)

প্র : 'লায়লী মজনু' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লায়লী মজনু'র রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। আহমদ শরীফের মতে ১৫৪৩-১৫৫৩; শহীদুল্লাহর মতে ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। বাহরাম খান চট্টগ্রাম-অধিপতি নিজাম শাহ সুরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। 'লায়লী-মজনু' কাব্য পারসি কবি জামির (মৃত্যু ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) 'লায়লী-মজনু' কাব্যের ভাবানুবাদ। তবে কাহিনিতে স্বাধীন কল্পনা ও উপস্থাপনায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ, উপমা, রূপক সৃষ্টি করেছেন। গ্রন্থটি আদি রসাত্মক। আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানবিক প্রবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে। আমিরপুত্র কয়েস বণিককন্যা লায়লার প্রেমে পাগলপ্রায় হয়। লায়লীও কয়েসকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে বিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র। তারপরও উভয়ের আকর্ষণ এতোই তীব্র থাকে যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার সমাপন ঘটে।

প্র : 'মধুমালতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : হিন্দি কবি মনঝনের 'মধুমালতী' কাব্যের কথা নানা ভাষায় প্রচারিত হয়। মুহম্মদ কবীর হিন্দিতে অথবা পারসি ভাষায় এই কাব্যের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হয়ে রচনা করেন বাংলা 'মধুমালতী'। এর রচনাকাল ১৫৮৮ খ্রিষ্টাব্দ। এ কাহিনি ভারতীয়। সূর্যভান কঙ্গিরা রাজ্যের রাজা। তার রাণী কমলাসুন্দরী, পুত্র মনোহর। মনোহর সুদর্শন। মহারসরাজ্যের পরমা সুন্দরী রাজকুমারী মধুমালতীর সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ ও প্রেমের যোগসূত্র ঘটে পরিদের ষড়যন্ত্রে। এরপর মনোহর ও মধুমালতী হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদের ফলে তাদের বিরহতাপিত অবস্থা অত্যন্ত করুণ ও সহৃদয়তার সঙ্গে কবি উল্লেখ করেছেন। পরে তাদের পুনর্মিলন ঘটে। বোঝা যায়, সমকালে 'মধুমালতী' খুবই পরিচিত কাহিনি ছিল। যে কারণে সৈয়দ হামজা, শাকের মুহম্মদ প্রমুখ একই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

প্র : 'গুলে বকাওলী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : ইজ্জতুল্লা নামক এক বাঙালি লেখক রচিত পারসি গ্রন্থ। ১৭২২ থেকে ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন কবি নওয়াজিশ খান। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মহম্মদ মুকিম তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম দেন 'গুলে বকাওলী'। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিম কবিদের নাম উল্লেখ করে মুসলিম বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ নিয়ে আলোকপাত করেন। তারপরও নওয়াজিস খান খন্দকার বিরচিত 'গুলে বকাওলী'র রচনাকাল নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে কাব্যটি যে সতের শতকের রচনা এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা মত দিয়েছেন। চট্টগ্রামের জমিদার বংশীয় বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে কবি এই কাব্য লেখেন।

'গুলে বকাওলী' প্রেমকাব্য। শর্কিস্তানের রাজা অন্ধ। রাজকুমার তাজুল মুলুক জানতে পারে পরিরাজকন্যা বকাওলীর উদ্যানে বকাওলী ফুল আছে এবং সেই ফুলের রসে পিতার অন্ধত্ব দূরীভূত হবে। তাজুল সেই উদ্যানে উপস্থিত হয়ে দেখে অপূর্ব সুন্দরী পরিরাজকন্যা বকাওলী সেখানে নিদ্রিতাবস্থায়। ভালোলাগে তাজুলের। সে বকাওলীর সঙ্গে আংটি বদল করে এবং একটি প্রেমপত্র লিখে আসে। বকাওলী ঘুম থেকে জেগে আংটি ও প্রেমপত্র দেখে তাজুলের সন্ধানে বের হয়। অনেক দুঃখ ও ধৈর্যের পর উভয়ের মিলন ঘটে। একই কাহিনি হিন্দি-উর্দু-পারসি ভাষাতেও আছে। কাহিনিটি সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা 'গুলে বকাওলী'তে পদ্যের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ আছে। সে দিক থেকে এর রচনা অভিনব।

প্র : 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী'র পরিচয় দাও।

উ : সতের শতকের কবি দৌলত কাজী 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। রোসাঙ্গের অধিপতি শ্রীসুধর্মার (রাজত্বকাল ১৬২২-৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রধান আমাত্য আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। পরে উজির সোলায়মানের আদেশে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

কাব্যের কাহিনি এরকম : রাজা লোর আর রূপসী রানি ময়নাবতীর সুখের সংসার। বনবিহারে গিয়ে লোর এক যোগীর কাছে অপরূপা চন্দ্রানীর সংবাদ পায়। চন্দ্রানীর স্বামী নপুংসক। লোর দেখা করে চন্দ্রানীর সঙ্গে। তাদের গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। চন্দ্রানীর স্বামী বামনের সঙ্গে লোরেরর যুদ্ধে বামন মারা যায়। গোহারী রাজ্যের রাজা চন্দ্রানীর পিতা মোহরা লোরকে গ্রহণ করে এবং পৌত্রলাভের আশায় তাদের বিয়ে দেয়। লোর ময়নার কথা ভুলে চন্দ্রানীকে নিয়ে সংসার করে। লোর-চন্দ্রানীর এক পুত্র হয়, নাম প্রচণ্ডতপন। দিন যায়। ময়নাবতী স্বামীর বিরহেও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। ১৪ বছর পর এক শুকপাখি ময়নাবতীর কথা লোরকে বর্ণনা করলে পুত্র তপনের হাতে গোহারীর রাজত্ব দিয়ে লোর চন্দ্রানীকে নিয়ে ময়নাবতীর জন্য নিজরাজ্যে গমন করে। পরে দুই স্ত্রী ময়নাবতী ও চন্দ্রানীকে নিয়ে লোর জীবনযাপন করে বৃদ্ধ হয়। তার মৃত্যুর পর দুই স্ত্রী একত্র চিতারোহণ করে।

প্র : 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের একমাত্র রচয়িতা কেরেশী মাগন ঠাকুর। এর একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গেছে। কাব্যের রচনাকাল নিয়ে সংশয় আছে। তবে মাগন আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী ও আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই কাব্যটি সতের শতকের। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের প্রাচীন উৎস জানা যায় না। মনে হয় এটা কবির স্বাধীন কল্পনা। ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের বীরপুত্র বীরভান। উজির সঞ্জয়ের পুত্র সুত বীরভানের বন্ধু। সরদ্বীপের রাজা শূলপালের সুন্দরী কন্যা চন্দ্রাবতী বীরভানের চিত্ররূপ দেখে প্রণয়তাপিতা হয়। চন্দ্রাবতীর চিত্ররূপ দেখে বীরভান। উভয়ে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুত এবং চন্দ্রাবতীর সখী চিত্রাবতী এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে। অনেক অলৌকিকত্ব, অভিনবত্ব, অনন্যতার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যায়। পরে তাদের মিলন ঘটে।

প্র : 'পদ্মাবতী' কাব্যের পরিচয় দাও।

উ : মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল, যাঁর একাধিক গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। তিনি সতের শতকের কবি। 'পদ্মাবতী' তাঁর অমর কীর্তি। বর্তমান ফরিদপুরের পাঠান শাসনকর্তা মজলিশ কুতুবের তিনি মন্ত্রী ছিলেন। স্থানান্তরে যাবার সময় পর্তুগিজদের আক্রমণে তাঁর পিতা নিহত হলেও তিনি আরাকানে নীত হন এবং মুক্তি পেয়ে আরাকান রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পান। আরাকানের বৌদ্ধ রাজারা ও তাদের অমাত্যরা আলাওলের উপর খুশি ছিলেন। তাদের আগ্রহে আলাওল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। অনুবাদ হলেও কবি এখানে অনেক মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

জায়সি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে 'পদুমাবৎ' রচনা করেন আর আলাওল 'পদ্মাবতী' আরাকানরাজ সাদ খদোমিস্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২) মন্ত্রী মাখন ঠাকুরের আদেশে ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন।

'পদ্মাবতী'র কাহিনি-সংক্ষেপ : সিংহলের রাজা ও রানী গন্ধর্ব সেন ও চম্পাবতী। তাদের পরমাসুন্দরী কন্যা পদ্মাবতী। শাস্ত্রজ্ঞ ও দূরদর্শী শুকপাখি তাদের সঙ্গী। নাম হীরামণি। হীরামণি সদ্যযৌবনা পদ্মাবতীর সঙ্গে অতি রসালাপ করায় গন্ধর্ব ক্রুদ্ধ হয়। হীরামণিকে হত্যার নির্দেশ দেয় সে। সময় বুঝে শুকপাখি হীরামণি পালায়। কিন্তু ব্যাধের জালে ধরা পড়ে পাখি। ব্যাধ সেটা চিতোরের এক বণিকের কাছে বিক্রি করলে হীরামণিকে নিয়ে বণিক চিতোরে চলে আসে। চিতোরের রাজা চিত্রসেনের মৃত্যুর পর রাজকুমার রত্নসেন সিংহাসনারোহণ করে। পণ্ডিত শুকপাখির সংবাদ জানতে পেরে উচ্চ দাম দিয়ে বণিকের কাছ থেকে রাজা রত্নসেন হীরামণিকে কেনে। রত্নসেন বিবাহিত; স্ত্রী নাগমতী। একদিন গোপনে নাগমতী শুককে জিজ্ঞেস করে পৃথিবীতে সর্ব সুন্দরী কে? শুক বলে, পদ্মাবতী। একথা শুনে নাগমতী ভাবে, যদি রত্নসেন একথা শোনে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ সিংহলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অতএব, হীরামণিকে মেরে ফেলাই ভালো। সে এক ধাত্রীকে নির্দেশ দেয় হীরামণিকে মেরে ফেলতে। কিন্তু ধাত্রী পাখি হত্যা না করে গোপনে রেখে দেয়। পরে রত্নসেন পাখির খোঁজ পায় এবং শুকের মুখে পদ্মাবতীর সব সংবাদ জানে। নাগমতীর আশঙ্কা অনুসারেই রত্নসেন সিংহল যাত্রা করে এবং শুকপাখির পরামর্শ মতো যোগী বেশে সেখানে পূজার ছলে মন্দিরে অপরূপা পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। অপরূপা পদ্মাবতীকে দেখেই রত্নসেন মূর্ছিত হয়। পদ্মাবতীও রত্নসেনকে দেখে প্রেম অনুভব করে এবং প্রেমনিদর্শন রেখে প্রাসাদে চলে যায়। রত্নসেন স্বাভাবিক হলে যেতে চায় গান্ধর্বের প্রাসাদে। কিন্তু কঠোর রাজা গান্ধর্ব যোগী বেশধারীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয় নি। শুকপাখি রত্নসেনের প্রেমপত্র পদ্মাবতীকে পৌঁছে দিলো এবং পদ্মাবতী এর উত্তরে জানাল যে, 'সিঁধ কেটে যেন রত্নসেন ভেতরে প্রবেশ করে। যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু সকাল হতেই ধরা পড়লো রত্নসেন। একজন যোগীর এ ধরনের আচরণে রাজা ক্রুদ্ধ হয় এবং রত্নসেনকে শূলে দেবার আদেশ দেন। মহাদেব এ সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে যোগীর প্রকৃত পরিচয় সিংহলরাজ গান্ধর্ব সেনকে প্রদান করেন। এ পরিচয় জেনে চিতোররাজ রত্নসেনকে মুক্ত করা হয় এবং যোগ্যপাত্র বিবেচনায় রত্নসেনের হাতে গান্ধর্ব সেন নিজকন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করে। রত্নসেন-পদ্মাবতী মিলনের দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম কালে শুকপাখি হীরামণি তাদের সঙ্গে ছিল। এ মিলন সম্পন্ন হলে পাখি সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। পদ্মাবতীর প্রথম খণ্ড এ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে : দীর্ঘদিন বিরহে থেকে এক পাখি পাঠায় রত্নসেনের প্রথম স্ত্রী নাগমতী। রত্নসেন পাখির কাছে পূর্বাপর শুনে দ্বিতীয় স্ত্রী পদ্মাবতীকে নিয়ে নিজরাজ্য চিতোরে আসে। তার রাজের রাজপণ্ডিত রাঘবচেতন চাতুরির আশ্রয় নিলে রাঘবকে চাকুরিচ্যুত করে রত্নসেন। রাঘব প্রতিশোধ নেবার আশায় দিল্লির বাদশাহ আলাউদ্দিনকে গিয়ে পদ্মাবতীর রূপের বিবরণ দিলে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে। বারো বছর যুদ্ধ চলে। রত্নসেন বন্দি হলেও তার দুই সহচরের কৌশলে মুক্ত হয়। এদিকে আর এক রাজা দেবপাল পদ্মাবতীকে পেতে চায়। তার সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধে দেবপাল নিহত ও রত্নসেন আহত হন। আহত রত্নসেন সাত দিন পর মারা যায়। এই শোকে তার দুই স্ত্রী নাগমতী ও পদ্মাবতীও চিতায় সহমরণত্ব বরণ করে। এ-সংবাদ আলাউদ্দিন জানত না। সে পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসে পদ্মাবতীর চিতাভস্ম দেখে। এখানেই কাব্যের শেষ। 'পদ্মাবতী'তে বাস্তবতা ও কাল্পনিকতার চমৎকার মিশেল আছে। লোকসাহিত্যের মটিফ হিসেবে হীরামণি বা শুকপাখির অবতারণা। এই শুকপাখি অবশ্য সুফিবাদের প্রভাবজাত। পাখিত্ব ছাড়া এর আর সবই মনুষ্য চরিত্রের মতো। পদ্মাবতীর রূপবর্ণনার অংশ আন্তরিক এবং কবির দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। রত্নসেন-পদ্মাবতীর বিয়ের অনুষ্ঠান সামাজিকতায় পরিপূর্ণ। উভয়ের দেহমিলন স্থূল হতে পারে, কিন্তু বর্ণনা বাস্তব, কাল্পনিক নয়। অতএব, বাস্তবতা ও অলৌকিকতার সংমিশ্রণে 'পদ্মাবতী' একটি চমৎকার কাব্য।

প্র : 'পদ্মাবতী'র রূপবর্ণনা অংশ থেকে সামান্য উল্লেখ কর।

উ : সুচারু সুরস অতি রাতুল অধর।
লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর॥
মাণিক্য প্রবাল অতি নীরস কর্কশ।
অধরের অমিয়া স্রবে এই মহারস॥
রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে।
তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে॥
আঁখিযুগ নীলোৎপল পুণ্য দরশনে।
কার ভাগ্য বশে বিধি সৃজিল যতনে॥
পুণ্য ফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইবে অমর॥
('পদ্মাবতীর রূপবর্ণনা' থেকে)

প্র : মর্সিয়া সাহিত্য কী?

উ : কারবালা ও ইসলামি বিয়োগান্তক কাহিনি নিয়ে মূলত মুসলমানদের রচিত সাহিত্যই মর্সিয়া সাহিত্য।

প্র : মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি কে?

উ : শেখ ফয়জুল্লাহ। তার গ্রন্থের নাম জয়নালের চৌতিশা (১৫৭০)

প্র : মুক্তল হোসেন কী?

উ : মুহম্মদ খান রচিত পারসি থেকে অনূদিত (১৬৪৫) বাংলা মর্সিয়া সাহিত্যগ্রন্থ।

প্র : কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শায়েরের নাম লেখ।

উ : ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোঃ দানেশ।

প্র : দোভাষী পুথি বা পুথিসাহিত্য কী?

উ : বাংলা সাহিত্যে ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধিকাল বলে। এ সময় হিন্দু কবিয়ালদের সঙ্গে মুসলিম শায়েরদের আবির্ভাব ঘটে। এই শায়েরেরা হিন্দি-উর্দু-বাংলা মিশ্রিত এক বিশেষ ধরনের ভাষায় (ব্রজবুলির উদ্ভব কি এভাবে কৃত্রিমতা নিয়েই ঘটে নি?) কবিগান করে। অবশ্য উত্তর ভারতীয় ও বিদেশি মুসলিম অধ্যুষিত নগর-বন্দর এলাকায় মুসলিম সমাজে এ ভাষা চর্চা হয়। কলকাতা-হাওড়া-হুগলির বন্দর এলাকায় এ ভাষারীতি মুসলিমদের প্রভাবিত করে। বিশুদ্ধ বাংলার প্রতি ঘৃণাবোধও বাঙালি মুসলিমদের নিজ ভাষায় উর্দু-আরবি-পারসি শব্দের অনুপ্রবেশে উৎসাহ দেয়। রচয়িতারা কাহিনি গ্রহণ করেন আরবি-পারসি-উর্দু থেকে। তবে এর সঙ্গে মিশে যায় প্রচলিত বাংলা উপকাহিনি বা লোককথা। আরবি-পারসি-উর্দু শব্দবহুল মিশ্র ভাষারীতির এই ধরনের গ্রন্থকে ইংরেজ লঙ্ সাহেব প্রথমে 'মুসলমানী বাংলা সাহিত্য' বলে অভিহিত করেন। সুকুমার সেন বলেছেন, 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য'। এগুলোকেই দোভাষী পুথি বা পুথিসাহিত্য বলা হয়। আঠার শতকের শেষার্ধে ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রমুখ এই মিশ্র ভাষারীতিতে কাব্য রচনা করেন। তবে একথা সত্য, মিশ্র ভাষারীতিতে কাব্য রচিত হলেও বাংলার মানুষ মুখে এই ভাষায় কথা বলতো না।

প্র : বটতলার পুথি কী?

উ : কলকাতার বটতলা নামক স্থানে অতি সস্তা কাগজ ও মুদ্রণে যে বই ছাপা হতো, যেগুলোর কাহিনি রুচির প্রশ্নে অনেক সময়ই নিম্নরুচির বলে বিবেচিত হতো, সেগুলোকে বটতলার পুথি বলা হয়। এই পুথিসমূহের ভাষা ছিল মিশ্র, পাঠক ছিল গ্রামের খুবই অল্পশিক্ষিত মানুষ।

প্র : মার্সিয়া সাহিত্যে একজন হিন্দু কবি ও তার কাব্যের নাম লিখ।

উ : রাধারমণ গোপ। গ্রন্থ : ইমামগণের কেচ্ছা, আফৎনামা

প্র : জঙ্গনামা কী?

উ : জঙ্গনামা হলো যুদ্ধকাব্য। মুসলিম বীরাত্মক কাহিনি নিয়ে রচিত মুসলিম কবিদের রচিত গ্রন্থ।

প্র : হেয়াত মামুদ কে ছিলেন?

উ : জঙ্গনামা ধারার কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২৩ খ্রিষ্টাব্দে পারসি কাব্যের অনুসরণে লেখেন জঙ্গানামা নামক গ্রন্থ।

প্র : 'নবীবংশ' কার রচনা?
উ : সৈয়দ সুলতান।
প্র : 'আমীর হামযা' কী?
উ : ফকির গরীবুল্লাহ রচিত জঙ্গনামা শ্রেণির কথা।

নাথসাহিত্য ও অন্যান্য

প্র : নাথসাহিত্য কী?
উ : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক নাথ-যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।
প্র : নাথ সাহিত্য প্রধান কয় ভাগে বিভক্ত, কী কী?
উ : দুই ভাগে। ১) মীন নাথ ও তার শিষ্য গোরক্ষনাথের কাহিনি ২) রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস। এই দুই কাহিনি অবলম্বন করেই নাথ যোগীদের অলৌকিক গল্প পল্লবিত হয়েছে।
প্র : গোরক্ষবিজয়ের পুথি কখন ও কোথায় পাওয়া যায়?
উ : অষ্টাদশ শতকে, বাংলায় সহদেব চক্রবর্তী ও রামাই পণ্ডিতের ধর্ম পুরাণে বা অনিল পুরাণে।
প্র : গোপীচন্দ্র কাহিনির প্রথম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়?
উ : জায়সীর পদুমাবতে। এ বিষয়ে প্রথম বাংলা গ্রন্থ নেপালে রচিত সপ্তদশ শতাব্দীর নাটক 'গোপীচন্দ্র নাটক'।
প্র : 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কার রচনা?
উ : সুকুর মামুদের।

কবিওয়ালা ও শায়ের

প্র : কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন?
উ : আঠার শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে কলকাতার হিন্দু সমাজে কবিওয়ালা ও মুসলিম সমাজে শায়েরের উদ্ভব ঘটে।
প্র : কবিওয়ালাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম লিখ।
উ : গৌজলা গুই, হরু ঠাকুর, এন্টনি ফিরিঙ্গি।

মৈমনসিংহ-গীতিকা

প্র : বাংলাদেশে গীতিকা সাহিত্যে কয় ধরনের গীতিকা প্রচলিত? কী কী?
উ : তিন ধরনের। নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা কোন অঞ্চলের গীতিকাব্য?
উ : বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের।
প্র : কার আগ্রহে ও কার পৃষ্ঠপোষকতায় এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করা হয়?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়।
প্র : কে এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন?
উ : চন্দ্রকুমার দে।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা বিশ্বের কতগুলো ভাষায় মুদ্রিত হয়?
উ : ২৩টি ভাষায়।
প্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা কার সম্পাদনায় কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কী?
উ : পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চল বলে পরিচিত, বর্তমানে সুসং (সুষ্‌গ) দুর্গাপুর, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ এলাকায় লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত কবিতা বা গীতসমূহের সংকলন। অবশ্য এই গীতের কোনো কোনোটির কাহিনি পার্শ্ববর্তী (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলা) বানিয়াচঙ্গ কেন্দ্রিক। উল্লেখ্য, বানিয়াচঙ্গ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্রাম।
প্র : ময়মনসিংহের এই গীতগুলো সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ রচয়িতাও বটেন। অধ্যাপক সেন এই গীত ও পালাগুলো সংগ্রহের জন্য স্থানীয় উদ্যোগী যুবক চন্দ্রকুমার দে-কে নিয়োজিত করেন। চন্দ্রই প্রথমে প্রাপ্ত পালাগুলি সংগ্রহ করেন। তখন কথা রেকর্ডের ব্যবস্থা ছিল না। তাই মুখে মুখে প্রচলিত গীত ও পালাগুলি অনেক ধৈর্য নিয়ে পল্লির সাধারণ মানুষের মুখ থেকে তিনি লিখে লিখে সংগ্রহ করেন।
প্র : চন্দ্রকুমার দে কে ছিলেন?
উ : তিনি গ্রামীণ পাঠশালায় সামান্য বিদ্যা অর্জন করেন। মাসিক এক টাকা বেতনে মুদির দোকানে কাজ করতেন। পরে মাসিক দুটাকা বেতনে গ্রামে তহশিলদারি করেন। তখনই গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে তার মেশার সুযোগ হয়। তাদের গীত ও পালা সম্পর্কে চন্দ্রর আগ্রহ জন্মে। চন্দ্রকুমার ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে নেত্রকোণার আইথর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। (চন্দ্রকুমার দে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের 'চন্দ্রকুমার দে' অংশ দ্রষ্টব্য।)
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কে সম্পাদনা করেন এবং তা কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালা ও রূপকথাসমূহ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সম্পাদনা করে একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেন অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
প্র : এর দু-একটি পালা প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়?
উ : কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সৌরভ' পত্রিকায়। পালাসংগ্রাহক ছিলেন : চন্দ্রকুমার দে।
প্র : ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কয়েকটি পালা ও রূপকথার নাম লেখ।
উ : ১. মহুয়া : দ্বিজ কানাই প্রণীত
২. মলুয়া : রচয়িতা অজ্ঞাত (কারো অনুমান চন্দ্রাবতীর লেখা)
৩. চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র : নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত
৪. কমলা : দ্বিজ ঈশান প্রণীত
৫. দস্যু কেনারাম : চন্দ্রাবতী প্রণীত
৬. দেওয়ানা মদিনা : মনসুর বয়াতি প্রণীত
৭. বিদ্যাসুন্দর : কবিকঙ্ক প্রণীত
৮. রামায়ণ : চন্দ্রাবতী প্রণীত
৯. রূপবতী : কবির নাম অজ্ঞাত
১০. কাজলরেখা : ওই
১১. দেওয়ান ভাবনা : ওই
১২. কঙ্ক ও লীলা : রচয়িতা চার জন : দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বেনিয়া।
প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মূল্য নির্ধারণ কর।
উ : এই সংগ্রহের প্রতিটি পালাই অমূল্য। কথিত শিক্ষিত সমাজের বাইরে সাধারণ মানুষ সাধারণ নীতিকথার মানদণ্ডে সরল ভাষা প্রয়োগ করে এগুলো রচনা ও চর্চা করেছে। এখানে কোনো দেব-দেবী তুষ্টি বা আল্লা-খোদার মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টা নেই। হিন্দুদের বল্লাল সেনীয় কুপ্রথা মুক্ত এ সমাজ। অন্যদিকে মুসলিমদের কাঠমোল্লার ফতোয়াবাজি থেকেও দূরে। বৌদ্ধ কর্মবাদ, হিন্দুর নিষ্ঠা, মুসলিম একাগ্রতার সমন্বয় 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সমাজজীবনে দেখা যায়। এ সমাজের মেয়েরা যথেষ্ট মুক্ত ও স্বাধীন ছিল। কাউকে বিয়ে না করে আজীবন কুমারীব্রত পালনের অধিকার মেয়েরা ভোগ করত। মেয়েদের স্বাধীনভাবে বিচরণের অধিকার ছিল বলে পালাগুলোতে হিন্দু ছেলে মুসলিম মেয়ে অথবা হিন্দু মেয়ে মুসলিম ছেলের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য সমাজ এ ধরনের বিয়েকে সমর্থন করে নি। এই পালাগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কোনো সংঘাতের পরিচয় নেই। বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন এগুলো। এর ভালো চরিত্রগুলো এবং মন্দ চরিত্রগুলো সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে এসেছে। তাছাড়া এখানে প্রাচীন হিন্দু ও আগত মুসলিম (পারসি / উর্দু) সংস্কৃতির চমৎকার মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এর ভাষা সহজ-সরল, কথা শব্দ ও রীতি অনুসারী। গ্রামের মানুষের প্রাণের ভাষায় মনের কথা 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় ফুটে উঠেছে। তাই বাংলা সাহিত্যের বিচারে এর মূল্য অপরিসীম।
প্র : মহুয়া পালার পরিচয় দাও।
উ : নমশূদ্রদের ব্রাহ্মণ কবি দ্বিজ কানাই ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে মহুয়া পালা রচনা করেন বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণা। এই পালার কাহিনির সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত প্রেমবঞ্চনার বেদনার সাদৃশ্য রয়েছে।

কাহিনি : বেদে সর্দার হুমরা ডাকাত ছিল। তার ছোট ভাই মাইন্‌কা। কাঞ্চনপুর গ্রামের ব্রাহ্মণের ছয়মাসের শিশুকন্যাকে হুমরা চুরি করে পালিয়ে যায় এবং নিজ কন্যার ন্যায় বড় করে। এই কন্যাই 'মহুয়া'। ভবঘুরে বেদে দল বামনকান্দা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ওই গ্রামের জমিদার নদের চাঁদের সভায় খেলা দেখাতে গেলে মহুয়া নদের চাঁদের চোখে পড়ে। মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাঁদ বেদে দলকে গ্রামে থাকার জায়গা ও চাষের জমি দেয়। এক সময় মহুয়া ও নদের চাঁদ পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে। তাদের এ সম্পর্ক জানত মহুয়ার সখী পালং। এক সময় হুমরা বেদে এ সম্পর্কের কথা জানতে পারে এবং এ সম্পর্ক অস্বীকার করে। কেননা সে তার পালিত পুত্র সুজনের সঙ্গে মহুয়ার বিয়ের কথা ভেবেছিল। তাছাড়া হুমরার ভয় ছিল যে, নদের চাঁদকে বিয়ে করে মহুয়া যদি অন্যত্র চলে যায় তাহলে মহুয়া নাচ-গান করে যে রোজগার করে তা সে হারাবে। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশংকা সে অনুভব করে। তাই রাতের অন্ধকারে হুমরা তার দল নিয়ে বামনকান্দা ত্যাগ করে। ওদিকে নদের চাঁদ মহুয়ার খোঁজে দেশ ত্যাগ করে। এক সময় উভয়ের পুনর্মিলন হয়। হুমরা মহুয়ার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মহুয়া তাকে হত্যা না করে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পথে নদী পারাপারের জন্য তারা এক সাধু সওদাগরের নৌকায় ওঠে। সওদাগরের চক্রান্তে তার লোকেরা নদের চাঁদকে নদীতে ফেলে দেয়। সওদাগর মহুয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। তখন মহুয়া বুদ্ধি করে তার মাথায় বাঁধা পাহাড়ি তক্ষকের বিষ পানের সাথে মিশিয়ে সাধুসহ অন্যদের খাওয়ায় এবং নৌকা ডুবিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করে। নদের চাঁদকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় এক ভাঙ্গা মন্দিরে তাকে অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। সেখানে এক সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে মহুয়া তার কাছে আশ্রয় চায়। কিন্তু সে সন্ন্যাসীও মহুয়াকে পেতে উদ্‌গ্রীব হয়। তখন মহুয়া সন্ন্যাসীকে শর্ত দেয় সন্ন্যাসী যদি নদের চাঁদকে সুস্থ করতে পারে তবে তার প্রস্তাবে মহুয়া রাজি হবে। একদিন নদের চাঁদকে নিয়ে মহুয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় থেকে পালায়। বনের মধ্যে নদীর তীরে মহুয়া ও নদের চাঁদ ঘর বাঁধে। একদিন বনের মধ্যে বাঁশির ধ্বনি শুনে মহুয়া বুঝতে পারে তার সখী পালং ধ্বনি বাজিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে যে বেদের দল এ বনে পৌঁছে গেছে। মহুয়াকে খুঁজে পেয়ে হুমরা বেদে তার হাতে বিষলক্ষের ছুরি তুলে দেয় নদের চাঁদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু মহুয়া নদের চাঁদকে হত্যা না করে নিজে আত্মঘাতী হয়। আর নদের চাঁদকে বেদের দল হত্যা করে। দুজনকে এক সঙ্গে মাটিচাপা দেয়া হয়।

প্র : মহুয়া পালার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : ১. ছয় মাসের শিশু কইন্যা পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী।
২. লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।

প্র : মহুয়ার পালার প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেদে, সাধু।

প্র : 'মলুয়া' পালার পরিচয় দাও।

উ : মলুয়া পালাটির রচয়িতা কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এর সূচনাতে মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর একটি বন্দনা আছে। তাতে অনেকে মনে করেন যে, পালাটির রচয়িতা চন্দ্রাবতী।

কাহিনি : সাত ভাইয়ের এক বোন মলুয়া। ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখে চান্দ বিনোদকে। সে কুড়া (এক প্রকার প্রাণী) শিকার করে। হালুয়া দাস হীরা ধরে কন্যা মলুয়া। মায়ের নাম অসমা। চান্দ সুদর্শন, বংশও ভালো, কিন্তু জমি নেই, দরিদ্র। তাই বিয়েতে মত দেয় না হীরা ধর। বিদেশে গেলে চান্দের উপর দেবতা তুষ্ট হয় এবং তাদের বরে তার ধন হয়। এবার বিয়ে হয়। বিয়ের পরে কাজির কুদৃষ্টি পড়ে মলুয়ার উপর। নেতাই কুটুনি নামে এক প্রৌঢ়াকে দিয়ে মলুয়াকে নিকাহর প্রস্তাব পাঠায় সে। ক্ষমতার ভয় ও ধনের লোভ দেখায়। আরো অর্থ উপার্জনের জন্য চান্দ বিনোদ আবার বিদেশে যায়। তখন অর্থ কষ্ট দেখা দেয় মলুয়ার। সে সময়ও নেতাই মলুয়াকে কুপ্রস্তাব দেয় এবং যথারীতি প্রত্যাখ্যাত হয়। বিনোদ দেশে ফেরে। কাজি এবার প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং বিনোদকে দেশত্যাগ করায়। কাজি মলুয়াকে তুলে নিয়ে যায় দেওয়ানের বাড়ি। দেওয়ানও দেখেই মলুয়াকে পছন্দ করে এবং পেতে চায়। কৌশল করে মলুয়া দেওয়ানকে দিয়ে কাজিকে শাস্তি দেওয়ায় এবং নিজের পঞ্চভাইকে চিঠি লেখে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। উদ্ধারের পর সতীত্বের জিজ্ঞাসায় মলুয়া নিকটাত্মীয়দের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। পরে বিনোদ আত্মীয়দের চাপে অন্যত্র বিয়ে করে এবং মলুয়া ওই সংসারে চাকরানী হয়ে থাকে। শিকারে গেলে বিনোদকে কালসাপে দংশন করে। সেই বিষ মলুয়ার সতীত্বের গুণে নেমে যাওয়ায় সমাজ মলুয়াকে ঘরে তোলার পক্ষে বলে। কিন্তু বিনোদের কতিপয় আত্মীয় মলুয়াকে অসতীই বলে। এই দুঃখে সবার সামনে মলুয়া নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করে।

প্র : 'কাজলরেখা'র কাহিনি সংক্ষেপ লেখ।

উ : কাজলরেখা কোনো পালা নয়। এটা পদ্য ও গল্পাকারে বর্ণিত রূপকথা। এর রচয়িতা কে তা জানা যায় না।

কাহিনি : ভটিয়াল মুল্লুকের এক সওদাগরের নাম ধনেশ্বর। তার এক কন্যা কাজলরেখা ও পুত্র রত্নেশ্বর। বাজি খেলে ধনেশ্বর হতদরিদ্রে পরিণত হয়। এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি প্রীত হয়ে ধনেশ্বরকে একটি আংটি ও একটি ধর্মমতী শুকপাখি দান করে। শুকপাখির পরামর্শে সেই আংটি বিক্রি করে বিক্রিত টাকায় পুনরায় বাণিজ্য করে ধনেশ্বর পূর্বধন আবার ফিরে পায়। শুকপাখি আরো বলে যে, তার কন্যার বিয়ে হবে মৃত পুরুষের সঙ্গে। তাই কাজলরেখাকে বনবাসে রেখে আসতে হবে। শুকপাখির পরামর্শে ধনেশ্বর কন্যা কাজলকে নিয়ে বনে যায়। সেখানে এক ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়িতে বসিয়ে রেখে ধনেশ্বর কন্যার জন্য পানীয় জল আনতে গেল। এমন সময় কৌতূহলবশত কাজল মন্দিরে যেতেই মন্দিরের দরোজা বন্ধ হয়ে যায়। ধনেশ্বর ফিরে এসে সেই কপাট খুলতে পারে না। সেই মন্দিরে ছিল এক মৃত রাজপুত্র। ভেতর থেকে কাজল পিতাকে চিৎকার করে সব বললে ধনেশ্বর শুকপাখির কথার যথার্থতা পায়। পিতা কন্যা কাজলকে বলে, ওই মৃত রাজপুত্রই তোমার স্বামী। ধনেশ্বর চলে এল। ধনেশ্বর চলে যাবার পর আবার সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে এবং সন্ন্যাসী কাজলকে বলে গেল, তোমার স্বামীর গায়ে সুই ফোটানো। এগুলো তুমি তুলে ফেল। এই পাতার রস দিয়ে চোখের সুই দুটো তুলবে। তাহলে তোমার স্বামী আবার বেঁচে উঠবে। আর তুমি তোমার নিজের পরিচয় নিজের মুখে দেবে না, ধর্মমতী শুকপাখি বলে দেবে তোমার পরিচয়। নিজে দিতে গেলে তুমি বিধবা হবে। সন্ন্যাসীর কথামতো সাত দিন ধরে অনবরত কাজলরেখা কুমারের গায়ের সুই তুলে শেষ করে। স্নান করে পবিত্র হয়ে চোখের সুই দুটো তুলবে ভেবে কাজল স্নানে যায়। পুকুর পাড়ে নিজ হাতের কঙ্কণ দিয়ে কাজলরেখা এক দরিদ্রের ১৩/১৪ বছরের কন্যাকে দাসী হিসেবে ক্রয় করে। দাসীকে কাজলরেখা পূর্বাপর ঘটনা বর্ণনা করে বলে, সে যেন মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করে। স্নান সমাপনান্তে সে মন্দিরে আসছে। কঙ্কণদাসী মন্দিরে এসেই কুমারের চোখে ওই পাতার রস দিয়ে চোখের সুই তুলে নেয়। এতে কুমার জীবন ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কঙ্কণদাসীকে বিয়ে করে। স্নান সমাপনান্তে ফিরে এলে দাসী কুমারকে বলে যে, কাজলরেখাই তার কঙ্কণদাসী। সন্ন্যাসীর কথা ভেবে কাজল কোনো প্রতিবাদ করে না, নিজের পরিচয়ও দেয় না। প্রাসাদে গিয়ে নকল রানীর কাজকর্মে নানা অসংগতি এবং কাজলরেখার কাজকর্মে সুচারুত্ব দেখে রাজকুমারের সন্দেহ হয়। নকল রানী এই সন্দেহ আঁচ করতে পেরে রাজার এক বন্ধুর সঙ্গে কাজলরেখার মিথ্যে নিশিযাপনের নাটক তৈরি করে। এতে রাজকুমার কাজলরেখাকে সন্দেহ করে ও দ্বীপে নির্বাসন দেয়। সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল কাজলরেখার পিতা ধনেশ্বরের পুত্র রত্নেশ্বর অর্থাৎ কাজলের বড় ভাই। ধনেশ্বরের মৃত্যু হলে রত্নেশ্বর পিতার মতো বাণিজ্যে প্রসার ঘটায়।

রত্নেশ্বর সুন্দরী যুবতী কাজলরেখাকে জাহাজে তুলে নিয়ে যায়। আসলে রত্নেশ্বর ও কাজলরেখা দুই ভাইবোন। খুব ছোটবেলা তারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে প্রান্তরযন্ত্র হয়ে কেউ কাউকে চিনতে পারে নি। এদিকে কাজলরেখাকে দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে কাজলের প্রকৃত স্বামী সেই রাজকুমার বিবাগীপ্রায়। পরিচয় না জেনে রত্নেশ্বর ঘোষণা করে যে, সে এক অপূর্ব সুন্দরী সমুদ্রকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তবে বিয়ের আগে এই কন্যার বংশ পরিচয় ধর্মমতী শুকপাখি সবার সম্মুখে বর্ণনা করবে। এই সংবাদ প্রচারিত হলে বিভিন্ন স্থানের রাজপুত্র ও ধনাঢ্যরা রত্নেশ্বরের প্রাসাদে সমবেত হয়। সেই সমাবেশে শুকপাখি কাজলরেখার জীবনেতিহাস বর্ণনা করলে ভাইবোনের পরিচয় প্রকাশ পায়। সমাবেশে কাজলরেখার প্রকৃত স্বামী সেই সূচবিদ্ধ রাজপুত্রও উপস্থিত ছিল। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাজলরেখাকে বধূর মর্যাদায় প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শুকপাখি স্বর্গে চলে যায়। প্রকৃত কঙ্কণদাসীর জীবন্ত সমাধি হয়।

প্র : 'দেওয়ানা মদিনা' পালা সম্পর্কে লেখ।

উ : বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার অধীন বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচঙের দেওয়ানদের সম্পর্কে এ পালা। লেখক মনসুর বয়াতি। নাম ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে কবিত্বশালী এবং করুণরসসৃজনে পটু ছিলেন সে প্রমাণ এখানে আছে।

কাহিনি : বানিয়াচঙের সোনাফর দেওয়ানের দুই পুত্র আলাল আর দুলাল। হঠাৎ তার স্ত্রী মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং স্বামীকে অনুরোধ করে তার মৃত্যুর পর দেওয়ান যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে। কেননা সৎমা তার সন্তানদের কখনো আপন ভাবতে পারবে না। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসার রক্ষার জন্য দেওয়ান আবার বিয়ে করে। সৎমা এসে ভালো মানুষীর অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নেয়। ষড়যন্ত্র করে সৎমা আলাল-দুলালকে মেলায় পাঠায় এবং জল্লাদকে বলে ওদের হত্যা করতে পারলে জল্লাদ ২০ পুড়া জমি পাবে। আলাল-দুলাল একে অন্যের জীবনভিক্ষা চায় জল্লাদের কাছে। জল্লাদ দুভাইকে সাধু সওদাগরের কাছে তুলে দেয়। সাধু কাজলকান্দার ইরাধর ব্যাপারীর কাছে দুভাইকে বিক্রি করে দেয়। তারা সেখানে রাখালের কাজ করে। একটি গাছের নিচে আলালকে পেয়ে দেওয়ান সেকেন্দার আলালকে নিয়ে যায়। আলাল দেওয়ানের বাড়ি কাজ করে কিন্তু মাইনে নেয় না। সে জানায় একেবারে মাইনে নেবে। ১২ বছর পর আলাল মাইনে হিসেবে চায় বানিয়াচং শহরে বাড়ি করার জন্য ৫০০ মানুষ আর ২০০ ফৌজ। সেকেন্দার রাজি হয়। আলাল বানিয়াচং বাড়ি করতে গেলে সৎমার পক্ষ থেকে বাধা আসে কিন্তু আলাল নিজের অধিকারের কথা বলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওদিকে পুত্রশোকে সোনাফর দেওয়ান অর্ধমৃত। দ্বিতীয়পক্ষে তার এক পুত্র হয় এবং সেই পুত্রই দেওয়ান হয়। সৎমার রাজত্বে সংসারে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হয়। পিতার সঙ্গে আলালের মিলন হয়। এরপর আলাল দুলালের সন্ধানে বের হয়। এক মাঠে রাখালদের মুখে নিজেদের জীবন বৃত্তান্ত শুনে সেই সূত্রে আলাল দুলালকে খুঁজে পায়। আলাল দুলালকে দেশে ফিরিয়ে নিতে চাইলে দুলাল জানায় ইরাধর ব্যাপারীর মেয়ে মদিনাকে সে বিয়ে করেছে এবং সুরুজ নামে তাদের এক পুত্র সন্তান আছে। তখন দুলালকে আলাল পরামর্শ দেয় মদিনাকে তালাক দিতে। কেননা সেকেন্দার দেওয়ানের দুকন্যা মমিনা, আমিনাকে দুভাই বিয়ে করবে। দেওয়ানির লোভে দুলাল মদিনার ভাইয়ের কাছে তালাকনামা দিয়ে আলালের সঙ্গে দেশে চলে যায় এবং দেশে গিয়ে মমিনাকে আলাল ও আমিনাকে দুলাল বিয়ে করে। মদিনা সেই তালাকনামা দেখে বিশ্বাস করে না। সে স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকে। অনেকদিন হয়ে গেলেও স্বামী না আসায় ভাই ও পুত্র সুরুজকে সে দুলালের কাছে পাঠায়। দুলাল শ্যালক ও পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে আর কখনো যেন তারা না আসে। পুত্রের মুখে এ কথা শুনে মদিনা উন্মাদিনীর মতো হয়ে এক সময় মৃত্যুবরণ করে। ওদিকে পুত্রকে এভাবে তাড়িয়ে দিয়ে দুলাল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। সে কাউকে না জানিয়ে কাজলকান্দায় মদিনার কাছে ক্ষমা চাইতে আসে। কিন্তু মদিনার মৃত্যুতে সে সংসার বিবাগী হয়ে ফকিরি জীবন বেছে নেয়। মদিনার কবরের উপর একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে সেখানেই দুলাল থাকে।

প্র : 'দেওয়ানা মদিনা' কোন বিষয় নিয়ে রচিত?

উ : বানিয়াচঙের দেওয়ান সোনাফরের পুত্র আলাল ও দুলালের বিচিত্র জীবনকাহিনি এবং দুলাল ও গৃহস্থকন্যা মদিনার প্রেম কাহিনি এর মূল বিষয়।

প্র : 'দেওয়ানা মদিনা'র প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : আলাল, দুলাল, মদিনা, সোনার।

প্র : 'দেওয়ানা মদিনা'র পালাকে আর কোন নামে অভিহিত করা হয়?

উ : আলাল-দুলালের পালা।

প্র : 'কঙ্ক ও লীলা' পালার পরিচয় দাও এবং কাহিনি লেখ।

উ : 'কঙ্ক ও লীলা' পালার রচয়িতা একজন নয়। দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বেনিয়া, নয়ানচাঁদ ঘোষ এই চারজন পালাটির রচয়িতা। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র পালাগুলি যে লোকমুখে এবং একাধিক কবির দ্বারা পরিবর্তিত, নবসৃজিত ও নতুনত্ব পেয়েছে এর বড় প্রমাণ 'কঙ্ক ও লীলা' পালা। বন্দনা অংশ এবং শেষের 'গায়েনের নিবেদন' অংশ বাদে এই পালায় ২৩টি পর্ব আছে। পর্বগুলো পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। যথা : ১. কঙ্কের জন্ম ও পিতামাতার মৃত্যু; ২. মুরারি চণ্ডালের গৃহে কঙ্ক; ৩. গর্গের আলয়ে; ৪. বিপদের উপর বিপদ; ৫. লীলার যৌবনে পদার্পণ; ৬. যবন পিরের আগমন; ৭. পির ও কঙ্ক; ৮. গোপন দীক্ষা; ৯. সত্যপিরের পাঁচালি; ১০. কঙ্ককে জাতিতে তোলা; ১১. কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্র; ১২. গর্গের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের সঙ্কল্প; ১৩. সুরভির মৃত্যু; ১৪. লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ; ১৫. গর্গের ধন্না দেওয়া ও দৈববাণী; ১৬. বিচিত্র-মাধবের গমন; ১৭. লীলার কষ্ট; ১৮. যান্মাসিকী গীতি; ১৯. শোক-গাথা; ২০. পুনরায় অনুসন্ধান; ২১. জনরব; ২২. মৃত্যুশয্যায় লীলা; ২৩. শেষ দৃশ্য।

কাহিনি : বিপ্রপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ গুণরাজ ও তার স্ত্রী বসুমতীর পুত্র কঙ্ক। জন্মের ছয় মাসের মধ্যে কঙ্কের মাতা-পিতার মৃত্যু হয়। তাই প্রতিবেশীরা শিশু কঙ্ককে 'খাকুরা' (যে মানুষ খায়) বলে ঘৃণা করে। দরিদ্র মুরারি চণ্ডাল ও তার স্ত্রী কৌশল্যা কঙ্ককে লালন-পালনের জন্য গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যে সামান্য রোগে উভয়ে মারা যায়। শিশু কঙ্কের দুঃখ দেখে ব্রাহ্মণ গর্গ তাকে ঘরে আনে। এতে তার স্ত্রী গায়ত্রী খুব খুশি হয়। কারণ তাদের একটি কন্যা সন্তান আছে, নাম লীলা; কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু অল্প দিন পরে গায়ত্রীর মৃত্যু হয়। গর্গের বাড়িতে তার শিশুকন্যা লীলার সঙ্গে কঙ্ক বেড়ে ওঠে। কঙ্ক মাঠে গরু রাখে, বাঁশি বাজায়, নিজে গীত তৈরি করতে পারে, সর্বোপরি সে সুদর্শন ও বুদ্ধিমান।

অন্যদিকে লীলার (পালাতে লীলার অসাধারণ রূপবর্ণনা আছে) সৌন্দর্য ও বুদ্ধিও আকর্ষণী। তারা পরস্পরের প্রতি অনুরাগ পোষণ করে; যদিও গর্গ ভাবে যে তারা ভাইবোনের মতো বড় হচ্ছে। এমন সময় বিপ্রপুরে সাকরেদ বা শিষ্য নিয়ে এক পির স্থান গ্রহণ করে। পির কঙ্কের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পায় এবং মনে করে যে, যদি কঙ্ক তার দলে যোগ দেয় তাহলে তার প্রসার খুব দ্রুত হবে। পির সফলও হয়। কঙ্ক গোপনে পিরের কাছে দীক্ষিত হয় এবং কবিত্বগুণ আছে বিধায় সত্যপিরের পাঁচালি লেখে। সত্যপিরের ভক্ত যেহেতু হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ, সেহেতু কঙ্কের নামের প্রসার হয় খুব দ্রুত। পিতৃপ্রতিম গর্গ কঙ্ককে ত্যাগ না করে পুনরায় জাতিতে তোলে। এতে রুষ্ট হয় গোড়া প্রতিবেশীরা। তারা কঙ্কের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং গর্গকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে কঙ্ক তার কন্যা লীলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়েছে। এতে গর্গ ক্ষিপ্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, কঙ্ক ও লীলাকে হত্যা করে সে নিজে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরবে। কঙ্কের খাবারে গর্গ কালজর (কালকূট বিষ) প্রয়োগ করলেও লীলার বুদ্ধিমত্তায় কঙ্কের মৃত্যু হয় না; [illegible] গরু সুরভি। [illegible]

জন্মের পরে যে, পর্ণ তাকে সংশোধন করে তখন পর্ণ সেনগুপ্তই হয়। পর্ণ ঐরবতীতে জন্মের পরে যে তার জন্মা লীলা ও তন্ত্র মিলনে। তখন পর্ণ তন্ত্রকে অন্যত্রপে ব্যস্ত হয়। বিভিন্নমনস্ক নন্দের এক শিল্পকে সে ভোগ করে তন্ত্রের অন্যত্রপে। অনেক দূরের বিভিন্ন তন্ত্রের মেলা পাই না। অবশেষে সোভদুখে হাটে যায় এই কথা : 'দুর্বিষহ সংসারে তন্ত্র সহিবার তরে।' বিভিন্নমনস্ক এই সংসারে পর্ণ ও লীলাকে জন্মদান লীলা মেহভাগ করে। কিন্তু এরপর হয়ং একদিন তন্ত্র ছিন্নে আসে এবং লীলার মৃত্যু সংবাদ পাই। শোকে মোহমান পিতা পর্ণ তার তন্ত্র অবশেষে উজার একত্র সংসার ত্যাগ করে লীলাচলে গমন করে। এই ট্রাজিক পরিণতির মধ্য দিয়েই 'তন্ত্র ও লীলা' পালা সমাপ্ত হয়েছে।

প্রধান সাহিত্যিক ও তাঁদের কর্মের পরিচয়

আবদুল হাকিম

প্র : আবদুল হাকিম কে ছিলেন?
উ : সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলিম কবি। তিনি ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেন ১৭১০-এ। সম্ভবতঃ সুবর্ণগ্রাম তার জন্ম। পিতা শাহ রাজ্জাক।
প্র : আবদুল হাকিমের কয়টি কাব্য পাওয়া গেছে?
উ : ৩টি। ইউসুফ জোলেখা, নসরনামা, নুরের নজলিশ; সত্যনারায়ণ সত্যপীরের পুথি, হাকিমের পুথি।
প্র : মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে রচিত প্রবাদতুল্য তাঁর পঙ্‌ক্তি দুটি কি?
উ : যে সব কাফের জন্ম হিন্দুস্থানে।
সে সব কাফের জন্ম নির্দয় না জানি।
প্র : কোন কাব্যে তিনি এই প্রবাদতুল্য পঙ্‌ক্তি দুটো লিখেন?
উ : নসরনামা।
প্র : তিনি কেন এ ধরনের পঙ্‌ক্তি লেখেন?
উ : মধ্যযুগে মুসলমানগণ বাংলাকে নিজেদের ভাষা মনে না করে পারসি-আরবি-উর্দুকে আপন ভাষা মনে করতো। এই পরভাষাপ্রীতিকে অপসারিত করার জন্য আবদুল হাকিম এ ধরনের পঙ্‌ক্তি লেখেন।

আলাওল

প্র : আলাওলের জন্মসন কবে?
উ : (আনুমানিক) ১৬০৭।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : জোবরা গ্রাম, হাটহাজারি, চট্টগ্রাম মতান্তরে ফতেহাবাদ পরগনা, ফরিদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও পণ্ডিত। বাংলা, সংস্কৃত, পার্সি, আরবি ভাষা জানতেন।
প্র : তিনি আরাকানে কী পেশায় নিযুক্ত ছিলেন?
উ : আরাকান-রাজ উমাদারের রাজসভার প্রধান অমাত্য।
প্র : আলাওলের পিতা কী করতেন?
উ : আলাওলের পিতা ফতেহাবাদের মজলিস কুতুবের মন্ত্রী ছিলেন।
প্র : আলাওল তাঁর কর্মজীবন কোথায় শুরু করেন?
উ : আলাওল মগরাজের সেনাবাহিনীতে চাকরি নেন।
প্র : আলাওলের সময় আরাকানের রাজা কে ছিলেন?
উ : রাজা শ্রী সুধর্মা।
প্র : আরাকানে কে আলাওলকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন?
উ : প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুর।
প্র : এ পর্যন্ত আলাওলের কয়টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়?
উ : ৭টি।
প্র : গ্রন্থগুলির নাম কী?
উ : পদ্মাবতী (১৬৪৮), সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৬৯), হপ্ত পয়কর (১৬৬৫), সিকান্দরনামা (১৬৭২), তোহফা (১৬৬৪) বা তত্ত্বোপদেশ, রাগতালনামা এবং দৌলত কাজী অসমাপ্ত গ্রন্থ সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী (১৬৫৯)।
প্র : 'হপ্তপয়কর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'হপ্তপয়কর' সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনো এক সময়ের রচনা। মগরাজ রাজসভায় সৈয়দ আলাওল এই কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ১৬৬৫ এ রচনাকাল। প্রসিদ্ধ কবি নিজামি গঞ্জবী ফারসি ভাষায় বর্তমান কাব্য রচনা করে রাজপুত্র বহরাম সাতরাজি ধরে যা কাহিনি শুনিয়ে সাতটি গল্প শোনান তার সংকলন। পারসি ও বাংলা কাব্যসাহিত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
প্র : 'পদ্মাবতী' কোন গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?
উ : কবি মালিক মুহম্মদ জায়সির হিন্দিকাব্য পদ্মাবৎ অবলম্বনে।
প্র : পদ্মাবতী গ্রন্থের কাহিনি-সংক্ষেপ জানার (পদ্মাবতী গ্রন্থের কাহিনি-সংক্ষেপ জানার জন্য দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের 'মুসলিম-রচিত সাহিত্য' অংশ।)
প্র : পদ্মাবতীকে আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে কেন?
উ : একাধিক কারণে–
১ নামকরণ গিতা
২ কবির বৈদগ্ধ্য রূপ
৩ কাব্যের গভীরতা
৪. ভাষা ও অলংকার প্রয়োগে বুদ্ধিদীপ্ততার পরিচয় পাওয়া যায় বলে।
প্র : 'বক্ত উৎপল সাজে জলান্তরে বৈসে।
চাদুস বাদুল হৈল অধর পরশে।'
কোন-কাব্যে আছে?
উ : আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের রূপ বর্ণনা করতে।
প্র : 'পদ্মাবতী' কোন ধরনের রচনা?
উ : ইতিহাসাশ্রিত রোমান্টিক প্রেমকাব্য।
প্র : সিকান্দরনামা গ্রন্থটি কার রচনা? উৎস কী?
উ : আলাওলের রচনা। উৎ–নিজামি সমরকন্দের ফারসি কাব্য ইসকান্দার-নামার সরল অনুবাদ।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সনে?
উ : ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ।

এন্টনি ফিরিঙ্গি

প্র : এন্টনি ফিরিঙ্গি কে ছিলেন?
উ : অষ্টাদশ শতকের বাংলা ভাষার কবিয়াল।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী? কোন জাতি?
উ : এন্টনি হেনম্যান। তিনি পর্তুগিজ।
প্র : তাঁর সম্পর্কে লেখ।
উ : তিনি খ্রিষ্টান হলেও বাঙালি কালী সাধক হিন্দুর মত জীবনযাপন করতেন। হিন্দু বিধবাকে বিয়ে এবং কলকাতার বউবাজারে ফিরিঙ্গি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
প্র : তাঁর বিশেষত্ব কী?
উ : তিনি একাধারে বাংলা কবিগানের পাইয়ে ও গান বাঁধতে পারতেন তাঁর একটি বিখ্যাত গান আমি ভজন সাধন জানি নে মা
নিতের ভিখারি
তাই দয়া করে কৃপা করে
দে পদ তরণী।
প্র : তাঁর জন্ম-মৃত্যু কোন সালে?
উ : তাঁর জন্মসন জানা যায় না, মৃত্যু ১৮০৯ খ্রি.।

উইলিয়াম কেরি, সাহেব

প্র : উইলিয়াম কেরি কে জন্ম গ্রহণ করে?
উ : ১৭.৯. ১৭৬১
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : ইংল্যান্ড।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : বহু ভাষাবিদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।
প্র : তিনি প্রাচ্যবিদ্যা শেখেন কোথা থেকে?
উ : তন্ত্রকোর্ট থেকে।
প্র : তিনি কত সালে পরনি জেলে নবীন শাহের জীবনী অনুবাদ করেন।
উ : ১৭৭০
প্র : কত সালে তিনি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : ১৭৮৪ সালে (আজীবন সদস্য ও সভাপতি ছিলেন)
প্র : তিনি কোন কোন গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন?
উ : 'শকুন্তলা', 'হিতোপদেশ', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ইত্যাদি।
প্র : তাঁর পুথিপত্র কোথায় আছে?
উ : কলকাতার সেন্ট পলস্ কাথিড্রাল গির্জায়।
প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

কবি কঙ্ক

প্র : কবি কঙ্ক কে ছিলেন?
উ : ভক্তিকাব্যের বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি। কিশোরগঞ্জের ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী বিল গ্রামে ব্রাহ্মণ ঘরে তার জন্ম। পিতা গুণরাজ, মাতা গুণবতী।

প্র : তাঁর জীবনকাল কত?
উ : তিনি কোন সময় বর্তমান ছিলেন, এব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় না। গবেষকগণ মনে করেন, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুকুমার সেনের মতে কবি কঙ্ক আরও পরের কবি।
প্র : তিনি কার কবিতে প্রতিপালিত হন?
উ : শৈশবে পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় কঙ্ক মুরারি ও কৌশল্যা নামধেয় এক চন্ডাল দম্পতির ঘরে পালিত হন। তারাই কঙ্ক নাম রাখেন।

কানাহরি দত্ত

প্র : মনসামঙ্গল কাব্যধারার আদি কবির নাম কী?
উ : কানাহরি দত্ত।
প্র : কানাহরি দত্তের কাব্যের উদাহরণ দাও।
উ : কানাহরি দত্তের নাম পাওয়া যায় বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে। তাতে একটি পঙ্‌ক্তি আছে: 'হরি দত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে।' কানাহরি দত্তের রচনা লোপ পাওয়ায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় না। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বর্তমানে মনসামঙ্গলের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথি।
প্র : কানাহরি দত্তের সময় কত?
উ : আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, বিজয় গুপ্তের সময় শতাব্দী পূর্বে, অর্থাৎ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

কোরেশী মাগন ঠাকুর

প্র : কোরেশী মাগন ঠাকুরের জন্ম কত সালে?
উ : ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ (আনুমানিক)।
প্র : তাঁর জন্ম কোথায়?
উ : চট্টগ্রামে।
প্র : তিনি বিখ্যাত যে রাজসভার বাঙালি কবি ছিলেন তার নাম কী?
উ : রোসাঙ্গ।
প্র : মাগন ঠাকুরের পিতার নাম কী?
উ : বড়াই ঠাকুর (আরাকানের মন্ত্রী ছিলেন)।
প্র : আলাওল কার আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'পদ্মাবতী' (১৬৫২) কাব্য রচনা করেন?
উ : কোরেশী মাগন ঠাকুরের।
প্র : কোন কোন ভাষায় আলাওলের পান্ডিত্য ছিল?
উ : বাংলা, আরবি, পারসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : আলাওলের সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৯) কাব্য রচনার পৃষ্ঠপোষক কে।
উ : কোরেশী মাগন ঠাকুর।
প্র : কোরেশী মাগন ঠাকুরের অন্যতম কাব্য কী?
উ : 'চন্দ্রাবতী'।
প্র : তাঁর মৃত্যু কত সালে?
উ : ১৬৬০ সালে।

কৃত্তিবাস ওঝা

প্র : কৃত্তিবাস ওঝা কে?
উ : বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম ও প্রধান অনুবাদক। তাঁর এ রামায়ণকে শ্রীরাম পাঁচালিও বলা হয়। মৈথিলি ব্রাহ্মণের অসমিয়া ভাষায় ওঝা বলা হয়। ওঝা শব্দটি এসেছে 'উপাধ্যায়' থেকে।
প্র : কৃত্তিবাসের পদবি কী ছিল?
উ : কৃত্তিবাসের পদবি ছিল মুখোপাধ্যায়।
প্র : প্রথম বাংলা রামায়ণ অনুবাদক কে ছিলেন? তাঁর কাব্যের কাহিনি উৎস উল্লেখ কর।
উ : বাংলা রামায়ণের আদি কবির নাম কৃত্তিবাস ওঝা। কবির কাব্যের 'আত্ম-পরিচয়' অংশ থেকে তাঁর বংশ পরিচয় পাওয়া যায়। আত্ম-পরিচয় অংশে কবি বলেছেন 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমীপূর্ণ (পুণ্য) মাঘ মাস/তিথি মধ্যে জন্ম লইল কৃত্তিবাস।' যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন ১৩৮৬-১৩৯৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। তাই মোটামুটি ১৪০০ থেকে ১৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ পনের শতকের কবি তিনি। নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের মুখুটি বংশে তাঁর জন্ম। 'কৃত্তিবাস' তাঁর পিতামহ প্রদত্ত নাম।
প্র : কৃত্তিবাসের অনূদিত রামকাহিনির নাম কী ছিল? তাঁর কাব্যের মৌলিকতা কোথায়?
উ : শ্রীরাম পাঁচালি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের

কয়েকটি প্রাখ্যান কবি হলেও কল্পিত। তবে কিছু মৌলিক অংশ আছে। গীতাহরণ, তরণীসেনের কাহিনি, মহীরাবণ-বধ, অহীরাবণের কথা, রামের অকালবোধন, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মৃত্যুপথযাত্রী রাবণের কাছে রামচন্দ্রের শিক্ষা, সীতার রাবণমূর্তি আঁকন ও রামের মূর্ছা। পরবর্তীকালে দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালিতে এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে এই ঘটনাক্রম গ্রহণ করেন।
প্র : কৃত্তিবাসী রামায়ণ কার উদ্যোগে কোন্ সনে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়?
উ : শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনের প্রাচ্য ভাষাবিদ উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে কয়েক খণ্ড ১৮০২-'০৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত হয়।
প্র : "কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলঙ্কার।"—কৃত্তিবাস সম্পর্কে এ মন্তব্য কে করেছিলেন?
উ : এ মন্তব্য করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্র : কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাঙালির জাতীয় কাব্য বলা হয় কেন?
উ : বাল্মীকির শালপ্রাংশু মহাভুজ রামচন্দ্র কৃত্তিবাসের লেখনীর স্পর্শে হয়ে গেছেন—'নবজলধর শ্যাম'। তুলসীচন্দনে লিপ্ত এই বিগ্রহ আমাদের সমাজের সঙ্গে আদ্যোপান্ত মিশে মিশে আছেন। অযোধ্যার রাজপরিবার যেন বাঙালির একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে শত দুঃখে মুখ বুজে সংসার করছেন বাঙালি কুলবধূর প্রতিরূপ জানকী সীতা। তিনি আর্যনারীর মতো সরলা নন। রাবণের ভয়ে তিনি 'কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।' ভরত লক্ষ্মণ আমাদেরই সহোদর। কৌশল্যাও বাঙালি মায়ের আদলে তৈরি। 'লাজে অধোমুখি সীতা'; দেবর লক্ষ্মণকে রেঁধে খাইয়েছেন বাঙালির খাদ্য। গুহকের গৃহে ভরত যা খেয়েছেন এবং ভরদ্বাজ ঋষি বানরবাহিনীকে যেসব ভোজ দিয়ে তৃপ্ত করেছেন, সে সবই বাংলাদেশের লোকনীয় খাদ্যসম্ভার। ভাত, দুধি, গুড়পিঠে, পুলি, পায়েস, রোহিত ভিন্ন মাছের উল্লেখ করেছেন কৃত্তিবাস। এদেশের আচারাদির স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালির কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মহাকবির জীবনরস সমৃদ্ধ একখানি ভক্তিগ্রন্থই নয় তার দুর্লভ জীবনের কাব্য।
প্র : কৃত্তিবাস কোন রাজার রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অনুমিত?
উ : এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর অল্প বিতর্কের কারণ কৃত্তিবাস তাঁর 'আত্মপরিচয়' অংশে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ করেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সেন ও ড. মজিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই গৌড়েশ্বর ছিলেন রাজা গণেশ। আবার বসন্তরঞ্জন রায় বলেন যে ইনি গণেশপুর যদু বা তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ড. সুকুমার সেনের মতে ইনি সুবুদ্ধি রায় বা সেন বংশীয় দনুজমাধব কিংবা চট্টগ্রামের দনুজমর্দন হতে পারেন।

গোবিন্দদাস

প্র : গোবিন্দদাস কে ছিলেন?
উ : বৈষ্ণব পদকর্তা। চৈতন্যোত্তরকালে খ্যাতি অর্জনকারী কবিদের একজন।
প্র : তিনি কোথায়, কখন জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার নিকটবর্তী তেলিয়াবুধুরি গ্রামে, আনুমানিক ১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : কোন কবি 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' নামে খ্যাত।
উ : গোবিন্দদাস। কবি বল্লভদাস অভিধা দিয়েছিলেন-গোবিন্দের কবিত্বগুণ, গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।
প্র : গোবিন্দদাসের আসল পদবি কী?
উ : সেন।
প্র : গোবিন্দদাস রচিত সংস্কৃত নাটকের নাম কী?
উ : 'সংগীতমাধব'।
প্র : গোবিন্দদাস কোন পর্যায়ের পদকর্তা?
উ : পূর্বরাগ, অভিসার, মান, কলহান্তরিতা,

বাসকসজ্জা, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের পদকর্তা।

প্র : কোন পদ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

উ : অভিসার পদ পর্যায়ে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। সমালোচকের মতে অভিসার পর্যায়ে তিনি রাজাধিরাজ।

প্র : গোবিন্দদাসকে আর কী বলা হয়?

উ : বিদ্যাপতি।

প্র : গোবিন্দদাস কার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন?

উ : গোবিন্দদাস বিখ্যাত বৈষ্ণব ধর্মগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

প্র : গোবিন্দদাসকে কে 'কবিরাজ' উপাধি দেন।

উ : শ্রীজীব গোস্বামী।

প্র : গোবিন্দদাসের নামে কতগুলো বৈষ্ণবপদ পাওয়া যায়?

উ : প্রায় সাড়ে চারশত।

প্র : গোবিন্দদাসের কাব্যগুরু কে ছিলেন?

উ : মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

প্র : পদরচনার কোন দিক থেকে গোবিন্দদাসের তুলনা মেলে না?

উ : রাধার অভিসারের পদ রচনায়।

প্র : তার রচিত পদে কোন গুণ পাওয়া যায়?

উ : অলঙ্কারচাতুর্য, ছন্দ-ঝংকার ও রস-মাধুর্য গুণ।

প্র : গোবিন্দদাস রচিত যে একটি নাটকের নাম পাওয়া যায় তা কী?

উ : সঙ্গীতমাধব।

প্র : তাঁকে কবীন্দ্র উপাধি কে প্রদান করেন?

উ : জীব গোস্বামী

প্র : গোবিন্দদাস রচিত একটি পদের অংশবিশেষ লিখ।

উ : ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরছা পায়।

প্র : কত সালে তার মৃত্যু হয়?

উ : আনুমানিক ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে।

চণ্ডীদাস

প্র : চণ্ডীদাস কে ছিলেন?

উ : চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি ছিলেন। তার জন্ম কোন সময় তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে তিনি বাশুলি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।

প্র : চণ্ডীদাস জাতিতে কী ছিলেন? তাঁর আরাধ্য দেবতার নাম কী?

উ : চণ্ডীদাস জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁর আরাধ্য দেবতার নাম বাশুলী বা বিশালাক্ষী।

প্র : চণ্ডীদাস কোন সময়ের কবি?

উ : চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন।

প্র : চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে কীরূপ ভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

উ : চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ পৌরুষের ভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

প্র : চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী কে ছিলেন।

উ : চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন রামী নাম্নী এক রজকিনী।

প্র : চণ্ডীদাস কোন ধরনের কবি ছিলেন?

উ : সহজিয়াপন্থী।

প্র : কোন পদপর্যায়ে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন?

উ : পূর্বরাগ পর্যায়ে। তিনি এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি।

প্র : চণ্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী মন্তব্য করেছিলেন?

উ : 'চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি- এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।'

প্র : চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতার নাম কর।

উ : চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতা হলেন চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

প্র : চণ্ডীদাস তার পদে রাধার কোন মূর্তি চিত্রিত করেছেন?

উ : প্রথম থেকেই চণ্ডীদাস রাধার বৈরাগিনী তপস্বিনী মূর্তি চিত্রিত করেছেন। তাঁর রাধার চরিত্রে মর্ত্যচেতনা নেই।

প্র : চণ্ডীদাসকে কে দুঃখের কবি বলেছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন।

প্র : চণ্ডীদাস কতজন? বা চণ্ডীদাস সমস্যা কী?

উ : মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে অন্তত চারজন চণ্ডীদাসের কবিতা পাওয়া যায়। এরা হলেন : বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস। এই চারটি নামের মধ্যে শেষ তিনটি নাম একজনের নাকি তাঁরা পৃথক কবি তা নিশ্চিত করে আজও বলা যাচ্ছে না। এই সমস্যাকেই চণ্ডীদাস-সমস্যা বলে।

প্র : চণ্ডীদাসের নামে কোন প্রেমকাহিনি প্রচলিত?

উ : বাশুলি মন্দিরের পুরোহিত চণ্ডীদাস রামী নামের এক রজকিনীর প্রেমে মুগ্ধ হন। তিনি রামীর মধ্যে রাধারূপ দেখেন। জমিদার এই প্রণয়কে অবৈধ আখ্যা দিয়ে চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত ও মন্দির থেকে বিতাড়িত করে।

প্র : চণ্ডীদাসকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয় কেন?

উ : তিনি 'শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' বলে জাত-পাতযুক্ত সমাজে প্রথম মানবতার বাণী কাব্যে ধারণ করেছেন বলে। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনেও তিনি জাত-সংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন। অনেকে যে বলে থাকেন, মানবতার বাণী আমরা ইউরোপ থেকে পেয়েছি, চণ্ডীদাসের এই বাণী তা ভুল প্রমাণ করে।

প্র : 'আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় / আমারি আঙিনা দিয়া' কোন কবির রচনা?

উ : চণ্ডীদাস (দ্বিজ)

প্র : চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কবি ছিলেন। বৈষ্ণব কী?

উ : বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলে। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরের বিষ্ণু অবতাররূপকে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীকে ভক্তি করেছেন। এই মতের অনুসারীদের বৈষ্ণব বলে।

চন্দ্রাবতী

প্র : চন্দ্রাবতী কে ছিলেন?

উ : মধ্যযুগের তিনজন প্রধান মহিলাকবির একজন। অপর দুইজন চণ্ডীদাসের অনুরাগী রামী ও চৈতন্যের কৃপাপাত্রী মাধবী।

প্র : চন্দ্রাবতীর জীবনকাল কত শতাব্দী?

উ : ষোড়শ শতাব্দী।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের পাটোয়ারি গ্রামে।

প্র : চন্দ্রাবতীর পিতা কে ছিলেন?

উ : মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাস।

প্র : কত খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রাবতী জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে

প্র : চন্দ্রাবতী রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, রামায়ণ ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত রামায়ণ বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে কেন?

উ : মৌলিক, মানবিক ও কিছু মৌলিক উপাদান সংযোগের ফলে।

প্র : মহিলা রামায়ণকার কাকে বলা হয়?

উ : চন্দ্রাবতীকে।

প্র : তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কী?

উ : ষোড়শ শতাব্দীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত।

জ্ঞানদাস

প্র : জ্ঞানদাস কে ছিলেন?

উ : চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি।

প্র : কোথায়, কখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন?

উ : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়, ষোড়শ শতাব্দীতে।

প্র : জ্ঞানদাস কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : আনুমানিক ১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : জ্ঞানদাস কোন সময়ের কবি?

উ : চৈতন্য উত্তর যুগের ষোড়শ শতাব্দীর কবি।

প্র : জ্ঞানদাস কার শিষ্য ছিলেন?

উ : বৈষ্ণবগুরু নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন।

প্র : জ্ঞানদাস কোন কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন?

উ : জ্ঞানদাস খেতুরীর বৈষ্ণব কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

প্র : খেতুরীর কবিসম্মেলনে কাদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পরিচয় হয়েছিল?

উ : এখানে গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো?

প্র : কোন প্রাচীন কবির রচনাধারাকে অনুসরণ করে জ্ঞানদাস পদ রচনা করেন?

উ : চণ্ডীদাস। বলা হয় তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।

প্র : জ্ঞানদাস কী কী বিষয়ে কবিতা লিখেছেন?

উ : শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, নৌকাবিলাস ও দানখণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানদাস কবিতা লিখেছেন।

প্র : জ্ঞানদাস কোন কোন ভাষায়, আনুমানিক কতগুলো পদ লেখেন?

উ : বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায়, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় দুশ পদ লেখেন।

প্র : তাঁর রচিত দুটি বৈষ্ণব গীতিকাব্যের নাম লেখ।

উ : মাথুর ও মুরলীশিক্ষা

প্র : জ্ঞানদাসের পদরচনার মূল বিষয় কী?

উ : প্রেম, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতা

প্র : পদ রচনার সময় তিনি রাধা-কৃষ্ণের কোন বয়সকে গুরুত্ব দেন?

উ : কিশোর-কিশোরী বয়সকে।

প্র : প্রণয়ের কোন কাল বা রাগ তাঁর রচনায় চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে?

উ : পূর্বরাগ

প্র : জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদের কিছু অংশ লেখ :

উ : সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

দৌলত উজির বাহরাম খান

প্র : দৌলত উজির বাহরাম খান এর জন্ম কোথায়? পিতা কে?

উ : ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম। পিতা চট্টলাধিপতির উজির মোবারক খান।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?

উ : আসাউদ্দীন

প্র : তাঁর উপাধি কী?

উ : দৌলত উজির বাহরাম খাঁ।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম কাব্যের নাম কী?

উ : 'জঙ্গনামা' বা 'মক্তুল হোসেন'

প্র : তাঁর রচিত দ্বিতীয় কাব্যের নাম কী?

উ : লায়লী মজনু (১৫৪৩-১৫৫৩)

প্র : তাঁর লায়লী মজনু কার কাব্য অবলম্বনে রচিত?

উ : পারসি কবি আবদুর রহমান জামির লায়লী মজনু (১৪৪৮)।

প্র : তিনি কী কী ভাষার পারদর্শী ছিলেন?

উ : আরবি ও পারসি ভাষা এবং ইসলামি ধর্মশাস্ত্রের মত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায়।

প্র : লাইলী মজনুর মত বিশ্বখ্যাত বিরহকথা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম কে কাব্য রচনা করেন?

উ : দৌলত উজির বাহরাম খান

প্র : তাঁর লাইলী মজনু কাব্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উ : জামির কাব্যে আধ্যাত্মিকতা প্রধান ছিল, বাহরাম খার কাব্য মানবিক প্রেমবোধ প্রধান।

দৌলত কাজী

প্র : দৌলত কাজীর জীবনকাল কত?

উ : আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৬৩৮ খ্রি.।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : সুলতানপুর গ্রাম, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি।

প্র : তিনি কী কী ভাষায় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন?

উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ব্রজবুলি ভাষায়।

প্র : দৌলত কাজী কার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দি কাব্য অবলম্বনে কাব্য রচনায় উৎসাহী হয়?

উ : আরাকানের রাজা সুধর্মের সমর সচিব আশারাফ খানের।

প্র : তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী?

উ : সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী।

প্র : এই গ্রন্থের মূল কী?

উ : হিন্দি কবি সাধনের মৈনাসৎ নামক কাব্য।

প্র : তাঁর এ কাব্য কোন দুইটি ভাষার মিশ্রণে রচিত?

উ : বাংলা ও ব্রজবুলি।

প্র : তিনি তাঁর রচনায় কোথা থেকে অনুষঙ্গ ব্যবহারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন?

উ : রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব পদাবলি।

প্র : কাব্য রচনার শেষ পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু হলে কে তা সম্পূর্ণ করেন?

উ : আলাওল (১৬৫৯)।

প্র : 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্যটি কোন ছন্দে রচিত?

উ : পয়ার ত্রিপদী ছন্দে।

প্র : দৌলত কোন মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন?

উ : সুফি মতাবলম্বী।

প্র : রোসাঙ্গ রাজসভা কোথায়? এখানে চর্চিত বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উ : একজন কবির কবিতা থেকে প্রসঙ্গ অবতারণা করা যেতে পারে। কবি দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' গ্রন্থে লিখেছেন: 'কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী / রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী ॥ / তাহাতে মগধ বংশক্রমে যুদ্ধাচার / নাম থিরি থুধম্মা রাজা ধন অবতার॥ / প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন / পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ / দেব গুরু পুজ এ ধর্মেতে তান মন / সে পদ দর্শনে হএ পাপের মোচন ॥ / পুণ্যফলে দেখে যদি রাজার চরণ / নারকীও স্বর্গ পাএ সাফল্য জীবন ॥' দৌলত কাজী এভাবে রোসাঙ্গ নগরীর রাজা শ্রীসুধর্মার খুব প্রশংসা করে বলেছেন, এই রাজা পুত্রের মতো করে প্রজাপালন করেন। আরাকান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত এবং অতি প্রাচীনকাল থেকে সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাজা নরমিখলা ১৪৩০ সালে লেমব্রু নদীর তীরে 'ম্রোহং' নামক স্থানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই 'ম্রোহং'-এর রাজার সভাই ম্রোহংরাজসভা হিসেবে পরিচিতি পায়। আর 'ম্রোহং' শব্দ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নেয় 'রোসাঙ্গ'। পরে মগরাজা আরাকানকেই 'রোসাঙ্গ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। অতএব, আরাকানেই 'রোসাঙ্গ রাজসভা'। আরাকান অঞ্চলটি বর্তমানে মিয়ানমারের 'রাখাইন স্টেট' নামে পরিচিত একটি প্রদেশ।

আরাকানের মগরাজারা উদার বৌদ্ধ ছিলেন এবং ধর্মের ভিন্নতায় মানুষকে পর ভাবতেন না। প্রতিভা মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজেদের রাজকার্যে গতিশীলতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুসলমানদেরও সমাদর করতেন তারা। তারা সবাইকে স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেন। অতীতকালে আন্তর্জাতিক সীমারেখা এতোটা প্রকট না থাকায় চট্টগ্রামের সাথে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল প্রবল। তাই বাংলা ভাষার ঢেউ পৌঁছে আরাকানেও। আরাকানে বা রোসাঙ্গ এলাকায় বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা লক্ষণীয়: একটি ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে রচিত সাহিত্য, অপরটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারার রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। আর এক্ষেত্রে আরাকানে বৌদ্ধ রাজাদের সমর্থন ছিল ব্যাপক। তাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকবি আলাওল তাঁর সাহিত্যসাধনা করেছেন। মৌলিক রচনা এবং বিশেষত অনুবাদ সাহিত্যে আরাকানের বাংলাভাষী কবিদের অনন্য অবদানের কথা আমাদের জানা। আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চাকারীদের মধ্যে দৌলত কাজী অন্যতম। চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামের কাজি বংশের সন্তান কবি দৌলত কাজী আরাকানে বাংলা সাহিত্যচর্চা করেন। এমনকি তিনি আরাকানে রাজসভার কাজির পদেও নিযুক্ত ছিলেন। এ কবি সাহিত্যের গতানুগতিক পথ মাড়িয়ে বাস্তবতার নিরিখে মানবীয় প্রেমকে উপজীব্য করে 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী' কাব্যরচনা করেন। তিনি

আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) রাজত্বকালের (১৬২২-'৩৮ খ্রি.) মধ্যেই তাঁর উজির আশরাফ খানের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য সমাপ্ত করার আগেই মাত্র ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম কবি আলাওল। তিনি আরাকানে অশ্বারোহী সৈন্য পদে চাকরি করলেও আরাকানের রাজশক্তির সুনজরে আসেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁর কাব্যগুলো রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা 'পদ্মাবতী' অনুবাদ হলেও মৌলিকতার পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ। আরাকানের রাজসভায় জ্ঞানীদের ব্যাপক কদর ছিল, ধর্মের ভেদ মুখ্য ছিল না। বৌদ্ধ রাজারা উলামা, সৈয়দ, শেখ সবাইকে সম্মান দিয়ে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন করেছিলেন। আর এ কারণেই আরাকানে মুসলমানদের বিকৃতি ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যেরও চর্চা হয়েছে সেসময়। কবি আলাওল রাজপৃষ্ঠপোষকতায় দৌলত কাজী রচিত অসমাপ্ত 'সতী ময়না লোর চন্দ্রাণী' কাব্যটি সমাপ্ত করেন। মূলত এটি কবির মৌলিক রচনা। তিনি আরাকানের রাজা থু ধম্মার শাসনামলে স্বীয় প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল' রচনা শুরু করেন। আলাওল ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের মুখ্য সেনাপতির আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'সপ্তপয়কর' কাব্য রচনা করেন। 'তোহফা' আলাওলের একটি অন্যতম বিখ্যাত ও উপদেশমূলক কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৬৬৩-'৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল আরাকানের মহামাত্য মুহম্মদ সোলায়মানের আদেশে সৃজনশীলধারায় কাব্যানুবাদ সম্পন্ন করেন। 'সিকান্দরনামা' আলাওলের শেষ কাব্যগ্রন্থ। কবি আলাওল আরাকানের রাজা থিরি থু ধম্মার প্রধান অমাত্য নবরাজ মজলিশের আদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭১ থেকে ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি রচনা করেন। রোসাঙ্গ রাজসভার অপর কোরেশী মাগন ঠাকুরও 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেন। কবি মরদনও এ সময় কাব্যরচনা করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে অবদান রাখেন। আরাকান রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি মসরুল্লাহ বোজকার। এ কবির তিনটি প্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় যথা: 'জঙ্গনামা', 'মুসার সওয়াল' ও 'শরীয়তনামা'। এ ছাড়াও অনেক কবি আছেন যাঁদের অবদানে রাজসভায় বাংলাচর্চা অব্যাহত ছিল। এসব গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে ধর্মীয় আবাসের পুনর্সৃষ্টির দৃষ্টান্ততো মিলবেই উপরন্তু সমকালীন ইতিহাস, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিলনভাব, ভৌগোলিক অবস্থা, ভাষার শব্দচেতনা, মানুষের বৃত্তি সম্পর্কে অনুধাবন ইত্যাদি বহুবিধয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। তবে, একটি জিজ্ঞাসাও ভেতরে আসবে এবং তাহলো, কেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের এমন বিকাশ যে হলো, সেই রাজপৃষ্ঠপোষকতা কালক্রমে কেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসাহিত্যচর্চা একেবারে হারিয়ে গেল, তার কারণ কী? তবে কি এই সাহিত্যচর্চার মধ্যে প্রাণের কোনো যোগ ছিল না? এই জিজ্ঞাসা মনে রেখেই বলা দরকার, রোসাঙ্গ রাজসভায় শুধু বাংলা সাহিত্য শুধু বিষয়ে নয়, উপস্থাপনার চমৎকারিত্বেও মধ্যযুগের অমর সৃষ্টি।

দ্বিজ বংশীদাস

প্র : দ্বিজ বংশীদাসের জন্মস্থান কোথায়?
উ : পাতোয়ারি গ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
প্র : তাঁর জীবনকাল লেখ?
উ : ষোড়শ শতাব্দী।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কী কী শাস্ত্রে সুপন্ডিত ছিলেন?
উ : সংস্কৃত, পুরাণ, আগম, তন্ত্রাদি শাস্ত্রে।
প্র : তিনি কোন কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি?
উ : পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল।
প্র : তিনি কখন মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন?
উ : ১৫৫৭-এ।
প্র : তিনি তাঁর কাব্যে কী দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্কন করেন?
উ : বেহুলার দুঃখের চিত্র ও চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা।
প্র : দ্বিজ বংশীদাস রচিত অন্য কাব্যগুলো কী?
উ : কৃষ্ণ গুণার্ণব, রামগীতা ও চণ্ডী।

বড়ু চণ্ডীদাস

প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ছাতনা, বাঁকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে।
প্র : তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন।
উ : নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে আনুমানিক ১৩০৯ খ্রিষ্টাব্দ (বসন্তরঞ্জনের মতে)।
প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কী রচনা করেন?
উ : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থকে অন্য কী নামে অভিহিত করা হয়?
উ : শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : এই গ্রন্থের 'মধ্যযুগ' অংশ।)
প্র : এই গ্রন্থের রচনা কোন সময়?
উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালে গ্রন্থটি রচিত বলে মনে করেন।
প্র : এই গ্রন্থের বিষয় কী?
উ : রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনার মাধ্যমে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ।
প্র : এই প্রণয়ে দৈব না মানবিক গুণ প্রকাশিত?
উ : মানবিক।
প্র : রাধা ও কৃষ্ণ কীসের প্রতীক?
উ : রাধা এই জীবলোকের জীবাত্মা এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রতীক।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ কয় খণ্ডে রচিত? এখানে চরিত্র কয়টি?
উ : গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে বিভক্ত, কারো রচিত। চরিত্র তিনটি: রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থ কে, কখন, কীভাবে আবিষ্কার করেন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পুথিশালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে পঁচিশবছর বাঁকুড়া জেলার কর্কিলা গ্রামের এক দুঃস্থবৈষ্ণবের গোয়াল ঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি হাতে লেখা পুথি আবিষ্কার করেন।
প্র : গ্রন্থটির নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কে রাখেন?
উ : এর আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন রায় নিজে।
প্র : হাতে লেখা পুথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কবে, কোথা থেকে, কার সম্পাদনায়?
উ : ১৯১৬ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।
প্র : বসন্তরঞ্জন রায়কে কী বিশেষ উপাধি দেয়া হয়, কে দেন?
উ : বিদ্বদ্রত্ন। নবদ্বীপের হুবনমোহন চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ কর্তৃক এই উপাধি প্রদান করা হয়।
প্র : বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
উ : বড়ু চণ্ডীদাস।
প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাংলার দ্বিতীয় গ্রন্থ কোন দিক থেকে?
উ : ভাষা ও রচনাকাল।
প্র : এই গ্রন্থে কবিতার পাশাপাশি আর কোন গুণ প্রধান?
উ : নাট্যিক গুণ।
প্র : এই গ্রন্থের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের নাম কত ভাবে পাওয়া যায়?
উ : অনন্ত চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি ভাবে। এর মধ্যে বড়ু তাঁর কৌলীন্য উপাধি, চণ্ডীদাস গুরুদত্ত নাম, অনন্ত প্রকৃত নাম।

প্র : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে চারটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

প্র : বড়ু চণ্ডীদাস কবে মারা যান?

উ : আনুমানিক ১৩৯৯ খ্রিষ্টাব্দ (বসন্তরঞ্জনের মতে)।

বিজয় গুপ্ত

প্র : বিজয় গুপ্ত কে?

উ : মনসামঙ্গলের যে পুথিসমূহ পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত এই পুথিভিত্তিক প্রাচীনতম কবি বিজয় গুপ্ত।

প্র : তাঁর পরিচয় ও জীবনকাল লেখ।

উ : বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) (এই স্থানটি নদীর বাঁকে ছিল বলে এই নাম হয়) জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সনাতন গুপ্ত, মাতা রুক্মিনী দেবী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে তিনি জীবিত ছিলেন।

প্র : তাঁর রচিত পদ্মাপুরাণের পরিচয় দাও।

উ : মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ব্যঞ্জক তাঁর গ্রন্থটির পাঠে নানা প্রক্ষেপ ঘটেছে। কারণ তা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল বলে জনগণের মুখে মুখে ফিরত।

বিদ্যাপতি

প্র : বিদ্যাপতি কে ছিলেন?

উ : বৈষ্ণব কবি এবং পদসঙ্গীত ধারার রূপকার।

প্র : তিনি কোথায়, কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মিথিলার সীতামারী মহকুমার বিসফি গ্রামে আনুমানিক ১৩৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?

উ : মৈথিলি, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত ভাষায়।

প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি কী?

উ : ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ।

প্র : ব্রজবুলি কী? কোন স্থানের?

উ : এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে এই ভাষা তৈরি হলেও এতে বেশ কিছু হিন্দি শব্দ আছে।

প্র : বাংলা ভাষায় এক পঙ্‌ক্তি না লিখেও কোন কবি বাঙালিদের কাছে নমস্য?

উ : বিদ্যাপতি

প্র : বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কোন কবির পদ চৈতন্যদেব বিশেষভাবে শ্রবণ করতেন?

উ : বিদ্যাপতির।

প্র : বিদ্যাপতি রচিত পদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লেখ।

উ : এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

প্র : বিদ্যাপতির মৃত্যুকাল?

উ : আনুমানিক ১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

প্র : ভারতচন্দ্র রায়ের পরিচয় দাও।

উ : ভারতচন্দ্রের জীবনকাল ১৭১২ থেকে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি আঠার শতকের মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামে জমিদার বংশে তাঁর জন্ম।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মাতা-পিতার নাম ও পরিচয় দাও।

উ : মাতা ভবানী দেবী, পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ। তাঁদের পদবি মুখোপাধ্যায়। পিতা ছিলেন বর্ধমান রাজপরিবারের অধীনে হুগলির জমিদার।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষা জানতেন?

উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, পারসি ও আরবি।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যখ্যাতি কবে থেকে আরম্ভ হয়?

উ : বর্ধমানের রাজা কর্তৃক ভারতচন্দ্রের পিতা জমিদারিচ্যুত হলে ভারতচন্দ্র এর কারণ জানতে ও প্রতিকার করতে রাজদরবারে গমন করেন। এর আগেই, যখন বয়স মাত্র পনেরো বছর, তাঁর গ্রন্থ 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' (১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দে) রচনা শেষ এবং পাঠকমহল থেকে ব্যাপক সাড়া পান।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কি কারাগারে গমনকারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম লেখক?

উ : ভারতচন্দ্রই সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি, যিনি রাজরোষে কারাগারে যান। পিতার জমিদারিচ্যুতির কারণ জানতে গিয়ে বর্ধমানের রাজা কর্তৃক কবি ভারতচন্দ্র কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কবে তিনি কারাগারে যান এর ঠিক তারিখটি জানা যায় না সত্য, তবে দীর্ঘদিন পরে তিনি, ৩৯ বছর বয়সে সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন। এ ব্যাপারে কারাধ্যক্ষ তাঁকে সাহায্য করে। তখনই তাঁর শরীরে নানা রোগ জন্ম নেয়। বিশেষ করে বহুমূত্র (ডায়াবেটিক) রোগে তিনি পতিত হন এবং এই রোগেই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মারা যান। বর্ধমান থেকে পালিয়ে নবদ্বীপে (নদীয়া) গমন করলে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সেখানের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে বিভিন্ন কাব্যরচনা করতে বলেন এবং 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্র : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন লেখ।

উ : ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্ঠসৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গল' ও এই কাব্যের দ্বিতীয়াংশ 'বিদ্যাসুন্দর'। সংস্কৃত, আরবি, পারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে আশ্চর্য নতুন এক বাগভঙ্গি ও প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতায় নিপুণ ছন্দপ্রয়োগ ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যের অনেক পঙ্‌ক্তি আজও বাংলা ভাষায় প্রবচনতুল্য। নদীয়ার রাজসভায় স্থান পাওয়া এ কবির কাব্যে ছিল বাক্‌চাতুর্য, বুদ্ধির খেলা আর পাণ্ডিত্য। সহজ-সরল কোনো অনুভূতি তাঁকে মুগ্ধ করেনি বরং তিনি সব সময় চেয়েছেন এমন বস্তু যা তাঁর পাঠককে চমকে দেবে। তাঁর কথা ছিল ধারালো, চকচকে তরবারির মতো। কবি যেন সব কিছুতেই ঠাট্টা খুঁজে পেতেন। অসঙ্গতি দেখলেই বিদ্রূপ করতে পারতেন সবাইকে নিয়ে। মধ্যযুগের সব কবিই যখন নিজের নায়িকাকে চাঁদের মতো রূপসী বলছেন তখন ভারতচন্দ্র ঠাট্টা করে বলছেন: 'কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা / পদনখে পড়ে আছে তাঁর কতগুলা।' মধ্যযুগের এ বর্ণকারিগর এমন অসংখ্য চমৎকার কথা বলেছেন অবিরাম। তাঁর মুখের অনেক কথা প্রবাদ হয়ে আজো প্রাণমত্ত মানুষের মুখে মুখে। যেমন: 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' কিংবা 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।' অথবা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দ ও অলঙ্কারের সুদক্ষ প্রয়োগ। ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম ভারতচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের বিভিন্ন ছন্দ ও অলঙ্কার সার্থকভাবে এই কাব্যে প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।' সমালোচক-অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: 'অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম।'

প্র : তিনি কোন রাজার সভাকবি ছিলেন?

উ : নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।

প্র : কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের ভারতচন্দ্র কী রচনা করেন?

উ : ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অন্নদামঙ্গল কাব্য (১৭৫২-'৫৩) রচনা।

প্র : কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কে তাঁকে রায়গুণাকর উপাধি প্রদান করেন?

উ : রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

প্র : মধ্যযুগের 'শেষ বড় কবি' কাকে বলে।

উ : ভারতচন্দ্রকে

প্র : ভারতচন্দ্রকে আর কী বিশেষণে অভিহিত করা হয়?

উ : নাগরিক কবি।

প্র : ভারতচন্দ্র রচিত আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কর।
উ। সত্য পীরের পাঁচালি (১৭৩৭-৩৮)
প্র : অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রথম কে মুদ্রিত করেন?
উ : পঞ্চকিশোর ভট্টাচার্য, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে।
প্র। 'না হবে প্রাসাদতল না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।'
— কোন কবির রচনা?
উ : ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের।
প্র : 'যাবনী' কী?
উ : 'যবন' শব্দের অর্থ বহিরাগত। আরবি-পারসি ভাষাভাষী মুসলমানরা ভারতবর্ষে বহিরাগত ভাষা। সে কারণে যাবনী বলে এখানে আরবি-পারসি ভাষা বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় 'যবন' শব্দের ব্যবহার করেছেন আরবি-পারসি ভাষার উত্তরাধিকারী মুসলমানদের বোঝাতে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেও মুসলিম অর্থে 'যবন' শব্দের ব্যবহার আছে (দ্রষ্টব্য: 'আমার কৈফিয়ত' কবিতা)।
প্র : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'— কার রচনা?
উ : ভারতচন্দ্রের। তিনি ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মুখ দিয়ে একথা বলিয়েছেন।

'আমার সন্তান' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পাটুনী' কী?
উ : হিন্দি শব্দ 'পাটনি' বাংলায় কখনো 'পাটুনী' বলে ব্যবহার হয়। এর অর্থ খেয়ামাঝি।
প্র : ঈশ্বরী পাটুনী নারী না পুরুষ?
উ : এ নিয়ে কিছুটা তর্ক আছে পণ্ডিতদের মধ্যে। অনেকে তাকে পুরুষ চরিত্র বলেন। তাদের বিচারে খেয়ামাঝি পুরুষ। কিন্তু এই যুক্তিগুলোও ভেবে দেখা প্রয়োজন: ১. চর্যায় নারীদের নৌকা চালনার দৃষ্টান্ত আছে, মধ্যযুগেও সে ধারাবাহিকতা থাকা খুবই সম্ভব। ২. ঈশ্বরী নারীও হতে পারে। ৩. তাছাড়া একজন মমতাময়ী মায়ের মতো ব্যক্তিগত চাহিদার চেয়ে সন্তানের সমৃদ্ধি কামনা করেছে বলে তাকেতো নারী হিসেবেই হিসেবে নেয়া প্রয়োজন।
প্র : 'একা দেখি কুলবধূ'– কেন?
উ : সম্ভ্রান্ত ও অন্য গৃহিণীরা একা পথ চলতে পারে, মধ্যযুগে এমনই সামাজিকরীতি ছিল। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর তার পরিচয় দেয়ার খেয়া পারাপারে অসম্মত। তখন অন্নপূর্ণা কৌশলের আশ্রয় নেয়। বলে, সে অন্ন গৃহিণী বলেই সে স্বামীর নাম মুখে আনবে না। স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ না করার রীতি বাঙালি সমাজে প্রচলিত ছিল।
প্র : অন্নপূর্ণা কে?
উ : অন্নে পূর্ণ যিনি; যিনি মানব জাতিকে আহার দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। দেবী দুর্গার অন্নপূর্ণা।
প্র : এই কবিতায় কোন পঙ্‌ক্তি দুটো সবচেয়ে ভালোলাগতে পারে, কেন?
উ : 'প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'
—এই পঙ্‌ক্তি দুটো সবচেয়ে বেশি ভালোলাগে। কারণ, এখানে নিজের প্রাপ্তির চেয়ে সন্তানের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবা হয়েছে। এই ভাবনা চিরন্তন মাতৃ-ভাবনা। এই ভাবনাই বাঙালিকে পৃথিবীর অন্য জাতি থেকে অনন্য করেছে।
প্র : কার বাক্যে মাভা হেসে পা দুখানি সেঁউতির ওপর রাখেন?
উ : পাটুনীর (ঈশ্বরী পাটুনীর)।
প্র : রবদান কী?
উ : অভীষ্ট পূরণ করে এমন কিছু প্রদান।
প্র : ডুবন্ত লঞ্চ থেকে ছেলে রতনকে রক্ষা করে মা যখন নিজে আর বাঁচতে পারেন না– এদৃশ্য উদ্দীপকের আলোকে মা-কে 'আমার সন্তান' কবিতার কার সঙ্গে তুলনা করা যায়?
উ : পাটুনী বা ঈশ্বরী পাটুনী।

প্র : মা-এর সাথে পাটুনীর সাদৃশ্যের কারণ কী?
উ : সন্তান মাতোলা ও আত্মভোলা।
প্র : "এ তো মেয়ে মেয়ে নয়"– কথাটি কেন বলা হয়েছে?
উ : মেয়েটির পদস্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনা দেখে। মেয়েটি সাধারণ নারী নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে কথাটি বলা হয়েছে।

মানিক দত্ত

প্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
উ: মানিক দত্ত।
প্র: মানিক দত্তের জীবনকাল সম্পর্কে মত দাও।
উ: দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন ত্রয়োদশ শতাব্দী। আশুতোষ ভট্টাচার্যসহ কোনো কোনো গবেষক মনে করেন মানিক দত্ত ষোড়শ শতাব্দীর কবি।
প্র: তাঁর পরিচয় কী?
উ। তিনি মালনহ জেলার ফুলুছা (বর্তমানে ফুলবাড়ি) অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিজের দেয়া আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি ছেলেবেলায় বিকলাঙ্গ ছিলেন। দেবী চণ্ডীর কৃপায় তিনি ভাল হন এবং কাব্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন।

মালাধর বসু (গুণরাজ খান)

প্র: মালাধর বসুর জন্ম সন কত?
উ: ১২শ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: বর্ধমান জেলার কুলিন গ্রামে।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের কবি।
প্র: তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তির জন্য শামসুদ্দীন ইউসুফ সাহের কাছ থেকে কী উপাধি লাভ করেন?
উ: গুণরাজ খান।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী?
উ : শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
প্র : এই কাব্যে কী বর্ণিত হয়েছে?
উ : ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও তাঁর লীলা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ

প্র : মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনকাল কত?
উ। আনুমানিক (১৫৪০-১৬০৫)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : দামুন্যা গ্রাম, বর্ধমান।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : মেদিনীপুরের রাজা রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে তিনি কোন কাব্য লেখেন।
উ : চণ্ডীমঙ্গল।
প্র : তাঁকে কী বলে আখ্যায়িত করা হয়?
উ : দুঃখবর্ণনার কবি।
প্র : কবি তাঁর রচনার স্বীকৃতি স্বরূপ কী উপাধি লাভ করেন?
উ : কবিকঙ্কণ।
প্র : কে এই উপাধি প্রদান করেন?
উ : রাজা রঘুনাথ রায়।
প্র : তাঁর রচনা কি কারণে স্মরণীয়?
উ : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানব-রসের তিনি প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা।
প্র : আধুনিককালে জন্মালে মুকুন্দরাম কবি না হয়ে কী হতেন বলে মনে করা হয়?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : মুকুন্দরাম সৃষ্ট কোন চরিত্রগুলোকে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত বলা হয়?
উ : বেনে মুরারি শীল, দাসী দুর্বলা ও ভাঁড়ু দত্ত।

রামনিধি গুপ্ত

প্র : রামনিধি গুপ্তর ডাক নাম কী?
উ : নিধু (বাবু)

৩২১ 5/12 21:20

প্র : তিনি কী কারণে বিখ্যাত?
উ : বাংলা টপ্পা সঙ্গীতের প্রবর্তক হিসেবে।
প্র : কিভাবে তিনি টপ্পা সৃষ্টি করেন?
উ : বাংলায় টপ্পা গান ছিল না। ১৭৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরি সূত্রে বিহারের ছাপরায় গমন এবং হিন্দুস্তানি টপ্পা শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে তিনি বাংলায় টপ্পা রচনা ও পরিবেশন করেন।
প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত টপ্পার উদাহরণ দাও।
উ : নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?
প্র : তাঁর টপ্পা সঙ্গীত সংকলনের নাম কী?
উ : গীতরত্ন (১৮৩২)।

রামপ্রসাদ সেন

প্র : রামপ্রসাদ সেন বিখ্যাত কিভাবে?
উ : শাক্তসঙ্গীত রচনা করে।
প্র : তাঁর জন্মস্থান ও পিতার নাম?
উ : পশ্চিমবঙ্গের হালিসহরে জন্ম। পিতা রামরাম সেন। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুহলে তাঁকে চাকুরি করতে হয়।
প্র : তিনি কী কী ভাষা জানতেন?
উ : বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, পারসি।
প্র : তিনি কিভাবে শাক্তপদ রচনায় ব্রতী হন?
উ : চাকুরির অবসরকালে, পরে সার্বক্ষণিকভাবে কালীসাধনা ও পদ রচনা করেন।
প্র : শাক্তপদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উ : রামপ্রসাদ সেন।
প্র : রামপ্রসাদের গানের সুর কী নামে পরিচিত?
উ : রামপ্রসাদের গানের সুর 'রামপ্রসাদি সুর' নামে পরিচিত।
প্র : রামপ্রসাদ কোন ধরনের সাধক?
উ : রামপ্রসাদ ছিলেন গৃহী ও সাধক।
প্র : রামপ্রসাদের গান শুনে কে অভিভূত হয়েছিলেন?
উ : বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
প্র : রামপ্রসাদের উপাধি কী? কে দিয়েছিলেন?
উ : রামপ্রসাদের উপাধি ছিল 'কবিরঞ্জন'। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই উপাধি দিয়েছিলেন।
প্র : রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা কত?
উ : প্রায় তিনশ।
প্র : রামপ্রসাদ সেন রচিত পদগুলোকে কী বলা হয়?
উ : শ্যামা সঙ্গীত বা রামপ্রসাদী বা শাক্ত পদাবলি।
প্র : রামপ্রসাদ কী সন্ন্যাসী ছিলেন?
উ : না। তিনি অন্তরে বৈরাগ্য নিয়েছেন, কিন্তু গৃহত্যাগ করেন নি।
প্র : 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই'— কার উক্তি?
উ : রামপ্রসাদ সেনের।
প্র : রামপ্রসাদের আর একটি বিখ্যাত গান কী?
উ : মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।
প্র : রামপ্রসাদ সেনের জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
উ : জন্ম ১৭২০, মৃত্যু ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ

প্র : শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহর জন্মসন কত?
উ : ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : হুগলির হাফিজপুর গ্রামে বালিয়া পরগনায়।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, পুথি সাহিত্যের দোভাষী।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : আমীর হামজা, সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুথি ও ইউসুফ জোলেখা
প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : অজ্ঞাত।

শাহ মুহম্মদ সগীর

প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর এর জন্মসন কত?
উ : আনুমানিক ১৪-এর শেষ থেকে ১৫ শতক।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কোন অর্থে প্রাচীন কবি?
উ : মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যটির নাম কী?
উ : ইউসুফ জোলেখা
প্র : তিনি ইউসুফ জোলেখা কাব্য রচনায় রাজবন্দনায় কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ?
উ : সুলতান গোছ (অর্থাৎ গিয়াসদ্দিন আযম শাহ)
প্র : তাঁর রচিত কাব্যে কী শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়?
উ : প্রাকৃত ভাবাপন্ন। তাছাড়া আরবি-পারসি শব্দবহুলতা।
প্র : ইউসুফ জোলেখার প্রেম কাহিনির উৎস কোথায়?
উ : ধর্মগ্রন্থ কোরানে এই কাহিনি আছে।
প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর গ্রন্থের কাহিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন?
উ : পারসি কবি আবদুর রহমান জামি রচিত ইউসুফ জোলেখা থেকে।
প্র : শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখার কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
উ : তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখার আজিজের সঙ্গে বিয়ে হয়। ক্রীতদাস ইউসুফের (নবি) প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে জোলেখা তাকে আকর্ষণ করে। নানা ঘটনায় ইউসুফ মিশরের অধিপতি হয় এবং তাঁর মনেরও পরিবর্তন ঘটে। ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে ইউসুফ-জোলেখার মিলন হয়। সুফিরা ইউসুফকে পরমাত্মা জোলেখাকে জীবাত্মার প্রতীক বিবেচনা করেন। সগীরও তাই করেছেন। তবে বর্ণনায় প্রেমের আবহটি প্রধান হয়েছে। সগীর ছাড়া একই কাহিনি নিয়ে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ কাব্য লিখেছেন।
প্র : সগীর রচিত ইউসুফ জোলেখা কাব্যে 'জোলেখার প্রেম নিবেদন' অংশ থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত কর।
উ : ব্যাধি এ পীড়িত মোর বিফল শরীর।
ঔষধ দর্শনে প্রাণ শান্ত নহে স্থির।
এহেন নির্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা ভীতি কর উপভোগ।
না জানি কেমন আছে নিষেধ কারণ।
বুঝিনু তোমার ইচ্ছা আমার মরণ।
প্র : সগীরের কাব্যে কোন নিকটি প্রধান?
উ : আধ্যাত্মিক প্রেমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা নয়, মানবপ্রেমের প্রাধান্য।

সৈয়দ সুলতান

প্র : সৈয়দ সুলতানের জন্ম ও পরিচয় দাও।
উ : জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০ থেকে ১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি। চট্টগ্রামের পটিয়ায় জন্ম। কবি পীর সৈয়দ হাসানের ভক্ত ছিলেন।
প্র : তিনি কোন গ্রন্থ রচনা করার জন্য বিখ্যাত? গ্রন্থ সম্পর্কে লিখ।
উ : নবীবংশ। গ্রন্থটি ১৫৮৪ সালে রচিত। হযরত মুহম্মদের জীবনীকাব্য এটি। এর দুটি খণ্ড। এখানে হিন্দু দেবদেবী ও মুসলিম পয়গম্বরের উল্লেখ থাকলেও ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য ছিল।
প্র : সৈয়দ সুলতানের অন্য প্রধান গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : জ্ঞানপ্রদীপ, জ্ঞানচৌতিশা ইত্যাদি।
প্র : 'নবীবংশ' কোন কাব্যের অনুসরণে রচিত।
উ : পারসি কাব্য কাসাসুল আম্বিয়া
প্র : 'নবীবংশে'র দ্বিতীয় খণ্ডের নাম কী?
উ : রসুল চরিত। মধ্যযুগে রচিত হযরত মুহম্মদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী হিসেবে রসুল চরিতই শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আধুনিক যুগ

সাধারণ আলোচনা

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ অসংখ্য ক্ষণজন্মা লেখকের অবদানের ফলে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এর প্রথম থেকেই বাঙালিদের পাশাপাশি অনেক অবাঙালি ব্যক্তিত্ব তাঁদের মনন ও মেধা ব্যয় করেছেন। এ-সব কারণে বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধি এসেছে। দেশীয় ও পাশ্চাত্য মত ও দর্শন চিন্তার অভিঘাতও লেগেছে আধুনিক সাহিত্যে। অনেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন সত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবেই সাহিত্যাঙ্গনে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা পাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই স্বাতন্ত্র্যবাদই সম্ভবত আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা গেছে শুধু কবিতায় সাহিত্য রচিত হতো। আধুনিককালে কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ সময় সাহিত্য নিয়েছে নানা মাত্রায় মোড়। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প সহ বহু কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যাঙ্গিকেও এসেছে নতুন সুর। তাছাড়া কবিতাতেও গদ্য প্রবেশ করল, এল গদ্যকবিতা। আজ অবশ্য আধুনিক যুগ অতিক্রম করে উত্তর আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছি বলে কেউ কেউ মনে করছেন। মর্মগত নৈরাশ্যবোধ থেকে এই উত্তরাধুনিক যুগচেতনার উদ্ভব বলে দাবি করেন এর বিপরীত মত পোষণকারীগণ। সাহিত্য এরকম দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের আগে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা ছিল মূলত কবিতা বা পদ্য নির্ভর। উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যে মূলগত যে বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয় তা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হলো :

১. গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব
২. সাময়িকপত্রের আবির্ভাব
৩. নাট্যসাহিত্যের জন্ম
৪. প্রবন্ধ (চিন্তামূলক) সাহিত্যের সৃষ্টি ইত্যাদি।

এ সময় প্রথাগত কবিতার বদলে কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পাশ্চাত্য প্রভাব অঙ্গীভূত হয়েছে। এছাড়াও সাহিত্যে চেতনাগত পরিবর্তনও পরিদৃষ্ট হয়। এগুলো হচ্ছে প্রকৃতিবোধ, শিল্পচেতনা, সর্বোপরি অদৃষ্টবাদের পরিবর্তে মানবনির্ভরতা বা মানবপ্রাধান্য। আর এ সময় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গদ্যচর্চা আরম্ভ হয়। এর আগেও অবশ্য গদ্যচর্চা হয়েছে। তবে তা চিঠিপত্রে বা দলিলে। কিন্তু সংবাদ, সাহিত্য বা শিক্ষাবিস্তারে গদ্যের ব্যবহার এ সময় ব্যাপকভাবে হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা চর্চা এগিয়ে যায়।

প্র : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কী?

উ : কলকাতার 'গড়ের মাঠ'-এর পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম ভবনে এই কলেজ বা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৮০০ সালে। ফোর্ট বা দুর্গটি আরো পুরোনো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সর্বাধিক বিখ্যাত দুর্গ এটি। ফোর্ট উইলিয়ামের মাধ্যমেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের ঘাঁটি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সামরিক শক্তি প্রদর্শনের একটি বড়নিদর্শন এই দুর্গ। এটি অষ্টকোণ ও পরিখাবেষ্টিত। চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার বেষ্টনী, ভেতরে একটি ছোট-খাট শহর। প্রায় ১০,০০০ জন সৈনিকের বাসোপযোগী ব্যারাক, অস্ত্রশালা, গির্জা, কুচকাওয়াজের মাঠ, দোকান প্রভৃতি আছে। ভেতরে যাতায়াতের ৬টি গেট; অনুমতি ছাড়া ভেতরে যাওয়া যায় না। ইংরেজ সৈন্য চলে যাওয়ায় তাদের গির্জাগুলি এখন সভাগৃহরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা এই দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। ১৭৭৩-এ ওয়ারেন হেসটিংসের শাসনকালে নির্মাণ শেষ হয়। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা ৪র্থ উইলিয়ামের নামানুসারে দুর্গের নাম হয় ফোর্ট উইলিয়াম। বাস্তবে দুটি ফোর্ট উইলিয়াম ছিল। একটি পুরনো, অন্যটি নতুন। পুরনো দুর্গটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনাকালের সৃষ্টি। স্যার চার্লস আইয়ার এই দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। তাঁর উত্তরসূরি জন বিয়ার্ড ১৭০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তর-পূর্বাংশের দুর্গপ্রাচীর সংযোজন করেন। ১৭০২ সালে তিনি দুর্গের মধ্যভাগে বাণিজ্যকুঠি বা 'গভর্নমেন্ট হাউস' নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৭০৬ সালে শেষ হয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করেন এবং ইংরেজদের তাড়িয়ে দেন। পরে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে উপমহাদেশে ইংরেজদের অবস্থান সংহত হতে থাকে। '১৭৮০ সালে দুর্গটি সম্প্রসারিত হয়। এর প্রায় একশ বছর পরে দুর্গটিকে আধুনিকায়ন করে অষ্টভুজাকৃতির রূপ দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই দুর্গটি অদ্যাবধি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দুর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছিল লালদিঘির উত্তরে (বর্তমান) রাইটার্স বিল্ডিং যেখানে অবস্থিত সেখানে। কোম্পানির সাহেব কর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাবার জন্য এই কলেজ স্থাপিত হয় (১৮০০)। কিন্তু এই কলেজকে কেন্দ্র করেই বাংলা ও উর্দু গদ্যসাহিত্যের জন্ম হয়েছে। এই কলেজ হতে প্রকাশিত বাংলা বইগুলো বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচিত পাঠ্যপুস্তক এবং রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য কতিপয় লেখকের গদ্যরচনা বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের আদর্শ ছিল। (পাদ্রী) উইলিয়াম কেরি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। রামরাম রসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন কেরির দুই প্রধান বাংলা নবিস সহকারী। রামরামের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও 'লিপিমালা' (১৮০২) এবং মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮০০) বাংলা গদ্যসাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের স্মৃতি বহন করছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা আরও কয়েকখানা বই, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' (১৮০৫, বাংলা গদ্যে প্রথম জীবনী), চণ্ডীচরণ মুন্সির 'তোতা ইতিহাস' এবং হরপ্রসাদ রায় বিরচিত 'পুরুষ পরীক্ষা' (১৮১৫)। কেরি নিজে লিখেছেন: 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)। এসব বই-ই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছিল।

প্রধান সাহিত্যিক ও তাঁদের কর্মের পরিচয়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কোথায়?
উ : নোয়াখালি।
প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম কত সালে?
উ : ১৯০৩।
প্র : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : ফরিদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক।
প্র : কর্মজীবন শুরু করেন কীভাবে?
উ : ১৯৩১ সালে মুন্সেফ রূপে।
প্র : তিনি কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন?
উ : কল্লোল গোষ্ঠীর।
প্র : যে পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কী?
উ : কল্লোল।
প্র : কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি বাংলা কোন ধারা সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন?
উ : তিরিশের আধুনিক ধারা।
প্র : তিনি কখন 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন?
উ : ১৯২৫ সালে।

প্র : তিনি কী কী লেখায় দক্ষতার পরিচয় দেন?
উ : গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও জীবনীকাব্য রচনায়।
প্র : তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম কী এবং কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : 'বেদে', ১৯২৮ সালে।
প্র : 'বেদে' উপন্যাসটি কিসের জন্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস?
উ : গ্রন্থনাভঙ্গি ও বিষয়বিন্যাসের জন্য।
প্র : তাঁর অপর দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'কালজ্যোৎস্না (১৯৩১); 'প্রথম কদমফুল' (১৯৬১)
প্র : তিনি কী লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন?
উ : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ জীবনীগ্রন্থ (৪ খণ্ড) (১৯৫২)
প্র : তাঁর লিখিত অন্য একটি অসাধারণ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম কী?
উ : কল্লোল যুগ (১৩৫৭)।
প্র : তিনি কী লিখে খ্যাতিমান হয়েছিলেন?
উ : ছোটগল্প লিখে।
প্র : তাঁর প্রথম ছোটগল্পের নাম কী?
উ : 'টুটা-ফুটা' (১৯২৮)
প্র : তাঁর কবিতার ভাববস্তু কি?
উ : রোমান্টিকতা ও গণচেতনা উভয়ই।
প্র : তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কী?
উ : 'অমাবস্যা' (১৯৩০)
প্র : তাঁর অন্যান্য কবিতাগ্রন্থ কী?
উ : আমরা (১৯৩৩), প্রিয়া ও পৃথিবী (১৯৩৬) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

প্র : অতুলচন্দ্র গুপ্তের জন্ম কোথায়?
উ : বিক্রাইক গ্রাম, টাঙ্গাইল।
প্র : তাঁর জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৮৪ সালে
প্র : তিনি মূলত কি ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক এবং আইনজীবী।
প্র : তাঁর পিতার নাম কি?
উ : উমেশচন্দ্র গুপ্ত।
প্র : তাঁর শিক্ষগত যোগ্যতা কী ছিল?
উ : তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে ও দর্শন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি.এ., দর্শন শাস্ত্রে এম.এ এবং রিপন কলেজ থেকে বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তিনি কী লিখে খ্যাতি লাভ করেন?
উ : গল্প লিখে।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থ কী?
উ : কাব্যজিজ্ঞাসা, শিক্ষা ও সভ্যতা, শ্রী পথে, মনির মালিক।
প্র : তাঁর রচিত রসতত্ত্বের বিশিষ্ট গ্রন্থ কী?
উ : 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (১৯২৮)।
প্র : তিনি কোন গবেষণা গ্রন্থ লিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সেব পুরস্কার লাভ করেন?
উ : Trading with the Enemy.
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : কলিকাতা, ১৯৬১।

অতুলপ্রসাদ সেন

প্র : অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম কোথায়?
উ : ঢাকা শহরে।
প্র : তাঁর জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৭১ সালে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, গীতিকার ও গায়ক।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী ছিল?
উ : ১৮৯০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। এর পরে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি।
প্র : তিনি বাংলা গানে কী আমদানি করেন?
উ : সর্বপ্রথম ঠুমরি আমদানি করেন।
প্র : তিনি কী রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন?
উ : সুরকার হিসেবে।
প্র : সঙ্গীত ভুবনে তাঁর বিশিষ্ট স্থান কিসের জন্য?
উ : গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।
প্র : তাঁর রচিত গানগুলো কয় ভাগে বিভক্ত?
উ : স্বদেশি সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, প্রেমের গান।
প্র : তাঁর কোন গানগুলো জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে জনসাধারণের মনে প্রেরণা যোগায়?
উ : মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও স্বজাতির উদ্দেশে নিবেদিত গানগুলো।

প্র : তাঁর কোন গান ঘাটের দশকে পূর্ব বাংলার একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল?
উ : 'সোনার গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।'
প্র : তাঁর রচিত গানের সংখ্যা কত?
উ : প্রায় দুশোটি।
প্র : তাঁর গানের সকলন কি?
উ : 'কয়েকটি গান ও গীতিগুচ্ছ' (১৯৩১)
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ১৯৩৪ সালে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ

প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোথায়, কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন?
উ : গোকর্ণ গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ১৯১৪ সাল।
প্র : তিনি কোন বয়সে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাত্র বয়সে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'নবশক্তি'।
প্র : তিনি কী দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন?
উ : 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় সাংবাদিকতা দিয়ে।
প্র : কোন পত্রিকায় তিনি বেনামে কবিতা লেখেন?
উ : 'মোহাম্মদী'।
প্র : তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাসটির নাম কী? তার খণ্ড কয়টি?
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম'; ৪ খণ্ড।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রথম কোন মাসিক পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : 'মোহম্মদী' পত্রিকায়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে।
প্র : উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি কোন উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে ধীবর সমাজের কাহিনিকে তুলে এনেছেন?
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম'।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে কৃষিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 'তিতাস' নামক নদীতীরের ধীবর (জেলে ও মৎস্যজীবী) সমাজের রীতি-নীতি, ধর্ম-সংস্কার উৎসব ও জীবনযাপনের অনবদ্য কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের ও অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে কিভাবে এই সমাজের বুকে বিপর্যয়ের ঢেউ লাগল, আর প্রকৃতির খেয়ালে একদিন তিতাসের ধারা কিভাবে শুকিয়ে গেল, সেই সঙ্গে নেমে হয়ে এল ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন এর যথার্থ প্রতিফলন আছে উপন্যাসে। সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার এই উপন্যাসে লক্ষণীয়।
প্র : উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ণ হয় কবে, কে করেন?
উ : ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে, ঋত্বিক ঘটক।
প্র : তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : নয়াবসত, রামধনু, সাদা হাওয়া ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কবে?
উ : ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫১।

'তিতাস একটি নদীর নাম' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস বাংলা কত সালে প্রকাশিত হয় এবং কোন পত্রিকায়?
উ : ১৩৫২; 'মোহাম্মদী'।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে কোন বিষয়কে অবলম্বন করা হয়েছে?
উ : জেলে ও মৎস্যজীবীদের অন্ত্যজ জীবন।
প্র : কিশোরদের গ্রামের নাম কী?
উ : গোকর্ণঘাট।
প্র : 'কিন্তু কালা আখর যে কী চিজ অখন কিছু কিছু টের পাই'– এখানে 'কালা আখর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : বর্ণমালা।
প্র : 'ভোরের হাওয়ায় তার তন্দ্রা ভাঙে'- কার?
উ : তিতাস নদীর।

প্র : 'মনের মত মানুষ পাইলাম না'- কে মনের মত মানুষ পেলো না?
উ : জনৈক মালো যুবক।
প্র : কোন পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রথম কর্ম জীবন শুরু করেন?
উ : 'ত্রিপুরা' পত্রিকা।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণ কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন-
উ : নবশক্তি, ত্রিপুরা ও মোহাম্মদী পত্রিকার সঙ্গে।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'সাদা হাওয়া' কোন ধরনের উপন্যাস?
উ : রাজনৈতিক।
প্র : 'ধানত এইবার খুব ফলছে।'-উক্তিটি কার?
উ : রামপ্রসাদের।
প্র : অদ্বৈত মল্লবর্মণের নাগরিক উপন্যাস কোনটি?
উ : 'সাদা হাওয়া'।
প্র : 'তোমার আমার ঘরই নাই, তার আবার মানুষ'- উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : করমালীর।
প্র : 'হেই পুলা, তুই আমার নাওয়ে যাইবি? আমি খালে-বিলে জাল লইয়া ঘুরি, মাছ ধরি- মাছ বেচি, নাওয়ে রান্ধি-নাওয়ে খাই।'- উক্তিটি কার?
উ : কিশোরের।
প্র : 'সে তখন পরের বাড়ির কাঁথা সিলাই করে, আর সে সুইচের ফোড় আমার বুকে আইয়া বিন্ধে।'- কার বুকে সুচ বিঁধে?
উ : করমালীর।
প্র : বিজয় নদী তিতাস নদী থেকে কত মাইল দূরে প্রবাহিত?
উ : ১৩ মাইল।
প্র : যে বউ বাপের বাড়িতে যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে কী থাকে?
উ : জল।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রের নাম কী?
উ : বাসন্তী।
প্র : 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রের নাম কী?
উ : কিশোর।
প্র : বড় নৌকার মাঝিরা কার জিম্মায় চলন্ত নৌকা ও জাল রেখে আসে?
উ : নিকারীর জিম্মায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

প্র : অন্নদাশঙ্কর রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের ঢেঙ্কানলে।
প্র : তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ : পিতা- নিমাইশঙ্কর রায়,
মাতা- হেমনলিনী দেবী।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন কোথায় অতিবাহিত হয়?
উ : বিহারের পাটনা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২১)। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এ. পরীক্ষায় ১ম স্থান, একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ১ম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পরে আইসিএস পরীক্ষায় পাস।
প্র : তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৬), কুমিল্লার জজ (১৯৩৯), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সচিব (১৯৫০) পদে অবসরগ্রহণ।
প্র : তাঁর মূল পরিচয় কী?
উ : বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। শতাধিক গ্রন্থের লেখক।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার নাম কী?
উ : 'তিনটি প্রশ্ন' ('প্রবাসী', ১৯২০)।
প্র : তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থের নাম কী?
উ : 'রাখী' (১৯৩২)।
প্র : তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'অসমাপিকা' (১৯৩০)।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান কবিতাগুলোর নাম লেখ?
উ : রাখী (১৯৩২), কালের শাসন (১৯৩৩), কামনা পঞ্চবিংশতি (১৯৩৪), নূতনা রাধা (১৯৪৩), লিপি, জার্নাল, ক্রীডো প্রভৃতি।

প্র : তাঁর রচিত প্রধান উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : প্রাণ যেথা দেশ (১৯৩২), অজ্ঞাতবাস (১৯৩৩), কঙ্কাবতী (১৯৩৪), দুঃখমোচন (১৯৩৬), মর্তের স্বর্গ (১৯৪০), অপসরণ (১৯৪২)- ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত পটভূমিতে রচিত এপিকধর্মী এই উপন্যাস ছয়টি তত্ত্বপ্রধান ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তবে কিছুটা কৃত্রিম।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান ছোটগল্পগুলোর নাম কী?
উ : প্রকৃতির পরিহাস (১৯৩৪), মন পবন (১৯৪৬), যৌবন জ্বালা (১৯৫০), কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : তারুণ্য (১৯৩৭), জীবনশিল্পী (১৯৪১), দুশারা (১৯৪৩), বিনুর বই (১৯৪৪), জীয়ন কাটি (১৯৪৯), দেশকাল পাত্র (১৯৪৯), প্রত্যয় (১৯৫১), নতুন করে বাঁচা (১৯৫৩), আধুনিকতা (১৯৫৩) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনিগুলোর নাম কী?
উ : পথে প্রবাসে (১৯৩১), ইউরোপের চিঠি (১৯৪২) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উ : গদ্যভাষায় বীরবলী (প্রমথ চৌধুরীর মতো) চমক ও গভীর মননশীলতা রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
প্র : তিনি প্রধান কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : একাডেমি পুরস্কার (১৯৩২), বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮০), আনন্দ পুরস্কার (১৯৮৩)।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৮শে অক্টোবর ২০০২, কলকাতায়।

অমিয় চক্রবর্তী

প্র : অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম কোথায়?
উ : শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তাঁর জন্মতারিখ কত?
উ : ১০ই এপ্রিল, ১৯০১।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ; দর্শন ও সাহিত্যে এম.এ. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব হিসেবে সায়িত্ব পালন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : একজন শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবি।
প্র : কাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল?
উ : কবি ইয়েটস, জর্জ বার্নাড শ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, আলবার্ট সোয়াইটজর প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীর সঙ্গে।
প্র : তিনি কোন সময়ের কবি ছিলেন?
উ : ত্রিশের দশকের।
প্র : বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান কোথায়?
উ : রবীন্দ্র প্রভাবিত কাব্য-বলয়ের বাইরে।
প্র : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি কিভাবে যুক্ত ছিলেন?
উ : তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন।
প্র : কবিতা ছাড়াও কিসে তাঁর পরিচিতি লাভ হয়?
উ : গদ্যশিল্পী হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত বিশেষ কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : 'খসড়া' (১৯৩৮); 'এক মুঠো' (১৯৩৯); 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২); 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৫০), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর গদ্যরচনাগুলো কী?
উ : 'চলো যাই'; 'সাম্প্রতিক'; 'পূর্ববাসী'; 'পথ অন্তহীন' ইত্যাদি।
প্র : 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : অমিয় চক্রবর্তীর 'এক মুঠো' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। বিশ শতকের বিজ্ঞানের যুগে ব্যবহারিক জীবনে যেমন জটিলতা বাড়ছে, মানুষের মনেও তেমনি চিন্তার জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চেতনায় যুগধর্মের এই বৈশিষ্ট্য খুব উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছে এই কাব্যে। কবি এখানে সময়কে বিবেচনায় এনে এই সময়গত মানব-মানবীর অন্তর্গত সুখ ও সমস্যা ধরার চেষ্টা করেছেন।
প্র : 'বাংলাদেশ' কবিতাটি তিনি কোন প্রেক্ষাপটে রচনা করেন?
উ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : 'ইউনেস্কো পুরস্কার' (১৯৬০), 'ভারতীয় ন্যাশনাল একাডেমি পুরস্কার', ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি (১৯৭০) প্রাপ্ত।
প্র : কতসালে তাঁর মৃত্যু হয়?
উ : ১৯৮৬ সালে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

প্র : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোহাটি গ্রামে (মাতুলালয়ে)।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : কথাসাহিত্যিক
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লিখ।
উ : উপন্যাস: চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭), খোয়াবনামা (১৯৯৬) ছোটগল্প: অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫), দোজখের ওম (১৯৮৯)।
প্র : আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ : অনাহার, অভাব, দারিদ্র্য ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবনযাপন করছে সে-সব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত।
প্র : তাঁর মহাকাব্যোচিত উপন্যাস কোনটি?
উ : 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' উভয়ই।
প্র : 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : উনসত্তরের (১৯৬৯) গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই'। কোন বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন মিলিত হয়েছিল ওসমান। জনজীবনের সমগ্রতাকে, বিশেষ করে গ্রাম ও শহরের সমস্ত মানুষকে ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। ওসমানের পিতার মৃত্যুর স্বপ্নদৃশ্য নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ। এই ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতোটাই বিভিন্ন এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠার বাস করা তার জন্য যথাযথ হয়েছে। অথচ বামপন্থী ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ নেতা, শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালা এমন কি বাড়িওয়ালার কন্যার সঙ্গে বিভিন্নভাবে তার যোগাযোগ হচ্ছে। ওসমান যেন ছোট ছোট কাহিনির সূত্রধর। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মহাকবির মতো ছোট ছোট কাহিনি-পর্বকে সুন্দর সম্মিলনের মাধ্যমে একটি মহাকাব্যিক উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। এখানে ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পূর্বরূপটি ওঠে এসেছে।
প্র : 'খোয়াবনামা'র বিষয় কী?
উ : গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান এ উপন্যাসে নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এই উপাদানসমূহ অবলম্বন করে বাঙালির তথা মানবজীবনের সংগ্রামও এগিয়ে যাওয়াই উপন্যাসটির বিষয়।
প্র : 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সালে রচিত নিরুদ্দেশ যাত্রা, উৎসব, প্রতিশোধ, যোগাযোগ, ফেরারী, অন্য ঘরে অন্য স্বর ইত্যাদি গল্প নিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। ব্যক্তিমানুষই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। তাছাড়া প্রথমবারের মতো পুরানো ঢাকার জনজীবন গল্পগুলোতে বিশেষত্ব পেয়েছে যা বাংলাদেশের বাংলাকথাসাহিত্যে যুক্ত করেছে এক নতুন স্বাদ ও মাত্রা।
প্র : তিনি প্রধান কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২)।
প্র : তিনি কোন রোগে কত তারিখে মারা যান?
উ : ক্যান্সারের; ১৯৯৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি।

'রেইনকোট' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রেইনকোট' গল্পটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৯৫ সালে।
প্র : পাকিস্তানের গাঁয়ের কাঁটা কী ছিল?
উ : শহিদ মিনার।
প্র : প্রিন্সিপাল আফাজ আহমদ মিলিটারির বড় কর্তাদের কাছে কী নিবেদন করেছিলেন?
উ : পাকিস্তান বাঁচাতে হলে সব স্কুল কলেজ থেকে শহিদ মিনার হটানোর জন্য।
প্র : মগবাজারের বাসা থেকে মিন্টু কবে চলে গিয়েছিল?
উ : জুন মাসের ২৩ তারিখে।
প্র : যুদ্ধ শুরু হবার পর হুদা সাহেব কত বার বাসা পাল্টিয়েছিলেন?
উ : চার বার।
প্র : কার শ্বশুর বড় গোছের রাজাকার?
উ : ওয়েলডিং ওয়ার্কশপের মালিকের।
প্র : হুদা সাহেবের মেয়ের বয়স কত ছিল?
উ : আড়াই বছর।
প্র : হুদা সাহেবের ছেলের বয়স কত ছিল?
উ : পাঁচ বছর।
প্র : স্টেট বাসগুলো কী রঙের ছিল?
উ : লাল রঙের।
প্র : আসাদ গেটে বাস থামলে সেখান থেকে কত জন লোক বাসে উঠেছিল?
উ : নয় জন।
প্র : মসজিদের ছাদ থেকে মুয়াজ্জিন সাহেব নিচে পড়ে গিয়েছিল কেন?
উ : মিলিটারিদের গুলিতে।
প্র : প্রিন্সিপালের চেয়ার দেখতে কেমন ছিল?
উ : সিংহাসন মার্কা।
প্র : কলেজের জন্য কয়টি আলমারি কেনা হয়েছিল?
উ : সর্বমোট দশটি।
প্র : মুক্তিযোদ্ধা তথা মিলিটারিদের ভাষায় মিসক্রিয়েন্টরা কী বেশে কলেজে ঢুকেছিল?
উ : কুলির বেশে।
প্র : 'বর্ষাকালেই তো জুৎ' কথাটি কথার বলা হয়েছিল?
উ : দুবার।
প্র : 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
উ : 'সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটিজ' কথাটির অর্থ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রম। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাকে পাকিস্তান সরকার ও তাদের সমর্থকরা ১৯৭১ সালে উক্ত নামে অভিহিত করতো।
প্র : 'ক্রাক-ডাউনের রাত' কথাটির মানে কী?
উ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ নিরাপত্তা রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা পরিচালনা করে, সেই রাতের কথা বোঝাতে উক্ত কথাটি ব্যবহৃত হয়।
প্র : গল্পের নাম 'রেইনকোট' হবার তাৎপর্য কী?
উ : মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকের রেইনকোট গায়ে দিয়ে সাধারণ ভীতু প্রকৃতির নুরুল হুদার ভেতর সঞ্চারিত হয় উষ্ণতা, সাহস ও দেশপ্রেম– তারই ব্যঞ্জনা প্রকাশে রেইনকোটকে প্রতীকী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
প্র : 'রেইনকোট' গল্পে মিলিটারি ক্যাম্প কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : কলেজের জিমন্যাশিয়ামে।
প্র : নুরুল হুদা কেন ভ্যাবাচ্যাকা খায়–
উ : ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের নতুন রূপ দেখে।
প্র : প্রিন্সিপালের পিওনের নাম কী ছিল?
উ : ইসহাক মিয়া।
প্র : মিন্টুর বোনের নাম কী?
উ : আসমা।
প্র : উর্দু বিভাগের অধ্যাপকের নাম কী ছিল?
উ : আকবর সাজিদ।
প্র : ইসহাক কোন মাসের শুরু থেকে বাংলা বলা ছেড়ে দেয়?
উ : এপ্রিল।

প্র : পাকিস্তানিদের জন্য প্রিন্সিপাল দিনরাত কী করতো?
উ : সোয়া-দুরুদ পড়তো।
প্র : জেনারেল স্ট্রেটমেন অর্থ কী?
উ : সাধারণ বিবৃতি।
প্র : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরাজিত হয়ে ছিল–
উ : রাশিয়ার রুশ বাহিনীর হাতে।
প্র : প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করতেন–
উ : মজিদ আকবরকে।
প্র : মুক্তিফৌজরা কোথায় বোমা ফেলেছিল?
উ : প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে।
প্র : রেইনকোট পরার পরে লেখককে কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : শ্যালক মিস্টুর মতো।
প্র : কোথায় অর্ধেকের বেশি জায়গা স্বাধীন–
উ : রংপুর, দিনাজপুর।
প্র : নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার–
উ : কেমিস্ট্রির বা রসায়নের।
প্র : কত দিন ধরে বৃষ্টি চলছিল?
উ : টানা তিন দিন।
প্র : নুরুল হুদার সাথে আর কাকে মিলিটারির জিপে তোলা হয়–
উ : আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
প্র : রেইনকোটের ওপর চাবুকের বাড়ি নুরুল হুদার কাছে স্রেপ উৎপাত মনে হয়েছিল কেন?
উ : মুক্তিযুদ্ধার ব্যবহৃত জিনিস তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবিত করে। তাই পাকিস্তানী যখন তাকে চাবুক মারতে থাকে। তখন তার মনে হয়– এ যেন স্রেপ উৎপাত।

আনিসুজ্জামান

প্র : লেখক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত নাম কী?
উ : এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা-স্ত্রীর নাম কী?
উ : পিতার নাম : এ.টি.এম. মোয়াজ্জেম; মাতার নাম : সৈয়দা খাতুন; স্ত্রীর নাম : সিদ্দিকা জামান।
প্র : তিনি কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়।
প্র : আনিসুজ্জামানের প্রকৃত পরিচয় কী?
উ : তিনি শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)।
প্র : তিনি কোথা থেকে কী শিরোনামে ডক্টরেট করেন?
উ : ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' শিরোনামে। এই গবেষণাপত্রকে তিনি 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) নামে গ্রন্থরূপ দেন।
প্র : তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬); 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩); 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে' (২০০০); 'কাল নিরবধি' (২০০৩) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পদক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উল্লেখযোগ্য পদক ও পুরস্কার হলো : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০); একুশে পদক (১৯৮৫); আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪); ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (২০১৪)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. পান ২০০৫ সালে।

'জাদুঘরে কেন যাব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পাশ্চাত্যদেশে কোনগুলো স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃংখলা হিসেবে বিকশিত?
উ : জাদুঘরতত্ত্ব-মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ।
প্র : পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : আলেকজান্দ্রিয়ায় (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে)।

প্র : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়া কী কাজে ব্যবহৃত হতো?
উ : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ছিল, উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে সেখানে মূলত দর্শনচর্চা হতো।
প্র : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে কী কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়?
উ : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে দুটি কারণ আছে বলে ধারণা করা হয়। এক, জাদুঘরটি গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক। দুই, দর্শকেরা সেখানে যেত নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, কেউ কেউ হয়তো পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখতো।
প্র : জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি কী ছিল?
উ : জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে যারা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক উদ্যোগে সংগৃহীত হতে থাকে প্রাচীন নিদর্শনগুলো। এটাই জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি।
প্র : পাশ্চাত্যে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ শুরু হয়?
উ : ইউরোপীয় রেনেশাঁসের পর পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে, প্রাচ্যদেশে অনেক আগ থেকেই সংগ্রহ হতো বলে ধারণা করা হয়।
প্র : রাজ-রাজারা কেন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করতো?
উ : রাজ-রাজাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ ছিল তাদের পরাক্রম, শৌর্য-বীর্য, সম্পদ ও গৌরবগাথার ঘোষণা হিসেবে তা সংগ্রহ হতো।
প্র : যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থান উদ্যোগে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা হয় বলে মনে করা হয়?
উ : ষোল শতকের পরে।
প্র : ল্যুভ বা লুভর মিউজিয়াম কখন গড়ে ওঠে?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে গড়ে ওঠে ল্যুভ বা লুভর মিউজিয়াম।
প্র : ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার উন্মোচিত হয় কখন?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর।
প্র : লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদ কখন গড়ে ওঠে?
উ : রুশ বিপ্লবের পর লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদ গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে।
প্র : ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
উ : টাওয়ার অফ লন্ডন নামক ঐতিহাসিক প্রাসাদ।
প্র : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কোথায়?
উ : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
প্র : অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হয়?
উ : পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল- এই তিনজনের সংগ্রহ নিয়ে।
প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম কার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : আঠার শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়। তবে, স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির সার্বিক সহায়তা ছিল।
প্র : জাদুঘরে সংগৃহীত বিষয় বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধর।
উ : জাদুঘরের বৈচিত্র্য খুব চোখে পড়ার মতো। সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। বর্তমানে ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা প্রবল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ

ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা-তারও নানা প্রকার বিভাগ-উপবিভাগ। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর হিসেবে চিহ্নিত।

প্র : প্রশাসনিক দিক দিয়ে জাদুঘরের প্রকারভেদ লেখ।

উ : প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণির জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তি উদ্যোগে গঠিত জাদুঘর।

প্র : বাংলাদেশে কোন কোন জাদুঘর রয়েছে?

উ : বাংলাদেশে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, চট্টগ্রামে আছে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর।

প্র : বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর কোনগুলো?

উ : রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলধা গার্ডেন। এছাড়া কিছু রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়াম।

প্র : জাদুঘরে কোন বিষয়কে লক্ষ করে জিনিস সংগ্রহ করা হয়?

উ : জাদুঘরে সাধারণত যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময় উদ্রেককারী – এমন বস্তু সংগ্রহ করা হয়।

প্র : 'জাদু' কোন ভাষার শব্দ?

উ : ফারসি।

প্র : জাদুঘর থেকে আমরা কী লাভ করতে পারি?

উ : বঙ্গের হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির নমুনা থেকে আমরা আমাদের অর্থাৎ বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করতে পারি।

প্র : কোন মিউজিয়ামে মিশরের পুরানো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে?

উ : আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো- রোমান মিউজিয়ামে ও কায়রো মিউজিয়ামে মিশরের পুরানো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে।

প্র : ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন কোথায় রয়েছে?

উ : সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।

প্র : ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি কোথায় ধরে রাখা হয়েছে?

উ : ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং টাওয়ার অফ লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরে রাখা হয়েছে।

প্র : ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান কোথায় লক্ষ করা যায়?

উ : কুয়েতের জাদুঘরে।

প্র : জাদুঘরের একটি অন্যতম কাজ কী?

উ : জাদুঘরের একটি অন্যতম প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো।

প্র : কোহিনুর দেখতে কোন মিউজিয়ামে সবাই ভিড় করে?

উ : টাওয়ার অফ লন্ডনে।

প্র : জাতীয় জাদুঘর থেকে আমাদের প্রাপ্তি কী?

উ : জাতীয় জাদুঘর একটি জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির সন্ধান ও আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করা যায়। অন্য জাতির কীর্তির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়, ফলে আত্মসত্তা উন্নীত হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

প্র : জাদুঘর আমাদের কী উপকারে আসে?

উ : জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি যোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান

তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়নের পথও প্রশস্ত হয়। জাদুঘর কেবল জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। ফলে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি করে, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

প্র : ইউরোপীয় রেনেসাঁস কী?

উ : খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ থেকে ষোল শতক ধরে ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের মাধ্যমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণই ইউরোপীয় রেনেসাঁস।

প্র : ফরাসি বিপ্লব কী?

উ : ইউরোপের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই ফরাসি জনগণ সেখানকার কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গ ও কারাগার দখল করে নেয় এবং সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেয়। এর মাধ্যমে এই বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় ধনিক শ্রেণি আর অত্যাচারিত কৃষকরা ছিল তাদের সহযোগী। বিপ্লবের মূল বাণী ছিল 'মুক্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পত্তির পবিত্র অধিকার'। এই বিপ্লবের ফলে সামন্তবাদের উৎপাটন হয়।

প্র : রুশ বিপ্লব কী?

উ : ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী নেতা লেনিনের রাশিয়ায় সর্বহারার দল বলশেভিক পার্টি সেখানকার জারতন্ত্রকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত সম্পত্তি ও উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় জনগণ তথা রাষ্ট্র।

প্র : টাওয়ার অব লন্ডন কী?

উ : লন্ডনের টেমস নদীর উত্তর তীরবর্তী রাজকীয় দুর্গ। এর মূল অংশে রয়েছে সাদা পাথরের গম্বুজ। এটি নির্মিত হয় ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এক সময় দুর্গটি রাজকীয় ভবন ও রাষ্ট্রীয় কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে অস্ত্রশালা ও জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত।

প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম সম্পর্কে লেখ।

উ : প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাকীর্তি সংক্রান্ত জাদুঘর। এটা ব্রিটেনের জাতীয় জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫৩। সে সময়ে ব্রিটিশ সরকার স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন, আর্ল অব অক্সফোর্ড, রবার্ট হার্লি- এই তিন জন সংগ্রাহকের বই, পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, পুরাকীর্তি ইত্যাদির বিশাল ব্যক্তিগত সংগ্রহ ক্রয় করে এই জাদুঘর গড়ে তোলে।

প্র : হার্মিটেজ কী?

উ : সন্ন্যাসীর নির্জন আশ্রম।

প্র : বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাদুঘর হলো জাতীয় জাদুঘর। আমাদের দেশের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজে এটা নিয়োজিত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা জাদুঘর হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। এটা বর্তমান ঢাকার সাহবাগ মোড়ে অবস্থিত।

প্র : বাংলাদেশের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম জাদুঘর। চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদে অবস্থিত এই জাদুঘরে বাংলাদেশের পঁচিশটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ বিদেশি পাঁচটি দেশের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্র : ঢাকা নগর জাদুঘর কোথায়?

উ : ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত এই জাদুঘর নগর ভবনে অবস্থিত। এটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। এর লক্ষ্য ঢাকা নগরের ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

প্র : বঙ্গবন্ধু জাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : বঙ্গবন্ধু জাদুঘর ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বাসভবনকে ১৯৯৭ সালে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এই জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক দুর্লভ ছবি, তাঁর জীবনের শেষ সময়ের কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং তাঁর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

প্র : ঢাকা বিজ্ঞান যাদুঘর সম্পর্কে লেখ।

উ : ঢাকায় অবস্থিত এই জাদুঘরের প্রাতিষ্ঠানিক নাম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ১৯৬২ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ভৌতবিজ্ঞান, শিল্পপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, মজার বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্যালারি ছাড়াও রয়েছে প্লেনেটরিয়াম, আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার ইত্যাদি। তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনামূলক কাজে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

প্র : সামরিক জাদুঘর কী?

উ : ১৯৮৭ সালে মিরপুর সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে শহরের কেন্দ্রস্থল বিজয় সরণিতে এটাকে স্থানান্তরিত হয়। প্রাচীন যুগের সমরাস্ত্র, ট্যাংক, ক্রুজারসহ নানা ধরনের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, আঠারো শতক থেকে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কামান, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিভিন্ন স্মারক ইত্যাদি দেখার সুযোগ এ জাদুঘরে রয়েছে।

প্র : বরেন্দ্র জাদুঘর কোথায় এবং কেন খ্যাত?

উ : প্রাতিষ্ঠানিক নাম বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত ও রাজশাহীতে অবস্থিত। এ জাদুঘর বাংলাদেশের অন্যতম জাদুঘর। এখানে ভাস্কর্য, খোদিত লিপি, পাণ্ডুলিপি ও প্রাচীন মুদ্রার মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণায় এগুলোকে আকর-উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্র : বলধা গার্ডেন কোথায় এবং কেন খ্যাত?

উ : ঢাকা মহানগরের ওয়ারীতে এর অবস্থান। এটা একাধারে উদ্ভিদ উদ্যান ও জাদুঘর। জাওয়ালের জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ১৯০৯ সালে এটা প্রতিষ্ঠা করেন। এই জাদুঘরের অনেক নিদর্শন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বলধা গার্ডেন দেশি-বিদেশি অনেক প্রজাতির গাছপালার আকর্ষণীয় সমাহার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৮ সালে এই উদ্যান পরিদর্শনে এসেছিলেন।

আনোয়ার পাশা

প্র : আনোয়ার পাশা কতসালে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল।

প্র : আনোয়ার পাশার জন্মস্থান কোথায়?

উ : ভবকাই গ্রাম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি, কথাসাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাবিদ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ছিল?

উ : রাজশাহি সরকারি কলেজ থেকে বি এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ।

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো কী?

উ : উপন্যাস : নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিশুতি রাতের গাথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)। গল্পগ্রন্থ : নিরুপায় হরিণী (১৯৭০)। কাব্য : নদী নিঃশ্বেষিত হলে, সমুদ্র শৃঙ্খলতা উজ্জয়িনী।

প্র : তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের নাম কী?

উ : রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩)।

প্র : 'রাইফেল রোটি আওরাতে'র পরিচয় দাও।

উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা প্রথম কয়েকটি উপন্যাসের একটি আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। আয়োজনের দুরূহ বলে অগ্নুৎপাতের কথা লেখা যতোটা কঠিন, যুদ্ধকালে যুদ্ধের তথ্যাবহুতার মধ্যে বসে করে তেমনি যুদ্ধকথা লেখার জন্য চাই সাহস ও মানসিক স্থিরতা। আনোয়ার পাশা তা দেখিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই শিক্ষক অবশ্য উপন্যাসটি লিখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখতে পারেন নি। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করে পাকিস্তানিরা। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। শহিদ হবার আগেই তিনি এই উপন্যাস লিখে যান। 'রাইফেল রোটি আওরাত' নামটিতেই তর্পুর গন্ধ। যদিও শব্দগুলো বাংলা ভাষায় উপস্থিত তবু লেখক এই তিনটি শব্দে লুকিয়েছেন পাকিস্তানি হীন মনোভাবকে। কাফের হত্যার নামে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যায় নেমেছিল বাঙালিদের। উপন্যাসে পাকিস্তানিদের মনোভাব ব্যক্ত আছে এভাবে: 'হাত দেওয়া যায় রোটি ও রাইফেলে। আর আওরাতের গায়ে। দুনিয়ার সেরা চিজ আওরাত, আওর রাইফেল। রোটি খেয়ে গায়ের তাকত বাড়াও, রাইফেল ধরে প্রতিপক্ষকে খতম কর, তারপর আওরাত নিয়ে ফুর্তি কর। ব্যা, এহি জিন্দেগী হ্যায়। এই ত জীবন।' উপন্যাসে বাঙালিদের মধ্যে কথিত শিক্ষিত একাংশ মনে করে 'ইসলাম মানেই পাকিস্তান আর পাকিস্তান মানেই ইসলাম।' তাদের ধারণা: পাকিস্তানের নামে শহিদ হওয়া মানেই ইসলামের নামে শহিদ হওয়া। তাদের বিবেচনায় শহিদের নামে কোনো পৃথক 'শহিদ মিনার' বানানো 'কুফরি কাম'। বানাতে হবে মসজিদ, শহিদ মিনার নয়। আনোয়ার পাশা তৎকালীন পাকিস্তানপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের আদলে সৃষ্টি করেছেন ড. খালেক ও ড. মালেক চরিত্র। ড. খালেক চূড়ান্তভাবে পাকিস্তানপন্থী আর ড. মালেক সুবিধাবাদী। আছে মুসলিম লীগের হরদুম মিয়া, মোনায়েম খানের আশীর্বাদপুষ্ট রাজনৈতিক আলী, অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রমুখ। কিন্তু অধ্যাপক সুদীন শহীদ, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সাহেব, কমিউনিস্টকর্মী সুমন এই উপন্যাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর কথাও আছে এই উপন্যাসে। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখা হয়েছে: 'একাত্তরের একুশের ফেব্রুয়ারীতে রাজপুরের অনুষ্ঠানে সুদীন এখানে এসেছিলেন। কেননা অনেছিলেন, স্বয়ং শেখ সাহেব ঐ সময় আসবেন। এসেছিলেন। পালগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' সুদীন শহিদের চেতনের পরিবর্তনের আলোকে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের প্রভাবকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এভাবে: 'একুশে ফেব্রুয়ারীর ঠিক দুসপ্তাহ পর। রমনা রেসকোর্সে সাতই মার্চের সেই বজ্রকণ্ঠ। সেই কণ্ঠ বিশ্বস্ত শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আবার স্মরণ করলেন সুদীন। কাল থেকে কত বারই তা স্মরণ করলেন। সেই কণ্ঠ ইতঃপূর্বে কোনো বাঙালি অনেছে? হয়তো কখনো অনেছে শশধরের কণ্ঠে, হুসেন শাহের কণ্ঠে কিংবা সিরাজের সেনাপতি মোহনলালের কণ্ঠে। অতঃপর এই সেদিন নেতাজী সুভাষের কণ্ঠে। নেতাজীর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু! তোমার প্রয়াস ব্যর্থ হবে না। আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। সাতই মার্চের রমনা রেসকোর্সে যারা গিয়েছিল তারা কি জীবনের মতো অন্য মানুষ হয়ে যায় নি? অন্ততঃ সুদীন হয়েছিল।' বাঙালি যখন যুদ্ধে যুদ্ধে একাত্তরের ষোলর দিকে এগোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আনোয়ার পাশা ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লেখক। দূরদৃষ্টি না থাকলে এমন উপন্যাস লেখা যায় না। 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রচলিত অর্থের চরিত্রনির্ভর উপন্যাস নয়। ঘটনার প্রবহমানতাই এখানে মুখ্য। শিল্পীকে হত্যা করা গেলেও তাঁর শিল্পকে হত্যা করা যায় না- 'রাইফেল রোটি আওরাত' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ।
প্র : রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত ও প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী আলোচনায় পাশা কবে মৃত্যুবরণ করেন।
উ : ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার্স থেকে পাক হানাদার বাহিনীর অনুগত আলবদর সদস্যরা তাঁকে ঢাকার মিরপুরের বদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

আবদুল কাদির

প্র : আবদুল কাদিরের জন্ম কত সনে?
উ : ১৯০৬ সালের ১লা জুন।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : আড়াই সিধা গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক, ছান্দসিক ও সম্পাদক।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু ছিল?
উ : তিনি অন্নদা মডেল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।
প্র : তিনি প্রথমে কোথায় কর্মরত ছিলেন?
উ : কলকাতায় সওগাত পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে চাকুরি করেন।
প্র : তিনি কার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন?
উ : কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের কন্যা আফিয়া খাতুনের সঙ্গে।
প্র : তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কোন পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন?
উ : দৈনিক নবযুগ পত্রিকায়।
প্র : তিনি অন্য কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় চাকুরি করেন?
উ : মোহাম্মদী ও অর্ধসাপ্তাহিক পয়গাম পত্রিকায়।
প্র : ১৯২৬ সালে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর নেতৃত্বে ঢাকার 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের তিনি কী ভূমিকা পালন করেন?
উ : প্রধান উদ্যোক্তাদের একজন।
প্র : মুসলিম সাহিত্য সমাজ থেকে প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার তিনি কী ছিলেন?
উ : প্রকাশক ও লেখক (১৯২৭)
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কী?
উ : কবিতা : দিলরুবা (১৯৩৩), উত্তর বসন্ত (১৯৬৭); প্রবন্ধ : বাংলা কাব্যের ইতিহাসে : মুসলিম সাধনার ধারা (১৯৪৬), কবি নজরুল (১৯৭০), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৭৬), লোকায়ত সাহিত্য (১৮৮৫)।
প্র : তাঁর মৃত্যুর পরে কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : লোকায়ত সাহিত্য (১৯৮৫)
প্র : মৌলিক রচনা ছাড়াও তিনি কী সম্পাদনা করেছেন?
উ : কাব্য মালঞ্চ, মুসলিম সাহিত্যের সেরা গল্প, নজরুল রচনাবলি (১ম খণ্ড-৫ম খণ্ড) রোকেয়া রচনাবলি, সিরাজী রচনাবলি, মুতাফর রহমান রচনাবলি, ইয়াকুব আলী চৌধুরী রচনাবলি, কাব্যবীথি ইত্যাদি।
প্র : এই সম্পাদনাকর্মের মধ্যে কোন্‌টি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত?
উ : নজরুল রচনাবলি সম্পাদনা।
প্র : সাহিত্যকীর্তির জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, কুমিল্লা ফাউন্ডেশন পদক, মুক্তধারা পুরস্কার লাভ করেন।
প্র : তিনি অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখেন?
উ : শুধু ছন্দ রচনায় নয়, ছন্দ বিচারেও তাঁর অধিকার ছিল।
প্র : তাঁর কোন গ্রন্থে বাংলাছন্দের সামগ্রিক রূপটি বিশ্লেষণ করার প্রয়াস আছে?
উ : 'ছন্দ-সমীক্ষণ'
প্র : তাঁর কাব্য প্রয়াসে কী লক্ষণীয়?
উ : মোহিতলালের ধ্রুপদী সংগঠন ও নজরুলের উদাত্ত আবেগের চমৎকার সমন্বয় সহজে লক্ষণীয়।
প্র : তাঁর মৃত্যু সন কত?
উ : ঢাকা, ১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর; ফরিশালের চরদিয়ায়।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ডানপিটে শওকত (১৯৫৩)।
প্র : 'ডানপিটে শওকত' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উ : শিশুতোষ গ্রন্থ।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?
উ : কৃষ্ণপক্ষ (১৯৫৯)।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থের নাম কী?
উ : চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০)।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : গল্পগ্রন্থ : সম্রাটের ছবি (১৯৫৯), সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০); উপন্যাস : নাম না জানা ভোর (১৯৬২), নীল যমুনা (১৯৬৪), শেষ রাত্রির চাঁদ (১৯৭৬); সম্পাদনা : বাংলাদেশ কথা কয় (১৯৭২)।
প্র : আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর অমর-কর্ম কোনটি?
উ : ভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মরণে রচিত গান: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো /একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি।
প্র : এই গানটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) সংকলন গ্রন্থে।
প্র : গানটির সুরকার কে?
উ : গানটির প্রথম সুরকার আবদুল লতিফ। সেই সুর পরিবর্তন করে আলতাফ মাহমুদ পরে এর সুরারোপ করেন। সেটি এখন বলবৎ আছে।
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক কোন চলচ্চিত্রের কাহিনি রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।
উ : পলাশী থেকে ধানমন্ডি (২০০৭)।

'একুশের গান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'একুশের গান' প্রথম কোথায় ছাপা হয়?
উ : 'একুশের গান' প্রথম ছাপা হয় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনে।
প্র : 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়?
উ : ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের আর একটি পরিচয় কী?
উ : এটি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রকাশিত প্রথম সংকলন।
প্র : একুশে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে লেখ।
উ : পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে চলমান এক মাস ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করে। তারপরও ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ছাত্ররা সভা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল মতিনের প্রস্তাবক্রমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেবার ভার উপস্থিত সাধারণ ছাত্রদের ওপর প্রদান করা হয়। সাধারণ ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেয় এবং তারপরই ১০জন করে একত্র হয়ে বহু মিছিল বের করা হয়। একে বলা হয় 'দশজনী মিছিল'। সেই মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের কারণে জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ শহিদ হন।
প্র : 'রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বহু মানুষের রক্ত ঝরেছে।
প্র : 'অশ্রু-গড়া' কী?
উ : অশ্রু দিয়ে গড়া। (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস)
প্র : 'ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া'- এখানে 'শত' কোন ধরনের সংখ্যাশব্দ?
উ : অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ।

প্র : 'অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ' কী?
উ : যে সংখ্যাশব্দে নির্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায়। (সেখানে 'শত' দিয়ে ১০০ বোঝান হয় নি, 'অনেক' বোঝান হয়েছে।)
প্র : এই কবিতায় 'নাগিনী' ও 'কালবৈশাখী' কারা?
উ : বাঙালির লোক-ঐতিহ্যের প্রধান সহায় 'নাগিনী' আর প্রাকৃতিক প্রচণ্ডতা 'কালবৈশাখী'। বাংলার এই দুই শক্তিকে কবি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে নেমে উঠতে আহ্বান জানাচ্ছেন।
প্র : 'ক্রান্তি' কী?
উ : অগ্রগতি।
প্র : 'তবু তোরা পার পাবি?' –কারা?
উ : পাকিস্তানিরা।
প্র : একুশে ফেব্রুয়ারি কী রায় দিয়েছে?
উ : একুশে ফেব্রুয়ারির রায় হলো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায় সঙ্গত এবং অত্যাচারীর পতন অনিবার্য।
প্র : 'অলকানন্দা' কী?
উ : স্বর্গের নদীর ধারা বা স্বর্গের গঙ্গা।
প্র : 'সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে–' এর পর কী বলা হয়েছে?
উ : কবি কল্পনা করেছেন, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি চমৎকার দিন ছিল। সে দিন ভোরে নীল আকাশের কোনে চাঁদ তখনো দেখা যাচ্ছিল, পথের ধারে এমন সুন্দর রজনীগন্ধা ফুল ফুটেছিল, যাতে মনে হয়েছে স্বর্গের নদী বইছে পাশ দিয়ে। আর এমন সুন্দর পরিবেশেই পাকিস্তানিরা সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। গুলি করে বইয়ে দেয় রক্তগঙ্গা।
প্র : 'আঁধারের পশু' কারা?
উ : যারা ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালিদের ওপর গুলি চালিয়েছে। এখানে পাকিস্তানিরা।
প্র : 'ওরা এদেশের নয়'– কাদের কথা বলা হয়েছে?
উ : পশ্চিম পাকিস্তানিরা।
প্র : 'দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়'– কোন দেশ?
উ : যদিও তখন বাঙালিরাও পাকিস্তান দেশের অধিবাসী তবু ২১শে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টির মাধ্যমে মন থেকে বাঙালিরা পৃথক হয়ে যায়। তারা নিজেদের পাকিস্তানবাসী মনে করে না, বাংলাকে পৃথক দেশ ভাবে। এখানে 'দেশ' বলতে বাংলাদেশকেই বোঝান হয়েছে।
প্র : 'আদিম' কারা?
উ : অত্যাচারীরা।
প্র : 'আদিম' কোন শব্দ?
উ : আরবি শব্দ।
প্র : 'আপো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে'– বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উ : বাঙালির মধ্যে প্রতিরোধ স্পৃহা আছে। এই প্রতিরোধ স্পৃহাকে তিনি জাগ্রত করতে বলেছেন এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বলেছেন ঐক্যবদ্ধ হতে।
প্র : 'একুশের গান'-এর সঙ্গে তাবশত ঐক্য আছে এমন দুটি কবিতার উল্লেখ কর।
উ : 'কোনো এক মাকে'– আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ; 'ঝুমকো ফুলে ফুলে / ভরে পড়েছে লতাটা, / সজনে উঁচিয়ে / ভরে গেছে গাছটা, / আর, আমি ডালের বড়ি / শুকিয়ে রেখেছি, / খোকা তুই কবে আসবি। / কবে ছুটি?' 'মৃত্তিকন্যা'– আলাউদ্দিন আল আজাদ ; 'মৃত্তির নিবন্ধ ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, অনেক এখনো / চার কোটি পরিবার / খায় বয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কেঁদে রাজন্য / পারে নি ভাঙতে / বীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার / খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে / যাদু বুলি ধান / গুল টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাসর চালাই / সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।'

আবদুল মান্নান সৈয়দ

প্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অগস্ট, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায়।
প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?
উ : মা: কাজী আনোয়ারা মজিদ; বাবা: সৈয়দ এ এম বদরুদ্দোজা।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রবেশিকা, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চমাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক (১৯৬৩) ও স্নাতকোত্তর (১৯৬৪) ডিগ্রি লাভ।
প্র : কর্মজীবনে তিনি কোন কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
উ : প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে পরবর্তীতে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।
প্র : তিনি প্রথমজীবনে কোন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন?
উ : অলোক সৈয়দ।
প্র : তিনি কোন ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন?
উ : কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ-গবেষণা, জীবনী, নাটক/কাব্যনাটক, স্মৃতিকথা, অনুবাদ-কবিতা, সম্পাদনা– সব ধরনের গ্রন্থ রচনাতেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থাবলির একটি তালিকা উল্লেখ কর।
উ : কবিতা: জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৭), জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯), ও সংবেদ ও জলতরঙ্গ (১৯৭৪), কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৮২), পরাবাস্তব কবিতা (১৯৮২), পার্কস্ট্রিটে একরাত্রি (১৯৮৩), মাছ সিরিজ (১৯৮৪), সকল প্রশংসা তাঁর (১৯৯৩) নীরবতা গভীরতা দুই বোন বলে কথা (১৯৯৭) ইত্যাদি; ছোটগল্প: সত্যের মতো বদমাশ (১৯৬৮), চলো যাই পরোক্ষে (১৯৭৩), মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা (১৯৭৭), নেকড়ে হায়না আর তির পরী (১৯৯৭) ইত্যাদি; উপন্যাস: পদ্মিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী (১৯৭৪), পোড়ামাটির কাজ (১৯৮২), অ-তে অজগর (১৯৮২) গভীর গভীরতর অসুখ (১৯৮২), ক্ষুধা প্রেম আগুন (১৯৯৪), শ্রাবস্তীর দিনরাত্রি (১৯৯৮); প্রবন্ধ-গবেষণা: শুদ্ধতম কবি (১৯৭২), নজরুল : কবি ও কবিতা (১৯৭৭), নজরুল : কালজ কালোত্তর (১৯৮৭), আধুনিক সাম্প্রতিক (২০০১) ইত্যাদি। জীবনী: জীবনানন্দ দাশ (১৯৮৮), ফররুখ আহমদ (১৯৮৮), প্রবোধচন্দ্র সেন (১৯৯৪); নাটক/কাব্যনাটক: চাকা (১৯৮৫), কবি ও অন্যেরা (১৯৯৬); স্মৃতিকথা: স্মৃতির নোটবুক (২০০০); অনুবাদ-কবিতা: মাতাল মানচিত্র (১৯৭০), বিদেশী প্রেমের কবিতা (১৯৮৪); সম্পাদনা: জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৬), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সুনির্বাচিত কবিতা (১৯৯০), অমিয়কুমার সেনগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৪), শ্রেষ্ঠ সজরুল (১৯৯৬) ইত্যাদি।
প্র : স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর অবদান কী ছিল?
উ : দেশের প্রধান কবিদের প্রায় সবাই, যখন জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন করে তৎকালীন সৈরশাসক এইচ. এম. এরশাদের বিরুদ্ধে সেবনী ধারণ করেন তখন আবদুল মান্নান সৈয়দ এরশাদের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত এশীয় কবিতা উৎসবে একাধিকবার যোগদান দেন। তখন রাষ্ট্রপতি এরশাদ কবিতা লিখতেন এবং সেগুলো দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। জনশ্রুতি আছে, এরশাদের এই কবিতাবলির কয়েকজন কবিদলের একজন ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ।
প্র : আবদুল মান্নান সৈয়দ কোন কোন পদক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), সজরুল পুরস্কার (১৯৯৬), সজরুল পদক (২০০১) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর।

আবদুল্লাহ আল মামুন

প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৩ সালের ১২ই জুলাই; জামালপুর জেলা সদরের আমলা পাড়ায়।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত নাটক কোনটি?
উ : শপথ (১৯৬৪)।
প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত নাটকগুলোর নাম লেখ।
উ : সুবচন নির্বাসনে (১৯৭৪), এখন দুঃসময় (১৯৭৫), এবার ধরা দাও (১৯৭৭), শাহজাদীর কাল নেকাব (১৯৭৮), চারদিকে যুদ্ধ (১৯৮৩), এখনও ক্রীতদাস (১৯৮৪), কোকিলারা (১৯৯০), মেরাজ ফকিরের মা (১৯৯৭)।
প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত উপন্যাসগুলোর নাম লেখ।
উ : মানব তোমার সারা জীবন (১৯৮৮); আহ্

দেবদাস (১৯৮৯); তাহাদের যৌবনকাল (১৯৯১); হায় পার্বতী (১৯৯১); এই চুনীলাল (১৯৯৩); গুড়াপাখার বাবা (১৯৯৩); খলনায়ক (১৯৯৭)।

প্র : 'এখনও ক্রীতদাস' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এই নাটকে ঢাকা শহরে 'গলাচিপা' বস্তির যুদ্ধাহত শম্ভু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার পরিবারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের অসহায় জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত। পুরুষতান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর নির্যাতনের চিহ্নও তুলে ধরা হয়েছে।

প্র : আবদুল্লাহ আল মামুন মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : নাট্যরচয়িতা (এবং নাট্যাভিনেতা)।

প্র : তাঁর রচিত এক চরিত্রনির্ভর নাটক কোনটি?

উ : কোকিলারা (১৯৯০)।

প্র : 'কোকিলারা' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এক চরিত্র বিশিষ্ট নাটক। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে। তবে ঢাকা গাইড হাউজ মিলনায়তনে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি প্রথম অভিনীত হয়। ফেরদৌসী মজুমদার করেন এই একক অভিনয়। নাটকে তার নাম কোকিলা। 'কোকিলারা' উৎসর্গিত হয়েছে ফেরদৌসী মজুমদারকে। এ নাটকে তিনটি পর্যায় : প্রথম কোকিলা, দ্বিতীয় কোকিলা, তৃতীয় কোকিলা। প্রথম কোকিলা সরল বালিকা, প্রেমের প্রতারণায় গর্ভে সন্তান আসে, চোর সাব্যস্ত হয়, শেষে আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় কোকিলা মধ্যবিত্তের সংসারে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া স্বামীর ভোগ্যপণ্য, নিরীহ প্রাণী। তৃতীয় কোকিলা প্রতিবাদী, সমাজের অন্যায় ও অমানবিকতার বিপক্ষে সে সর্বদা সোচ্চার। বাংলাদেশের নারীদের তিনটি রূপ তিন কোকিলা। লেখক আশা করেছেন তার তৃতীয় কোকিলা বর্বরতা, কুসংস্কার ও অধর্মের লৌহ কপাটে আঘাত করেই যাবে। দেশ-বিদেশ মিলে নাটকটি শতবারেরও বেশি মঞ্চস্থ হয়েছে।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (নাটক); জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (পরিচালনা); জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার (প্রযোজনা); মুনীর চৌধুরী সম্মাননা ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : শারীরিক নানা জটিলতায় ৪২ দিন হাসপাতালে কাটিয়ে ২১শে আগস্ট, ২০০৮; বৃহস্পতিবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবদুল্লাহ আল-মুতী

প্র : আবদুল্লাহ আল-মুতীর সম্পূর্ণ নাম কী?

উ : আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন।

প্র : আবদুল্লাহ আল-মুতী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়িতে।

প্র : তিনি কোথা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি (১৯৫৩); আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি (১৯৬২) ডিগ্রি লাভ করেন।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?

উ : আমলা। বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব পদ থেকে তিনি অবসরে যান।

প্র : তিনি মূলত কোন ধরনের লেখক হিসেবে পরিচিত?

উ : বিজ্ঞানলেখক হিসেবে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম বইয়ের নাম কী?

উ : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে; প্রকাশ ১৯৫৫ সালে।

প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য কিছু গ্রন্থের নাম লেখ:

উ : আবিষ্কারের নেশায় (১৯৬৯); বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৭৫); সাগরের রহস্যপুরী (১৯৭৬); তারার দেশের হাতছানি (১৯৮৪); বিজ্ঞানের বিস্ময় (১৯৮৬); শিক্ষা ও বিজ্ঞান : নতুন দিগন্ত (১৯৯১); মহাকাশে কী ঘটছে (১৯৯৭) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?

উ : দেশের প্রধান প্রধান প্রায় সব পুরস্কারই লাভ করেন। যেমন : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫); ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক

কলিঙ্গ পুরস্কার (১৯৮৩); একুশে পদক (১৯৮৫); স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৫) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৮ সালের ৩০শে নবেম্বর ঢাকায়।

আবু ইসহাক

প্র : আবু ইসহাক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১লা নবেম্বর; শরিয়তপুর জেলার নড়িয়ায়।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : ঔপন্যাসিক হিসেবে।

প্র : পেশায় তিনি কী ছিলেন?

উ : সরকারি চাকুরে। এন.এস.আই. খুলনা বিভাগের ডেপুটি ডাইরেকটর হিসেবে ১৯৮৪ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?

উ : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫); উপন্যাস।

প্র : 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৫৫ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বিশ্বস্ত দলিল এই গ্রন্থ। বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক পরিচয় সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রকাশের অব্যবহিত পর থেকে বাস্তব চিত্রণ, চরিত্রায়ণের স্বাভাবিকতা ও প্রকাশভঙ্গির ঋজুতার জন্য উপন্যাসটি সমালোচক ও পাঠকসমাজে নন্দিত হয়েছে। জয়গুনদের বাড়িটিতে রাতে কথিত ভূতের ঢিল পড়ে, সে বাড়িতে নির্ভয়ে থাকা যায় না। তাই সূর্য-দীঘল বাড়ি অমঙ্গলের প্রতীকে পরিণত হয়। উপন্যাসে গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, মোড়ল ও মোল্লাদের দৌরাত্ম্য, হৃদয়হীনা শাশুড়ির বৌয়ের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি এমন বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যে কারণে এটি হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবনের যথার্থ উপস্থাপনা। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : জয়গুন, তার ছেলে হাসু, মেয়ে মায়মুন, শফি, ডা. রমেশ চক্রবর্তী, মোড়ল গদু প্রধান।

প্র : তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও ধরন উল্লেখ কর।

উ : উপন্যাস: 'পদ্মার পলিদ্বীপ' (১৯৮৬), 'জাল' (১৯৮৮); গল্পগ্রন্থ : 'হায়েম' (১৯৬২), 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩)।

প্র : 'পদ্মার পলিদ্বীপ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : আবু ইসহাকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী রচিত উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মুক্তধারা থেকে উপন্যাসটি প্রকাশ পেলেও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আবু ইসহাক উপন্যাসটি রচনায় হাত দেন। উপন্যাসের প্রথম ষোলটি অধ্যায় বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মে ১৯৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। অবশ্য তখন এর নাম ছিল 'মুখর মাটি'। এর অনেক পরে আবু ইসহাক উপন্যাসটি বত্রিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করেন এবং এর নামবদল করে দেন 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। দ্বিতীয় নামটি সাদামাটা; উপন্যাসটি না পড়েও এতে কী আছে তা বোঝা যায়। প্রথম নামটি ছিল বহুগুণে সাহিত্য গুণসম্পন্ন, প্রতীকী। 'পদ্মার পলিদ্বীপ' একটি আঞ্চলিক উপন্যাস। পদ্মানদীকে বলা হয় 'কীর্তিনাশা'। কারণ চাঁদরায়-কেদাররায়-রাজবল্লভ প্রমুখ বারভূঁইয়াদের কীর্তি এ নদী ধ্বংস করেছে। এ উপন্যাসে পদ্মাতীরবর্তী চরকেন্দ্রিক অধিবাসী, তাদের চরদখল, জীবন-সংগ্রাম মুখ্য। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া (যেমন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি) যে গ্রামীণ বা চরাঞ্চলের মানুষের উপরও পড়েছিল তা এ উপন্যাসে প্রতিভাত। ফজল এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এছাড়া এরফান মাতব্বর, আরশেদ মোল্লা, জঙ্গুরুল্লা, জরিনা, রূপজান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসটি গতানুগতিক। পঁচিশ বছর আগের লেখা ও বিষয়-নির্বাচন আড়াই দশক পড়ে অনিবার্যভাবেই পুরোনো হয়ে যায়। আবু ইসহাকের এ উপন্যাসেও মধ্য আশির দশকে নতুন কোনো চমক ছিল না, যেমন চমক ছিল তাঁর 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে।

প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, তাঁর সম্পাদিত অভিধানটির নাম কী?
উ : 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' (১৯৯৩)।
প্র : তাঁর প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পুরস্কার কী?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৩), একুশে পদক (১৯৯৭)।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি; বরিশালের গির্জামহল্লায়।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : সাতনরী হার (১৯৫৫): কাব্যগ্রন্থ।
প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?
উ : বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব, স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের মন্ত্রী, এফএও-র অতিরিক্ত মহাপরিচালক। কিন্তু তাঁর পরিচয়, তিনি একজন কবি।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো :
উ : আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি ও কোন এক মাকে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা)।
প্র : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কাব্যগ্রন্থসমূহ:
উ : 'কখনো রং কখনো সুর' (১৯৭০), 'কমলের চোখ' (১৯৭৪), 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' (১৯৮১) ইত্যাদি।
প্র : 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। গ্রন্থটিতে ৩৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার মৃত্তিকামূলে শিকড় সঞ্চার করে এ কাব্যগ্রন্থে কবি ঐক্যবদ্ধ চেতনায় সাহসী মানুষের সম্ভাবনার ছবি এঁকেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় আছে : 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি / আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি / তার বুকে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল-'।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০১ সালে।
প্র : তাঁর পুরো নাম কী?
উ : আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান (ডাকনাম সেন্টু)

'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কিংবদন্তি অর্থ কী?
উ : জনশ্রুতি লোকপরম্পরায় শ্রুত ও কবির বিষয় যা একটি জাতির ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। (কিংবদন্তী ও কিংবদন্তি দুটোই শুদ্ধ বানান।)
প্র : শ্বাপদ শব্দের অর্থ কী?
উ : হিংস্র মাংসাশী শিকারী জন্তু।
প্র : প্রবহমান নদী কাকে ভাসিয়ে রাখে?
উ : যে সাঁতার জানে না।
প্র : কবিতার মুক্ত শব্দগুলো কোথা থেকে উচ্চারিত হয়?
উ : জিহ্বা থেকে।
প্র : কার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল?
উ : কবির পূর্বপুরুষের পিঠে।
প্র : কে সন্তানের জন্য মরতে পারে না?
উ : যে কবিতা শুনতে জানে না সে সন্তানের জন্য মরতে পারে না।
প্র : কর্ষিত জমির কবিতা কোনটি?
উ : প্রতিটি শস্যদানা কবিতা।
প্র : কে আজন্ম ক্রীতদাস থেকে যাবে?
উ : যে কবিতা শুনতে জানে না।
প্র : কবি কার মৃত্যুর কথা বলেছেন?
উ : গর্ভবতী বোনের মৃত্যুর কথা।
প্র : কবির পূর্বপুরুষের করতলে কী ছিল?
উ : পলিমাটির সৌরভ।
প্র : যে কবিতা শুনতে জানে না সে কিসের আর্তনাদ শুনবে?
উ : ঝড়ের।
প্র : রক্তজবার মতো প্রতিরোধের উচ্চারণকে কী বলে?
উ : কবিতা।
প্র : ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়- বলতে বুঝিয়েছেন?
উ : দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হলে জন্মদাত্রী মা প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায়।
প্র : যুদ্ধ আসে ভালোবেসে- অর্থ কী?
উ : যখন মানুষ তার অধিকার বঞ্চিত হতে থাকে/ হতে থাকে নিপীড়িত ও নির্যাতিত; তখন যুদ্ধের কোনো বিকল্প থাকে না/ তখন যুদ্ধ নিজেই যেন ভালোবেসে আবির্ভূত হয়।

আবু জাফর শামসুদ্দীন

প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : পূর্বতন ঢাকা জেলা, বর্তমানের গাজিপুর জেলার দক্ষিণবাগ গ্রামে ১৯১১ সালের ১২ই মার্চ।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : মোহাম্মদ আকাস আলী।
প্র : তাঁর পিতামহ নাদিরুজ্জামান ভূঁইয়া কার শিষ্য ছিলেন?
উ : মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরির শিষ্য এবং স্থানীয় প্রতিনিধি।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের শিক্ষাজীবন কেমন ছিল?
উ : প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা তাঁর ছিল না। প্রভাত পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ভ করলেও মাদ্রাসা শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে আজকের ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেন নি।
প্র : অবিভক্ত ভারতে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন?
উ : মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (এমএন রায়) রেডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে।
প্র : পাকিস্তান আমলে তিনি কোন দলে যুক্ত হন?
উ : আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপের সঙ্গে।
প্র : তিনি কোন বিশেষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন?
উ : ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনের (১৯৫৭) প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ছিলেন।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের মূল পরিচয় কী?
উ : তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল লেখক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : দৈনিক ছোলতান পত্রিকার সাব-এডিটর হিসেবে কর্মজীবন শুরু। পরে দৈনিক আজাদ, ইত্তেফাক, পূর্বদেশ ও সংবাদ পত্রিকায় বিভিন্ন পদে চাকরি।
প্র : তিনি একটি ছদ্মনামে কলমে লিখতেন, সেটা কী?
উ : দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় আবু জাফর শামসুদ্দীন মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত 'অল্পদর্শী' ছদ্মনামে 'বৈয়াসিকের পার্শ্বচিন্তা' শিরোনামে কলমে লিখতেন।
প্র : আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'পরিত্যক্ত স্বামী' (১৯৪৭)। এটি তাঁর প্রকাশিত প্রথমগ্রন্থও।
প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য উপন্যাসের নাম কী?
উ : ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩), পদ্মা মেঘনা যমুনা (১৯৭৪), সংকর সংকীর্তন (১৯৮০), দেয়াল (১৯৮৫)।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'জীবন' (১৯৪৮), 'রাজেন্দ্রঠাকুরের তীর্থযাত্রা' (১৯৭৮), 'ল্যাংড়ী' (১৯৮৪), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৮)।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্বপাকিস্তানী সাহিত্য' (১৯৬৪), 'সোচ্চার উচ্চারণ' (১৯৭৭), 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি' (১৯৮৮)।
প্র : তাঁর লেখায় কোন গুণটি বেশি প্রকাশিত?
উ : তাঁর লেখায় গণমানুষের সংগ্রাম ও উদার মানবতাবাদের দিকটিই মুখ্য।
প্র : কোন উপন্যাস তিনটিকে তাঁর 'ত্রয়ী উপন্যাস' বলে?
উ : 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'সংকর সংকীর্তন'।
প্র : তিনি কোন কোন পদক ও পুরস্কার পান?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), সমকাল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৩), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৮৮)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৮৮ সালের ২৪শে অগস্ট।

আবু রুশদ

প্র : আবু রুশদ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর; কলকাতায়।
প্র : তাঁর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : আবু রুশদ মতিন উদ্দিন।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : আমাতুজ জোহরা ও সৈয়দ আবদুল করিম।

প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজিতে স্নাতক (স.) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৯); গল্পগ্রন্থ।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : গল্পগ্রন্থ : 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮), 'ডোবা হলো দীঘি' (১৯৬০), 'শাড়ি বাড়ি গাড়ি' (১৯৬১), 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' (১৯৮২), 'বিয়োগ ব্যথা' (১৯৯৬); উপন্যাস : 'এলোমেলো' (১৯৪৬), 'সামনে নূতন দিন' (১৯৫১), 'নোঙর' (১৯৬৩), 'স্থগিত দ্বীপ' (১৯৭৪)।
প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : একুশে পদক (১৯৮১), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯২), শেরে বাংলা পুরস্কার (১৯৯২) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্র : আবু হেনা মোস্তফা কামালের জন্মতারিখ কত?
উ : ৩.১২.১৯৩৬।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : গোবিন্দগ্রাম, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন কত সালে?
উ : ১৯৮৬, ১১ই মার্চ।
প্র : তিনি কী কী রচনা করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন?
উ : কবিতা, প্রবন্ধ, গান।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : কাব্য : 'আপন যৌবন বৈরী' (১৯৭৫), 'যেহেতু জন্মান্ধ' (১৯৮৪), 'আত্মজ গজল' (১৯৮৮); প্রবন্ধ-গবেষণা: 'শিল্পীর রূপান্তর' (১৯৭৫), 'The Bengali Press and Literary writing' (১৯৭৭), 'কথা ও কবিতা' (১৯৮১)।
প্র : সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আলাওল পুরস্কার (১৯৭৫), সুহৃদ সাহিত্য স্বর্ণপদক (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৭), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্বর্ণপদক (১৯৮৯), সাদাত আলি আকন্দ স্মৃতি পুরস্কার (১৯১৯)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ২৩.৯.১৯৮৯।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

প্র : আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর জন্মতারিখ কত?
উ : ৩.১১.১৮৯৭।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : ধানিখোলা গ্রাম, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন কত সনে?
উ : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : অসযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের আহ্বানে কোন পরীক্ষা বর্জন করেন?
উ : বি.এ।
প্র : বাঙালি মুসলমান সমাজের কল্যাণ সাধনায় কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন?
উ : সাংবাদিকতা ও সাহিত্য সাধনায়।
প্র : তিনি ১৯২৩-এ কোন পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
উ : দৈনিক মোহাম্মদী পত্রিকায়।
প্র : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সওগাত পত্রিকায় তিনি কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
উ : সম্পাদনা বিভাগে (১৯২৬)।

প্র : মওলানা আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে তিনি কবে যোগদান করেন?
উ : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৬
প্র : তিনি 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় কত বছর সম্পাদনা করেন?
উ : দীর্ঘ বাইশ বছর (১৯৪০-'৬২)
প্র : তিনি কত সনে দৈনিক পাকিস্তান পরে দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন?
উ : ৬ই নবেম্বর, ১৯৬৪।
প্র : তিনি কখন মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন?
উ : ত্রিশের দশকে।
প্র : বাঙালি মুসলিম সমাজকে ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করার প্রয়াসে কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' (১৯৪০) প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি এর কোন পদে ছিলেন।
উ : সভাপতি।
প্র : মুসলিম লীগের মনোনয়নে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন কত সালে?
উ : ১৯৪৬ সালে।
প্র : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি কী ভূমিকা পালন করেন?
উ : অত্যন্ত প্রতিবাদী ভূমিকা।
প্র : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ পরিষদে থেকে কত তারিখে তিনি পদত্যাগ করেন?
উ : ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
প্র : তিনি কত তারিখে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন?
উ : ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।
প্র : আয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনের সময় সরকারের দমন নীতির প্রতিবাদে তিনি কোন খেতাব বর্জন করেন?
উ : 'সিতারা-এ খেদমত' ও 'সেতারা-এ ইমতিয়াজ' খেতাব (১৯৬০)।
প্র : ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি কত তারিখে বিবৃতি প্রদান করেন?
উ : ১৭ই মে, ১৯৭১।
প্র : তিনি কোন বিষয়ে বহু চিন্তামূলক সরস প্রবন্ধ রচনা করেন?
উ : সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে।
প্র : তিনি অন্য কোন বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন?
উ : বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারার এবং নজরুল কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ ও নবমূল্যায়নে।
প্র : কাজী নজরুল ইসলামকে অন্তর্ভুক্ত প্রথম কী বলে অভিহিত করা হয়?
উ : যুগ প্রবর্তক।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে একুশে পদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলি কী কী?
উ : কচিপাতা (শিশু সাহিত্য, ১৯৩২), ত্রিস্রোতা (তুর্গেনিভের তিনটি গল্পের অনুবাদ, ১৯৩৯), দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৬১), ইলিয়ড (বঙ্গানুবাদ, ১৯৬৭), পলাশী থেকে পাকিস্তান (ইতিহাস, ১৯৬৮), অতীত দিনের স্মৃতি (আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ, ১৯৬৮)।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন?
উ : দৈনিক আজাদ।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৪. ৩. ১৯৭৮।

আবুল ফজল

প্র : আবুল ফজলের জন্মতারিখ কত?
উ : ১লা জুলাই, ১৯০৩।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : কেঁওচিয়া গ্রাম, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : তিনি চট্টগ্রাম সরকারি নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে ম্যাট্রিক (১৯২৩) এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

প্র : তাঁর প্রথম পেশা কী ছিল?
উ : স্কুলে শিক্ষকতা
প্র : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন কত সালে?
উ : ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৩।
প্র : তিনি রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা ছিলেন কার শাসনামলে?
উ : রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের।
প্র : তিনি কোন সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কত সালে?
উ : ১৯২৬ সালে গঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজের।
প্র : তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন?
উ : 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন।
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা কী ছিল?
উ : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র বার্ষিক পত্রিকার নাম কী ছিল?
উ : শিখা (১৯২৭)
প্র : কত সালে তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হন?
উ : ১৯৩০ সালে।
প্র : শিখার কোন সংখ্যা তিনি সম্পাদনা করেন?
উ : ৫ম সংখ্যা (১৯৩১)
প্র : তিনি কী হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন?
উ : সমাজ ও সমকাল সচেতন প্রাবন্ধিক হিসেবে।
প্র : তিনি অন্য কীসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন?
উ : কথাশিল্পী হিসেবে।
প্র : তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রতিপাদ্য কী?
উ : স্বদেশপ্রীতি, অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা, সত্যনিষ্ঠা, মানবতা ও কল্যাণবোধ।
প্র : তাঁর প্রধান রচনাবলির নাম কী?
উ : উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪), প্রদীপ ও পতঙ্গ (১৩৪৭), রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪); গল্পগ্রন্থ : মাটির পৃথিবী (১৩৪৭), মৃতের আত্মহত্যা (১৯৭৮); নাটক : কায়েদে আজম (১৯৪৬), প্রণতি (১৯৪৮), স্বয়ম্বরা (১৯৬৬); আত্মকাহিনী ও দিনলিপি : রেখাচিত্র (১৯৬৬); প্রবন্ধ : বিচিত্র কথা (১৩৪৭), সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা (১৯৬১), সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন (১৯৬৫), সমকালীন চিন্তা (১৯৭০), মানবতন্ত্র ((১৩৭৯) শুভবুদ্ধি (১৯৭৪), শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি (১৯৭৮), রবীন্দ্র প্রসঙ্গ (১৯৭৯)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও উপাধি লাভ করেন?
উ : উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৬৩) ও রেখাচিত্র গ্রন্থের জন্য আদমজি পুরস্কার (১৯৬৬); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধি প্রদান (১৯৭৪)।
প্র : তিনি কি নামে আখ্যায়িত হন?
উ : মুক্তবুদ্ধির চিরসজাগ প্রহরী
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৪ঠা মে, ১৯৮৩।

আবুল মনসুর আহমদ

প্র : আবুল মনসুর আহমদ কতসালে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ধানিখোলা গ্রাম, ময়মনসিংহ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : তিনি কত সালে 'ছোলতান' ও 'মোহাম্মদী'র সহকারী সম্পাদক হন?
উ : ১৯২৩।
প্র : কত সালে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক হন?
উ : ১৯৪৬ সালে, ১৯৪৮ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।
প্র : তিনি কোন কোন আন্দোলনে সাথে যুক্ত ছিলেন?
উ : খেলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ আন্দোলন।
প্র : তিনি আওয়ামী লীগের কী ছিলেন?
উ : প্রতিষ্ঠাতা নেতা (১৯৫৩-৫৮ সাল পর্যন্ত সহ-সভাপতি)।
প্র : যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচির কী দায়িত্ব পালন করেন?
উ : ২১ দফার অন্যতম প্রণেতা।
প্র : তিনি যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রী ছিলেন?
উ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী (১৯৫৪)।
প্র : পাকিস্তান সরকার বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করলে তাঁর অবস্থান কী ছিল?
উ : তিনি এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থনদান করেন।
প্র : তিনি কোন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : খেলাফত আন্দোলন থেকে দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টি, সেখান থেকে সুভাষ বসুর কংগ্রেস, সেখান থেকে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাপার্টি, সেখান থেকে মুসলিম লীগ, তারপর আওয়ামী লীগ। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে ইসলামি গোঁড়া মতবাদী।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা কী?
উ : উপন্যাস : সত্যমিথ্যা (১৯৫৩), জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), আবে হায়াত (১৯৬৮); গল্পগ্রন্থ : আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৪); রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯), শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২); স্মৃতিকথা: আত্মকথা (১৯৭৮); শিশুসাহিত্য: ছোটদের কসাসুল আম্বিয়া (১৯৪৯), গালিভারের সফরনামা (১৯৫৯)।
প্র : কাজী নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমদের কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন?
উ : আয়না।
প্র : 'আবেহায়াত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আবুল মনসুর আহমদের 'আবেহায়াত' (১৯৬৮) উপন্যাসে গ্রামের পির পরিবারের সন্তান হামিদের ডাক্তার হিসেবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও শহরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দেখা যায়। মুখে সে জনদরদি হলেও মনেপ্রাণে ধনলিপ্সু। বাইরে বিজ্ঞানমনস্ক মনে হলেও ভেতরে ভেতরে আধ্যাত্মিকতায় আস্থা স্থাপনকারী। বিবাহিত প্রাক্তন সহপাঠী রাজিয়াকে স্ত্রী হিসেবে লাভ করার জন্য হামিদ খান বিজ্ঞানের খোলস ছেড়ে যখন আধ্যাত্মিকতা নির্ভর হয় তখন তার প্রকৃত রূপ বোঝা যায়। সমাজে হামিদের মতো লোকের অভাব নেই।
প্র : 'আয়না' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : হাস্যরসাত্মক গল্পের সমাহারে আবুল মনসুর আহমদ রচিত গল্পগ্রন্থ 'আয়না' ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। হুবুর কেবলা, খো-দেওতা-কা দেশ, নায়েবে নবী, লীডরে কওম, মুজাহেদীন, বিদ্রোহী সংঘ, ধর্মরাজা-এই সাতটি গল্প রয়েছে বইটির মধ্যে। যার মধ্যে 'বিদ্রোহী সংঘ' ছাড়া বাকি সবগুলো গল্পেই ধর্মান্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী কয়েকটি চরিত্রকে তীব্র ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী সংঘ' গল্পে ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' কে ব্যঙ্গ করে বলা হয়েছে যে, তারা আত্মিক স্বাধীনতা বা আনন্দের জন্য উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু দেশের পরাধীনতা নিয়ে মৌনব্রত পালন করে। 'আয়না' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি লিখেছেন : 'যে-সমস্ত মানুষ হরেক রকমের মুখোশ পরে আমাদের সমাজে অবাধে বিচরণ করছে, আবুল মনসুরের আয়নার ভেতরে তাদের স্বরূপ-মূর্তি বন্য ভীষণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে।'
প্র : বাংলা সাহিত্যে তিনি কোন ধারার সাহিত্য রচনা করেন?
উ : ব্যঙ্গধারার।
প্র : সাহিত্যে তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯৬০-এ ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৮.৩.১৯৭৯; ঢাকা।

আবুল হাসান

প্র : আবুল হাসানের জন্মতারিখ কত?
উ : ৪ঠা অগস্ট, ১৯৪৭।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাতুলালয়, কর্মি গ্রাম, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : বাজিরপুর, শিবোজপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আবুল হোসেন মিয়া।
প্র : তাঁর সাহিত্যিক নাম কী?
উ : আবুল হাসান।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : সাংবাদিকতা
প্র : কোন সালে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকরি করেন?
উ : ১৯৬৯ সালে।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবে।
প্র : কোন দিকটি তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
উ : আত্মগত দুঃখবোধ, মৃত্যুচেতনা, বিচ্ছিন্নতা বোধ, নিঃসঙ্গচেতনা, স্মৃতিমুগ্ধতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : 'রাজা যায় রাজা আসে' (১৯৭২), 'যে তুমি হরণ করো' (১৯৪৭), 'পৃথক পালঙ্ক' (১৯৭৫)। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যনাট্য 'ওরা কয়েকজন' (১৯৮৮); গল্প সংকলন : 'আবুল হাসান গল্প সংগ্রহ' (১৯৯০)।
প্র : সাহিত্যে তিনি কী কী পুরস্কার ও পদক লাভ করেন?
উ : ১৯৭০-এ এশীয় কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান, কবিতায় মরণোত্তর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, (১৯৭৫), বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সাহিত্যে মরণোত্তর একুশের পদক (১৯৮২)।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ২৬শে নবেম্বর, ১৯৭৫।

আবুল হুসেন

প্র : আবুল হুসেনের জন্মতারিখ কত?
উ : ৬ই জানুয়ারি, ১৮৯৬।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাতুলালয়, পাশিসারা গ্রাম, যশোর।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কাউরিয়া গ্রাম, যশোর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : প্রথমে শিক্ষকতা, কলকাতা প্রেসের [illegible] সহকারী শিক্ষক (১৯২০), বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ১৯২১ [illegible] অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের লেকচারার।
প্র : তিনি কিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা?
উ : ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' (১৯২৬)।
প্র : তাঁরা কী আন্দোলন গড়ে তোলেন?
উ : 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'।
প্র : আবুল হুসেন এ আন্দোলনের কী ছিলেন?
উ : প্রাণপুরুষ।
প্র : সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র পত্রিকার নাম কী ছিল?
উ : 'শিখা' (১৯২৭-৩১)।
প্র : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সংগঠনকে শিখা গোষ্ঠী বলা হয় কেন?
উ : এই সংগঠনের পত্রিকা 'শিখা'র নামানুসারে।
প্র : তিনি শিখা পত্রিকার কোন বর্ষের সম্পাদক ছিলেন?
উ : প্রথম বর্ষের (১৯২৭)।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : মননশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক।
প্র : তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?
উ : বাংলার বলশী (১৯২৫), বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা (১৯২৮), মুসলিম কালচার (১৯২৮)।
প্র : 'বাংলার বলশী' গ্রন্থের কী নির্দেশ করা হয়েছে?
উ : কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা চিহ্নিত করে তাদের মুক্তির পথ নির্দেশ।
প্র : তিনি রুশ বিপ্লবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কী কী প্রবন্ধ রচনা করেন?
উ : কৃষকের আর্তনাদ, কৃষকের দুর্দশা, কৃষি বিপ্লবের সূচনা।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৮।

আবুল হোসেন

প্র : আবুল হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট; খুলনায়।
প্র : তাঁর পেশা ও পরিচিতি সম্পর্কে লেখ।
উ : তিনি পেশায় বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব) ছিলেন। তবে কবি হিসেবেই পরিচিত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম-
উ : মধু বসন্ত (১৯৪০), বিরস সংলাপ (১৯৬৯), হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস (১৯৬৯), দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে (১৯৮৫), (১৯৮২), এখনও সময় আছে (১৯৯৬), রাজা রাজড়া (১৯৯৭)।
প্র : 'অরণ্যের ডাক' কী?
উ : আবুল হোসেন অনূদিত উপন্যাস। মূল ল্যাক লন্ডন রচিত 'দ্য কল অব দ্য ওয়াইল্ড'। জ্যাক লন্ডনের প্রকৃত নাম জন গ্রিফিথ। আমেরিকান এই লেখকের বই আবুল হোসেন ১৯৫৪ সালে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ২৯শে জুন ২০১৪; ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর

প্র : আরজ আলী মাতুব্বর-এর জন্মতারিখ কত?
উ : ৩রা পৌষ, ১৩০৭ (১৯০০)
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : লামচারি গ্রাম, বরিশাল।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : দার্শনিক
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : এন্ত্রাজ আলী মাতুব্বর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : স্কুলে মুন্সি আবদুল করিমের মক্তবে সীতানাথ বসাকের 'আদর্শলিপি' অধ্যয়ন এবং উত্তরকালে নিজের সাধনায় নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : বাল্যকালে পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত। পরে জমি জরিপের কাজকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ।
প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : পৌরুষদীপ্ত নাস্তিক হিসেবে।
প্র : তাঁর রচনার বিষয়বস্তু কী?
উ : অলীকবাসের চিন্তা-চেতনা।
প্র : জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কীসের পরিচয় পাওয়া যায়?
উ : প্রজ্ঞা, যুক্তিনিষ্ঠা ও মুক্তবুদ্ধির।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কী কী।
উ : সত্যের সন্ধান (১৯৭৩), সৃষ্টি রহস্য (১৯৭৮), অবহিলা (১৯৮২), অনুমান (১৯৮৩) ইত্যাদি।
প্র : 'অনুমান' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ধর্মের প্রতিষ্ঠা', 'ঈশ্বরের কীর্তি', 'ভগবানের মৃত্যু', 'আধুনিক দেবতা', 'মেরাজ', 'শয়তানের জবানবন্দি', 'সমাধি' এই সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে আরজ আলী মাতুব্বরের 'অনুমান' গ্রন্থে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৩৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৯৮৩ সালে। এই গ্রন্থে আরজ আলী তাঁর ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে ধর্ম ও সংস্কারে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ধারণার বিরুদ্ধে নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন।
প্র : অল্প কথায় আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কী বলা যায়?
উ : আরজ আলী মাতুব্বর বরিশালের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। সমগ্র জীবন সংগ্রাম করেছেন দারিদ্র্য এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তিনি আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নি। কিন্তু কঠিন পরিশ্রমে বিদ্যা অর্জন এবং ধর্মীয় মূঢ়তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করেছেন। সমকালীন সরকার তাঁর রচনার বিরোধিতা করেছে, মৌলবাদীরা তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ করতে চেয়েছে। 'সত্যের সন্ধান' (১৯৭৩), 'সৃষ্টিরহস্য' (১৯৭৮) ও 'স্বরচিকা' (১৯৮২) তাঁর তিনটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। এই অসামান্য মানুষটির রচনা সমগ্র (দুই খণ্ড, ১৯৯৩, ১৯৯৫) আইয়ুব হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।
প্র : তিনি স্ব-উপার্জিত অর্থে তাঁর জন্মস্থান লামচারি গ্রামে কী প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি।

প্র : কিসে কী নামে প্রাথমিক মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া
উ : আরজ বৃত্তি (১৩৮৬)
প্র : তিনি কোন কলেজকে মরণোত্তর সেহলান করেন?
উ : বরিশাল দেবেন্দ্রলাল কলেজকে।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলাদেশ লেখক শিবির কর্তৃক হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৩৮৫) ও উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর বরিশাল শাখা কর্তৃক বরণীয় মনীষী হিসেবে সম্মাননা (১৩৯২); এছাড়া বাংলা একাডেমি কর্তৃক নবকর্মের সংবর্ধনা জ্ঞাপন (১লা বৈশাখ, ১৩৯২)।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১লা চৈত্র, ১৩৯২ (১৯৮৫)।

আল মাহমুদ

প্র : আল মাহমুদের জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : ১৯৩৬ সালের ১১ই জুলাই; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মৌড়াইল গ্রামে।
প্র : লেখক আল মাহমুদের প্রকৃতনাম কী?
উ : মির আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ
প্র : আল মাহমুদ মূলত কী?
উ : তিনি বাংলাদেশের অন্যতম কবি।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু?
উ : মাধ্যমিক পাস।
প্র : তাঁর প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
উ : সোনালী কাবিন (১৯৭৩)।
প্র : তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলো কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭), পাখির কাছে ফুলের কাছে, প্রেমের কবিতা, দ্বিতীয় ভাঙন (২০০২); গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), গন্ধবণিক (১৯৮৬), মধুরীর মুখ (১৯৯৪); উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২), উপমহাদেশ (১৯৯৩), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), চেহারার চতুরঙ্গ (২০০০), কাবিলের বোন (২০০১)।

প্র : 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : আল মাহমুদের কবি-প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছিল 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামের কবিতার সঙ্গে 'সোনালী কাবিন' নামে চৌদ্দটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত। এটিকে একটি স্বয়ং কাব্যগ্রন্থও বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, বীজ কাব্যগ্রন্থ। অন্য কবিতাগুলো। জাতিস্মর, পালক ভারার প্রতিবাসে, ক্যামোফ্লাজ, শোণিতে গৌরভ, তোমার আড়ালে ইত্যাদি। পুরো কাব্যগ্রন্থটির বঞ্চিতের ক্ষোভ, শ্রমিকের ঘাম, কৃষকের পরিশ্রম গ্রামীণ আবহে উঠে এসেছে। অসাধারণ কাব্যভাষা, গীতল, অনুভবযোগ্য। যৌন-প্রসঙ্গও বাদ যায় নি, তবে তা করেছেন শ্রেণিচেতনার নিরিখে। 'তারপর তুলতে ঢাও কামের ধ্বনি যদি নারী / ক্ষেতের আড়ালে এসে দাঁড়াও কোনো যৌবন ভারনত, / শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি / তারো বেশী দেবো আন্তরিক রতির দরদ/সবটাই নাও নিয়ে ধরে আছি পটিময় শাড়ি / সুন্দরি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।' মার্কসবাদীরা অবশ্য শ্রেণিচেতনার নামে রতি শক্তির এ ধরনের প্রদর্শনি প্রশ্রয় দেয় না। যৌবনকালে মার্কসবাদের নামে আল মাহমুদ সে স্বাধীনতা নিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে অবশ্য তিনি 'ভালো' হয়ে গেছেন। কারণ তিনি লিখেছেন : 'আমার বুকের ভেতর ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে।' 'সোনালী কাবিনে'র কবিতাগুলো রচিত হয় ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।
প্র : আল মাহমুদ শেষ পর্যন্ত কোথায় চাকরিরত ছিলেন?
উ : আল মাহমুদ উচ্চ সার্টিফিকেটধারী নন। তাই বাংলা একাডেমির প্রুফ রিডার, চট্টগ্রামে একটি পত্রিকার সাংবাদিক ও পরে ঢাকায় জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) প্রতিষ্ঠিত দৈনিক 'গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের সুপারিশে তিনি শিল্পকলা একাডেমীর অফিসার পদে বিশেষ বিবেচনায় চাকরি লাভ করেন। পরে ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

প্র : কবীনকা-উত্তরকালে তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : দৈনিক গণকণ্ঠ (অধুনালুপ্ত)।
প্র : তাঁর কবিতার বিশেষত্ব কী?
উ : তাঁর কবিতায় বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য ও লোকশব্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাতে।

'লোক-লোকান্তর' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : লোক-লোকান্তর কবিতাটি কোন কাজের শুরুতা
উ : লোক-লোকান্তর কাব্য।
প্র : এটি কী জাতীয় কবিতা?
উ : আত্মপরিচয়মূলক।
প্র : কবির চেতনার পাখিটি কেমন?
উ : সদা সতিকার। নখ দেখতে লাল। ঠোঁট সুস্থ পরাগে মাখা। দুটি চোখের কোটরে কটা সুপারির রং, পা সবুজ।
প্র : কবির চেতনার রূপ পাখি কিসের ডালে বসে আছে?
উ : সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে।
প্র : লোক থেকে লোকান্তরে কবি কী শোনেন?
উ : আহত কবির গান।
প্র : বসন্তবায়ু বাতাসের তালে কী দোলে?
উ : বন্য পালতা দোলে। কবির মাথার উপরে ও নিচে এটি দোলে।
প্র : কবিতার আসন্ন বিজয় বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
উ : কবির চেতনায় সমাজ সংসার ও ধর্ম তুচ্ছ হয়ে ভিন্নতর অভিব্যক্তি লাভ করে তখনই কবিতার জন্ম হওয়ার বিষয়টি বোঝানো হয়েছে।
প্র : কবি কেন লোক-লোকান্তরে স্তব্ধ হয়ে আছে?
উ : আহত কবির গান শোনার জন্য। অর্থাৎ সৃষ্টি কর্মের জয়ধ্বনি শোনার জন্য। যা কবিকে পৃথিবীতে অমরত্ব এনে দিতে পারে।
প্র : সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি হয়ে আছে তার ঠোঁট- এটি কী জাতীয় উপস্থাপনা।
উ : চিত্রকল্প।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্র : আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালের ৩রা মে; সরাইলী, জেলার রামনগর গ্রামে।
প্র : তাঁর পেশা ও পরিচিতি কী?
উ : পেশায় মূলত অধ্যাপক। কিন্তু বিভিন্ন সরকারের সান্নিধ্য লাভ, এমন কি স্বৈরাচারী এরশাদের সঙ্গেও সংস্কৃতি উপদেষ্টা। তবে মূল পরিচিতি কবি হিসেবে।
প্র : প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
প্র : জেগে আছি (১৯৫০); গল্পগ্রন্থ
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র (১৯৬১), তোমার নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২); গল্পগ্রন্থ: জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৬), যখন সৈকত (১৯৬৭), আমার রক্ত স্বপ্ন আমার (১৯৭৫), জীবনজমিন (১৯৮৮); উপন্যাস : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২), কর্ণফুলী (১৯৬২), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), খসড়া কাগজ (১৯৮৬), স্বপ্নশিলা (১৯৯২), বিশ্বম্ভরা (১৯৯৭) ইত্যাদি।
প্র : 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা একটি বিশেষ জনপদের উপন্যাস। আদিবাসী রাঙামিলা, প্রেমিক দেওয়ানপুত্র (চাকমা), বাঙালি ইসমাইল, জলি, রমজান প্রমুখের জীবন যাপন ও প্রণয় উপন্যাসে বর্ণিত। ইসমাইল চোয়াকারবারি, উচ্চাভিলাষী। সে আদিবাসী তরুণী রাঙামিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এসব নানা বিষয় উপন্যাসে আছে। উপন্যাস হিসেবে 'কর্ণফুলী'কে ব্যর্থ বলা চলে। তবে এখানে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের কষ্টকর চেষ্টাও আছে।
প্র : যে কবিতাটি লিখার জন্য তিনি জনপ্রিয়, তার নাম কী?
উ : স্মৃতিস্তম্ভ। ('স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার/ ভর কি বন্ধু-)

প্র : 'স্মৃতিস্তম্ভ' কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : মানচিত্র
প্র : তাঁর কোন উপন্যাসটি 'বসুন্ধরা' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে?
উ : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র। ১৯৭৭ সালে পুরস্কার পায়।
প্র : আলাউদ্দিন আল আজাদ কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৪ঠা জুলাই, ২০০৯।

আশরাফ সিদ্দিকী

প্র : আশরাফ সিদ্দিকী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২৭ সালের ১লা মার্চ। টাঙ্গাইলের নাগবাড়ি নামক স্থানে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : লোক সাহিত্য-সংস্কৃতিবিদ হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম ও ধরন কী?
উ : তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০); কাব্যগ্রন্থ।
প্র : তাঁর লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নববর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), আবহমান বাংলা (১৯৮৭)।
প্র : আশরাফ সিদ্দিকীর অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : কাব্যগ্রন্থ : সাতভাই চম্পা (১৯৫৩), বিষকন্যা (১৯৫৫), বৃক্ষ দাও: ছায়া দাও (১৯৮৪), দাঁড়াও পথিক বর (১৯৯০), সহস্র মুখের ভীড়ে (১৯৯৭); গল্পগ্রন্থ : রাবেয়া আপা (১৯৬৫), গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১), শেষ নালিশ (১৯৯২); উপন্যাস গ্রন্থ : শেষ কথা কে বলবে (১৯৮০), আরশিনগর (১৯৮৮), গুণিন (১৯৮৯)।
প্র : 'গুণিন' ছোটগল্পটি কার?।
উ : হাসান আজিজুল হকের। (কিন্তু উপন্যাস আশরাফ সিদ্দিকীর)।
প্র : 'সাত ভাই চম্পা' এই নামে আর কোন কবির কাব্যগ্রন্থ আছে?।
উ : কবি বিষ্ণু দে'র।
প্র : 'নতুন কবিতা' সংকলন সম্পর্কে লেখ।
উ : আবদুর রশীদ খান ও আশরাফ সিদ্দিকী যৌথভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি কবিদের প্রথম সংকলন 'নতুন কবিতা' সম্পাদনা করেন। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। এতে লিখেছিলেন : হাবীবুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুর রশীদ খান, আশরাফ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মামুন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মনোজ সেনগুপ্তসহ তেরোজন কবি। সম্পাদকগণ দাবি করেছিলেন যে, সংকলনটি হবে 'সাহিত্য পথের নতুন যাত্রীদের কাব্য সৃষ্টির খতিয়ান'। কিন্তু উত্তরকাল দেখা গেছে এঁদের মধ্যে অধিকাংশই কবি হতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন, অনেকে কবিতা লিখলেও স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়েছেন।
প্র : তাঁর কোন সাহিত্যকর্ম নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে?
উ : গলির ধারের ছেলেটি।
প্র : চলচ্চিত্রটির নাম?
উ : ডুমুরের ফুল।

আসকার ইবনে শাইখ

প্র : আসকার ইবনে শাইখ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১০ই মার্চ, ১৯২৫; ময়মনসিংহের গৌরীপুরে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাহিত্যিক। তবে নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধ।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : (ড.) এম. ওবায়দুল্লাহ।

প্র : তিনি পেশায় কী ছিলেন?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম লেখ?
উ : নাটক : বিরোধ (১৯৪৭), পদক্ষেপ (১৯৪৮), বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৪৯), দুরন্ত ঢেউ ১৯৫১), শেষ অধ্যায় (১৯৫২), বিল বাওড়ের ঢেউ (১৯৫৫), এপার ওপার (১৯৫৫), প্রতীক্ষা (১৯৫৭), লালন ফকির (১৯৫৯), কর্ডোভার আগে (১৯৮০), রাজপুত্র (১৯৮০), রাজা রাজ্য রাজধানী (১৯৮০), মেঘলা রাতের তারা (১৯৮১), কন্যা জায়া জননী (১৯৮৭); গানের সংকলন : নবজীবনের গান (১৯৫৯); গল্প সংকলন : কালো রাত তারার ফুল (১৯৮২); প্রবন্ধ : গবেষণা বাংলা মঞ্চ নাটকের পশ্চাৎভূমি (১৯৮৬)।
প্র : আসকার ইবনে শাইখের কয়েকটি নাটকের পরিচয় দাও।
উ : বিরোধ : গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৬ সালে রচিত, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত। মূলত মুসলিম পাত্রপাত্রী এবং মুসলিম সমাজ পরিবেশের সামাজিক ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব উঠে এসেছে এই নাটকে। আহমদ, আজিজ, মাহবুব, হাবিবা প্রধান চরিত্র। খানিকটা সিনেমাটিক ব্যাপার যেন: আহমদ ও আজিজ-পারিবারের দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব এই দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ে মাহবুব ও হাবিবার বিয়ের মাধ্যমে মিটে যায়।
পদক্ষেপ : ১৯৪৭ সালে রচিত, ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। প্রকাশের পূর্বে এর নাম ভাবা হয়েছিল 'কংকাল'। আভিজাত্য ও বংশমর্যাদায় অন্ধ মুসলিম পরিবারের মধ্য থেকেই আসে প্রতিবাদ, অবশেষে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জমিদার জাফর চৌধুরী সেই বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যে নিজপুত্র আহসান ও পালকপুত্র শহীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত হয়ে ধ্বংস পায়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: জাফর, আহসান, শহীদ, সালাম, আমিনা।
বিদ্রোহী পদ্মা : ১৯৫২ সালে রচিত, পরের বছর প্রকাশিত। একে অনেকেই লেখকের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে মনে করেন। পদ্মানদীর তীরবর্তী সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনভাষ্য এই নাটকের কেন্দ্রভূমি। রহমত, অর্জুন, কৈবর্ত, ঈশান, রফিক মাস্টার, দেওয়ান, সায়েব, তরফদার ইত্যাদি এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। পদ্মার চর জেগে উঠলে জমিদার সেটা গ্রাস করতে চায়। এজন্য কৌশলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাও বাঁধায় সে। অবশেষে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত শক্তির কাছে সেই অপকৌশল ব্যর্থ হয়।
বিল বাওড়ের ঢেউ : ১৯৫৩ সালে রচিত, ১৯৫৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। মূলত জেলে সম্প্রদায়ের জীবনভিত্তিক নাটক। জেলেজীবনের অর্থকষ্ট ও সামাজিক সমস্যা দুটোই আছে এখানে। মহাজন নিতাই দাস কর্জের বাঁধনে সবাইকে বাঁধতে চায়। যুবক সহদেব সমবায় গঠন করে তা থেকে মুক্তির ইশারা দেয়। নিতাইয়ের মেয়ে গৌরী ভালোবাসে সহদেবকে। সংঘাতময় অবস্থার অবসান শেষে মিলন হয় তাদের।
অগ্নিগিরি : এটি ঐতিহাসিক নাটক। ১৯৫৪ সালে রচিত, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ আমলে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে সংঘটিত কৃষকবিদ্রোহ এর কেন্দ্রীয় বিষয়। ফকির মজনু শাহ, ভবানী পাঠক, রানি ভবানী ও দেবী চৌধুরানির যৌথ সমন্বিত বিদ্রোহে উত্তরাঞ্চলে যে কৃষক জাগরণ ঘটেছিল সেখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ঐতিহাসিক ব্যক্তি নামেই এ নাটকে চরিত্রাবলির নামকরণ করা হয়েছে।
রক্তপদ্ম : ঐতিহাসিক সিপাহি বিপ্লবের (১৮৫৭) শতবর্ষে (১৯৫৭) এ নাটক রচিত এবং ১৯৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। নাটকটি ঐতিহাসিক কিন্তু এখানে চরিত্রাবলির প্রেমসংযোগ কম গুরুত্ব পায় নি। ইংরেজ সৈন্য সুবেদার শামসুদ্দিন এবং কানপুরের নর্তকী আজিজনের প্রেমপর্ব এই নাটকে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহি-জনতার সমন্বিত প্রতিরোধই এই নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে।

প্র : সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৮৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৭), টেনিশিয়ান পুরস্কার (১৯৮৯)।

প্র : তিনি কোন তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৮ই মে, ২০০৯।

আহমদ ছফা

প্র : আহমদ ছফা কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ৩০শে জুন, ১৯৪৩: গাছবাড়িয়া, চট্টগ্রাম।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া কোন পর্যন্ত?

উ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে পিএইচ.ডি. গবেষণায় নাম লেখালেও ডিগ্রি অর্জন সম্ভব হয় নি।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উ : উত্থানপর্ব।

প্র : তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থসমূহের নাম কী?

উ : উপন্যাস : সূর্য তুমি সাথী (১৯৬৭), ওঙ্কার (১৯৭৫), একজন আলী কেনানের উত্থান পতন (১৯৮৯), মরণ বিলাস (১৯৯০), গাভি বিত্তান্ত (১৯৯৪), অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী (১৯৯৬), বিহঙ্গ পুরাণ (১৯৮৬)।

প্র : তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থগুলো কী কী?

উ : জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), বুদ্ধি বৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৭৩), বাঙালি মুসলমানের মন (১৯৭৬), সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (১৯৮০) শতবর্ষের ফেরারী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৭), সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস (১৯৯৭), যদ্যপি আমার গুরু প্রফেসর রাজ্জাক (১৯৯৭)

প্র : 'ওঙ্কার' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : আহমদ ছফা রচিত এই উপন্যাসের নায়ক, আবু নসরের বোবা মেয়েকে বিয়ে করে। আবু নসরের সঙ্গে আইয়ুব খানের সম্পর্ক থাকায় সে এক ধরনের ক্ষমতা লাভ করে। আর এই ঘটনার সূত্র ধরে উপন্যাসটির কাহিনি গতি লাভ করেছে। এটি মূলত '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূতিতে লেখা হয়েছে। আহমদ ছফার উপন্যাস 'ওঙ্কার' প্রকাশ পায় ১৯৭৫ সালে। ভারতীয় পুরাণের অনুসরণে তিনি এই উপন্যাসের নামকরণ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শব্দ-প্রতীক 'ওঁ'-ই ওঙ্কার। ব্রহ্মা এই জগৎ সৃজন করেছেন- বাংলাদেশও সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এখানে মুক্তিযুদ্ধই ব্রহ্মা। আর এই যুদ্ধকালে যারা নানাভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে, রক্ত দিয়েছে, শহিদ হয়েছে- তারা যেন প্রজাপতি ব্রহ্মারই প্রতিনিধি বা অংশ। অসাধারণ শৈল্পিক দক্ষতায় আহমদ ছফা ভারতীয় মিথের সঙ্গে বাংলাদেশের জন্ম-প্রক্রিয়াটিকে সম্পর্কিত করেছেন। উপন্যাসের কথকের সহধর্মিণী ও আবু নছর মোক্তারের মেয়ে বোবা। এই বোবা মেয়ের কণ্ঠ থেকে বাংলা নামটি উচ্চারণ করানোর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রতীকাশ্রয়ে এ কথাই বলেছেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুসারেই জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। আবু নছর মোক্তার পাকিস্তান সরকারের অনুগত এবং সে সরকারের আদর্শ লালন করে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় মানুষের মুখে শব্দটি পর্যন্ত ছিল না। আইয়ুব খান উন্নয়নের দশক পালন করেন আর মুক্তিকামী বাঙালিদের ওপর করেন জুলুম। আবু নছরের জামাতা ও বোবা মেয়েটির স্বামীরও প্রায় একই অবস্থা। সে পলায়নকামী বাঙালি। এক দিকে বাঙালিরা রাজপথে মিছিল করে, বাঙালিদের ন্যায্য দাবি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে, কিভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে এ ব্যাপারে মত দেয়- অন্য দিকে এই বোবা মেয়ের স্বামী এসব দেখেও না দেখার ভান, শুনেও না শোনার ভান করে। কিন্তু কিছু ভীরু মানুষ ছাড়া আর সবাইতো রাজপথে নেমেছিল। বাঙালির ইতিহাসে বিগত শতকের ষাটের দশক ছিল রাজপথে জনজোয়ারের দশক। এই রাজপথে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় আসাদ। আসাদ শহিদ হবার পর রাজপথে যেন জনজোয়ার জাগে আবার, উত্তাল নদীর মতো ফুঁসে ওঠে জনতার নদী। ঢাকা পরিণত হয় স্লোগানের নগরীতে, মিছিলের নগরীতে। নানা ধরনের স্লোগান তৈরি হয় এ সময়। সমস্বরে এই স্লোগানগুলো উচ্চারণ করে পথ অতিক্রম করে বাঙালি জনতা। কিছু ভীরু আর আপসকামী মানুষ ছাড়া সবাই ঘর ছেড়ে এ সময় বের হয়ে আসে। শিশুরা বোর হয়ে আসে ফটকের বাইরে, নারীরা জানালা খুলে মিছিলে মিশে যেতে চায়। বোবা মেয়েটিও তাই চেয়েছে। যখন তার পিতা বা স্বামীর কানে রাস্তার মিছিলের স্লোগান কোনো আবেদন সৃষ্টি করে নি, তখন একটি বোবা মেয়ে জানালার ধারে এসে ঘটিয়ে দিল এক অভাবিত ঘটনা। উপন্যাসে বলা হয়েছে: "আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' শব্দটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করলো। তার মুখ দিয়ে গল গল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে।" বোবা মেয়েটির মৃত্যু হয়। কিন্তু এ কোনো সাধারণ মৃত্যু নয়, প্রতীকী মৃত্যু। তার যে রক্তে মেঝে ভেসে যায়, সে রক্ত থেকেই উত্থান ঘটে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের।

প্র : 'ওঙ্কার' উপন্যাস অবলম্বনে বাংলা কোন চলচ্চিত্র নির্মিত হয়?।

উ : বাঙলা।

প্র : 'অলাতচক্র' কী?

উ : এটি আহমদ ছফা রচিত উপন্যাস। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন 'নিপুণ' নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তিনি সেটি পরিমার্জন করে ১৯৯৩ সালে প্রায় নতুন করেই লেখেন। এটি মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাইরের দেশগুলোর অংশগ্রহণকে সমালোচকের দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনদানকারী দেশসমূহের স্বার্থের দিকটি তিনি দেখতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : ফাতেমা, জাহিদুল, দানিয়েল প্রমুখ।

প্র : তাঁর অন্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য?

উ : গল্প : নিহত নক্ষত্র (১৯৬৯); কবিতা : জল্লাদ সময় (১৯৭৪), দুঃখের দিনে দোয়া (১৯৭৫); অনুবাদ : তানিয়া (১৯৬৭), ফাউস্ট (১৯৮৬), বার্ট্রান্ড রাসেল সংশয়ী রচনাবলী; শিশুতোষ : দোলা আমার কনক চাপা (১৯৬৮), গো হাকিম (১৯৭৭)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : লেখক শিবির পুরস্কার ১৯৭৫ (প্রত্যাখ্যান), সাদাত আলী আকন্দ পুরস্কার (প্রত্যাখ্যান), ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৮০)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০০১ সালের ২৮শে জুলাই।

আহমদ শরীফ

প্র : আহমদ শরীফ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১, সুচক্রদণ্ডী চট্টগ্রাম।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : শিক্ষাবিদ ও গবেষক।

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : প্রবন্ধ গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৮৬), সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (১৯৬৯) স্বদেশ অন্বেষা (১৯৭০), জীবনে সমাজে সাহিত্যে (১৯৭০), যুগ যন্ত্রণা (১৯৭৪), কালিক ভাবনা (১৯৭৪), মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৯৭৭), বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩), ইদানীং আমরা (১৯৮৬), বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা (১৯৮৭), একালে নজরুল (১৯৯০), সময় সমাজ মানুষ (১৯৯৫), স্বদেশ চিন্তা (১৯৯৭), বিশ শতকের বাঙালী (১৯৯৮), বিশ্বাসবাদ বিজ্ঞানবাদ যুক্তিবাদ মৌলবাদ (২০০০); সম্পাদনা : লাইলী মজনু (১৯৫৭), মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১),

মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা (১৯৬১), মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ (১৯৬২), রসুল বিজয় (১৯৬৪), কোরেশী মাগন ঠাকুর চন্দ্রাবলী (১৯৬৭) আলাওল বিরচিত সিকান্দারনামা (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ (১৯৭৮), সৈয়দ সুলতান বিরচিত রসুল চরিত (১৯৭৮)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), বাংলাদেশ লেখিকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০) আলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১), ডি. লিট (সম্মানসূচক) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি।

প্র : তাঁর মৃতদেহ কী কবর দেওয়া হয়েছিল?

উ : না। মৃত্যুর আগে তিনি এক উইল করে নিজের মৃত্যু-উত্তর দেহ 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ'কে দান করে যান। তিনি লিখেছিলেন : 'গোটা অঙ্গ কবরে কীটের খাদ্য হওয়ার চেয়ে মানুষের কাজে লাগাই বাঞ্ছনীয়।'

আহসান হাবীব

প্র : আহসান হাবীবের জন্মতারিখ কত?

উ : ২. ১. ১৯১৭।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : শঙ্করপাসা গ্রাম, পিরোজপুর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি ও সাংবাদিক।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু ?

উ : বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই, এ পর্যন্ত অধ্যয়ন।

প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?

উ : সাংবাদিকতা।

প্র : তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন?

উ : এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক বুদ্ধিজীবী সমাবেশে; ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

প্র : তাঁর কবিকার কোন বিষয়টি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?

উ : গ্রামীণ ঐতিহ্যমণ্ডিত সামাজিক পটভূমে মধ্যবিত্ত মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : রাত্রিশেষ (১৯৪৭)

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য গ্রন্থগুলির নাম কী?

উ : কাব্যগ্রন্থ : ঘরা মহিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৯৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬), দুঃখের দুই আদিম পাথর (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), বিনীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫); উপন্যাস : অরণ্যে নীলিমা (১৯৬২), রানী খালের সাঁকো (১৯৬৮); শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের শকিকলা (১৯৫৪), বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর (১৯৭৬), খুটির দিন দুপুরে (১৯৭৮)।

প্র : 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৪৭; কলকাতার কমরেড পাবলিশার্স থেকে। এই কাব্যগ্রন্থে প্রহর, প্রান্তিক, প্রতিভাস, পদক্ষেপ এই চার ভাগে কবিতাগুলো বিন্যস্ত। মোট কবিতার সংখ্যা ২৮। কাব্যগ্রন্থে কবি আত্মানুসন্ধানে ব্রতী। তিনি কবিতার পথ সন্ধান করেছেন এখানে। গ্রাম ও নগর উভয় কেন্দ্রিক কবিতা এখানে আছে।

প্র : 'ছায়াহরিণ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : গ্রন্থটি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোট কবিতার সংখ্যা ২৪। এ কাব্যে তাঁর সমাজ-সচেতনতা প্রকাশিত। ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবি এখানে বণিক সভ্যতার রুদ্র রূপ দেখেছেন। তিনি গ্রামীণ অনুষঙ্গে স্থিত হতে চেয়েছেন।

প্র : 'সারা দুপুর' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে 'সারা দুপুর' প্রকাশিত। অনেকের মতে আহসান হাবীবের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। মোট কবিতার সংখ্যা ২৬। কাব্যভাষা, ঐতিহ্যান্বেষণ ও বক্তব্য প্রকাশে কবি এখানে পরিপক্ব।

প্র : 'আমি কোন আগন্তুক নই' কবিতার বিষয়বস্তু কী?

উ : 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর' (১৯৮০) কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা এটি। কবিতাতে কবি মানুষের গ্রামে ফেরার কথা আছে। গ্রামীণ অনুষঙ্গসমূহ এই শহরে মানুষকে সচেতন না করলেও সেই মানুষ সাক্ষী মানছে গ্রামীণ মাটি কিছু। 'আমি কোন অভাগাও নই' একথা বোঝাতে শহরে বসবাস তাই বলছে : 'আসমানের তারা সাক্ষী, সাক্ষী এই জমিনের ঘুঘু .....' ইত্যাদি। উদ্ধৃতাংশ, কবির এ কাব্যগ্রন্থের নাম বাংলা একাডেমির 'চরিতাভিধান'সহ অনেক গ্রন্থে 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' আছে। এটি ঠিক নয়। হবে 'দু'হাতে দুই আদিম পাথর'।

প্র : 'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : উপন্যাসে মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি এক তরুণ চিত্রশিল্পী ও তাঁর স্ত্রীর মনোজাগতিক সংকটকে উপজীব্য করে রচিত আহসান হাবীবের 'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এটি আহসান হাবীব রচিত একমাত্র উপন্যাস।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?

উ : অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা পত্রিকার।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১) ও একুশে পদক (১৯৭৮)।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ১০. ৭. ১৯৮৫।

'সেই অস্ত্র' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহসান হাবীবের কাব্যের মূল বৈশিষ্ট্য?

উ : গভীর জীবনবোধ ও আশাবাদ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

উ : বিনীর্ণ দর্পণে মুখ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

উ : অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পর্বগুলোর বিন্যাস ও অসম।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কবির প্রত্যাশা কী?

উ : ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানব সমাজে ফিরে পাওয়া।

প্র : জাত্যভিমান কী?

উ : কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।

প্র : ট্রয়বাসী সম্পর্কে কী জান?

উ : প্রাচীন গ্রিসের হ্যাসরাকলস পর্বত এক-সময়ে। মানুষের হিংসা বিদ্বেষ যখন এক-পক্ষের দিকের মহে পৃথিবীর ইতিহাসে যার-বেরের ধ্বংসে মাতেছে এই নগরী। সুদেব নির্মমতার এক নিদারুণ দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।

প্র : আমোঘ অনন্য অস্ত্র কী?

উ : ভালোবাসা।

প্র : কবির অস্ত্র ব্যতীত হলে পক্ষর খণ্ডিত-আকাশ থেকে কী ঝরবে না?

উ : আগুন ঝরবে না।

প্র : সেই অস্ত্র; কবিতায় কবি কোন অস্ত্রের প্রত্যাশী?

উ : অবিনাশী।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কী মানুষকে সচেতন করে?

উ : ভালোবাসা।

প্র : অবিনাশী শব্দের অর্থ কী?

উ : শাশ্বত বা যা বিনাশ করা যায় না।

প্র : মানব বসতির বুক কোথা থেকে আগুন ঝরবে না?

উ : নক্ষত্রখচিত আকাশ।

প্র : সেই অস্ত্র কবিতায় কবি কী ফিরে পেতে চান?

উ : জ্ঞতবোধ ফিরে পেতে চান।

প্র : ভালোবাসা কিসের লোককে চিহ্নিত করে দেয়?

উ : আধিপত্যের লোককে চিহ্নিত করে দেয়।

প্র : কবি ভালোবাসাকে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন কেন?

উ : ভালোবাসা মানুষের সকল অমঙ্গল থেকে উত্তরণের পথ দেখায় বলে একে অমোঘ অনন্য অস্ত্র বলেছেন।

প্র : 'সেই অস্ত্র' কোন ধরনের কবিতা?

উ : প্রার্থনামূলক।

প্র : এই প্রার্থনা কার কাছে?

উ : এই প্রার্থনা কোনো দৈবশক্তির কাছে নয় আত্মশক্তির কাছে।

প্র : কেন এ ধরনের কবিতা লিখলেন কবি?

উ : পৃথিবীতে যখন হিংসা, দ্বেষ, হানাহানিতে পরিপূর্ণ, যখন বিশ্বযুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধের নামে মানুষ হত্যা করে মানুষকে তখন নিজের মধ্যে ভালোবাসা জাগ্রত করা জরুরি। ভালোবাসাহীন মানুষ যখন পশুতে পরিণত হচ্ছে, তখন কবি ভালোবাসাকে অস্ত্র হিসেবে কামনা করছেন।

প্র : ভালোবাসা কেমন অস্ত্র?
উ : অমোঘ অস্ত্র-- অব্যর্থ অস্ত্র। অন্য অস্ত্র ব্যর্থ হতে পারে, ভালোবাসা হৃদয়ে জায়গা হলে তা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হবে না।

'আমি কোনো আগন্তুক নই' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহসান হাবীবের কিশোরপাঠ্য উপন্যাস কোনটি?
উ : 'রানী খালের সাঁকো' (১৯৮২)।
প্র : কোন পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালে আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করেন?
উ : 'দৈনিক বাংলা'।
প্র : কবি কোন বাগানকে সাক্ষী রেখে বলেছেন যে তিনি কোনো আগন্তুক নন?
উ : বাঁশবাগান।
প্র : কবি কোন নিয়মে বাংলায় থাকেন?
উ : স্বাপ্নিক নিয়মে।
প্র : কোন পাখিরা কবিকে চেনেন?
উ : মেঘ কান্ত বিকেলের পাখিরা।
প্র : কোন সময়ের ধানের মঞ্জরীকে কবি সাক্ষী মেনেছেন?
উ : কার্তিক মাসের ধানের মঞ্জরীকে।
প্র : কোন পাতার টলমলে শিশিরকে কবি সাক্ষী মেনেছেন?
উ : চিরোল পাতার টলমলে শিশিরকে।
প্র : কবি কার চিরচেনা স্বজন?
উ : অকাল বার্ধক্যে নত কদম আলীর।
প্র : কার মা কবিকে চেনেন?
উ : জমিলার মা।
প্র : কোথায় কবির হাতের স্পর্শ লেগে আছে?
উ : বৈঠায় ও লাঙলে।
প্র : কবির শরীরে কিসের গন্ধ লেগে রয়েছে?
উ : স্নিগ্ধ মাটির।
প্র : কবির অস্তিত্বে কী গাঁথা রয়েছে?
উ : ধানক্ষেত, সরু পথ এবং ধুধু নদীর কিনার।
প্র : কবি উধাও নদীর কেমনতর বালক?
উ : মুগ্ধ এক অবোধ বালক।
প্র : পুবের পুকুর- এখানে প-এর উ-কার কেন?
উ : পূর্ব লিখতে উ-কার। কিন্তু এই শব্দটি তৎসম থেকে তদ্ভব হওয়ায় পুব লিখতে উ-কার হবে।

প্র : অভ্যাগত কী?
উ : সংস্কৃত অতি উপসর্গ সহযোগে আগত = অভ্যাগত। অতি এখানে সমীপে অর্থে। অভ্যাগত অর্থ 'অতিথি হিসেবে আগত'।
প্র : আগন্তুক অর্থ কী?
উ : অতিথি।
প্র : 'স্বাপ্নিক নিয়ম' কী?
উ : স্বপ্নজাত নিয়ম। এটি কোনো লিখিত নিয়ম বা আইন নয়। মানুষ তার কল্পনা বা স্বপ্নে একই সাথে অনেক কিছুকে ধারণ করতে পারে। বহু দূরত্ব তুচ্ছ হয় তার কাছে। সুস্থ মানুষ মাত্রই স্বপ্নচারিত। একেই কবি বলছেন 'স্বাপ্নিক নিয়ম'।
প্র : 'জলজ বাতাস'?
উ : জলজ অর্থ জলে জন্মে যা। এখানে জলবাহী আর্দ্র সুশীতল গ্রামীণ বাতাস বোঝানো হয়েছে।
প্র : শিশিপা কী?
উ : এক প্রকার গাছ যাকে ওষধি ও বৃক্ষের সংকর বলা চলে। শিশিপা (Vitex negundo) প্রায় সারা দেশে গ্রামঞ্চলে প্রায় অযত্নেই জন্মে। পাঁচ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এই গাছ। এই গাছের ভেষজ গুণ থাকায় বাত, ব্যথা, হাঁপানি, ঠান্ডাজ্বর ইত্যাদিতে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর পাতা ও ডাল পোকামাকড়রোধী।
প্র : উধাও নদী কেন?
উ : উধাও অর্থ নিরুদ্দেশ। নদী যেহেতু নিরুদ্দেশে ধাবিত হয়, সেহেতু বহমানতা বোঝাতে কবি লিখেছেন 'উধাও নদী'।

ইমদাদুল হক মিলন

প্র : ইমদাদুল হক মিলন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫; নৌহজং বিক্রমপুর।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাহিত্যিক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : গল্পগ্রন্থ : নিরন্নের কাল (১৯৭৯), হে প্রেম (১৯৮৩), ফুলের বাগানে সাপ (১৯৮৩), আহারী (১৯৮৪), তাহারা (১৯৮৬), মর্মবেদনা (১৯৮৮), প্রেম নদী (১৯৮৮), বারো রকমের মানুষ (১৯৮৮) ইত্যাদি।

উপন্যাস : সুখের কষ্ট (১৯৮২), ও রাধা ও কৃষ্ণ (১৯৮২), এক দেশ (১৯৮৩), প্রিয় সাথী জাতি (১৯৮৪), ফুলিপুর (১৯৮৫), পরবাস (১৯৮৭), নায়ক (১৯৮৮), সাবাবেলা (১৯৮৮), জলধারা (১৯৮৮), কথা ছিলো (১৯৮৮), মুজদে (১৯৮৮), বাসরের অষ্টমান (১৯৮৯), বন্দমানুষ (১৯৮৯), স্বপ্ন (১৯৮৯), মহাযুদ্ধ (১৯৮৯), রাজাকারতন্ত্র (১৯৮৯), কোন কালের ফুল (১৯৯০), কালো ঘোড়া (১৯৯১), সুসুরতমা (১৯৯১), আশায় আশায় থাকি (১৯৯২), বাঁকা জল (১৯৯৩), মানুষজন (১৯৯৪), দূরজাহান (১৯৯৫), আহ তুমি হৃদয় জুড়ে (১৯৯৬), সুরক্ষিতাসু (১৯৯৭), যুবরাজ (১৯৯৭), মৌসুমি (১৯৯৮), রহস্যময়ী (১৯৯৯), তখন ছিলাম আমি (২০০০), এলো (২০০১), ঘ্রান (২০০২), কুসুমের মতো মেয়েরা (২০০৩), বন্ধুয়া (২০০৪), তুমিই (২০০৫), অপরবেলা (২০০৬) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বিশ্ব জ্যোতিষ সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬), হুকো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৭) হুমায়ুন কবির সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৯২), নাটা সভা পুরস্কার (১৯৯৩), যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার (১৯৯৫),ঢাকা যুব ফাউন্ডেশন পদক (১৯৯৬), এসএম সুলতান পদক (১৯৯৯), শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর পদক (২০০০), জিয়া শিশু একাডেমি কমল পদক (২০০৪)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মসন কত?
উ : ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কী নামে সমধিক পরিচিত?
উ : ঈশ্বর গুপ্ত নামে।
প্র : তিনি নিজের সাধনায় কোন কোন বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করেন?
উ : ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা এবং বেদান্ত, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে খ্যাত ছিলেন?
উ : সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ খ্রি. সাপ্তাহিক; ১৮৩৯ খ্রি. দৈনিক)।
প্র : বাংলা ভাষার প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা কোনটি?
উ : দৈনিক সংবাদ প্রভাকর (১৮৩৯)।
প্র : সংবাদ প্রভাকরের পরিচয় দাও।
উ : 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিছুদিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ১৮৩৯ সালে পুনর্বার ছাপা হয়। ১৮৩৯ সালে বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেকালের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি, যেমন অযোধ্যানাথ তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ এখানে লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা এই পত্রিকা দিয়েই শুরু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকাতেই প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত প্রকাশ করেন। ১৮৫৯-তে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত এ পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
প্র : 'সংবাদ প্রভাকরে'র যে-কোনো চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম লেখ।
উ : 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ছিলেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি ছাড়া আর তিনজন বিশিষ্ট লেখক হলেন- রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীনবন্ধু মিত্র।
প্র : বাংলা সাহিত্যে তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : যুগসন্ধির কবি।
প্র : বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিকাল কোন সময়কে ধরা হয়?
উ : ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : ঈশ্বর গুপ্তকে যুগসন্ধির কবি বলা হয় কেন?
উ : ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সূচিত হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'মেঘনাদবধ

কাব্য' রচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা আরম্ভ হয় নি। এই ষাট বছর (১৮০১-১৮৬১) কাব্যে আধুনিকতার পৌছার চেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবৎকাল ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বড় হয়েছেন কলকাতার নাগরিক পরিবেশে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কবিতাচর্চায় তিনি এ সময় মধ্যযুগের দেবদেবীর কথা বা কাহিনি নির্ভর কাব্যরচনা বর্জন করে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন। তপসে মাছের মতো সামান্য প্রাণীও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়। তাঁর কবিতায় সমাজসচেতনতা বিশেষ করে মাতৃভূমির প্রতি দরদ অর্থাৎ দেশাত্মবোধ স্পষ্ট দেখা যায়। আবার কবিওয়ালাদের কাব্য ঢঙ, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে লক্ষযোগ্য। আসলে মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের প্রথম পুরুষ মাইকেল মধুসূদন- এই দুই মনীষীর মধ্যবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। তাঁর মধ্যে মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ করা যায় বলে তাঁকে যুগসন্ধির কবি বলা হয়।

প্র : তাঁর রচনা রীতির বিশেষত্ব কী?

উ : ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং দেশ ও সমাজভাবনা।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : রামপ্রসাদ সেন কৃত কালীকীর্তন (১৮৩৩), কবিবর ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১২৯২ বঙ্গাব্দ), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৬), মণিকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত সংগ্রহ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

প্র : তাঁর সম্পাদনায় আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়?

উ : সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২), সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৩. ০১. ১৮৫৯।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ২৬. ৯. ১৮২০: মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে।

প্র : তাঁর পৈতৃক পদবি কী?

উ : বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়া হয়?

উ : সংস্কৃত কলেজ থেকে (১৮৩৯)।

প্র : তিনি কোন নামে স্বাক্ষর করতেন?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সমাজসংস্কারক (বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য খ্যাত), লেখক, শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?

উ : ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতার সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি এবং একাদিক্রমে বারো বছর অধ্যয়ন। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন।

প্র : তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্তি হন?

উ : ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর।

প্র : তিনি সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন কত সালে?

উ : ১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল।

প্র : তিনি জনশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা প্রসারকল্পে বাঙালির জন্য কী কী গ্রন্থ রচনা করেন?

উ : বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যান মঞ্জরী (১৮৬৩)।

প্র : বিদ্যাসাগরের কয়েকটি মৌলিক রচনার পরিচয় দাও।

উ : অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা, রত্ন পরীক্ষা।

এই পাঁচটি বেনামি রচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' নামে প্রথম রচনা 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। উক্ত বেনামিতে দ্বিতীয় রচনা 'আবার অতি অল্প হইল' (১৮৭৩)। এই দুই পুস্তিকায় বহুবিবাহ বিষয়ে তারানাথ তর্কবাচস্পতির লিখিত বক্তব্যের প্রতিবাদে লেখা, বিতর্কমূলক উত্তর-প্রত্যুত্তর। তৃতীয় রচনা 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৫) 'কবিকুল তিলকস্য কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' বেনামিতে লেখা, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা বিবাহ বিরোধী সংস্কৃত বক্তৃতাবলির উত্তর। চতুর্থ রচনা 'বিধবা বিবাহ ও যশোরের হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা' (১৮৮৪), 'কস্যাচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ' বেনামিতে বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন ও স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী তিন পণ্ডিতের যথার্থ পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পঞ্চম রচনা 'কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপো-সহচরস্য' বেনামিতে লেখা 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬)। এতে তাঁরা নির্মাণে বিদ্যাসাগর সাধুরীতিকে কথ্যরীতিতে নিয়ে এসেছেন।

প্র : 'শকুন্তলা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি আখ্যান বা উপন্যাসোপম কাহিনি লিখে নাম দেন 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা'য় কাহিনি নির্মাণ ও ভাষাব্যবহারে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট স্বাধীনতা নিয়েছেন। এখানে লেখকের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, আধুনিক মনোভাব, শিল্প ও পরিমিতিবোধ প্রকাশিত। চন্দ্রবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শিকারে এসে কন্ব মুনির তপোবনে উপস্থিত হয়। সেখানে শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা, অনসূয়া নামের মুনির তিন রূপবতী পালিতা কন্যার মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিয়ে হয়। দুষ্মন্ত চিহ্ন হিসেবে রাজা-আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে নিজ রাজ্যে চলে আসে। রাজকার্যে ব্যস্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা ভুলে যায়। এদিকে শকুন্তলার গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়; নাম ভরত। ভরতসহ শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদে এসে তাদের বিয়ের কথা বর্ণনা দিলেও রাজা তা মনে করতে পারে না। পরে দৈববাণীতে মুখর সব অবগত হয় এবং শকুন্তলা-ভরতকে সোনা স্থান দেয়। মূল কাহিনি মুখর ভরতকে নিয়ে রাজার উৎকণ্ঠিতাই করে। বাংলা সাহিত্যে 'শকুন্তলা' গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, এ গ্রন্থের আগে পরে এমন গ্রন্থের এতো চমৎকার কাহিনি বা আখ্যান বর্ণনা পাওয়া যায় না। গদ্যসাহিত্যে প্রতিভার মূলে 'শকুন্তলা' একটি অসাধারণ সৃষ্টি।

প্র : তিনি কত সালে কলকাতা বিডন্যাসাগরের ফোলো এবং কত সালে শকুন্তলোনী সভার সভ্য হন?

উ : ১৮৫৬ ও ১৮৫৮ সালে।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন?

উ : বিধবা-বিবাহ আন্দোলন।

প্র : 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন কত সালে?

উ : ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে।

প্র : কত সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়?

উ : ২৬শে জুলাই, ১৮৫৬।

প্র : তাঁর কোন নিকটাত্মীয় বিধবা বিবাহ করেন?

উ : তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ করেন।

প্র : ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকার নাম কী?

উ : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।

প্র : 'অতি অল্প হইল' কত সালে রচিত?

উ : মে ১৮৭৩; 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : বাংলা গদ্যের জনক।

প্র : বাংলা গদ্যপ্রবাহ সমৃদ্ধির জন্য তিনি তাঁর গদ্যে কিসের সৃষ্টি করেন?

উ : 'উচ্চবচন ধ্বনিতরঙ্গ' ও 'অনতিলম্বা ছন্দস্রোত'।

প্র : বাংলা গদ্যে যতি বা বিরামচিহ্ন প্রথম স্থাপন করেন কে?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্র : বিদ্যাসাগর বিতর্কসাহিত্যসম্পন্ন পুস্তক রচনার অবকাশ পান নি কেন?

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

অতিদ্রুত বাংলা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থের অভাব দূর করা। তাই শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলার গ্রন্থ অনুবাদে রত হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসও ছিল শিক্ষার প্রসার এবং সমাজসংস্কারমূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য নিছক রসচর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের সারস্বত প্রতিভাকে তিনি অনুবাদকর্মে নিয়োগ করেছিলেন।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা গদ্যের জনক-মন্তব্যটির যাথার্থ্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উ : বাংলা গদ্যকে গতিশীল করে প্রাণদান করেছেন বিদ্যাসাগর। এর আগে তা ছিল প্রস্তরবৎ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠী ও রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্যরচনার প্রাথমিক প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁদের গদ্যরীতিতে বহুতর অপূর্ণতার লক্ষণ ছিল স্পষ্ট। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যে কিছুটা ছন্দ আনলেও সে গদ্যে দূরান্বয়ী দোষ থেকে গেছে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সুললিত শব্দবিন্যাস, পদবিভাগ ও যতিসন্নিবেশে সুবোধ্য ও শিল্প গুণান্বিত করে তোলেন। বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনিঝংকার ও সুরবিন্যাস তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন এবং বাংলা গদ্যকে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব অনুসারে ভাগ করে সেখানে যতিচিহ্ন স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগরের পরিকল্পিত সাধুভাষা তাই পরবর্তীকালের আদর্শ সাধুভাষা রূপে গৃহীত হয়। বাংলা গদ্যকে তিনি সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সর্বভাব প্রকাশক্ষম করেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন।

প্র : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

উ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যিকের চেয়ে সমাজসংস্কারক আগে। কারণ, তিনি সমাজসংস্কারের কাজে যে লেখাগুলো লিখেছেন, সেগুলো পরে সাহিত্য হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে। সাহিত্যকর্ম ও সমাজসংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তারেও তার অশেষ অবদান রয়েছে। এটিও তাঁর সমাজসংস্কার কাজের অংশ। সমাজকে অগ্রসর করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষার পত্তন ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সমাজ-প্রগতির লক্ষ্যে এবং সমাজে আধুনিকতা আনতে গিয়ে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজসংস্কারের মুখ্যকর্ম করতে গিয়ে তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ বিধবা বিবাহের তীব্র বিরোধিতায় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিরুদ্ধবাদীদের অপতৎপরতার জবাব দেয়ার জন্য একই শিরোনামে আরেকটি পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সালের ৮ই অক্টোবরে বিধবা বিবাহ আইন পাস করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনি আবেদন জানান। এই আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি বিধবা বিবাহ আইনের একটি খসড়াও সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরোধী শিবির থেকেও সরকারের কাছে বিপরীত একটি আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। ১৮৫৫ সালের ১৭ই নবেম্বর, এক বছর পর খসড়াটি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়। বহুবিধ বিচার-বিশ্লেষণের পর ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধবা বিবাহ আইনের খসড়াটি গৃহীত হয়। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয়। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বরে আইনানুসারে প্রথম বিধবা বিবাহ করেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে তার নেতৃত্বে বহু বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে বিদ্যাসাগর নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে এক বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, শুধু কথায় নয় কাজেই তিনি বিধবা বিবাহ চান। এ নিয়ে নিজ মায়ের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মায়ের চেয়েও তিনি বড় করে দেখেছিলেন লাখ লাখ বিধবা মায়ের দুঃখকে। বিধবা বিবাহ সিদ্ধ- এমন আইন হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে গেছেন। ১৮৭১ সালের জুলাই মাসে তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করেন। বাঙালি নারীজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে বিদ্যাসাগরকেই মান্য করা হয়। শেষজীবনে তিনি বিহারের অন্তর্গত কর্মাটারে কাটান। সেখানে সাঁওতালদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করে। অবহেলিত অবস্থা দেখে তাদের জন্য তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই তিনি জীবনের অন্তিমদিবস পর্যন্ত সমাজসংস্কারের আন্দোলন করে গেছেন।

প্র : বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (হিন্দি বৈতালপৈচ্চিসির বঙ্গানুবাদ ১৮৪৭), 'শকুন্তলা' (কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের উপাখ্যান ভাগের বঙ্গানুবাদ, ১৮৫৪), 'সীতার বনবাস' (ভবভূতির উত্তররাম চরিত নাটকের প্রথম অঙ্কের ও রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের বঙ্গানুবাদ, ১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (শেক্সপিয়রের Comedy of Errors-এর বঙ্গানুবাদ, ১৮৬৯)।

প্র : বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি?

উ : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)।

প্র : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য রচনার নাম কী?

উ : প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২)।

প্র : বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম কী?

উ : ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৩, ৩য় ভাগ ১৮৫৪, ৪র্থ ভাগ ১৮৬২ সাল)।

প্র : ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?

উ : মানবতাবাদ, কর্মবাদ ইহলৌকিক চিন্তা চেতনার প্রতি আস্থাশীল একজন ক্ষণজন্মা বাঙালি।

প্র : বিবিসি জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কোথায়?

উ : অষ্টম স্থান।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বিদ্যাসাগর উপাধি (১৮৩৯), বাংলার গভর্নর কর্তৃক সম্মাননা লিপি (১৮৭৭) ও ভারত সরকার কর্তৃক সিআইই উপাধিতে ভূষিত।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৯. ৭. ১৮৯১।

উইলিয়াম কেরী

(*নামটি বিদেশি হলেও উইলিয়াম কেরী বাংলা বই লিখেছেন এবং সেখানে তিনি ঈ-কার দিয়েই 'কেরী' লিখিছেন।)

প্র : উইলিয়াম কেরীর জন্মতারিখ কত?

উ : ১৭. ৮. ১৭৬১

প্র : তাঁর জন্ম স্থান কোথায়?

উ : নর্দানটন শায়ার, ইংল্যান্ড.

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : মিশনারি ও বাংলায় গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক।

প্র : তিনি কার কাছ থেকে গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন?

উ : টমাস জোনস

প্র : তিনি কিভাবে বাংলা ভাষা শেখেন?

উ : ইংল্যান্ড থেকে জাহাজযোগে কলকাতায় আসতে তখন সমুদ্র পথে প্রায় ছয় মাস সময় লাগত। এই সময় জাহাজের বাঙালি খালাসিদের কাছ থেকে তিনি বাংলা শেখেন।

প্র : তিনি কতসালে ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতে আসেন?

উ : ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে

প্র : তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপিস্ট মিশন (যাকে শ্রীরামপুর মিশন বলে) প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?

উ : ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি।

প্র : তিনি কত সালে 'ম্যাথু রচিত সমাচার'-এর প্রথম পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করেন?

উ : ১৮০০র ১৮ই মার্চ।

প্র : শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থটির নাম কী?
উ : 'যথী রচিত মিশন সমাচার'। এটিই বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ। মুদ্রিত হয় ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের অগস্ট মাসে।
প্র : তিনি কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন?
উ : ১৮০১-র মে মাসে (ত্রিশ বছর অধ্যাপনা করেন)। তিনি একই সঙ্গে সংস্কৃত ও মারাঠি ভাষাও পড়াতেন।
প্র : তাঁর নিজস্ব রচনা কী কী? এতগুলো বিশিষ্ট কেন?
উ : কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২)। এইগ্রন্থ দুটোতে সূচনাকালীন বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি ও প্রতিষ্ঠাপ্রয়াস লক্ষণযোগ্য।
প্র : 'কথোপকথন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : একাধিক মানুষের মুখের সাধারণ কথা বা কথোপকথন বা ডায়লগ এ গ্রন্থের উপজীব্য। বাংলা লিখিত গদ্যের সূচনাকালীন নমুনা এখানে উল্লেখকৃত। স্ল্যাং বা গালিগালাজও বাদ দেয়া হয় নি। এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য প্রচুর।
প্র : 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) উইলিয়াম কেরি সঙ্কলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এটি প্রথম গল্পসংগ্রহ। গল্পগুলি বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।
প্র : তাঁর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর থেকে কতগুলো ভাষায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
উ : ৪০ টি।
প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন?
উ : মারাঠি (১৮০৫), সংস্কৃত (১৮০৬), পাঞ্জাবি (১৮১২), তেলিঙ্গা (১৮১৪)। ভারতীয় ভাষায় অভিধান রচনা করেন : মারাঠা (১৮১৮), বাংলা (১৮১৮)।
প্র : তিনি কত সালে রামায়ণ সম্পাদনা করেন?
উ : ১৮০৬-১৮১০।
প্র : তিনি কিসের জন্যে অমর হয়ে থাকবেন?
উ : বাংলা গদ্যের সূচনাকালীন অবদান, বাংলা লিপির সংস্কার এবং এদেশীয় কৃষ্টি, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে গবেষণার জন্য।

প্র : কেরী রচিত ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
উ : এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৮০১)।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উ : অর্ধশত (প্রায়)
প্র : ভারতে আসার আগে তাঁর মূল পেশা কী ছিল?
উ : পাদুকা নির্মাণ
প্র : তিনি বাংলা গদ্যের বিকাশধারায় চিরস্মরণীয় কেন?
উ : গদ্য ও পাঠ্যপুস্তকের জন্য।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ৯ই জুন, ১৮৩৪।

এস ওয়াজেদ আলি

প্র : এস ওয়াজেদ আলির জন্মতারিখ ও স্থান?
উ : ১৮৯০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর, হুগলির শ্রীরামপুরে।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ (১৯১০) ও কেম্ব্রিজ থেকে বার এট ল (১৯১৫)
প্র : তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত ইংরেজি মাসিকের নাম?
উ : Bulletin of the Indian Rationalistic Society (১৯১৯).
প্র : তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত বাংলা মাসিকের নাম?
উ : গুলিস্তাঁ (১৩৩২)
প্র : তিনি কোন পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্রে'র।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : গল্পগ্রন্থ 'গুলদাস্তা' (১৯২৭)।
প্র : তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : প্রবন্ধ : জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩); গল্প : মাসুকের দরবার (১৯৩০), বাদশাহী গল্প (১৯৪৪); ভ্রমণ কাহিনি : মোটরযোগে রাঁচি সফর (১৯৪৯); ঐতিহাসিক উপন্যাস : গ্রানাডার শেষ বীর (১৯৪০)।

প্র : কোন গ্রন্থটির জন্য এস ওয়াজেদ আলি বিখ্যাত হয়ে থাকবেন?
উ : ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩)। এই বইতে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধকরণের কথা আছে।
প্র : কখন ও কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়?
উ : ১৯৫১ সালের ১০ই জুন, কলকাতায়।

কাঙাল হরিনাথ

প্র : কাঙাল হরিনাথের জন্ম সন কত?
উ : ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কুষ্টিয়ার কুমারখালি।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী ছিল?
উ : হরিনাথ মজুমদার।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোথায় হয়?
উ : বাল্যকালে কৃষ্ণনাথ মজুমদারের ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন, অর্থাভাবে লেখাপড়া বন্ধ।
প্র : নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে?
উ : ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি বিখ্যাত যে পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন তার নাম কী?
উ : 'সংবাদ প্রভাকর'।
প্র : ১৮৬৩-র এপ্রিল মাসে কুমারখালি থেকে তিনি যে পত্রিকা প্রকাশ করেন তার নাম কী?
উ : 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'।
প্র : 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় কী কী বিষয় স্থান পেত?
উ : সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ এবং নীলকর সাহেবদের শোষণের কাহিনি।
প্র : স্বরচিত গানে তিনি কোন ভণিতা ব্যবহার করতেন?
উ : কাঙাল
প্র : তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?
উ : আঠারটি।

প্র : পত্রিকা সম্পাদনা পরিত্যাগ করে তিনি কীসে মনোযোগী হয়েছিলেন?
উ : ধর্মভাব প্রচারের জন্য 'কাঙাল হরিনাথ ঠাকুরের দল' নামে একটি যাত্রার দল গঠন করে গান রচনা ও পরিবেশনায় মনোযোগী হন।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?
উ : বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), চারু চরিত্র (১৮৬৩), কবিতা কৌমুদী (১৮৬৬), অক্ষুর সংবাদ (১৮৭০), বিত্ত চপলা (১৮৭৬) এবং হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১৯০১)।
প্র : কাঙাল হরিনাথের মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল।

কাজী আবদুল ওদুদ

প্র : কাজী আবদুল ওদুদের জন্মতারিখ কত?
উ : ২৬-৪-১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্ম নেন?
উ : বাগমারা গ্রাম, পাংশা, রাজবাড়ি (তৎকালীন ফরিদপুর)।
প্র : তিনি কী ছিলেন?
উ : লেখক ও চিন্তাবিদ।
প্র : ওদুদের পিতার নাম কী? তিনি কোন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন?
উ : কাজী সগীর উদ্দিন। তিনি রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার ছিলেন।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ দাও।
উ : তিনি ১৯১৩-তে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯১৫ ও ১৯১৭-তে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে যথাক্রমে আই.এ ও বি.এ, এবং ১৯১৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন।
প্র : তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (ঢাকা কলেজ) বাংলার অধ্যাপক হন কত সালে?
উ : ১৯২০ সালে।
প্র : ১৯৬৫-তে নবপর্যায়ে প্রকাশিত যে পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন তার নাম কী?
উ : 'তরুণ পত্র'।
প্র : বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনকল্পে ১৯২৬-এ প্রতিষ্ঠিত যে সমিতির অন্যতম নেতা তিনি ছিলেন, তার নাম কী?
উ : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

প্র : তিনি কোন ধরনের লেখার জন্য ঢাকার নওয়াব পরিবার কর্তৃক নিগৃহীত হন?
উ : সাহিত্য সমাজের পত্রিকা শিখায় (১৯২৭) তাঁর মুক্তচিন্তা ও যুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন লেখার জন্য।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ কী?
উ : উপন্যাস : নদীবক্ষে (১৯১৮), সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ : শাশ্বতবঙ্গ (১৯৫১), কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রতিভা।
প্র : 'শাশ্বতবঙ্গ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : কাজী আবদুল ওদুদ রচিত প্রবন্ধের সংকলন 'শাশ্বতবঙ্গ' : ১৯৫১ (১৩৫৮) খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। এতে ইতঃপূর্বে রচিত তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক / পুস্তিকা থেকে প্রবন্ধ গৃহীত হয়, কিছু নতুন প্রবন্ধ থাকে। 'শাশ্বতবঙ্গে'র প্রবন্ধগুলো ৬টি ভাগে বিভক্ত করা চলে : হিন্দু-মুসলিম সমস্যা বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অন্বেষণ, মুসলিমদের আত্ম-অন্বেষণ, রবীন্দ্র-ভাবনা, নজরুল-মূল্যায়ন, সাহিত্য-ভাবনা, অন্যান্য মনীষী-মূল্যায়ন। প্রবন্ধগুলোতে লেখক বৃহৎ বাংলা ও ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বুদ্ধির মুক্তি ঘটাতে চেয়েছেন এবং শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতায় জাতির কতটুকু বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, সে-আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন। কাজী আবদুল ওদুদ অবিভক্ত বাংলা প্রত্যাশা করেছিলেন। তাই ফরিদপুরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, দেশ ভাগ হওয়ার পর অনুরোধ পেয়েও তিনি পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন নি।
প্র : 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'নদীবক্ষে' (১৯১৮) যতটুকু উপন্যাস, তার চেয়ে বেশি সমাজচিত্র। এখানে অন্ত্যজ চাষি মুসলিম জীবনের যে নির্ভরযোগ্য উল্লেখ আছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি সে কথা লিখেছিলেন। গ্রামীণ সমাজের কলহ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব আবার মিলনের কথা চারটি কৃষক পরিবারকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই কৃষক-পরিবারের প্রধানরা হলেন জমির শেখ, ইরফান মণ্ডল, দুখে, লালু। এখানে লালু ও মতির মধ্যে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের যে উল্লেখ আছে তা বেশ আকর্ষণীয়। 'নদীবক্ষে' উপন্যাসে কাজী ওদুদ দেখিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মুসলিমরা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু ধর্ম নিয়ে বাড়া বাড়ি তাদের নেই। কেউ নামাজ না পড়লে বা ধর্মীয় রেওয়াজ মেনে না চললেও তারা 'ধর্মপেল' বলে চিৎকার করে না। লালু যে সতের বছরেও নামাজ পড়া শেখে নি এ ব্যাপারে গ্রামের মুসলিম সমাজের মাথা ব্যথা নেই। ধর্মীয় রেওয়াজ না মানলেও এরা অসৎ নয়, কপটও নয়। কাজী ওদুদ বাংলাদেশের শাশ্বত ধর্মবোধকেই তুলে ধরেছেন এবং আচরণের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন।
প্র : 'কবিগুরু গ্যেটে'র পরিচয় দাও।
উ : 'কবিগুরু গ্যেটে' (১৯৪৬) কাজী আবদুল ওদুদ রচিত দুইখণ্ডে বিভক্ত জার্মান মহাকবি ও নাট্যকার গ্যেটের জীবন ও কর্মের আলোচনা। এই গ্রন্থে গ্যেটের নাটক 'ফাউস্টে'র রসগ্রাহী পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষায় গ্যেটে সম্বন্ধে এটি প্রথম বই।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কোথায় কবে?
উ : কলকাতা; ১৯-৫-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

কাজী ইমদাদুল হক

প্র : কাজী ইমদাদুল হকের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর, খুলনায়।
প্র : তিনি কবে, কোথায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন?
উ : ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ঢাকা মাদ্রাসা'র শিক্ষক হিসেবে।
প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : উপন্যাস : 'আবদুল্লাহ্' (১৯৩৩);
কাব্য : 'আঁখিজল' ও 'লতিকা';
প্রবন্ধ : 'প্রবন্ধমালা';
শিশুতোষগ্রন্থ : 'নবীকাহিনী'।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'শিক্ষক' পত্রিকার (১৯২০)।

প্র : 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসটি কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?
উ : মোসলেম ভারত।
প্র : 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : কাজী ইমদাদুল হকের এই বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যু হলে অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির ইমদাদুল হকের খসড়া অবলম্বনে অসমাপ্ত উপন্যাসটির ১১টি পরিচ্ছেদ রচনা করেন। উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম সমাজের পিরভক্তি, ধর্মীয় কুসংস্কার, পদপ্রিয়তা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য, হীন স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়বিদ্বেষ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানবতাবাদী প্রতিবাদ। বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'আবদুল্লাহ্ বইটি পড়ে আমি খুশি হয়েছি বিশেষ কারণে, এই বই থেকে মুসলমানের ঘরের কথা জানা গেল।' রবীন্দ্রনাথ লেখকের উদার প্রকাশভঙ্গিরও প্রশংসা করেন। শিল্পের বিচারে 'আবদুল্লাহ্' উৎকৃষ্ট উপন্যাস নয়। তবে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের, বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের অগ্রযাত্রার সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা সুচারুভাবে ফুটে ওঠায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কাহিনির নায়কের নামেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।
প্র : তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্থপতি ছিলেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (১৯১১)।
প্র : তিনি কবে কোথায় মারা যান?
উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ, কলকাতায়।

কাজী নজরুল ইসলাম

প্র : কাজী নজরুল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চুরুলিয়া গ্রাম, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি কবে জন্ম নেন?
উ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ (২৪শে মে, ১৮৯৯ খ্রি.)।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : কাজী ফকির আহমদ।
প্র : তাঁর মাতার নাম কী?
উ : জাহেদা খাতুন।
প্র : নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বর্ণনা দাও।
উ : দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে শিল্প প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৯) হন। এরপর ১৯১৪ সালে ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে, ১৯১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের রানিগঞ্জ শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণি প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।
প্র : বার বছর বয়সে তিনি কোথায় যোগ দেন?
উ : লেটোর দলে এবং দলে 'পালা গান' রচনা করেন।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হয় কিভাবে?
উ : আসানসোল রুটির দোকানে কাজ করা অবস্থায় আসানসোল থানার দারোগা কাজী রফিজউদ্দিন তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজের বাড়ি ময়মনসিংহের কাজি সিমলা গ্রামে নিয়ে যান এবং দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯১৪'র ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে কাজি সিমলা ত্যাগ করেন। পরে নিজের ইচ্ছায় শিয়ারশোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই প্রি-টেস্ট পরীক্ষার সময় ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দেন (১৯১৭)।
প্র : নজরুল বাংলাদেশের কোন সঙ্গীতের রচয়িতা?
উ : রণসঙ্গীত।
প্র : রণসংগীত হিসেবে মূল কবিতাটির কত চরণ গৃহীত?
উ : ২১ চরণ।
প্র : রণসংগীতটি কী শিরোনামে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : 'নতুনের গান' শিরোনামে ঢাকার 'শিখা' পত্রিকায় ১৯২৮ (১৩৩৫) বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে এর নাম হয় 'চল্ চল্ চল্'।

প্র : নজরুলের কোন গ্রন্থে এই সংগীত অন্তর্ভুক্ত আছে?

উ : 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে।

প্র : 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়?

উ : 'সাপ্তাহিক বিজলী'র ২২শে পৌষ (১৩২৮) সংখ্যায়।

প্র : নজরুল কোন দৈনিক পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন?

উ : 'সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ' (১৯২০)-এর।

প্র : এই পত্রিকার সঙ্গে আর কোন দুজন রাজনৈতিক নেতা যুক্ত ছিলেন?

উ : কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও শেরে বাংলা ফজলুল হক।

প্র : তাঁর সম্পাদনায় কোন অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত?

উ : 'ধূমকেতু' (১৯২২)।

প্র : ধূমকেতু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কোন বাণী ছাপা হয়?

উ : 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু—'।

প্র : কোন কবিতা প্রকাশিত হলে তিনি গ্রেফতার হন?

উ : ধূমকেতুর পূজা সংখ্যায় (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২) 'আনন্দময়ীর আগমনে'।

প্র : রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন?

উ : 'বসন্ত'।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ কবি নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করলে অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কোন কথা জানিয়েছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারো নি। আমার বিশ্বাস, তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছো। আর পড়ে থাকলেও রূপ ও রসের সন্ধান করো নি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছো মাত্র। কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকতে পারে না এসব তোমাদের [illegible] বটে : সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন সেখানে কংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করলে বৈকি। আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজতো।"

প্র : হুগলি জেলে কর্মকর্তাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নজরুল অনশন করলে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে কী লিখে টেলিগ্রাফ পাঠান?

উ : 'Give up hunger strike. Our literature claims you.'

প্র : নজরুল জেল থেকে মুক্তি পান কবে?

উ : ১৯২৩-এর ১৫ই অক্টোবর।

প্র : নজরুলের স্ত্রীর নাম কী?

উ : আশালতা সেনগুপ্ত, ডাক নাম দুলি। আদর করে ডাকা হতো দোলন বা দুলু। বিয়ের পর নজরুল তাঁর নাম পাল্টে দেন 'প্রমীলা'। (রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্ত্রী ভবতারিণী দেবীর নাম পাল্টে নিয়ে করেছিলেন মৃণালিনী।)

প্র : আশালতা সেনগুপ্তের (প্রমীলা) সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয় কত তারিখ?

উ : ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল।

প্র : প্রমীলার জন্ম-মৃত্যু কবে?

উ : প্রমীলার জন্ম ১৯০৮ সালের মে মাসে, মৃত্যু ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন। ১৯৩৯ সালে প্রমীলা অসুস্থ হন এবং ধীরে ধীরে তা গুরুতর আকার ধারণ করে। দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি প্রায় বিছানাতেই কাটান।

প্র : নজরুল ও প্রমীলার সন্তান কতজন?

উ : তাঁদের কোনো কন্যাসন্তান নেই। প্রথম দুই পুত্র কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও অরিন্দম খালেদ ওরফে বুলবুলের অকাল প্রয়াণের পর কাজী সব্যসাচী (১৯২৯-১৯৭৯) ও কাজী অনিরুদ্ধ (১৯৩১-১৯৭৪) তাঁদের দুই পুত্র বেঁচে ছিলেন। সব্যসাচী আবৃত্তিকার, তাঁর কন্যা খিলখিল কাজী; অনিরুদ্ধ সুরকার, তাঁর কন্যা অনিন্দিতা কাজী।

প্র : কাজী নজরুল ইসলাম কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেন কখন?

উ : ১৯২৫-এ ফরিদপুর কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে।

প্র : তাঁর সম্পাদিত 'লাঙল' পত্রিকার প্রকাশকাল কত?

উ : ১৯২৫ সাল।

প্র : নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয় কোথায় এবং কখন?

উ : ১৯২৯-এর ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?

উ : ব্যথার দান (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনার নাম কী?

উ : বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬; সওগাত)।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতার নাম কী?

উ : মুক্তি (প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩২৬; বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা)।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী?

উ : বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী (প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?

উ : ব্যথার দান (প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯২২)

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : অগ্নি-বীণা (সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : বাঁধন-হারা (১৯২৭)।

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম কী?

উ : তুর্কমহিলার ঘোমটা খোলা (প্রকাশ : কার্তিক ১৩২৬)

প্র : নজরুলের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?

উ : যুগবাণী (অক্টোবর ১৯২২)

প্র : নজরুলের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম কী?

উ : ঝিলিমিলি (১৩৩৪, নওরোজ)।

প্র : প্রথম প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ কোনটি?

উ : ঝিলিমিলি (১৩৩৭)। এই গ্রন্থে মোট তিনটি নাটক আছে।

প্র : নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ কোনটি?

উ : বিষের বাঁশি (প্রকাশ : অগস্ট ১৯২৪/ নিষিদ্ধ : ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪)

প্র : নজরুলের মোট কয়টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়, কী কী?

উ : ৫টি। বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, মুখবাণী।

প্র : জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম কী?

উ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। রচনার তারিখ ৭/১/১৯২৩।

প্র : অগ্নি-বীণা কাকে উৎসর্গ করা হয়?

উ : বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে।

প্র : অগ্নি-বীণার প্রথম কবিতা কোনটি?

উ : প্রলয়োল্লাস।

প্র : 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'সাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম' এই বারটি কবিতার সমাহারে কলকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত। কিন্তু প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নিজের নাম ছাপা হয়েছে। এই কাব্যের অন্যতম ও জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্য প্রথমে তাঁকে 'বিদ্রোহীর কবি' বলা হয়, পরে 'বিদ্রোহী কবি'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে কাব্যটি রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। কাব্যটিতে কবি ভারতীয় পুরাণ এবং পশ্চিম এশীয় ঐতিহ্য ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কবি শব্দ ব্যবহারেও রেখেছেন স্বকীয়তার ছাপ। কাব্যটির প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় ব্রিটিশ বিরোধী বাঙালি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে। উল্লেখ্য যে, অনেকে লিখে থাকেন 'অগ্নি-বীণা' ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এ তথ্য সত্য নয়। গ্রন্থটি কোনোদিন নিষিদ্ধ হয় নি।

প্র : নজরুলের কোনটি পত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত?

উ : বাঁধন-হারা।

প্র : নজরুল মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন কখন?

উ : ১৯৪২-এর ১০ই অক্টোবর।

প্র : নজরুলকে কবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়?

উ : তাঁর মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস আগে, ১৯৭৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো কী?

উ : 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২), 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), ফণি-মনসা (১৯২৭), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি।

প্র : 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে (অক্টোবর, ১৯২৩) 'দোলন-চাঁপা' প্রকাশিত হয়। কবি তখন রাজবন্দি হিসেবে জেলে। ২১টি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতা 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। এছাড়া বেলাশেষে, পুবের চাতক, অবেলার ডাক, পূজারিণী, কবি-রানী ইত্যাদি কবিতা রয়েছে। মূলত প্রেম-প্রধান কবিতার বই। নজরুল কুমিল্লা গিয়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে ছিলেন। এ সময় ইন্দ্রকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্রী আশালতার সঙ্গে তাঁর প্রণয় জন্মে। আশালতার ডাকনাম ছিল দুলি। দুলিকে আদর করে দোলন ও দুলু বলে ডাকা হতো (দ্রষ্টব্য : মুজফ্ফর আহমদের স্মৃতিকথা)। দোলন বা আশালতার নামেই 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থের নামকরণ। এর অধিকাংশ কবিতা দোলন বা দুলি বা আশালতাকে নিয়ে। কারাদণ্ড ভোগ শেষে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল নজরুল ও আশালতার বিয়ে হয়। বিয়ের পর নজরুল স্ত্রীর নামকরণ করেন প্রমীলা (রবীন্দ্রনাথও স্ত্রী ভবতারিণীর নাম পাল্টে দিয়ে করেছিলেন মৃণালিনী।)।

প্র : 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (অগস্ট ১৯২৪) 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করেন কবি নিজেই। সে বছরই সরকার গ্রন্থটি নিষিদ্ধ করে। এটি নজরুলের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো বিদ্রোহাত্মক ও জাতি জাগরণমূলক। বন্দী-বন্দনা, শিকল-পরা গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি, সত্য-মন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। নজরুল ইসলামের কবিতার বলিষ্ঠতা, যৌবনের উদ্দাম শক্তি, উন্নত মানবিকতা ও সামাজিক সচেতনতা এবং গীতি প্রতিভার সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে পরিস্ফুট।

প্র : 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে (অগস্ট ১৯২৪) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সরকার একই বছর ১১ই নভেম্বর বইটি নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ আমলে এ গ্রন্থের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয় নি। ১১টি কবিতা এখানে আছে। প্রতিটি কবিতাই বিদ্রোহাত্মক। জাগরণী, দুঃশাসনের রক্ত-পান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য কবিতা।

প্র : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে নজরুলের অসাধারণ ও মানবতাবাদী কাব্যগ্রন্থ 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, কুলি-মজুর ইত্যাদি এর উল্লেখযোগ্য কবিতা। এ গ্রন্থে কতিপয় বিপ্লবাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন নজরুল। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষই সব গ্রন্থ এনেছে, কোন গ্রন্থই মানুষ আনে নি : 'মানুষেরে ঘৃণা করি / ও কারা কোরান বেদ বাইবেল চুমিছে মরি মরি / ও মুখ হইতে কেতাব-গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে / যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে / পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল-মূর্খরা সব শোনো / মানুষ এনেছে গ্রন্থ;-গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।'

প্র : 'সঞ্চিতা'র পরিচয় দাও।

উ : 'সঞ্চিতা' নজরুলের অনুমোদনে প্রকাশিত তাঁর কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। উৎসর্গ করেন এই লিখে : 'বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'। ৭৮টি কবিতা ও গান এখানে সংকলিত। নজরুলের কবিতার ধারা বুঝবার জন্য এ সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জীবিতাবস্থায় নজরুল এগুলোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি বলে অনুমোদন করে গেছেন।

প্র : 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম'র পরিচয় দাও।

উ : ফারসী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাই বা কবিতা অনুবাদ করেন নজরুল। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সৈয়দ মুজতবা আলী এর ভূমিকা লেখেন। জীবনবাদী ওমর নজরুলকে খুব আকর্ষিত করেছিলেন। এ অনুবাদে অত্যন্ত চমৎকার ভাষাভঙ্গি ব্যবহৃত। অন্যান্য অনুবাদকারের চেয়ে নজরুলের অনুবাদ অনুভূতির গভীরে, যথাযথ শব্দের পারিপাট্যে উজ্জ্বল।

প্র : জীবনীকাব্যগুলো কী কী?

উ : 'চিত্তনামা' (১৯২৫) ও 'মরু-ভাস্কর' (১৯৫০)।

প্র : চিত্তনামা ও মরু-ভাস্কর কার জীবনভিত্তিক কাব্য?

উ : চিত্তনামা : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ; মরু-ভাস্কর : হযরত মুহম্মদ।

প্র : 'চিত্তনামা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত (১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিঙে মৃত্যুবরণ করেন। এ মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে নজরুল অর্ঘ্য, অকাল-সন্ধ্যা, সাঙ্কনা, ইন্দ্রপতন, রাজভিখারি নামে কয়েকটি কবিতা সমকালীন পত্রিকায় লেখেন। এ কবিতাগুলোতে চিত্তরঞ্জনের প্রতি কবির আবেগ মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয় এবং তিনি চিত্তরঞ্জনকে নবির সঙ্গে তুলনা করে লেখেন : 'জন্মিলে তুমি মোহাম্মদের আগে হে পুরুষবর / কোরানে ঘোষিত তোমার মহিমা হতে পয়গাম্বর।' (ইন্দ্রপতন) নজরুল চিত্তরঞ্জনকে 'হে মানব-আখিয়া' নামেও অভিহিত করেন। এতে গোঁড়া মুসলিমরা ক্ষেপে যায়। কবি যখন এসব কবিতা নিয়ে 'চিত্তনামা' গ্রন্থ বের করেন, তখন তাই ওই অংশগুলো বর্জিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ছিলেন খুবই স্নেহশীলা নারী। নজরুলের মধ্যে মাতৃস্নেহ পাবার আগ্রহ ছিল। কারণ নিজের মায়ের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক ভালো ছিল না। নজরুল বাসন্তী দেবীকে মা বলে ডাকতেন।

প্র : 'মরু-ভাস্কর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : হযরত মোহাম্মদের জীবনী-কাব্য। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ থেকে কবিটি রচিত হয়। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে (১৯৫০) গ্রন্থকারে মুদ্রণ হয়। একাধিক চারটি সর্গ। ১৮টি খণ্ড কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। মোহাম্মদের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, বিয়ে ইত্যাদি এখানে কবিতায় বর্ণিত।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসগুলোর নাম উল্লেখ কর।

উ : 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭), 'মৃত্যু-ক্ষুধা' (১৯৩০) ও 'কুহেলিকা' (১৯৩১)।

প্র : 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : নজরুল ইসলাম রচিত প্রথম উপন্যাস। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (১৯২১) 'মোসলেম ভারতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত এই উপন্যাসের বেশ কিছু অংশ গ্রন্থকারে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। বর্তমান গ্রন্থের রচয়িতা তা খুঁজে পেয়ে ১৮শে মে, ২০০৬ দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় তা পুনঃপ্রকাশ করেন। 'বাঁধন-হারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস। নুরুর সঙ্গে মাহবুবার প্রণয় এবং পরে বিয়ের উদ্যোগ অনেক দূর এগিয়ে গেলেও হঠাৎ নুরু পালিয়ে গিয়ে সৈনিক জীবন গ্রহণ করে। সৈনিক জীবন গ্রহণের পেছনে দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালীন কোন তাগিদ ছিল না। এ প্রসঙ্গে নার্গিসের সঙ্গে কবির প্রণয় ও আকস্ (মতান্তর আছে) প্রসঙ্গ মনে আসে। অনেকে মনে করেন নুরুই নজরুল। এ উপন্যাসে রাবেয়া, মাহবুবা, সাহসিকা প্রমুখ নারী চরিত্রের উল্লেখ ও তাদের পত্র বিনিময় আছে। সাহসিকা যথেষ্ট প্রতিবাদী; চিরকুমারী থেকে যে নারীদের উপর পতিত নানা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

প্র : 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'মৃত্যু-ক্ষুধা' ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৯৩১) মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। 'সওগাত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রণ হয় ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৩৬

2020/5/12, 21:25

বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পর্যন্ত। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সপরিবার মেজ-বৌয়ের মুসলিম থেকে খ্রিষ্ট ধর্মান্তর গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অন্যদিকে কবি আনসারকে ভালোবাসলেও কবির পিতা তাকে বিয়ে দেয় আইসিএস পরীক্ষার্থী মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। মোয়াজ্জেমের মৃত্যুর পর বিধবা কবির জীবনে নেমে আসে সমাজের বিধিনিষেধ। নারীজীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।

প্র : 'কুহেলিকা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'নওরোজ' পত্রিকায় 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)। এ উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে অত্যন্ত বড় ক্যানভাসে। উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী স্বদেশি দলের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু তার যে প্রেমের সম্পর্ক ও নারী সম্পর্কে ধারণা তা যথেষ্ট ঋণাত্মক। জাহাঙ্গীর বলে : 'নারী কুহেলিকা'। তাহমিনা (ভূণী), চম্পা, ফিরদৌস বেগম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। নারী সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে : 'ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু।'

প্র : 'যুগবাণী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : প্রবন্ধের গ্রন্থ 'যুগবাণী' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধের বই। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (২৩শে নভেম্বর, ১৯২২) সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়। নবযুগ, ধর্মঘট, সত্য-শিক্ষা, ভাব ও কাজ, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশি চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত।

প্র : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূলবক্তব্য কী?

উ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত একটি প্রবন্ধ। কাজী নজরুল সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' পত্রিকা ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। সেই পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'ও নিষিদ্ধ হয়। নজরুলকে জেলে আটক করে রাখার পর তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি লিখিতভাবে আদালতে উপস্থাপন করেন চার পৃষ্ঠার বক্তব্য। তাই এটি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে পরিচিত। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বসে তিনি এই চার পৃষ্ঠার জবানবন্দি রচনা করেন। পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যেমন, 'ধূমকেতু', 'প্রবর্তক', 'উপাসনা' ইত্যাদিতে ১৯২৩ সালেই তা প্রকাশিত হয়। ২৩শে নবেম্বর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হয়। ৭ই জানুয়ারি, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে বিচারাধীন বন্দি হিসেবে নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেন। এই জবানবন্দি, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে সাহিত্য-মর্যাদা পায়। ১৬ জানুয়ারি, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে, বিচারের রায়ে নজরুল এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম, শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যের তুলনায় এটি উৎকৃষ্টতর। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র শুরুতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চকণ্ঠে বলেছেন, 'আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একাধারে-রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; অন্যজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ বেতনভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে সব রাজার রাজা, সব বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য

ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।' কবির 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' পাঠ করে একথা বলতে হয়, নিশ্চিত শাস্তির ভয়কে তিনি তুচ্ছ করে আত্মশক্তির ঝাণ্ডা তুলে ধরেছেন। শাসকদের উপেক্ষা করে লেখকের স্ববক্তব্যে একনিষ্ঠতা এখানে প্রকাশিত। সত্য, শিব, সুন্দরের যে বাণী পরবর্তীকালে নজরুলের রচনায় দেখা গেছে তার সূত্রপাত এই রচনাতে আছে।

প্র : 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : তিনটি ছোট নাটকের গ্রন্থ 'ঝিলিমিলি'। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের (১৯৩০) অগ্রহায়ণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী নামের তিনটি ছোট নাটক এ গ্রন্থভুক্ত।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ গুলোর নাম কর।

উ : 'ব্যথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫), 'শিউলিমালা' (১৯৩১)।

প্র : 'ব্যথার দান' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ছয়টি গল্প নিয়ে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। এটি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ; প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ তো বটেই। গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলো : ব্যথার দান, হেনা, অতৃপ্ত কামনা, বাদল-বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি। শেষ গল্পটি বাদে এই গল্পগুলোর ভাষা আবেগাশ্রয়ী, বক্তব্য নরনারীর প্রেমকেন্দ্রিক।

প্র : 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয় নজরুলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'রিক্তের বেদন'। অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো : রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার, সাঁজের তারা, রাক্ষুসী, সালেক, শামীহারা, দুরন্ত পথিক। প্রতিটি গল্পই সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পগুলোর প্রধান বিষয় প্রেম। তবে প্রেমকে কেন্দ্র করে পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও মনোবেদনাসমূহও উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে নারীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

প্র : 'শিউলিমালা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থ। পর-পোষ্যেরা, জিনের বাদশা, অগ্নি-গিরি, শিউলিমালা গল্পের সমন্বয়ে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের কার্তিকে (১৯৩১)।

প্র : সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলির উল্লেখ কর।

উ : চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, সুর সাকী, বনগীতি প্রভৃতি।

প্র : নজরুল ছায়াছবির সঙ্গে কবে থেকে যুক্ত হন?

উ : ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে পাইওনিয়ার ফিল্ম কোম্পানিতে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের সূচনা পর্যন্ত এ সংশ্লিষ্টতা ছিল।

প্র : তিনি কয়টি ছায়াছবির সঙ্গে কাজ করেছেন?

উ : যতটুকু জানা যায়, দশের অধিক। এগুলো হচ্ছে : বাংলা : ধ্রুব, পাতালপুরী, গ্রহের ফের, বিদ্যাপতি, গোরা, সাপুড়ে, চৌরঙ্গী, দিকশূল, অভিনয় নয়; হিন্দি : বিদ্যাপতি, সাপেড়া, চৌরঙ্গী ইত্যাদি।

প্র : 'ধ্রুব' ছায়াছবির সঙ্গে নজরুল জড়িত কিভাবে?

উ : নজরুল 'ধ্রুব' ছায়াছবির পরিচালকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও গান রচনা, সুরারোপ, সঙ্গীত পরিচালনা করেন। তাছাড়া তিনি এ ছায়াছবিতে নারদের ভূমিকায় অভিনয় ও চারটি গানে অংশ নেন। এ ছায়াছবির কাহিনি রচনা করেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পাইনিওর ফিল্মের ব্যানারে ছবিটি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলকাতার ক্রাউন টকি হাউজে (সিনেমা হলে) মুক্তি পায়।

প্র : কোন চলচ্চিত্রে নজরুল অভিনয় করেন?

উ : ধ্রুব। নারদের ভূমিকায়।

প্র : তিনি কোন চলচ্চিত্রে কিভাবে জড়িত ছিলেন? কয়েকটি তথ্য দাও।

উ : 'ধ্রুব' চলচ্চিত্র (মুক্তি : ১৯৩৪) :

5/12 21:25

পরিচালক
গীতিকার (১৭টি গান)
সুরকার (১৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক
অভিনেতা (নারদ চরিত্রে)
কণ্ঠশিল্পী
'পাতালপুরী' (মুক্তি : ১৯৩৫) :
গীতিকার (৭টি গান)
সুরকার (৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক
'গ্রহের ফের' (মুক্তি : ১৯৩৭) :
সঙ্গীত পরিচালক
সুরকার (৬টি গান)
বিদ্যাপতি (বাংলা : মুক্তি : ১৯৩৮) :
কাহিনি রচনা
সুরকার
গীতিকার (৫টি গান)
বিদ্যাপতি (হিন্দি : মুক্তি : ১৯৩৮) :
কাহিনি রচনা
সুরকার
গোরা (মুক্তি : ১৯৩৮) :
সঙ্গীত পরিচালক
গীত রচনা (১টি গান)
সুরারোপ (১টি গান)
সাপুড়ে (মুক্তি : ১৯৩৯) :
কাহিনি রচনা
গীত রচনা (৭টি গান)
সুরারোপ (৭টি গান)
নন্দিনী (মুক্তি : ১৯৪১) :
গীত রচনা (১টি গান)
সুর রচনা (১টি গান)
চৌরঙ্গী (মুক্তি : ১৯৪২) :
গীত রচনা (৮টি গান)
সুরকার (৮টি গান)
সঙ্গীত পরিচালক

প্র : নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম 'দৈনিক নবযুগ', পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১২ই জুলাই ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে। পত্রিকাটি বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। পরে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হলে নজরুল এককভাবে এর সম্পাদক হন।

প্র : কাজী নজরুল ইসলামের ওপর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত- 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' (১৩৭৬, কলকাতা); আজাহার ইসলাম খান- 'বাংলাসাহিত্যে নজরুল' (১৯৬৯, কলকাতা); প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়- 'কাজী নজরুল' (১৯৭৩); মুজফ্ফর আহমদ- 'কাজী নজরুল ইসলাম' (১৯৬৫); রফিকুল ইসলাম- 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য' (১৯৯১, কলকাতা); শিশির কর- 'বিদ্রোহী নজরুল' (১৯৮৩, কলকাতা); সুফী জুলফিকার হায়দার- 'নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়' (১৯৬৪, ঢাকা); সুশীলকুমার গুপ্ত- 'নজরুল চরিতমানস' (১৩৭০, কলকাতা), গোলাম মুরশিদ- 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' (২০১৮, ঢাকা)।

প্র : কার আগ্রহে নজরুল 'লিচুচোর' কবিতা লেখেন?

উ : কুমিল্লার পুস্তক প্রকাশক ও ব্যবসায়ী আলী আকবর খানের আগ্রহে।

প্র : আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুল কবে বাংলাদেশে আসেন?

উ : ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল কুমিল্লায় আসেন আলী আকবর খানের সঙ্গে। এটি তাঁর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আসা। এর আগে তিনি শৈশবে ত্রিশালে এসেছিলেন।

প্র : সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে আলী আকবর খানের সম্পর্ক কী?

উ : আলী আকবর খানের বড় বোনের মেয়ে ছিলেন সৈয়দা খাতুন। অর্থাৎ মামা। সৈয়দা খাতুনের পিতা মুন্সী আবদুল খালেক।

প্র : সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের প্রণয় হয় কিভাবে?

উ : নজরুল যখন আলী আকবর খানের দৌলতপুরের বাড়িতে অতিথি, সেসময় সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের প্রণয়ভাব গড়ে ওঠে। দৌলতপুরে রচিত নজরুলের 'হারমানা হার' বা 'মানস-বধূ' কবিতায় এই প্রণয়ভাব প্রকাশিত। নজরুল লিখেছেন : 'মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায়। / নামহারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোয়ায়।'

প্র : নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ের তারিখ কি নির্ধারিত হয়েছিল?

উ : হয়েছিল। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৩রা আষাঢ় শুক্রবার ছিল বিয়ের তারিখ।

প্র : নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ হয়েছিল?

উ : হয়েছিল। কলকাতার লেখক আবদুল আজিজ আল আমান তাঁর 'নজরুল পরিক্রমা' (১৩৭৬) গ্রন্থে সেই আমন্ত্রণপত্রের বয়ান উল্লেখ করেছেন। রফিকুল ইসলামও তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে সেই বয়ান মুদ্রণ করেছেন। ত্রিপুরা জেলার দৌলতপুর (এখন কুমিল্লা জেলা) থেকে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে জ্যৈষ্ঠ আলী আকবর খানের নামে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হয়েছিল।

প্র : নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল কী?

উ : এনিয়ে এখনো পরিপূর্ণ গবেষণা হয় নি। নজরুলের সহচর ও ভক্তগণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিয়ের মজলিশ থেকে উঠে নজরুল পায়ে হেঁটে দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় চলে যান। বিয়ের সময় বরের পক্ষে একা এ কাজ করা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য এ প্রশ্নটি থেকে যায়। অন্যদিকে গবেষকদের একপক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, নজরুল ও সৈয়দা খাতুনের 'আক্দ' হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সেই মিলনমেলায় যবনিকা পতন ঘটে। তবে নজরুল যে তাকে একসময় ভালোবাসতেন এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। তাই ইরানি ফুল নার্গিসের নামে তিনি প্রিয়ার নামকরণ করেন। নার্গিসেরই প্রকৃতনাম সৈয়দা খাতুন।

প্র : সৈয়দা খাতুনের বিয়ে পরে কার সঙ্গে হয়?

উ : ১৯৩৭ সালে কবি আজীজুল হাকিমের সঙ্গে সৈয়দা খাতুনের বিয়ে হয়। সৈয়দা খাতুন শিক্ষিতা ছিলেন, তিনি 'তহমিনা' নামে একটি উপন্যাস লেখেন।

প্র : নজরুলকে বিদ্রোহী কবি আখ্যার কারণ কী?

উ : নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এক প্রবল প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় যা তৎকালীন কবিসমাজে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধের বলু, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবি নজরুলের কাব্য থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 'অগ্নি-বীণা', 'সর্বহারা', 'প্রলয়শিখা', 'জিঞ্জিরা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে নজরুলের স্বাদেশিকতা সাম্যবান ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বিধাতার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। এজন্যই তাঁকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিদ্রোহী কবি বলা হয়ে থাকে। অবশ্য নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতাটিও প্রথমদিকে ভূমিকা রেখেছে। এর আগে তিনি 'হাবিলদার নজরুল' বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী ছিলেন। নামের আগে লিখতেনও 'হাবিলদার'। 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশ হওয়ার পর নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি > বিদ্রোহীর কবি > বিদ্রোহী-কবি বলে পরিচিতিজনরা অভিহিত করেছেন। পরে অবশ্য নজরুল স্বমহিমাতেই আবির্ভূত হন।

প্র : নজরুল ইসলাম প্রথম কবে ঢাকায় আসেন?

উ : ১৯২৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে।

প্র : কার সঙ্গে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন এবং কেন?

উ : অবিভক্ত বঙ্গের স্বদেশি নেতা হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে তিনি প্রথম ঢাকায় এসেছিলেন। এ আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বেড়ানো।

প্র : এ সময় ঢাকায় তিনি কোথায় উঠেছিলেন?

উ : ঢাকার কাছারির নিকটবর্তী মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে নজরুল আতিথ্য গ্রহণ করেন।

প্র : ঢাকায় প্রকাশিত নজরুলের প্রথম লেখা কোনটি?

উ : এ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে বলা মুশকিল। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'অভিযান' নামে একটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় 'অভিযান' নামে একটি কবিতা লেখেন নজরুল। মনে করা হয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এটি তাঁর প্রথম লেখা। পরে কবির 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে কবিতাটি স্থান পায়।

2020/5/12 21:26

প্র : নজরুল দ্বিতীয়বার কবে ঢাকায় আসেন?
উ : ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে।
প্র : এই আগমনের উদ্দেশ্য কী?
উ : রাজনীতি। কবি ঢাকা বিভাগের মুসলিম কেন্দ্র থেকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হন। নির্বাচনের প্রচারের জন্য এ সময় তিনি ঢাকায় আসেন।
প্র : এ সময় তিনি কোথায় উঠেছিলেন?
উ : বেচারাম দেউড়ির জনৈক মো. ইউসুফ খাদেরির বাড়িতে।
প্র : নজরুল মোট কয়বার ঢাকায় আসেন?
উ : ১৩ বার।
প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল কতবার আসেন?
উ : ৫ বার।
প্র : নজরুল কবে এবং কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আগমন করেন?
উ : ১৯২৬ সালের ২৭শে জুন মুসলিম সাহিত্য সমাজের চতুর্থ বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে।
প্র : নজরুল কবে এবং কী কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন করেন?
উ : ১৯২৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। সেবারও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়বারও তিনি আসেন একই কারণে, সাহিত্য সমাজের সম্মেলন উদ্বোধন করতে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
প্র : কবি সুস্থ অবস্থায় কবে সর্বশেষ ঢাকায় আসেন?
উ : ১৯৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর। সেবারও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।
প্র : বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নজরুলকে কলকাতা থেকে ঢাকায় আনয়ন করা হয় কত সালে?
উ : ১৯৭২-এর ২৪শে মে। এরপর থেকে নজরুল বাংলাদেশেই ছিলেন।

প্র : ঢাকায় আনার পর নজরুলকে কোন বাড়িতে স্থান দেয়া হয়?
উ : সাকরাইল নজরুলকে ঢাকায় আনার পর ধানমন্ডির ২৮ নম্বর সড়কের ৩০৩বি নম্বর বাড়িতে স্থান দেয়া হয়। পরে এই বাড়িটি নজরুল ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়।
প্র : কবিকে কবে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়?
উ : ১৯৭২ সালের ২২শে জুলাই ধানমন্ডির বাড়ি থেকে অসুস্থ নজরুলকে পিজি হাসপাতালের (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) ১১৭ নম্বর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত্যুর আগে এক বছর এক মাসাধিককাল তিনি এই কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
প্র : কবির কবিতা 'জয়দেবপুরের পথে' কখন লেখা হয়?
উ : নজরুল নির্বাচনের প্রচারের কাজে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর যাবার সময় জ্যোৎস্না রাতে 'জয়দেবপুরের পথে' নামে একটি কবিতা লেখেন। পরে তিনি এ কবিতাটি পরিমার্জনা করে নাম দেন 'চাঁদনী রাতে'। এটি 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আবদুল কাদির তাঁর 'জয়ন্তী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন।
প্র : তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকার কর্তৃক কোন কোন পদক দেয়া হয়?
উ : যথাক্রমে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫) ও 'পদ্মভূষণ' (১৯৬০) পদক দেয়া হয়।
প্র : ডি-লিট পদক 'রবীন্দ্রভারতী' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে কখন দেয়া হয়?
উ : যথাক্রমে ১৯৬৯ সাল ও ১৯৭৪ সালে।
প্র : কত সালে বাংলাদেশ সরকার কবিকে '২১শে পদক' প্রদান করেন?
উ : বাংলাদেশ সরকার 'একুশে পদক' দেন ১৯৭৬ সালে।
প্র : বিবিসির বাংলা বিভাগ কর্তৃক জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় নজরুলের স্থান কত?
উ : তৃতীয়।
প্র : তাঁর মৃত্যুসাল কত?
উ : ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬; ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

'আমার পথ' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কাজী নজরুল ইসলাম কেন বাহিরের অন্ধে ভীত নন?
উ : তিনি নিজের সত্তাকে চিনে ফেলেছেন বলে।
প্র : মিথ্যা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য কী?
উ : যে মিথ্যাকে চেনে সে মিথ্যাকে ভয় করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে।
প্র : মিথ্যা বিনয় কিসের চেয়ে নিন্দনীয়?
উ : অহংকারের পৌরুষের।
প্র : ব্যক্তি আমি সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস কী?
উ : নিজেকে চিনলে, নিজের সত্তাকে নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে।
প্র : প্রাবন্ধিককে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছেন কে?
উ : মহাত্মা গান্ধী।
প্র : দেশের শত্রু, মিথ্যা, ভণ্ডামী দূর করতে প্রয়োজন–
উ : আত্মের সম্মার্জনা।
প্র : কবি কোনোদিন যে কাজটা করে নি–
উ : না বুঝে বোঝার ভণ্ডামি করে অন্যের শ্রদ্ধা আর প্রশংসা লাভ।

'সাম্যবাদী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
উ : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা। সাম্যবাদী নামক কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
প্র : চার্বাক কে ছিলেন?
উ : একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি। তিনি বেদ, আত্মা, পরলোক ইত্যাদিতে আস্থাশীল ছিলেন না।
প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতায় হিন্দুদের কয়টি ধর্মীয় পবিত্র স্থানের নাম আছে?
উ : চারটি। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া।
প্র : 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত কোন মূর্তি মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নিকট সমভাবে পূণ্যস্থান হিসেবে পরিচিত?
উ : জেরুজালেম। কারণ মোজাসেম।
প্র : বাঁশির কিশোর গরিমায় যহু-বীর– খুলের কিশোর কে?
উ : হিন্দু ধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণ।
প্র : শাক্যমুনি কে ছিলেন?
উ : শাক্যবংশে জন্মগ্রহণকারী গৌতমবুদ্ধ।
প্র : নীলাচল কী?
উ : নীলবর্ণের অচল বা পাহাড়। উড়িষ্যার নীলাচলে জগন্নাথদেব।
প্র : যুগাবতার অর্থ কী?
উ : বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ মহাপুরুষ।
প্র : কোথায় তারা ফুল ফোটে?
উ : পথে তারা ফুল ফোটে।
প্র : মহাবীর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতাবলম্বী অহিংসকে কী বলে?
উ : জৈন বলে।
প্র : পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উ : আবেস্তা।
প্র : সকল কেতাব ও কালের জ্ঞান কোথায় রয়েছে?
উ : মানুষের মাঝে।
প্র : ঈদ কী?
উ : ভারতীয় উপমহাদেশের আনি জাতিবিশেষ।
প্র : যেখানে সব বাধা ব্যবধান এক হয়ে গেছে। কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান কেন?
উ : বিশ্বব্যাপী মানবজাতির একত্বের চেতনা মনে প্রাণে পোষণ করেন বলে যেখানে সব বাধা ব্যবধান এক হয়ে গেছে। কবি সেখানে সাম্যের গান গাইতে চান।
প্র : দেবতা ঠাকুর অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে হাসেন কেন?
উ : মানুষ আপন অন্তরে পরম পুরুষের অবস্থান অনুভব করার চেষ্টা না করে বই পুস্তকের মৃত কঙ্কালে তাঁকে খুঁজে হয়রান হয় বলে দেবতা ঠাকুর অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে হাসেন।

প্র : কোথায় সব ধর্ম ও যুগাবতার আছেন?
উ : মানুষের মধ্যেই।
প্র : দেবতা বা ঠাকুরকে মানুষ কোথায় খোঁজে?
উ : ধর্মপুস্তক বা শাস্ত্রে।
প্র : এই ধরনের অনুসন্ধানের ফলে দেবতা কী করেন?
উ : তিনি হাসেন। কারণ, নজরুল বলছেন– দেবতা রয়েছেন মানুষের অন্তরে অন্য কোথাও নয়।
প্র : মানুষের হৃদয়কে নজরুল কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উ : মসজিদ, মন্দির, গির্জার সঙ্গে।
প্র : 'রাখাল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কী?
উ : রাখাল বলতে গরু বা মেষের পালকদের বোঝালেও আসলে রাখ্ + আল হলো রাখাল। অর্থাৎ যিনি রাখেন বা রক্ষা করেন। সে দিক থেকে ধর্মপুরুষদেরও রাখাল হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

'মানুষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯২৫ সালে।
প্র : 'সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'– 'তিনি' কে?
উ : স্রষ্টা বা ঈশ্বর।
প্র : এই কবিতায় কিছু সংলাপ-পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তার উদাহরণ দাও?
উ : ১. 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন!' ২. 'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!' ৩. 'না বাবা!' ইত্যাদি।
প্র : 'দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়!' – কেন?
উ : পুরোহিত দিবানিদ্রায় ছিলেন। তাঁর মনে দেবতার আশীর্বাদে বিপুল অর্থপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সদাজাগ্রত ছিল। দিবানিদ্রা ও দিবাস্বপ্নে প্রায়শ বাস্তববুদ্ধি তৎক্ষণাৎ কাজ করে না। পুরোহিত তাঁর দ্বারে করাঘাত শুনে তাই মনে করেছে, দেবতা তাঁর গৃহদ্বারে এসেছেন বর দিতে; পুরোহিতগিরি ছেড়ে তিনি কোনো রাজ্যের অধিশ্বর হতে যাচ্ছেন।

প্র : 'তিমিররাত্রি' কী?
উ : তিমির অর্থ অন্ধকার। কিন্তু তিমিররাত্রি অর্থ কৃষ্ণপক্ষের রাত।
প্র : ফুকারি কী?
উ : ফুকার হিন্দি শব্দ, এর অর্থ চিৎকার, ফুকারি অর্থে চিৎকার করে।
প্র : ফুকারি শব্দে নজরুল একটি ঊর্ধ্ব কমা (ফুকারি') ব্যবহার করেছেন, কেন?
উ : আসলে নজরুল বুঝিয়েছেন ফুকারিয়া অর্থাৎ 'চিৎকার করিয়া'। ফুকারিয়া-এর য় তুলে দেবার জন্য লোপচিহ্ন হিসেবে তিনি ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করেছেন। তাই শব্দটি হয়েছে ফুকারি'। আধুনিক বানানে ফুকারি লিখলে ভুল নয়।
প্র : আজারির চিন কী?
উ : রুগ্‌ণ বা ব্যথিতের চিহ্ন। চিহ্ন থেকে ধ্বনিলোপের মাধ্যমে 'চিন' হয়েছে।
প্র : 'ভ্যালা হলো দেখি লেঠা' মানে কী?
উ : বিদ্রূপাত্মক বাক্য। 'ভালো' শব্দের বিকৃত ও বিদ্রূপাত্মক রূপ ভ্যালা। 'লেঠা' একটি মারাঠি শব্দ (এর মূল লঢ়া), যার অর্থ উৎপাত বা ঝামেলা।
প্র : 'তব' কী?
উ : আধুনিক বাংলায় 'তোমার'। বিশে শতাব্দীর প্রথম দিকেও কাব্যভাষা হিসেবে 'তোমার' অর্থে 'তব', 'আমার' অর্থে 'মম' ইত্যাদি প্রচলিত ছিল।
প্র : 'সব দ্বার এর খোলা রবে' বলে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : স্রষ্টার ভজনালয় মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে না। এখানে সব শ্রেণির মানুষের সর্বরকমের অধিকার নিশ্চিত ও সমানভাবে থাকবে। ধনীরা কেবল এর সব কিছুর অধিকারী হবে, গরিবেরা থাকবে সব থেকে পেছনে– এমন যেন না হয়।

'ভাব ও কাজ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক কে?
উ : কাজী নজরুল ইসলাম।
প্র : কাজের পূর্ব পরিকল্পনা কী?
উ : ভাব।

প্র : ভাব কে রূপ দেয়ার উপায় কী?
উ : কাজ।
প্র : 'পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো'– এটি কী?
উ : এটি একটি উপমা। ভাষাকে সুন্দর করে বোঝাবার জন্য উপমা প্রয়োগ করা হয়। ফুল ছাড়া কি প্রকৃত সুগন্ধ হয়? হয় না। এমন ভাবা হলে তা হবে অবাস্তব উচ্ছ্বাস। বাস্তবজগতকে উপলব্ধি করা যায় কিসের মাধ্যমে?
প্র : যথাযথভাবে কাজ করার মাধ্যমে।
উ : ভাব ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক কী?
প্র : একে অপরের পরিপূরক।
উ : 'ভাবপাগলা' দেশ কী?
প্র : যে দেশের মানুষ শুধু কল্পনা করে চলে, কল্পনা করেই থাকে, ভাবতে ভাবতে জীবন যায় কিন্তু কাজ আরম্ভই করে না। নজরুল বাঙালিদের 'ভাবপাগলা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।
প্র : 'কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়'– এটি কী?
উ : এটি একটি উপমা। কর্পূর যেমন অল্পক্ষণেই বাতাসে মিশে 'নেই' হয়ে যায়, তেমনি।
প্র : কাজ সঠিক হওয়ার পূর্বশর্ত কী?
উ : কাজের আগে সঠিকভাবে ভেবে নেওয়া।
প্র : প্রত্যেকটি মানুষকে কেন ভাবা প্রয়োজন?
উ : মানুষের কল্যাণের জন্য।
প্র : ভাবের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?
উ : অন্যের কল্যাণ কামনা করা।
প্র : ভাবের দ্বারা মানুষের কী কী জাগিয়ে তোলে?
উ : যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও কাজের স্পৃহা।
প্র : 'কাঁসি' কী?
উ : ধাতব পদার্থ 'কাঁসা' দিয়ে নির্মিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র, যা হিন্দুদের পূজাতে বাজানো হয়।
প্র : আমাদের দেশের আশা ভরসার স্থল কারা?
উ : যুবকগণ।
প্র : ভাব কিসের জন্য হওয়া উচিত নয়?
উ : একটা সাময়িক সময়ের জন্য।
প্র : স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভাব কেমন হওয়া উচিত?
উ : দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।

প্র : ভালো কাজ করার পূর্বশর্ত কী?
উ : প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা।
প্র : কখন ধর্ম, দেশ, মনুষ্যত্বের পতন ঘটনে?
উ : অতি ভাবের কারণে সঠিকভাবে কাজ না করলে।
প্র : কখন দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে?
উ : যখন ব্যক্তির 'স্পিরিট' উদ্দীপনা, উৎসাহ, শক্তি জাগিয়ে কাজে প্রয়োগ করা যাবে।
প্র : কাজের আগে সঠিক পরিকল্পনা না করলে কাজের অবস্থা কেমন হবে?
উ : উদ্‌মো ষাঁড়ের মতো অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত ষাঁড় যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে যায়। কাজের অবস্থা তেমনি হবে।
প্র : 'এই কর্মীর কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে'– এখানে 'পুয়ালচাপা' কী?
উ : শব্দটি আসলে 'পোয়ালচাপা'। 'পলাল' শব্দ থেকে 'পোয়াল' শব্দ জাত, যার অর্থ আবাঁধা খড়। 'পল+আল' পলাল। নজরুল পোয়ালচাপাকে পুয়ালচাপা লিখেছেন, বুঝিয়েছেন– গ্রামে যেমন আলগা খড়ের স্তূপ বা পালা দেখা যায়, সেটা।
প্র : 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের মাধ্যমে লেখক কোন ইঙ্গিত করেছেন?
উ : দেশের উন্নতি ও মুক্তি এবং মানুষের কল্যাণের জন্য ভাবের সঙ্গে বাস্তব কাজের মিল হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন।
প্র : হুজুগে কারা?
উ : যারা নিজ স্বার্থের জন্য সর্বদা চিন্তা করে।
প্র : 'দশচক্রে ভগবান ভূত' অর্থ কী?
উ : এটি একটি প্রবাদ। এর পেছনের গল্পটি এমন: ভগবান নামের একজন সৎলোক রাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছিল। স্বার্থবাদীরা একদিন প্রচার করে দিলো যে, ভগবানের মৃত্যু হয়েছে। তারা ভগবানকে আর রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দিলো না। রাজা পরিচিতদের এই প্রচার বিশ্বাস করলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের ফটকে একদিন রাজা ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনতে পান। সন্দিগ্ধ হয়ে রাজা এর কারণ জানতে চাইলে, সবাই একস্বরে বলে, সেটা ভগবানের কণ্ঠ নয়, মৃত ভগবান ভূত হয়ে এসেছে। পারিষদবর্গের এই ব্যাখ্যার পর রাজা সেটা

বিশ্বাস করেন। সবাই মিলে যে সত্যকে মিথ্যে করে প্রচার করতে পারে– এই প্রবাদ সে কথাই বলে।

প্র : ভেড়ার মতো পেছন ধরে চলা– বাগধারায় কী বলে?

উ : গড্ডলিকা প্রবাহ।

প্র : 'ভাবের ঘরে চুরি করিও না' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : 'অতি ভাব' গ্রহণ করে প্রকৃত কার্য থেকে পিছিয়ে না-পড়ার পরামর্শ। আমাদের দেশের নবীনসমাজ অতি ভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে এমন কর্ম করে যা প্রকৃত কাজের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। এই অতি আবেগ বা অতি ভাবকেই 'ভাবের ঘরে চুরি' বলা হয়েছে।

'নারী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'নারী' কবিতাটি নজরুল ইসলামের কোন পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত?

উ : 'সাম্যবাদী'।

প্র : 'সাম্যবাদী' কত খ্রিষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে, কলকাতা থেকে।

প্র : 'সাম্যবাদী' পরে কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়?

উ : 'সর্বহারা' (১৯২৬)।

প্র : 'সাম্য' কী?

উ : সমতা।

প্র : নজরুল 'সাম্য' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উ : নজরুল সাম্য বলতে 'সাম্যবাদ'কে বুঝিয়েছেন।

প্র : 'সাম্যবাদ' কী?

উ : জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস সাম্যবাদের তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: পৃথিবীতে ধনীরা গরিবদের শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে। তারা নারী, পুরুষের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টি করে। সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে সবাইকে সুখে রাখার তত্ত্বই সাম্যবাদ।

প্র : 'অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।'– কী?

উ : পৃথিবীর সব সুন্দর কিছু এবং পৃথিবীর পাপ-দুঃখ ইত্যাদিও।

প্র : এই চরণ দিয়ে নজরুল কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

উ : নজরুল বোঝাতে চাচ্ছেন, নারী-পুরুষ মিলে এই পৃথিবীর সুন্দর কাজটুকুই সম্পন্ন করে নি, পাপ-তাপ, দুঃখ-বেদনাও নারী-পুরুষ মিলেই এনেছে। তাই এই পৃথিবীর সুন্দর ও অসুন্দরের কৃতিত্ব ও দায় দুটোই নারী-পুরুষের, একা কারো নয়।

প্র : 'জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান / মাতা ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।'– কিভাবে?

উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই নারীদের সম্মুখ যুদ্ধে যাবার ইতিহাস আছে, তাদের সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, তারা মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাইয়েছে ইত্যাদি।

প্র : 'খুন' অর্থ কী?

উ : রক্ত (পারসি বা ফার্সি শব্দ)।

প্র : 'কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে, / কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।'– এই বক্তব্য দিয়ে নজরুল কী বুঝিয়েছেন?

উ : ইতিহাস যেহেতু পুরুষের রচনা সেহেতু ইতিহাস রচনায় পুরুষ কার্পণ্য করেছে। নারীকে অবজ্ঞার চোখে দেখে তারা নিজেদের পাশে সমান মর্যাদায় নারীদের স্থান দেয় নি। যুদ্ধে একজন পুরুষের আত্মত্যাগের পেছনে একজন নারীরও যে সহায়-সম্বল ও আশ্রয় হারার ব্যাপারটি জড়িত– পুরুষ ইতিহাসকারগণ সে কথা মনে রাখেন নি।

প্র : নজরুলের এই বক্তব্যের সত্যতা এ যুগের নিরিখে দেখাও।

উ : মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক উপাধিপ্রাপ্ত হলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের কথা ইতিহাসে দীর্ঘ দিন অলিখিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রায় তিন দশক পরে ময়মনসিংহের বিমলচন্দ্র দে তারামন বিবির অনুসন্ধান করে এই বীর-মুক্তিযোদ্ধাকে লোকসম্মুখে নিয়ে আসেন।

তারামন বিবির মতো অনেক নারীমুক্তিযোদ্ধার সংবাদ এ জাতি এখন আর স্মরণে রাখে না, এ কথা সত্য। অন্য দিকে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার ভাতার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যে মুক্তিযোদ্ধারা রণাঙ্গনে শহিদ হয়েছেন, তাঁদের অসহায় পরিবারের জন্য সরকারের সত্যি কি তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ে? তাদের বিধবা স্ত্রীদের জন্য কী সাহায্য প্রদান করেছে সরকার?

প্র : 'বিজয়-লক্ষ্মী' কী?

উ : বিজয়ের অনুপ্রেরণাদাতৃ লক্ষ্মী।

প্র : 'সে-যুগ হয়েছে বাসি,'– বলে নজরুল কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : নতুন যুগ সমাগত। পুরোনো ধ্যান-ধারণা ফেলে নতুনকে বরণ করতে হবে– এ যুগে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা থাকবে।

প্র : নতুন এই যুগকে নজরুল কী বলে অভিহিত করেছেন?

উ : বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ।

প্র : 'ডঙ্কা' কী

উ : জয়ঢাক।

প্র : 'কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি।'– এই চরণে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না অর্থাৎ সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে– এই বার্তা আজ চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে।

প্র : 'পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।' –এই বক্তব্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কারো অধিকার খর্ব করলে বা কাউকে শোষণ করলে ভবিষ্যতে নিজের একই রকমের অধিকার হারাবার বা শোষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্র : 'পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।'– এই চরণটি তোমার জানা অন্য দুটো বাক্যে প্রকাশ কর।

উ : 'যারে তুমি পিছে ফেল, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' 'ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

কাজী মোতাহার হোসেন

প্র : কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম কত সালে?

উ : ৩০শে জুলাই, ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মাতুলালয়, লক্ষ্মীপুর গ্রাম, কুমারখালি, কুষ্টিয়া।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী।

প্র : কত সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষকতার পদ লাভ করেন?

উ : ১৯২৩ সালে।

প্র : কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের অন্যতম কীর্তি কোনটি?

উ : ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার মুখপত্র হিসেবে কাজ করেন?

উ : 'শিখা' (১৯২৭)।

প্র : তাঁর প্রথম ও বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?

উ : 'সঞ্চয়ন' (১৯৩৭)।

প্র : প্রবন্ধ সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?

উ : ১৯৬৬ সালে।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানজনক 'ডক্টরেট' উপাধি ও 'জাতীয় অধ্যাপক' মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার সাল লেখ।

উ : যথাক্রমে ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?

উ : ৯ই অক্টোবর, ১৯৮১।

কামরুল হাসান

প্র : কামরুল হাসান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২১ সালের ২রা ডিসেম্বর কলকাতার তিনজিলা গোরস্থান রোডে।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার নারেঙ্গা গ্রামে।

প্র : তিনি কোথা থেকে গ্রাজুয়েট হন? কত সালে?

উ : ১৯৪৭ সালে কলকাতা চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে তিনি চিত্রকলা বিষয়ে গ্রাজুয়েট হন।

2020/5/12 21:26

প্র : কখন তিনি স্থায়ীভাবে এদেশে চলে আসেন?
উ : ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে কলকাতা ত্যাগ করে তিনি ঢাকায় আগমন করেন?
প্র : শিল্পাচার্য জয়নুল 'বেদিনের সঙ্গে তিনি কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন?
উ : ঢাকা আর্ট স্কুল। পরে এটা 'চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট' নাম পায়।
প্র : কর্মজীবনে তিনি কোথায় ছিলেন?
উ : ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিসিক-এর প্রধান আর্টিস্ট হিসেবে অবসর গ্রহণ।
প্র : মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ কীভাবে?
উ : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের শিল্পবিভাগের প্রধান পদে দায়িত্ব পালন। তাঁর অঙ্কিত ইয়াহিয়া খানের জানোয়ার আকৃতির মুখমণ্ডল এবং নিচে লেখা 'এই জানোয়ারকে হত্যা করুন' খুবই প্রশংসিত হয়।
প্র : তাঁর কোন স্কেচটি স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে?
উ : জাতীয় কবিতা পরিষদের মণ্ডপে বসে আঁকা 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে'।
প্র : কামরুল হাসান কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি; ঢাকা।

'আমাদের লোকশিল্প' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মসলিন' কোন ভাষার শব্দ?
উ : ফার্সি (পারসি) ভাষার।
প্র : 'মসলিন' কোন ভাষার শব্দ থেকে জাত?
উ : আরবি মরসিলি থেকে ফার্সি মসলিন জাত।
প্র : মসলিন কী?
উ : অতি কোমল ও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রবিশেষ।
প্র : মসলিন কাপড়ের সঙ্গে কোথাকার বস্ত্রের সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়?
উ : সম্ভবত প্রাচীন ব্যাবিলনের মসৌলে নির্মিত সূক্ষ্ম মসৃণ বস্ত্রসদৃশ ঢাকায় তৈরি হয় মসলিন বস্ত্র।
প্র : 'জামদানি' কোন ভাষার শব্দ?
উ : আরবি।
প্র : জামদানি কী?
উ : হাতে বুনে তাঁতের ফুলতোলা মিহি কাপড়বিশেষ।
প্র : শহরতলি অর্থ কী?
উ : শহরের উপকণ্ঠ।
প্র : শহর কোন শব্দ?
উ : ফার্সি।
প্র : ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর : সূক্ষ্ম, শিল্প, ঐতিহ্য
উ : সূক্ষ্ম : √সূচ্ + ষ্ম
শিল্প : √শীল্ + প
ঐতিহ্য : ইতিহ + য
প্র : লোকশিল্প অর্থ কী?
উ : লোক বা সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট শিল্প।
প্র : কোনটি মোগল বাদশাহদের বিলাসের বস্তু ছিল?
উ : ঢাকার মসলিন।
প্র : জামদানি শাড়ির জন্য কোনটি প্রয়োজনীয়?
উ : আর্দ্রতা।
প্র : খাদির বৈশিষ্ট্য কী?
উ : এটি হাতে তৈরি।
প্র : কাপড়ের তৈরি পুতুলের বৈশিষ্ট্য কী?
উ : প্রতীকধর্মিতা।
প্র : কামরুল হাসানের ছবিতে কোন বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে?
উ : লোকজ ঐতিহ্য।
প্র : 'আমাদের লোকশিল্প' কোন শ্রেণির রচনা?
উ : প্রবন্ধ।
প্র : খাদ্যশস্যের পরে কোন জিনিসটি এদেশের মানুষের জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে?
উ : কুটির শিল্প।
প্র : মসলিন তাঁতিরা ঢাকার অদূরে কোথায় বাস করত?
উ : ডেমরা।
প্র : মসলিন কাপড় বুনবার জন্য কারিগরি দক্ষতা ছাড়াও কোন জিনিসটি থাকা প্রয়োজন?
উ : শিল্পীমন।
প্র : মসলিন শব্দের অর্থ কী?
উ : অতি মিহি ও মসৃণ।

প্র : মসলিন কারিগরের বংশধররা আছে বলে আমরা কী শাড়ি পাচ্ছি?
উ : জামদানি।
প্র : কোন মৌসুমে সাধারণত নকশিকাঁথা সেলাই করা হত?
উ : বর্ষাকালে।
প্র : তাঁতশিল্প বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় বেশি আছে?
উ : ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা।
প্র : কোন নদীর তীরে জামদানি শাড়ির তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে?
উ : শীতলক্ষ্যা।
প্র : গ্রামবাসী যারা সুতা কাটে তাদেরকে কী বলা হয়?
উ : কাটুনি।
প্র : খাদি কাপড় কোন আন্দোলন সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে?
উ : স্বদেশি আন্দোলন।
প্র : সিলেটের কোন অঞ্চলের পরিবারের মেয়েরা নিজেদের পরিধেয় কাপড় নিজেরা তৈরি করে?
উ : মাছিমপুর অঞ্চল।
প্র : বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কিসের বাসন পত্র এককালে বেশ প্রিয় ছিল?
উ : কাঁসা পিতলের।
প্র : কাঁসা কী?
উ : রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতু।
প্র : আজকালকার অতি আধুনিক গৃহসজ্জার সামগ্রী হিসাবে কোনটি ব্যবহার হতে দেখা যায়?
উ : ফুলদানি।
প্র : 'ঐতিহ্য' শব্দটির অর্থ কী?
উ : অতীত গৌরবের বস্তু।
প্র : কোনগুলো তৈরির জন্য বাংলাদেশের পালপাড়া ও কুমারপাড়ার অদিবাসীরা সারা বছর ব্যস্ত থাকে?
উ : হাঁড়ি-পাতিল।
প্র : গ্রাম্য কারিগররা বদনা, বাটি, গ্লাস, থালা ইত্যাদি কিভাবে তৈরি করেন?
উ : মাটির ছাঁচে।
প্র : পুরাকালের মসজিদ মন্দিরের গায়ে যেসব নকশাদার ইট দেখা যায় তা কিসের নিদর্শন?
উ : লোকশিল্পের।
প্র : কাঠের খাট, পালংক, খুঁটি, সরজার নকশা আঁকাকে কী বলা হত?
উ : হাসিয়া।
প্র : কোন জেলায় কাঠের নৌকার কাজ সবচেয়ে ভালো ছিল?
উ : বরিশাল।
প্র : কোন জেলার শীতল পাটি বিখ্যাত?
উ : সিলেট।
প্র : কোন জেলার মাদুর বিখ্যাত?
উ : খুলনা।
প্র : কোন এলাকার নবাব হাতির দাঁতের শীতল পাটি তৈরি করেছিলেন?
উ : ঢাকা।
প্র : আমাদের দেশের মেয়েদের সহজাত শিল্পগুণ কোনটি?
উ : কাপড়ের পুতুল তৈরি করা।
প্র : আমাদের লোকশিল্প বিদেশিদের হৃদয়ে কিভাবে সাড়া জাগাতে পারে?
উ : লোকশিল্পে আমাদের হৃদয়-মনের প্রকাশ ঘটলে।
প্র : খাদি তৈরির সুতা সাধারণত কিভাবে জোগাড় করা হয়?
উ : বাড়ির পাশে তুলার গাছ লাগিয়ে।
প্র : সোলা শিল্পের উৎকৃষ্ট সৃজনশীল নমুনা কোন জিনিসে পাওয়া যায়?
উ : পুতুল, টোপর ইত্যাদি।
প্র : কয়েকশ গজ মসলিন কাপড় কিসের মধ্যে রাখা যেত?
উ : আংটির ভিতরে।
প্র : হাতির দাঁতের শীতল পাটি কোথায় সংরক্ষিত আছে?
উ : ঢাকার জাদুঘরে।

প্র : হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি মূর্তি তৈরি করে কারা?
উ : পাল ও কুমোররা।
প্র : 'প্রকৃতি' শব্দটির বিশেষণ রূপ কোনটি?
উ : প্রাকৃত।
প্র : কুটিরশিল্প অর্থ কী?
উ : সাধারণ মানুষের গৃহে তৈরি শিল্প। কুটির অর্থ কুঁড়েঘর। যে শিল্প গ্রামবাংলার কুঁড়েঘর বা সাধারণ মানুষের গৃহে প্রস্তুত তাকেই কুটিরশিল্প বলে। ইংরেজিতে বলে: Cottage Industry.

কামিনী রায়

প্র : কামিনী রায়ের জন্ম কত সালে?
উ : ১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪।
প্র : তাঁর জন্ম হয় কোথায়?
উ : বাসন্তা, বরিশাল।
প্র : তাঁর পিতা কে?
উ : ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন।
প্র : তাঁর শিক্ষা জীবনের বিবরণ দাও।
উ : তিনি ১৮৮৬-তে কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাস করেন।
প্র : কামিনী রায়ের পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা (বেথুন কলেজ)।
প্র : কামিনী রায়ের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), নির্মাল্য' (১৮৯১), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭), 'গুঞ্জন' (১৯০৫), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), অশোক সংগীত (সনেট সংগ্রহ, ১৯১৪), অম্বা (নাট্যকাব্য, ১৯১৫), দীপ ও ধূপ (১৯২৯), জীবনপথে (১৯৩০)।
প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী' পদক পান কত সালে?
উ : ১৯২৯ সালে।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

'পাছে লোকে কিছু বলে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পাছে লোকে কিছু বলে'– এখানে 'পাছে' শব্দটির ব্যবহৃত সম্পর্কে লেখ।
উ : এটি একটি শ্লেষ অলঙ্কার। কবি কামিনী রায় 'পাছে' বলতে 'পেছনে' এবং 'পাছে' এই দুই অর্থে বুঝিয়েছেন।
প্র : এই ধরনের শ্লেষ অলঙ্কারকে কী বলে?
উ : অভঙ্গ শ্লেষ।
প্র : 'আপনা' কী?
উ : নিজেকে নিজে।
প্র : 'নিরমল' কী?
উ : নির্মল অর্থাৎ পবিত্র। কবিতার ছন্দের প্রয়োজনে কবি এভাবে শব্দকে হ্রস্ব বা দীর্ঘ করে নিতে পারেন।
প্র : 'একটি স্নেহের কথা / প্রশমিতে পারে ব্যথা'– কবি কী বলেছেন?
উ : মানুষের সামান্য স্নেহপূর্ণ কথা বা আদর অনেকের মন থেকে কষ্ট লাঘব করতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ সে কথাটুকুও বলতে চান না, উপেক্ষা করে চলে যান। তার ধারণা, এতে অন্যরা তাকে কিছু বলতে পারে।
প্র : 'যবে' কী?
উ : যখন।
প্র : 'কোনো কোনো মানুষ আর কখন একত্রে মিলতে পারেন না'?
উ : মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যখন মানুষ কিছু করার জন্য একত্রিত হয়, তখনও সে মিলতে পারে না।
প্র : বিধাতা প্রাণ প্রদানের পরও এই ধরনের মানুষগুলো কেমন থাকে?
উ : ম্রিয়মাণ।
প্র : 'ম্রিয়মাণ' অর্থ কী?
উ : মরণাপন্ন বা কাতর।
প্র : 'শক্তি মরে ভীতির কবলে'– বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : মনের শক্তি মিথ্যে ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়।
প্র : 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সঙ্গে একটি বাংলা প্রবাদের হুবহু মিল দেখাও।
উ : 'বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।'

কালিদাস রায়

প্র : কালিদাস রায়ের জন্ম কবে ও কোথায়?
উ : কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ. পাস করার পর কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।
প্র : কোথায় চাকুরজীবন শুরু করেন?
উ : আজকের বাংলাদেশের রংপুরের উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী বিদ্যালয়ে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে শিক্ষক, পরে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাত বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা জেলার বড়িশা উচ্চবিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং পরে দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে কলকাতার ভবানীপুরের মিত্র ইন্সটিটিউশনে (বিদ্যালয়) সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।
প্র : তিনি কোনধারা কবি হিসেবে পরিচিত?
উ : রবীন্দ্রধারার কবি হিসেবে। তিনি আখ্যানধর্মী বা গল্পের মতো কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।
প্র : কালিদাস রায়ের কাব্যগুণ কেমন?
উ : তাঁর কবিতার ভাষা সহজ-সরল, অনাড়ম্বর কিন্তু হৃদয়গ্রাহী।
প্র : কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : 'কুন্দ' (১৯০৮), 'কিশলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১ম ভাগ: ১৯১৪; ২য় ভাগ: ১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫), 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৪), 'হৈমন্তী' (১৯২৪), 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি আর কী কী বই লেখেন?
উ : প্রবন্ধগ্রন্থ: 'প্রাচীর বঙ্গসাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়'; রম্যসাহিত্যগ্রন্থ: 'চণক সংহিতা', 'ব্যঙ্গচিত্র ও চালচিত্র' ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী উপাধি ও পদক-পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর সাহিত্য পরিষদ 'কবিশেখর' উপাধি প্রদান করে; ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক', ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আনন্দ পুরস্কার', ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। তাছাড়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দেশিকোত্তম উপাধি, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট্' উপাধি প্রদান করে।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতার টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়' (এর অর্থ 'শেষজীবনের পাখির বাসা') নামের স্বগৃহে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

'বাবুরের মহত্ত্ব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতা কে লিখেছেন?
উ : কালিদাস রায়।
প্র : 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতা কালিদাস রায়ের কোন কাব্যগ্রন্থভুক্ত?
উ : 'পর্ণপুট' (২য় ভাগ)
প্র : 'পর্ণপুট' অর্থ কী?
উ : পাতার ঠোঙা বা পাতা দিয়ে বানানো আধার।
প্র : ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কে ছিলেন?
উ : বাবুর।
প্র : কোন বানান শুদ্ধ: 'মুঘল' নাকি 'মুগল'?
উ : দুটো বানানই ঠিক। এমনকি 'মোগল' বা 'মোঘল' এই বানানেও লেখা হয়। আসলে মঙ্গোলিয়া থেকে এসে যারা ভারতের ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল তাদের তুর্কি ভাষায় মোগল বলা হয়েছে। এরই বানানভেদ চলছে। তবে বর্তমানে 'মোগল' বানানই সর্বমান্য হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় যেহেতু 'মোঘল' লেখা হয়েছে, সেহেতু ছাত্রছাত্রীদের এই বানানই লেখার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।
প্র : বাবুরের প্রকৃত নাম কী?
উ : জহিরুদ্দিন মুহম্মদ।
প্র : 'বাবুর' অর্থ কী?
উ : 'বাবুর' বা 'বাবর' অর্থ সিংহ; এটি পারসি

শব্দ। আমরা যে বলি 'বাবরি চুল'— এর অর্থ সিংহের কেশরের মতো দেখতে চুল।

প্র : বাবুর কত বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন?

উ : ১১ বছর বয়সে।

প্র : বাবুর কখন দিল্লি দখল করেন?

উ : পানিপথের ১ম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে।

প্র : পানিপথ কোথায় অবস্থিত?

উ : ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের একটি প্রাচীন শহরের নাম পানিপথ। এই স্থানের ভারতের ইতিহাসে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

প্র : ইব্রাহিম লোদি কোন বাদশা ছিলেন?

উ : পাঠান বাদশা।

প্র : পাঠান কাদের বলা হয়?

উ : পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের হিন্দিতে পাঠান বলা হয়েছে।

প্র : উত্তর-ভারত কিভাবে বিজয় হলো?

উ : পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে।

প্র : বাবুরের মহত্ত্বগুণ কী ছিল?

উ : তিনি ছদ্মবেশে রাতের আঁধারে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখতে ঘুরতেন।

প্র : ইব্রাহিম লোদি কোন স্থানে বাবুরের কাছে পরাজিত হন?

উ : খানুয়ার প্রান্তরে।

প্র : খানুয়ার প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?

উ : আগ্রার পশ্চিমে অবস্থিত একটি যুদ্ধক্ষেত্র।

প্র : প্রজারঞ্জন অর্থ কী?

উ : এখানে 'জনগণের মনঃতুষ্টি' বোঝানো হয়েছে।

প্র : 'করি' অর্থ কী?

উ : 'করি' মানে হাতি। 'করি-শুণ্ড' অর্থ হাতির শুঁড়।

প্র : 'রাজপদ' অর্থ কী?

উ : রাজার পদ অর্থাৎ 'রাজা'।

প্র : 'সঁপিনু' অর্থ কী?

উ : সমর্পণ করছি।

প্র : বাবুরের ভারত আক্রমণকালে ইব্রাহিম লোদি কোথাকার শাসক ছিলেন?

উ : পাঞ্জাবের।

প্র : বাদশা বাবুর পর্যটকবেশে কার ছেলেকে হাতির কবল থেকে রক্ষা করল?

উ : মেথরের ছেলেকে।

প্র : রণবীর চৌহান লুকানো তলোয়ার নিয়ে কাকে হত্যার করার উদ্দেশ্যে রাজপথে ঘুরছিলেন?

উ : মুঘল সম্রাট বাবুরকে।

প্র : রাজপুত্র যুবককে কেন রণবীর চৌহান উপাধি দেয়া হয়?

উ : মুঘল সম্রাট বাবুরের রাজ্য বিজয়ের পর রাজপুত্রগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এক রাজপুত্র বাবুরকে হত্যার করার জন্য খোলা তরবারি নিয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরছিলেন তাই এই সাহসিকতার জন্য তাকে রণবীর চৌহান উপাধি দেয়া হয়।

প্র : বিদেশি পুরুষ বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন?

উ : সম্রাট বাবুরকে।

প্র : নে আকুফ শব্দের অর্থ কী?

উ : যার নিজের কোন হিতাহিত জ্ঞান নেই।

প্র : রণবীর চৌহান কখন বিস্মিত হলেন?

উ : যখন বাবুর তার নিজ জীবন বাজি রেখে হাতির কবল থেকে মেথরের ছেলেকে রক্ষা করলেন, এই মহত্ত্ব দেখে।

প্র : বাবুর কখন রাজপুত যুবককে ক্ষমা করে দিলেন?

উ : যখন রাজপুত যুবক বাবুরের পায়ে পড়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন।

প্র : বাবুর রণবীর চৌহানকে কী হিসাবে নিয়োগ করলেন?

উ : রাজার দেহরক্ষী।

প্র : সংগ্রাম সিংহ কে?

উ : রাজপুতনার অন্তর্গত মেবার রাজের অধিপতি।

প্র : 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় বাবুরের কী বর্ণিত হয়েছে?

উ : বাবুরের মহানুভবতা। যিনি বাবুরকে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি যখন নিজে সে পথ থেকে সরে এসেছেন, তখনই বাবুর তাকে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে বরণ করে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

কায়কোবাদ

প্র : কবি কায়কোবাদের জন্ম কত সালে?

উ : ১৮৫৭ সালে।

প্র : তাঁর জন্ম কোথায় হয়?

উ : আগলা পূর্বপাড়া গ্রাম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি।

প্র : কায়কোবাদের প্রকৃত নাম কী?

উ : তাজেম আল কোরেশী।

প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

উ : বাল্যের গৃহশিক্ষা শেষ করে ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে ভর্তি হন। পরে 'ঢাকা মাদ্রাসা' থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন।

প্র : কোন কোন কবির কাব্যপ্রভাব তাঁর উপর বেশি ছিল?

উ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন।

প্র : তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে কোন কাব্য রচনা করে?

উ : মাত্র তের বছর বয়সে 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০) লিখে। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

প্র : তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দুটো কী কী?

উ : গীতিকাব্য: 'অশ্রুমালা' (১৮৯৫), মহাকাব্য: 'মহাশ্মশান' (১৯০৫)।

প্র : বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা কে?

উ : কায়কোবাদ।

প্র : বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা কে?

উ : কায়কোবাদ।

প্র : আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?

উ : কায়কোবাদ।

প্র : কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৭০)। তবে অনেক সমালোচকই কাব্যটির নাম 'বিরহ বিলাস' বলেছেন। কবি অবশ্য বলেছেন: 'আমি যখন বার বৎসর বয়স্ক বালক সেই সময় আমার বিরহ-বিলাপ নামক ক্ষুদ্র একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়।' কাব্যগ্রন্থটি আজ দুষ্প্রাপ্য।

প্র : 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : কায়কোবাদের খণ্ড কবিতাগ্রন্থ 'অশ্রুমালা' (১৮৯৬)। এই কাব্যগ্রন্থের মূল সুর প্রেম। তবে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণবোধও এ কাব্য খুব লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থে কোন তত্ত্ব নেই, আছে মানব মনের আবেগ, আনন্দ-বিরহ, প্রেম-বেদনা ইত্যাদির স্বাভাবিক প্রকাশ। কবি লিখেছেন : 'ইচ্ছা হয় তারে নিয়ে / বনবাসী হই / চাইলে এ লোকালয় / এ যে বড় বিষময়।' সহজ উপস্থাপনা ও সরলতাই এ কাব্যগ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'মহাশ্মশান' গ্রন্থটির পরিচয় দাও।

উ : কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মহাশ্মশান' (১৯০৫)। কাব্যটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কাব্যের তিনটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড ২৯ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ সর্গ, তৃতীয় খণ্ড ৭ সর্গ বিশিষ্ট। প্রধান চরিত্রগুলো : এব্রাহিম কার্দি, জোহরা বেগম, হিরণ বালা, আতা খাঁ, লঙ্গ, রত্নজি, সুজাউদ্দৌলা, সেলিন্দ, আহমদ শাহ্ আব্দালী। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক দুধরনেরই আছে। চরিত্রসৃজনে হিরণ বালা শ্রেষ্ঠ। প্রেমিক আতা খাঁ নিজ পরিচয় গোপন অর্থাৎ প্রতারণার আশ্রয় নিলেও হিরণ বালা জোহরার মত ধর্মনিষ্ঠ থাকে নি। বরং আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবতাবোধের আলোকে সে বলেছে : 'নিজে প্রেমময় / জগদীশ, প্রেম শ্রেষ্ঠ সর্বধর্ম হতে / হিন্দু মুসলমান করে সৃজেছে কি বিধি / জীব শ্রেষ্ঠ মানবেরে- তোমারে আমারে?' অথচ জোহরা প্রাণাধিক স্বামীর চেয়ে ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এব্রাহিম কার্দি বাহ্যিক কর্তব্যকর্ম করলেও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকর্মে ব্যর্থ। 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত হলেও একে পরিপূর্ণ মহাকাব্য বলা যায় না। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে সার্বিকভাবে প্রতিফলিত নয়। একে কাহিনিকাব্য বলা চলে। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তরে'র কাহিনি-উৎস এই গ্রন্থ।

2020/5/12 21:26

প্র : কোন ঘটনা অবলম্বনে 'মহাশ্মশান' কাব্য রচিত হয়?
উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে।
প্র : তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'কুসুমকানন' (১৮৭৩), 'শিবমন্দির' (১৯২১), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩) প্রভৃতি।
প্র : নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক ১৯৩২-এ কোন উপাধিগুলো তিনি পান?
উ : 'কাব্যভূষণ', 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্যরত্ন'।
প্র : তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কত সালে?
উ : ১৯৩২ সালে।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ লেখ।
উ : ২১শে জুলাই, ১৯৫১।

'প্রার্থনা' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'প্রার্থনা' কবিতার লেখক কে?
উ : কায়কোবাদ
প্র : কায়কোবাদের মতে, আমাদের কার কাছে সর্বদা প্রার্থনা করা উচিত?
উ : স্রষ্টার কাছে।
প্র : 'বিভো' কী?
উ : শব্দটি হলো 'বিভু'। এই 'বিভু'র কাব্যিকরূপ 'বিভো'। 'বিভু'র আভিধানিক অর্থ 'বিধাতা', মানে স্রষ্টা।
প্র : 'বিভো, দেহ হৃদে বল।' –এখানে 'দেহ' কী?
উ : এর অর্থ 'দাও'। প্রাগাধুনিক বাংলা কবিতায় ক্রিয়াপদে ও-এর বদলে 'হ' ব্যবহারের রীতি দেখা যায়। যেমন: 'অন্ধজনে দেহ আলো'। উনিশ শতকের বাংলা কবিতাতে কেউ কেউ এই রীতি ব্যবহার করেছেন।
প্র : স্রষ্টার কাছে কারা নিঃসম্বল?
উ : এই জগতের মানুষ।
প্র : স্রষ্টার কাছে কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত?
উ : আঁখিতে জল ভাসিয়ে।
প্র : জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে একমাত্র পথের সম্বল কে?
উ : স্রষ্টা।
প্র : জীবনে সকল ক্ষেত্রে কার দুয়ারে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত?
উ : স্রষ্টার।
প্র : স্রষ্টার সৃষ্টি সকল জাতি কাকে মানে?
উ : সৃষ্টিকর্তাকে।
প্র : কার অফুরন্ত দয়ায় জগতের সবকিছু চলছে?
উ : স্রষ্টার।
প্র : আমাদের রিক্ত হস্তে পরম ভক্তির সাথে কার কাছে প্রার্থনা করা উচিত?
উ : সৃষ্টিকর্তার।
প্র : প্রার্থনা কবিতাটি কোথা থেকে দেওয়া হয়েছে?
উ : কবির 'অশ্রুমালা' কাব্যগ্রন্থ।
প্র : 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার প্রতি কেমন মনোভাব প্রকাশ করেছেন?
উ : অপার মহিমা।
প্র : গাছের পাখি, বনের ফুল স্রষ্টার সকল সৃষ্টি কাকে স্মরণ করছে?
উ : বিধাতাকে।
প্র : 'তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ'– প্রসাদ কী?
উ : প্রসাদ হলো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী, যা দেবতা 'গ্রহণ' করেছেন বলে মনে করা হয়। তবে এখানে ঈশ্বরের সৃষ্ট ফল-ফুল বা সৃষ্টিকে বা অনুগ্রহকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : বিশ্বসংসার বলতে কী বুঝিয়েছেন?
উ : স্রষ্টার সৃষ্টির মহাজগতকে।
প্র : 'শোকানল'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
উ : শোক+অনল
প্র : 'অনল' মানে কী?
উ : আগুন
প্র : 'শোকানল'কে সমাস বিচ্ছেদ করলে কী হয়?
উ : শোক রূপ অনল > শোকানল; রূপক কর্মধারয় সমাস।
প্র : 'প্রার্থনা' কবিতার মূলচেতনা কী?
উ : মূলচেতনা হলো: 'দেহ হৃদে বল' অর্থাৎ হৃদয়ে শক্তি দাও বা আত্মশক্তি চাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্র : কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম কোথায়, কবে?
উ : কলকাতার জোড়াসাঁকোয়; ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তাঁর শিক্ষার পরিচয় ও পিতার নাম লেখ।
উ : ধনী জমিদার নন্দলাল সিংহের একমাত্র সন্তান। নিজের ছয় বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। প্রতিষ্ঠানে এবং গৃহশিক্ষক রেখে সংস্কৃত, ইংরেজি, বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।
প্র : তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম লেখ।
উ : বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩) স্থাপন; 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠা; 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) স্থাপন।
প্র : মধুসূদনকে কেন তিনি সংবর্ধিত করেন?
উ : বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার মহাকাব্য রচিত হয়েছে এটা বুঝতে পেরে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হওয়া মাত্র, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দেই মধুসূদনকে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবর্ধনা জানান।
প্র : 'নীল-দর্পণে'র জন্য তিনি জরিমানার টাকা দেন কেন?
উ : দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপার দায়ে প্রকাশক রেভারেন্ড লঙ্ নামক এক পাদ্রিকে (অনুবাদে লেখকের বা অনুবাদকের নাম মুদ্রিত ছিল না বলে তাদের বিচার করা যায় নি) বিচারালয় এক হাজার টাকা জরিমানা করে (১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই)। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে নিজে সে অর্থ পরিশোধ করে পরোক্ষভাবে 'নীল-দর্পণে' ব্যক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন।
প্র : কালীপ্রসন্ন যে দুটি গ্রন্থের জন্য অমর হবেন?
উ : 'হুতোম প্যাঁচার নকশা (১৮৬২), সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ (১৮৬৬)।
প্র : 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র পরিচয় দাও।
উ : কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় (১৮৬২) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সে যুগের সমাজজীবনের ক্ষত চিত্রের মধ্যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আলালের ঘরের দুলালে'র চার বছর পরে প্রকাশিত এ গ্রন্থে সাচনভঙ্গি, রচনারীতি, আঙ্গিক প্রভৃতি দিক থেকে লেখক নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। নকশা উপন্যাস নয়, তা সামাজিক সমস্যামূলক ব্যক্তিগত রচনা। তারপরও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' উপন্যাসের মতোই আশ্চর্যরকম সুখপাঠ্য। এর কারণ কালীপ্রসন্ন সংস্কৃতবহুল পদ্ধতি ভাষার বদলে কথ্যভাষায় এই নকশা রচনা করেছেন। প্যারীচাঁদের আলালী ভাষার সাধু ও কথ্য উভয় বাক্যরীতির মিশ্র প্রয়োগ আছে। কালীপ্রসন্ন এই ভাষাকে আরো স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য দান করেন। এ কাজটি সম্ভবপর হয় বাক্যের ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যরীতি মিশ্রণযুক্ত করার কারণে। তিনিই প্রথম কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার কথ্যভাষা সার্থকভাবে গ্রন্থে প্রয়োগ করেন।
প্র : কালীপ্রসন্ন অনুসৃত রীতির ভাষাকে কী বলা হয়?
উ : হুতোমী বাংলা।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কোথায়, কবে?
উ : কলকাতায়; ২৪শে জুলাই, ১৮৭০।

কুসুমকুমারী দাশ

প্র : কুসুমকুমারী দাশের জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৮২ সালে।
প্র : তাঁর জন্ম কোথায় হয়?
উ : বরিশাল।
প্র : তাঁর শিক্ষা জীবনের বর্ণনা দাও।
উ : কুসুমকুমারী দাশ কিছুকাল বরিশাল ও পরে কলকাতা বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন।
প্র : তিনি শিশুদের জন্য যে পুস্তকটি রচনা করেন তার নাম কী?
উ : 'কবিতা মুকুল'।
প্র : তাঁর গদ্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : 'পৌরাণিক আখ্যায়িকা'।
প্র : যে পত্রিকাগুলোতে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত তার নাম কী?
উ : প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল প্রভৃতি।

5/12 21:27

প্র : কুসুমকুমারী দাশের বিখ্যাত কবিতা পঙ্‌ক্তির নাম বলো।
উ : 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'।
প্র : কুসুমকুমারী দাশের আর একটি বিশেষ পরিচয় কী?
উ : তিনি কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা।
প্র : কুসুমকুমারী দাশের মৃত্যুসাল কত?
উ : ১৯৪৮।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

প্র : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৩৪ সালে বৃহত্তর খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কবি ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১)।
প্র : ঢাকা প্রকাশ ছাড়া আর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : মাসিক মনোরঞ্জিকা (১৮৬০); মাসিক কবিতা কুসুমাঞ্জলি (১৮৬); সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫); বৈভাষিকী (১৮৮৬)।
প্র : তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : সদ্ভাবশতক (১৮৬১)।
প্র : কৃষ্ণচন্দ্র রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : রাসের ইতিবৃত্ত (১৮৬৮), মোহভোগ (১৮৭১)।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯০৭ সালের ১৭ই জানুয়ারি খুলনাতে।

গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই)

প্র : গিরিশচন্দ্র সেন কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৩৫ সালে বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে।
প্র : তিনি কবে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হন?
উ : কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে ১৮৭১ সালে ব্রাহ্মমতে দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে পড়ন, পাঠনে আগ্রহান্বিত হন।
প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন?
উ : বাংলা, সংস্কৃত, পারসি, আরবি (আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য তিনি লক্ষ্ণৌ যান।)
প্র : কী কারণে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন?
উ : বাঙালি মুসলিমদের জন্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ ও মহাপুরুষদের জীবনী রচনা, বিশেষত বাংলা ভাষায় কোরান শরিফ প্রথম অনুবাদের কারণে।
প্র : গিরিশচন্দ্রের কোরান অনুবাদ সম্পর্কে লেখ।
উ : কর্মটি স্পর্শকাতর, সাহসেরও। যেহেতু ধর্মের বিষয় সেহেতু সাবধানতাও দেখি। গিরিশচন্দ্র ছয় বছর (১৮৮১-'৮৬) পরিশ্রম করে নিজের বিদ্যার উপর সহমর্মিতা ও দৃঢ়তা রেখে কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর এই অনুবাদ মুসলিম পণ্ডিতগণ অনুমোদন ও গ্রহণ করেন। বিতর্কহীনভাবে গিরিশচন্দ্র অমরত্ব পান। মওলানা আকরম খাঁ (পরে তিনিও কোরান অনুবাদ করেছেন) গিরিশচন্দ্রের অনুবাদের লিখিত প্রশংসা করেন।
প্র : গিরিশচন্দ্র সেনের মুসলিমদের জন্য রচিত কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ :
* শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের পারসি ভাষার গ্রন্থ 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা'। 'তাপসমালা' ৯৬ জন মুসলিম সাধকের জীবনচরিত।
* 'মিশকাত শরিফে'র অর্ধেক অনুবাদ করেন 'হাদিস-পূর্ব বিভাগ' নামে।
* শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তারের 'মানতেকুহতায়েব' এবং মওলানা জালালুদ্দিন রুমির 'মসনবি শরিফ' পারসি গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে লেখেন 'তত্ত্বরত্নমালা'।

প্র : গিরিশচন্দ্র রচিত আর কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'হাদিস' বা 'মেসকাত মসাবিহ'; 'মহাপুরুষ চরিত'; 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম'; 'এমাম হাসান ও হোসায়েনের জীবনী'; 'চারটি সাধ্বী মুসলমান নারী'সহ মোট ৪২টি গ্রন্থ তিনি রচনা ও অনুবাদ করেন।
প্র : গিরিশচন্দ্র সেন সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ : ধর্মচর্চা যে শুধু আপনধর্মের গুণকীর্তন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা নয়, পরধর্ম ও মতের ভালো দিকগুলোর প্রকাশ ও উন্মোচন, গিরিশচন্দ্র তা দেখিয়েছেন। একজন অমুসলমান হয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙালি মুসলিমদের সামনে প্রথম উপস্থাপন করলেন তাদের ধর্ম-পুস্তক, তাদের মহাপুরুষ ও শ্রদ্ধেয় নারী বা ধর্মপুরুষদের জীবনী, এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে?
উ : ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : জয়দেবপুর, ভাওয়াল, গাজিপুর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : জয়দেবপুর মাইনর স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাস করে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েও শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাস মূলত কী?
উ : স্বভাবকবি।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাস রচিত ব্যঙ্গকাব্য কোনটি?
উ : 'মণের মুলুক'।
প্র : গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার কাহিনিগুলোর বিষয় কী ধরনের?
উ : নরভক্তি, পতিপত্নীর প্রেম, ভ্রাতৃস্নেহ, সন্তান বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনি, পল্লিজীবনের আলেখ্য, জাতীয় উদ্দীপনা ও স্বদেশপ্রেম।
প্র : তাঁর রচিত প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রেম ও ফুল (১২৯৪), কুসুম (১২৯৮), মণের মুলুক (১২৯৯), কস্তুরী (১৩০২), চন্দন (১৩০৩), ফুলরেণু (১৩০৩), বৈজয়ন্তী (১৩১২), শোক সান্ত্বনা (১৩১৬)।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯১৮ সালে।

গোলাম মোস্তফা

প্র : গোলাম মোস্তফার জন্মসাল কত?
উ : ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন?
উ : গ্রাম মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : কলকাতা বিপন কলেজ থেকে বি.এ. ও বি.টি ডিগ্রি লাভ।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : শিক্ষকতা।
প্র : তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু কী?
উ : ইসলাম ও প্রেম।
প্র : তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় প্রচুর পরিমাণে কী রচনা করে?
উ : ইসলামি ও পাকিস্তানি ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত।
প্র : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তিনি কোন ভাষাকে সমর্থন করেন?
উ : উর্দু ভাষাকে।
প্র : গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২), সাম্যবাদ (১৯৩৬), হাসনাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা ই পাকিস্তান (১৯৫৬), বনি আদম (১৯৫৮), গীতি সঞ্চয়ন (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গদ্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : রসূলুল্লাহর জীবনীমূলক গ্রন্থ বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২)।
প্র : তিনি কী কী উপাধিতে ভূষিত হন?
উ : ১৯৫২-তে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক কাব্যসুধাকর ও ১৯৬০-এ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত হন।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৪; ঢাকায়।

চন্দ্রকুমার দে

প্র : চন্দ্রকুমার দে-এর জন্ম সাল কত?
উ : ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : গ্রাম রাঘবপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : গ্রামীণ পাঠশালায় সামান্য বিদ্যাশিক্ষা লাভ।
প্র : সুখী সমাজে পরিচিতি লাভ করেন কিভাবে?
উ : ১৯১২ সালে ময়মনসিংহের সৌরভ পত্রিকায় লোকসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে।
প্র : তিনি কিভাবে দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?
উ : ১৩২০-এর ফাল্গুন সংখ্যার সৌরভে তাঁর 'মহিলাকবি চন্দ্রাবতী' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে তা দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
প্র : তিনি কিভাবে পালা সংগ্রহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন?
উ : দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক তাঁকে মাসিক সত্তর টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা সংগ্রাহকের পদে নিযুক্তিদানের পরে।
প্র : তাঁর সংগৃহীত পালাগানগুলো কী কী?
উ : মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ানা-ভাবনা, দস্যু কেনারাম, রূপবতী, কঙ্কলীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট।
প্র : এগুলো কোন নামে প্রকাশিত হয়?
উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা।
প্র : তাঁর সংগৃহীত পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলো কী কী?
উ : মাইষাল বন্ধু, ভেলুয়া, কমলারানী, দেওয়ান ঈসাখাঁ, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, আয়না বিবি, শ্যাম রায়, শিলাদেবী, আন্ধা বন্ধু, বন্ডুলার বারমাসী, রতনঠাকুর, পীর বাতাসী, জিবালনি, সোনারামের জন্ম, ভারাইয়া রাজা।
প্র : গীতিকা সংগ্রহ ছাড়াও চন্দ্রকুমার দে আর কী রচনা করেছেন?
উ : কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ময়মনসিংহ, ১৯৪৬।

জগদীশ গুপ্ত

প্র : জগদীশ গুপ্তের জন্মসন কত?
উ : কুষ্টিয়া, ২২ আষাঢ় ১২৯২ (জুন ১৮৮৬)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : আমলাপাড়া, কুষ্টিয়া।
প্র : জগদীশ গুপ্তের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : খোর্দ মেঘচারসি গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : কথাসাহিত্যিক ও ছোটগল্পের বিশিষ্ট শিল্পী।
প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো সমৃদ্ধ কেন?
উ : গভীরজীবনবোধ, সুঠাম কাহিনিবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যের জন্যে।
প্র : জগদীশ গুপ্তের শিল্পকর্ম কেন অসাধারণ সৃষ্টি?
উ : মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণ এবং দুঃখময়তার নিপুণ বর্ণনার জন্য।
প্র : তাঁর গল্পে কোন কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে?
উ : সামাজিক অন্যায় অবিচারের চাইতে অদৃষ্টলিপিই দুঃখময়তার কারণ।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বিনোদিনী (১৯২৭), রূপের বাহিরে (১৯২৯), শ্রীমতী (১৯৩১), উদয়লেখা (১৯৩৩), শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৯৩৫), মেঘাবৃত অশনি (১৩৫৪), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৪৭)।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯), রোমন্থন (১৯৩০), লঘুগুরু (১৯৩১), দুলালের দোলা (১৯২৯), নিষেধের পটভূমিকায় (১৯৫২), কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতা, ১৯৫৭।

জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন

প্র : জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের জন্মতারিখ কত?
উ : ৭ই জানুয়ারি, ১৮৫১।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক।

প্র : তিনি কী অনুশীলনে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন?
উ : ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও অনুশীলনে।
প্র : তিনি কোন কোন ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন?
উ : সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মৈথিলি, মগধি, ভোজপুরি, ছত্রিশগড়ি ও বাংলা।
প্র : রংপুরের উপভাষা সম্পর্কে তাঁর গবেষণামূলক আলোচনা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৭৭-এ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়।
প্র : তাঁর কোন রচনাটি ১৮৮১-৮২-তে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়?
উ : বিদ্যাপতির পদাবলি সম্বলিত An Introduction to the Maithile Language of North Bihar.
প্র : তাঁর রচিত কোন গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৮৩-৮৭-তে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় Seven Grammars of the Dialects and Subdialects of the Bihar Language.
প্র : তাঁর রচিত অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : Maithili Grammar for an Introduction to the Maithili Dialect of the Bihari Language of North Bihar.
প্র : তাঁর রচিত বিহারের জনজীবনের ওপর আঞ্চলিক শব্দ সম্বলিত তথ্যবহুল গ্রন্থটি কী?
উ : Bihar Peasent Life (১৮৮৫)।
প্র : ভারতে ভাষাসমীক্ষার প্রয়োজনে তাঁর তত্ত্বাবধানে কী গঠিত হয়?
উ : Linguistic Survey of India.
প্র : এই সংস্থা কী করে?
উ : সংস্থার পক্ষে ১৮৯৮-১৯০২ পর্যন্ত ভাষার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
প্র : তিনি কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উ : ১৯০৩ সালে।
প্র : তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কী?
উ : তৎকালীন ভারতে প্রচলিত ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষার বিবরণ সম্বলিত Linguistic Survey of India নামক ভাষাসমীক্ষামূলক গবেষণাকর্ম (খণ্ড ১১টি) প্রকাশ : ১৯০৩।
প্র : কাশ্মিরি ভাষা সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কী কী?
উ : Essays on Kashmiri Grammar (১৮৯৯), A Manual of the Kashmiri Language (১৯১১) ও চার খণ্ডে প্রকাশিত A Dictionary of the Kashmiri Language (১৯১৬-১৯৩২)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো কী কী?
উ : The Kashmiri Ramayana, Comprising the Sritamavalaracarita and the Lava-Kusayudha Carita of Divakara Prakasa Bhatta. (১৯৩০)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত অন্য গ্রন্থ কী?
উ : হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ।।
প্র : তিনি কী কী সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন?
উ : ডাবলিন, অক্সফোর্ড, পাটনা ও হালে (জার্মানি) বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডক্টরেট, ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত Order of Merit উপাধি প্রদান (১৯২৮), সিজাইই উপাধি লাভ (১৮৮৪), কেসিএসআই উপাধি লাভ (১৯১২)।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৭ই মার্চ, ১৯৪১।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

প্র : জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জন্মতারিখ কত?
উ : ১৮ই অগস্ট, ১৭৯৪
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ব্রডমিড, ইংল্যান্ড।
প্র : তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন?
উ : শ্রীরামপুর মিশনে।
প্র : তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিতে অবদান রাখেন কত বছর?
উ : প্রায় ত্রিশ বছরকাল।
প্র : তিনি কী কী পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও গভর্নমেন্ট গেজেট।

প্র : 'সমাচার দর্পণে'র পরিচয় দাও।
উ : 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ২৩শে মে, ১৮১৮। পরে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্রোমল প্রমুখ এই পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাসে এবং বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পত্রিকার গুরুত্ব যথেষ্ট।
প্র : তিনি কী কী ভাষায় দক্ষ ছিলেন?
উ : ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, ফরাসি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : তিনি কী কী জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?
উ : তৎকালে রেল, টেলিযোগাযোগ ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাদি কী?
উ : ভারতবর্ষের ইতিহাস (২খণ্ড), পুরাবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৮৩৩), জ্যোতিষ গোলাধ্যায়, সনৃত্তণ ও বীর্যের ইতিহাস (১৮২৯), ঈশপস ফেবলস্, ক্ষেত্রবাগান বিবরণ, Murray's Grammar ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন?
উ : ১৮৫২ সালে।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৮ই জুলাই, ১৮৭৭।

জসীমউদ্‌দীন

প্র : জসীমউদ্‌দীনের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১লা জানুয়ারি, ১৯০৩।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাতুলালয়, তাম্বুলখানা গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : আমেনা খাতুন; মৌলবি আনসার উদ্‌দীন আহমদ।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : গোবিন্দপুর গ্রাম, ফরিদপুর।
প্র : জসীমউদ্‌দীনকে কী বলা হয়?
উ : পল্লিকবি। তবে অনেক মনে করেন, তিনি 'আধুনিক কবি'।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রি লাভ।
প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সংগ্রাহক পদে নিযুক্তি লাভ করেন কার আনুকূল্যে?
উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেনের।
প্র : তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন কোন বিভাগে ও কত সালে?
উ : বাংলা বিভাগে, ১৯৩৮-এ।
প্র : তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কোন বিভাগে কর্মরত ছিলেন?
উ : প্রচার বিভাগের Additional Secy Publicity Organiser পদে।
প্র : তাঁর কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটে কখন?
উ : ছাত্রজীবনেই।
প্র : তাঁর ছাত্রাবস্থায় কোন কবিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়?
উ : 'কবর' কবিতা।
প্র : কবর কবিতাটি প্রথম কোন পত্রিকায় ছাপা হয়?
উ : 'কল্লোল' পত্রিকায়।
প্র : 'কবর' তাঁর কোন কাব্যভুক্ত কবিতা?
উ : প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭)।
প্র : তাঁর রচিত কবিতাগুলোতে কুশলতার সঙ্গে কী অঙ্কিত হয়েছে?
উ : গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র।
প্র : তাঁর কবিতাগুলোতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র যে কুশলতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে তাতে কীসের ছাপ সুস্পষ্ট?
উ : আধুনিক শিল্প-চেতনার ছাপ।
প্র : তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্যগুলো কী?
উ : নক্সীকাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) ইত্যাদি।
প্র : 'নক্সীকাঁথার মাঠ'—এর পরিচয় দাও।
উ : 'নক্সীকাঁথার মাঠ' (১৯২৯) গ্রন্থের প্রথম অংশে আছে চাষির ছেলে রূপা ও পাশের গ্রামের মেয়ে সাজুর প্রথম পরিচয় থেকে তাদের অনুরাগের বিকাশ ও বিবাহ এবং কয়েক মাসের সুখময় জীবনের কথা। দ্বিতীয় অংশের বিষয় তাদের বিচ্ছেদ। পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যে বর্ণনাভঙ্গি এবং ভাষারীতি; জসীমউদ্‌দীন তাকে অবলম্বন করেছেন। গ্রামীণ জীবনের মাধুর্য ও করুণা, বৈচিত্র্যহীন ক্লান্তিকরতা এবং মানুষের অসহায়তা এই কাব্যের উপকরণ। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এই কাব্য এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা হয়েছিল।
প্র : 'সূচয়নী' কোন ধরনের গ্রন্থ?
উ : রবীন্দ্রনাথের যেমন 'সঞ্চয়িতা', নজরুলের 'সঞ্চিতা' জসীমউদ্‌দীনের তেমনি 'সূচয়নী'। এটি কবির নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থ।
প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় খণ্ড কবিতার সংকলনগুলো কী কী?
উ : রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত (১৯৩৩), রূপবতী (১৯৪৬), মাটির কান্না (১৯৫৮) ও সুচয়নী (১৯৬১)।
প্র : তাঁর রচিত সুখপাঠ্য গদ্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : যাঁদের দেখেছি (স্মৃতিকথা ১৯৫২), ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (স্মৃতিকথা ১৩৬৮), জীবন কথা (আত্মজীবনী ১৯৬৪) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনিগুলো কী?
উ : চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭), যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮) প্রভৃতি।
প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলো কী?
উ : হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশী (১৩৫৬), ডালিমকুমার (১৯৫১)।
প্র : তাঁর রচিত নাটকগুলো কী কী?
উ : পল্লীমাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধূ (১৯৫৬), গ্রামের মায়া ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত একমাত্র উপন্যাসের নাম কী?
উ : বোবা কাহিনী (১৯৬৪)।
প্র : 'বোবা কাহিনী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : জসীমউদ্‌দীন রচিত 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪) উপন্যাসে মহাজনী শোষণের কারণে গ্রামের প্রান্তিক চাষি আজহারের ভূমিহীন হওয়া, শহরের সুবিধাবাদী উকিল ও ভণ্ড ধার্মিক কর্তৃক মেধাবী বছির নিগ্রহ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্র : বছির, আজহার, আরজান, রহিমুদ্দিন। উপন্যাসে কোন জটিলতা নেই। নিছক সাদা ও সাদাসিধা একটা গল্প আছে উপন্যাসটিতে।
প্র : তাঁর রচিত গল্পের সংকলনের নাম কী?
উ : বালুচর নামের মধ্যে (১৯৩০), গল্পের গল্প (১৯৬৪), জাদুঘাস (১৯৬৮) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় ভ্রমণকাহিনির নাম কী?
উ : বাঙালির হাসির গল্প।
প্র : 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্যটি কী নামে ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়?
উ : 'The Field of the Embroidered Quilt'.
প্র : কে অনুবাদ করেন?
উ : E.M. Millford. ই. এম. মিলফোর্ড।
প্র : তিনি কোন আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?
উ : বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনের।
প্র : তিনি কোন সমাজব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন?
উ : সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার।
প্র : তিনি কী কী সম্মাননামূলক ডিগ্রিলাভ করেন?
উ : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মাননামূলক ডি.লিট. ডিগ্রি ও সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?
উ : ১৯৭৬-এর ১৩ই মার্চ দিবাগত রাতে অর্থাৎ ১৪ই মার্চ।
প্র : তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
উ : ১৪ই মার্চ (১৯৭৬) ফরিদপুরের আম্বিকাপুর।

'রূপাই' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রূপাই' কবিতাটি কে লিখেছেন?
উ : কবি জসীমউদ্‌দীন। তবে জানা থাকা দরকার, 'রূপাই' নামে এই কবির পৃথক কোনো কবিতা নেই। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' নামে কবির যে কাব্যগ্রন্থ রয়েছে, সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণিতে 'রূপাই' শিরোনামে খানিকটা কবিতা সংকলিত হয়েছে।
প্র : চাষার ছেলে রূপাইয়ের রূপ এই কবিতায় কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?
উ : রূপাইয়ের মাথার চুল লম্বা; তার মুখ ফুলের চেয়েও সুন্দর তাই সবসময় চুল করে

তার মুখে বসে; তার মুখের মায়া কাঁচা ধানের পাতার মতো; নতুন ধানের ছায়ার স্নিগ্ধতা আছে তার মুখে; তার বাহু দুটো জালি লাউডগের ডগার মতো সরু; শরীরটি তমাল গাছের মতো প্রশস্ত; তার গায়ের রং ও লাবণ্য যেন মেঘের বুকে ভেল মাখানো এবং সেখানে বিজলির আলো পড়েছে।

প্র : কৃষকের মুখে কখন হাসি ফোটে?
উ : যখন ফসলের ক্ষেতে কাঁচা ধানের চারা গজায়।
প্র : কাঁচা ধানের পাতার মতন কচি কাদের মুখের মায়া?
উ : রুপাইয়ের
প্র : রুপাইয়ের বাহু দুখানি কবি কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ : লাউয়ের কচি ডগার সাথে।
প্র : কাদের শ্রমেই সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে?
উ : কৃষকের
প্র : কবির মতে আমাদের দেশের সোনার ছেলে কারা?
উ : কৃষকরা
প্র : কৃষকের সোনার ছেলে কিভাবে এই ভুবন জয় করবে?
উ : ফসলের মাঠে সোনার ফসল ফলিয়ে।
প্র : পৃথিবীর সকল কেতাব বা গ্রন্থের লেখা কালো– কবি এই কালো কে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ : রোদে পুড়ে মাঠে কাজ করতে কৃষকের শরীরের রং কালো হয় যায়। তাই কবি কৃষকের কালো শরীরের সাথে তুলনা করেছেন।
প্র : রুপাই কবিতায় কবির মতে জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ কারা?
উ : কৃষক
প্র : কৃষকরা কিভাবে ভুলাবে সবার মন?
উ : তারা সোনার হাতে সোনার ফসল ফলিয়ে সবার মন ভুলাবে।
প্র : কবির দৃষ্টিতে কৃষক দামী বলে গণ্য হয়েছে কেন?
উ : কৃষক যেমন মাঠে সোনার ফসল ফলাতে পারে তেমনি জারি গান সারি গান গেয়ে সকল মানুষের মন জয় করতে পারে। তাই কবি তাঁর দৃষ্টিতে কৃষকদের দামী বলেছেন।

প্র : শোকগীতি কী?
উ : কারবালার শোকাবহ ঘটনাসূচক গান।
প্র : 'রুপাই' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কী বর্ণিত হয়েছে?
উ : দ্বিতীয় স্তবকে আছে, কালো রঙের মানুষ বর্ণন।
প্র : কালো রঙের কেমন উল্লেখ আছে এই কবিতায়?
উ : মানুষের চোখের তারা কালো, আর এই কালো তারা দিয়েই মানুষ জগতের সবকিছু দেখে; পবিত্র গ্রন্থগুলোও কালো কালিতে লিখিত; জন্মের আগেও মানুষ অন্ধকার মাতৃগর্ভে থাকে, মৃত্যুর পরও মানুষ অন্ধকার হয়ে যায়।
প্র : রামধনুক কী?
উ : 'রামায়ণে' রামচন্দ্রের হাতে যে ধনুক আছে তাকেই রামধনুক বলে। হালকা বৃষ্টির পর রোদ উঠলে আকাশে যে ধনুসদৃশ বাঁকা রঙিন আলপনা দেখা যায়, সেটির নাম 'রামায়ণে'র মিথ অনুসরে 'রামধনুক' বলা হতো। অর্থাৎ ইংরেজি 'রেইনবো'ই হলো 'রামধনুক'। সজরুল, জসীমউদ্‌দীনসহ বহু কবি-সাহিত্যিক 'রামধনুক' কথাটি তাঁদের সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এই 'রামধনুক' শব্দটি এখন আর ব্যবহার হয় না। একে করা হয়েছে 'রংধনু'। এর ফলে শব্দটি পৌরাণিক অর্থদ্যোতনা হারিয়ে শুধু রং-প্রকাশক হয়ে উঠেছে।
প্র : 'কালো যেজন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন / তারির পদ-রজের রাগি লুটায় বৃন্দাবন'– এখানে কী বলা হয়েছে?
উ : এখানে কৃষ্ণের রূপকল্প তৈরি করা হয়েছে। কৃষ্ণ যেমন কালো, কিন্তু তিনি সবার মন আলো করেন, সবার মন হরণ করেন, তাঁর পায়ের ধুলো পেতে বৃন্দাবনসহ অন্যস্থানের মানুষ লুটিয়ে পড়ে, কালো বলে মোটেও হেলাফেলা করে না– রুপাইও তেমনি। অর্থাৎ রুপাইয়ের কালো রূপকে মাহাত্ম্য দেবার জন্য এখানে ভগবান কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।
প্র : 'সিনান্' কী?
উ : স্নান শব্দের অর্ধতৎসম রূপ। মধ্যযুগে শব্দের এই রূপটি খুব ব্যবহার হয়েছে।

('স্নান' থেকে 'সিনান' থেকে 'সান' বা 'চান')
প্র : 'জারি গান' কী?
উ : এই গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাঠের জন্য প্রস্তাবা: বর্তমান গ্রন্থের শেষ দিকে 'বাংলা গানের ইতিহাস' অংশ।

'পল্লিজননী' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মাতা কার শিয়রে বসে আছেন?
উ : রুগ্ন ছেলের শিয়রে।
প্র : ঘুমে কার চোখের পাতা চুলছে?
উ : মাতার।
প্র : নিবু নিবু দীপ কোথায় জ্বলে আছে?
উ : অসুস্থ ছেলের শিয়রে।
প্র : ওদ্ধে কার পরান লোলে?
উ : বিরহী মায়ের।
প্র : অন্ধকার রাতে কাদের গান জমাট বেঁধেছে?
উ : ঘুলো মশকের গান।
প্র : কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে?
উ : এঁদো ডোবা হতে।
প্র : কুঁড়ে ঘরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরে কী ঢুকছে?
উ : শীতের বায়ু।
প্র : শিয়রে বসে মাতা কী গুণছেন?
উ : অসুস্থ ছেলের আয়ু গুণছেন।
প্র : রুগ্ন ছেলের গালের রঙ কেমন?
উ : পাণ্ডুর।
প্র : নামাজের ঘরে জননী কেন মানত করে?
উ : অসুস্থ ছেলের রোগ ভালো করে দিতে।
প্র : বাঁশ বনে কোন পাখি ডাকে?
উ : কানা কুয়ো পাখি।
প্র : বাদুরের পাখার বাতাসে কী হেলে পড়ে?
উ : সুপারির বন।
প্র : রুগ্ন বালক কার সঙ্গে খেলা করতে চায়?
উ : সমবয়সী ছেলে করিমের সঙ্গে।
প্র : কার ঝাড়া পেলে রুগ্ন ছেলেটি ভালো হবে বলে মনে হয়?
উ : রহিম চাচার।
প্র : রুগ্ন ছেলে তার মাকে কী বস্তু এনে রাখার অনুরোধ করে?
উ : সাটাই।
প্র : রুগ্ন ছেলে তার মাকে সাদা-কালি দিয়ে তার কী রাখতে বলে?
উ : চাঁদের মোয়া বেঁধে আনার জন্য।
প্র : অসুস্থ বালকটি ছোলা ভরে কী রাখতে বলে?
উ : খেঁজুর গুড়ের নাড়া পাটালি।
প্র : অসুস্থ বালকটি কী সাজিয়ে তার সামনে রাখতে বলেছে?
উ : ফুলঝুরি শিকা।
প্র : বালকটির কোঁচ ভরা কোন ফল কানুর খেতেছিল?
উ : বেদুল ফল।
প্র : দরিদ্র মাতা কোন উৎসবে ছেলেকে পুতুল কিনে দিতে পারেন নি?
উ : আড়ম্বর উৎসবে।
প্র : দুখিনী মায়ের ছাতা ছিদ্র বাড়তো কেন?
উ : ছেলের কথার উত্তর দিতে।
প্র : দুখিনী মাতা কোন সুরকে অবলম্বনের মনে করেন?
উ : ঘরের চালে হুতুমের ডাককে।
প্র : পাঁচা ডোবা থেকে কেমন করে বিরহিনী ডাক ডাকছে?
উ : কুরি কুরি।
প্র : ঝুরি'র বাচ্চা কারা চুরি করেছে?
উ : কৃষাণ-ছেলেরা।
প্র : বনে কোন ধরনের পাতা ঝরে পড়ছে?
উ : বুড়ো পাতা।
প্র : প্রদীপের তেল কার সঙ্গে যুদ্ধ করে ফুরিয়ে এসেছে?
উ : রাতের আঁধারের সঙ্গে।
প্র : 'পল্লিজননী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : 'রাখালী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত।
প্র : 'কোথা সারা কার' অর্থ কী?
উ : কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই।
প্র : রোগগ্রস্ত অর্থে রুগ্ন, রুগ্ন নাকি রুগ্ণ কোন বানান শুদ্ধ?
উ : রুগ্ণ শুদ্ধ বানান।
প্র : 'এদো ডোবা' কী?
উ : আগাছায় ভরা ডোবা।

প্র : 'মাজে' কী?
উ : মাগো এর আঞ্চলিক ব্যবহার। এটা দুঃখার্থে নয়।
প্র : পাখের পাল কেশা
উ : হতভাগা ষেত কর্ণ ৯-৮।
প্র : আলা রসুল কী?
উ : আল্লা > আলা; আঞ্চলিক রূপ। এর সঙ্গে রসুল যুক্ত।
প্র : কানা কুয়ো অর্থ কী?
উ : ভয়ংকর শব্দ উচ্চারণকারী এক জাতীয় নিশিপক্ষী।
প্র : 'চলে কুলো পথে জোনাকি মেয়েরা কুয়াশা কাফন ধরি' কী?
উ : এটি কবির কল্পনা। কুয়াশা পড়ছে আর জোনাকি জ্বলছে। কবি কল্পনা করছেন, মেয়ে জোনাকিরা ধনের পথে চলছে এবং কাফনের কাপড় তারা ধরে আছে। এটি অমঙ্গলকর মনে হয়েছে পল্লিজননীর কাছে।
প্র : ট্যাঁপের মোয়া কী?
উ : শাপলা ফুল থেকে উৎপন্ন বীজ থেকে এক ধরনের খৈ। সেই খৈ দিয়ে তৈরি মোয়াকে ট্যাঁপের মোয়া বলে।
প্র : সাত-নরি কী?
উ : সাত প্যাঁচবিশিষ্ট। সমতুল্য: সাত-নরি হার।
প্র : হুরুমের কোলা কী?
উ : কোলা অর্থ পেটমোটা বড় মাটির জালা বিশেষ। হুরুম অর্থ সম্ভ্রান্ত, এখানে কারুকাজখচিত অর্থে। 'হুরুমের কোলা' হলো কারুকাজখচিত পেটমোটা বড় মাটির জালা।
প্র : 'এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে,'– কী বোঝানো হয়েছে?
উ : ছেলেটি তার কাপড়ের (এখানে অনুমান করা যায় লুঙ্গি) কোঁচে বেথোশাক নিয়ে এসেছে এবং সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় গ্রামের নরু পথচ্যুত হয়ে শুকনো পাতার ওপর চলতে গিয়ে পাতায় ঝামুর ঝুমুর শব্দ উঠেছে।
প্র : 'মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।'– কী?
উ : কবি এখানে গ্রামে প্রচলিত একটি অন্ধবিশ্বাসকে সামনে এনে মাকে সন্তান এক সময় মৌলবাদিদের কেউ কেউ প্রচার করতেন, মেলা বা আড়ঙ হিন্দুদের মুসলমানের জন্য নয়। অনেক ধর্মান্ধ মুসলিম সরল বিশ্বাসে সে কথা মানতো। এই বিশ্বাসটি কবি এখানে কাজে লাগাতে চেয়েছেন গ্রামীণ কাঠামো বোঝাবার জন্য। কিন্তু ছেলেটিও তার চেয়ে কম নয়। করিম, অর্জিনা গ্রামমুখের উদাহরণ দিয়ে মাকে সে ঠিকই বুঝিয়েছে যে মেলা বা আড়তে যাওয়ার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই।
প্র : হুতুম কী?
উ : আতঙ্ক সৃষ্টি করে ডাকা এক প্রকার প্রকাণ্ড পেচক।
প্র : 'ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, ... তাহার বাচ্চা করেছে চুরি।'– অংশটুকুর ব্যাখ্যা কী?
উ : এই কবিতার সর্বাপেক্ষা নিকট-প্রতীক এটি। কৃষকের ছেলেরা বাচ্চা চুরি করা মা পেচক প্রবলভাবে শোকার্ত। এই মা পেচক পল্লিজননীর প্রতীক। মা পেচক প্রথমে ঘরের চালে ডাকলে পল্লিজননী সেটাকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু এর কিছুক্ষণ পর এসে ভোরার ধারে বসেই সন্তানের জন্য আবার বিলাপ করতে থাকে পেচকটি। লক্ষণীয়, ঘরে মর্মবেদনায় পুড়ছেন পল্লিজননী আর বাইরে শোকে কাতর মা পেচক।

জহির রায়হান

প্র : জহির রায়হানের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১৯শে অগস্ট, ১৯৩৫।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মজুপুর গ্রাম, ফেনি, নোয়াখালি।
প্র : জহির রায়হানের প্রকৃত নাম কী?
উ : মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ।
প্র : শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে জহির রায়হানের সম্পর্ক কী?
উ : তাঁরা উভয়ে সহোদর (ভ্রাতা) ছিলেন।
প্র : জহির রায়হান মূলত কী?
উ : কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক।

প্র : তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে যোগ্যতা কতটুকু?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স ও এম.এ. পাস (১৯৫৮)।
প্র : তিনি কোন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে।
প্র : তিনি কখন চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন?
উ : ১৯৬৩-র শেষের দিকে।
প্র : তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি কোনটি?
উ : কখনো আসে নি (১৯৬১)।
প্র : তাঁর পরিচালিত অন্য ছবিগুলো কী?
উ : সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), সঙ্গম জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০) ইত্যাদি।
প্র : তিনি বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার যে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন তার নাম কী?
উ : Stop Genocide.
প্র : তিনি তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানে প্রথম কোন রঙিন ছবি সৃষ্টি করেন?
উ : সঙ্গম (টেকনিকালার)।
প্র : তাঁর সৃষ্ট প্রথম সিনেমাস্কোপ ছবি কোনটি?
উ : বেহুলা।
প্র : তাঁর কোন ছবিটি শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসেবে নিগার পুরস্কার লাভ করে?
উ : কাঁচের দেয়াল।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : তৃষ্ণা (১৩৬২), শেষ বিকেলের মেয়ে (১৩৬৭), হাজার বছর ধরে (১৩৭১), আরেক ফাল্গুন (১৩৭৫), বরফ গলা নদী (১৩৭৬), আর কত দিন (১৩৭৭) ও কয়েকটি মৃত্যু (১৩৮২)।
প্র : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। নদী তীরবর্তী প্রকৃতির কোলে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী বিকশিত। এর ভাষা কাব্যিক, গতিশীল ও সুখপাঠ্য। উপন্যাসে যে জীবন ও জনপদের বর্ণনা আছে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের। এই উপন্যাসে লেখক নিজস্বতায় তা তুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসের শরিফা বুবি একমাত্র জীবন্ত চরিত্র। আর সবই যেন মৃত ও নির্জীব।
প্র : 'আর কতদিন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : মুহূর্তকালীন বাস্তবতা, সহিংস মানবতার আর্তি ও শান্তির স্বপ্নকে জোরালো 'আবেদন দিয়ে জহির রায়হানের 'আর কত দিন' উপন্যাসটি ১৯৭০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির কাহিনি সংঘটনের বিস্তারিত বর্ণনা, কাহিনি শুরুর কোনো স্থান-কাল নির্দেশনা থাকলেও গ্রন্থটির প্রকাশকাল ও ঘটনা বিন্যাসের আলোকে বুঝতে পারা যায় যে মুক্তিমুদ্ধ-পূর্ব সময়ের অস্থির সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর প্রেক্ষাপটে আসন্ন যুদ্ধের একটি ভয়াবহ সম্ভাবনা লেখকের মনে উদয় হয়েছিল। শান্তি ও ভালোবাসার জন্য মানুষের চিরন্তন অন্বেষা উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। আর উপন্যাসটির চরিত্র ইভা ও তপু শাশ্বত শান্তি ও ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে।
প্র : 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায় জহির রায়হান 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) উপন্যাস রচনা করেন। নায়ক মুনিম, আসাদ, বকুল, সালমা চরিত্রের মতো অন্যান্য চরিত্র ইতিহাস অনুমোদিত। ১৯৫৫ সালে বর্তমান শহিদ মিনারের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ হয়ে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চলমান আন্দোলন, জনতার সম্মিলন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, তাদের প্রেম-প্রণয় ইত্যাদি উপন্যাসটির মূলবিষয়। তাদের বিশ্বাস, জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আগামী ফাল্গুনে আরও প্রবল হবে। তাই তাদের উচ্চারণ : আসছে ফাল্গুনে আমরা ফিরে হবো। এই উপন্যাসে বাঙালির জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপায়িত করা হয়েছে।

প্র : পাকিস্তানিদের জন্য প্রিন্সিপাল দিনরাত কী করতো?
উ : সোয়া-দুরুদ পড়তো।
প্র : জেনারেল স্ট্রেটমেন অর্থ কী?
উ : সাধারণ বিবৃতি।
প্র : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের বাহিনী পরাজিত হয়ে ছিল–
উ : রাশিয়ার রুশ বাহিনীর হাতে।
প্র : প্রিন্সিপাল কাকে তোয়াজ করতেন–
উ : মজিদ আকবরকে।
প্র : মুক্তিফৌজরা কোথায় বোমা ফেলেছিল?
উ : প্রিন্সিপালের বাড়ির গেটে।
প্র : রেইনকোট পরার পরে লেখককে কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : শ্যালক মিস্টুর মতো।
প্র : কোথায় অর্ধেকের বেশি জায়গা স্বাধীন–
উ : রংপুর, দিনাজপুর।
প্র : নুরুল হুদা কোন বিষয়ের লেকচারার–
উ : কেমিস্ট্রির বা রসায়নের।
প্র : কত দিন ধরে বৃষ্টি চলছিল?
উ : টানা তিন দিন।
প্র : নুরুল হুদার সাথে আর কাকে মিলিটারির জিপে তোলা হয়–
উ : আব্দুস সাত্তার মৃধাকে।
প্র : রেইনকোটের ওপর চাবুকের বাড়ি নুরুল হুদার কাছে স্রেপ উৎপাত মনে হয়েছিল কেন?
উ : মুক্তিযুদ্ধার ব্যবহৃত জিনিস তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জিবিত করে। তাই পাকিস্তানী যখন তাকে চাবুক মারতে থাকে। তখন তার মনে হয়– এ যেন স্রেপ উৎপাত।

আনিসুজ্জামান

প্র : লেখক আনিসুজ্জামানের প্রকৃত নাম কী?
উ : এ.টি.এম. আনিসুজ্জামান।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা-স্ত্রীর নাম কী?
উ : পিতার নাম : এ.টি.এম. মোয়াজ্জেম; মাতার নাম : সৈয়দা খাতুন; স্ত্রীর নাম : সিদ্দিকা জামান।
প্র : তিনি কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায়।
প্র : আনিসুজ্জামানের প্রকৃত পরিচয় কী?
উ : তিনি শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস প্রফেসর (বাংলা বিভাগ)।
প্র : তিনি কোথা থেকে কী শিরোনামে ডক্টরেট করেন?
উ : ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৭৫৭-১৯১৮)' শিরোনামে। এই গবেষণাপত্রকে তিনি 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (১৯৬৪) নামে গ্রন্থরূপ দেন।
প্র : তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : 'স্বরূপের সন্ধানে' (১৯৭৬); 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' (১৯৮৩); 'বাঙালি নারী : সাহিত্যে ও সমাজে' (২০০০); 'কাল নিরবধি' (২০০৩) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পদক ও পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উল্লেখযোগ্য পদক ও পুরস্কার হলো : বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০); একুশে পদক (১৯৮৫); আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪); ভারত সরকারের পদ্মভূষণ (২০১৪)। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট. পান ২০০৫ সালে।

'জাদুঘরে কেন যাব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পাশ্চাত্যদেশে কোনগুলো স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃংখলা হিসেবে বিকশিত?
উ : জাদুঘরতত্ত্ব-মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ।
প্র : পৃথিবীর বৃহত্তম জাদুঘর কোথায় স্থাপিত হয়েছিল?
উ : আলেকজান্দ্রিয়ায় (খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে)।

প্র : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়া কী কাজে ব্যবহৃত হতো?
উ : পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার। ছিল, উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। তবে সেখানে মূলত দর্শনচর্চা হতো।
প্র : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে কী কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়?
উ : আলেকজান্দ্রিয়া গড়ে ওঠার পেছনে দুটি কারণ আছে বলে ধারণা করা হয়। এক, জাদুঘরটি গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক। দুই, দর্শকেরা সেখানে যেত নিজের নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, কেউ কেউ হয়তো পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখতো।
প্র : জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি কী ছিল?
উ : জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রাচীন জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছিল এবং তাদের মধ্যে যারা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাদের ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক উদ্যোগে সংগৃহীত হতে থাকে প্রাচীন নিদর্শনগুলো। এটাই জাদুঘর গড়ে ওঠার ভিত্তি।
প্র : পাশ্চাত্যে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ শুরু হয়?
উ : ইউরোপীয় রেনেশাঁসের পর পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে, প্রাচ্যদেশে অনেক আগ থেকেই সংগ্রহ হতো বলে ধারণা করা হয়।
প্র : রাজ-রাজারা কেন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করতো?
উ : রাজ-রাজাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ ছিল তাদের পরাক্রম, শৌর্য-বীর্য, সম্পদ ও গৌরবগাথার ঘোষণা হিসেবে তা সংগ্রহ হতো।
প্র : যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থান উদ্যোগে কখন প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ করা হয় বলে মনে করা হয়?
উ : ষোল শতকের পরে।
প্র : ল্যুভ বা লুভর মিউজিয়াম কখন গড়ে ওঠে?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে গড়ে ওঠে ল্যুভ বা লুভর মিউজিয়াম।
প্র : ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার উন্মোচিত হয় কখন?
উ : ফরাসি বিপ্লবের পর।
প্র : লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদ কখন গড়ে ওঠে?
উ : রুশ বিপ্লবের পর লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদ গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে।
প্র : ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কোনটিকে?
উ : টাওয়ার অফ লন্ডন নামক ঐতিহাসিক প্রাসাদ।
প্র : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে কোথায়?
উ : সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।
প্র : অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম কিভাবে সৃষ্টি হয়?
উ : পিতাপুত্র দুই ট্রাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল- এই তিনজনের সংগ্রহ নিয়ে।
প্র : ব্রিটিশ মিউজিয়াম কার তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : আঠার শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়। তবে, স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির সার্বিক সহায়তা ছিল।
প্র : জাদুঘরে সংগৃহীত বিষয় বৈচিত্র্যের চিত্র তুলে ধর।
উ : জাদুঘরের বৈচিত্র্য খুব চোখে পড়ার মতো। সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। বর্তমানে ভিন্নভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা প্রবল। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর ভাষা কিরূপ?
উ : ভাষা ঋজু ও সাবলীল এবং ভাবাবেগমন্ডিত।
প্র : তাঁর রচিত সুপরিচিত গল্পগ্রন্থটির নাম কি?
উ : সূর্যগ্রহণ (১৩৬২)।
প্র : তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন কেন?
উ : 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাস রচনার জন্য (১৯৬৪)।
প্র : তিনি বাংলা একাডেমি থেকে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : উপন্যাসের জন্যে মরণোত্তর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২)।
প্র : তিনি ছাত্রজীবনে কোন কোন পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে যুক্ত ছিলেন?
উ : সাহিত্য ম্যাসিক প্রবাহ এবং ইংরেজি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস পত্রিকা।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭২-এর ৩০শে জানুয়ারি মিরপুরে নিখোঁজ হন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না।

'একুশের গল্প' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'একুশের গল্প' এর রচয়িতা কে?
উ : জহির রায়হান।
প্র : 'যদিও একটু আধটু তন্দ্রা আসে, তবু অন্ধকারে হঠাৎ ওর দিকে চোখ পড়লে গা হাত পা শিউরে ওঠে'– কথাটি যে রচনা থেকে নেয়া হয়েছে তার নাম কী?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'তুবড়ি' কি?
উ : আতশবাজি।
প্র : 'একুশের গল্প'-এর রেণু মাঝে মাঝে কী ভেজে আনতো?
উ : ডালমুট।
প্র : 'একুশের গল্প'– ছোটগল্প ব্যবহৃত Skull শব্দের অর্থ কী?
উ : মাথার খুলি।
প্র : 'টিবিয়া ফেবুলা' দু ইঞ্চি ছোট ছিল কার?
উ : তপুর।
প্র : 'একদিন মিছিলটাকে ঘিরে ... ওর।'– কার সম্বন্ধ?
উ : তপুর।
প্র : তপু কোন গল্পের চরিত্র?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'পলকহীন চোখজোড়া দিয়ে অপলক সে দেখেছিলো তার।'– 'একুশের গল্প' থেকে অপলক কথা বলা হয়েছে?
উ : রেণুর।
প্র : 'ওই যে লোকটা বলছিল সে ... হবে, পরশু রাতে মারা গেছে।'– কোন দেশের লেখক?
উ : আয়ারল্যান্ড। (তিনি ১৯২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'ম্যান অ্যান্ড সুপার ম্যান', সেন্ট জোয়ান তাঁর বিখ্যাত নাটক)
প্র : মিছিলের সময় তপুর হাতে কী ছিল?
উ : প্ল্যাকার্ড।
প্র : 'আমরাও দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম ... উপর'– কার উপর?
উ : তপুর।
প্র : তপুর মা আর বউকে খবর দেবার জন্য কাকে পাঠানো হয়েছিল?
উ : রাহাতকে।
প্র : বন্ধুদের সাথে কলেজ হোস্টেলে তপুর কয় বছর ছিল?
উ : দুবছর।
প্র : 'সেকি! এর মধ্যে বিয়ে করে ফেলল মেয়েটা?'– এ উক্তি কার?
উ : নাজিমের।
প্র : বার্নাডশ কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?
উ : ১৯২৫ সালে।
প্র : জহির রায়হান রচনাবলি কোন খণ্ড থেকে 'একুশের গল্প' গল্পটি চয়িত হয়েছে?
উ : দ্বিতীয় খণ্ড।
প্র : 'আরেক ফাল্গুন' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উ : উপন্যাস।
প্র : তপুর কী হবার সখ ছিল?
উ : সৈনিক।
প্র : 'শহরের সেরা নাচিয়ে ছিল'– কে?
উ : রুনী।
প্র : 'হয়েছে, এবার তুমি এসো। উঃ বড় বলতে শুরু করলে যেন আর ফুরোতে চায় না'- এটি কার উক্তি?
উ : রাহাতের।

প্র : 'এটি, তুমি আবার কবি হলে কবে থেকে?'– এটি কার উক্তি?
উ : রাহাতের।
প্র : 'স্মরণি রাহাত্মান রচনাবলি' প্রকাশিত হয় কত সালে?
উ : ১৯৮১ সালে।
প্র : 'বিয়ে করবে না তো কি সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকবে শাকি মেয়েটা।'– এটি কার উক্তি?
উ : মাহতের।
প্র : কলেজে ভর্তি হবার কতদিন পরে তপু মেহুকে বিয়ে করে?
উ : এক বছর।
প্র : 'একুশের গল্পে' ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ।
উ : Anatomy (এনাটমি) > শরীরবিদ্যা;
Skull (স্কাল) > মাথার খুলি;
Tibia-fibula (টিবিয়া-ফেবুলা) > জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।
Placard (প্ল্যাকার্ড) > প্রদর্শনের জন্য প্রচারপত্র।
প্র : 'কিন্তু বরাত মন্দ।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'এ পথের যদি শেষ না হতো কোনদিন। অনন্তকাল ধরে যদি এমনি চলতে পারতাম আমরা।'—কথাটি যে রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে তার নাম কী?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'বলে বিরক্তিতে মা লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো সে।'—সে কে?
উ : রেণু।
প্র : 'আগেতো পাটকাটি ছিল। এখন বেশ মোটাসোটা হয়েছে।'—কে?
উ : রুনী।
প্র : 'সমুদ্র গভীর জনতা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে'—প্রসঙ্গটি কোন গল্পের?
উ : একুশের গল্প।
প্র : তপুর গরম কোটটি কার কাছে ছিল?
উ : রাহাতের।
প্র : 'বলতে গিয়ে গলাটা ধরে এলো ওর।'—কার গলা ধরে এলো?
উ : রাহাতের (এটি গল্পের শেষ লাইন)।
প্র : মিছিলের সময় তপুর হাতে কোন রংয়ের লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল?
উ : লাল রংয়ের।
প্র : 'মাহতোরা ঠকঠক করে কাঁপছিল ... ভার।'—কার হাত কাঁপছিল?
উ : মাহতের।
প্র : 'তপু মা মরে আমি মরলেই ভালো হতো।'—উক্তিটি কার?
উ : মাহতের।
প্র : 'যাঁর কান্না দেখে আমার নিজের ওপরে ঘৃণা এসে গিয়েছিল।'—কার কান্না দেখে?
উ : তপুর মায়ের।
প্র : মাস্টার যখন কোন শব্দ শেখার পরে বসে ঐ শব্দের বিশ্লেষণের কাজ করে-তখন তাকে কী বলে?
উ : অনুসর্গ।
প্র : 'সোহরাব গফুর, হিন্দুস্থিলে কটি, আসলে বয়সের মেয়েটা প্রায়ই ওর সাথে দেখা করতে আসতো এখানে।'—কে এই মেয়ে?
উ : রেণু।
প্র : চার বছর আগে তপুকে দেখবার মতো কোথায় দেখা গিয়েছিল?
উ : হাইকোর্টের মোড়ে।
প্র : 'হাসি দিয়ে মরটাকে ভরিয়ে রাখতো সে।'—কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
উ : তপু।
প্র : 'স্বপ্নালু চোখে স্বপ্ন দেখতো তার।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'আমাদের জীবনটা ছিল যান্ত্রিক।'—বাক্যটি কোন রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : একুশের গল্প।
প্র : 'সে গর্ত দিয়ে নির্ঝরের মতো রক্ত ঝরছে তার।'—কার?
উ : তপুর।
প্র : 'কথার তুবড়ি' শব্দের অর্থ কী?
উ : অনর্গল কথা।
প্র : 'একুশের গল্পে'র মূলকথা কী?
উ : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এক উদ্দাম হৃদয়বান, প্রাণবন্ত তরুণ শহিদ হয়। কিন্তু পুলিশ সেই লাশ গুম করে ফেলে। তার বন্ধুরা মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া এক বন্ধু আবিষ্কার করে।

2020/5/12 21:27

জীবনানন্দ দাশ

প্র : জীবনানন্দ দাশের জন্মসাল কবে?
উ : ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : বরিশাল।
প্র : তাঁর আদি নিবাস কোথায়?
উ : গাওপাড়া গ্রাম, বিক্রমপুর।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এম.এ. (১৯২১)।
প্র : জীবনানন্দ দাশ কোন পত্রিকার সাহিত্যপাতা সম্পাদনা করেন?
উ : দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ।
প্র : তাঁর রচনায় কী কাব্যময় হয়ে উঠেছে?
উ : গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে কী বলেছেন?
উ : চিত্ররূপময় কবিতা।
প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাগ্রন্থ পাঠ করে জীবনানন্দ দাশকে এই কথা লিখেছিলেন?
উ : ধূসর পাণ্ডুলিপি।
প্র : তাঁর রচিত কবিতায় কী কী দীপ্যমান?
উ : আধুনিক নাগরিক জীবনের হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয়ের চিত্র।
প্র : তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় কেন?
উ : স্বচ্ছ, সুন্দর, শান্ত ও স্নিগ্ধ রোম্যান্টিক কবিতার স্রষ্টা বলে।
প্র : বিশ শতকের ষাটের দশকের বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে কী তীব্রভাবে এদেশের সংগ্রামী জনতাকে অনুপ্রাণিত করেছেন?
উ : তাঁর নিসর্গবিষয়ক কবিতা।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী?
উ : ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ও বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
প্র : জীবনানন্দ দাশকে কী কী বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়?
উ : ধূসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, রূপসী বাংলার কবি।
প্র : জীবনানন্দ দাশের কবিতায় চিত্ররূপময়তার পরিচয় দাও।
উ : জীবনানন্দ দাশের কবিতা সম্পর্কে কবিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠিতে লিখেছিলেন, তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ ভুল নয়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ছবির পর ছবি দেখা যায়। এই ছবি কোনো সাদা-কালো ছবি নয়, যেন রঙিন চলচ্চিত্র। তিরিশের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন: 'চারিপাশে বনের বিস্ময় / চৈত্রের বাতাস / জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন; / ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে; / কোথাও অনেক বনে– সেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই / পুরুষহরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার।' (–ক্যাম্পে) অথবা অন্য একটি কবিতায়: 'হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল? / বালতিতে টানিনি কি জল? / কাস্তে হাতে কতোবার যাই নি কি মাঠে? / মেছোদের মতো আমি কতো নদী ঘাটে / ঘুরিয়াছি।' (–বোধ) এই দুটি উদ্ধৃতিতেই কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখে একটি করে রঙিন ছবি ভেসে উঠবে। জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে এ কারণেই চিত্ররূপময় বলা হয়।
প্র : জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা হয় কেন?
উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ আছে জীবনানন্দ দাশের। কিন্তু শুধু এ কারণেই তাঁকে 'ধূসরতার কবি' বলা হয়– তা নয়। ঝরা পাতা, শিরশিরে হাওয়া, উর ব্যাবিলন মিশরীয় সভ্যতা- এসবই জীবনানন্দের কাব্য-বৈশিষ্ট্য। বন্ধ্যাযুগের যথাযথ চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দের তুলনা নেই। মৃত্যুচেতনাও প্রায় প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শ্মশান, মরুবালু, আলেয়া ইত্যাদি কবিতার পটভূমি মৃত্যু। এই মৃত্যুচেতনা malady of the age অর্থাৎ যুগযন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত। জীবনানন্দ একে জীবনে ধারণ করেছিলেন। যেমন, একটি কবিতায় তিনি হতাশা ভরে বলেছেন: 'বিবর্ণ

জ্ঞানের রাজ্য কাগজের ঢাঁইয়ে পড়ে আছে, / আমাদের সন্ততিও আমাদের নয়।' (–বিভিন্ন কোরাস) এরকমের হতাশা আর বিবর্ণের কথা আছে তাঁ বহু কবিতায়। তাঁর কবিতায় চলচ্চিত্রে আছে ধূসর বর্ণ। তাই জীবনানন্দ দাশকে ধূসরতার কবি বলা হয়।
প্র : জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন উপমার জাদুঘর।–তাঁর কবিতা থেকে কয়েকটি উপমার উল্লেখ কর।
উ : সংস্কৃত সাহিত্যে 'উপমা কালিদাসস্য' বলে একটি কথা আছে। বাংলা কবিতায় বলতে হয়: 'উপমা জীবনানন্দ দাশস্য'। সত্যিকার অর্থেই জীবনানন্দ দাশের কবিতা যেন উপমার জাদুঘর। নিচে কয়েকটি উপমার উল্লেখ করা হলো:
• আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে।
• তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
• নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা।
• পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।
• উটের গ্রীবার মতো কোন-এক নিস্তব্ধতা এসে।
বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপমা প্রয়োগ নিয়ে মন্তব্য করেছেন: 'তাঁর উপমা উজ্জ্বল, জটিল ও দূরগন্ধবহ।' অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপমা কেবল চিত্র বা তুলনা নয়, তারা চিন্তা। কথাটি অসঙ্গত নয়।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?
উ : কবিতার কথা।
প্র : 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের একটি বিখ্যাত উক্তি কী?
উ : 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।'
প্র : তিনি বিশিষ্ট কেন?
উ : রবীন্দ্রবলয় ছিন্নকারী ও উত্তরকালের কবিদের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাববিস্তারী কবি হিসেবে। তাছাড়া মর্মগত, সুমিত, নিরাবেগ ও সুস্থির গদ্য লেখক হিসেবেও।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো কী কী?
উ : মাল্যবান (১৯৬৬), সতীর্থ (১৯৭৫)।
প্র : 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ঝরাপালক' (১৯২৭) জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ যেমন আছে, তেমনই আছে এক নতুন ভাষারীতি ও বাক্যপ্রতিমা রচনার চেষ্টা।
প্র : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতাগুলির মধ্যে জীবনানন্দীয় কাব্যের নিজস্ব বিষয়, ছন্দভঙ্গি, ভাষা, প্রতিমা সমস্ত বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট প্রকাশিত। এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই আধুনিক বাংলা কাব্যাঙ্গনে জীবনানন্দের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হতে থাকে।
প্র : 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'বনলতা সেন' (১৯৪২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গ্রন্থগুলির অন্যতম। এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতাগুলির মধ্যে ভাস্বর। ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়নে যেমন বিদিশা, শ্রাবস্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা চোখের নীড়ের মতো উপমানগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কাব্যমণ্ডল। প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি ও বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর সমাহার এই অপরূপ কাব্যে আলোছায়ার জাল রচনা করেছে। জীবনানন্দের শ্লথগতি ছন্দস্পন্দ, অভিনব শব্দ প্রয়োগ ও অন্বয়, রূপময় ইন্দ্রিয়ালু বাকপ্রতিমাগুলি এই কাব্যকে অসামান্য মহিমা দিয়েছে। পাখির নীড়ের মতো চোখ, শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা, অন্ধকারের মতো কালো চুল ইত্যাদি অশ্রুতপূর্ব উপমা প্রয়োগে জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।
প্র : 'রূপসীবাংলা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'রূপসী বাংলা' ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত

হয়। কবিতাগুলি লিখিত হয়েছিল বিশ বছরেরও আগে। প্রথম প্রকাশের সময় ভূমিকায় অশোকানন্দ লাল জানান যে কবিতাগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল। কবিতাগুলির গঠন সনেটের। এদের বিষয় বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি, নদীনালা, পশু-পাখি, উৎসব, অনুষ্ঠান। জনপ্রিয়তার দিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন'-এর পরেই এর স্থান। 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়' এ কাব্যের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি।

প্র : 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? প্রকাশকাল কত? কবিতাটির সঙ্গে বিদেশি কোন কবির, কোন কবিতার মিল আছে?

উ : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', ১৯৩৬। কবি W. B. Yeats-এর 'The falling of the leaves's' কবিতার মিল আছে।

প্র : জীবনানন্দের মৃত্যুচেতনা কী মৌলিক?

উ : পুরোপুরি মৌলিক নয়, পাশ্চাত্যের কবি রিলকের প্রভাব আছে।

প্র : 'হায় চিল' কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্গত? এর উপর কারো প্রভাব পড়েছে কী?

উ : 'হায় চিল' 'মহাপৃথিবী' কাব্যের অন্তর্গত। এই কবিতার সঙ্গে ইয়েটস-এর 'He reproves the curlow' কবিতার মিল আছে।

প্র : 'বনলতা সেন' কবিতার উপর কার প্রভাব আছে?

উ : অ্যাডগার এলেন পো-র 'টু হেলেন' কবিতার প্রভাব পড়েছে।

প্র : পাশ্চাত্যের কোন কোন কবির দ্বারা জীবনানন্দ প্রভাবিত?

উ : ইয়েটস, বোদলেয়ার, অ্যাডগার এলেন পো।

প্র : 'মাল্যবান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'মাল্যবান' (১৯৭৩) উপন্যাস। লেখা হয়েছিল সম্ভবত ১৯৪৮ সালে, প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের মৃত্যুর অনেক দিন পরে। বাংলা সাহিত্যের মূল কাহিনি বর্ণনার ধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই উপন্যাসটি।

মানসিকতা জীবনের এক নিবিড় কাহিনি। সম্পর্কের জটিলতা এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বোধ এক ইঙ্গিতময় ভাষায় অসামান্য কুশলতার সঙ্গে লিপিত হয়েছে।

প্র : সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া তাঁর আর একটি উপন্যাসের নাম কী?

উ : কল্যাণী (প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৯৯)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?

উ : ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪।

প্র : কিভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ট্রামের নিচে পড়ে আহত হন ও পরে হাসপাতালে মারা যান।

প্র : জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর তাঁর কোন কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়?

উ : রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।

'এই পৃথিবীতে একস্থান আছে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : পৃথিবীর সুন্দর করুণ স্থানটি কোন ঘাসে ভরে আছে?

উ : মধুকুপী।

প্র : ভোরের মেঘে জেগে ওঠা অরুণ কোন রং ধারণ করেছে?

উ : নাটার।

প্র : সুদর্শন কখন ঘরে উড়ে যায়?

উ : সন্ধ্যার অন্ধকারে।

প্র : বরুণ এবং বারুণীর অবস্থান কোথায়?

উ : বরুণ কর্ণফুলী ও পদ্মা নদীতে, বারুণী গঙ্গাসাগরে অবস্থান করে।

প্র : বিশালাক্ষী কবিকে বর হিসেবে কী দিয়েছিল?

উ : শঙ্খমালা নামক প্রেমিকাকে।

প্র : 'এই পৃথিবীতে একস্থান আছে' কবিতায় কোন পাখির নাম আছে?

উ : শঙ্খচিল এবং লক্ষ্মীপেঁচার।

প্র : অন্ধকারে ঘাসের উপর কী নুয়ে থাকে?

উ : লেবুর শাখা।

প্র : শঙ্খমালার শরীরে কোন রংয়ের শাড়ি ছিল?

উ : হলুদ।

প্র : শঙ্খমালা পরবর্তী জীবনে নীল বাংলায় কোথায় জন্মে?

উ : ঘাস আর ধানের ভেতর।

প্র : নীলের মতো ছড়ায় চঞ্চল, সেটা কী?

উ : পাখিরা।

প্র : নক্ষত্রগুলি কিসের মতো অস্ফুট?

উ : ধানের গন্ধের মতো।

প্র : জীবনানন্দ দাশের কাব্যবৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলেছেন?

উ : মিস্টিসিজম।

প্র : বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে কী বলে উল্লেখ করেন?

উ : নিরালার কবি।

প্র : কেন এ পৃথিবীর অন্য কোথাও আর শঙ্খমালাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

উ : এই পৃথিবীর অন্য কোথাও বাংলা নামক সুন্দর দেশ নেই, এ জন্যই পৃথিবীর অন্য কোথাও আর শঙ্খমালাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্র : সবুজ ডাঙা বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : কবির কাছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ কী?

উ : তার জন্মভূমি।

প্র : সুন্দর আবার করুণ কেন?

উ : এটি কবিকল্পনা। দুটো আপাত বিপরীত গুণ বা বস্তুকে পাশাপাশি স্থাপন করা; যেমন : ভীষণ সুন্দর। করুণতা শুধু নেতিবাচক অর্থে নয়, বিশেষ ভালোবাসা অর্থেও। যেমন : মায়ের করুণমুখ স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধে যায় বীরেরা। এখানে 'করুণ' নেতিবাচক অর্থে নয় বিশেষ ভাবেদন সঞ্চারী ভালোবাসা অর্থে ব্যবহৃত।

প্র : 'মধুকুপী' কী?

উ : বৃক্ষে মধুধারণ করে আছে এমন। গ্রামবাংলার অনেক লতা, গুল্ম, ফুলে যে মধুরমতো মিষ্ট রস থাকে তা বোঝাতে চমৎকার এই শব্দের ব্যবহার।

প্র : 'সেইখানে শঙ্খচিল পানের বনের মতো হাওয়ায় চঞ্চল, / সেইখানে লক্ষ্মীপেঁচা ঘাসের মতো মাথা নুয়ে, ডানার / দুই পঙ্‌ক্তিতে কোন অলঙ্কার আছে?

উ : দুটোতেই আছে উপমা।

প্র : 'সুদর্শন' কী?

উ : এক ধরনের কাল্পনিক।

প্র : 'ডাঙা' কে বা কী?

উ : বাংলাদেশ।

প্র : হলুদ শঙ্খি কী?

উ : শরিষার ফুল বা অন্যান্য হলুদাভ ফুল-ফসলকে বোঝানো হয়েছে।

প্র : 'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে' কবিতার মূলকথা কী?

উ : চমৎকার রূপ বর্ণনা করে কবি বলেছেন, দেবী দুর্গা বর দিয়েছিলেন বলে বাংলা এতো সুন্দর হয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও এমন স্থান পাওয়া যাবে না।

'সেইদিন এই মাঠ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থভুক্ত?

উ : 'সেইদিন এই মাঠ' জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থভুক্ত প্রথম কবিতা। 'রূপসী বাংলা' প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পর, ১৯৫৭ সালে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় 'আবহমান বাংলা, বাঙালীকে।

প্র : এই কবিতার স্তবক-সংখ্যা কয়টি?

উ : দুটি। প্রথমটি নয় পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট দ্বিতীয়টি চার পঙ্‌ক্তির।

প্র : 'নদী নক্ষত্রের জল' কী?

উ : কবি কল্পনা করছেন, রাতে নক্ষত্রের ছায়া জলে নদী সৃষ্টি হয়েছে। নক্ষত্রসমূহ ওপরে আর নিচে অর্থাৎ নদীর জলে এই পৃথিবীর মাটি, মাঠ, বাড়ি কিছু।

প্র : 'সোনার স্বপ্ন' কী?

উ : যে স্বপ্ন অনেক দামি।

প্র : কবিতায় 'চালতা ফুল' কেন ব্যবহার করা হয়েছে?

উ : চালতা ভারতীয় ফল। এর ফুল খুবই হালকা গন্ধ ছড়ায়। তবু ফুল হিসেবে চালতা ফুল তুচ্ছ। কবি এখানে ভারতীয়

আপাত তুচ্ছ একটি ফুলকে শিশিরে স্নান করানোর মাধ্যমে পল্লিপ্রকৃতিকে নিসর্গকে জীবন্ত করেছেন।

প্র : 'লক্ষ্মীপেঁচা' কী?

উ : উলুক বা পেচক হলো পেঁচা, যা একটি নিশাচর পাখি। হিন্দুপুরাণ অনুসারে ধনদেবী লক্ষ্মীর বাহন এই পেঁচা। পেঁচার বিভিন্ন প্রজাতি আছে। লক্ষ্মীর বাহনরূপী বিশেষ প্রজাতির পেচকই লক্ষ্মীপেঁচা।

প্র : 'সেইদিন এই মাঠ' কবিতায় কোন পঙ্‌ক্তি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে?

উ : 'সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে তবে আর ঝরে।'

প্র : এসিরিয়া কী?

উ : প্রাচীন নগরী। টাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমানের ইরাকের কিছু অংশ) অবস্থিত সমৃদ্ধ রাজ্য। বর্তমানে বিভিন্নমুখী আক্রমণ ও লুণ্ঠনে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

প্র : বেবিলন কী?

উ : বেবিলন হলো প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার (বর্তমানের ইরাকের কিছু অংশ) দক্ষিণ দিকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৯৪ অব্দে গড়ে ওঠা অ্যামোরিট সাম্রাজ্যের নগরী। ইউফ্রেটাস নদী এই নগরীর মধ্যবর্তী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমান দুই ভাগ করেছিল। এক সময় বেবিলন নগরীকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। পরে তা আবার পুনর্গঠন করা হয়।

'আবার আসিব ফিরে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতা জীবনানন্দ দাশের কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ পায়?

উ : ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে; কবির মৃত্যুর (১৯৫৪) পর।

প্র : 'ধানসিড়ি' কী?

উ : একটি নদীর নাম ধানসিড়ি। (বি.দ্র. নদীটির নামের বানানে চন্দ্রবিন্দু - নেই।)

প্র : 'ধানসিড়ি' কোন জেলার নদী?

উ : ঝালকাঠি জেলার নদী। বিশেষজ্ঞদের মতে, ধানসিড়ি ঝালকাঠি জেলার একটি নদী।

প্র : 'ধানসিড়ি' নামে কি আরো কোনো নদী রয়েছে?

উ : আছে। ভারতের আসামের গোলাঘাট জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীর নাম 'ধনসিড়ি'। ধানসাগরের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ৩৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ হয়ে এটি ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিশেছে।

প্র : কবি বাংলাদেশকে কীসের দেশ বলেছেন?

উ : নবান্নের।

প্র : 'নবান্ন'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ ও সমাস কী?

উ : সন্ধি: নব+অন্ন; সমাস: নব অন্ন হয়ে যে অনুষ্ঠানে= অনুক্ত বহুব্রীহি।

প্র : 'নবান্ন' কী?

উ : এক ধরনের লোক-উৎসব। নতুন ধান ওঠার সময়।

প্র : 'হয়তো মানুষ নয়– হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;'– কবির জন্মের প্রত্যাশা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

উ : জীবনানন্দ আবার এই বাংলায় জন্মাতে চেয়েছেন। এটা তাঁর ভাবনা। মানুষ মরে গেলে আবার জন্মগ্রহণ করে কি-না এ প্রশ্নের কোনো উত্তর জিজ্ঞেস না করে কবি-সাহিত্যিকগণ মৃত্যুর পর অন্য জন্মের কথা বলেছেন। আসলে মানুষ ব্যক্তি-শরীর ধ্বংস হয়ে গেলেও জীবকুলের যেহেতু বিনাশ নেই, সেহেতু বেঁচে থাকার প্রত্যাশা থাকতেই পারে। জীবনানন্দ দাশ তো তাঁর আর এক কবিতায় লিখেছেন: 'মানুষের মৃত্যু হয় তবুও মানব বেঁচে রয়।'

প্র : জীবনানন্দ দাশের এই ভাবনার সঙ্গে নজরুলের কোনো গানের কথা কি মিলে যায়?

উ : 'মোরা আর জনমে হংসমিথুন ছিলাম ...'।

প্র : 'ভোরের কাক' কেন?

উ : রাতের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ামাত্র সে প্রথম চিৎকার করে এবং সবাইকে জাগিয়ে দেয়।

প্র : 'জলাঙ্গী' কী?

উ : একটি নদীর নাম।

প্র : 'বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;'– 'করুণ' কোন অর্থে?

উ : নদীর ডাঙা সব সময়ই করুণ বা অসহায় থাকে। কারণ এই বুঝি তার ভাঙন এলো। তবে বাংলাদেশের ডাঙা সবুজ থাকে– এটাই এখানকার বিশেষত্ব।

প্র : 'সুদর্শন' কী?

উ : এটি এক ধরনের পোকার স্থানীয় নাম।

প্র : লক্ষ্মীপেঁচা কী?

উ : এক বিশেষ ধরনের পেঁচা যা লক্ষ্মী দেবীর বাহন হিসেবে থাকে। মনে করা হয়, এই পেঁচা ভাগ্যের প্রতীক।

প্র : 'হুড়াইতেছে' কী?

উ : 'হুড়াইতেছে'-এর কবিকৃত সাধিত রূপ।

প্র : জলসা কী?

উ : একটি নদী। বাগেরহাট জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত।

প্র : 'ডিঙা' কী?

উ : নৌকা।

প্র : 'ডিঙা' কোন শব্দ?

উ : দেশি শব্দ।

প্র : কবি সন্ধ্যার আকাশে কী উড়বে বলেছেন?

উ : সুদর্শন।

প্র : সাদা ছেঁড়া পালে কে ডিঙা বায়?

উ : কিশোর।

প্র : শঙ্খচিল কী?

উ : শুভ্র বক্ষোদেশযুক্ত চিলবিশেষ।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় মানুষ ছাড়া কয়টি প্রাণীর উল্লেখ আছে?

উ : সাতটি।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

উ : রূপসী বাংলা।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় মানুষের কোন দুটো কালের উল্লেখ আছে?

উ : শিশু ও কিশোর।

প্র : 'ধানসিড়ি' নদীটি কোথায়?

উ : ঝালকাঠিতে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কী বেশ ধারণ করে কবি এ বাংলায় ফিরে আসতে চান?

উ : শঙ্খচিল শালিকের বেশে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবির সারাদিন কীভাবে কেটে যাবে?

উ : কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় শঙ্খচিল কোথায় ডানা মেলে উড়বে?

উ : শিশিরের ঘাসে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় চিল কোথায় ডানা মেলে উড়বে?

উ : ডানার মাঠে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় চড়ুই কোথায় ডাকবে?

উ : নীড়ে।

প্র : 'আবার আসিব ফিরে' কবিতায় কবির কোন অসমাপ্ত কাজটির কথা বলা হয়েছে?

উ : দেশপ্রেম।

প্র : 'আমারেই পাবে তুমি ইহার ভিতর!'– কবিতার মতো কী হতে চেয়েছে?

উ : কবির অভিপ্রায়, তিনি নদীমাতৃক এই বাংলার বিচিত্র জনপদ ও উপাদানের মধ্যেই জীবিত থাকবেন। এভাবে তিনি মরিয়ে যান তবে বাংলার পাখির মতো মাত্র যাবে। তাই বাংলার রূপ অবিকৃত রাখার প্রয়োজনে আমাদের উচিত, এই দেশের পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-হাওড়, মানুষ ও জীবনযাত্রাকে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এগুলো যেন দুষণজনিত ক্ষতির মুখে পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখা।

জোভান্না মার্শম্যান

প্র : জোভান্না মার্শম্যান-এর জন্মতারিখ কত?

উ : ২০শে এপ্রিল, ১৭৬৩।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : অক্সফোর্ডশিরে, ইংলিশ শায়ার লন্ডন।

প্র : তাঁর কী কী ভাষায় দক্ষতা ছিল?

উ : ভারতীয় ভাষা ছাড়া গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু ও সিরিয়াক ইত্যাদি।

প্র : তিনি প্রথম কোথায় কর্মরত ছিলেন?

উ : লন্ডনের পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকানে।

প্র : তিনি বাঙ্গালোরে শিক্ষিত হন কত সালে?

উ : ১৭৯১-এ।

প্র : তিনি কখন মিশনারির কাজে ভারতে আসেন?

উ : ১৭৯৯-এ। শ্রীরামপুরের মিশনে কাজে নিযুক্ত হন।

20/5/12 21:27

প্র : তিনি কোন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন?
উ : চিনা ভাষায়।
প্র : তিনি কেরির সহযোগিতায় কী অনুবাদ করেন?
উ : সংস্কৃত রামায়ণ।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন?
উ : সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ', 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ও 'দিগ্দর্শন' পত্রিকা।
প্র : 'দিগ্দর্শন'-এর সম্পাদনা সম্পর্কে লেখ।
উ : 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত এবং জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান কর্তৃক সম্পাদিত। এখানে ছাত্রদের জন্য ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতো।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ৫ই ডিসেম্বর, ১৮৩৭।

ডিরোজিও, হেনরি

প্র : ডিরোজিওর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
প্র : তিনি কে ছিলেন?
উ : একজন ইউরেশীয় তরুণ কবি, যুক্তিবাদী, চিন্তাবিদ ও শিক্ষক।
প্র : তাঁর জীবৎকাল কত?
উ : ১৮০৯ থেকে ১৮৩১ (ডিসেম্বর) অর্থাৎ ২২ বৎসর।
প্র : তাঁর কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর।
উ : তিনি মাত্র সতের বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের (বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষক নিযুক্ত হন। পড়াতেন ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস। প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দেয়া ছিল তাঁর শিক্ষার মূলকথা। ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসের বাইরেও মুক্ত আলোচনা করতেন। তরুণ শিক্ষক হওয়ায় ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে খুব সহজেই মিশে যেতো। সংস্কারপন্থীদের অভিযোগ ও চাপের ফলে এই ছাত্রপ্রিয় শিক্ষককে হিন্দু কলেজ থেকে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরখাস্ত করা হয়।
প্র : ডিরোজিও একটি সংগঠন করেছিলেন তার নাম কী?
উ : ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'।
প্র : ডিরোজিওর অনুসারী মুক্তচিন্তক গোষ্ঠীকে কী বলা হয়?
উ : ইয়ংবেঙ্গল।
প্র : ডিরোজিও-র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
উ : 'ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান' (১৮০৯-১৯৩১) হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পিতার নাম ফ্রান্সিস ও মাতার নাম সোফিয়া। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র প্রভৃতি মুবক ছিলেন তাঁর শিষ্য। এই ছাত্রদের 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে পরিচিত ছিল। যুক্তি ও তর্কের দ্বারা সমাজ, ধর্ম, নীতি সবকিছুকে যাচাই করে দেখার এক নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন ডিরোজিও তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ: The Fakeer of Jungkeera (১৯২৮)। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর চিন্তাধারার প্রভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে কর্মচ্যুত করেন। বাংলা সাহিত্যের নতুন ভাবমণ্ডল গঠনের ইতিহাসে তাঁর ছাত্রদের দান স্মরণীয়।
প্র : 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর পরিচয় দাও।
উ : 'ইয়ংবেঙ্গল' ডিরোজিও প্রভাবিত এক তরুণ ছাত্রগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে প্রধান কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ছাত্র হিসেবে সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান, ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহী। প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সমালোচনা-মুখর। প্রচলিত হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

তাদের প্রেরণাসূত্র। তদানিন্তন সভ্যতাগীর সাহিত্য, ধর্ম, নীতি গঠনে তাঁদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।
প্র : ইয়ংবেঙ্গলদের নিয়ে মধুসূদন সতের বিদ্রোহ প্রহসন গ্রন্থটির নাম কী?
প্র : একেই কি বলে সভ্যতা?
প্র : হিন্দু কলেজের চাকুরিচ্যুতির পর তিনি যে পত্রিকার সম্পাদক হন তার নাম?
উ : কেলিডোনিয়ান।
প্র : বাংলা সাহিত্যে ডিরোজিও আলোচিত কেন?
উ : তাঁর ছাত্র ও অনুসারীবৃন্দ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনাতে যুক্তিশীলতা ও মানবিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সাহিত্য রচনা করেন।

তসলিমা নাসরিন

প্র : তসলিমা নাসরিন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৬২ সালের ২৫শে অগস্ট, ময়মনসিংহে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : নারীবাদী লেখক হিসেবে।
প্র : তাঁর গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : কবিতা : শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা (১৯৮৬), নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে (১৯৮৯), আমার কিছু যায় আসে না (১৯৯০), অতলে প্রস্তরীভূত (১৯৯১), বালিকার গোগ্রাসে (১৯৯২), নির্বাচিত নারী (১৯৯২), বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা (১৯৯৩) ইত্যাদি।
গল্পগ্রন্থ : ভালোবাসো? ছাই বাসো (২০০৮)।
উপন্যাস : অপরপক্ষ (১৯৯২), শোধ (১৯৯২), ভ্রমর কেও গিয়া (১৯৯৩), লজ্জা (১৯৯৩) ইত্যাদি।
প্রবন্ধ : নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য (১৯৯২), যাবো না কেন? যাবো (১৯৯২), ছোট ছোট দুঃখ কথা (১৯৯৪), একা (২০০৩), নারীর কোনো দেশ নেই (২০০৭) ইত্যাদি।
আত্মকাহিনি : আমার মেয়েবেলা (১৯৯৯), উতল হাওয়া (২০০১), ক (২০০৬), নির্বাসন (২০০৭), ওই অন্ধকার (২০০৮), দেশের জিন দেশ (২০০৯)।
প্র : তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ফরাস দাও (১৯৯৩)।
প্র : তসলিমা নাসরিন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন?
উ : সুইডেন ও সিঙ্গাপুরের কাছে প্রথমে আশ্রয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ কত?
উ : ২৩শে অগস্ট, ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : লাভপুর গ্রাম, বীরভূম।
প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত কী?
উ : তিনিশের দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় কথাসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহে কী নিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?
উ : রাঢ় অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনের সমস্যা ও আঞ্চলিক বিশ্বাস।
প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসগুলো কী?
উ : চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), পাষাণপুরী (১৯৩১), কালিন্দী (১৯৪০), জলসাঘর, কবি (১৯৪২), গণদেবতা (১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), আরোগ্য নিকেতন (১৯৫০), পঞ্চপুত্তলী (১৯৫৬), রাধা (১৯৫৭) ইত্যাদি।
প্র : 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র পরিচয় দাও।
উ : 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে বীরভূমের কাহার সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোককথা আন্তরিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। একদিকে এই সম্প্রদায়ের আত্মবিরোধ, পরিবর্তন ও বিলুপ্তি যেমন কাহিনির একটি প্রধান ধারা, আর একটি ধারা হল প্রাচীন সমাজের সঙ্গে নতুন পরিবর্তমান জগতের সংঘাত। উজ্জ্বল এর বিচিত্র চরিত্রগুলি। সেই সঙ্গে আছে এক অদ্ভিম মানবিক সংগ্রাম।

2020/5/12 21:28

প্র : 'কালিন্দী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'কালিন্দী' (১৯৪০) দুই বিবাদমান জমিদার বাড়ির কাহিনি। নদীর বুকে একটি চরকে কেন্দ্র করে এই দুই পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ সামন্ততান্ত্রিক জীবনের কতগুলি উপাদানের প্রতি তারাশঙ্করের মমতা এবং জমিদার ও শিল্পপতির দ্বন্দ্বে জমিদারদের পরাজয়ের জন্য বেদনাবোধ উপন্যাসে স্পষ্ট।

প্র : 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) ১৯৫২ সালে শারদীয় আনন্দবাজারে 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই কাহিনির নায়ক এক কবিরাজ, জীবনমশায়। তার জীবনদর্শনের সঙ্গে নব্যশিক্ষিত ডাকার প্রদ্যোতের আনর্শিক সংঘাত উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য। একদিকে প্রাচীনবিদ্যা ও নবীন শিক্ষার টানাপোড়েন, অন্যদিকে জীবনমশায়ের মৃত্যুরহস্য জিজ্ঞাসা কাহিনিটিকে প্রগাঢ় করে তুলেছে। তারাশঙ্করের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় দৃষ্টিতে ও পাশ্চাত্য ভাবনায় সংঘাত, সেই সঙ্গে আছে তাঁর মৃত্যু-জিজ্ঞাসা।

প্র : 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কবি' (১৯৪১) ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবি রূপে প্রতিষ্ঠা এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ক উপন্যাস। আখ্যানের নিপুণ বিন্যাস, চরিত্রগুলির উজ্জ্বল উপস্থিতি এবং গানের সহজ কথার সঙ্গে জড়িত সংরাগ ও বেদনা সব মিলে এই উপন্যাসটি তারাশঙ্করের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। এই উপন্যাসের 'জীবন এত ছোট ক্যানে' সংলাপটি ক্লাসিক মর্যাদা পেয়েছে।

প্র : 'কবি' নামে বাংলা সাহিত্যের আরেকজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন, তিনি কে?

উ : হুমায়ূন আহমেদ।

প্র : 'যতিভঙ্গ' ভিন্নধর্মী উপন্যাস, কেন?

উ : 'যতিভঙ্গ' (১৯৬২) এক অবাঙালি যুবতী রৌশনকে নিয়ে লেখা। বাংলা উপন্যাসে অবাঙালি চরিত্র বিরল। সেদিক থেকে কাহিনিটি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক নারীর জীবনজিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ, সমাজসচেতন জীবনের নানা সমস্যা এই কাহিনিতে স্থান পেয়েছে। তারাশঙ্করের সাহিত্যসৃষ্টিতে যে-কটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস 'যতিভঙ্গ' তার অন্যতম।

প্র : 'অভিযান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'অভিযান' (১৯৪৬) উপন্যাসে মফস্বল অঞ্চলের ট্যাকসি ড্রাইভারদের জীবন উপজীব্য। একদিকে তথাকথিত ভদ্রসমাজের পর্যবেক্ষণ, অন্যদিকে মানুষের অকৃত্রিম আচরণের বৈচিত্র্য, ক্রূর ও জটিল, কুটিল ও প্রবল বলিষ্ঠতা এই কাহিনির বৈশিষ্ট্য। সত্যজিৎ রায় এই উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

প্র : তারাশঙ্করের কোন কোন উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। কেন বলা হয়?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, কবি, কন্যার কাহিনী প্রভৃতি উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। কারণ এই সব উপন্যাসের পটভূমি রাঢ় বাংলা, বিশেষ করে বীরভূম অঞ্চলের মানবগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের সামগ্রিক রূপ এতে অঙ্কিত হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সব পরিচয়ই এখানে আছে। যেন প্রতিটি উপন্যাসই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল।

প্র : কত খ্রিষ্টাব্দে কিসের জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তরীণ হন?

উ : ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই.এ পাঠকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য অন্তরীণ হন।

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম ছোটগল্পের নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত ছোটগল্পের নাম 'রসকলি'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম ও এর রচনাকাল কত খ্রিষ্টাব্দে?

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'চৈতালী ঘূর্ণি'। রচনাকাল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়।

প্র : 'জলসাঘর' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জলসাঘর' (১৯৩৭) এগারোটি গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পের পটভূমি গ্রন্থকারের জমিদারের প্রভাব ও তার ক্ষয়ের পোড়নীয় রূপ। জমিদারতন্ত্রের সমৃদ্ধি ও অবসানের রূপ এই গল্পগুলিতে লক্ষ করা যায়।

প্র : 'অগ্রদানী' গল্প সম্পর্কে লেখ।

উ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর একটি 'অগ্রদানী'। গরিব পূর্ব স্বত্ববতী রাজভোগের আশায় কৌশলে নিজপুত্রকে তুলে দেয় শ্যামাদাস অধিপাত্রের হাতে। কিন্তু সেই পুত্রের অকাল মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধে পিণ্ডভক্ষণ কালে গোঁড়া চক্রবর্তী তার ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু নিয়তির শাস্তির হাত থেকে সে রক্ষা পায় না। এরকম কাহিনিতে গল্পটি রচিত হয়েছে। গল্পটিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায়। পরে 'রসকলি' গল্পগ্রন্থে ১৯৩৮ সালে স্থান পায়।

প্র : তারাশঙ্করের ত্রয়ী উপন্যাস কোনগুলো?

উ : ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম।

প্র : 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯) বঙ্গশ্রী পত্রিকায় (১৯৩৪) 'জমিদারের মেয়ে' নামে ছোট আকারে প্রথম প্রকাশিত। চার বছর পরে শনিবারের চিঠিতে 'ধাত্রী দেবতা' নামে এই উপন্যাসটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করে দেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের নানা আন্দোলন ও পরিবর্তন এই উপন্যাসের উপজীব্য।

প্র : গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), গণদেবতা (১৯৪৩), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪) মূলত একই সূত্রে বাঁধা। কারুণ শিবনাথ নামক এক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনটি উপন্যাসই বিকশিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় ও সমাজ গণদেবতা পঞ্চগ্রামে মুখ্য। এ সময় ভারতের গ্রামীণ সমাজে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের সঙ্গে নবজাগরণের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বঙ্কিম মণ্ডল, হারান চৌধুরী, দেবু ঘোষ, হরেকৃষ্ণ মিশ্র, ভানুকরণ সদৃশ মূর্তি, ধর্ম, দেবু উপন্যাসের মহাকাব্যোচিত আয়োজনে এখানে ধাত্রীর উদয়ন, ঘনশ্যাম সংকীর্ণতা, প্রেম, চৌপাহা সবই ছাড়া এসেছে। উপন্যাস সংঘবদ্ধতা ও দিয়ে এদিয়ে আসে দেবু ঘোষ, হরিকৃষ্ণকে নির্ভর করে তার 4 অভিযান। 'পঞ্চগ্রামের পথে' থেকে শ্রীহরি ঘোষ বাস্তবায়ন করে সমাজপতি হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, অসার বহুল সমাজে ধর্মভক্তরা, বিদ্রূপাত্মের কাছে পরাস্ত হবে, এটাই সময়ের দাবি।

প্র : আদিবাসী সাঁওতাল, সিধোরে, নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস কোনটি?

উ : অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬)।

প্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাসের নাম কী?

উ : 'একটি কাশো মেয়ের কথা' (১৯৭১)।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর কী জীবনরূপে প্রকাশিত হয়েছে?

উ : মানবচরিত্রের নানান জটিলতা ও নিগূঢ় রহস্য।

প্র : তিনি আর কী হিসেবে প্রসিদ্ধ?

উ : গল্পকার হিসেবে।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলো কী?

উ : রসকলি, বেদেনী, ডাকহরকরা।

প্র : তাঁর রচিত কোন কোন গল্প ও উপন্যাস অবলম্বনে সার্থক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে?

উ : দুই পুরুষ, কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন, সপ্তপদী ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কারে ভূষিত হন?

উ : সাহিত্যকৃতির জন্য পদ্ম স্মৃতি পুরস্কার, জগত্তারিণী স্মৃতিপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।

প্র : তিনি কী কী উপাধি লাভ করেন?

উ : পদ্মশ্রী ও পদ্মভূষণ উপাধি।

20/5/12 21:28

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : কলকাতা; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।
প্র : তারাশঙ্করের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের ভারতস্থ হাই কমিশনার প্রেরিত শোকবার্তায় কী বলা হয়েছে?
উ : ভারতস্থ বাংলাদেশ (প্রবাসী সরকারের) হাই কমিশনার এম. হোসেন ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর পি.আর/৪৮/৭১ স্মারকমূলে এই শোকবার্তা প্রেরণ করেন: 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ তিরোধানের সংবাদে শোকাভিভূত হলাম। সাহিত্যজগতের মুকুটমণির এই তিরোধানে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে অনেক সময় লাগবে এবং সাহিত্যক্ষেত্রেও এ ক্ষতি বিরাট। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ছিল অসীম। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর আত্মীয়বর্গকে জানাই আমার প্রগাঢ় সমবেদনা।'

তালিম হোসেন

প্র : তালিম হোসেনের জন্ম কবে এবং কোথায় হয়?
উ : ১৯১৮ সালে নওগাঁর বদলগাছি নামক এলাকায়।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : মাসিক মোহাম্মদী।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : দিশারী (১৯৫৬), শাহীন (১৯৬২), ইসলামী কবিতা (১৯৮১), নূহের জাহাজ (১৯৮৩)।
প্র : তাঁর অনুবাদকৃত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : স্বর্গচারণ (উপন্যাস ১৯৫৯), দানবীর এন্দ্রুর কানেগী (১৯৬২)।
প্র : তিনি কোন ধরনের সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত?
উ : ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্যিক হিসেবে।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও খেতাব লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৫), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৮২), বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), নজরুল একাডেমী পুরস্কার, চুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৯০)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

প্র : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের জন্মদান কবে?
উ : ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : উলাইল গ্রাম, ঢাকা।
প্র : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মূলত কী?
উ : শিশুসাহিত্যিক ও লোক সংগ্রাহক।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলি কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : প্রদীপ ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়।
প্র : তিনি কোন পত্রিকাটি প্রকাশ করেন?
উ : সুধা।
প্র : তিনি জমিদারির কাজে দশ বছর পরে ময়মনসিংহে থেকে কী করেন?
উ : গ্রাম বাংলার লুপ্তপ্রায় কথাসাহিত্য সংগ্রহ ও তার গবেষণা।
প্র : তিনি এই লোকসংগ্রহ উপাদানগুলো কার পরামর্শে ও কীভাবে প্রকাশ করেন?
উ : দীনেশচন্দ্র সেনের পরামর্শে রসকথা, ব্রতকথা, রূপকথা ও গীতিকথা এ চার ভাগে ভাগ করে প্রকাশ করেন।
প্র : তিনি কোথায় সভাপতি নির্বাচিত হন?
উ : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির।
প্র : তিনি পরিষদ কর্তৃক কোন পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন?
উ : পথ নামক সাময়িকীর।
প্র : তাঁর সংগৃহীত কাহিনি নিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?
উ : ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদা মশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে, খোকা বাবুর খেলা, আমাল বই, কিশোরদের মন, বাংলার সোনার ছেলে, পৃথিবীর রূপকথা ও সবুজ লেখা।
প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে লেখ।
উ : 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন রূপকথার সংকলন। রূপকথার সঙ্গে এখানে উপকথার বৈশিষ্ট্যও আছে। কারণ পশু-পাখির মুখ দিয়েও কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলি বলার গ্রামীণ রীতি ও ভাষা যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে দক্ষিণারঞ্জন সম্পাদনা ও প্রকাশ করে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।
প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পরবর্তী খণ্ডের নাম কী?
উ : পরবর্তী খণ্ডের নাম 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯)। 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' বাংলা শিশুসাহিত্য তো বটেই বাংলা লোকসাহিত্যচর্চার ইতিহাসেও অমূল্য সম্পদ।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : দৃষ্টিহীন।
প্র : তিনি বাংলায় কীসের পরিভাষা রচনা করেন?
উ : বিজ্ঞানের।
প্র : তিনি রূপকথা লেখক হিসেবে কার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?
উ : ১৯৫৭।

দাউদ হায়দার

প্র : দাউদ হায়দার কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, পাবনার দোহার নামক স্থানে।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : লেখক।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : জন্মই আমার আজন্ম পাপ, এই শাওনে এই পরবাসে, আমি ভাল আছি তুমি, পাথরের পুঁথি।
প্র : দাউদ হায়দার কোথায় আছেন?
উ : তিনি জার্মানিতে অবস্থান করছেন।

দিলওয়ার

প্র : দিলওয়ার কত তারিখে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তিনি ১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারি সিলেটের সুরমা সদীর দক্ষিণে তার্থখলায় জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তাঁর মাতা-পিতা ও স্ত্রীর নাম কী?
উ : মাতার নাম রহিমুন্নেছা, পিতার নাম মোহাম্মদ হাসান খান। তিনি দুই বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রী আনিসা খাতুন, দ্বিতীয় স্ত্রী ওয়ারিসা খাতুন।
প্র : তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?
উ : তিনি ১৯৫২ সালে প্রবেশিকা ও ১৯৫৪ সালে সিলেট এম.সি. কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন।
প্র : তাঁর প্রথম কবিতা কোথায়, কবে ছাপা হয়?
উ : সিলেটের সাপ্তাহিক 'যুগভেরী' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। নাম: 'সাইফুল্লাহ হে নজরুল'।
প্র : দিলওয়ারের প্রকৃত নাম কী?
উ : প্রকৃত নাম দিলওয়ার খান। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯৫৩) দিলওয়ার খান নামেই লেখেন। এর পরে তিনি নামের শেষের 'খান' শব্দ বাদ দেন।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'জিজ্ঞাসা' কাব্যগ্রন্থই তাঁর প্রথম গ্রন্থ।
প্র : দিলওয়ার রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।
উ : কবিতা গ্রন্থ : 'জিজ্ঞাসা' (১৯৫৩); 'ঐকতান' (১৯৬৪); 'উদ্ভিন্ন উল্লাস' (১৯৭২); 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' (১৯৮৩)। গানের বই : 'পূবাল হাওয়া' (১৯৬৫); 'বাংলা তোমার আমার' (১৯৭২)। শিশু-সাহিত্য : 'দিলওয়ারের শতছড়া' (১৯৮৯); 'ছড়ায় অআ কখ' (১৯৯৪)।
প্র : দিলওয়ার কোন ধারার লেখক?
উ : প্রথম জীবনে তিনি জাতীয় জীবন ঘেঁষা ও বিপ্লবী লেখা লিখেছেন। পরে নিজ এলাকা সিলেটে থিতু হন এবং

লেখাতেও জাতীয় জীবনের ভাব কমে আসে। জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণের চেয়ে আঞ্চলিক জীবনেই তিনি শেষ দিকে অংশ নিয়েছেন। চেতনাগত দিক থেকেও বিপ্লবীপণার চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় ঠাঁই নিয়েছিলেন তিনি।

প্র : তিনি প্রধান কী কী পুরস্কার পেয়েছেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), লন্ডনে সিলেট সেন্টারে সংবর্ধনা (১৯৮৭) ইত্যাদি।

প্র : কবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন?

উ : সিলেটের ভার্থখলার নিজ বাড়িতে তিনি ১০ই অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উ : জাতিসত্তার শোণিত এবং অস্থি আমরা আমাদের অস্তিত্বে ধারণ করে আছি, এখানে সে কথাই আলংকারিক ভাষায় কবি ব্যক্ত করেছেন।

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯৮১ সালে সিলেট থেকে।

প্র : 'রক্তে আমার অনাদি অস্থি' কবিতাটির মূল আলোচ্য বিষয় কী?

উ : সাগরদুহিতা ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের বন্দনাই কবিতাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

প্র : কবি কোন নদীর যৌবন কামনা করেছেন?

উ : পদ্মা নদীর।

প্র : কবি কোন নদীর প্রেম কামনা করেছেন?

উ : যমুনা নদীর।

প্র : কার কাজল বুকে পলি রয়েছে?

উ : সুরমা নদীর কাজল বুকে।

প্র : সুরমার কাজল বুকের পলিতে কী দেখা যায়?

উ : গলিত হেম।

প্র : 'গলিত হেম' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : গলিত হেম বলতে আমাদের দেশের গলিত সোনা মেশানো পলিমাটির কথা বলা হয়েছে। পলিমাটির উর্বরতাকে গলিত সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্র : কিসের বুকে কবি নিরবধি গণমানবের তুলি?

উ : পদ্মা, যমুনা, সুরমা, মেঘনা, গঙ্গা ও কর্ণফুলী নদীর বুকে।

প্র : জীবনের রং কেমন?

উ : অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ।

প্র : মুগ্ধমরণ কোথায় ঘুরে?

উ : মুগ্ধমরণ জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘুরে।

প্র : কবি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে কোথায় রেখেছেন?

উ : বঙ্গোপসাগরে কবি তাঁর প্রাণ স্বপ্নকে রেখেছেন।

প্র : কবি তাঁর ক্রোধকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উ : ভয়াল ঘূর্ণির সঙ্গে।

প্র : কার উপমা নেই বলে কবি মত প্রকাশ করেছেন?

উ : ভয়াল ঘূর্ণির মতো কবি তাঁর ক্রোধের কোনো তুলনা নেই বলে মত প্রকাশ করেছেন।

প্র : ক্রোধে কারা জ্বলে?

উ : স্বজনরা।

প্র : 'নরদানব' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

উ : মানুষরূপী বিদেশি নরপিশাচদের বোঝানো হয়েছে। যারা নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের সম্পদকে লুটে নিচ্ছে।

প্র : 'প্রাণের জাহাজ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : আমাদের দেশের জনসম্পদকে প্রাণের জাহাজ বলা হয়েছে।

প্র : গণমানব কারা?

উ : গণমানব বলতে প্রান্তিক জনগণকে বোঝানো হয়েছে।

দিলারা হাসেম

প্র : দিলারা হাসেম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৬ সালের ২৫শে অগস্ট, যশোরে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক। তবে কর্মজীবনে ভয়েস অব আমেরিকা (বাংলা বিভাগ), ওয়াশিংটন-এর অনুষ্ঠান প্রযোজক ও ব্রডকাস্টার হিসেবে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?

উ : উপন্যাস : ঘর মন জানালা (১৯৬৫), একদা এবং অনন্ত (১৯৭২), স্তব্ধতার কানে কানে (১৯৭৭), আমলকির মৌ (১৯৭৮), কাকতালীয় (১৯৮৫), শব্দ করাত (১৯৯৫), অনুক্ত পদাবলী (১৯৯৮), সদর অন্দর (১৯৯৮)। গল্প : হলদে পাখীর কান্না (১৯৭০), সিন্ধু পারের উপাখ্যান (১৯৮৮), নায়ক (১৯৮৯)। কবিতা : ফেরারী (১৯৭৭)।

প্র : 'একদা এবং অনন্ত' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : অভাবের সর্বগ্রাসী অগ্রাসনে মানুষ হারিয়ে ফেলে নৈতিকতা। হারিয়ে ফেলে আভিজাত্যের গরিমা, পাপ পুণ্যের ব্যবধান। 'তবে কি সব ইচ্ছের কবর দেয়ার নামই ভাল থাকা?' এই প্রশ্ন পাঠক সমাজে রেখে দিলারা হাশেমের রচিত 'একদা এবং অনন্ত' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। আর এই উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে প্রেম, বাৎসল্য, সংস্কার, নীতি, ভালবাসা, ত্যাগ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কান্না ইত্যাদি।

প্র : 'আমলকির মৌ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, ক্রোধ, বাস্তবতা, নিঃসঙ্গতা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তির জটিল আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া সারা, মতিন, মাজেদা, সালেহা, সকিনা ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে দিলারা হাশেম রচনা করলেন 'আমলকির মৌ'। যা মনঃসমীক্ষণের উল্লেখযোগ্য দলিল। এই উপন্যাসটি প্রকাশ হয় ১৯৭৮ সালে।

প্র : 'আমলকি'র সঠিক বানান কী?

উ : আমলকী; তেমনি হরীতকী'।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬), শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার, উত্তর আমেরিকা কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৪), শিকাগো সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্র : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর জন্মতারিখ জানো?

উ : ১৯শে জুলাই, ১৮৬৩।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

প্র : তিনি কী নামে পরিচিত?

উ : ডি.এল. রায়।

প্র : তাঁর ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত প্রথম কাব্যের নাম কী?

উ : আর্যগাথা (১৮৮২)।

প্র : তাঁর রচিত ইংরেজি কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : Lyrics of Ind.

প্র : তিনি কী কী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : কবি, নাট্যকার ও গীতিকার।

প্র : বাংলা নাটকে তাঁর প্রথম কৃতিত্ব কী?

উ : সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টিতে।

প্র : তাঁর রচিত সার্থক ঐতিহাসিক নাটক কী?

উ : সাজাহান (১৯০৯) (যেটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে)।

প্র : সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে অনেকেই নাটক লিখেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম কে সাজাহানকে নিয়ে নাটক লিখেন।

উ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্র : তিনি কী হিসেবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন?

উ : গীতিকার ও সুরকার হিসেবে।

প্র : তিনি কোন বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন?

উ : পূর্ণিমা সম্মিলন (১৯০৫)।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো কী?

উ : আর্যগাথা (১ম ভাগ ১৮৮২, ২য় ভাগ ১৮৯৩), মন্দ্র (১৯০২), আলেখ্য (১৯০৭), ত্রিবেণী (১৯১২) ইত্যাদি।

প্র : 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটির রচয়িতা কে?

উ : ডি. এল. রায়।

প্র : এটি তাঁর কোন নাটকে ছিল?

উ : 'সাজাহান' নাটকে এই গান ছিল।

প্র : তাঁর রচিত ব্যঙ্গ কবিতাগুলো কী?

উ : আষাঢ়ে (১৮৯৯), হাসির গান (১৯০০)

2020/5/12 21:28

প্র : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী?

উ : পাষাণী (১৯০০)।

প্র : তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটক কী কী?

উ : প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯১৫), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)।

প্র : 'সাজাহান' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : 'সাজাহান' (১৯০৯) মোগল সম্রাট সাজাহানের জীবন অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। নায়কের করুণ জীবন নাটকটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম মাইলফলক নাটক 'সাজাহান'। সংলাপের আড়ম্বর, বাকশৈলীর বর্ণাঢ্যতা, আবেগের প্রচণ্ডতা ও ঘটনার অতি-নাটকীয়তা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সম্রাট সাজাহানকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম নাটক লেখেন।

প্র : 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) জনপ্রিয় নাটক। গ্রিক-ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্তকে এই নাটকের পটভূমি করা হয়েছে। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র চাণক্যের মধ্যে কাঠিন্য এবং কোমলতার বিপরীত সমাবেশ, দেশপ্রেমের উদ্দীপ্তি এবং ভাষার আড়ম্বর এই তিনদিক থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাসে 'চন্দ্রগুপ্ত' বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

প্র : তাঁর রচিত সামাজিক নাটকগুলোর নাম কি?

উ : পরপারে (১৯১২), বঙ্গনারী (১০১৬), নকশা ও প্রহসন : এক ঘরে (১৮৮৯), কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ব্রাহস্পর্শ (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), পুনর্জন্ম (১৯১১), আনন্দ বিদায় (১৯১২)।

প্র : তাঁর রচিত রোমান্টিক পৌরাণিক নাটক কী কী?

উ : চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), সিংহল বিজয় (১৯১৬)

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ১৭ই মে, ১৯১৩।

দীনবন্ধু মিত্র

প্র : দীনবন্ধু মিত্রের জন্মসাল কবে?

উ : ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : চৌবেড়িয়া গ্রাম, নদীয়া।

প্র : তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু কী দিয়ে?

উ : কবিতা দিয়ে।

প্র : তিনি কার অনুপ্রেরণায় কবিতা লিখেন?

উ : ঈশ্বর গুপ্তের।

প্র : তাঁর কবিতা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ পায়?

উ : সংবাদ প্রভাকর (১৯৩১), সংবাদ সাধু রঞ্জন (১৮৪৭)।

প্র : তাঁর রচিত জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ কী?

উ : সুরধুনী কাব্য (১ম ভাগ ১৮৭১ ও ২য় ভাগ ১৮৭৬) ও দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

প্র : দীনবন্ধু মিত্র কোন রূপে সর্বাধিক খ্যাত?

উ : নাট্যকার রূপে।

প্র : নীলকর সাহেবদের শ্বীকৃত অত্যাচারে ক্লান্তিত নীল চাষিদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকের নাম কী?

উ : নীল-দর্পণ (১৮৬০)।

প্র : নীল-দর্পণকে বাংলাদেশের নাটক বলা হয় কেন?

উ : কারণ, নাটকটির কাহিনি যেহেতু অঞ্চলের, দীনবন্ধু ঢাকায় অবস্থানকালে এ রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে এবং প্রথম মঞ্চস্থও হয় ঢাকাতে।

প্র : নীল-দর্পণ নাটকের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরেজিতে অনুবাদের নাম কী?

উ : Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror (1861)

প্র : মধুসূদন কোন ছদ্মনামে এই অনুবাদ করেন?

উ : A Native.

প্র : তিনি আর কী রচনা করে দক্ষতার পরিচয় দেন?

উ : প্রহসন।

প্র : ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসন কী?

উ : সধবার একাদশী (১৮৬৬)।

প্র : সমকালের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম কী?

উ : বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)।

প্র : তাঁর রচিত অপরাপর নাটকগুলোর নাম কী কী?

উ : জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।

প্র : 'নীল-দর্পণ' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) নাটকটির ঘটনা, বিন্যাস, রচনাস্থান, প্রকাশস্থান, মুদ্রণালয়, প্রথম মঞ্চায়ন সবই বাংলাদেশে। প্রথম প্রকাশের সময় দীনবন্ধুর নাম ছিল না। 'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-রোদনকরণ-কেনচিৎ পথিকেনাদি প্রণীতম' এই দীর্ঘ প্রচ্ছদে গ্রন্থকারের নাম গুপ্ত রাখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নীলকরদের প্রভাবে নীড়িত সাধারণ কৃষক-জীবনের মর্মন্তুদ ছবি নাটকটিতে প্রকাশিত হয়। এটির ইংরেজি অনুবাদ করেন মধুসূদন দত্ত এবং তা প্রকাশ করেন রেভারেন্ড জেমস্ লঙ। নাটকের বাস্তবতা এবং চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার গুণের জন্য অনেকেই নীল-দর্পণকে Uncle Tom's Cabin-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য চরিত্র : গোলক বসু, সবীন মাধব, রাইচরণ, তোরাপ, সাবিত্রী, সরলতা, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।

প্র : 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি একশ্রেণির যুবকের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। 'সধবার একাদশী' সেই সামাজিক বিপর্যয়ের কাহিনি। নায়ক নিমচাঁদের জীবনে প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থতা, অধঃপতন বোধ ও আত্মগ্লানি নাটকটিতে এক গভীর মাত্রা যোজনা করেছে। চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, ঘটনাপ্রবাহ, কৌতুক সবকিছুর মিলিতরূপে 'সধবার একাদশী' বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় রচনা। এই নাটকের নায়ক নিমে দত্ত বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় চরিত্র। বলা হয়, কেনারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণির নৈতিক অবস্থান এবং বিচার ব্যবস্থার হাস্যকর পরিচয় ফুটে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : নীলকমল, ভদ্রার্জুন, পিসি, কেনারাম, অক্রূর সংবাদ, হিপি, ক্ষেত্রমণি ইত্যাদি।

প্র : নীল-দর্পণ যে কি ঐতিহাসিক নাটক তার রায়?

উ : নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনিসূত্র সমকাল ঘটনাকেন্দ্রিক। দূরের নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিশ্বাসকুল ধ্বংস ও সোরাপাড়া গ্রামের হিন্দুর বিশ্বাসের নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কাহিনি এই নাটকের প্রেক্ষাপটে। এদিক থেকে নাটকটি একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে নীলবন্ধ তাই একে ঠিক ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।

প্র : নীল-দর্পণ নাটকের কী কী ত্রুটি সমালোচকেরা নির্দেশ করে থাকেন?

উ : নীল-দর্পণ নাটকের প্রধান ত্রুটি তার নাটকীয়তা। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর ঘনঘটা স্টানিশ ট্র্যাজেডির মতো শ্বীকৃত হয় সন্ধার করে। দ্বিতীয় ত্রুটি অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রগুলির সংলাপের বৃদ্ধিমত্তা, অযথা শব্দবহুল সাধুরীতির ভাষা নিতান্ত বুদ্ধির হয়ে পড়েছে।

প্র : নীল-দর্পণ নাটককে ট্র্যাজেডি বলা যায় কি?

উ : নীল-দর্পণ নাটক সেই অর্থে ট্র্যাজেডি নয়। কারণ এই নাটকে কোনো নায়ক চরিত্র ভুল-ত্রুটি হেতু মুখবন্ধ পরিণতির জন্য দায়ী নয়। দর্শকচিত্তে ট্র্যাজেডিসুলভ Pity-Fear না নাটকের ট্রাজিক কলসনে সৃষ্টি করতে মৃত্যুর ঘটনার বাহুল্য সৃষ্টি করে তদ্রূপ রস সৃষ্টি করেছেন। একে বলে মেলোড্রামা বলা হয়।

প্র : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরিচয় দাও।

উ : 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) হাস্যরসাত্মক নাটক। ক্ষীরোদচন্দ্র লিখেছিলেন যে এই নাটক কোনো 'জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।' ১৮৭২ সালে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : নসিরাম, রতা, রাজীব, রাজমণি, কেশব, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি।

প্র : 'জামাইবারিক' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জামাইবারিক' (১৮৭২) হাস্যরসাত্মক নাটক। ১৮৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর

কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'জামাই বারিকের দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।' নাটকটির ঘটনা সংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি এবং সংলাপ রচনা বহু প্রশংসিত। এই নাটকের অন্তর্গত বিন্দুবাসিনী ও বগলার কলহ দৃশ্যটি ১৯২৬ সালে 'জেনানাযুদ্ধ' নামে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : বিজাবল্লভ, অভয়কুমার, কামিনী, বগলা, বিন্দুবাসিনী ইত্যাদি।

প্র : 'কমলেকামিনী' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কমলেকামিনী' (১৮৭৩) দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশেষ নাটক। এই নাটকের পটভূমি কাছাড় অঞ্চল। চরিত্রগুলি সবই অভিজাত বংশীয় তবে দুর্বল। ২০ শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ তারিখে নাটকটি ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রাজা, সমরকেতু, শশাঙ্কশেখর, গান্ধারী, সুশীলা, সুরবালা।

প্র : দীনবন্ধু মিত্র কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১লা নবেম্বর, ১৮৭৩।

দীনেশচন্দ্র সেন

প্র : দীনেশচন্দ্র সেনের জন্মতারিখ কত?

উ : ৩রা নবেম্বর, ১৮৬৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মাতুলালয়, বগজুড়ি গ্রামে, ঢাকা জেলা।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : সুয়াপুর গ্রাম, ঢাকা।

প্র : তিনি পল্লিঅঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কী সংগ্রহ করেন?

উ : প্রাচীন বাংলা পুথি ও লোককথা।

প্র : তিনি তাঁর সংগৃহীত পুঁথি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কী রচনা করেন?

উ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)।

প্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মূলত কী?

উ : বাংলা সাহিত্যের সুশৃঙ্খল ও তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাসমূলক গ্রন্থ।

প্র : কোনগ্রন্থ প্রকাশিত হলে পাশ্চাত্যের বহু মনীষীর কাছ থেকে তিনি ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন?

উ : 'History of Bengali Language and literature' (১৯১১)।

প্র : তাঁর রচিত আর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ কোনটি?

উ : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১৯১৪)।

প্র : তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে কী লাভ করেন?

উ : রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ (১৯১৩)।

প্র : তিনি কী সম্পাদনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা (১৯২৩), পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬)।

প্র : কাকে নিয়োগ করে তিনি এই গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন?

উ : চন্দ্রকুমার দে।

প্র : এ ধরনের কাজে তিনি আর কাকে নিয়োগ করেছিলেন?

উ : কবি জসীম উদ্‌দীনকে।

প্র : 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বৃহৎবঙ্গ' (দুই খণ্ডে প্রকাশিত ১৯৩৫) সুপ্রাচীনকাল হতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে লিখিত গ্রন্থ। 'বৃহৎবঙ্গ' বহু তথ্য সম্বলিত এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ রচনা। নিরপেক্ষভাবে তথ্য প্রদানের জন্য গ্রন্থটি সর্বমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

প্র : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ। বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি, সংস্কৃত-প্রাকৃত ও বাংলার সম্পর্ক, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের ধর্মগোষ্ঠী ও তাদের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ইত্যাদি বিষয়ের মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এই গ্রন্থে। ইংরেজ-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের এমন বিশারদ এবং অনুরাগপূর্ণ ইতিহাস ইতোপূর্বে রচিত হয় নি। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ যেখানে সাহিত্য ও সমাজের গূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়।

প্র : পূর্ববঙ্গ/মৈমনসিংহ-গীতিকার পরিচয় দাও।

উ : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল, বিশেষত ময়মনসিংহ থেকে চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত। গীতিকাগুলি ১৯২৩ সালে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন এর সম্পাদক। আরও কয়েকটি খণ্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ড (১৯২৬), ৩য় খণ্ড (১৯৩০), ৪র্থ খণ্ড (১৯৩২)। এই সমগ্র গীতিকা সংকলনই 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'। এই গীতিকাগুলি Eastern Bengal Ballads নামে (১৯২৩-৩২) চারখণ্ডে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। কাহিনিগুলির প্রাচীনত্ব যেমনই হোক, সাহিত্যিক মূল্য যথেষ্ট। এই কাহিনিগুলির বৈচিত্র্য সারল্য এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা একমত। এখানে সম্পূর্ণভাবে মানুষের কথাই বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ নেই। এমনকি এদের কাঠামোও মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকে পৃথক।

প্র : তিনি কী কী ডিগ্রি, পদক ও উপাধি লাভ করেন?

উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.লিট. ডিগ্রি (১৯২১), জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৩১) ও ভারত সরকার কর্তৃক রায় বাহাদুর (১৯২১) উপাধি।

প্র : তিনি কোনগ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন?

উ : 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০শে নবেম্বর ১৯৩৯; বেহালার 'রূপেশ্বর' ভবনে।

দোম আন্তোনিয়ো

প্র : দোম আন্তোনিয়োর জীবনকাল কোন শতকে?

উ : ১৭শ শতকের শেষার্ধ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারক।

প্র : তাঁর পুরো নাম কী?

উ : দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো।

প্র : তিনি কোন রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন?

উ : তৎকালীন যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ঘুষণা রাজ্যের।

প্র : কার দ্বারা তিনি খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন?

উ : ধর্মযাজক আন্তনি কর্তৃক।

প্র : তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য কোথায় মিশন স্থাপন করেন?

উ : কোনাডাঙ্গা নামক স্থানে।

প্র : তিনি কোথাকার খ্রিষ্ট ধর্মের আলি প্রবর্তক?

উ : ভাওয়ালের।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কী?

উ : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'।

প্র : 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বাঙালি খ্রিষ্টান দোম আন্তোনিয়ো রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' (১৭৩৫) একটি ধর্মীয় বিতর্কমূলক গ্রন্থ। এক ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের মধ্যে ধর্মালোচনা ও হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রমাণ এই কথোপকথন জাতীয় রচনার মূল বিষয়। এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পর্তুগালে এভোরা শহরের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত। গ্রন্থটি মনোএল দা আসুম্পসাঁও নামক এক পর্তুগিজ পাদ্রি কর্তৃক পর্তুগিজ ভাষায় অনূদিত হয়।

প্র : তাঁর রচিত বইটি কে সম্পাদনা করেন?

উ : সুরেন্দ্রনাথ সেন (১৯৩৭)।

প্র : এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এই গ্রন্থটি কোনো বাঙালি রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। অবশ্য বাংলা লিপিতে তখনও মুদ্রণ হয় না। তাই ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে রোমান বর্ণমালায় এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থের সঙ্গে আরো দুটি বাংলা গ্রন্থ রোমান লিপিতে ছাপা হয়। এগুলো হচ্ছে : মনোএল দা আসসম্পুসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লাই পোরতুগিজ। মনোএল বাঙালি ছিলেন না।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা

প্র : নওয়াব ফয়জুন্নেসা কে ছিলেন?
উ : নওয়াব ফয়জুন্নেসা ত্রিপুরার পশ্চিমাঞ্চলে (বর্তমান নাকসাম) এক সামন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী-কন্যা বর্তমান মুহম্মদ গাজি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁকে তাঁর মাতা বিয়ে দেন। ফলে নাস্পতা জীবন বিষময় ও সন্তানসহ বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

প্র : তাঁর জীবনকাল কত?
উ : জন্ম ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯০৩।
প্র : নওয়াব উপাধি কিভাবে পেলেন?
উ : তিনি দানশীল ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার এজন্য তাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করে।
প্র : এই উপাধি প্রাপ্ত নারীদের মধ্যে তার স্থান কত?
উ : বাংলাদেশে তিনি একমাত্র মহিলা যিনি এই উপাধি পান।
প্র : তাঁর একমাত্র সাহিত্যকীর্তি কী?
উ : 'রূপজালাল' নামক গ্রন্থ।
প্র : এই গ্রন্থটির ধরন কী?
উ : গদ্য ও কবিতায় রচিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।
প্র : কত সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়?
উ : ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।

নবীনচন্দ্র সেন

প্র : নবীনচন্দ্র সেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তিনি কোথায় শিক্ষালাভ করেন?
উ : ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ. এ. এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্সটিটিউশন থেকে ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. পাস করেন।
প্র : তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে লেখ।
উ : বি. এ. পাস করেই তিনি বিখ্যাত হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। তিনি ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি করেন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন।
প্র : স্বল্পায়ুতায় কোন পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়?
উ : প্যারীচরণ সরকার সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'।
প্র : 'অবকাশরঞ্জনী' তাঁর কোন জাতীয় কাব্যগ্রন্থ?
উ : দেশপ্রেম ও আত্মচিন্তামূলক।
প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : 'অবকাশরঞ্জনী'।
প্র : 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) তাঁর কোন ধরনের কাব্যগ্রন্থ?
উ : ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্য।
প্র : তিনি যে ত্রয়ীকাব্য রচনা করেছেন সেগুলোর নাম কী?
উ : রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)।
প্র : এই তিনটি কাব্যকে ত্রয়ীকাব্য বলা হয় কেন?
উ : কারণ, এই তিনটি কাব্যের কাহিনি একই সুতোয় বাঁধা। এই তিনটি কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। রৈবতক-এ কৃষ্ণের আদি, কুরুক্ষেত্র-এ তাঁর মধ্য, প্রভাস-এ কৃষ্ণের অন্তলীলা বর্ণিত হয়েছে।
প্র : নবীনচন্দ্র কি মহাকাব্য রচনা করেছেন?
উ : ঠিক মহাকাব্য যাকে বলে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে, তাঁর রচিত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস একত্রে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
প্র : নবীনচন্দ্র সেন রচিত আত্মজীবনীর নাম কী?
উ : আমারজীবন। এই গ্রন্থটি এই লেখক সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসের অন্যতম আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য।
প্র : নবীনচন্দ্র সেন রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।
উ : ক্রিওপেট্রা, ভানুমতী, প্রবাসের পত্র, খৃষ্ট ও অমিতাভ, গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ।

প্র : গ্রন্থ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?
উ : অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদী। মিত্র ও ঘোষের জীবনী লেখার পর হযরত মুহম্মদের জীবনী লেখার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন। তবে তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি।

নরেন বিশ্বাস

প্র : নরেন বিশ্বাস কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯শে নবেম্বর ১৯৪৫, মাকিগাতি, খোপাগাছা।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : অধ্যাপক ও আবৃত্তিকার।
প্র : বাংলাদেশে আবৃত্তিগুরু কাকে বলা হয়?
উ : নরেন বিশ্বাসকে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রবন্ধ : অন্বেষা (১৯৭৬), কাব্যতত্ত্ব অন্বেষা (১৯৮২), প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা (১৯৮৫), ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব (১৯৮৫)।
প্র : তিনি কোন গ্রন্থটি সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
উ : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'বাংলা উচ্চারণ অভিধান' (১৯৮৯)।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৮।
প্র : মৃত্যু-উত্তর তাঁর দেহ কী করা হয়?
উ : তাঁর ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যুর পর দেহ প্রদান করা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজকে।

নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেড

প্র : নাথিনিয়েল ব্রাশি হ্যালহেডের জন্মতারিখ কবে?
উ : ২৫শে মে, ১৭৫১।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ওয়েস্টমিনিস্টার, অক্সফোর্ড।
প্র : তিনি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি কেন?
উ : বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ রচয়িতা বলে।
প্র : তাঁর ব্যাকরণের নাম কী?
উ : 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল লাঙ্গুয়েজ' (১৭৭৮)।
প্র : এই ব্যাকরণ কেমন ছিল?
উ : এটি বাংলা ভাষার প্রথম ও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত ইংরেজি ভাষায় রচিত। তবে দৃষ্টান্ত দেবার সময় এর কিছু অংশ বাংলা লিপিতে মুদ্রিত হয়।
প্র : বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ কোনটি?
উ : এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল লাঙ্গুয়েজ।
প্র : তিনি স্বল্পায়ুতায় কী কী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন?
উ : আরবি ও পার্সি ভাষা।
প্র : তিনি তৎকালীন বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের উপদেশে কী করেন?
উ : হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্ত সার 'A Code of Gentoo Laws' অনুবাদ।
প্র : তিনি অবসর মুহূর্তে কী করতেন?
উ : কবিতা রচনা।
প্র : তাঁর রচিত বহু রচনা কোথায় প্রকাশিত হয়?
উ : 'মর্নিং ক্রনিকল' এ।
প্র : তিনি কত তারিখ মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৮ই ডেসেম্বর, ১৮৩০।

নির্মলেন্দু গুণ

প্র : নির্মলেন্দু গুণ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২১শে জুন ১৯৪৫, কাশবন, নেত্রকোনা।
প্র : তাঁর সম্পূর্ণ নাম কী?
উ : নির্মলেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী।
প্র : তাঁর ডাকনাম কী?
উ : রতন। প্রিয়জনেরা 'রতু' বলে ডাকেন।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কবি।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : কবিতা : প্রেমাঙ্কের রক্ত চাই (১৯৭০), না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী (১৯৭৪), ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষাভুষার কাব্য (১৯৮১), পৃথিবীজোড়া গান (১৯৮২), দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩), ইসক্রা (১৯৮৪;

মুজিব-লেনিন-ইন্দিরা (১৯৮৪), সেই কেন সেই পাখি (১৯৮৫), চিরকালের বাঁশি (১৯৮৬), দুঃখ কোরো না, বাঁচো (১৯৮৭), শিরায় বাংলাদেশ (১৯৯৮), ইয়াহিয়াকাল (১৯৯৮), মুঠোফোনের কাব্য (২০০৩), চির অনাবৃতা হে নগ্নতমা (২০০৫), নিশিকান্যা (২০০৬), কামকানন (২০০৭) ইত্যাদি।

অনুবাদ কবিতা : রক্ত আর ফুলগুলি (মূলঃ তোহু, ১৯৮৩), রাজনৈতিক কবিতা (১৯৮৬), কাব্যসমগ্র (১৯৯২)।

ছোটগল্প : আপনজনের মানুষ (১৯৭৬), অন্তর্জলি (২০০৫)।

কিশোর উপন্যাস : কালো মেলা (১৯৮২), বাবা যখন ছোট ছিলেন (১৯৯৭)।

ভ্রমণ কাহিনি : ভলগার তীরে (১৯৮৫), গীতসাধারণির সঙ্গে (১৯৯৪), আমেরিকায় ঝুলনখেলার স্মৃতি (১৯৯৬), ব্রাজি লেশে লেশে (২০০৪)।

প্র : কাকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলে?

উ : নির্মলেন্দু গুণকে।

প্র : কেন নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয়?

উ : নির্মলেন্দু গুণ গত শতাব্দীর ষাটের দশকে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পরের দশকেই তাঁর কবিতা এতোটা প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে যে, তরুণেরা তাঁর কবিতা দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন, অনেকে তাঁর কবিতা পড়েই মনে কবি হবার আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। বাংলাদেশের আর কোনো কবি অনুজ কবিদের ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের অনেক প্রতিষ্ঠিত কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রভাবেই কবি হয়েছেন। পরের দশকেও এই প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল। আজকেও এই কবির প্রভাব অল্প-বিস্তর তরুণ কবিসমাজকে প্রভাবিত করে। তাই নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেশের কবিদের কবি বলা হয়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৭), আবুল মনসুর আহমদ পুরস্কার (২০০০), একুশে পদক (২০০১), কবিতা পরিষদ পুরস্কার (২০০৪)।

প্র : তিনি নিজ গ্রামে যে স্কুল স্থাপন করেন তার নাম কী?

উ : কাশবন বিদ্যানিকেতন।

প্র : কত সালে, কোথায় তাঁর অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়?

উ : নির্মলেন্দু গুণ কবিতার পাশাপাশি শখবশত ছবি আঁকেন। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় শাদকিন গ্যালারি প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের মনে থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : নির্মলেন্দু গুণ 'একটি কবিতা লেখা হয়' বলে কোন কবিতার কথা বুঝিয়েছেন?

উ : প্রচলিত অর্থে এটি কবিতা নয়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। কবি এই ভাষণকেই কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্র : 'জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে' কী?

উ : সমুদ্রের তীরে যেমন গাছগাছড়ার 'বাগান' থাকে, কবি জনসভায় আয়োজিত লোকসমাগমকে সেই বাগানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই পরে যখন তিনি বলেন: 'উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না, রেসকোর্স ময়দানের জন-উদ্যানের বদলে এবার বৃক্ষ-উদ্যানকে তিনি বোঝাচ্ছেন।

প্র : বিকেলকে কবি তপ্তাচ্ছন্ন ও বিবর্ণ বলেছেন কেন?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের বিকেল জনতার হাতে ও মাথায় লাল কাপড়, বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মুখর ছিল। সে তুলনায় এখকার যে-কোনো দিন কবির কাছে অনেক বেশি বর্ণহীন ও আবেগহীন মনে হয়।

প্র : রেসকোর্স ময়দানকে 'ঢাকার হৃদয়' বলা হয়েছে কেন?

উ : রমনা রেসকোর্স ময়দান ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এটি ছিল বৃক্ষশূন্য সমতল মাঠ। পৃথিবীর বড় বড় শহরের মাঝখানে এমন ফাঁকা মাঠ আছে; যুরোপিতে যাকে Esplanade বলে। নাগরিক যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে মানুষ প্রায়ই এখানে মাঠে ঘুলিকের আশ্রয় নেয়। এটির অবস্থান সেন্ট্রের হৃদপিণ্ডের মতোই। ঢাকারও এমন মাঠ ছিল একদিন। রমনার রেসকোর্স ময়দান। কবি এই মাঠকেই হৃদয় তুলনা করেছেন 'ঢাকার হৃদপিণ্ড' বলে।

প্র : 'লেনিনের সব স্মৃতি'– কোন দিনের স্মৃতি?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের।

প্র : 'প্রথাগত শিশু' কে?

উ : প্রথাগত অর্থ যার আগমন এখনো হয় নি, ভবিষ্যতের প্রজন্ম অর্থে।

প্র : এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার চরণকে পুনঃসৃজন করা হয়েছে– কোনটি?

উ : 'কথা' কাব্যগ্রন্থের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার "... তবু, তখনি পলকে / তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।" চরণসমূহ পুনঃসৃজনের মাধ্যমে নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন: 'তখন পলকে দারুণ ঝলকে / তরীতে উঠিল জল,।' লক্ষণীয়, নির্মলেন্দু গুণ এখানে রবীন্দ্রনাথ লিখিত ক্রিয়াপদের সাধুরূপ অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের রূপটি রেসকোর্সে প্রতিবিম্বিত করেছেন। এ এক আধুনিক কাব্যকৌশল।

প্র : এই কবিতায় বিষ্ণু দে-র একটি কবিতার চরণকে পুনঃসৃজন করা হয়েছে– কোনটি?

উ : বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ঘোড়সওয়ার'-এ কবি কবিতা খানিকটা হতাশ। তিনি একজন নায়ককে প্রত্যাশা করছেন এই হতাশা থেকে পরিত্রাণের জন্য। নির্মলেন্দু গুণ যেন সেই নায়কের দেখা পেয়েছেন। তাই তিনি বিষ্ণু দে-র :'জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার, / হৃদয়ে আমার চড়া।' এই চরণগুলোর বিপরীতে লেখেন: 'হৃদয়ে লাগির দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল ঢেউয়ের / সফেন কল্লোল।' অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র কবিতার নায়ক যে-হতাশা থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, নির্মলেন্দু গুণের কবিতার নায়ক সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাই তিনি বলতে পারেন: 'আমার হৃদয়ে আজ জোয়ার এসেছে।'

প্র : 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের [– অর্থ কী?

উ : ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণ-পর্বত অংশে বাঙালির মনে 'স্বাধীনতা' শব্দটি স্বাধীনতা এই শব্দ ছিল। কিন্তু ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও 'স্বাধীনতা' উচ্চারণের মধ্যে সমগ্র বাঙালির কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু যাবে না তারা।

নীলিমা ইব্রাহিম

প্র : নীলিমা ইব্রাহিম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১১ই জানুয়ারি ১৯২১; খুলনায়।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : প্রবন্ধ-গবেষণা : শরৎ প্রতিভা (১৯৮০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ ও বাংলার নাটক (১৯৬৪), বাঙালী মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭), অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভাষণাশ্রয়ী কন্যা আমি (১৯৯৫), আমি বীরাঙ্গনা বলছি (১৯৯৬)। গল্প : যমুনা পর্কে (১৯৬৪)। উপন্যাস : বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), এক পথ দুই বাঁক (১৯৫৮), কেয়া বন সঞ্চারিণী (১৯৬২), বহ্নিবলয় (১৯৮৫)। নাটক : দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদজ্বালা বিকেল (১৯৭৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)। আত্মজীবনী : বিন্দু বিসর্গ (১৯৯১)।

প্র : 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার

যেসব নারী কোনো না কোনোভাবে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সেইসব যুদ্ধাহত কয়েকজনের সত্যকাহিনিনির্ভর জীবন ইতিহাস 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'। যাদের দুঃখের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা হলেন- তারা ব্যানার্জি, মেহেরজান, রীনা, পেফা, ময়না, ফাতেমা, মীনা। তবে লেখকের বর্ণনাতে এই কাহিনি কেবল সাতজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি তা হয়ে উঠেছে দুলক্ষ মা-বোনের প্রতিনিধি। বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মহিমাময় ভূমিকা, হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অপকীর্তি ইত্যাদি।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জয়বাংলা পুরস্কার ভারত (১৯৭৩), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৯), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুন।

নুরুল মোমেন

প্র : নুরুল মোমেন কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ২৫শে নবেম্বর, ১৯০৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বুড়োইচ গ্রাম, যশোর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : নাট্যকার।

প্র : তিনি কোন ধরনের নাট্যচরিত্র অঙ্কন করে খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : সামাজিক সঙ্কটের পটভূমিকায় অন্তর্দ্বন্দ্ব-মূলক নাট্যচরিত্র।

প্র : তাঁর রচিত নাটকগুলোর নাম কী?

উ : রূপান্তর (১৯৪৭), নেমেসিস (১৯৪৮), যদি এমন হতো (১৯৬০), নয়া খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২) শতকরা আশি (১৯৬৭), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭), যেমন ইচ্ছা তেমন (১৯৭০) ইত্যাদি।

প্র : নেমেসিস উল্লেখযোগ্য কেন?

উ : এক চরিত্র বিশিষ্ট এমন নাটক বাংলা সাহিত্যে কম বলে।

প্র : 'নেমেসিস' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : নুরুল মোমেনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস'। ১৯৩৯-'৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নুরুল মোমেন ১৯৪৪ সালে নাটকটি লেখেন এবং 'শনিবারের চিঠি' (সম্পাদক : সজনীকান্ত দাস) পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালে। নাটকটি স্কুল মাস্টার সুরজিত নন্দী নামের এক-চরিত্র বিশিষ্ট। অদৃশ্য চরিত্র হিসেবে আছে নৃপেন বোস, তার কন্যা সুলতা, ম্যানেজার অনীম, অমল বাবু, ইয়াকুব প্রমুখ। নেমেসিস (Nemesis) গ্রিক দেবী। এই দেবী প্রতিহিংসার এবং মানব নিয়তি তার হাতে। মানুষ ইচ্ছে করেও তা অতিক্রম করতে পারে না। এ নাটকে সুরজিত ইচ্ছে করেও ভাগ্য অতিক্রম করতে পারে নি। সুরজিতের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কার্যকর। শেষে সে মৃত্যুবরণ করে। এ নাটকে সমকালীন মূর্তিক, মজুতদারদের পিশাচবৃত্তি ও নিরন্নদের হাহাকারের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত।

প্র : নুরুল মোমেনের নাটক 'নয়া খান্দান' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নয়া খান্দান' নাটকটি ১৯৬১ সালে রচিত, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত। বংশমর্যাদা ও এ নিয়ে আভিজাত্যের প্রতি শ্লেষ ব্যক্ত হয়েছে এ নাটকে। নাট্যকার দেখিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে বংশমর্যাদার চেয়ে সুরুচিই বরং কাম্য। এই সুশিক্ষাই বর্তমান যুগের নতুন বা নয়া খান্দান (আভিজাত্য) হিসেবে বিবেচিত। এটি একটি কমেডি।

প্র : নুরুল মোমেনের নাটক 'আলোছায়া' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'আলোছায়া' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত একটি কমেডি। ভালোমন্দের প্রতীক আলোছায়া। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব ছিল, আছে। এর মধ্যে ভালো বা আলোর প্রভাব যার মধ্যে সে-ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে,

কালো বা ছায়ার প্রাধান্যধারীরা স্মরণযোগ্য হবেন না- এটাই নাটকের মূল বক্তব্য। হাম্মাদ জামিল, জাহানারা, সুলতান, পারভীন উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

প্র : তিনি আর কী রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন?

উ : রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে?

প্র : তাঁর রচিত রম্যগ্রন্থ কী কী?

উ : বহুরূপ (১৩৬৫), নরসুন্দর (১৯৬১), হিংটিং ছট (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭০)।

প্র : তিনি রচিত নাটকের জন্য কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১)।

প্র : নুরুল মোমেন কী কী পদক লাভ করেন?

উ : সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৭) ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক একুশের পদক (১৯৭৮)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০।

পঞ্চানন কর্মকার

প্র : পঞ্চানন কর্মকারের জীবনকাল কত?

উ : তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন তা না জানা গেলেও ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে।

প্র : তাঁকে কী বলা হয়?

উ : বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক।

প্র : কেন বলা হয়?

উ : কারণ, শ্রীরামপুরে যখন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলা মুদ্রাক্ষর ছিল না। তিনি বহুধৈর্য ও কষ্ট করে প্রতিটি বাংলা লিপি বা অক্ষরের একাধিক প্রস্থ নির্মাণ করেন এবং এতেই প্রথম বাংলা ছাপা হয়।

প্রমথ চৌধুরী

প্র : প্রমথ চৌধুরীর জন্মতারিখ কবে?

উ : ৭ই অগস্ট, ১৮৬৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : যশোরে।

প্র : তিনি কোন সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন?

উ : ফরাসি ও ইংরেজি।

প্র : তিনি কী ছদ্মনাম ব্যবহার করে অনেক রচনা প্রকাশ করেন?

উ : বীরবল।

প্র : প্রমথ চৌধুরীকে কী বলা হয়?

উ : বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক।

প্র : চলিত রীতির তাঁর প্রথম গদ্যরচনা কোনটি?

উ : বীরবলের হালখাতা (ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ : ১৯০২)।

প্র : তাঁর রচিত বীরবলের হালখাতা গদ্য রচনাটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উ : ভারতী।

প্র : তিনি কোন মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : সবুজপত্র (১৯১৪)।

প্র : 'সবুজপত্র' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'সবুজপত্র' (১৯১৪) প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা। বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তের বছর চলে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক নূতন সাহিত্যগোষ্ঠী এবং সাহিত্যিক আদর্শ গড়ে ওঠে। এ পত্রিকাকে অবলম্বন করে চলিতরীতি বাংলাগদ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও ভাষারীতির আধুনিকতার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ চলিতরীতির গদ্য লেখায় অধিক উৎসাহী হন।

প্র : তিনি বাংলা সাহিত্যে কী হিসেবে স্মরণীয়?

উ : চলিত ভাষার প্রবর্তক ও বিদ্রূপাত্মক প্রাবন্ধিক হিসেবে।

প্র : প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : তেল নুন লকড়ি (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানাকথা (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), রায়তের কথা (১৯২৬), নানাচর্চা (১৯৩২), প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খণ্ড-১৯৫২, ও ২য় খণ্ড-১৯৫৩)।

প্র : তিনি আর কী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন?
উ : কবিতা ও ছোটগল্প।
প্র : তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে কীসের প্রবর্তক হিসেবে বিশেষ স্থান লাভ করেন?
উ : ইটালীয় সনেটের।
প্র : 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত'।– উক্তিটি কার?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩), পদচারণ (১৯১৯)।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : চার ইয়ারী কথা (১৯১৬), আহুতি (১৯১৯), নীললোহিত ও গল্পসংগ্রহ (১৯৪১)।
প্র : 'চার ইয়ারী কথা'র পরিচয় দাও।
উ : 'চার ইয়ারী কথা' (১৯১৬) প্রমথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ। চারবন্ধুর প্রেমের কাহিনি। প্রত্যেকটি প্রেমই অভিশপ্ত, নায়িকা চারজন ইউরোপীয়। প্রথম নায়িকা উন্মুল, দ্বিতীয় চোর, তৃতীয় প্রতারক, চতুর্থ নায়িকা মৃত্যুর পর তার ভালোবাসা ব্যক্ত করেছে। ভাষার চাতুর্য, পরিহাসপ্রিয়তা এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ উদ্ভাসিত এই কাহিনি বাংলা ভাবালু প্রেমকাহিনির প্রতিবাদী।
প্র : তিনি আর কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : বিশ্বভারতী পত্রিকা।
প্র : প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ভাষাগত বিশেষত্ব কী– এক কথায় লিখুন।
উ : প্রমথ চৌধুরীর রচনার ভাষাগত বিশেষত্ব হলো, তীক্ষ্ণ মননশীলতা বাকচাতুর্যের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির অসিচালনা।
প্র : প্রমথ চৌধুরীর ভাষার সমালোচনা লেখ।
উ : প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য শুধু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ছাড়া তিনি অন্য কোনো দিক থেকে মৌখিক ভাষার বিশেষ অনুকরণ করেন নি। ভাষার অনাবশ্যক মারপ্যাঁচ বাচনভঙ্গির অকারণ তির্যকতা ও অলংকারের চাকচিক্য তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও চলিত ভাষাকে সাধুভাষার চেয়েও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। সেজন্য প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'প্রমথ চৌধুরীর রচনায় ব্যারিস্টারির গন্ধ আছে।'
প্র : রবীন্দ্র পরিবারের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্ক কী?
উ : প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করেন।
প্র : তিনি কী পদক লাভ করেন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক। উল্লেখ্য, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজ মাতার নামে এ পদক প্রবর্তন করেন।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ (১৬ই ভাদ্র ১৩৫৩); শান্তিনিকেতন।

'বইপড়া' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বইপড়া' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
উ : প্রমথ চৌধুরী।
প্র : 'বইপড়া' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?
উ : প্রবন্ধ সংগ্রহ।
প্র : 'বইপড়া' কোন ধরনের রচনা?
উ : প্রবন্ধ।
প্র : মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি?
উ : বইপড়া।
প্র : উদ্বাহ কী?
উ : উর্ধ্বে উত্থিত বাহু = উদ্বাহ (একপদ প্রকাশ)
প্র : শব্দসমূহ বিশ্লেষণ কর : মনগঙ্গা, সোল্লাস, মন্দাগ্নি, জগদ্বিখ্যাত, নিষ্কর্মা
উ : মনগঙ্গা : মন রূপ গঙ্গা = রূপক কর্মধারয় সমাস
সোল্লাস : স + উল্লাস (উপসর্গযোগে)
মন্দাগ্নি : মন্দের অগ্নি = ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস
জগদ্বিখ্যাত : জগৎ + বিখ্যাত (সন্ধি)
নিষ্কর্মা : নিঃ + কর্মা (সন্ধি)
প্র : লেখকের মতে আত্মার মৃত্যু হয় কিভাবে?
উ : দেহের মৃত্যু দেখা যায়, আত্মার মৃত্যু দেখা যায় না। আত্মার স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয় যদি তার উপর চড়িয়ে দেয়া হয় অরুচিত বিদ্যার ভার। স্কুল-কলেজের শিক্ষা যেহেতু চাকরি লাভের পৌঢ় প্রতিযোগিতা, সেহেতু এ শিক্ষা লাভ করে চাকরি মেলে, চাকরির পর টাকা মেলে কিন্তু শান্তি মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। আত্মার জন্য চাই শান্তি। শান্তি মেলে ভালোলাগার উপাদানের সহযোগে। স্কুল-কলেজের বিদ্যাশিক্ষায় ভালোলাগার ক্ষেত্র যেহেতু সীমিত সেহেতু তাতে আত্মার মৃত্যু হতে পারে।
প্র : আমরা জাত হিসেবে কেমন নই?
উ : শৌখিন।
প্র : আমরা কী উপভোগ করতে প্রস্তুত নই?
উ : সাহিত্যের রস।
প্র : মানুষের কথিত সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি?
উ : বই পড়া।
প্র : আমরা জাত হিসেবে কেমন নই?
উ : শৌখিন নই।
প্র : আমরা কিসের ফল লাভের জন্য উদ্বাহ?
উ : শিক্ষার ফল লাভের জন্য উদ্বাহ।
প্র : শিক্ষা আমাদের কী দূর করবে বলে বিশ্বাস?
উ : গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুটোই দূর করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
প্র : শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কোনটি?
উ : সাহিত্যচর্চা।
প্র : কার কোনো বাজার দর নেই?
উ : শিক্ষার। শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ এর কোনো নগদ বাজার দর নেই।
প্র : ডেমোক্রেসি কিসের সার্থকতা বোঝে?
উ : ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে অর্থের।
প্র : ডেমোক্রেসির গুরুরা কী করতে চেয়েছিলেন?
উ : ডেমোক্রেসির গুরুরা সবাইকে সমান করতে চেয়েছিলেন।
প্র : কোনটি সংক্রামক?
উ : ব্যাধি সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
প্র : কোন বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান?
উ : সাহিত্যচর্চার সুফল সম্বন্ধে।
প্র : আর একপ্রকার অজ্ঞানতা নিয়ে মানুষ জন্মায়?
উ : যাঁরা ছাত্রের খসা প-বিশেষ্য বিশেষণ অর্থাৎ উকিলদের কথা বলা হয়েছে।
প্র : কোন জাতির মনের ঔদার্য কম?
উ : যে জাতির আসের ছাপার সংখ্যা, সে জাতির মনের ঔদার্যও কম।
প্র : কোন জাতি মনে বড় নয়?
উ : যে জাতি আসে বড় নয়।
প্র : মানুষের মনের পুরো সংবাদ পাওয়া যায় কোথায়?
উ : সাহিত্যে।
প্র : কোন বিষয়কে মনগড়ার তোপা জল বলা হয়েছে?
উ : দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়গুলোকে মনগড়ার তোপা জল বলা হয়েছে।
প্র : কোনটি ছাড়া সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই?
উ : বই পড়া ছাড়া।
প্র : দর্শনের চর্চা কোথায় করা যায়?
উ : পাহাড়ের গুহায়।
প্র : বিজ্ঞানের চর্চা কোথায় করতে হয়?
উ : জাদুঘরে।
প্র : সাহিত্যচর্চার জন্য আমাদের কী চাই?
উ : লাইব্রেরি।
প্র : লাইব্রেরির সার্থকতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
উ : হাসপাতালের সঙ্গে।
প্র : কোন দান প্রত্যাশাপেক্ষ?
উ : মনোরাজ্যের দান প্রত্যাশা সাপেক্ষ।
প্র : কে মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন?
উ : শিক্ষক ছাড়াও মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন।
প্র : শিক্ষার্থীও জ্ঞান পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারেন কে?
উ : শিক্ষক।
প্র : যিনি সত্যিকারের গুরু তিনি কী করেন?
উ : যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন।

প্র : কোন মৃত্যুর রেজিস্টারি করা হয় না?
উ : দেহের মৃত্যুর রেজিস্ট্রারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।
প্র : ব্রাদ্রুতকে কারা রক্ষা করেছিল?
উ : যারা পাস করতে পারে নি যা চায় নি, তারাই ব্রাদ্রুতকে রক্ষা করেছিল।
প্র : কারা বন্দুকের গুলি থেকে কামানের গোলা পর্যন্ত গলাধঃকরণ করতে পারেন?
উ : এক শ্রেণির বাঙ্গিকরা অর্থাৎ এক শ্রেণির শিক্ষার্থী যারা সব কিছু মুখস্থ করে ফেলতে পারে।
প্র : কোন বিষয়কে তরলন্ত বলা হয়েছে?
উ : নানা আকারের ও নানা প্রকারের গোলা অর্থাৎ তরল প্রমত্ত নোট প্রদানকে নির্দেশ করা হয়েছে।
প্র : প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে কার ওপরে স্থান দিয়েছেন?
উ : হাসপাতালের ওপর।
প্র : আমাদের কোন সম্প্রদায় বাধ্য না হলে বই ধরেন না?
উ : আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়।
প্র : ছেলের বাপেরা নজির পড়েন কেন?
উ : বাধ্য হয়ে, পেটের দায়ে।
প্র : সাহিত্য সাক্ষাৎভাবে কী কাজে লাগে না?
উ : উদরপূর্তির কাজে লাগে না।
প্র : মনের দাবি রক্ষা না করলে কী বাঁচে না?
উ : মানুষের আত্মা বাঁচে না।
প্র : কোন জাতি নির্জীব?
উ : যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব।
প্র : 'সুসার' শব্দের অর্থ কী?
উ : ব্যবসায় লাভ।
প্র : দাতাকর্ণ কে ছিলেন?
উ : মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ।
প্র : কাদেরকে কেতাবি মানুষ বলা হয়?
উ : কেতাব অনুসরণ করে চলে যারা।
প্র : আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল কে দূর করবে?
: শিক্ষা।

প্র : কারা সক্রেটিসকে সমাদর করতে চেয়েছিলেন?
উ : ডেমোক্রেসির গুরুরা।
প্র : কিসের সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির সোবতগো আস্বাদন করেছি?
উ : ইংরেজি সভ্যতার।
প্র : 'ভাঁড়ে ভবানী' কথাটির অর্থ কী?
উ : রিক্ত; শূন্য।
প্র : 'যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি আসলে বড় নয়;'—এটি কার উক্তি?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : মানুষের মনকে সরল, সচল, সরস ও সমৃদ্ধ করার ভার কার ওপর দাও?
উ : সাহিত্যের।
প্র : মানুষের পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কোথায়?
উ : সাহিত্যে।
প্র : সাহিত্যের চর্চার জন্য কী দরকার?
উ : লাইব্রেরির।
প্র : সুশিক্ষিত লোক মাত্রই কেমন?
উ : স্বশিক্ষিত।
প্র : আজকের বাজারে কাদের অভাব নেই?
উ : বিদ্যাদাতার।
প্র : দাতাকর্ণ কে?
উ : মহাভারতের বিশিষ্ট চরিত্র, কুন্তিপুত্র; দানের জন্য প্রবাদতুল্য মানুষ।
প্র : যথার্থ গুরু কে?
উ : যিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন, তিনিই যথার্থ গুরু।
প্র : কোন সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই?
উ : পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়।
প্র : আমাদের স্কুল-কলেজে ছেলেদের কী করা হয়?
উ : বিদ্যা গেলানো হয়।
প্র : কোনটি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না?
উ : ডেমোক্রেসি।
প্র : আত্মার অপমৃত্যুতে আমরা কী করি?
উ : উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

প্র : 'কারনামি' কোন জাতীয় শব্দ?
উ : ফ্রেঞ্চের উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ। (ফারসি কার + নামি = কারনামি; অর্থ—সৃষ্টি; কর্মকীর্তি; বাহাদুরি)
প্র : বাঙ্গাল শব্দ করা : গলাধঃকরণ, দুরাবস্থা, কুর্তি।
উ : গলাধঃকরণ (সং. গল + অধঃ + √কৃ + অন্য অর্থ—গিলে ফেলা); দুরবস্থা (সং. দুর + অবস্থা; অর্থ—দুর্দশা); কুর্তি (সং. √কৃত + তি; অর্থ—হর্ষ, প্রবল উৎসাহ। কুর্তি > ফুর্তি)
প্র : প্রমথ চৌধুরী স্কুল-কলেজের ওপরে স্থান দিয়েছেন কিসের?
উ : লাইব্রেরিকে।
প্র : মনের হাসপাতাল কী?
উ : লাইব্রেরি।
প্র : মুসলমান ধর্মে মানবজাতি কয়ভাগে বিভক্ত?
উ : দুই ভাগে বিভক্ত। কেতাবি ও যারা কেতাবি নয়।
প্র : কেউ পেছনে বই পড়লে তাকে কোন দলে ফেলে দেয়া হয়?
উ : নির্ধনের দলে।
প্র : কিসে মানুষের সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব হয় না?
উ : উদরপূর্তিতে।
প্র : মনের দাবি রক্ষা না করলে কী হয়?
উ : মানুষের আত্মা বাঁচে না।
প্র : 'যে জাতি যত নিরানন্দ সে জাতি তত নির্জীব।'—উক্তিটি কার?
উ : প্রমথ চৌধুরীর।
প্র : আনন্দের স্পর্শে কী হয়?
উ : মানুষের মনপ্রাণ সজীব, সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে।
প্র : সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ কী?
উ : জাতির জীবনীশক্তির হ্রাস করা।
প্র : আমাদের শিক্ষা আমাদের কী করেছে?
উ : নির্জীব।
প্র : হাকিমের নোট পড়া আর উকিলদের নজির পড়ার মধ্যে প্রমথ চৌধুরী কোন সাদৃশ্য প্রমাণ করেছেন?
উ : দুটোই পেটের দায়ে।

প্র : একজন পেশাদার অভিনেতা যুগলবন্দি বা বিশেষ কিছুতে পারদর্শী হলেও কারাগারে কেন সে—এর পেশা কোন কারণে ফিকে লাগে।
উ : এতে মানসিকতার সূত্রের দেই।
প্র : 'পঞ্চাশু' শব্দের অর্থ কী?
উ : মৃত।
প্র : আমাদের দেশে কিসের বাজার দর দেই?
উ : শিক্ষার।
প্র : কোন বিষয়ে লোকসব দেশকের মতের সমন্বয়ের চলে না?
উ : লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায়।
প্র : মনোরঞ্জনের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন কে?
উ : শিক্ষক।
প্র : আমাদের সাহিত্যচর্চা করা উচিত কেন?
উ : কেননা সাহিত্য হচ্ছে শিক্ষার সর্বস্বধন অস্ত্র। তাই আমাদের সাহিত্যচর্চা করা উচিত।
প্র : ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না কেন?
উ : সাহিত্যের কোনো নগদ কারবার নেই। তাই ডেমোক্রেসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না।
প্র : আমাদের শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি কোথায়?
উ : সাহিত্যের দিকে নয়, অর্থের দিকে।
প্র : যে জাতি মনে বড় নয়, সে জাতি আসলে বড় নয়– কে বলেছেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী 'বইপড়া' প্রবন্ধে।
প্র : একজন শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সব প্রচ্ছন্ন শক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন কে?
উ : একজন শিক্ষক।
প্র : যে জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে শূন্য সে জাতি ভাঁড়েও ভবানী– কে বলেছেন?
উ : প্রমথ চৌধুরী 'বইপড়া' প্রবন্ধে বলেছেন।
প্র : আমাদের দেশের ছেলেরা নোট পড়ে আর উকিলরা নথি পড়ে কেন?
উ : সবই পেটের দায়ে।
প্র : আমাদের জাত-মানুষ হবে কী করে?
উ : সঠিক সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে।

পার্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্র : প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্মসাল কত?
উ : ১৯০৪।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কাশীতে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কাজ করেন?
উ : কল্লোল।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন?
উ : বাংলার কথা, বঙ্গবাণী, সংবাদ প্রভৃতি।
প্র : তিনি কোন গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন?
উ : কল্লোল গোষ্ঠীর।
প্র : তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : সাধারণ মানুষের প্রতি অনুরাগ।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : প্রথমা (১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), ফেরারী ফৌজ (১৯৪৮), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯), কখনো মেঘ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : পাঁক (১৯২৬), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৪), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ (১৯৪১), কুয়াশা, প্রতিধ্বনি ফেরে, মনুদ্বাদশ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : পঞ্চশর (১৯২৯), বেনামী বন্দর (১৯৩০) পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা (১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), ধূলিধূসর (১৯৪৩), মহানগর (১৯৪৩), জলপায়রা (১৯৫৭) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা মে, ১৯৮৮; কলকাতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র

প্র : প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্মতারিখ কত?
উ : ২২শে জুলাই, ১৮১৪।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কলকাতা।
প্র : তিনি কী কী ভাষায় দক্ষ ছিলেন?
উ : বাংলা, পারসি ও ইংরেজি।
প্র : তিনি কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন?
উ : প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যান্ড সন্স।
প্র : প্যারীচাঁদ মিত্র কোন কোম্পানির ছিলেন?
উ : 'বেঙ্গল টি কোম্পানি' ও 'ভারত টি কোম্পানি'।
প্র : তিনি দেশোন্নতিবিধায়ক কোন কোন সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন?
উ : জ্ঞানোপার্জিকা সভার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৩৮), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটির সম্পাদক (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য (১৮৫১), পতিতা নিবারণী সভার সম্পাদক (১৮৬১), বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার যুগ্ম সম্পাদক (১৮৬৭-১৮৭৫)।
প্র : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করে রচিত তাঁর প্রবন্ধের নাম কী?
উ : The Zamindar and Royats.
প্র : তিনি গরিব চাষিদের রক্ষাকবচ হিসেবে কী প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন?
উ : পঞ্চায়েত ব্যবস্থা।
প্র : তাঁর রচিত কথিত প্রথম উপন্যাসের নাম কী?
উ : আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)।
প্র : 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল।' ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'মাসিক পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। কেউ বলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ। কারো মতে, উপন্যাস না, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। অর্থাৎ এটি সার্থক উপন্যাস কি-না এনিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকের মতে, 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নকশা। এখানে দেশীয় বন্ধ্যা শিক্ষা

ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার আলোকে উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন জীবনগঠনকে লেখক স্বাগত জানিয়েছেন। কাহিনি বর্ণনায় কৌতুক আছে। এ গ্রন্থের গদ্যে লেখক সচেতনভাবে চলতি ভাষা প্রয়োগ করেছেন। উদ্যোগটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই গদ্যরীতি বাংলা সাহিত্যে 'আলালী রীতি' হিসেবে পরিচিত। অবশ্য প্যারীচাঁদ নিজেই উত্তরজীবনে এ রীতির চর্চা না করে সাধুরীতিতে গদ্য লেখেন। প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে এই রচনাটি পত্রিকায় লেখেন। ধনী বিষয়ী বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষার ব্যাপারে পিতার, অবহেলা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে। পরে দুঃখের জীবনে তার বোধোদয় ঘটে এবং হৃদয়-মন পরিবর্তিত হওয়ায় সে সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ হয়। ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর ইত্যাদি চরিত্র জীবন্ত। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা। চরিত্রটি ধূর্ততা, বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রাণময়তা নিয়ে এ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত চরিত্র। 'আলালের ঘরের দুলাল' সার্থক উপন্যাস না হলেও বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার প্লাটফর্মটি তৈরি করে দেয়।
প্র : বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ কাকে বলা হয়?
উ : প্যারীচাঁদ মিত্রকে।
প্র : পাদ্রি লঙ সাহেব তাঁকে কী বলতেন?
উ : ডিফেন্স অব বেঙ্গল।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন?
উ : টেকচাঁদ ঠাকুর।
প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯), বামারঞ্জিকা (১৮৬০), গীতাঙ্কুর (১৮৬১), যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫), অভেদী (১৮৭১)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৩শে নবেম্বর, ১৮৮৩।

ফজিলতুন্নেসা

প্র : ফজিলতুন্নেসার জন্মসাল কবে?
উ : ১৮৯৯।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : করটিয়া, টাঙ্গাইল।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিক্ষাবিদ।
প্র : তিনি কী হিসেবে সেকালে মুসলিম সমাজে স্বনামধন্য ছিলেন?
উ : কৃতী ছাত্রী ও শিক্ষাব্রতী।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প রচনা করেন?
উ : শিখা ও সওগাত পত্রিকায়।
প্র : তাঁর রচিত লেখাগুলো কী?
উ : মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ, মুসলিম নারীর মুক্তি ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৭৭, ঢাকা।

ফররুখ আহমদ

প্র : ফররুখ আহমদের জন্মতারিখ কবে?
উ : ১০ই জুন, ১৯১৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাঝআইল গ্রাম, যশোর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ইসলামি স্বাতন্ত্র্যবাদী কবি।
প্র : তাঁর রচিত কবিতায় কী কী উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?
উ : পাকিস্তানবাদ, ইসলামি আদর্শ বিশেষত মুসলিম জাগরণ এবং আরব-ইরানের ঐতিহ্য।
প্র : তাঁর রচিত কবিতা কেন বিশিষ্ট?
উ : আরবি-পারসি শব্দের প্রয়োগ নৈপুণ্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে।
প্র : তাঁর রচিত কাহিনিকাব্যের নাম কী?
উ : হাতেমতায়ী (১৯৬৬)।

BCS PREPARATION

প্র : তিনি তাঁর রচিত হাতেমতায়ী গ্রন্থের জন্যে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আনমজি পুরস্কার (১৯৬৬)।
প্র : তিনি 'পাখির বাসা' গ্রন্থের জন্যে কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ইউনেস্কো (১৯৬৬)।
প্র : তিনি আর কী কী পুরস্কারে ভূষিত হন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক।
প্র : তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)।
প্র : 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বাংলাদেশের বাংলা কবিতার ধারায় চল্লিশের দশকের কবি ফররুখ আহমদের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪)। এই কাব্যগ্রন্থে মোট উনিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সাত সাগরের মাঝি নামের একটি কবিতা আছে গ্রন্থের সর্বশেষে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা : সিন্দবাদ, পাঞ্জেরি, লাশ, আউলাদ, দরিয়ার শেষরাত্রি ইত্যাদি। এ গ্রন্থের কবিতাগুলি ১৯৪৩-'৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিরূপ সমাজের ছবি যেমন লাশ, আউলাদ কবিতায় পাওয়া যাবে। তবে মূলত মুসলমানদের জাগরণের লক্ষ্যে তিনি এ গ্রন্থের কবিতাগুলো লিখেছেন। সেজন্যে কবি ত্যাগ করেছেন বঙ্গীয় শব্দ ও অনুষঙ্গ, গ্রহণ করেছেন আরব্য উপন্যাস, ইরান-আরবের সংস্কৃতি ও পুরাণকথা। বাংলা প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে একাব্যে কবি বহু অপ্রচলিত আরবি-পারসি শব্দ গ্রহণ করেছেন। অনুষঙ্গের ক্ষেত্রেও এসেছে সমুদ্র বারংবার, এসেছে ঈগল পাখি, নারঙ্গির বনের সবুজ পাতা ইত্যাদি। এ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে এই ধারণা হয়, কবি জন্মেছেন বাংলায়, কিন্তু তাঁর মন পড়ে আছে আরব-ইরানের মরুভূমিতে। এই কাব্যগ্রন্থের সব শব্দের অর্থ কোন বাঙালি পাঠকই বুঝবেন না। তাঁকে 'আরবি-পারসি থেকে বাংলা' অভিধান কাছে নিয়ে বসতে হবে। তবে কবিশক্তি থাকায় চমৎকার চিত্রকল্প, প্রতীক সৃজন ও কবিভাষা নির্মাণ ফররুখ আহমদ করতে পেরেছেন। তাই যথাযথ অর্থ না বুঝেও 'আকিক বিছানো পথ' বা 'শিলাদ্বার আবলুস' বা 'দরিয়ার হাম্মাম' শব্দবন্ধগুলো পড়তে আমাদের মন্দ লাগে না।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যনাট্যের নাম কী?
উ : নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)।
প্র : তাঁর রচিত সনেট সংকলনের নাম কী?
উ : মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)।
প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থের নাম কী?
উ : পাখির বাসা (১৯৬৫)।
প্র : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাঁর অবস্থান কী?
উ : বাংলা ভাষার পক্ষে।
প্র : পাকিস্তান বেতার-টিভিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্তে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি বন্ধ রাখার পক্ষে ছিলেন।
প্র : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা কী?
উ : মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৪।

ফয়েজ আহমদ

প্র : ফয়েজ আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালের ২রা মে, বিক্রমপুরের বাসাইলভোগ এলাকায়।
প্র : তিনি মূলত কী?
উ : সাংবাদিক ও লেখক, বিশেষ করে শিশুতোষ গ্রন্থকার।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : শিশু-কিশোর : হাতে খড়ি (১৯৫৪), জোনাকী (১৯৫৬), তা ধিনতা (১৯৬৩), পুতলী (১৯৬৪), বোকা আইভান (১৯৭৬), বিন্দু (১৯৮৪), তুলির সাথে লড়াই (১৯৮৬), হারিয়ে যাওয়া (১৯৮৮), জুড়ি নেই (১৯৮৮), বাজনা কিসের (১৯৯০), বাছাই করা শতকে ছড়া (১৯৯০), রুদ্র ঢাকা (১৯৯০), বেছে বেছে নেয়া কবিতার খেয়া (১৯৯১), প্রতিবাদের ছড়া (১৯৯৫), তারাদের সাথে (১৯৯৫), টিউ টিউ (১৯৯৭) ইত্যাদি। প্রবন্ধ : পিকিং থেকে লিখছি (১৯৬৭), চীনে ক্রান্তিকাল (১৯৮১), মধ্যরাতের অশ্বারোহী (১৯৮২), সত্যবাবু মারা গেছেন (১৯৮৪), চলমান রাজনীতি (১৯৯৪) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬), ভাসানী স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), একুশে পদক (১৯৯১), ঋষিজ সম্মাননা (১৯৯২), শিশু একাডেমি পুরস্কার (১৯৯৭)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

প্র : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মণিহারপুর, পূর্ণিয়া, বিহার।
প্র : তাঁর জন্ম তারিখ কত?
উ : ১৯শে জুলাই, ১৮৯৯।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কথাসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর আদিনিবাস কোথায়?
উ : শিয়াখালা, হুগলি।
প্র : তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?
উ : বনফুল।
প্র : তিনি কী রচনা করে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন?
উ : 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডি।
প্র : তিনি কোথায় কী গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন করেন?
উ : 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'একপাতা-আধপাতা' গল্প।
প্র : তিনি কী কী রচনা করেছেন?
উ : উপন্যাস ও গল্প।
প্র : তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসে কী কী নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে?
উ : বাস্তব জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উপাদান।
প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?
উ : বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪০), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অনুগামিনী (১৯৪৭), ঊর্মিমালা (১৯৫৫), সপ্তমী (১৯৬০), নূরবীণ (১৯৬১) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অগ্নি (১৩৩৯), তৃণখণ্ড (১৩৪২), বৈতরণী তীরে (১৩৪৩), কিছুক্ষণ (১৩৪৪), দ্বৈরথ (১৩৪৪), নির্মোক (১৩৪৭), সে ও আমি (১৩৫০), জঙ্গম (১৩৫০), সর্বনিগড় (১৩৫৬), স্থাবর (১৩৫৮), পঞ্চপর্ব (১৩৬১), লক্ষ্মীর আগমন (১৩৬১) ইত্যাদি।
প্র : 'অগ্নি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : ভারতে ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত, বনফুলের এই রাজনৈতিক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। উক্ত আন্দোলনের নেতা অংশুমান উপন্যাসের নায়ক, যাকে কারাদণ্ড দেয়া হয় ইংরেজ ডেপুটিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে। অন্য চরিত্রগুলোর মধ্যে নীহার ও তার স্ত্রী অন্তরা অন্যতম। নীহার কম্যুনিস্ট মতবাদী হয়েও ক্যাপিটালিস্ট সরকারের অধীনে চাকরি করে, এমনকি আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে তার তৎপরতা প্রদর্শন করে; লাভ করে রায় সাহেব উপাধি। কিন্তু তাতে স্ত্রী অন্তরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তার এই অনুভূতি প্রাক্তন কমরেড মীনা দত্তকে সে অবগত করে। এর মধ্যেই অংশুমানের সাথে তার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে তার ফাঁসির আদেশ হয়, অপরাধ পুলিশ অফিসারকে ট্রেন থেকে ফেলে খুন করা। বনফুল ছিলেন গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সমর্থক। এই উপন্যাস রচনা করে তিনি প্রকারান্তরে কমিউনিস্টদের সমালোচনা করলেন।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বনফুলের কবিতা (১৯২৯), ব্যঙ্গ কবিতা (১৯২৯), অঙ্গারপর্ণী (১৩৪০), চতুর্দশী (১৯৪৭), করকমলেষু (১৯৪৯) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী রচনার পথিকৃৎ ছিলেন?
উ : জীবনীনাটক রচনার।
প্র : তাঁর রচিত জীবনীনাটকগুলোর নাম কী?
উ : শ্রীমধুসূদন (১৯৩৯), বিদ্যাসাগর (১৯৪২)।

BCS PREPARATION ..

প্র: তিনি তাঁর রচনার জন্যে কী উপাধিতে ভূষিত হন?
উ: পদ্মভূষণ।
প্র: তিনি কত তারিখে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯; কলকাতা।

'নিমগাছ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ কোনটি?
উ: নিমগাছের ছাল ও পাতা।
প্র: নিম গাছের কটি পাতা কী কাজে লাগে?
উ: নিম গাছের কটি পাতা অনেকে ফাঁচা খায়, কেউ বেতন সহযোগে ছেজে খায়— যকৃতের পক্ষে বেশ উপকারী বলে।
প্র: নিম গাছের কটি ডাল কী কাজে লাগে?
উ: নিম গাছের কটি ডাল অনেকেই চিবোয়, দাঁত ভালো থাকে।
প্র: নিম গাছের প্রশংসায় কারা পঞ্চমুখ?
উ: কবিরাজরা নিম গাছের প্রশংসায় কারা পঞ্চমুখ।
প্র: নিম গাছ বাড়ির পাশে জন্মালে কারা খুশি হন?
উ: বিজ্ঞরা খুশি হন।
প্র: কে নিম গাছের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো?
উ: এক জন কবি নিম গাছের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো।
প্র: কে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল?
উ: এক জন কবি।
প্র: নিমগাছের কী ইচ্ছা করতে লাগল?
উ: কবির সঙ্গে চলে যেতে।
প্র: নিমগাছের ইচ্ছেপূরণ হলো না কেন?
উ: মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূর চলে গেছে বলে। অর্থাৎ সংসারের প্রতি মায়া-মমতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে।
প্র: কবিরাজ কারা?
উ: যারা গাছগাছালি পরিশোধন করে মনুষ্যরোগের চিকিৎসা করেন।
প্র: 'নিমগাছ' কী ধরনের গল্প?
উ: 'নিমগাছ' একটি প্রতীকী গল্প।
প্র: 'নিমগাছ' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উ: লেখক বদরুদ্দীন উমরের 'অমৃতলোক' (১৯৮৭) নামক গ্রন্থ থেকে।
প্র: নিমগাছকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
উ: একজন গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউয়ের সঙ্গে।

বদরুদ্দীন উমর

প্র: বদরুদ্দীন উমর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।
প্র: তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ: অধ্যাপক এবং রাজনীতিক।
প্র: তিনি কোন সাময়িকী সম্পাদনা করেন?
উ: সংস্কৃতি।
প্র: তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ: প্রবন্ধ-গবেষণা : সাম্প্রদায়িকতা (১৯৬৬), সংস্কৃতির সাম্প্রদায়িকরণ (১৯৬৮), পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৭০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (১৯৭৪), যুদ্ধপূর্ব বাঙলাদেশ (১৯৭৪), যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশ (১৯৭৬), ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮০), বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (১৯৮৭), বাঙলাদেশের মধ্যবিত্ত ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি (১৯৮৯), দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ (২০০৬) ইত্যাদি।
প্র: 'সংস্কৃতির সংকট' গ্রন্থটির লেখক কে?
উ: বদরুদ্দীন উমর।
প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭২, প্রত্যাখ্যান), ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৪, প্রত্যাখ্যান)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ কবে?
উ: ২৬শে জুন, ১৮৩৮ (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫)।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: ঔপন্যাসিক ও বাঙালির নবজাগরণের প্রধানতম অগ্রদূত।
প্র: তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন?
উ: সংবাদ প্রভাকরে।
প্র: তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ: ললিতা তথা মানস (১৮৫৬)।
প্র: তাঁর রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম কী?
উ: দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস।
প্র: তাঁর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম কী?
উ: কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)।
প্র: 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'।—এই সংলাপ সম্পর্কে কী বলা হয়?
উ: কপালকুণ্ডলার এই সংলাপকে বলা হয়— বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ।
প্র: এই উপন্যাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য বাক্য কী?
উ: 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'
প্র: ত্রয়োদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম কি?
উ: মৃণালিনী (১৮৬৯)।
প্র: সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ: বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস কোনটি?
উ: রজনী (১৮৭৭)।
প্র: তাঁর রচিত কোন উপন্যাস কিসের অনুকরণে ও কীরূপ আদর্শে রচিত?
উ: রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২); তাঁর রচিত সিংহল বিজয় বর্ণনা মূলক ঐতিহাসিক হয় কোন উপন্যাসে?
উ: দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
প্র: বাংলার উপন্যাসের জনক কাকে বলা হয়?
উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয় কেন?
উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা উপন্যাসের জনক বলার কারণ হলো, বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম পাশ্চাত্যরীতি অনুসরণ করে একটি পরিপূর্ণ আঙ্গিকে গল্প বলা করেন। উপন্যাস একটি পাশ্চাত্য শিল্প-ধরণা। এখানে একটি ক. দৃষ্টি থাকবে। খ. আখ্যানবস্তুর দেশকালগত অবস্থান ও পরিবর্তন দেখা যাবে। গ. চরিত্রের গঠন ও বিবর্তন, পরিণতি ও পরিণতি থাকবে; ঘ. সময় ও স্থানের ঐক্য থাকবে। এই বিচারে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে কেউ সর্বাঙ্গ সার্থক উপন্যাস লিখতে পারেন নি। 'মুলমণি ও করুণার বিবরণ' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস-মাত্রাইয়ের মাপকাঠিতে সর্বাঙ্গ সার্থক নয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার স্বাক্ষর রাখেন। এরপর তিনি সে ধারাকে বেগবান করেন এবং একের পর এক সার্থক উপন্যাস রচনা করে চলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা উপন্যাসের জনক বলা হয়।
প্র: বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয় কোনগুলোকে?
উ: আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭)।
প্র: 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
উ: 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। এতে নিগূঢ় ভাবসঙ্গতির জন্য 'রোমান্স' বলা যায়। অরণ্যে এক কাপালিক-পালিতা নারী কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনি গড়ে

BCS PREPARATION

উঠেছে। সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে অপরিচিতা এই নারীর নবকুমারের সঙ্গে বিয়ে এবং কপালকুণ্ডলার সমাজবন্ধনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এই কাহিনির মূল ঘটনা। কপালকুণ্ডলার মধ্যে যে রহস্য সেই রহস্য উদ্ঘাটনই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। কাহিনিতে একদিকে আছে সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়কার আগ্রার নগর ও স্থাপত্য এবং অন্যদিকে অরণ্য ও সমুদ্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা, কপালকুণ্ডলার চরিত্র, কাহিনির ট্র্যাজিক পরিণতি এই তিনটি কারণে উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম স্মরণীয় রচনা। বঙ্কিমের জীবৎকালেই এই উপন্যাসের আটটি সংস্করণ হয়। অনেকের মতে এটি বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কুপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই উপন্যাসের একটি নাট্যরূপ দেন (১৮৭৩) এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের একটি উপসংহার উপন্যাস রচনা করেন এবং নামকরণ করেন 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪)।

প্র: 'মৃণালিনী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাংলাদেশ ও তুর্কি আক্রমণ এর ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সঙ্গে মৃণালিনীর প্রণয় এবং দেশরক্ষার জন্য হেমচন্দ্রের সংকল্প ও ব্যর্থতার সঙ্গে এক রহস্যময়ী নারী মনোরমার কাহিনি এ উপন্যাসের মূল কথাবস্তু। বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ এবং ইতিহাস জিজ্ঞাসার প্রথম প্রকাশ এই উপন্যাসে। ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে হেমচন্দ্র-মৃণালিনী এবং পশুপতি-মনোরমার প্রেমকাহিনি এই উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের উপাদান নিয়ে এখানে জীবনকে মুখ্য করা হয়েছে।

প্র: 'বিষবৃক্ষ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কেন?

উ: 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার সঙ্গে বিধবা বিবাহ, পুরুষের একাধিক বিবাহ তার অপরাধ, নৈতিকতার দ্বন্দ্ব, নারীর আত্মসম্মান ও অধিকারবোধ প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাংলা উপন্যাসে বিষবৃক্ষের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। চরিত্রায়ণে ঘটনা সংস্থানে এবং জীবনের কঠিন সমস্যার ছায়াপাত 'বিষবৃক্ষ' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আর কোন লেখক এ জাতীয় বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনার চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। বালবিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও কামনার বিকাশকে তৎকালীন সমাজ যে প্রশ্রয় দেয় নি, এ উপন্যাস তার প্রমাণ। লেখকও মনে করেছেন, কুন্দর কাহিনি পাঠ করার ফলে ঘরে ঘরে অমৃত ফলবে অর্থাৎ এ ধরনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা রহিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র কী চেয়েছেন সেটি মুখ্য নয়। 'বিষবৃক্ষে' তিনি সমস্যার যে যথার্থ রূপায়ণ করতে পেরেছেন এটাই আসল। 'বিষবৃক্ষ' আজও বাংলা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর একটি।

প্র: 'ইন্দিরা' গল্প না উপন্যাস?

উ: 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) ছোট উপন্যাস (নভেলা), অনেকে বলেন বড়ো গল্প। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত এবং 'উপকথা' (১৮৭৭) গ্রন্থে সংকলিত। ১৮৯৩ সালে পুনর্লিখিত এবং পরিবর্তিত হয়। এই কাহিনিটি উত্তমপুরুষের বয়ানে রচিত। কৌতুক-পরিহাসপূর্ণ উপভোগ্য কাহিনি 'ইন্দিরা'। অনেকের মতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কালে শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছোটগল্পের অস্তিত্ব ছিলো না বলে তিনি একটি গল্পের বিষয়কে উপন্যাসে রূপ দিতে গিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'ইন্দিরা' বাংলা ছোটগল্পের ইঙ্গিত, সূচনার বার্তাবহ।

প্র: 'যুগলাঙ্গুরীয়' সম্পর্কে লেখ।

উ: 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ছোট আখ্যান। কেউ বলে থাকেন নভেলা বা ছোট উপন্যাস, কেউ বলেন বড় গল্প। বঙ্কিম একে বলেছেন উপকথা। প্রাচীন পটভূমিকায় একটি প্রেম কাহিনি। ছোটগল্প শিল্পমাধ্যমটি ওইকালে থাকলে 'যুগলাঙ্গুরীয়' একটি গল্প হতে পারত। 'ইন্দিরা'র পর এই আখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্র আবার একই ফর্মচর্চা করেন।

প্র: 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতাপ ও শৈবলিনীর বালাপ্রণয় এবং সেই প্রেমের করুণ পরিণতি এই উপন্যাসের প্রধান কাহিনি। প্রেম, নাম্পত্য আদর্শ, সমাজের শাসন, সতীত্ব ইত্যাদি এই কাহিনিতে বিশেষভাবে সমস্যায়িত হয়েছে। এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ বঙ্কিমের নীতি ও প্রথানুগত্য। কেননা, লেখক এখানে 'তবে যাও প্রতাপ, স্বর্গধামে' বলে নায়ককে পরলোকের পথ দেখিয়েছেন। উপন্যাসটির পটভূমি ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং মির কাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংগ্রাম। ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনার সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনির রূপায়ণ ঘটেছে বলে মির কাসিম-দলনি বেগমের সঙ্গে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনীর আখ্যান রচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

প্র: 'রজনী' কী প্রকৃত উপন্যাস?

উ: 'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের নায়িকা রজনীর সঙ্গে লর্ড লিটন প্রণীত 'দি লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই' নামক উপন্যাসের নিডিয়া চরিত্রের কিছুটা ঐক্য আছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর জবানবন্দিতে এই উপন্যাস রচিত। এই রীতিটিও যে বঙ্কিম ইংরেজ ঔপন্যাসিক কার্লিনস অনুসরণে করেছেন তা তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন। বাংলা উপন্যাস গড়ে তুলবার জন্য এভাবেই পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ উপন্যাসের মতোই এখানেও প্রেম ও আদর্শের সংঘাতই কাহিনির মূল উপজীব্য। 'রজনী'কে প্রকৃত উপন্যাস না বলে রোমান্স বলা হয়ে থাকে। কারণ এখানে বেশ কল্পদৃশ্যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

প্র: 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কী?

উ: 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমকালে বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধবা নারী রোহিণীকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শিল্পবোধ ও নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। ঔপন্যাসিকের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থের চারটি সংস্করণ হয়। প্রধান চরিত্র: রোহিণী, গোবিন্দলাল, ভ্রমর।

প্র: 'সীতারাম' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ: 'সীতারাম' (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। সীতারাম একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। উপন্যাসে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাও আছে। মূলত এটি এক ব্যক্তির পারিবারিক জীবনের এবং আদর্শের ট্র্যাজেডি। বঙ্কিমের ধর্মচিন্তা এই উপন্যাসের গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবে চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য এবং কাহিনির বর্ণনা কুশলতায় বঙ্কিমের প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ও 'সীতারাম'কে 'ত্রয়ী' উপন্যাস বলা হয়।

প্র: 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ: ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ছায়া অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮২ সালে। উপন্যাসটিতে প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে স্বদেশভক্তি, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ বলতে বঙ্গভূমিকে, আর ধর্ম বলতে হিন্দু ধর্মকে বুঝিয়েছেন। বন্দে মাতরম্ গান দ্বারা বুঝিয়েছেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের দীক্ষা। উল্লেখ্য যে এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এর ঘটনা কল্পিত কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়। চরিত্রগুলি আদর্শায়িত। মন্বন্তরের বর্ণনা নিখুঁত, সাধারণ গ্রামীণ জীবনের আখ্যান বাস্তব। সর্বোপরি প্রেম এবং আদর্শের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের কাহিনিকে নিবিড়তা দিয়েছে। কিন্তু এই উপমহাদেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এ উপন্যাসের মূল্য অসামান্য। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই গ্রন্থের 'বন্দে মাতরম্' গানটির ভূমিকা যেমন ঐতিহাসিক, তেমনি ঐতিহাসিক এই

উপন্যাসের প্রভাব। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত The Abbey of Bliss (1907) এবং শ্রী অরবিন্দ Ananda Math (1910) নামে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। এটি মূলত বাস্তবানুগ রোমান্সধর্মী উপন্যাস। এই গ্রন্থে রচিত গানের 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি পরবর্তীকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকারীদের অত্যন্ত প্রিয় ও উদ্দীপক স্লোগান হিসেবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পরিচয় দাও।

উ : 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম খণ্ড ১৮৮৭, ২য় খণ্ড ১৮৯২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু মূলত সাহিত্যকেন্দ্রিক। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রবন্ধগুলির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলোতেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনার নির্দিষ্ট পথে বাংলা প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ পথ সূচনা করলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৯৫) নামে ভূদেব মুখোপাধ্যায়েরও একটি প্রবন্ধ সংকলন আছে।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের কোন গ্রন্থে গদ্যকবিতার বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করা হয়?

উ : 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক' (১৮৯১)। ১৭৭৮-এ প্রকাশিত 'কবিতাপুস্তক' নামক পদ্যসংগ্রহের সঙ্গে কয়েকটি গদ্যরচনা যুক্ত করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনেকের মতে এই গ্রন্থের কোনো কোনো গদ্যরচনায় গদ্য কবিতার পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। সে বিবেচনায় এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : 'সাম্য' গ্রন্থটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উ : 'সাম্য' (১৮৭৯) গদ্যগ্রন্থ। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সাম্য' বিষয়ক তিনটি এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় সাম্যচিন্তার ধারার ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও অর্থনৈতিক প্রগতিশীল চিন্তা প্রকাশিত। তবে পরবর্তী জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা ভাষায় সাম্যবাদী চিন্তার এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ হতে দেখা যায় না। যা ঐতিহাসিক কারণেও 'সাম্য' গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলোতে সমাজে সাম্যপ্রতিষ্ঠা কামনা এবং দুঃখের মূলের কারণ হিসেবে অর্থনৈতিক শোষণের চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্র : 'কমলাকান্তের দপ্তর' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিভিন্ন মেজাজের গদ্য লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। কমলাকান্ত নামক এক চরিত্রের জবানিতে প্রবন্ধগুলি লিখিত। ফলে এদের মধ্যে একটি ক্ষীণ আখ্যানগত এবং চরিত্রগত ঐক্য আছে। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, খ্যাপাটে কিন্তু চিন্তাশীল ও কবিপ্রতিভাসম্পন্ন চরিত্রটি বঙ্কিমের অনন্য সৃষ্টি। মনে করা হয়, কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই। কমলাকান্ত আফিম খেলেই দিব্যদৃষ্টি ফিরে পায়। তার কবিত্ব, দেশপ্রেম, দার্শনিকত্ব, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপশক্তি সমস্তই একাকারে এই গ্রন্থে ঘনীভূত। প্রসন্ন গোয়ালিনী কমলাকান্তের অনুষঙ্গী চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যে কত মহৎ গদ্যশিল্পী এ গ্রন্থে তা বোঝা যায়। তৎসম শব্দের স্থাপত্যধর্মী ভার পরিত্যাগ করে এ গ্রন্থে তিনি শেষ গদ্যশৈলী নির্মাণ করেছেন। অনেকের মতে, কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : রাজমোহনস ওয়াইফ। ইংরেজিতে লেখা। প্রকাশ : ১৮৬৪ সালে 'Indian Field' পত্রিকায় ও ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে।

প্র : তিনি বাংলা ভাষার সমালোচনায় কোন ধারার পথ প্রদর্শক?

উ : তুলনামূলক সমালোচনা ধারার।

প্র : তিনি কী কী বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেছেন?

উ : ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ভাষা, সমাজ ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোর নাম কী কী?

উ : লোকরহস্য (১৮৭৪), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), সাম্য (১৮৭৯), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), বেঙ্গল অপুশীলন (১৮৮৮) ইত্যাদি।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোন গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন?

উ : সাম্য (১৮৭৯)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম কী?

উ : কমলাকান্ত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি কী?

উ : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার চারজন বিশিষ্ট লেখকের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারায় মিলন ঘটিয়েছিলেন। তিনি ছাড়া এই পত্রিকার বিশিষ্ট চারজন লেখক হলেন–সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

প্র : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা কে? ভ্রমণ কাহিনিটির নাম কি?

উ : বাংলা ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'পালামৌ' (১৮৮০)। ছোটোনাগপুরের বিশেষ অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনি।

প্র : পালামৌ স্থানটি কেমন?

উ : গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ড গ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।' অন্যত্র বলা হয়েছে: 'পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ এই লইয়াই পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ' গ্রন্থটি কোথায় প্রথম প্রকাশ পায়?

উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের পৌষ সংখ্যায় আরম্ভ, ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবদ্দশায় (১৮৩৪-১৮৮৯) গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নি।

প্র : 'পালামৌ' কিভাবে জনসমক্ষে আসে?

উ : সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৮৯) বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলি প্রকাশ করেন। সেখানেই 'পালামৌ' প্রথম গ্রন্থাকারে বহু পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রথম স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'পালামৌ' প্রকাশ করে।

প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালামৌ' নিয়ে উচ্চ আলোচনা করেছেন। এর এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন: "পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাঙ্গলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।"

প্র : 'পালামৌ'-এ ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্য আমাদের প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। কোনগুলো?

উ : ১. 'বঙ্গবাসীদের কেবল ঘাঁড় দেখা অভ্যাস, মুরিকার সামান্য বৃষ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়'। ২. 'বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর।' ৩. 'মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।' ৪. 'যাহার ভাগ্যে কাঁদন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন'। ৫. 'বনোয়া বনে সুন্দর; শিবরা মাতৃক্রোড়ে'। ৬. 'এক দিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব'। ৭. 'যে হারে, সেই রাণা'।

প্র : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন? পত্রিকাটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

PREPARATION "

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করেছিলেন তাঁর অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ ইউরোপীয় দার্শনিকের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে ইউরোপীয় দার্শনিক কোঁতের চিন্তাধারায় সমর্থক ছিলেন। এছাড়াও লকে, বেন্থাম ও মিলের সামাজিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

প্র : কমলাকান্তের দপ্তর কোন্ বিদেশি লেখকের কোন্ গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি-কুইন্সির Confession of an English Opium Eater-এর প্রেরণায় রচিত।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার মূলে কী উদ্দেশ্য ছিল?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাঙালি জাতিকে চিন্তা ও মননশীলতায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা ও স্বদেশিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ও সচেতন করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের চারটি ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্সধর্মী উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর ও রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস কোনটি?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহ।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি তত্ত্বমূলক উপন্যাস : আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের নাম 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)।

প্র : বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী উপন্যাসটি কোন্ ইংরেজি উপন্যাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত?

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসটি ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত The last Days of Pompeii অবলম্বনে রচিত।

প্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম গ্র্যাজুয়েট কে?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : বাংলা উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রথম সৃষ্টি কী?

উ : শিক্ষনবিশ সার্থক উপন্যাস।

প্র : তিনি সাহিত্যের রসবোদ্ধাদের কাছ থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : সাহিত্যসম্রাট।

প্র : তিনি হিন্দু ধর্মানুরাগীদের কাছ থেকে কী আখ্যা লাভ করেন?

উ : ঋষি।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ (২৬শে চৈত্র, ১৩০০) রবিবার।

'বিড়াল' রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আহার প্রস্তুত না হওয়ায় কমলাকান্ত হাঁস হাতে নিমীলিতলোচনে কী ভাবছিলেন?

উ : আমি যদি নেপোলিয়ান হইতাম, তবে ওয়াটারলু জিতিতে পারিতাম কি না।

প্র : প্রথম উদ্যমে কমলাকান্ত ডিউকে কি বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?

উ : ইতঃপূর্বে যথোচিত পুরস্কার দেয়া গিয়েছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত নয়।

প্র : প্রসন্নর দুগ্ধ মার্জার কর্তৃক উদরসাৎ করার সময়ে কমলাকান্ত কী করছিল?

উ : ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিল।

প্র : 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই'। মার্জার কিভাবে কথাটা ভাবছিল?

উ : মনে মনে হেসে।

প্র : বিড়ালের পান করা দুধ সম্পর্কে কমলাকান্তের ভাবনা কী ছিল?

উ : দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন।

প্র : কমলাকান্ত কোন মার্জারকে মারতে চেয়েছিল?

উ : কমলাকান্ত মার্জারকে মারতে চেয়েছিল দুধ খাইলে যা মারলে মনুষ্যত্বলে দুগ্ধের স্বভাবে পরিচিত হইবে উপভক্ষ সে কাজকর্ম মলে বিবেচিত হইবে।

প্র : কমলাকান্ত কিভাবে বিড়ালকে মারতে চেয়েছিল?

উ : মস্তকবরিতে। 'মুণ্ড হইতে ঘুঁটা মামাইয়া, তথ্য বাহির করিয়া'।

প্র : মার্জারের বক্তব্য কমলাকান্ত কিভাবে জানতে পেরেছিল?

উ : নিদ্রাকর্ষণের হইয়া।

প্র : মার্জার মানব সম্প্রদায়কে কী কী উপদেশ দিয়েছিল?

উ : পরাপায়ী মানুষ, চতুষ্পদের কাছে বিড়ালের ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপরক্ত দেখি না। আমি তোমার বর্জনের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্মের সহায়।

প্র : মনু ও চোর সম্পর্কে মার্জারের ভাবনা কী ছিল?

উ : যাহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষা প্রধর্মিক। অধর্ম চোরের নয়, চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর চোরী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়। চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

প্র : ছোটলোকের দুঃখে দুখী হওয়া প্রসঙ্গান্তরে বিড়ালের ভাবনা কী?

উ : আমার মতো দরিদ্রের ব্যাথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনো অন্ধকে মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না। সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না সকলেই পরের ব্যাথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি কে হইবে?

প্র : মানবসমাজ সম্পর্কে বিড়ালের আপেক্ষা কী?

উ : তেল মাখায় তেল দেয়া মনুষ্য জাতির রোগ-দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলে বিরক্ত হয় তার জন্য আয়োজন কর, আর যে খুধার জ্বালায় মরে তাকে ছোড়াই আর খাও।

প্র : মার্জারের কাছে কার মূল্য নেই?

উ : যে বিড়াল নিজের বিপদকে ভাল করে বুঝেছে, বুঝের দিকে ঘুরতে জানে সাহসের যা মূর্খ ধনীর সভয়ে খেদোক্তিকে স্থানীয় ঘরে থাকে।

প্র : চোর ও দরিদ্র সম্পর্কে বিড়ালের ভাবনা কী?

উ : চোরের দণ্ড আছে, দরিদ্রতার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের মত আছে, ধনীর ভাণ্ডারের দণ্ড নাই কেন?

প্র : দরিদ্রেরা কেন পৃথিবীতে আসে নাই?

উ : অন্যায়ের ঘরে যাবার জন্য নয়। এটি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদেশ।

প্র : কমলাকান্ত মার্জারের কোন বিষয়টি সহ্য করতে পারত না?

উ : বিড়ালের সোশিয়ালিস্টিক কথা।

প্র : সমাজ সম্পর্কে মার্জারের ভাবনা কী?

উ : আমি যদি খাইতে না পাইতাম, তবে সমাজের উন্নতি নিয়া কি হবে?

প্র : বিচারকদের সম্পর্কে বিড়ালের বক্তব্য কী?

উ : চোরকে ফাঁসি দাও। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন। তিন দিন অন্তে তিনি উপবাস করিবেন।

প্র : তিন দিন না খেয়ে থাকলে কমলাকান্তকে কার ঘরে আবিষ্কার সম্ভব?

উ : নসীরাম বাবুর ভাণ্ডার ঘরে।

প্র : আফিঙের মহিমা বোঝাতে কমলাকান্ত বিড়ালকে কোন বই পড়তে বলেন?

উ : লিটম্যান ও পার্কারের গ্রন্থ, কমলাকান্তের দপ্তর।

প্র : 'প্রেতবৎ' কী?

উ : প্রেতের মতো। এটি একটি উপমা।

প্র : 'পাষাণবৎ কঠিন' কী?

উ : পাষাণের মতো কঠিন। একটি উপমা।

প্র : মার্জার কোন শব্দ?

উ : তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ।

প্র : 'মার্জারসুন্দরী' কী?

উ : এখানে যে বেড়ালের কথা বলা হয়েছে তা নদিবেড়াল। তাই লেখক একে 'সুন্দরী' বলে অভিহিত করেছেন।

প্র : 'কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই'– কী?

উ : এটি একটি প্রবচন। এর অর্থ কেউ কষ্ট করে কেউ কষ্ট না করেই তার ফল ভোগ করে।

প্র : 'মঙ্গলা' কী?

উ : এই প্রবন্ধে উল্লেখ নেই। তবে যে গরুর মুখ নিয়ে এতো কাণ্ড সেই গরুটির নাম মঙ্গলা। নামটি যথাযথ। কারণ, গরুকে মানবের জন্য মঙ্গলময় বিবেচনা করা হয়।

প্র : 'প্রসন্ন' কে?

উ : মঙ্গলার মালিক গোয়ালিনী প্রসন্ন। এই নামটিও যথাযথ। এই গোয়ালিনী কমলাকান্তের বা লেখকের প্রতি সদাপ্রসন্ন ছিল।

প্র : মার্জারীর স্বজাতিমণ্ডল কী?

উ : বিড়ালকুল বা বিড়ালদের মধ্যে।

প্র : 'দিব্যকর্ণধ্বান্ত' কী?

উ : এটি এই প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ চাবিশব্দ। কমলাকান্তকে প্রাবন্ধিক নেশামস্ত করেন এবং নেশামস্ত হলে সে সমাজের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে। বলা হচ্ছে, ঈশ্বর তাকে দিয়ে এগুলো বলাচ্ছেন। আসলে ব্রিটিশ আমলে সরকারের একজন আমলা হিসেবে সরকার ও সমাজের সমালোচনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই তিনি নেশা ও দিব্যত্বের আড়ালে সে কাজটি করেন।

প্র : বিড়ালের বক্তব্য মূলত কী?

উ : এটি সমতা বা সাম্যের বক্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র আমলা ও ধনী হলেও তিনি সমাজের অসমতা দেখে কাতর ছিলেন। 'সাম্য' বলে তাঁর একটি গ্রন্থও আছে। বিড়াল মূলত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের মৌলিক চাহিদা নিবৃত্তির কথা ইঙ্গিতে বলেছে।

প্র : বড় রাজার জন্য ফাঁপর বা শিরোমণি / ন্যায়াসংকারের জন্য সমাদর দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উ : বুঝিয়েছেন মানুষ সব সময় তার অপেক্ষা ধনে ও ক্ষমতায় যিনি অগ্রগণ্য বা ধর্মের কাণ্ডারী তাদের সমাদর করে– গরিবদের নয়। মানুষ ক্ষমতাবান ও ধর্মের ক্ষমতাধারীদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যস্ত হয় কিন্তু সাধারণের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

প্র : এই প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য দেখাও।

উ : 'খাইতে দাও– নহিলে চুরি করিব।' এই বাক্য থেকেই কালক্রমে ঘোচের জিগির সৃষ্টি হয়েছে : 'কেউ বারে দো কেউ মারো, তা হবে না তা হবে না।'

প্র : 'আফিং' কী?

উ : ভেষজ নেশাবস্তু। ঘুমের ঔষধ আবিষ্কার হবার আগে অল্পমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত রোগে অল্প পরিমাণে আফিং সেবন বিধেয় ছিল। আফিং অধিক গ্রহণে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়।

প্র : কমলাকান্তের দপ্তরের মর্মার্থ কী?

উ : বিড়ালকে কমলাকান্ত রূপক দিয়ে সাম্যবাদের মূল কথাটি কৌশলে বলা করে দিয়েছে।

প্র : নসীরাম কে?

উ : কমলাকান্তের দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্র : 'একটি পণ্ডিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিয়াছি'– বলে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : কমলাকান্তের চেতনার দুয়ার খুলে গেছে বিড়ালের কথায়। তাই সে বিড়ালকে নিজের খাদ্যে ভাগ দিতে সম্মত হয়েছে আর সে হয়ে উঠেছে অন্য মানুষ। এই চেতনার উদয়াই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্র : 'দেখিনু সেদিন রেলে ... ... মার ঘরে দুর্বল?'– এই কবিতাংশে কী ধরা পেয়েছে?

উ : শ্রেণিবৈষম্য, সাম্যবাদিতা ও মানবিকতা।

প্র : 'দেখিনু সেদিন রেলে ... ... মার ঘরে দুর্বল' এই কবিতার চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

উ : 'তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কী?' বাক্যে।

প্র : গ্রন্থে নাজমার গল্প দিয়ে তৈরি উপন্যাসে নাজমা ও বিড়ালের বিপন্নতা কোন দিক থেকে?

উ : নাজমা পরিবারের সদস্যদের কথা ভাবে আর বিড়াল বিড়ালকুলের কথা চিন্তা করে। নাজমার চেয়ে বিড়ালের চিন্তা ব্যাপকতর।

প্র : কমলাকান্তের কথা কি নীতি ও ধর্মবিরোধী?

উ : কমলাকান্তের 'নীতি ও ধর্মের' কথা 'নীতি ও ধর্ম' নয়। এটি 'মূল' যেখানে মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকারের প্রশ্ন আছে তাই তা নীতি ও ধর্মবিরোধী নয়।

মুন্সী আলী মিয়া

প্র : মুন্সী আলী মিয়ার জন্মতারিখ কবে?

উ : ১লা ডিসেম্বর, ১৯০৬।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : চালিতা গ্রাম, পাবনা।

প্র : তিনি প্রথম কোন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন?

উ : ইসলাম দর্পন (১৯২৫)।

প্র : কার সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?

উ : কিংবদন্তির পরাগ, শিখনার্থিকী, জ্ঞানের প্রভা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক।

প্র : তিনি তাঁর কবিতায় কী বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন?

উ : তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য।

প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : ঝরনামতির চর (১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) ইত্যাদি।

প্র : তাঁর রচিত শিশুতোষ গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : ফের জামাই (১৯২৭), মৃগপরী (১৯৩৭), চাইনী বউ (১৯৫৯), রূপকথা (১৯৬০), কুঁড়বরণ কন্যা (১৯৬০)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬২) ও প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৫)।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৭ই জুন, ১৯৭৯; রাজশাহি।

বিজন ভট্টাচার্য

প্র : বিজন ভট্টাচার্য কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বানরীপুর, ফরিদপুর।

প্র : তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯০৬।

প্র : তিনি কিসের প্রথম সূত্রধরের ছিলেন?

উ : নবনাট্য আন্দোলনের।

প্র : এই আন্দোলনকে অন্য কী নামে অভিহিত করা হয়?

উ : গণনাট্য আন্দোলন।

প্র : গণনাট্য ও নবনাট্য আন্দোলন কী?

উ : গণনাট্য আন্দোলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবী জুড়েই শুরু হয়েছিল এক ধরনের বিপ্লবলা এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত এক অবস্থা। এই সুযোগ তার চরম রূপ লাভ করে ১৯২৯ সালে। তখন বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার চাকরিতে শুরু হয় চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদি ইত্যাদি নানা সামাজিক অপরাধ। এই সুযোগে স্বদেশপ্রেমের মুখোশে ইতালি, জার্মানি, স্পেন, হিংস প্রভৃতি দেশে শুরু হয় একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ। সোরকা, ব্যালক ফন্ডের ন্যায় অনেক নিষ্পন্দিত ব্যক্তি এইসব ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতে নিহত হন। রবীন্দ্রনাথ, রোমা রোলা, আন্দ্রে জিদ প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে জনমত প্রতিবাদ করতে থাকেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে গণনাট্য সংঘ বা গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মঞ্চ হিসেবে গড়ে তোলা হয় IPTA (Indian People's Theatre Association)। স্থাপিত হয় ফাসিবাদবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ। সেই সময় প্রতিষ্ঠিত গণনাট্য সংঘ যে আদর্শগুলি মেনে চলত সেগুলি হলো–

(১) নাটকে থাকবে বাস্তব সমস্যার রূপায়ণ ও জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ।

(২) ব্যক্তি এখানে শ্রেণির প্রতিভূ হয়ে নাটকে চিত্রিত হবেন।

(৩) ব্যক্তিনায়কের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে গোষ্ঠীর প্রতি চিন্তা।

(৪) আনন্দবিধানের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পের উদ্দেশ্য হবে জনগণের সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে পরিবর্তনের উপায় সম্পর্কে তাদের সচেতন করিয়ে দেওয়া।

(৫) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা বিষয়েও নাট্যকারকে সচেতন থাকতে হবে।

(৬) আমজনতার হৃৎস্পন্দনকে স্পর্শ করার জন্য নাটকে থাকবে লোকসংগীত বা লোক-উৎসবের ঘটনা।

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' বা বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' নাটকে IPTA-র সাহিত্যাদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

নবনাট্য-আন্দোলন : গণনাট্যের পরবর্তী পর্যায় হলো নবনাট্য-আন্দোলন। নবনাট্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হলে নবনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ গঙ্গাপদ বসুর কথাতেই বলতে হয়—'সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবনগঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমায় প্রতিফলিত, তাকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক এবং এইরকম নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর মতো রিয়ালিটির যে অন্বেষণ তাকেই বলতে পারি নবনাট্য আন্দোলন।' বস্তুতপক্ষে, নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে গণনাট্যের সঙ্গে নবনাট্যের কোনো বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা না গেলেও একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা গিয়েছিল। সেটি হলো, নবনাট্যের দলগুলি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ করতে চান নি। নবনাট্যের সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন নাট্যাচার্য শম্ভু মিত্র ('চাঁদবণিকের পালা'), তৃপ্তি মিত্র ('বিদ্রোহিণী'), উমানাথ ভট্টাচার্য ('ছারপোকা') প্রমুখ। বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য থেকে নবনাট্যের অন্যতম সূচনাকারী ছিলেন।

প্র : কোন নাটক রচনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : নবান্ন (১৯৪৪)।

প্র : 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু লেখ।

উ : 'নবান্ন' (১৯৪৪) পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় কৃষক জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনি অবলম্বনে রচিত নাটক। নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকের মাধ্যমে বাংলা নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রাখেন। তাই এই নাটকটিকে বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে যুগান্তকারী বলা চলে। অনেকে দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। এ নাটকটি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ১৯৪৪ সালে প্রথম অভিনয় করেন। তখন থেকেই 'নবান্ন' নতুন বাংলা নাটকের অগ্রদূত রূপে গণ্য হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর, সমকালীন জাতীয় আন্দোলন, মেহনতি মানুষের চাহিদা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ কৃষক সমাজের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের সংগ্রাম, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি এই নাটকের মূল সুর।

প্র : তাঁর রচিত অপরাপর নাটকের নাম কী?

উ : জনপদ (১৯৪৫), কলঙ্ক (১৯৪৬), মরাচাঁদ (১৯৪৬), অবরোধ (১৯৪৭), গোত্রান্তর (১৯৬০)।
(টীকা: 'গোত্রান্তর' ছোটগল্পের লেখক সুবোধ ঘোষ)।

প্র : তাঁর রচিত নাটকের উপজীব্য কী?

উ : সমাজের নিচের তলার মানুষের জীবনচিত্র।

প্র : নাট্য রচনায় কোন মতবাদকে তিনি প্রাধান্য দেন?

উ : মার্কসবাদকে।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯শে জানুয়ারি, ১৯৭৮; কলকাতা।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?

উ : মাতার নাম সুষমা বড়ুয়া; পিতার নাম অরুণ কুমার বড়ুয়া।

প্র : তাঁর পিতা পেশায় কী ছিলেন?

উ : ডাক্তার।

প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?

উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাঙামাটি (সরকারি) উচ্চবিদ্যালয় থেকে।

প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?

উ : ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে।

প্র : তিনি কবে, কোথা থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন?

উ : ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বাংলার স্নাতক ডিগ্রি এবং পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্র : তিনি কোথা থেকে চাকরিতে অবসর গ্রহণ করেন?

উ : বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর সহকারী পরিচালক হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন।

প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : উপন্যাস: অচেনা (১৯৭৫), ভয় ভালোবাসা নির্বাসন (১৯৮৮), মুক্তিযোদ্ধারা (১৯৯১), শ্রমণ গৌতম (১৯৯৬), ইয়াসমিন (১৯৮৯), অশ্রু ও আগুনের নদী (২০০৬); ছোটদের উপন্যাস: রোবট ও ফুল ফোটানোর রহস্য (১৯৯৮), জানুমানিক স্বাধীনতা (১৯৯২), রাতের রেলগাড়িতে ছায়াপথে ভ্রমণ (২০০০); ছোটগল্প: যুদ্ধজয়ের গল্প (১৯৮৫), গায়চিল (১৯৮৬), স্বপ্নমিছিল (১৯৮৯), আমি মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি (১৯৯১), বনের ভেতরে অদ্ভুত রেস্তোরাঁ (২০০০); প্রবন্ধগ্রন্থ: কবিতায় বাক্‌প্রতিমা (১৯৭৬); নাটক: কুমড়োলতা ও পাখি (১৯৯৭); শিশুসাহিত্য: সূর্য লুঠের গান (১৯৮০), বাঘের উপর টাগ (১৯৯৩); জীবনী: বিদ্যাসাগর (১৯৮৮), পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন (১৯৯৭); প্রকৃতিবিষয়ক: কাছের পাখি দূরের পাখি (১৯৭৯), নদী মেখলা বাংলাদেশ (১৯৯৪), পাখির ভুবন (২০০২); ভ্রমণ-গ্রন্থ: অপরূপ মায়ানমার (২০০৩), মায়াবি জাপান (২০১০), ভূস্বর্গ ভ্রমণ: বাংলাদেশ (২০১১)।

প্র : বিপ্রদাশ বড়ুয়া কী কী পুরস্কার ও পদক লাভ করেন?

উ : কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), আন্তর্জাতিক যুবধর্ম পদক (১৯৮৫), অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৮), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯১), অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক (১৯৯৭)।

'মংডুর পথে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মংডুর পথে' ভ্রমণকাহিনিটি বিপ্রদাশ বড়ুয়ার কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উ : 'অপরূপ মায়ানমার'।

প্র : অপরূপ মায়ানমার কত খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়?

উ : ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : 'অপরূপ মায়ানমার' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : ভ্রমণকাহিনি।

প্র : টেকনাফ কোথায় অবস্থিত?

উ : বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলার নাম টেকনাফ। এই উপজেলার পূর্ব দিকে নাফ নদী এবং নদীর অপর প্রান্তে মায়ানমার দেশ অবস্থিত। নাফ নদীর নাম থেকে এ স্থানের নাম 'টেকনাফ' হয়েছে। টেকনাফ থানায় বিখ্যাত 'মাথিনের কূপ' আছে। এই মাথিনের কূপ নিয়ে আছে কিংবদন্তি এবং গ্রন্থ।

প্র : 'মায়ানমার'-এর পূর্বনাম কী?

উ : বার্মা।

প্র : ব্রিটিশ যুগ বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : যে সময় ব্রিটিশেরা এ অঞ্চল শাসন করেছে।

প্র : পাদরি কারা?

উ : খ্রিষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের পাদরি বলে।

প্র : সপ্তদশ শতাব্দী কোন সময়?

উ : ১৬০১ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : পর্তুগিজ কারা?

উ : পর্তুগাল দেশের অধিবাসী।

প্র : পর্তুগিজরা বসত-অঞ্চলকে কী বলতো?

উ : ব্যান্ডেল।

করছে।

প্র : 'খাঁচা-ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম।'– এটা কী?

উ : এটা একটি উপমা।

প্র : আরাকানের বর্তমান নাম কী?

উ : রাখাইন রাজ্য।

প্র : রাখাইন রাজ্য-এর রাজধানীর নাম কী?

উ : সিত্তিওয়ে।

প্র : আরাকান অর্থাৎ বর্তমানের রাখাইন রাজ্যের কোন দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত?

উ : আরাকান অর্থাৎ বর্তমানের রাখাইন রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগ অবস্থিত।

প্র : আন্দামান কী?

উ : আন্দামান বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলোর প্রায় সবই ভারতের অন্তর্ভুক্ত, ছোট্ট একটি-দুটি মায়ানমারভুক্ত।

প্র : 'আন্দামান সাগর' কী?

উ : আন্দামান সাগর হলো ভারত মহাসাগরভুক্ত সেই জলরাশি যা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, মায়ানমারের দক্ষিণ দিকে, থাইল্যান্ডের পশ্চিম দিকে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

প্র : ফেনি নদী কোনটি?

উ : এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়া একটি নদী।

প্র : দৌলত কাজী ও আলাওল কে ছিলেন?

উ : এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য এই গ্রন্থের দৌলত কাজী ও আলাওল অংশ দ্রষ্টব্য।

প্র : শুক্লপক্ষ কী?

উ : পূর্ণিমার চাঁদের উদয় থেকে অবসান পর্যন্ত সময়।

[illegible] ।

প্র : প্রৌঢ় কারা?

উ : যারা যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থাপ্রাপ্ত।

প্র : পাইক্যা কী?

উ : তিন চাকার রিক্সা জাতীয় ইঞ্জিন চালিত পরিবহন।

প্র : অনাথ কাকে বলে?

উ : এতিমকে।

প্র : পরখ করা কী?

উ : পরীক্ষা করা। (পরীক্ষা > পরখ)

প্র : 'দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মধ্যে তোশক।'– এটা কী?

উ : এটা একটি উপমা।

প্র : পটুয়াখালি কোথায় অবস্থিত?

উ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পটুয়াখালি আটটি উপজেলা নিয়ে গঠিত একটি জেলা। এটি বরিশাল বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পটুয়াখালিকে 'সাগরকন্যা' বলা হয়।

প্র : রাখাইন কারা?

উ : একটি জাতি-বিশেষ। বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালি জেলাতে এদের কিছু বসতি আছে। মায়ানমারে ব্যাপক সংখ্যক রাখাইন বাস করে।

প্র : 'পূর্বপুরুষের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। আমার পাশের থানা।'– লেখক কোন থানার অধিবাসী?

উ : রাঙ্গুনিয়া থানার।

প্র : চাকমা, মারমা কারা?

উ : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়ি নৃ-জনগোষ্ঠী।

প্র : বড়ুয়া কারা?

উ : মূলত চট্টগ্রামের সমতলে বাসকারী বাংলা ভাষী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী।

প্র : ধানি লঙ্কা কী?

উ : ধানের মতো ছোট কিন্তু প্রচুর ঝাল বিশিষ্ট [illegible]

চীবর কী?

উ : বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধানযোগ্য পোশাকবিশেষ।

প্র : রক্তখণ্ড।

উ : চীবর সাধারণত কোন রঙের হয়?

প্র : লাল বা লালের কাছাকাছি রঙের।

উ : 'ক্যা' কী?

প্র : মায়ানমারের মুদ্রানামের আঞ্চলিক উচ্চারণ।

উ : মায়ানমারের মুদ্রার প্রকৃত নাম কী?

প্র : ক্যাত (kyat)।

উ : প্যাগোডা কী?

প্র : বৌদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধদের প্রার্থনাগৃহ।

উ : ভাসমান দোকান কী?

প্র : যে দোকান স্থায়ী নয়– অস্থায়ী এবং চাকার গাড়ির ওপরে স্থাপিত।

উ : পুলকসহ খাওয়া কী?

প্র : আনন্দের সঙ্গে আহার করা।

উ : রোয়াইংগা কারা?

প্র : রোহিঙ্গাদের বোঝানো হচ্ছে।

উ : 'বয়' কারা?

প্র : খাবারের দোকানে পরিবেশনকারী হিসেবে যারা কাজ করে তাদের কথ্য ভাষায় 'বয়' বলে।

প্র : 'মহিলারা চিরস্বাধীন।'– এই বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : মায়ানমারে নারী স্বাধীনতা আছে ব্যাপক। নারীরা দোকানের মালিক, ভাসমান দোকান পরিচালনা, বাজারে দ্রব্য বিক্রি– সব কিছু করে, পুরুষেরা এতে কোনো আপত্তি বা বিপত্তি ঘটায় না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : মাতুলালয়, মুরারিপুর গ্রাম, চব্বিশ পরগনা।

উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর রচিত সাহিত্যে জগৎ ও অবিচ্ছিন্ন সত্তায় কী ধারণ করেছে?

উ : প্রকৃতি ও মানব জীবন।

প্র : তাঁর ভাষা কীরূপ?

উ : মধুর ও কাব্যধর্মী।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কী পরিস্ফুট হয়?

উ : গীতিকবির ব্যক্তিত্ব।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরাজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯), অশনি সংকেত (১৯৫৯) ইত্যাদি।

প্র : 'পথের পাঁচালী'র পরিচয় দাও।

উ : 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস এবং অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় সজনীকান্ত দাসের রঞ্জন প্রকাশালয়, কলকাতা থেকে। এই কাহিনির পটভূমিতে আছে বাংলাদেশের গ্রাম ও তার পরিচিত মানুষের জীবন। এর প্রধান অংশই হলো একটি শিশুর চৈতন্যের জাগরণ, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয়। প্রত্যেকটি আপাততুচ্ছ বিষয় ও ঘটনা নিয়ে আসে রহস্য ও সৌন্দর্যের আভাস, সবই মূল্যবান ও আনন্দময়। এই আনন্দ 'পথের পাঁচালী'র প্রাণ। এর তিনটি ভাগ : বল্লালী বালাই, আমআঁটির ভেঁপু, অক্রূর সংবাদ। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড 'অপরাজিত' (১৯৩১)। 'পথের পাঁচালী'র নায়ক বালক অপু। দ্বিতীয় অংশে অপুর কৈশোর ও যৌবনের কাহিনি। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। 'পথের পাঁচালী'র

রবীন্দ্রনাথের উচ্চমন্তব্য আছে। 'এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি।'

প্র : 'অপরাজিত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালী'র পরিপূরক কথাশিল্প হিসেবে রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'অপরাজিত'। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)। উপন্যাসটির প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল 'অলোক সারথী'। সর্বজয়ার মৃত্যু হলে অপুর জীবন স্বাভাবিক নিয়মেই অন্যদিকে মোড় নেয়। গড়ে উঠে অপর্ণার সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক। অল্পকালের ব্যবধানে অপর্ণার মৃত্যু, লীলার আত্মহত্যা অপুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিজ পুত্র শিশু কাজলকে মাতামহের বাড়িতে রেখে অপু নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অজানার পথে। একদিন ফিরেও আসে। দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসে সে দেখে নিজপুত্র কাজলকে। অপু কাজলের নিষ্পাপ মুখে আবিষ্কার করে নিজের হারিয়ে যাওয়া শৈশব, দিদি কিশোরী দুর্গাকে আর তাদের প্রিয় গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরকে। উপন্যাসে বলা হয়েছে, মানুষ সব ভুলতে পারে, ত্যাগ করতে পারে কিন্তু তার স্মৃতির শৈশব আর নিজের গ্রামীণ নিসর্গ প্রকৃতির আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে না; এই আহ্বান পরাভব মানে না কোনো কিছুর কাছে।

প্র : 'আরণ্যক' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আরণ্যক' (১৯৩৯) রচনার আগে কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন। সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অরণ্যচারী অজস্র মানুষের সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বহু বিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আশা ও আনন্দ এই কাহিনির উপজীব্য। উপন্যাসটি ডায়েরিরীতিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে রচিত। অরণ্যের সৌন্দর্য ও ভয়ালতা, অরণ্যবাসীর বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আর্যসভ্যতা এবং অনার্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের এমন তীব্র কাহিনি বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : ভানুমতী, বনোয়ারী, দোবরু পান্না, বুদ্ধু সিংহ, খাদা ইত্যাদি।

প্র : 'ইছামতী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে। ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানী বাঁড়ুয়ে কিংবা তার পুত্রত্রয় তিলু, বিলু, নীলু লেখকের নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ। একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিতে এদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন। গয়া মেম অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রাজারাম বেওয়ান পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইংরেজের চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে ছলচাতুরি ও জোচ্চুরি করেছে। ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির মনে যে বাণিজ্য-চেতনা জাগে নালুপাল যেন তারই প্রতীক। প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণের প্রতিনিধি নিস্তারিনী। নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে এ উপন্যাসে। একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নদীতীরবর্তী সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উপন্যাসটি চিহ্নিত।

প্র : 'দেবযান' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'দেবযান' (১৯৪৪) প্রেততত্ত্ব ও পারলোকতত্ত্ব-ভিত্তিক উপন্যাস। এই উপন্যাস রচনার জন্য বিভূতিভূষণ সর্বাধিক কাল ধরে পরিকল্পনা করেছিলেন। অবাস্তব ও অধিবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এর কাহিনি ও চরিত্রবিন্যাসের নিয়ামক। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৯৩৫) উপন্যাসে এ ধরনের চিন্তা প্রথম প্রকাশ পায়।

প্র : 'অশনি সংকেত' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের

করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন এই উপন্যাসটি। এটা প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৫৯ সালে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'অশনি সংকেতে'র পটভূমি বিভূতিভূষণের স্বগ্রাম বারাকপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও বনগ্রাম মহকুমা শহর। আর উপন্যাসের চরিত্রগুলো জীবন্ত, বাস্তবঘন ও স্বাভাবিক। 'অনঙ্গবৌ' নামে চরিত্রটি বাঙালির প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় সংসারে খুঁজে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটিকে সত্যজিৎ রায় একই নামে চলচ্চিত্রে রূপদান করেন। অনঙ্গবৌ চরিত্রে অভিনয় করেন বাংলাদেশের চিত্রাভিনেত্রী ববিতা, গঙ্গারাম চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণের বাস্তব অভিজ্ঞতার মানুষ, 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' এর প্রধান চরিত্র হাজারি ঠাকুরের অপূর্ণ স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষাকেই উপন্যাসে রূপদানের প্রয়াস করা হয়েছে। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ নিজে যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে লাভ করেছেন মানুষের ভালোবাসা। আর এর উপর ভিত্তি করে রচিত এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৪০ (১৩৪৭) খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : 'অনুবর্তন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তনে' (১৯৪২) ব্যক্তি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এখানে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে দলাদলি ও স্বার্থপ্রিয়তা দেখা যায় তা বিভূতিভূষণের নিজ চোখে দেখা। ক্ষেত্রবাবু, নারানবাবু, যদুবাবু, ছাত্র চুনি, যদু মুখুজ্জে ইত্যাদি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বল চরিত্র। এর মধ্যে যদু মুখুজ্জে নিজে ভালো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য স্ত্রীর প্রতি অবিচার করে, ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করে, আবার নিজের পাপের জন্য ভগবানের কাছে ক্ষমাও চায়। শেষে তার ট্রাজিক মৃত্যু ঘটে। বিভূতিভূষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র এই যদু মুখুজ্জে।

প্র : 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস অবলম্বনে কে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন?

উ : সত্যজিৎ রায়।

প্র : 'পথের পাঁচালী'র দ্বিতীয় খণ্ড কল্প নয়, কোন উপন্যাসকে?

উ : 'অপরাজিত' (১৯৩১)।

প্র : এই উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ।

উ : অপু, সর্বজয়া, হরিহর, অপর্ণা।

প্র : ঋত্বিক ঘটক তাঁর কোন উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করেন?

উ : 'অশনি সংকেত'।

প্র : তাঁর রচিত ছোটগল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), যাত্রাবদল (১৯৩৪), কিন্নরদল (১৯৩৮)।

প্র : তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?

উ : তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩)।

প্র : তাঁর রচিত পথের পাঁচালী উপন্যাসটি কোন কোন ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

উ : ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়।

প্র : তিনি কোন উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন?

উ : ইছামতী (১৯৪৯)।

প্র : তাঁর কোন উপন্যাসে অরণ্যচারী মানুষের জীবন প্রাধান্য পেয়েছে?

উ : 'আরণ্যক' (১৯৩৮)।

প্র : বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কী গুরুত্বের সঙ্গে এসেছে?

উ : প্রকৃতি ও দরিদ্র মানুষের জীবন।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।

'আহ্বান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আহ্বান' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য কী?

উ : মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শেই

5/13 20:55

ধার্মিক বলে [illegible]
অপরের জমি ও অন্য দ্রব্য ভোগ করে। এটা অন্যায় এবং অধর্মের কাজ।

প্র : 'বিচুলি' কী?
উ : বিচালি > বিচুলি অর্থ ধানের খড়।
প্র : 'বিচুলি' কোন শব্দ?
উ : 'দেশি' শব্দ।
প্র : 'নাটমন্দির' কী?
উ : 'নাট' অর্থ 'নাট্য ও গীতি' আর 'মন্দির' অর্থ 'ঘর'। নাটমন্দির হলো দেবমন্দিরের সম্মুখের সেই ঘর, যেখানে দেবদেবীর উদ্দেশে কীর্তন, নাচ বা গান করা হয়।
প্র : 'বাদলা নেমে গিয়েছে' কী?
উ : বর্ষা শুরু হয়ে গেছে।
প্র : 'বোষ্টম' কী?
উ : বৈষ্ণবদের কথ্যভাষায় বোষ্টম বলে। (বৈষ্ণব > বোষ্টম) এঁরা সাধারণত হরিনাম গেয়ে গেয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।
প্র : বৈষ্ণব কারা?
উ : যারা রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করেন, শ্রীচৈতন্য দেবের অনুসারী এবং অহিংস।
প্র : 'শুনহ মানুষ ভাই, / সবার ওপরে মানুষ সত্য, / তাহার ওপরে নাই।'– কার কথা?
উ : চণ্ডীদাসের।
প্র : চণ্ডীদাস কী ছিলেন?
উ : বৈষ্ণব কবি।
প্র : 'আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব' বলতে কী বোঝাচ্ছে?
উ : একমাত্র [illegible]

[illegible] ব্যবহার হয়। মানুষের ডাকনামও থাকতে পারে। মা, বাবা, বাল্যবন্ধুরা এই ডাকনামে ডাকেন। অনেক লেখক 'লেখক-নাম' ব্যবহার করেন; যেমন– শেখ আজিজুর রহমানের লেখক-নাম 'শওকত ওসমান'। লেখক-নামকে প্রচলিত কথায় ছদ্মনামও বলা হয়।

প্র : 'চণ্ডীমণ্ডপ' কী?
উ : চণ্ডী হলেন দুর্গা। মণ্ডপ হলো ছাদ বা চালাযুক্ত স্থান। দুর্গা যেহেতু বড় পূজা সেহেতু চণ্ডীমণ্ডপ বেশ বড় স্থান। গ্রামে এক-দুই বাড়িতেই চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। দুর্গা পূজা বাদে এখানে গ্রামের বড় বড় সভা-সমাবেশও হতো। সে বিচারে আজকের কমিউনিটি সেন্টারের ধারণাটি আসলে চণ্ডীমণ্ডপেরই পরিবর্তিত রূপ।
প্র : 'অম্বর' অর্থ কী?
উ : 'অম্বর'-এর দুটো অর্থ আছে: অম্বর অর্থ বস্ত্র; অম্বর অর্থ আকাশ।
প্র : 'কাপালি' কারা?
উ : এক জনগোষ্ঠী– যারা শ্মশান, নদী বা সমুদ্রতীরে তন্ত্রসাধনা করেন।
প্র : 'কুমোর' কী?
উ : 'কুমার'-এর কথ্য রূপ। 'কুমার' শব্দের একাধিক অর্থ আছে। এর একটি অর্থ হলো: যারা মাটির কাজ করে তারা কুমার বা কুমোর। এই গল্পে মাটি কেটে কুয়ো বানিয়েছে ভাদুই কুমোর।
[illegible]

আমরা আজের বদলে 'হ্যাঁ', 'ইয়েস', 'জি' ব্যবহার করি।

প্র : 'দুরবস্থা'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : দুর + অবস্থা

প্র : 'জষ্টি' মাস কোনটি?

উ : জ্যৈষ্ঠ মাসকে কথ্যভাষায় অনেকে জষ্টি মাস বলে।

প্র : জ্যৈষ্ঠ > জষ্টি শব্দটি কিভাবে হয়েছে?

উ : তৎসম থেকে তদ্ভব।

প্র : 'অদেষ্ট' কী?

উ : অদৃষ্ট > অদেষ্ট, অর্থ ভাগ্য।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পের পাঠের মূল উদ্দেশ্য কী?

উ : শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্তব্য পরায়ণতা ও নৈতিক চেতনার সৃষ্টি।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' কী?

উ : এটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কিশোরগল্প।

প্র : এই গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উ : নীলগঞ্জের ফলমান সাহেব।

প্র : এ গল্পে কিশোররা কুড়িয়ে পাওয়া অর্থ সম্পদ নিয়ে কিসের পরিচয় দেয় নি?

উ : লোভের।

প্র : তবে তারা কিসের পরিচয় দিয়েছে?

উ : তাদের বয়সের চেয়েও অনেক বেশি দায়িত্বশীলতার।

প্র : এ গল্পে লেখক কী দেখিয়েছেন?

উ : ছোট হলে কি হবে, তাদের নৈতিক অবস্থানও বেশ দৃঢ়।

প্র : এ গল্পে ঐক্য চেতনার সাথে সাথে কিসের পরিচয়ের প্রকাশ ঘটেছে?

উ : তাদের উন্নত মানবিক বোধের।

প্র : তাদের চারিত্রিক বিবেচনার সাথে সাথে কোন জিনিস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

উ : তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ।

প্র : এ গল্পে কী ফুটে উঠেছে?

উ : দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি ভালোবাসার চিত্র।

প্র : কাপালিক কাদেরকে বলা হয়?

উ : তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

প্র : আড়ি বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে?

উ : ধান, গম ইত্যাদি মাপার বেতের ঝুড়ি।

প্র : পত্রপাঠ বিদায় বলতে কী বুঝায়?

উ : তৎক্ষণাৎ বিদায়।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কোন সময়ের কথা বলা হয়েছে?

উ : কালবৈশাখীর।

প্র : এ গল্পে কতজন বন্ধুর নাম উল্লেখ আছে?

উ : পাঁচ জন।

প্র : বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?

উ : বিধূ।

প্র : বন্ধুরা নদীর ঘাটে কী করতে যায়?

উ : স্নান করতে।

প্র : বৈশাখ মাসে কোন দিকে মেঘ ডাকলে ঝড় ওঠে?

উ : পশ্চিম দিকে।

প্র : বইয়ে 'কালবৈশাখী'র ঝড় মানেই কী?

উ : আম কুড়ানোর সময়।

প্র : কাদের মাঠের বাগানের আম বেশ বিখ্যাত?

উ : বাড়ুয্যেদের। (বন্দ্যোপাধ্যায়কে কথ্যভাষায় এই বলে)

প্র : বাড়ুয্যেদের বাগানের কোন আম বিখ্যাত?

উ : চাঁপাতলীর।

প্র : সব বন্ধুর মনের শঙ্কা দূর করল কে?

উ : বিধূ।

প্র : সব বন্ধু কান পেতে মেঘের আওয়াজ কেমন টের পেল?

উ : গুড়গুড়।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে আম কিসের মতো ঝরছে?

উ : শিলাবৃষ্টির মতো।

প্র : ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ধ্বনি কেমন ছিল?

উ : চড়্ চড়্।

প্র : সবশেষে নদীর পথ দিয়ে ফিরছিল কারা?

উ : লেখক ও বাদল।

প্র : তারা দুজন বাক্সটি কোন অবস্থায় পেল?

উ : তালাবদ্ধ।

প্র : 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কাঁটা রয়েছে কোন গাছের ডালে?

উ : সাঁইবাবলার।

প্র : কে কে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছে?

উ : বিধু, সিধু, নিধু, তিনু ও বাদল।

প্র : কোন দিকের আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ?

উ : দূর পশ্চিম আকাশে।

প্র : কোন মাসে পশ্চিম দিকে মেঘের আওয়াজ হয়?

উ : বৈশাখ মাসে।

প্র : কেন তারা জলে নামবে না?

উ : কালবৈশাখী ঝড় হবে বলে।

প্র : কে লেখকের সব সংশয় দূর করেছিল?

উ : বিধূ।

প্র : আম ঝরছে কিসের মতো?

উ : শিলাবৃষ্টির মতো।

প্র : কে কে সন্ধ্যের অন্ধকারে নদীর ধারে পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে?

উ : লেখক ও বাদল।

প্র : কোন গাছের ডালে পথ ভর্তি?

উ : কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে।

প্র : কে একটা জিনিসের সঙ্গে হোঁচট খেল?

উ : বাদল।

প্র : এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে কী বলে?

উ : ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।

প্র : এ বাক্সে কোন গাঁয় টাকা কড়ি রাখে?

উ : পাড়াগাঁয়।

প্র : টিনের ক্যাশ বাক্সের সাথে লেখক ও বাদল কোথায় বসে?

উ : তেঁতুলতলায়।

প্র : আমগুলো একপাশে কী অবস্থায় পড়ে রইল?

উ : অনাদৃত।

প্র : কোথায় ভূত আছে?

উ : তেঁতুলতলায়।

প্র : বাক্সটি কার হতে পারে?

উ : কোনো গরিব লোকের।

প্র : কে কে হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলো?

উ : বাদল ও লেখক।

প্র : কোথায় এক গুপ্ত মিটিং বসলো?

উ : বাদলের ডাঙা নাটমন্দিরের কোণে।

প্র : কোন মাসের প্রথম দিক?

উ : জ্যৈষ্ঠ।

প্র : কোন মাসের কাগজ কেটে আনতে বললো?

উ : খুড়ির।

প্র : কার হাতের লেখা সুন্দর?

উ : বাদলের।

প্র : কয়টা কাগজে লিখে নদীর ধারে গাছে মেরে দেওয়া হলো?

উ : তিনখানা।

প্র : কিসের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হলো?

উ : বেলের আঠা দিয়ে।

প্র : তিনদিন পর কে এলো?

উ : কালোমতো লোক এলো।

প্র : লেখকদের নদীতে কী এলো?

উ : ভীষণ বন্যা।

প্র : কয়টা গরু ভেসে যেতে দেখা গেল?

উ : দু-একটা গরু।

প্র : কে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে?

উ : অম্বরপুর চরের কাপালিরা।

প্র : কোন মাসে কাপালি নির্দিষ্ট খোলার হাট থেকে আসছিল?

উ : গত জষ্টি মাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে।

প্র : ডবল টিনের বাক্সে কী রয়েছে?

উ : প্রায় আড়াই শো টাকার গয়না ও নগদ টাকা পঞ্চাশটি।

প্র : কে এই ব্যাপার দেখে অনেক অবাক হয়ে গেল?

উ : লেখকের বাবা।

প্র : বিকট গরমে সকলে নদীর ঘাটে কেন গিয়েছিল?

উ : নাইতে বা স্নান করতে বা গোসল করতে।

প্র : বিধু, সিধু, নিধু, তিনু ও বাদলের দলের মধ্যে কার বয়স বেশি ছিল?

উ : বিধূর।

প্র : সকলে কান খাড়া করে কী শুনতে পেয়েছিল?

উ : মেঘের আওয়াজ।

প্র : কোন মাসে পশ্চিম আকাশে মেঘ ডাকে?

উ : বৈশাখ।

প্র : কালবৈশাখী মানে কী?

উ : বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড ঝড়।

প্র : ঝড়ের সময় পশ্চিম দিক থেকে কী উড়ে আসতে লাগল?

উ : কালো মেঘের রাশি।

প্র : কে সবচেয়ে বিজ্ঞ?
উ : বিধু।
প্র : কী পড়ে পথ থেকে গিয়েছিল?
উ : ডালপালা।
প্র : বাদল কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল?
উ : টিনের বাক্স।
প্র : টিনের বাক্সে কী রাখা হয়?
উ : টাকাকড়ি।
প্র : টিনের বাক্স নিয়ে তারা কোথায় বসে পড়ে?
উ : ভেঁতুলতলায়।
প্র : শীতে কেঁপে মরছি এ কথাটি কে বলে?
উ : বাদল।
প্র : কে ভালো ভাতের কথা বলেছে?
উ : বাদল।
প্র : বাদলদের বাড়ির কোথায় বাক্সটি রাখা হয়?
উ : বিড়লিগাদায়।
প্র : বর্ষার দিন আকাশ কেমন দেখায়?
উ : মেঘাচ্ছন্ন।
প্র : কোন ফুল থেকে বর্ষায় হাওয়ার সাথে মিষ্টিগন্ধ ভেসে আসে?
উ : চাঁপাফুল।
প্র : নরহরি বোষ্টমের ডোবায় কী ডাকছে?
উ : ব্যাঙ
প্র : কার আসেপে মিটিং বসে?
উ : বিধুর।
প্র : তাদের সকলের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব কী ছিল?
উ : বাক্স ফেরত দেওয়া।
প্র : বিধু ঘুড়ির মাপে কী কেটে আনতে বলেছিল?
উ : কাগজ।
প্র : তারা কাগজে লিখে কোথায় কাগজ লাগাল?
উ : নদীর ধারে রাস্তায়।
প্র : 'ইন্দিরভীষণ' কে?
উ : গল্পের কথক। এটি তাঁর নামের বিকৃত উচ্চারণ। মনে হয়, এখানে প্রকৃত নাম 'ইন্দ্রভূষণ' বোঝানো হয়েছে। তবে এটি 'বিভূতিভূষণ' নাম নয়।
প্র : 'সুদ্ধ' কী?
উ : সুদ্ধ অর্থ সমেত। 'শুদ্ধ' আর 'সুদ্ধ' দুই শব্দ, দুই অর্থ।

বিষ্ণু দে

প্র : বিষ্ণু দে কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কলকাতা, ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি, প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক।
প্র : তিনি কোন সাহিত্যগোষ্ঠীর লেখক?
উ : কল্লোল সাহিত্যগোষ্ঠী।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন ছিলেন?
উ : পরিচয় (১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত)
প্র : তাঁর প্রকাশিত অপর পত্রিকার নাম কী?
উ : সাহিত্যপত্র (১৯৪৮)।
প্র : বিষ্ণু দের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : কবিতা : উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ (১৯৬৩), সেই অন্ধকার চাই (১৯৬৯), রবিকরোজ্জ্বল নিরুদ্দেশ (১৯৮০)।
প্র : 'উর্বশী ও আর্টেমিস' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিষ্ণু দে রচিত এই কাব্যগ্রন্থে দেশি ও বিদেশি মিথের প্রয়োগ আছে। সমাজ রোমান্টিকতার বিরোধী বিষ্ণু দে-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি প্রথম সচেতন ব্যক্তি ছিলেন বলে আর্টেমিসের চিত্রকল্পের সঙ্গে উর্বশীর চিত্রকল্পের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। এগুলি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : উর্বশী, উর্বশী ও আর্টেমিস, প্রেম, হেম, পলায়ন, রাত্রিশেষ ইত্যাদি।
প্র : তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্য কী?
উ : তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের সঙ্গে বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটান। তাছাড়া মার্কসীয় মতবাদকে নিজের মতো করে প্রয়োগ করেন।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলোর নাম কী?
উ : সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৬৮), রবীন্দ্রনাথ : শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (১৯৬৬)।
প্র : তাঁর রচিত অনুবাদ সাহিত্যের নাম কী?
উ : এলিয়টের কবিতা (১৯৫০)।
প্র : তিনি সাহিত্য রচনার জন্য কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : ১৯৫৫-তে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার ও ১৯৭২-এ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।
প্র : তিনি তাঁর রচনায় কী উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শন করেন?
উ : মার্কসীয় তত্ত্বকে জীবনাবেগ ও শিল্পসম্মত করে।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৮২।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : নিমতলা, কলকাতা।
প্র : তিনি কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২৩শে মে, ১৮৩৫।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তিনি কী কী মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : পূর্ণিমা (১৮৫৯), সাহিত্য সংক্রান্তি (১৮৬৩), অবোধ বন্ধু (১২৭৫)।
প্র : তিনি বাংলা সাহিত্যের কীসের স্রষ্টা?
উ : আধুনিক গীতিকবিতার।
প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত কবিতায় প্রথম বিশুদ্ধভাবে কী প্রকাশিত হয়?
উ : কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস।
প্র : তিনি গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কী হিসেবে খ্যাত?
উ : রবীন্দ্রনাথের গুরু হিসেবে।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গীতিকবিতার ধারার কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?
উ : ভোরের পাখি।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গীতিকবিতার ধারার ভোরের পাখি বলার কারণ কী?
উ : বিহারীলালই প্রথম বাংলায় ব্যক্তির আত্মলীনতা, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছ্বাস সমাবেশে কবিতা রচনা করে বাংলা কবিতাকে নতুন এক মোড় দান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রথম। তাই তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়েছে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বঙ্গসুন্দরী (১৮৪৮), সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), সাধের আসন (১৮৭০), প্রেম প্রবাহিণী (১৮৭০) ও সারদা মঙ্গল (১৮৭৯)।
প্র : 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিহারীলালের প্রথম সার্থক গীতিকবিতার গ্রন্থ 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০)। এ কাব্যে কবি বলেছেন। 'সবখানি হৃদ্ ভরে মন / নিখিল ভুবন ভরুক / চরাচরকে আপনারা / উঃ কি ফুলর ফুলা / অন্তরেতে পড়ক পড়ক।' রবীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন। 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম কোন কবির নিজের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।' গ্রন্থটির প্রথম সর্গ উপহার, দ্বিতীয় সর্গ নারীবন্দনা, তৃতীয় সর্গ সুরবালা, চতুর্থ সর্গ চিরপরাধিনী, পঞ্চম সর্গ বঙ্গসুন্দরী, ষষ্ঠ সর্গ বিদায়িনী, সপ্তম সর্গ প্রিয়তমা, অষ্টম সর্গ বিরহিণী, নবম সর্গ প্রিয়তমা ও দশম সর্গ অন্তর্যামিনী নামকরণ করা হয়েছে।
প্র : 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সারদামঙ্গল' ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। এটি পঁচ সর্গে ত্রিপদী দীর্ঘ স্তবকময় লালিত্যপূর্ণ ভাষায় রচিত। কাব্যের প্রথম সর্গে কবির মনোজগতে এক কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব, দ্বিতীয় সর্গে হারানো আনন্দ লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে কবির মানসভ্রমণ, তৃতীয় সর্গে কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব, চতুর্থ সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে কবিচিত্তের আশ্বাস লাভ, পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের পুণ্যভূমিতে কবির আনন্দ উপলব্ধির চিত্র পাওয়া যায়। 'সারদামঙ্গল' কাব্য সম্পূর্ণরূপে জীবনরহিত, বিশেষ সৌন্দর্যধ্যান। শেলির মতো বিহারীলাল তাঁর প্রিয়তমার মধ্যে সারদাকে অন্বেষণ করেছেন এবং দীর্ঘ বিরহের পর হিমাদ্রিশিখরে ভাব-সম্মিলনের চিত্র অঙ্কন করে কবি কাব্যের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

প্র : 'সাধের আসন' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বিহারীলালের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাধের আসন'কে (১৮৮৯) 'সারদামঙ্গল' কাব্যের পরিশিষ্ট বলা যায়। কোনো এক সম্ভ্রান্ত বিবাহিত নারী কবির 'সারদামঙ্গল' কাব্য পাঠ করে নিজ হাতে একটি আসন বুনে কবিকে উপহার দিয়েছেন। সেখানে ওই নারী কবিকে প্রশ্ন করেছেন, তুমি কাকে ধ্যান কর? এর উত্তর স্বরূপ বিহারীলাল 'সাধের আসন' লিখেছেন। শুরুই করেছেন এভাবে : 'ধেয়াই কাহারে দেবী নিজে আমি জানি নে / কবিগুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।' এ কাব্যের সূচনাতে কবির রোম্যান্টিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু কাব্যের শেষে তা মিস্টিসিজমে রূপান্তরিত। উপসংহার ছাড়া 'সাধের আসন' কাব্য দশ সর্গ বিশিষ্ট। এর প্রথম সর্গ মাধুরী, দ্বিতীয় সর্গ গোধূলি ও নিশীথে, তৃতীয় সর্গ প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা, চতুর্থ সর্গ নন্দনকানন, পঞ্চম সর্গ অমরাবতীর প্রবেশ পথ, ষষ্ঠ সর্গ তুমি, সপ্তম সর্গ মায়া, অষ্টম সর্গ শশিকলা, নবম সর্গ আসনদাত্রী, দশম সর্গ পতিব্রতা নামকরণ করা হয়েছে। অনেকের মতে, এই কাব্যে কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন এবং এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য।

প্র : সর্বদা হুহু করে মন/ বিশ্ব যেন মরুর মতন— কোন কবির লেখা?

উ : বিহারীলালের।

প্র : বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

উ : সৌন্দর্যপিয়াসী প্রকৃতি প্রেমিক কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীর কবিতায় সমাজ সমকাল ও সমকালীন সমস্যাবলি ততোটা প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু কবিতার চরণে ছন্দে ঢেউ তুলেছে নূপুর-নিক্বণ। মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির রস পান করেছেন যেভাবে, সেই-মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে তার কবিতায়। নগরবাসের অভিজ্ঞতা কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন করতে পারে নি তাঁর সলজ্জ সরস মানসভূমিকে।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ২৪শে মে, ১৮৯৪; কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু

প্র : বুদ্ধদেব বসুর জন্মসাল কবে?

উ : ৩০শে নবেম্বর, ১৯০৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কুমিল্লা।

প্র : রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যে কাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়?

উ : বুদ্ধদেব বসুকে।

প্র : তিনি মূলত কী কী ছিলেন?

উ : কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক।

প্র : তিনি বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজিতে।

প্র : জগন্নাথ হলের ছাত্র অবস্থায় তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যা আজও বের হয়। তার নাম কী?

উ : বাসন্তিকা।

প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?

উ : প্রগতি (১৯২৭-২৯) ও কবিতা (১৩৪২-৪৭)।

প্র : হুমায়ুন কবিরের সাথে তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা কোনটি?

উ : চতুরঙ্গ।

প্র : তাঁর রচিত কবিতাগ্রন্থের নাম কী?

উ : মর্মবাণী (১৯২৫), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দময়ন্তী (১৯৪৩), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮), মরচেপড়া পেরেকের গান (১৯৬৬), একদিন চিরদিন (১৯৭১), স্বাগত বিদায় (১৯৭১) ইত্যাদি।

প্র : 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'কঙ্কাবতী' (১৯৩৭) বুদ্ধদেব বসুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯-৩৪ এবং প্রধান বিষয় প্রেম। সংগীতময় ভাষা এবং উচ্চারণের সংক্ষেপের জন্য কাব্যগ্রন্থটি সমকালে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

প্র : 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসটি কার?

উ : অন্নদাশঙ্কর রায়।

প্র : 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'দয়মন্তী' (১৯৪৩) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি ১৯৩৫-৪২ সালের মধ্যে রচিত হয়। এই কাব্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের কবিতায় একটি পালাবদল লক্ষ করা যায়। ভিত্তি ত্রিপাঠীর মতে, এ কাব্যে বাংলা ও পূজার রসের যৌক্তিক মিলন ঘটেছে।

প্র : 'কবিতা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'কবিতা' (১৯৩৫) বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা। এ পত্রিকা শুধু কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক আলোচনার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনদিনে পতাকীতে ঢাকা থেকে হরিশ্চন্দ্র মিত্র একটি কবিতা পত্রিকার সূত্রপাত করেন কিন্তু তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। তিন দশক ধরে 'কবিতা' পত্রিকা বাংলা কবিতার গতিপ্রকৃতির পরিচয় যেমন ধরে রেখেছে, তেমনই গড়ে তুলতে চেয়েছে বিশেষ রুচি ও আদর্শ। প্রথম কয়েক বছর এর সম্পাদনায় যুক্ত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমর সেন। বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান কবি 'কবিতা'র সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। 'কবিতা'র শততম সংখ্যা ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬১-তে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়।

প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : সাড়া (১৯৩০), সানন্দা (১৯৩৩), লালমেঘ (১৯৩৪), পরিক্রমা (১৯৩৮), কালো হাওয়া (১৯৪২), তিথিডোর (১৯৪৯), নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১), মৌলিনাথ (১৯৫২), নীলাঞ্জনের খাতা (১৯৬০), রাত ভরে বৃষ্টি (১৯৬৭) ইত্যাদি।

প্র : 'তিথিডোর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'তিথিডোর' (১৯৪৮) উপন্যাস প্রথম শ্রাবণ, করুণ রঙিন পথ, যবনিকা কম্পমান এই তিনখণ্ডে বিভক্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শিল্পিত স্বভাব নর-নারীর জীবনযাপনের মনোরম ও মধুর কাহিনি এ উপন্যাসে বর্ণিত। কাহিনির মূল উপজীব্য প্রেম ও যৌবনের বন্দনা। এই কাহিনির গীতল ভাষা ও কাব্যময়তা এবং এর শেষাংশে প্রযুক্ত 'চৈতন্যপ্রবাহ'-ধর্মী বর্ণনাভঙ্গি দেখা যায়।

প্র : 'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : পলাশ ও রেবার মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারই স্মৃতি ধরে উভয়ের মনে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। রেবা নতুনভাবে প্রেমের অভিষেক করতে চায় কিন্তু পলাশ বুঝতে পারে তা সম্ভবপর নয়। এরকম একটি কাহিনি নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর রচিত 'একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে।

প্র : বুদ্ধদেব বসুর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : বুদ্ধদেব বসুর কবিতাগুলির বাচনভঙ্গির বক্রতা এবং আধুনিক দুর্বোধ্যতা নেই। রোমান্টিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বেশি বয়সের রচনাগুলিতে। বুদ্ধদেবের রচনাতেই সর্বপ্রথম কাব্যরীতিতে কথ্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক কাহিনি প্রসঙ্গ বা চিত্রকল্প নির্মাণেও কবি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। দ্রৌপদীর শাড়ি দময়ন্তী, কঙ্কাবতী শীতের প্রার্থনা প্রভৃতি কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সকল কারণে সমকালীন কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি।

প্র : বুদ্ধদেব বসুকে নাগরিক কবি বলা যেতে পারে। কেন?

উ : বুদ্ধদেবের কাব্যে সমাজচেতনা বিশেষভাবে প্রকাশ না পেলেও বাস্তববাদিতা ও নাগরিক চেতনা প্রকাশে সর্বগ্রহণ্য। এ জন্যই তাঁকে নাগরিক কবি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তাঁর কবিতায় নগর উঠে এসেছে মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। আগে যে অভিজ্ঞতা মানুষ প্রকাশ করে নি বুদ্ধদেব তা প্রকাশ করেন। বিশেষ করে রাতের নগর এবং এর বাস্তবতা তুলে ধরতে বুদ্ধদেবই আগ্রহী করেন পরবর্তীকালের কবিদের।

প্র : তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), হাওয়া বদল (১৯৪৩) ইত্যাদি।

প্র: কয় ভাই, কয় বোন?
উ: এক ভাই, দুই বোন।
প্র: কানাইয়ের অবস্থান কত?
উ: কানাই মেঝো।
প্র: ছোকানু নামের কী অর্থ করা যায়?
উ: ছোট কানু > ছোকানু অর্থাৎ আদুরে।
প্র: পৌরাণিক কানাই কে?
উ: কৃষ্ণ।
প্র: 'উনুন' কি?
উ: চুলা (যেখানে আগুন জ্বেলে রান্না করা হয়)।
প্র: 'উনুন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?
উ: সংস্কৃত 'উদ্‌স্মান' শব্দ থেকে।
প্র: 'পইঠা' কী?
উ: সোপান বা সিঁড়ি। এখানে নৌকার প্রান্ত বোঝাচ্ছে।
প্র: 'পইঠা' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?
উ: সংস্কৃত 'প্রতিষ্ঠা' শব্দ থেকে 'পইঠা' শব্দটি এসেছে।
প্র: 'সূর্য লুকোলো–' মানে কী?
উ: সূর্য ডুবলো।
প্র: কানাইয়ের দায়িত্ব-জ্ঞানের কতটুকু পরিচয় আছে?
উ: কানাই খুবই দায়িত্বশীল। বোন ছোকানুর চোখে যখন ঘুম আসে তখন সে জেগে থাকতে চায়। গল্প শুনতে শুনতে তারও যখন ঘুম পায় তখন সে মাঝিকে বলে, তার বোন খুবই ভিতু, সে যেন ঘুমন্ত ছোকানুকে দেখে রাখে। ঝড় এলে কানাই নিজেকে ডাকতে বলেছে, তবু বোনের ঘুম যেন না ভাঙানো হয়– এই তার নিবেদন।

বেনজীর আহমদ

প্র: বেনজীর আহমদ কত সালে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ১৯০৩, নরসিংদীর ধানুয়ায়।
প্র: তিনি কী ছিলেন?
উ: কবি ও সম্পাদক।
প্র: তিনি কত সালে কোন পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন?
উ: ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে, নওরোজ পত্রিকা।
প্র: তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ: বন্দীর বাঁশী ও বৈশাখ (১৯৬২)।
প্র: রাজনৈতিকভাবে তিনি কোন মতে বিশ্বাসী ছিলেন?
উ: পাকিস্তান আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। আয়ুবি মৌলিক গণতন্ত্রের সুযোগে ঢাকা-৬ থেকে এমএলএ হন।
প্র: পাকিস্তানে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ: তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে জুন পাকিস্তান সরকার বেতার টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ ঘোষণা করলে বেনজীর আহমদ এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।
প্র: তিনি কী ধরনের কবি ছিলেন?
উ: মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
প্র: তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান কত সালে?
উ: ১৯৬৪-তে, কবিতায়।
প্র: তার মৃত্যুতারিখ কত?
উ: ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।

মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ

প্র: মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ কে ছিলেন?
উ: একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক।
প্র: তিনি কোন দেশের বাসিন্দা?
উ: পর্তুগালের। জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ।
প্র: বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম স্মরণ করা হয় কেন?
উ: কারণ তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা।
প্র: মনোএলের ব্যাকরণ কী?
উ: মনোএলের আগে কেউ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন নি। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে রোমান লিপিতে মনোএল দুটি বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ করেন। গ্রন্থ দুটি হলো : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং 'ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ'। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই

পোরতুগিজ' মূলত অভিধান গ্রন্থ। তবুও এই গ্রন্থেই মনোএল অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ একটি অধ্যায়ে সংযোজন করেন। এটাকেই মনোএলের ব্যাকরণ বলে এবং এ কারণেই তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্র : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র পরিচয় দাও।

উ : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৫) মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ নামক পর্তুগিজ খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়। গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টধর্মের মহিমা কীর্তন এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

মমতাজ উদদীন আহমদ

প্র : মমতাজ উদদীন আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের মালদহে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : নাট্যকার।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : নাটক : হৃদয় ঘটিত ব্যাপার স্যাপার, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, কী চাহ শঙ্খছিল, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা, সাত ঘাটের কানাকড়ি, রাক্ষুসি, এই সেই কণ্ঠস্বর, পুত্র আমার পুত্র, হাস্য লাস্য ভাষ্য, বটবৃক্ষের ধরমকরম, ভালোবাসার দশ নাটক, ওহে তঞ্চক।

উপন্যাস : সজল তোমার ঠিকানা, এক যে জোজো এক যে মধুমতী।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, শিশু একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, বাচসাস চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও চিত্রনাট্য পুরস্কার, একুশে পদক (নাটক ১৯৯৭), শেলটেক পুরস্কার (২০০৫)।

'সুখী মানুষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'নাড়ী' ও 'নারী' শব্দের অর্থের পার্থক্য কী?

উ : 'নাড়ী' অর্থ রক্তবাহী শিরা বা ধমনি, 'নারী' অর্থ স্ত্রীলোক।

প্র : 'সুবর্ণ' শব্দের অর্থ কী?

উ : সোনা।

প্র : 'ব্যারাম' শব্দের অর্থ কী?

উ : অসুখ।

প্র : 'ব্যারাম' শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : বিদেশি উপসর্গযোগে। ফার্সি উপসর্গ 'বে + আরাম' = বেআরাম > বেরাম > ব্যারাম।

প্র : 'মূর্খ' এবং 'মুখ্য' শব্দের অর্থের কী?

উ : 'মূর্খ' অর্থ জ্ঞানহীন; 'মুখ্য' অর্থ 'প্রধান'। লক্ষণীয়: একটি বানানে ম-এর উ-কার, অন্যটিতে উ-কার।

প্র : 'বাঘের চোখ আনা' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : সুকঠিন কর্ম সম্পাদন। এটি একটি বাগধারা।

প্র : 'জবরদস্তি' অর্থ কী?

উ : 'অত্যাচার'।

প্র : 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' কী জাতীয় প্রয়োগ?

উ : এটি একটি প্রবাদ।

প্র : 'ব্যামো' কী?

উ : ব্যাধি বা রোগ।

প্র : 'ব্যামো' কোন শব্দ?

উ : সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ।

প্র : 'ফতুয়া' কী?

উ : ক্ষুদ্রাকৃতির গলাকাটা জামাবিশেষ।

প্র : 'ফতুয়া' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'বনে যে কাঠ কাটে'— এককথায় তাকে কী বলে?

উ : কাঠুরিয়া বা কাঠুরে।

প্র : 'কবিরাজ' বলতে কাদের বোঝায়?

উ : আগে তৃণ বা গাছগাছরা ঔষধ হিসেবে প্রদান করে অনেকে রোগের চিকিৎসা করতেন। এই পদ্ধতিকে আয়ুর্বেদ বলা হয়। যারা এই চিকিৎসা করতেন তাদের কবিরাজ বলা হতো। তখন আজকের মতো ডাক্তার ছিল না। এখনো খুব অল্প সংখ্যক কবিরাজ আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়।

প্র : 'সুখী মানুষ'কে 'নাটিকা' বলা হয়েছে। 'নাটিকা' কী?

উ : 'সুখী মানুষ' একটি ছোট নাটক। ছোট নাটককে 'নাটিকা' বলা হয়।

মহাদেব সাহা

প্র : মহাদেব সাহা কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৪ সালের ৫ই অগস্ট, সিরাজগঞ্জে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কবি ও সাংবাদিক।

প্র : তিনি কোন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন?

উ : দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : কবিতা : এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২), মানব এসেছি কাছে (১৯৭৩), কী সুন্দর অন্ধ (১৯৭৮), তোমার পায়ের শব্দ (১৯৮২), ফুল কই শুধু অস্ত্রের উল্লাস (১৯৮৪), আমি ছিন্ন ভিন্ন (১৯৮৬), তোমার জন্য অন্ত্যর্মিল (১৯৯৬), ভুলি নাই তোমাকে রুমাল (১৯৯৬), অন্তহীন নৃত্যের মহড়া (১৯৯৭)। প্রবন্ধ : আনন্দের মৃত্যু নেই (১৯৮৪), মহাদেব সাহার কলাম (১৯৯২), কবির দেশ ও অন্যান্য ভাবনা (১৯৯৯)।

প্র : 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস' কাব্যগ্রন্থর পরিচয় দাও।

উ : মহাদেব সাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে রয়েছে মোট ৪২টি কবিতা। কবিতাগুলোতে স্থান পেয়েছে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, স্বদেশের করুণতম ট্র্যাজেডি, শৈশব স্মৃতি, মানুষের জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যক্তির অনুভূতি ও অস্তিত্ববাদী বেদনার চিত্র অঙ্কনে কবি চিত্রকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন। এ কারণে জিরাফের ভয়ঙ্কর গলা তক্ষকের ডাক, লেকের জলের সানের মধ্যে চিত্রকল্পের সন্ধান করেছেন এবং তার প্রয়োগ হয়েছে সার্থকতাসে।

প্র : 'আনন্দের মৃত্যু নেই' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : কবি মহাদেব সাহার এই প্রবন্ধের বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি মূলত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক। লেখক রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরেছেন গ্রন্থটিতে। এই পুস্তকটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত আছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'প্রাণের মাঝে সুধা আছে' দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'কবিতার মৃত্যু' এবং তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'আনন্দের মৃত্যু নেই'।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩), জেবুন্নেসা-মাহবুব উল্লাহ পুরস্কার (১৯৯৪), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৫)।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্র : মধুসূদন দত্তের জন্মতারিখ কত?

উ : ২৫শে জানুয়ারি, ১৮২৪।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : সাগরদাঁড়ি, যশোর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি ও নাট্যকার।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় দক্ষ ছিলেন?

উ : বাংলা, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, হিব্রু, পারসি, জার্মান, ইটালিয়ান, তামিল ও তেলেগু।

প্র : তাঁর রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

উ : Captive Ladie (১৮৪৯; ইংরেজিতে লেখা)। (Captive অর্থ বন্দি)।

প্র : মধুসূদন রচিত ও প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থের নাম কী?

উ : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক।

প্র : তাঁর রচিত প্রহসনগুলোর নাম কী?

উ : একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০) ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০)।

2020/5/13 20:55

প্র : তিনি আর কী কী বাংলা নাটক রচনা করেন?

উ : পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।

প্র : 'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) পত্রকাব্য। পত্রাকারে এ ধরনের কাব্য বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। রোমান কবি পাবলিয়াস ওভিডিয়াস ন্যাসো সংক্ষেপে ওভিদের 'হেরোইদাইদস' কাব্যের অনুসরণে এই গ্রন্থ রচিত। এখানে মোট এগারটি পত্র আছে। দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সোমের প্রতি তারা, নীলধ্বজের প্রতি জনা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক নারীরা মধুসূদনের হাতে যেন আধুনিক মানুষ হিসেবে পুনর্মূল্যায়িত হয়ে নিজেদের প্রণয়-কামনা ইত্যাদি প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত নয়। এই গ্রন্থ রচনার জন্য সমকালে মধুসূদন নিন্দিত হয়েছিলেন।

প্র : 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকের কাহিনি উইলিয়াম টডের 'রাজস্থান' নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। এই নাটকে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি রচনা করেন। এজন্য নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো : কৃষ্ণকুমারী, মদনিকা, ভীম-সিংহ, জগৎসিংহ, ধনদাস প্রমুখ। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হলেও নাটকটি রচিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে। রচনার প্রায় সাত বছর পর এ নাটক 'শোভাবাজার থিয়েটারে' ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম অভিনীত হয়।

প্র : 'কৃষ্ণকুমারী' কোন জাতীয় নাটক?

উ : বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক।

প্র : মহাভারতের সুন্দ ও উপসুন্দ কাহিনিকে অবলম্বন করে তাঁর রচিত কাহিনির নাম কী?

উ : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য (১৮৬০)।

প্র : তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্যের নাম কী?

উ : ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১)।

প্র : তাঁর রচিত অমর মহাকাব্যের নাম কী?

উ : মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)।

প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনি কোন মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে?

উ : সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ণ।

প্র : 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র পরিচয় দাও।

উ : সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণে'র ক্ষুদ্র অংশের কাহিনি অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দেই প্রকাশ পায়। এটা মধুসূদনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) তাঁর প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিস্তৃত পটভূমির মধ্যে নানা ধরনের চরিত্র এবং নানা রসের সমাবেশ ঘটেছে। কবি কাব্যের প্রথম দিকে বীররসের কথা বললেও এই কাব্যে করুণরসই প্রধান। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে রাবণকে নায়ক ও রামকে খলনায়ক করে মধুসূদন রচনা করে এই স্বাধীনতাভিলাষী কাব্য। নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ থেকে মেঘনাদ-হত্যা, প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত মোট তিন দিন দুই রাতের ঘটনা বর্ণিত। এ কাব্যের ট্রাজেডি সৃজন হয়েছে নায়ক রাবণ চরিত্রকে অবলম্বন করে। কবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' মহাকাব্যে শয়তান যেমন দুর্জয় বাসনা ও ঋজুতা প্রদর্শন করে, মধুসূদনও রাবণকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছেন। ভাব-ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে কবি বিদেশি ক্লাসিক রীতি আয়ত্ত করে তা বাংলায় ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন সর্গে বীরত্ব, অভিমান, আক্ষেপ ইত্যাদি প্রকাশিত। কয়েকটি প্রধান চরিত্র : রাবণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, রাম, প্রমীলা, বিভীষণ, সীতা, সরমা ইত্যাদি।

প্র : 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্গগুলোর নাম লেখ।

উ : প্রথম সর্গ > অভিষেক
দ্বিতীয় সর্গ > অস্ত্রলাভ
তৃতীয় সর্গ > সমাগম
চতুর্থ সর্গ > অশোক বন
পঞ্চম সর্গ > উদ্যোগ
ষষ্ঠ সর্গ > বধ
সপ্তম সর্গ > শক্তিনির্ভেদ
অষ্টম সর্গ > প্রেতপুরী
নবম সর্গ > সৎক্রিয়া।

প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনির বিস্তার কোন ঘটনা থেকে কোন ঘটনা পর্যন্ত?

উ : মেঘনাদবধ কাব্যে মোটি সর্গে সম্পূর্ণ, কাহিনিবিস্তার- বীরবাহুর নিধন সংবাদ থেকে মেঘনাদের হত্যা এবং প্রমীলার মৃত্যু ও চিতারোহণ পর্যন্ত। এই মহাকাব্যে মোট তিনদিন ও দুরাত্রির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্র : মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন কোন কোন পাশ্চাত্য কবি ও কাব্য থেকে ঋণ গ্রহণ করেন?

উ : মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় মধুসূদন কবি ভর্জিলের ইনিড। দান্তের ডিভাইন কমেডি, হোমারের ইলিয়াড ও মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট থেকে বহু কাহিনিসূত্র ও চরিত্রাদর্শ অনুসরণ করেছিলেন।

প্র : মেঘনাদবধে চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন পাশ্চাত্যের কোন কবির চরিত্রের ঋণিকটা প্রভাব স্বীকার করেছিলেন?

উ : চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন ইংরেজ কবি মিল্টনের প্যারাইডাস লস্ট-এর চরিত্রের আংশিক প্রভাব স্বীকার করেছিলেন।

প্র : ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কোন শ্রেণির কবিতা সংকলিত হয়েছে? কবি কাব্যটিকে কয় খণ্ডে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন? এই কাব্যে রাধা সম্পর্কে কবি কী বলেছেন?

উ : ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলি ওড্ (ode)-জাতীয় গীতিকবিতা। মধুসূদন কাব্যটিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন, বিরহ ও মিলন। তবে 'মিলন' খণ্ডটি তিনি লিখে যেতে পারেন নি। এই কাজে রাধা সম্পর্কে মধুসূদন বলেছেন রাধা হলেন 'Poor Old Mrs. Radha of Braja'. (ব্রজের হতভাগিনী নায়িকা রাধা)

প্র : মেঘনাদবধ কাব্যের সনেট বর্ণনায় মধুসূদন কোন্ বিদেশি কবির কোন কাব্যকে অনুসরণ করেছিলেন?

উ : মেঘনাদবধ কাব্যের সনেট বর্ণনায় মধুসূদন কবি ভার্জিলের ইনিড এবং দান্তের Divine comedy-র বর্ণিত সনেটের রীতি অনুসরণ করেছিলেন।

প্র : মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশকাল লেখ।

উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল : শর্মিষ্ঠা- প্রকাশকাল ১৮৫৯, বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ- প্রকাশকাল ১৮৬০, একেই কী বলে সভ্যতা- প্রকাশকাল ১৮৬০, পদ্মাবতী- প্রকাশকাল ১৮৬০, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য- প্রকাশকাল ১৮৬০, মেঘনাদবধ কাব্য- প্রকাশকাল ১৮৬১, কৃষ্ণকুমারী- প্রকাশকাল ১৮৬১, বীরাঙ্গনা কাব্য- প্রকাশকাল ১৮৬২, ইংরেজি গ্রন্থ : The Captive Ladie- ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র : মধুসূদন কেন বাংলা নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন?

উ : মধুসূদন দেখেছিলেন বাংলায় মৌলিক নাটক রচনার অভাব রয়েছে। ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অকম অনুবাদ দ্বারা জমিদারদের শৌখিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতো। তাই মধুসূদন বলেছিলেন- "অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়দেশে/ নিরখিয়া প্রাণে সহি সয়।" তাই তিনি নিজে বাংলা নাটক লেখায় হাত দেন এবং তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হলে অসাধারণ দর্শকপ্রিয়তা লাভ করে।

প্র : তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে কিসের স্রষ্টা?

উ : অমিত্রাক্ষর ছন্দের।

প্র : বাংলা ভাষায় কী রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রথম?

উ : চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৬); সনেট।

প্র : তিনি কার অনুকরণে চতুর্দশপদী কবিতাবলি বা সনেট রচনা করেন?

উ : ইতালীয় কবি পেত্রার্ক এবং শেকসপিয়র।

প্র : তিনি হোমারের 'ইলিয়াড'-এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে কী রচনা করেন?

উ : হেক্টরবধ (১৮৭১)।

প্র : 'হেক্টরবধ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'হেক্টরবধ' (১৮৭১) হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গের গদ্যে রচিত বঙ্গানুবাদ। মধুসূদন রচনাটি ১৮৬৭তে শুরু করেন কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থাতেই ১৮৭১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তা প্রকাশিত হয়। হোমারের রচনা মূল গ্রিক থেকে বাংলায় অনুবাদের এটিই প্রথম প্রচেষ্টা। গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

প্র : মধুসূদনের প্রপিতামহের নাম কী?

উ : রামকিশোর দত্ত।

প্র : মধুসূদন কবে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন?

উ : ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর বয়স তখন ১৯ বৎসর।

প্র : তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন কত বছর বয়সে?

উ : ২৪ বৎসর বয়সে।

প্র : মধুসূদন রেবেকা মেকটাভিসকে কত তারিখে বিয়ে করেন?

উ : ১৮৪৮ সালের ৩১শে জুলাই।

প্র : মধুসূদন কিভাবে অধ্যয়ন করে তাঁরা লিখেছেন?

উ : 'সকালে দুঘণ্টা পড়েন গ্রিক, দুপুরের পর দুঘণ্টা গ্রিক, বিকেলে তিন ঘণ্টা তেলেগু ও সংস্কৃত, সন্ধ্যে বেলায় দুঘণ্টা ল্যাটিন আর রাতের বেলায় তিন ঘণ্টা ইংরেজি- মোট বারো ঘণ্টা।' (সূত্র: গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি', পৃ. ১২১)

প্র : মধুসূদন সম্পাদিত (মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত) পত্রিকাগুলোর নাম?

উ : Eurasian এবং Madras Hindu Chronicle. সহকারী সম্পাদক হিসেবে: Madras Spectator.

প্র : মধুসূদনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের নাম কী?

উ : যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩)।

প্র : মধুসূদনের সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ বলা হয় কোন সময়কে?

উ : মাদ্রাজ থেকে ১৮৫৬ সালের প্রথম দিকে কলকাতায় ফিরে ১৮৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে মধুসূদনের বিলেত গমনের পূর্ব পর্যন্ত।

প্র : এমেলিয়া হেনরিয়েটা সঙ্গে কবির সম্পর্ক কী?

উ : বিবাহিত মধুসূদনের সঙ্গে হেনরিয়েটার প্রণয় ছিল। কবি ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এলে রেবেকা ও তাঁদের চার সন্তানের সঙ্গে মধুসূদনের সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়। কবি রেবেকাকে আনুষ্ঠানিক ডিভোর্স দেন নি। এ সময় মাদ্রাজ থেকে কবির আহ্বানে হেনরিয়েটা কলকাতায় আসেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘর বসবাস করেন। হেনরিয়েটার সঙ্গে কবির ধর্মমতে বা অন্য কোনোভাবে বিয়ে হয় নি। (সূত্র: 'আশার ছলনে ভুলি')

প্র : ১৮৬২ সালে কেন মধুসূদন ইংল্যান্ড যান?

উ : ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য।

প্র : তিনি কি ব্যারিস্টার হতে পেরেছিলেন?

উ : তিনি ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তবে আইন পেশায় ভালো করতে পারেন নি।

প্র : 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদনের উল্লেখযোগ্য নাটক কেন?

উ : 'শর্মিষ্ঠা' মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত বাংলা নাটক। কলকাতার পাইকপাড়ার রাজাদের অনুপ্রেরণায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য মধুসূদন দত্ত ১৮৫৮ সালে নাটকটি রচনা করেন। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে রাজাদের অর্থানুকূল্যে 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশিত ও ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সেটা বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। পাশ্চাত্যরীতিতে বাংলা নাটক রচনার চেষ্টা এই নাটকের মধ্যে বিশেষভাবে সফলতা পায়। মধুসূদন পরে 'শর্মিষ্ঠা'র ইংরেজি অনুবাদও করেন। এই নাটক রচনায় পুরাণের কাহিনি অবলম্বন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: যযাতি, দেবযানী, শর্মিষ্ঠা, মাধব্য, পূর্ণিমা, রাজমন্ত্রী প্রমুখ।

প্র : 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য সম্পর্কে লেখ।

উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের চার সর্গে রচিত কাব্য। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে রচিত ও সে বছরই মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। সৌন্দর্য প্রতিমা তিলোত্তমাকে নিয়ে সুন্দ-উপসুন্দের ঘ

এই কাব্যের উপজীব্য। বাংলা আখ্যান অবিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য। অবশ্য কবি তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৬০) নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যই প্রথম।

প্র : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসন। প্রথমে এ প্রহসনের নাম ছিল 'তপ্ত নিবন্ধির'। এক লম্পট জমিদারের অত্যাচার-ব্যভিচার ও দরিদ্র প্রজাদের দ্বারা রচিত শিক্ষা এই উপভোগ্য প্রহসনের মূলকাহিনি। এর গঠন ও বিষয়বস্তুর প্রভাব পরবর্তী বাংলা নাটকে খুবই স্পষ্ট। বেলগাছিয়া থিয়েটারে মঞ্চায়নের জন্য মধুসূদন যে দুটো প্রহসন রচনা করেন তার একটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। পরে প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় এর কোনোটি মঞ্চস্থ হতে পারে নি। ক্ষুব্ধ মধুসূদন জানিয়েছিলেন যে, প্রহসন লেখার ব্যাপারে তাঁর 'ডানা ভেঙ্গে গেছে'। পরে সত্যি মধুসূদন আর কোনো প্রহসন লেখেন নি। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : ভক্তপ্রসাদ, পঞ্চানন বাচস্পতি, গদাধর, পুঁটি, ফতেমা, ভণ্ডী, হুনিফ গাজি প্রমুখ।

প্র : 'একেই কি বলে সভ্যতা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তৎকালীন নব্যবঙ্গীয় সম্প্রদায়ের সুরাপান এবং ইংরেজ অনুকরণের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য মধুসূদন যে দুটো প্রহসন রচনা করেন 'একেই কি বলে সভ্যতা' তার একটি। অন্যটি 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'। সত্যের যথাযথ উল্লেখ থাকায় প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় দুটো প্রহসনের একটিও শেষ পর্যন্ত ওই মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত নবলব্ধ ইংরেজি শিক্ষাভিমানী যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের কথা বর্ণনা করতে রচনা করেন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক 'একেই কি বলে সভ্যতা'। প্রথমে ১৮৬০ সালে। নাটকটিতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র মদনমোহন, কালীনাথ, সাবাশী, নিরাশিনী, কর্তাবাবা, এন্টনী, পরোপকারী ইত্যাদি। এটি মূলত ইয়ংবেঙ্গল দলের মদ্য নিবারণী পত্রিকা হয়েছে। নাটকারের বিদ্রোহের এ ধরনের পরিচয় প্রহসন বলা হয়।

প্র : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ১০২টি সনেটের সংকলন। মধুসূদনের আগে বাংলা সনেট বা সনেটধর্মী রচিত হয় নি। সে দিক থেকে বাংলা সনেটের আদি গ্রন্থ এটি। গ্রন্থটি ১৮৬৬ সালের ১লা আগস্ট প্রথমবার প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি প্রবাসে রচিত। সনেটগুলির কয়েকটি পেত্রার্কের আদর্শে এবং বেশির ভাগ শেক্সপিরীয় আদর্শে রচিত। সনেটগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন- ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কবিদের উদ্দেশে বন্দনা, বাংলাদেশের নদী, বৃক্ষ, পক্ষীকুল, পারিপার্শ্ব এবং আত্মজীবনের সুখ-দুঃখ। বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, আশা ইত্যাদি বিখ্যাত সনেট এই গ্রন্থভুক্ত। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দশ পঙ্‌ক্তিতে রচিত কবিতাসংকলন এটি।

প্র : মধুসূদন দত্তকে কী বলা হয়?

উ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি। কারণ সাহিত্যিক ও সামাজিক বিদ্রোহ তিনিই প্রথম করেন।

প্র : তিনি কোথায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন।

উ : পদ্মাবতী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে)

প্র : মধুসূদন পোশাকে বিদ্রোহী কীভাবে?

উ : মধুসূদন বাঙালি হিন্দু বা মুসলিমের পোশাকের পরিবর্তে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্য পোশাক হিসেবে প্যান্ট-কোট-টাই পরেন।

প্র : মধুসূদনের অসম্পূর্ণ নাটকের নাম কী?

উ : সুলতানা রিজিয়ার বীরত্বপূর্ণ কাহিনি নিয়ে ইংরেজি অসম্পূর্ণ নাটক রিজিয়া।

প্র : মধুসূদন আর একটি মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন কোন কাহিনি নিয়ে?
উ : কারবালার কাহিনি।
প্র : মধুসূদন দত্তের অবদান সম্পর্কে এক বাক্যে কী বলা যায়?
উ : বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী লেখক; প্রথম আধুনিক কবি; প্রথম আধুনিক নাট্যকার; অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক; বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম রচয়িতা; সার্থক ট্রাজেডির প্রথম রচয়িতা; প্রথম প্রহসন রচয়িতা; পুরাণকাহিনির ব্যত্যয় ঘটিয়ে আধুনিক সাহিত্যরস সৃষ্টির প্রথম শিল্পী; পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যধারার সংমিশ্রণে নতুন ধরনের মহাকাব্য রচয়িতা।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২৯শে জুন, ১৮৭৩; কলকাতা।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : মেঘনাদবধ কাব্যের বধো নামক ৬ষ্ঠ সর্গের ৫২০-৫৭০ চরণ।
প্র : ৬ষ্ঠ সর্গের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : লক্ষ্মণের হাতে অন্যায় যুদ্ধে অসম সাহসী বীর মেঘনাদের মৃত্যু।
প্র : বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ অংশে কোন নাটকীয় ভাষ্য সংকলিত হয়েছে?
উ : খুল্লতাত বিভীষণকে প্রত্যক্ষ করে দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদের প্রতিক্রিয়া।
প্র : 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কোন ছন্দে রচিত?
উ : ১৪ মাত্রার অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।
প্র : অরিন্দম, রাবণি কাকে বলা হয়েছে?
উ : রাবণের জ্যেষ্ঠাপুত্র মেঘনাদকে। তাকে বাসবত্রাসও বলা হয়। মেঘনাদের অন্য নাম ইন্দ্রজিৎ।
প্র : কুম্ভকর্ণ কে?
উ : রাবণের মধ্যম সহোদর।
প্র : মৃগেন্দ্রকেশরী, শব্দের অর্থ কী?
উ : কেশরযুক্ত পশুরাজ সিংহ।
প্র : মেঘনাদ কোথায় যজ্ঞ করেছিলেন?
উ : নিকুম্ভীলা যজ্ঞাগারে।
প্র : রাবণ ও বিভীষণের মাঝে সম্পর্ক ছিল?
উ : সহোদর ভাই।
প্র : মেঘনাদের ঠাকুরমা বা দাদির নাম কী?
উ : নিকষা।
প্র : 'শূলিশম্ভুনিভ' শব্দের অর্থ?
উ : শূলপাণি মহাদেবের মতো।
প্র : সৌমিত্রি কে?
উ : লক্ষ্মণ। সুমিত্রা নামক মাতার গর্ভে জন্ম বলে তাঁর এই নাম।
প্র : 'হায় তাত উচিত কি তব একাজ' বলতে বোঝানো হয়েছে—
উ : বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা।

'কপোতাক্ষ নদ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার রচয়িতার নাম কী?
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত?
উ : চতুর্দশপদী কবিতাবলী।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কোন জাতীয় কবিতা?
উ : সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' রচনাকালে কবি কোথায় অবস্থান করছিলেন?
উ : ফ্রান্সে।
প্র : 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে'— এ পঙ্‌ক্তিতে 'হে নদ' বলে কবি কোন নদকে সম্বোধন করেছেন?
উ : কপোতাক্ষ।
প্র : স্বদেশের প্রতি নিজের হৃদয়ের কাতরতা প্রকাশ করতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাকে মাধ্যম হিসেবে কামনা করেন?
উ : শৈশব-স্মৃতিবাহী কপোতাক্ষ নদকে।
প্র : কবি 'মায়া-মন্ত্রধ্বনি' বলতে কী বুঝিয়েছেন?
উ : কপোতাক্ষের কলধ্বনিকে।
প্র : 'ভ্রান্তির ছলনে' অর্থ কী?
উ : ভুলের ছলনায়।
প্র : 'যুদ্ধ-স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।'— এখানে কবি স্বদেশকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?
উ : মা।
প্র : 'যুদ্ধ' কোন ধরনের শব্দ?
উ : তৎসম।
প্র : কপোতাক্ষের স্রোতধারাকে কবি কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ : মাতৃদুগ্ধ।
প্র : কে প্রজারূপে সাগরকে 'বারি রূপ কর' দেয়?
উ : কপোতাক্ষ নদ।
প্র : 'আর কি হে হবে দেখা?'—উদ্ধৃতাংশে কী ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
উ : অনিশ্চয়তা।
প্র : 'বঙ্গজ জনের' বলতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে?
উ : বঙ্গবাসীর।
প্র : 'বঙ্গজ জনের কানে, সখে, সখা-রীতে নাম তার',—এ পঙ্‌ক্তিতে 'নাম তার' বলতে কার নামের কথা বলা হয়েছে?
উ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের।
প্র : প্রবাসে বসে কবি কিভাবে কপোতাক্ষ নদের নাম নিয়েছেন?
উ : বঙ্গের সংগীতে।
প্র : 'নিশা' শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ লেখ।
উ : রজনী, রাত্রি, যামিনী, বিভাবরী, নিশীথিনী, শর্বরী, ক্ষণদা।
প্র : 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা রচনাকালে কবি কোন দেশে ছিলেন?
উ : ফ্রান্সে।
প্র : 'কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?' — এ উক্তিতে কবির কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে?
উ : অনুরাগ।
প্র : প্রবাস জীবনে ফাস্টফুড খেতে খেতে মায়ের হাতের পিঠা খাবার বাসনার মধ্যে এ কবিতার কোন দিকটির মিল আছে?
উ : স্নেহাদরের কাতরতা।
প্র : প্রবাসে যখন মায়ের হাতের পিঠার কথা ভোলা যায় 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন চরণটির সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়?
উ : 'এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?'
প্র : সনেটে অষ্টকে কী থাকে?
উ : কবিতার ভাবের পরিণতি থাকে।
প্র : সনেটে অষ্টকে কী থাকে?
উ : কবিতার মূলভাবের প্রবর্তনা।
প্র : 'স্নেহের তৃষ্ণা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : স্নেহ-কাতরতাকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : পাঠ্যগ্রন্থে প্রদত্ত উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি এই কবিতার আলোকে কিভাবে তুলে ধরা যায়?
উ : বাংলার নদীতীরবর্তী কোনো অঞ্চলের মানুষ ডিভি লটারি পেয়ে আমেরিকায় যাবার পর স্বজনশূন্যতায় দিন কাটায়। মধুসূদন দত্তও প্রবাসে গিয়ে এই দেশ, ভাষা, মানুষের সঙ্গ কামনায় কাতর হয়েছেন। আমেরিকায় গিয়ে উদ্দীপকের বক্তার যেমন নদী সাঁতারের কথা মনে হয়েছে, বাড়ি ফিরে আসার কথা তার মনে জেগেছে— মধুসূদনেরও কপোতাক্ষ নদ এবং তার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গকে মনে করে স্মৃতিকাতর হয়েছেন।
প্র : উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ'-এর মূলভাব কী?
উ : স্মৃতিকাতরতা। এই স্মৃতিকাতরতা নদীকেন্দ্রিক হলেও তা আসলে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গেই যুক্ত। মানুষ যে পরিবেশে জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে তাকে যে সহজে সে ভুলতে পারে না; সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিলে সে যে সুস্থ থাকে না— উদ্দীপক ও 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় সে কথাই বলা হয়েছে।

'বঙ্গভূমির প্রতি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মাইকেল' কী?
উ : ইংরেজিতে 'মাইকেল' (michael) শব্দটি হিব্রু 'মিখাইল' (mikha'el) শব্দ থেকে এসেছে। 'কে ঈশ্বর পছন্দ করেন?' —এমন প্রশ্নের উত্তর ছিল: 'মাইকেল'। ইংরেজিভাষী খ্রিষ্টানদের কেউ কেউ নামের আগে 'মাইকেল' ব্যবহার করেন। সে-সূত্রেই ধর্মান্তর গ্রহণের পর মধুসূদনের নামের অগ্রে 'মাইকেল' ব্যবহৃত হয়।

প্র : মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোথা থেকে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি গ্রহণ করা হয়েছে?

উ : মধুসূদন রচনাবলির 'নানা-কবিতা' শিরোনামের সংগ্রহ থেকে।

প্র : মধুসূদন এই কবিতাটি কি কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?

উ : না।

প্র : মধুসূদন তাঁর এ কবিতার সূচনাতে একজন কবির একটি কাব্য-পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেছেন। সে কবির নাম কী?

উ : বায়রন।

প্র : বায়রনের সেই কাব্য-পঙ্‌ক্তিটি কি?

উ : 'My native Land, Good night !'

প্র : 'রেখো, মা, দাসেরে মনে,'– এখানে 'মা'কে?

উ : কবির জন্মভূমি। কবি জন্মভূমিকে 'মা' বলে সম্বোধন করছেন।

প্র : 'পদে' কী?

উ : পায়ে। ('পদ'-এর একাধিক অর্থ আছে: ব্যাকরণের 'পদ', খাবার টেবিলের 'পদ' ভিন্ন অর্থজ্ঞাপক।)

প্র : 'সাধিতে' অর্থ কী?

উ : সম্পাদন করতে বা পূরণ করতে।

প্র : 'সাধিতে' শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : সাধিত + এ।

প্র : 'পরমাদ' কী?

উ : ভুল।

প্র : 'পরমাদ' শব্দটি কিভাবে গঠিত?

উ : 'প্রমাদ' শব্দের অপভ্রংশ 'পরমাদ'।

প্র : 'মনঃকোকনদ' কী?

উ : কোকনদ অর্থ লাল পদ্মফুল। মন রূপ লালপদ্ম।

প্র : 'মধুহীন করও না গো তব মনঃকোকনদে'– এটা কোন অলঙ্কার?

উ : শ্লেষ অলঙ্কার।

প্র : কিভাবে শ্লেষ অলঙ্কার?

উ : এখানে 'মধুহীন' বলতে মিষ্টিহীন ও মধুসূদনবিহীন এই দুই অর্থই প্রকাশিত।

প্র : 'জীব-তারা' কোন সমাস?

উ : জীবন রূপ তারা = রূপক কর্মধারয়।

প্র : 'দেহ-আকাশ' কোন সমাস?

উ : দেহ রূপ আকাশ = রূপক কর্মধারয়

প্র : 'প্রবাসে, দৈবের বশে, / জীব-তারা যদি খসে / এ দেহ-আকাশ হতে, / নাহি সেথা তাহে।'– এখানে কবি কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

উ : তিনি তখন বিদেশে অবস্থানরত। সেই বিদেশে যদি তাঁর দেহ রূপ আকাশ থেকে জীবন রূপ তারা বা নক্ষত্রের পতনও ঘটে– তবু তাঁর কোনো কষ্ট থাকবে না।

প্র : 'চিরস্থির কবে নীর, / হায় রে, জীবন-নদে?'– অর্থ কী?

উ : কবি জীবনকে নদ বা নদীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, কার জীবন-নদীতে চিরদিন পানি থাকে? ('নীর' অর্থ জল বা পানি।)

প্র : শমন কে?

উ : মৃত্যুর দেবতা বা যম।

প্র : 'জন্মিলে মরিতে হবে, / অমর কে কোথা কবে,'– এই চরণদ্বয়ের দ্বারা কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : কবি দৈহিক মৃত্যুর কথা বলেছেন। জন্মগ্রহণকারীর যে মৃত্যু অনিবার্য সে কথাই বলা হয়েছে। এই চরণদ্বয় প্রবচন হিসেবে গৃহীত।

প্র : 'গলে' কী?

উ : বের হয়ে আসা অর্থে।

প্র : 'মক্ষিকাও গলে না গো'–অর্থ কী

উ : মাছিও বেরিয়ে আসতে পারে না।

প্র : 'অমৃত-হ্রদ' কী?

উ : অমৃত রূপ হ্রদ।

প্র : হ্রদ কাকে বলে?

উ : চারি দিকে স্থল মাঝখানে জল– এ রকম বৃহৎ স্থানকে হ্রদ বলে।

প্র : 'যাচিব' কী?

উ : 'যাচ্ঞা করিব' বা প্রার্থনা করবো।

প্র : 'সেবে'– কী?

উ : 'সেবা করে', এখানে 'স্মরণ করে' অর্থে।

প্র : 'জন্মদে' কী?

উ : জন্মদাত্রী বা মাতা।

প্র : 'কহ, গো, শ্যামা জন্মদে!'–এখানে জন্মভূমিকে কী কী নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উ : এখানে শ্যামল জন্মভূমিকে 'শ্যামা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া তাকে 'মাতা' বলেও সম্বোধন করা হয়েছে।

প্র : 'বর' অর্থ কী?

উ : আশীর্বাদ।

প্র : 'দেহ' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : 'দাও'। স্মরণীয়, পুরোনো বাংলায় ক্রিয়ার শেষে 'হ' যুক্ত করা সিদ্ধ ছিল, যেমন: 'অন্ধজনে দেহ আলো'।

প্র : 'সুবরদে' অর্থ কী?

উ : 'বরদে' অর্থ বর বা আশীর্বাদদাত্রী। 'সুবরদে' অর্থ যিনি সুন্দর আশীর্বাদদান করেন।

প্র : 'মানসে' অর্থ কী?

উ : মনের একান্তে।

প্র : 'তামরস' কী?

উ : পদ্মফুল।

প্র : এই কবিতার শেষে কবির অভিপ্রায় কী?

উ : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মভূমিকে মা সম্বোধন করে বলছেন, তিনি যেন দেশের মানুষের স্মৃতির জলে বসন্ত, শরৎ ঋতু নির্বিশেষে মধুপূর্ণ পদ্মফুলের মতো ফুটে থাকতে পারেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতারিখ কবে?

উ : ১৯শে মে, ১৯০৮।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : দুমকা, সাঁওতাল পরগনা, বিহার।

প্র : তাঁর পিতৃদত্ত নাম কী?

উ : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক নাম মানিক।

প্র : জন্মপঞ্জিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কী?

উ : অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম কী এবং তা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উ : অতসী মামী: বিচিত্রা পত্রিকা (পৌষ সংখ্যা ১৩৩৫)

প্র : যৌনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উদর পূর্তির সমস্যা ভিত্তিক তাঁর রচনার নাম কী?

উ : পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : জননী (১৯৩৫), দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), সহরতলী (১৯৪১), অহিংসা (১৯৪১), সহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১), স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১), আরোগ্য (১৯৫৩) ইত্যাদি।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : 'জননী' (১৯৩৫)।

প্র : 'জননী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জননী' (১৯৩৫) নারীর জননী-জীবনের নানা স্তর এবং সন্তানের সঙ্গে জননীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস। চরিত্র ও কাহিনির নির্মোহ বাস্তব রূপায়ণ এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস ১৯৩৪ সাল থেকে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পদ্মা তীরবর্তী ধীবর-জীবন এর মূলকাহিনি। সম্ভবত এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস, যেখানে আদ্যন্ত কথোপকথনে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষের হাতে নির্যাতিত একটি গোষ্ঠীজীবনের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ ভালোবাসা রিরংসা অসহায়তা ও আত্মরক্ষার তীব্র জৈবিক ইচ্ছার কাহিনি, গরিব মানুষের বেঁচে থাকার আগ্রহ ও সংগ্রামের সাহস, সেই সঙ্গে হোসেন মিঞা নামক এক রহস্যময় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : কুবের, কপিলা, মালা, ধনঞ্জয়, গণেশ, শীতলবাবু, হোসেন মিঞা। কুবের-কপিলার আন্তঃসম্পর্কও উপন্যাসটির ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে।

প্র : 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

2020/5/13 20:58

'সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন।' 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আছে। উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে বজ্রাঘাতে নিহত হারু ঘোষের বর্ণনা দিয়ে। নায়ক শশী ডাক্তার বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও মড়াস্পর্শ অনুচিতসহ এরকম নানা কুসংস্কার তার মধ্যে কার্যকর। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্তর্গত টানাপোড়েন ও অস্তিত্ব সংকট শশী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। কুসুম বৃষ্টিতে ভিজে তার কাছে এলেও শশী নিশ্চুপ থাকে। লোকায়ত ভাষায় অনুভব প্রকাশ করে কুসুম। উজ্জ্বল এই নারী এক সময় অন্তর্গতভাবে সবকিছুতে আগ্রহ হারায়। তাই কুসুমের আত্মিক মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে সেনদিদির সঙ্গে শশীর পিতা গোপালের সম্পর্ক, যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রীর ইচ্ছামৃত্যু ইত্যাদি উপন্যাসটিকে বহুবিচিত্র করেছে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় পুতুল বলতে এই মানুষগুলোকেই বোঝানো হয়েছে, যারা চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না; পুতুলের মতো অন্যের অল্প ধাক্কাতেই চালিত হয়।

প্র : 'অমৃতস্য পুত্রা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ১৯৩৮ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যামূলক এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বিত্তবান বীরেশ্বরের দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ, প্রথম বধূর স্বামীগৃহ ত্যাগ, তাদের সন্তান শ্যামলালের বিবাহ, অতঃপর শ্যামলালের পুত্র অনুপমের সঙ্গে বীরেশ্বরের সাক্ষাৎ এবং তার টাকাতে অনুপমের বিলেতে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। যার তাৎপর্য হলো আদর্শবান পিতার সন্তানের আদর্শচ্যুতি। উল্লেখ্য যে অনুপম চরিত্রটি দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক জীবনবোধের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

প্র : 'সহরতলী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'সহরতলী' (১৯৪১) নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণির মানুষের জীবনের কাহিনি ও সেইসঙ্গে প্রবৃত্তির নিরাবরণ প্রকাশের উপন্যাস, মানুষের আচরণের বলিষ্ঠতা ও কপটতা, ঈর্ষা ও ইন্দ্রিয়ালুতার রূপায়ণ এখানে আছে। যশোদা চরিত্রটির বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্ভ্রম বাংলাসাহিত্যে একটি ব্যতিক্রমী নারীচরিত্র হিসাবে স্বীকৃত।

প্র : 'আরোগ্য' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ সচেতনমূলক উপন্যাস 'আরোগ্য' (১৯৫৩)। এই উপন্যাসে তিনি মানুষের জীবন ও মন বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসীয় জ্ঞানের ফলে তিনি উপলব্ধি করেছেন সামাজিক কারণেই মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

প্র : 'অহিংসা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : মানুষ যে অজ্ঞাতসারেই অনেক অহিংস কাজ করে অথবা হিংসার সঙ্গে অহিংসা যে মানুষের মধ্যে জড়িত থাকতে পারে এই বিষয় নিয়ে রচিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' (১৯৪১)। উপন্যাসটিতে প্রকাশ হয়েছে আশ্রমিক ব্যবসার কাহিনি। যেখানে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে কাহিনিকে গতিময় করেছে বিপিন সদানন্দ, মহেশ চৌধুরী ও মাধবী ইত্যাদি চরিত্র।

প্র : তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪০) ইত্যাদি।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম কী?

উ : 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫)।

প্র : 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পের পরিচয় দাও।

উ : একটি দরিদ্র পরিবারের লাঞ্ছিত জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্যতম বিখ্যাত গল্প। এখানে গরিব নীলমণির যে কষ্টের কাহিনি বিবৃত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে তার যুবতী মেয়ে শ্যামা কষ্টকে দলিত করে, যেভাবে তার জীবনের রস আস্বাদনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, গল্পে

সেই আসক্তিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। লেখকের ভাব পরিকল্পনার প্রতিভাত হয়েছে যে, এই অসমবিন্যস্ত জগৎ ও জীবনে সবাই অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত। স্রষ্টার সৃষ্টির অসমতার প্রতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানী দৃষ্টি এখানে বক্র ও ব্যঙ্গাত্মক শিল্পরীতিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। স্রষ্টা নিজে কেন সমাজে এমন অসাম্য সৃজন করলেন, সেই প্রশ্নও করেছেন তিনি।

প্র : ভিখু ও পাচি তাঁর কোন গল্পের পাত্র-পাত্রী?

উ : প্রাগৈতিহাসিক।

প্র : পাঁচি চরিত্রটি নজরুলের কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

উ : মৃত্যু-ক্ষুধা।

প্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন?

উ : বঙ্গশ্রী (১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত)।

প্র : তিনি কত সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন?

উ : ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তিনি প্রগতি লেখক সংঘের কী ছিলেন?

উ : নির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক (১৯৪৬)।

প্র : মানিক সাহিত্য সম্পর্কে কী বলা হয়?

উ : শরৎচন্দ্র ও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতা ও মনোবিশ্লেষণ মানিক সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত।

প্র : পদ্মানদীর মাঝি নিয়ে কে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন?

উ : গৌতম ঘোষ।

প্র : শশী ও কুসুম কোন উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী?

উ : পুতুলনাচের ইতিকথা।

প্র : তিনি কত তারিখে মারা যান?

উ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬; কলকাতা।

'মসি-পিসি' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রহমানের শারীরিক গড়ন কেমন?

উ : আধপাকা চুল, রোগা শরীর।

প্র : সালতির মাঝে ভাটিসুটি ঘুরে বসে থাকা অল্পবয়সী বৌটি দেখতে কেমন?

উ : আঁটসাঁট থমথমে গড়ন, গোলগাল মুখ। সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত মোমটা।

প্র : 'এত বড় সোনার মেয়া, তোমরা দুটি মেয়েলোক বাসে ঘরে একটা পুরুষ মানুষ নেই, বিপদ-আপদ ঘটে যদি তো-ভাবনাটি কার?

উ : কৈলাশের।

প্র : কৈলাশের গোপন খবর মাসির কাছে কিসের নামান্তর?

উ : খুনসুটি।

প্র : সম্মান তো আছে একটা মানুষের- এখানে কার সম্মানের কথা বলা হয়েছে?

উ : জগুর।

প্র : পেটে শুকিয়ে লাথি ঝাঁটা খেতে, কলকেপোড়া ছ্যাঁখ্যা খেতে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি পাঠাবে না কে?

উ : মাসি।

প্র : আল্‌হাদির কোন মুখের ছাপে বুড়ো রহমান তার মেয়েকে খোঁজে?

উ : ফ্যাকাশে।

প্র : জগু বৌকে নেয়ার জন্য কী প্রস্তুতি নেয়?

উ : মামলা করার।

প্র : বছরের পর পর ধরে মাসি-পিসির সঞ্চয় ছিল কতো?

উ : রূপোর টাকা আর আধুলি সিকি।

প্র : বাপের বাড়িতে আসার সময় আল্‌হাদির অবস্থা কেমন ছিল?

উ : মরমর।

প্র : গলা কেটে রক্ত দিয়ে সে ধার শেরি করা যদি বা সম্ভব, অন্ন দেয়ার ক্ষমতা কোথায় পাবে- কার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উ : আল্‌হাদির বাবা-মা।

প্র : গাঁয়ের বাবু বাসিন্দারা নগদ পয়সার জন্য কী বেঁচতে দেয়?

উ : বাগানের জিনিস।

প্র : আল্‌হাদির বাবা মার সম্পত্তি কার ভোগ-দখলে গেছে-

উ : গোকুলের।

প্র : নিজেকে তার ছ্যাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে- কার?

উ : আল্‌হাদির।

2020/5/13 20:58

প্র : মাসি-পিসিকে কাছারি বাড়ি থেকে নিতে যেতে বলে কারা আসে?
উ : কানাই গৌকিদার।
প্র : মাসি-পিসিকে অর্ধেক জীবন কী করতে যায় বলে তাদের বিশ্বাস?
উ : সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া করতে।
প্র : কেটি বাঁধা বাবরি চুলওয়ালা মাথাটার ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে কার?
উ : বৈদ্যের।
প্র : যুদ্ধের জন্য মাসি-পিসি কিভাবে প্রস্তুতি নেয়?
উ : গামলার জলে কাঁথা-কম্বল চুবিয়ে রাখে, বটি দা, হাতের কাছে রাখে।

'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'কে বলা হয়–
উ : আঞ্চলিক উপন্যাস।
প্র : শঙ্খনীলাভ মণির মতো কিসের চোখ?
উ : ইলিশ মাছের।
প্র : 'বাদলা দিনের ঝড় জানান দিয়া আহে'।– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে এই উক্তি কে করেছিলো?
উ : হোসেন মিয়া।
প্র : 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, অভ্র পল্লীতে'– উক্তিটির উপন্যাসের নাম–
উ : পদ্মানদীর মাঝি।
প্র : হোসেন মিয়া কোন উপন্যাসের চরিত্র?
উ : পদ্মানদীর মাঝি।
প্র : হোসেন মিয়ার বাড়ি কোথায়?
উ : নোয়াখালি অঞ্চলে।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে অবলম্বন হলো–
উ : জেলে জীবন।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রকাশকাল–
উ : ১৯৩৬ সাল।
প্র : 'আমি একা ফিরা আইলাম গো মামা, সব কটারে গাঙের জলে ভাসাইয়া দিয়া আমি একা ফিরা আইলাম।'– একথা কে বলেছে?
উ : রাসু।
প্র : 'বিশ্বম্ভরের কর্ম দেওর মানু'।– 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : হারু জ্যাঠার।
প্র : 'কুবের বাই ছাড়ান দাও'।–'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে উক্তিটি কার?
উ : অহর মাঝির।
প্র : পদ্মানদীর মাঝি কে?
উ : কুবের।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনটি?
উ : কুবের।
প্র : 'কাইল চাইরে নামবে? হালার মাছ খাইয়া জুত নাই।'– উক্তিটি কার?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি'তে নৌকা ও জালের মালিক কে?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : কুবের মাঝির বাড়ি কোথায় ছিল?
উ : কেতুপুর গ্রামে।
প্র : মাছ ধরার সময় কুবের প্রথম কার সঙ্গে কথা বলেছিলো?
উ : যদু।
প্র : গণেশকে কে চিড়া কিনতে পাঠিয়েছিল?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : 'ই-আজকি আড়: কুবের।'– এই বাক্যে 'আড়' শব্দের অর্থ কী?
উ : শীত।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটিতে তিন মাঝি কুবের, ধনঞ্জয় আর গণেশ যে নৌকায় মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন সেটির মালিক কে?
উ : ধনঞ্জয়।
প্র : কেতুপুর গ্রামের কোন দিকে জেলে পাড়া?
উ : পূর্ব দিকে।
প্র : বাংলাদেশের কোন নদীকে 'কীর্তিনাশা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
উ : পদ্মা নদীকে।
প্র : 'একখানা গীত ক দেখি কুবির।'– কে বলেছে?
উ : গণেশ।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কোন চরিত্রকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অভিনব চরিত্র হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে?
উ : হোসেন মিয়া।

প্র : 'হালা ডাকাইত'– উক্তিটি কে কাকে বলেছে?
উ : কুবের, নীতাইকে।
প্র : হোসেন মিয়া লোকটি কেমন?
উ : বদমায়েশ।
প্র : কুবের কত বছর বয়স হতে মাছ ধরছে?
উ : ১২ বছর বয়স হতে।
প্র : 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটি কার লেখা?
উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
প্র : 'খু! নীত না ভর মাথা'– উক্তিটি কার?
উ : কুবেরের।
প্র : মহলাবীপ থেকে রাসু পালিয়ে এসেছিল কোন মাসে?
উ : বৈশাখ মাসে।
প্র : কুবেরের অনুগত বাকি কে?
উ : গণেশ।
প্র : কুবেরের মেয়ের নাম–
উ : পেয়ারী।
প্র : হোসেন মিয়া কুবেরের জন্য কত টাকার খত লিখেছিল?
উ : একুশ টাকা দশ আনা।
প্র : হাসুলের বাড়ি কোথায়?
উ : মালুয়াচর।
প্র : 'আচ্ছা সমুদ্র কত বড়– পদ্মার চেয়েও বড় বুঝি?'– কে বলেছে?
উ : মুখী।
প্র : কপিলা কোন ধরনের চরিত্র?
উ : রহস্যময়ী।
প্র : কুবের ও কপিলার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে লেখক কোন তত্ত্বের প্রয়োগ দেখিয়েছেন?
উ : ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনাতত্ত্ব।
প্র : রাসুকে কোন দ্বীপে নেয়া হয়েছিল?
উ : মহনাদ্বীপে।
প্র : মহনাদ্বীপের দৈর্ঘ্য কত?
উ : এগার মাইল।
প্র : কপিলার স্বামীর নাম কী?
উ : শ্যামাদাস।
প্র : কপিলার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
উ : আকুরটাকুর।
প্র : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনি কে নিয়ন্ত্রণ করে?
উ : হোসেন মিয়া।
প্র : 'যে বাড়ীতে আসাগোনে, সে বাড়ীর পাশ দিয়া- গাঙটির গায়ক সে।
উ : গণেশ।
প্র : 'কি ঝাঁটি মুসলমানের ঘরে রান্না খাইলো'– কে বলেছে?
উ : কুবের।
প্র : উপন্যাসে কোন অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে?
উ : পদ্মাপাড়ের আঞ্চলিক ভাষা।
প্র : মেজকর্তা অনন্ত তালুকদার কোন ঘরের সধবা পেয়েছিল?
উ : হাঁসের।
প্র : হোসেন মিয়ার পকেট থেকে কুবের কত চুরি করেছিল?
উ : আধুলি, কয়েকটা সিকি, একটা অনি।
প্র : 'জান দিয়া তোমাকে মরদ করি, আসে আজ তোমরা আঘাত দিলা'– কে বলেছে?
উ : হোসেন মিয়া।

'তেলচিত্রের ভূত' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তেলচিত্রের ভূত' গল্পটি কবে, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উ : মাসিক 'মৌচাক' পত্রিকার ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।
প্র : ডাক্তার পরাশর-এর নামটি কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে?
উ : পরাশর পৌরাণিক চরিত্র। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা ও ধর্মশাস্ত্রের সংকলনকারী।
প্র : 'নগেন' শব্দটি কিভাবে এসেছে?
উ : নগ + ইন্দ্র = 'নগেন্দ্র' থেকে সংক্ষিপ্ত হয়ে হয়েছে 'নগেন'। 'নগ' অর্থ পাহাড় বা পর্বত; আর নগেন্দ্র অর্থ পাহাড়-পর্বতের রাজা 'হিমালয়'। 'নগেন' অর্থেও তাই বোঝান হয়েছে।
প্র : নগেনের কী একটু উন্নতি?
উ : চাউনি।
প্র : 'বেচারি' অর্থ কী?
উ : নিরুপায় ও ভাগ্যহীন ব্যক্তি।

2020/5/13 20:58

প্র : 'বেচারি' কোন শব্দ?
উ : পারসি বা ফার্সি শব্দ।
প্র : 'উইল' কী?
উ : এক ধরনের দলিল। এই দলিলে দলিলকারীর ভবিষ্যৎ-ইচ্ছা ব্যক্ত থাকে। যেমন: কোনো ব্যক্তি যদি মনে করেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পদের কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাবে, সে ইচ্ছা তিনি 'উইলে'র মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারেন। এমন কি, মৃত্যুর পর নিজের চোখ বা অস্থি যদি কোনো হাসপাতালকে দান করতে চান, সে কথাও 'উইল' করে যেতে পারেন। 'উইল' সাধারণত গোপন থাকে।
প্র : 'প্রেতাত্মা' কী?
উ : মৃতের আত্মা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান ধর্মে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। হিন্দু ধর্মে মৃত মানুষের আত্মাকে 'প্রেতাত্মা' বলে।
প্র : 'পরলোকগত' কী?
উ : স্বর্গত বা মরহুম।
প্র : 'শ্রাদ্ধের দিন' কবে?
উ : হিন্দু ধর্ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে। সাধারণত মৃত্যুর এগার বা তের বা ত্রিশ দিন পরে আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়; এক বৎসর পর বাৎসরিক শ্রাদ্ধও অনেকে করেন। আদ্যশ্রাদ্ধকে মুসলিম শাস্ত্রের 'চল্লিশা'র সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা চলে।
প্র : 'তৈলচিত্র' কী?
উ : তেলরঙে আঁকা কোনো ছবি। ইংরেজিতে ওয়েল-পেইন্টিং (Oil-painting) বলে।
প্র : 'আত্মগ্লানি'-র সমাস কী?
উ : আত্মার গ্লানি = ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
প্র : 'খাপছাড়া' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : অস্বাভাবিক।
প্র : 'খাপছাড়া' নামে একটি শিশুতোষ গ্রন্থের রচয়িতা কে?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্র : 'মাসিকপত্র' কী?
উ : কিছু পত্রিকা, যেগুলো এক মাস অন্তর প্রকাশিত হয়।

প্র : 'কস্মিন্‌কাল' কী?
উ : এটা সংস্কৃত খাঁটি রূপ: কস্মিন্‌কাল। এর বর্তমান রূপ হচ্ছে: কোনোকাল। এখানে 'কোনোকাল'-এর বদলে জোর প্রদান অর্থে 'কস্মিন্‌কাল' কথাটি ব্যবহার হয়।
প্র : 'মড়া' আর 'মরা'-র কোনো পার্থক্য আছে?
উ : আছে। 'মড়া' হলো মৃতদেহ আর 'মরা' হলো মৃত্যুবরণ করা। নগেন শব বা মৃতদেহের মতো বিছানায় শুয়ে ছিল।
প্র : 'মটকার পাঞ্জাবি' কী?
উ : মোটা তসরের কাপড়ের পাঞ্জাবি। খদ্দরের যেমন পাঞ্জাবি হয়, তেমনি তসর এক জাতীয় কাপড়। মোটা তসরকে মটকা বলে।
প্র : 'শাল' কী?
উ : দামি পশমির গায়ের চাদর।
প্র : 'শাল' কোন শব্দ?
উ : 'শাল' একটি পারসি বা ফার্সি শব্দ।
প্র : 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্প থেকে এমন একটি শব্দ লেখ যেখানে ৎ-এর ওপর রেফ (´) আছে।
উ : 'ভর্ৎসনা'।
প্র : 'ইতস্তত' শব্দের অর্থ কী?
উ : এখানে- সেখানে। (ইতস্ অর্থ এখানে; ততস্ অথ সেখানে।)
প্র : '...অদ্ভুত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায়...'। –এখানে 'অদ্ভুত' আর 'ভূত' বানানে উ-কার / ঊ-কারের পার্থক্য কী?
উ : 'অদ্ভুত' বানানে 'উ-কার' আর 'ভূত' বানানে 'ঊ-কার'। মনে রাখা প্রয়োজন: 'অদ্ভুত' আর 'ভূতুরে' বানান দুটো ছাড়া সব 'ভূত' বানানে ঊ-কার। যেমন: উদ্ভূত; সম্ভূত; ভূতপূর্ব; অভূতপূর্ব; অনুভূত ইত্যাদি।
প্র : 'অশরীরী' অর্থ কী?
উ : যার শরীর নেই। এখানে ভূত কল্পনা করা হয়েছে।
প্র : 'উজ্জ্বল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
উ : উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
প্র : 'জ্বলজ্বল' শব্দের অর্থ কী?
উ : উজ্জ্বল।

প্র : 'পরেশ' নামের অর্থ কী?
উ : পরম ঈশ্বর।
প্র : 'পরেশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : পর + ঈশ।
প্র : 'তড়িতাহত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : তড়িৎ + আহত।
প্র : 'তড়িৎ' অর্থ কী?
উ : বিদ্যুৎ।

'মমতাদি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মমতাদির বয়স কত ছিল?
উ : তেইশ বছর।
প্র : মমতাদির কপালে ক্ষতটা কেমন ছিল?
উ : আন্দাজে পরা একটি টিপের মতন।
প্র : মমতাদিরা কোথায় থাকতো?
উ : জীবনময়ের গলির ভেতর সাতাশ নম্বর বাড়ির এক তলায়।
প্র : মমতাদির মাইনে কত ছিল?
উ : পনের টাকা।
প্র : 'ভাবিস না তোকে খুব ভালোবাসবে।'– উক্তিটি কার?
উ : লেখকের মায়ের।
প্র : কত দিন পর মমতাদি লেখকের সঙ্গে ভাব করল?
উ : সপ্তাখানেক পরে।
প্র : মমতাদি, তাকে কী বলে ডাকতে বলেছিল?
উ : দিদি।
প্র : মমতাদি এক বার লেখককে কেন বেশি আদর করেছিলেন?
উ : স্নেহে নয়, নিজের গর্ব প্রতিষ্ঠার জন্য।
প্র : লেখক মমতাদির গালে কয়টি দাগ দেখতে পেয়েছিলেন?
উ : গালে তিনটি দাগ দেখতে পেয়েছিলেন।
প্র : মমতাদির স্বামীর চাকরি কবে হয়েছিল?
উ : ইংরাজি মাসের পয়লা তারিখ থেকে।
প্র : মমতাদি কয়টি কমলালেবু কিনেছিল?
উ : দুটি।
প্র : মমতাদির ঘরে ভাঙা টেবিল কিসের জোরে দাঁড়িয়ে আছে?
উ : আগাগোড়া দড়ির ব্যান্ডেজের জোরে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্র : মমতাদির ঘরে টেবিলের উর্ধ্বে সেলাসের গর্তের তাকে কী ছিল?
উ : কতকগুলো বই।
প্র : মমতাদির ছেলের বয়স কত ছিল?
উ : পাঁচ বছর।
প্র : 'মমতাদি' গল্পটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
প্র : 'অপ্রতিভ' শব্দের অর্থ কী?
উ : অপ্রস্তুত।

মামুনুর রশীদ

প্র : মামুনুর রশীদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি, টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : নাট্যকার হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত নাটকের নাম কী?
উ : ওরা কদম আলী (১৯৭৮), ওরা আছে বলেই (১৯৮০), মে দিবস (১৯৮১), ইবলিশ (১৯৮২), এখানে নোঙর (১৯৮৬), গিনিপিগ (১৯৮৫), সমতট (১৯৯০), পাথর (১৯৯৩), লেবেদেফ (১৯৯৭) ইত্যাদি।
প্র : 'ওরা কদম আলী' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৭৮ সালে 'ওরা কদম আলী' প্রকাশের মধ্য দিয়ে মামুনুর রশীদের আবির্ভাব ঘটে নাট্যকার হিসেবে। শোষিত-নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের জন্য নাটক লিখতে গিয়ে তিনি নাটকে নিয়ে এসেছেন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা। আর বঞ্চিত, শোষিত মানুষের শ্রেণি সংগ্রামের রূপকার হিসেবে মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' নাটক সমকালীন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায় যুক্ত করেছেন বিশিষ্ট মাত্রা। গরিব ও মেহনতি মানুষের ব্যক্তিক প্রতিবাদ সামষ্টিক রূপ কিভাবে পরিগ্রহ করে কদম আলী নামের একটি বোবা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ নাটকে তা দেখানো হয়েছে। তবে কদম আলীদের 'ওরা' ভাবা হয়েছে। 'আমরা' ভাবতে পারেন নি লেখক।

20/5/13 20:58

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮২), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯০)।

মাহমুদুল হক

প্র : মাহমুদুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৪০ সালে, ঢাকায়।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : অনুর পাঠশালা, নিরাপদ তন্দ্রা, জীবন আমার বোন, কালো বরফ চিক্কোর কাবুল, খেলাঘর, মাটির জাহাজ, অশরীরী।
প্র : 'খেলাঘর' কোন ধরনের উপন্যাস?
উ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক।
প্র : 'জীবন আমার বোন' সম্পর্কে লেখ।
উ : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে; এর লেখক মাহমুদুল হক। জাহিদুল কবির খোকা নামের এক আপাত নির্লিপ্ত ও জীবন-পলাতক মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মাহমুদুল হক উপন্যাসটি লিখেছেন। দেশে যখন রাজনৈতিক উত্তালতা; বন্ধুকের দোকান লুট; জেল ভেঙে কয়েদিদের পলায়ন; অবাঙালিরা বাংলা থেকে পুঁজি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়নপর; ইয়াহিয়া-ভুট্টোর রাজনৈতিক আপোসের ভান; বাঙালিদের গর্জে ওঠা; জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্থগিত ও লাঠিসোটা নিয়ে এর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ; বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের পর বাংলার মুক্তিকামী মানুষের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়া– এই উত্তাল সময়টাই তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের একটি চরিত্র মুরাদ বলেছে: 'প্রত্যেকটা দিন এখন ইতিহাসের এক একটি পাতা; আমরা এক একজন এক একটা সাক্ষী হয়ে থাকবো।' মুরাদ আছে, রহমান আছে, ইয়াসিন আছে– সবাই কমবেশি আন্দোলন-সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট, শুধু জাহিদুল কবির খোকা ছাড়া। খোকা মনে করে আন্দোলন-সংগ্রাম হলো ভূতের মতো। এই 'ভূত' কোনোভাবেই যেন তার মাথায় না ঢুকতে পারে, এব্যাপারে সে তৎপর। উপন্যাসে বলা হয়েছে: ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের সময় চোর-ডাকাতও চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দেশপ্রেমিক হয়ে গিয়েছিল। আর মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে একজন বাঙালি এমন নির্লিপ্ত থাকে কী করে। খোকা নামের চরিত্রটি উত্তাল ঢাকায় থাকবে, ঢাকা ছাড়বে না, আবার আন্দোলন-সংগ্রামে যাবে না। খোকা চরিত্রের এই যখন অবস্থান, এরই মধ্যে নেমে আসে কাল রাত। পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে বাঙালিদের। মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। খোকার বন্ধুরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রহমান শহিদ হয়, ইয়াসিন পঙ্গু হয়, মুরাদ থাকে গেরিলা যুদ্ধে। জাহিদুল কবির খোকা এই অবস্থাকেও স্বপ্ন বলে। সে উচ্চারণ করে: 'স্বপ্নের ভিতর দেখতে দেখতে আমরা আরেক স্বপ্ন হয়ে যাই।' বাস্তবতাকে সে স্বপ্ন ভাবে। আসলে, মুক্তিযুদ্ধকালে এমন অনেক বাঙালি চরিত্র ছিল যারা পলায়নপর, দায়িত্ব পালনে অনীহ। জাহিদুল কবির খোকা তেমনি একটি চরিত্র। এই চরিত্রটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পালিয়ে বেড়িয়েছে। নীলা ভাবির সঙ্গে তার সম্পর্ক এর বড় প্রমাণ। বোনের ক্ষেত্রেও সে দায়িত্ব পালন করে নি। উপন্যাসে জাহিদুল কবির খোকা কাব্যমিশ্রিত বক্তব্য দেয়, স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখায় কিন্তু পাঠককে তৃপ্ত করে না। এ যেন, রোম যখন পুড়ছিল, রাজা নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল– ঠিক তেমনি কিছু। উপন্যাসটি থেকে বাঙালি পাঠক এই শিক্ষাই নেয় যে, অস্তিত্বের লড়াইয়ে যখন দেশ ও জনতা, তখন নির্লিপ্ততার আরেক নাম আত্ম-অবমাননা বলেই পরিজ্ঞাত।
প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৭)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৮ সালের ১৯শে জুলাই, রোববার দিবাগত রাত আড়াইটা; সে হিসেবে ২০শে জুলাই।

মীর মশাররফ হোসেন

প্র : মীর মশাররফ হোসেন কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে, ১৩ই নবেম্বর ১৮৪৭।
প্র : তাঁর পরিচয় কী?
উ : তিনি ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গদ্যরচয়িতা।
প্র : তিনি কোন দুটি পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন?
উ : কলকাতার সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) এবং কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)।
প্র : তাঁর সাহিত্যগুরু কে?
উ : কাঙাল হরিনাথ।
প্র : মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পত্রিকা দুটো কী?
উ : আজীজননেহার (১৮৭৪) ও হিতকরী (১৮৯০)।
প্র : মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ কী?
উ : রত্নবতী (১৮৬৯)।
প্র : রত্নবতী রচনা করায় মশাররফ কী পেলেন?
উ : তিনি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম গদ্যগ্রন্থ রচয়িতার মর্যাদা পেলেন।
প্র : 'রত্নবতী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রথম গ্রন্থ। এটি কোন মুসলিম রচিত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে, কলিকাতা থেকে। লেখক নাম-পৃষ্ঠায় গ্রন্থটিকে 'কৌতুকাবহ উপন্যাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি রূপকথা জাতীয় শিক্ষামূলক একটি দীর্ঘ গল্প। রাজপুত্র সুকুমার ও মন্ত্রীপুত্র সুমন্তের মধ্যে 'ধন বড় না বিদ্যা বড়'-এ বিতর্ক এবং বিতর্কের সমাধানই 'রত্নবতী'র মূল বিষয়।
প্র : মশাররফ হোসেন রচিত একমাত্র প্রহসন সম্পর্কে লেখ।
উ : 'এর উপায় কি?' মীর মশাররফ হোসেন রচিত একমাত্র প্রহসন। উনিশ শতকে এক শ্রেণির লোক যে স্ত্রীর প্রতি অবহেলা দেখিয়ে মদ ও পতিতাবৃত্তিতে আবৃত হয়ে নানা ধরনের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়েছিল– লেখক এই প্রহসনে সে রকম একটি ঘটনাই তুলে ধরেছেন। স্বামী রাধাকান্ত, স্ত্রী মুক্তকেশী, রক্ষিতা নয়নতারা, ইয়ার মদন প্রমুখ এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র। গ্রন্থটির প্রকাশ ঘটে ১৮৭৫ সালে, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৮৯২ সালে। সমকালে প্রহসনটি সমাদৃত হয়েছিল। এই প্রহসনে মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রভাব রয়েছে।
প্র : 'বসন্তকুমারী নাটক' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : মীর মশাররফের 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩)-এর বিষয়বস্তু এরকম : বৃদ্ধ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের যুবতী স্ত্রী রেবতী সপত্নী-পুত্র দরেন্দ্র সিংহকে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর পরিণামে সমগ্র রাজপরিবারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তিনটি অঙ্ক, নটনটীর প্রস্তাবনাসহ তেরটি দৃশ্য; প্রস্তাবনায় একটিসহ সর্বমোট আটটি গান রয়েছে নাটকটিতে। নামকরণে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-এর প্রভাব আছে।
প্র : 'জমীদার দর্পণ' নাটকের পরিচয় দাও।
উ : অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার এবং অধীনস্থ প্রজা আবু মোল্লার গর্ভবতী স্ত্রী নূরন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনি 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩)-এর মূল ঘটনা। মশাররফ হোসেন লিখেছেন, নাটকটির 'কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি' তুলে ধরা হয়েছে প্রচলিত সমাজের। ওই সময় মুসলিমগণ বাংলা চর্চায় এগিয়ে এসেছে কমই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নাটকটির প্রশংসা করে লিখেছেন, 'অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ'। নামকরণে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পণে'র প্রভাব যেমন প্রবল, নাটকটির ঘটনাবিন্যাসেও এর কম ছায়া পড়ে নি।

20/5/13 20:58

প্র : 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়। মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি। 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি 'মহরম পর্ব্ব' (১৮৮৫), 'উদ্ধার পর্ব্ব' (১৮৮৭) ও 'এজিদ-বধ পর্ব্ব' (১৮৯১) এই তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থটি উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ মোট তেষট্টিটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায় নিয়ে লিখিত। তন্মধ্যে 'মহরম পর্ব্বে' উপক্রমণিকা ও ছাব্বিশটি প্রবাহ, 'উদ্ধার পর্ব্বে' ত্রিশটি প্রবাহ, 'এজিদ-বধ পর্ব্বে' পাঁচটি প্রবাহ ও উপসংহার-অংশ রয়েছে।

প্রথমত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত স্পর্শকাতর কাহিনি সাধারণ মুসলিম পাঠকের কাছে এর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত 'বিষাদ-সিন্ধু'র জাদুকরী রচনাগুণের জন্যে সাহিত্যরসিকজনের কাছেও গ্রন্থটি আদরণীয়। জয়নাবের রূপে বিমোহিত এজিদ এবং এই রূপতৃষ্ণার পরিণামে বহু মানুষের বিপর্যয় ও ধ্বংসের যে কথকতা বর্ণিত হয়েছে তা গ্রন্থটিকে সর্বজনীন করে তুলেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনিতে অ্যান্টি-এস্টাব্লিশমেন্ট চেতনা মূলত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকেই মশাররফ হোসেন গ্রহণ করেছেন।

প্র : 'গো-জীবন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' (১৮৮৯) একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা। প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য হলো, কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে যে কোনো কারণেই হোক গো-হত্যা অনুচিত। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে লেখক ধর্মগ্রন্থ এবং প্রাত্যহিক-বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে নানা যুক্তি ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করার মানসে মশাররফ হোসেন এ প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি তৎকালে মুসলিম ধর্মীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এ কারণে 'আখবারে এসলামিয়া' (১৮৮৪) পত্রিকা প্রতিবাদ প্রকাশ করে এবং লেখককে মামলাতে জড়িয়ে পড়তে হয়। অবশেষে মৌলবাদী মুসলিমদের প্রবল চাপের মুখে তিনি 'গো-জীবন' প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

প্র : 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) কে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস কিংবা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না। বরং বলতে হয়, গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবননির্ভর কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেল উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা। এতে লেখকের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং নিজের মাতা-পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হতে দেখা যায়। উদাসীন পথিকের মনের কথায় হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-কামনা আছে, তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়।

প্র : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৯০০) মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন নির্ভর আত্মজীবনীমূলক রচনা। লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, অনাচার, সামাজিক দুর্নীতি এবং সেই সমাজভুক্ত মানুষগুলোর নৈতিক অধঃপতন, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়হীন আচরণ তুলে ধরেছে এ গ্রন্থে। লেখক নিজেকে 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আলকাতরা সানাল, কটা পেস্কার, জয়ঢাক, ছিড়িয়া খাতুন, অরাজকপুর, নচ্ছারপুর, জমদ্বারগ্রাম

প্রভৃতি নামচয়নের মধ্যেও লেখকের ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ করা যায়। এই ব্যঙ্গ সম্প্রদায় নির্বিশেষে, সকল কলুষ ও মালিন্যের বিরুদ্ধে। গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রভাব লক্ষ করা যায়।

প্র : 'আমার জীবনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'আমার জীবনী' বার খণ্ডে সমাপ্ত। এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনমূলক রচনা 'আমার জীবনী'। কিন্তু গ্রন্থটিতে তাঁর পরিপূর্ণ জীবন কাহিনি বর্ণিত হয় নি। লেখকের জীবনের মাত্র আঠার বছরের ঘটনা ও কার্যক্রম এতে তুলে ধরা হয়েছে। সে বিচারে আত্মজীবনীটি অসমাপ্ত।

প্র : 'কুলসুম জীবনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'কুলসুম জীবনী' (১৯১০) গ্রন্থটিকে লেখক 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' নামে অভিহিত করেছেন। এটি মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত। গ্রন্থটিতে লেখক বিবি কুলসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যেহেতু বিবি কুলসুম ও লেখক একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, সেহেতু বিবি কুলসুম প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক স্বাভাবিকভাবেই নিজের কথা বলেছেন। এদিক থেকে 'কুলসুম জীবনী' 'আমার জীবনী' গ্রন্থের পরিপূরক বলা চলে। এ কারণে 'আত্মজীবনী' না হয়েও গ্রন্থটি মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী-নির্ভর রচনার অন্তর্ভুক্ত।

প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

উ : 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) উপন্যাস।

প্র : 'গো-জীবন' (১৮৮৯) কেমন রচনা?

উ : প্রবন্ধগ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার দায়ে তাঁকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়।

প্র : মীরের দুটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম লেখ।

উ : 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ও 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩)।

প্র : মীরের অন্যান্য নাটকগুলো হলো–

উ : 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'টালা অভিনয়'।

প্র : মশাররফ হোসেন কোন ছদ্মনামে লিখতেন?

উ : গাজী মিয়াঁ।

প্র : 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯) কী ধরনের গ্রন্থ?

উ : আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসোপম রচনা।

প্র : মশাররফের দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : 'আমার জীবনী' (১৯১০), 'কুলসুম জীবনী' (১৯১০)।

প্র : মীর মশাররফ হোসেনের বিশিষ্টতা কিসে?

উ : বিষয়ে নয়, বঙ্কিম সমকালে ভিন্ন গদ্যশৈলীর জন্যই তিনি বিশিষ্ট।

প্র : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত মাসিক 'আজীজন নেহার'। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার জন্য পত্রিকা প্রকাশ ও সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হলেও মুসলমান পরিচালিত পত্রিকার লেখক ও পাঠকের অভাব সহ বিভিন্ন কারণে পত্রিকাটি বেশি দিন চলে নি। মনে করা হয়, মশাররফ হোসেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর নামে এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন। এই পত্রিকাটি বিলুপ্ত হলে তিনি 'হিতকরী' (১৮৯০) নামে অন্য একটি স্বল্পায়ু পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

প্র : মীর মশাররফের মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর।

'জমীদার দর্পণ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'জমীদার দর্পণ' কত বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়?

উ : ১২৮০ বঙ্গাব্দে।

প্র : 'এগুলোন একটিও মানুষ না। এগুলোনের শরীরে যে গোস্তপিণ্ড লেগে আছে সেগুলোন মানুষের গোস্ত না। কুকুরের গোস্ত।'– কার সংলাপ?

উ : সিরাজ আলীর।

প্র : 'জমীদার দর্পণ' নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যসংখ্যা কত?

উ : তিন অঙ্ক আর নয়টি দৃশ্য।

প্র : কোন শতকের মুসলমান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন?

উ : উনবিংশ শতক।

প্র : 'তোমাকে আমি জেলের ঘাটি টানিয়ে ছাড়ব।'– কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে-

উ : ফজু।

প্র : 'আপনি গরীবের বাপ-মা হুজুর'– কে উক্তিটি করেছে?

উ : আবু মোল্লা।

প্র : 'এরা টাকার লোভে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে।'– কারা করে?

উ : দারোগারা।

প্র : আবু মোল্লার কয় বিঘা জমি ছিল?

উ : দশ বিঘা।

প্র : 'হায় বিধি, পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।'– কার সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উ : নুরুন্নেহার সম্পর্কে।

প্র : 'বাঘে ছুঁলে সাত ঘা, আর জমিদারে ছুঁলে আঠারো ঘা'– উক্তিটি কার?

উ : জিতু মোল্লার।

মুনীর চৌধুরী

প্র : মুনীর চৌধুরীর জন্মসাল কবে?

উ : ২৭শে নবেম্বর, ১৯২৫।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : মানিকগঞ্জ, ঢাকা; পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলায়।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী।

প্র : ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত তাঁর বিখ্যাত নাটকের নাম কী?

উ : 'কবর' (প্রকাশ : ১৯৬৬)।

প্র : 'কবর' কবে, কোথায় রচিত ও অভিনীত?

উ : ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলে রচিত ও রাজবন্দিদের দ্বারা অভিনীত।

প্র : কার অনুরোধে তিনি এই নাটক লেখেন?

উ : সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক রণেশ দাশগুপ্ত। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাক্কালে বন্দি রণেশ দাশগুপ্ত আরেক বন্দি মুনীর চৌধুরীকে অনুরোধ করেন, তাতে জেলখানায় রাতেরর অভিনয়যোগ্য করে একটি নাটক লেখা হয়। সে অনুসারেই 'কবর' নাটক রচিত ও জেলে প্রথম অভিনীত।

প্র : তাঁর উদ্ভাবিত বাংলা টাইপ রাইটিং-এর নাম কী?

উ : মুনীর অপটিমা।

প্র : তাঁর রচিত অন্যান্য প্রধান নাটকের নাম কী?

উ : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৫), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬), পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)।

প্র : 'দণ্ডকারণ্য' গ্রন্থে কয়টি নাটক আছে?

উ : তিনটি (দণ্ড, দণ্ডধর, দণ্ডকারণ্য)।

প্র : রক্তাক্ত প্রান্তরের কাহিনি কোনগ্রন্থ থেকে নেয়া?

উ : কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান'।

প্র : তাঁর রচিত অনুবাদ নাটকগুলোর নাম কী?

উ : কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭), রূপার কৌটা (১৯৬৯), মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০)।

প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : মীর মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর পরিচয় দাও।

উ : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) মুনীর চৌধুরীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১) ঘটনা অবলম্বনে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি রচিত। অবশ্য ইতিহাস থেকে তিনি কাহিনি গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছেন কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' (১৯০৫) গ্রন্থ থেকে। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ঐতিহাসিক নাটক নয়, ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। এ নাটকে অনেক অনৈতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ আছে। আতা খাঁ, হিরণবালা, অমর চরিত্র ঐতিহাসিক নয়। নাটকে আছে : প্রশিক্ষিত মুসলিম যোদ্ধা ইব্রাহিম কার্দি মুসলিম শিবিরে চাকরি না পেয়ে মারাঠাদের কর্তৃক সমাদৃত হয় এবং চাকরি পায়। যুদ্ধ শুরু হলে ইব্রাহিম কার্দির স্ত্রী জোহরা মহুবেগ ছদ্মনাম ধারণ করে এসে স্বামীকে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বিশ্বাসঘাতকতা হবে বিবেচনা করে ইব্রাহিম কার্দি স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয় এবং জীবন দিয়ে মারাঠাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অন্যদিকে জোহরা ধর্মের জন্য স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু হিরণবালা মুসলিম প্রেমিককেই গ্রহণ করে। নাটকের নায়ক ইব্রাহিম কার্দি। তার জীবনের ট্র্যাজেডি নাটকটিকে ট্র্যাজিক করে তোলে।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনার প্রেক্ষাপট লেখ।

উ : ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন' (বিএনআর) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল সাম্প্রদায়িক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস থেকে মুসলিম উপাদান, মুসলিম মিথ, মুসলিম ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্ম অবলম্বনে 'সাহিত্য' রচনা করা। এই এ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতেই মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২) লেখেন। তবে এ নাটকে তিনি যুদ্ধবিরোধী বাণীও প্রচার করেছেন। উল্লেখ্য, মুনীর চৌধুরী ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকারের দেয়া 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে খেতাবটি বর্জন করেছিলেন।

প্র : 'কবর' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : 'কবর' (১৯৫৩) মুনীর চৌধুরীর একাঙ্ক নাটক। বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার অভিযোগ এনে মুনীর চৌধুরীকে ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সরকার আটক ও জেলে প্রেরণ করে। জেলে থাকা অবস্থায় অন্য রাজবন্দি বামপন্থী লেখক রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীকে একটি নাটক লিখতে বলেন, যা ওই জেলখানাতেই রাজবন্দিরা অভিনয় করবেন। রণেশ দাশগুপ্ত মুনীর চৌধুরীকে গোপনে চিঠি দেন এই লিখে : 'এরূপে ফেব্রুয়ারিতে অভিনয় করা যায় এ ধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে রাত ১০টার পর জেলের বাতি নিভিয়ে দেবে। লণ্ঠনের আলোতে যেন নাটকটি করা চলে আর মেয়ে চরিত্র এমনভাবে থাকে, যেন পুরুষদের দ্বারা তা অভিনয় করা চলে।' সেই অনুরোধ রক্ষা করে মুনীর চৌধুরী 'কবর' নাটক লেখেন এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কারান্তরালে রাজবন্দিরা তাতে অভিনয় করেন। উল্লেখ্য, এ নাটকে মুনীর চৌধুরী কোন নারী চরিত্রই রাখেন নি।

প্র : 'কবর' কোন নাটকের অবলম্বনে রচিত? এর কাহিনি লেখ।

উ : মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw রচিত Bury The Dead (১৯৩৬) নাটকের অনুসরণে এদেশীয় ঘটনা কেন্দ্র করে 'কবর' নাটক লেখা হয়েছে। সমাধি থেকে মানুষের আত্মার পুনরুত্থান ঘটে Bury The Dead নাটকে। 'কবর' নাটকে মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে শহরে কারফিউ দিয়ে লাশ গুম করতে গভীর রাতে কবরস্থানে নিয়ে যায়। পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর হাফিজ এবং নেতা (নাটকে তার নাম নেই) যৌথভাবে এ দায়িত্ব নেয়। কিন্তু লাশগুলো ছিন্নভিন্ন দেখে তারা ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কবরস্থ না করে একত্র মাটিচাপা দেবার সিদ্ধান্ত হয়। এতে বাধা দেয় গোর-খোদক। কবরস্থানে আশ্রয় নেয়া আরেক স্বজনহারা পাগল মুর্দা ফকিরও প্রতিবাদ জানায়। বলে : এ

লাশগুলো আন্দোলনকারীর। এরা এভাবে কবরে যাবে না। লাশগুলোও তখন উঠে দাঁড়ায় এবং বলে : আমরা কবরে যাবো না। এসব দেখে মদ্যপ ইন্‌স্‌পেক্টর ও নেতা ভয় পেয়ে যায়। 'কবর' একুশের পটভূমিতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক।

প্র : 'মানুষ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'মানুষ' (১৯৪৭) এক দৃশ্য বিশিষ্ট মুনীর চৌধুরীর নাটক। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত। এক হিন্দু তরুণ ডাক্তার আত্মরক্ষার জন্য এক মুসলিম বাড়িতে প্রবেশ করে। সে বাড়িতে একজন অসুস্থ, অন্য একজন দাঙ্গায় মারা গেছে। ডাক্তার রোগীকে চিকিৎসা দেয়। এ সময় হিন্দু ডাক্তারের খোঁজে মুসলিম দাঙ্গাকারীরা ঘরে প্রবেশ করে। তখন গৃহকর্ত্রী মশারির নিচে অসুস্থ সন্তানের পাশে ডাক্তারকে আড়াল করে তার জীবন রক্ষা করে। এভাবেই মানুষ বা মানবতা বড় হয়ে দেখা দেয়। মানুষ নাটকের চরিত্রাবলি : ফরিদ, জুলেখা, বাবা, মা, ডাক্তার।

প্র : 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : মুনীর চৌধুরী উইলিয়াম শেক্সপিয়রের The Taming of The Shrew (দি টেমিং অব দি শ্রু) অনুবাদ করেন 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নামে (১৯৭০)। এটি সর্বাংশে কমেডি। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট। পদুয়া নামক স্থানের এক ধনী ব্যাপ্তিস্তার দুই কন্যা ক্যাথেরিনা ও বিয়াঙ্কা। ক্যাথেরিনা খুবই মুখরা নারী, বিয়াঙ্কা সুন্দরী। ভেরোনা নামক স্থানের যুবক পেট্রুশিও ক্যাথেরিনার দর্প চূর্ণ করে তার পাণিগ্রহণ করে। মুনীর চৌধুরী নিজেই বলেছেন : কাহিনিটি স্থূল। কিন্তু এতে যে হাস্যরস আছে তা সতেজ, সরস ও উপভোগ্য।

প্র : মুনীর চৌধুরীর নাটক 'দণ্ডকারণ্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'দণ্ড', 'দণ্ডধর', 'দণ্ডকারণ্য' নামে তিনটি নাটক একত্রীকৃত করে ১৯৬৬ সালে 'দণ্ডকারণ্য' নামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। 'দণ্ড' একাঙ্ক কমেডি; ১৯৬০ সালে রচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী উপকরণ এক চোর দণ্ড বা লাঠির সাহায্যে চুরি করে নিয়ে গেলে সংসারে শান্তি আসে। এই সন্দেহ এবং লাঠির ব্যবহার নিয়ে হাস্যরসাত্মক নাটক 'দণ্ড'। এক উকিল দম্পতি (নাম নেই) এবং মঞ্চের নেপথ্যে এক চোরচরিত্র– এই তিন চরিত্রের একাঙ্ক নাটক 'দণ্ড'। 'দণ্ডধর' ১৯৬০ সালে রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠান আয়োজন, সেই আয়োজন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রেম-অনুরাগ বা বিরোধ সৃষ্টি, একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ভূমিকা ইত্যাদি 'দণ্ডধর' নাটকের বিষয়। আমিন, জাহানারা, রোকেয়া, অধ্যাপক এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। এটি একাঙ্ক কমেডি নাটক। 'দণ্ডকারণ্য' ১৯৬৫ সালে রচিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যকলার সংমিশ্রণে 'দণ্ডকারণ্য' রচিত হয়। একবার অরণ্য আবার নগর– পর্যায়ক্রমে চলতে থাকা এই দ্বিমাত্রিক মঞ্চসজ্জা সমকালে আকর্ষণীয় ছিল। পৌরাণিক আবহে রাম, লক্ষ্মণ, শূর্পণখা, সীতা ইত্যাদি চরিত্রকে মঞ্চে নিয়ে আসেন নাট্যকার। আবার সমকালের সঙ্গে তিনি খোঁজেন এর যোগসূত্র। মুনীর চৌধুরী এ একাঙ্ক নাটকে ভারতীয় মিথকে সমকালীন জীবনবাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়েছেন।

প্র : তাঁর রচনাগুলোর জন্য তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), মীর মানস গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (খেতাব, ১৯৬৬)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসাল কত?

উ : নিখোঁজ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১।

'রক্তাক্ত প্রান্তর' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের নাম ছিল–

উ : বেঙ্গল থিয়েটার।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর পটভূমি ছিল–

উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কত অঙ্ক, কত দৃশ্যের নাটক?

উ : তিন অঙ্ক, আট দৃশ্য।

প্র : 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কে করেছেন–

উ : নবাব সুজাউদ্দৌলা।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর লেখকের পেশা কী ছিল?

উ : অধ্যাপনা।

প্র : 'জোহরা' কার স্ত্রী?

উ : ইব্রাহিম কার্দির।

প্র : 'তারা ঘুমুচ্ছে ঘুমাক। কাল থেকে ঘুমের পালা কখন আসবে কে জানে।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে কে এই উক্তি করেন?

উ : জরিনা বেগম।

প্র : 'যত বড় ক্ষতি ততো বড় লাভ– এই তো জগতের নিয়ম।'– এ উক্তি কার?

উ : নজীবদ্দৌলার।

প্র : 'আমরা হচ্ছি পাহারাদার। টুলি-পরা কলুর বলদ।'–'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কার?

উ : বশিরের।

প্র : 'এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে।'– 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে উক্তিটি কার?

উ : জোহরার।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কোন ধরনের নাটক?

উ : ইতিহাস আশ্রিত।

প্র : 'হয়তো নারী মাত্রেই এ দুর্বলতার শিকার। স্নেহকে শৃঙ্খলে পরিণত করে। ভালবাসাকে মোহে, বন্ধনকে শিকারে।'– কে কাকে বলেছে?

উ : নজীব জরিনাকে।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে ঘটেছে কোন গুণ?

উ : ঐতিহাসিকতা, ট্র্যাজেডি ও যুদ্ধবিরোধী চেতনা।

প্র : মুনীর চৌধুরী কোন গ্রন্থ থেকে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের সারাংশ ও চরিত্র নিয়েছেন?

উ : কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' থেকে।

প্র : 'আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, গ্রহণ করতে এসেছি।'– উক্তিটি কার?

উ : জোহরা বেগমের।

প্র : কোন কলেজে মুনীর চৌধুরী অধ্যাপক হিসেবে প্রথম যোগদান করেন?

উ : বরিশালের বি.এল. কলেজে।

প্র : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে মুনীর চৌধুরীর কোন নাটক রচিত হয়?

উ : 'মানুষ'।

প্র : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় কত সালে?

উ : ১৭৬১ সালে।

প্র : কোন যুদ্ধে মারাঠারা জয় লাভ করে?

উ : উদয়গড়ের যুদ্ধে।

প্র : 'তুমি পশু সে দেবতা'– কার উদ্দেশ্যে এ উক্তি করেছেন?

উ : দিলীপ।

প্র : 'আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা অসম্ভব।'– কার উক্তি?

উ : নজীবউদ্দৌলা।

প্র : 'আমি কাপুরুষ'– কে বলে?

উ : ইব্রাহিম কার্দি।

প্র : 'মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ'– কার উক্তি।

উ : রহিমের।

প্র : 'তাদের মরা চোখও মনুবেগের রূপকে ভুলবে না'– কাদের চোখ?

উ : বিউলির প্রান্তরে মৃত মারাঠা সৈনিকদের।

প্র : 'বাঃ তুমি এত কাণ্ড করতে পারবে আর আমি হাসতে পারবো না?'– কে হাসতে পারবে না?

উ : হিরণ বালা।

প্র : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনার জন্য তিনি কোন পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার।

প্র : 'নিজের নিয়তিকে আমি নিজের হাতেই গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী।'– কার উক্তি?

উ : নজীবউদ্দৌলার।

20/5/13 20:59

প্র : 'যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের ওপর লাশ।'– কে দেখেছে?
উ : আহমদ শাহ আবদালি।
প্র : 'জয় পরাজয় যাই হউক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই।'– কে বলেছে?
উ : ইব্রাহিম কার্দি।
প্র : 'অন্ধকারটা স্বপ্ন, অলীক। আলোটাই সত্য, আলোটাই স্থায়ী।'– কে বলেছে?
উ : জোহরা।
প্র : 'তোমাকে নয়ন ভরে দেখে নিলাম। আসুক জরা, আসুক মৃত্যু, আর ভয় করি না।'– কার উক্তি, কার উদ্দেশে?
উ : ইব্রাহিম কার্দির; জোহরার উদ্দেশে।
প্র : আতা খাঁ কোন হিন্দু নাম নিয়ে পরিচয় গোপন করে?
উ : অমরেন্দ্র বাপ্পাজি।
প্র : 'আমি অস্ত্রধারী সৈনিক, আক্রমণ ভিন্ন অন্য ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য।'– কে বলেছে?
উ : জোহরা / মন্নু বেগ।
প্র : যতো হিন্দু আর যতো মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক-ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনোদিন হয় নি।– কোন যুদ্ধে?
উ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১)।

মুস্তাফা মনোয়ার

প্র : মুস্তাফা মনোয়ার কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : গোলাম মোস্তফা।
প্র : গোলাম মোস্তফা কে ছিলেন?
উ : একজন কবি ছিলেন।
প্র : মুস্তাফা মনোয়ার কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন?
উ : নারায়ণগঞ্জ (সরকারি) হাই স্কুল।
প্র : ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি কোথায় ভর্তি হন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশচার্চ কলেজে, বিজ্ঞান শাখায়।
প্র : কার পরামর্শে তিনি বিজ্ঞান শাখা পরিত্যাগ করে চারুকলায় ভর্তি হন?
উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর পরামর্শে তিনি কলকাতা আর্ট কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে তিনি স্নাতক হন।
প্র : কোথায় তিনি অধ্যাপনা করেন?
উ : ঢাকা চারুকলা কলেজে। এই কলেজ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি অনুষদ।
প্র : তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন?
উ : বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
প্র : তিনি কত খ্রিষ্টাব্দে 'একুশে পদক' লাভ করেন?
উ : ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কয়েক বছর তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন?
উ : বাংলাদেশ শিশু একাডেমির।
প্র : মুস্তাফা মনোয়ারের পরিচয় কী?
উ : তিনি চিত্রশিল্পী ও গণমাধ্যম-ব্যক্তিত্ব।
প্র : জনপ্রিয় মিনা কার্টুনের নির্মাতা কে?
উ : মুস্তাফা মনোয়ার।

'শিল্পকলার নানাদিক' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'– গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন পর্যায়ের গান?
উ : পূজা পর্যায়ের।
প্র : গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কর।
উ : 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে, / দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে॥ / পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া– / সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি– / নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥ / বসিয়া আছ কেন আপন-মনে, / স্বার্থনিমগন কী কারণে? / চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি, / ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি / প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥'
প্র : এই গানটির মর্মার্থ কী?
উ : এই গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবের উদ্দেশে বলেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আনন্দের

লহরি বইছে। সূর্য, চন্দ্র সেই আনন্দে অবগাহন করে নিজেরা উজ্জ্বল হয়। মানুষ কেন ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা করে নিজেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে আছে? স্বার্থ, লোভ, দুঃখ ইত্যাদির কথা ভুলে গিয়ে হৃদয় উন্মুক্ত করে মানুষ যদি জীবপ্রেম নিয়ে অন্য জীব তথা মানুষের কাছে আসে, তাহলেই তার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হতে পারে।
প্র : আনন্দ কী?
উ : আনন্দ এক প্রকার অনুভব। এই অনুভব মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত। তবে আনন্দ দুই প্রকার। সৎ কর্ম বা চিন্তা থেকে জাত আনন্দ এবং অসৎ কর্ম বা অসৎ চিন্তা থেকে জাত আনন্দ। সৎ কর্ম বা চিন্তা থেকে জাত আনন্দকে 'সদানন্দ' বলে। এই আনন্দই মানুষের প্রার্থিত।
প্র : আনন্দকে কিভাবে বোঝা যায়?
উ : রূপ- রস- শব্দ- স্পর্শ- গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে।
প্র : মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ কোনগুলো?
উ : চোখ, কান, জিভ, নাক, ত্বক।
প্র : শিল্পী কে?
উ : যিনি শিল্প সৃজন করেন তিনিই শিল্পী।
প্র : শিল্প কী?
উ : ইংরেজিতে ইন্ডাস্ট্রি (industry) ও আর্ট (art) বলে দুটো শব্দ আছে। দুটোর অর্থই শিল্প। এখানে শিল্প বলতে আর্ট (art)কে বোঝান হচ্ছে। আর্ট বা শিল্পের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ নেই। তবে মানবমনে সংবেদনশীল অনুভব সৃজনের মাধ্যমে সদানন্দধারা প্রবাহের উৎসকে শিল্প বলা যেতে পারে। সে দিক থেকে প্রকৃত গল্প, কবিতা, গান, নাচ, নাটক, ছবি, চলচ্চিত্র সবই শিল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
প্র : 'শিল্পকলা' কী?
উ : 'কলা' শব্দটিরও নানা অর্থ আছে। এর একটি অর্থ দক্ষতা, নৈপুণ্য বা বিদ্যা। যখন 'কলা' শব্দটি 'শিল্প' শব্দের সঙ্গে বসে তখন তা শিল্পের দক্ষতা বা নৈপুণ্য বোঝায়। যেমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজনই। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল যে শিল্পীরা এঁকেছেন কোনোটার সঙ্গে কি কোনোটার মিল আছে? এমন কি রবীন্দ্রনাথ যে নিজের 'আত্মপ্রকৃতি' এঁকেছেন সেগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। একটি মুখমণ্ডলের এই যে বিচিত্র প্রকাশ– এই পূর্বকথা সৃষ্টি হয়েছে 'কলা'র পার্থক্যে।
প্র : 'চিত্রকলা' কী?
উ : ছবি আঁকার এবং ছবি সম্পর্কে জানবার কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'ভাস্কর্য' কী?
উ : পাথর বা প্রস্তরাদি খোদাই করে অথবা মৃত্তি-সিমেন্ট মিশ্রিত করে মূর্তি নির্মাণ। ইংরেজিতে একে স্কালপচার (sculpture) বলে।
প্র : 'নৃত্যকলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে নাচবার এবং নাচ সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'সংগীতকলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে গান গাইবার এবং গান সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'অভিনয়কলা' কী?
উ : বিভিন্নভাবে অভিনয় করার এবং অভিনয় সম্পর্কে জানা ও ধারণা গ্রহণের কলা বা বিদ্যা।
প্র : 'স্থাপত্য' কী?
উ : এখানে স্থাপত্যশিল্পকে বোঝান হয়েছে। ঘর-বাড়ির নির্মাণ কাজকে স্থাপত্যশিল্প বলে। যেমন: ময়মনসিংহ শহরের কোনো কোনো প্রাচীন দালানে চিনা স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।
প্র : পুরাকাল কী?
উ : প্রাচীনকাল।
প্র : 'পুরা' শব্দটি কিভাবে এসেছে?
উ : পূর্ব > পূরব > পুরা। (তৎসম > অর্ধতৎসম > তদ্ভব)
প্র : ছন্দ কী?
উ : সহজ ভাষায় বললে, ছন্দ হলো গতির ভাব। মানুষের চলবার গতি সব সময় এক থাকে না, কবিতারও এক থাকে না, কথা বলারও এক থাকে না। এই গতিভিন্নতাই হলো ছন্দ। ইংরেজিতে একে metre বলা হয়। (*বাংলা কবিতার ছন্দ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের 'ছন্দ-প্রকরণ' অধ্যায়।)

প্র : 'কোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে।'– এই বাক্য দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উ : শিল্প নিয়ম মেনে সৃষ্টি করতে হয় ঠিকই কিন্তু শিল্প উপভোগ করতে নিয়ম মানতে হয় না। বরং সুন্দরকে সুন্দর বলে মেনে নেওয়া শেখাটাই আগে দরকার। সে সুন্দর যদি অপরের গুণে, কথায়, আচরণে, বক্তব্যে, জীবনযাপনে প্রকাশ পায় তা হলেও যেন সহজে মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এতে নিজের অসুন্দরগুলো ক্রমে ক্রমে একদিন হারিয়ে যাবে এবং আমরা সবাই সুন্দর হয়ে উঠবো।

প্র : নন্দনতত্ত্ব কী?

উ : সুন্দরকে জানার জন্য যে জ্ঞান তাকেই নন্দনতত্ত্ব বলে।

প্র : নন্দনতত্ত্বের আরেক নাম কী?

উ : সৌন্দর্যতত্ত্ব।

প্র : 'তত্ত্ব' অর্থ কী?

উ : স্বরূপ বা কাঠামো।

প্র : 'নন্দনতত্ত্ব'-এর ইংরেজি কী?

উ : Aesthetics (ইস্‌থিটিকস্)

প্র : 'যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে–' সে কাজ কেমন?

উ : সে কাজ 'সুন্দর'।

প্র : প্রয়োজন এবং সুন্দরের সমন্বয় করা যায় কিভাবে?

উ : প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটানো এবং সৌন্দর্যের কখনো সমন্বয়ের অভাব দেখা দিতে পারে। যেমন, আঁকার কাজে একটি পেন্সিল আমার প্রয়োজন। সাদামাটা একটি পেন্সিল হলেও আঁকাটা চলে। আবার খুবই সুদৃশ্য দামি পেন্সিল বাজারে আছে– তা কেউ কিনে তার লেখনীদানিতে সাজিয়ে রাখতে পারে। এ দুয়ের সমন্বয় হতে পারে, প্রাত্যহিক আঁকার কাজে অপেক্ষাকৃত কম দামি কিন্তু একটু সুন্দর পেন্সিল কেনা। এজন্য যা করতে হবে তা হলো, দু-একটি দোকানে খোঁজ নেওয়া। এর জন্য সময় দিতে হবে, খোঁজার মানসিকতাও থাকতে হবে। এভাবে সময় প্রদান ও মানসিকতার সংযোগে প্রয়োজন ও সুন্দরের সমন্বয় ঘটানো যায়।

প্র : প্রয়োজন এবং সুন্দরের সমন্বয় ঘটলে আসলে জয়ী হয় কোনটি?

উ : সুন্দর।

প্র : কেন সুন্দর জয়ী হয়?

উ : কারণ তখন প্রয়োজন মিটলো, এটা সবসময় থাকে না– মনে থাকে সুন্দরকে।

প্র : প্রয়োজনের কাজ কিসের মধ্যে নীমাবদ্ধ?

উ : শরীরের মধ্যে।

প্র : প্রয়োজনের কাজের বাইরে যা– তা কি?

উ : তা-ই সুন্দর।

প্র : তাহলে সুন্দর কি অপ্রয়োজনীয়?

উ : অপ্রয়োজনেরও প্রয়োজন আছে। কারণ অপ্রয়োজন না থাকলে প্রয়োজনটা বোঝা যায় না।

প্র : ছবি আঁকাকে কী শেখা বলে?

উ : দেখা শেখা।

প্র : 'বিষয়বস্তু' কী?

উ : যার ওপর বস্তুটি মূলত নির্ভরশীল। যেমন 'গ্রাম'-এর বিষয়বস্তু মানুষ, নদী, পশু, পাখি, ধানক্ষেত ইত্যাদি। 'বিদ্যালয়'-এর বিষয়বস্তু হলো– ভবন, শিক্ষার্থী, মাঠ ইত্যাদি। এই বিষয়বস্তু দিয়ে গ্রাম বা বিদ্যালয়ের একটি রচনাও লেখা যাবে, একটি ছবিও আঁকা যাবে আবার নরম মাটি বা সিমেন্ট জমিয়ে একটি ভাস্কর্যও নির্মাণ করা যাবে।

প্র : চিত্রকলার মাধ্যম কী?

উ : কালি, কলম, জল-রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি।

প্র : প্যাস্টেল রং কী?

উ : প্যাস্টেল একটি ইংরেজি শব্দ (pastel), যার অর্থ চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রঙিন খড়ি (চক)। এই রঙিন খড়িকে প্যাস্টেল রং বলে।

প্র : জল-রং কী?

উ : সামান্য জল মেশালে যে রং সহজেই আঁকার উপযোগী হয় তাকেই জল-রং বলে।

প্র : পুরাতন পুঁথি কী?

উ : যখন কাগজ আবিষ্কার হয় নি তখন মানুষ তালপাতা বা গাছের বাকলে নানা রকমের কালি ব্যবহার করে লিখতো। সেগুলো এখনো কোথাও কোথাও রক্ষিত আছে। এগুলোকেই পুরাতন পুঁথি বলা হচ্ছে।

প্র : সংস্কৃতি বা কালচার কী?

উ : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো কালচার (culture)। কোনো অঞ্চলের মানুষের ভাষা, আচরণ, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন প্রণালি, ধর্ম ইত্যাদির সম্মিলনকেই এক কথায় সংস্কৃতি বা কালচার (culture) বলে।

প্র : 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'– এটা কী?

উ : প্রবাদ।

প্র : 'কালি' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : দেশের ঐতিহ্যের বহু বছরের স্রোতধারা।

প্র : 'কলম' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম; যেমন– সাহিত্যিকের জন্য কলম, খাতা, কম্পিউটার; চিত্রশিল্পীর জন্য রং, তুলি, ক্যানভাস ইত্যাদি।

প্র : 'মন' দিয়ে কী বোঝায়?

উ : বর্তমান যুগরুচির সঙ্গে 'কালি' বা ঐতিহ্যের সম্মিলন করার মানসিকতা।

প্র : 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'– দিয়ে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : যে অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অতীত ঐতিহ্য থাকবে, শিল্পীদের জন্য প্রয়োজনীয় ও আধুনিক উপাদান থাকবে এবং শিল্পীদের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ভাবনার মিলন করার ইচ্ছা ও দক্ষতা থাকবে– সে অঞ্চলে অমর শিল্প সৃষ্টি হবে।

প্র : আমাদের দেশ কি 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'-এর শর্ত পূরণ করে?

উ : করে।

প্র : তাহলে আমাদের দেশে আর কী প্রয়োজন?

উ : শিল্পকলাচর্চার ধারা অব্যাহত রাখা।

মুহম্মদ আবদুল হাই

প্র : মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্ম কবে, কোথায়?

উ : ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে নবেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে।

প্র : তিনি কত সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন?

উ : ১৯৪৯ সালে।

প্র : লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কী নিয়ে গবেষণা করেন?

উ : ধ্বনিবিজ্ঞান (১৯২২)।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন?

উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র (তখন মানসিক) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

প্র : কোন গ্রন্থটি রচনার জন্য তিনি স্মরণীয়?

উ : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪)।

প্র : কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি সমালোচিত?

উ : সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (১৯৬৮) গ্রন্থ লিখে। কেননা, এ গ্রন্থে সম্প্রদায়গত শৃঙ্খলার প্রয়োগ করা হয়েছে। লেখকদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় নি। নামসর্বস্ব মুসলিম লেখকদের নিয়ে অতিকথা ও অতি উচ্ছ্বাস আছে। আর গুরুত্বপূর্ণ অমুসলিম লেখকদের সম্পর্কে আছে নির্লিপ্ততা।

প্র : তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ-গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' (১৯৫৮)।

প্র : পাকিস্তান সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এ বিষয়ে তাঁর অবস্থান কী?

উ : ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

প্র : তিনি কত সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?

উ : ১৯৬১ (প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন ঢাকা মালিবাগের রেলক্রসিঙে কাটা পড়ে তিনি মারা যান। অনেকে মনে করেন, কর্মক্ষেত্রে উদ্ভূত বিশেষ অবস্থার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

মুহম্মদ এনামুল হক

প্র : মুহম্মদ এনামুল হকের জন্ম কত সালে?

উ : ১৯০২।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : বখতপুর গ্রাম, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

প্র: তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো কী কী?
উ: চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ, আরাকান রাজসভার বাংলা সাহিত্য, বঙ্গে সুফী প্রভাব, ব্যাকরণ মঞ্জরী, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, মনীষা মঞ্জুষা (১ম ও ২য় খণ্ড)।
প্র: তিনি তাঁর রচনাভলোর জন্যে কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৪), প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬৬), সিতারা ই ইমতিয়াজ পুরস্কার (১৯৬৮), একুশে পদক (১৯৭৯), শেরে বাংলা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১)।
প্র: তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২; ঢাকা।

'বাংলা নববর্ষ' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের রচয়িতার নাম কী?
উ: মুহম্মদ এনামুল হক।
প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটির মূল নাম কী?
উ: 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ'।
প্র: 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ: 'মনীষা মঞ্জুষা'। ('মনীষা মঞ্জুষা' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড থেকে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধটি সংকলিত।)
প্র: 'ট্রেডিশন' বলতে কী বোঝায়?
উ: ঐতিহ্য: দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে এমন রীতি।
প্র: 'নববর্ষ' মানে কী?
উ: নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উৎসবের প্রথম দিন।
প্র: পৃথিবীর সব নতুন বছর কী একই সময়ে আরম্ভ হয়?
উ: না।
প্র: পৃথিবীময় চালু ছিল বা আজো চালু আছে কী?
উ: অব্দ বা বছর।
প্র: 'নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিপালিত অনুষ্ঠানগুলোকে মোটামুটি কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
উ: দুভাগে। (সর্বজনীন অনুষ্ঠান ও স্থানীয় অনুষ্ঠান)
প্র: বাংলা নববর্ষের 'সর্বজনীন অনুষ্ঠান' বলতে কী বোঝায়?
উ: যে সমস্ত অনুষ্ঠান 'স্থান' ও 'সময়ে' সংকীর্ণ নয়।
প্র: 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' বলে কোন অঞ্চলের মানুষ?
উ: উত্তরবঙ্গের।
প্র: 'চৈত্র মাসে শস্য ফুলে সে শস্য কভু না।'—এটি কী ধরনের ধারণা?
উ: লৌকিক ধারণা।
প্র: উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় কোন মাসে সবচেয়ে বড় মেলা বসে?
উ: বৈশাখমাসে।
প্র: 'পুণ্যাহ' শব্দের মৌলিক অর্থ কী?
উ: পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন।
প্র: জমিদার কর্তৃক প্রজাদের কাছ থেকে নতুন বছরে খাজনা আদায় করার প্রাক্কালে অনুষ্ঠানসূচক দিনকে কী বলা হয়?
উ: পুণ্যাহ।
প্র: 'ঐতিহ্য' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
উ: সংস্কৃত।
প্র: 'হালখাতা' কী?
উ: পয়লা বৈশাখের একটি সর্বজনীন আচরণীয় রীতি। নতুন বাংলা বছরের হিসাব পাকাপাকিভাবে টুকে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের নতুন খাতা খোলা এক আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ।
প্র: বাঙালির কোন দুটি অনুষ্ঠান একই অনুষ্ঠানের ওপিঠ-ওপিঠ?
উ: পুণ্যাহ ও হালখাতা।
প্র: পৃথিবীব্যাপী নর-নারী নববর্ষে কী অনুভব করে?
উ: জীবন ধারনের একটা কালচক্র সম্পূর্ণ আবর্তিত এবং আর একটা কালচক্র নবে আবর্তনোদ্যত।
প্র: নববর্ষের অনুষ্ঠানে কীসের প্রাধান্য লাভ করে?
উ: আশা, নিরাশা, আনন্দ, উল্লাস অথবা ধর্ম।
প্র: বাংলাদেশের চাষীরা বৈশাখ মাসে কোন জাতের ধান চাষ করে?
উ: আমন।

প্র: পয়লা বৈশাখ বাঙালিকে কিসের আহ্বান জানায়?
উ: একটানা সুখ-দুঃখ ভুলে নতুনের আহ্বান।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

প্র: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের জন্মসাল কত?
উ: ৩১শে জানুয়ারি, ১৯০৪।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: ফুলবিপুর, পয়লা।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: লোকসাহিত্য বিশেষজ্ঞ, লেখক ও শিক্ষাবিদ।
প্র: তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ: মাসিক মাহেনও (১৯৪৯)।
প্র: তিনি কী ছিলেন?
উ: বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রাহক।
প্র: তাঁর লোক সংগীতের সংকলন গ্রন্থের নাম কী?
উ: হারামণি (১ম-১০ম খণ্ড)।
প্র: হারামণি নামটি দেন কে?
উ: রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলে তিনি মনসুর উদ্দীনের সংগ্রহের এই নাম দেন।
প্র: তাঁর অন্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলো কী?
উ: শিরনী (১৯৩১), ধানের মঞ্জুরী (১৯৩৩), আখেরাতী (১৯৩৮), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬৬) ইত্যাদি।
প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ: বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৫) ও একুশে পদক (১৯৮৩)।
প্র: তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ: ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

প্র: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জন্মতারিখ কবে?
উ: ১০-৭-১৮৮৫।
প্র: তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ: পেয়ারা, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র: তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?
উ: কফিলউদ্দীন আহমদ ও হুরুন্নেসা।
প্র: শিক্ষাজীবনে তাঁর সাথে কারা যুক্তভাবে পরীক্ষা দেন?
উ: শিক্ষাজীবনে তাঁর সাথে কারা যুক্তভাবে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। পরে তা হয়েছিল মূলত পাঠ্য বিষয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সাথে।
প্র: তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ: ভাষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ।
প্র: তাঁর গবেষণা কর্মগুলো কী কী?
উ: সিদ্ধা কাহ্নপাদ গীত ও দোহা, বাঙলা সাহিত্যের কথা, বৌদ্ধ ধর্মবলম্বী বাঙালি, ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত।
প্র: তাঁর রচিত প্রবন্ধ সংকলনের নাম কী?
উ: ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৯), বাংলা ভাষার কি ভবিষ্য (১৯৫৭), Essays of Islam : Traditional culture in East Pakistan.
প্র: তাঁর রচিত অনুবাদগ্রন্থগুলো কী?
উ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয় শতক (১৯৪০), কথাইয়াত ই ওমর খায়াম (১৯৪২)।
প্র: কার পরামর্শে তিনি স্কুলফাইনাল ক্লাসে ভর্তি হন?
উ: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে শহীদুল্লাহ্ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯১২ সালে এম.এ. পাস করেন। আশুতোষবাবু শহীদুল্লাহ্‌কে জার্মানিতে যাবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন নি।
প্র: আশুতোষ ভট্টাচার্য শহীদুল্লাহ্‌র জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন- কথাটি সত্যি?
উ: শহীদুল্লাহ্‌কে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি করানোর অনুপ্রেরণা, জার্মানিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাড়াও আশুতোষবাবু শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বদল করিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে এম.এ. পাস করে শহীদুল্লাহ্ কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা নিয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে আইনে স্নাতক হয়ে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৯ সালে

আশুতোষ ভট্টাচার্য শহীদুল্লাহ্‌কে ডেকে এনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমারী লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক (রিসার্চ এসিস্টেন্ট) পদে নিয়োগদান করেন। সেই সূত্রেই পরে তিনি আবার শিক্ষকতায় ফিরে আসেন। আশুতোষবাবুর এই নিয়োগ শহীদুল্লাহ্‌র জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্র : তিনি কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন?

উ : ১৯২১ সালের ২রা জুন।

প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে?

উ : ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে একই বছর এর 'সংস্কৃত ও বাংলা' বিভাগের (তখন এভাবেই বিভাগের নাম ছিল) লেকচারার হন। ১৯৪৪ সালে তিনি রিডার পদে (বর্তমান মান সহযোগী অধ্যাপক) থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে আবার যোগদান এবং ১৯৫৪ পর্যন্ত একই পদে তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে তিনি ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রথম প্রভোস্ট হন। ১৯৫৩-'৫৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি ছিলেন কলা অনুষদের নির্বাচিত ডিন।

প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কিভাবে?

উ : ১৯৫৫ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা অনুষদের ডিন ছিলেন। ১৯৫৮ সালে করাচিতে যাবার আগ পর্যন্ত তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ছিলেন।

প্র : বাংলা একাডেমি প্রকাশিত কোন অভিধানের তিনি প্রধান সম্পাদক?

উ : বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

প্র : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।' পাকিস্তান আমলে এই উক্তি করেছিলেন কে?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।

প্র : তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলো কী?

উ : পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন, দুই খণ্ড প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

প্র : তিনি কী কী পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উ : আঙুর (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাস রয়েছে—এর পূর্ব নাম কী?

উ : ঢাকা হল।

প্র : বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : ষোড়শ।

প্র : তিনি কী কী সম্মানজনক পদ ও পদক লাভ করেন?

উ : প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসর পদ (১৯৬৭), প্রাইড অব পারফরম্যান্স এবং নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পদক।

প্র : তিনি কোন সম্মান গ্রহণ করতে পারেন নি, কেন?

উ : পাকিস্তান সরকার অনুমতি না দেওয়ায় ১৯৬২ সালে তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারাল রিলেশন (আইসিসিআর)-এর দেওয়া সম্মান গ্রহণ করতে পারেন নি।

প্র : শেষজীবনে তিনি কী চর্চা করতেন?

উ : শেষজীবন শুরু হওয়ার আগেই, মধ্যজীবন থেকে তিনি ভাষাতত্ত্বচর্চা বাদ দিয়ে ইসলামচর্চা ও তা প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯।

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' কোন জাতীয় রচনা?

উ : প্রবন্ধ। (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কিশোরগঞ্জ জেলায় 'পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী'র একাদশ অধিবেশনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ দেন তারই পুনর্লিখিত রূপ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধটি।)

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে পল্লিসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জরুরি কেন?

উ : জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঠিক পরিচয় প্রদানের জন্য।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক কী আবেদন জানিয়েছেন?

উ : পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার।

প্র : পল্লির পরতে পরতে কী ছড়িয়ে আছে?

উ : সাহিত্য।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কতজন মনীষীর নাম উচ্চারণ করেছেন?

উ : ছয় জন।

প্র : কোন কোন মনীষীর নাম 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে?

উ : ড. দীনেশচন্দ্র সেন, রোঁমা রোঁলা, শেক্‌সপিয়র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (যদিও এ নামটি সরাসরি নেই, তাঁকে বলা হয়েছে বিশ্ববরেণ্য কবিসম্রাট), মনসুর বয়াতি।

প্র : ড. দীনেশচন্দ্র সেন কী সংগ্রহ করেছিলেন?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকা।

প্র : রোঁমা রোঁলা কে?

উ : ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক। (রোঁমা রোঁলার (১৮৬৬-১৯৩৯) অমূল্য কীর্তি 'জাঁ ক্রিস্তফ'। এ গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯১৫ খ্রি. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান)

প্র : 'মদিনা বিবি' কে?

উ : মৈমনসিংহ-গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত লোকগাথা 'দেওয়ানা-মদিনা'র নায়িকা।

প্র : কার মতো পল্লিকবি শহুরে চক্ষুর অন্তরালে পল্লিতে আত্মগোপন করে আছে?

উ : মনসুর বয়াতি।

প্র : পল্লির অচেনা-অজানা কবিদের গাথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করলে কী হত বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন?

উ : দেখা যেত মুসলমানও সাহিত্য সম্পদে কত ধনী।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আরব্য উপন্যাসের কোন কোন কাহিনির উল্লেখ করা হয়েছে?

উ : আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু।

প্র : আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে কী?

উ : পল্লির উপকথাগুলো।

প্র : এখনকার শিক্ষিত জননী তার সন্তানকে কিসের গল্প শোনান না?

উ : রাখাল আর পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পরিবারের খোড়ুরে কথা শোনান না।

প্র : আধুনিক কালের শিক্ষিত জননী তার সন্তানকে কী ধরনের গল্প শোনান?

উ : আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ।

প্র : বাংলার সমস্ত রূপকথা সংগৃহীত হলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় কী দেখা যেত?

উ : বাংলার নিভৃত কোণের কোনো গল্প ভারতীয় উপমহাদেশের অন্য প্রান্তে কিংবা উপমহাদেশের বাইরে সিংহল, সুমাত্রা, কাভা, কম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে তা প্রচলিত আছে।

প্র : 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোন কোন উপমহাদেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

উ : এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা।

প্র : Folklore Society কী?

উ : যে সমিতি লোকশিল্প ও গান, উৎসব-অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রচারের জন্য নানা কাজ করে থাকে। এ সমিতি লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত।

প্র : Folklore Society-এর উদ্ভাবক কে?

উ : উইলিয়াম থমস।

প্র : Folklore Society সর্বপ্রথম কোথায় গঠিত হয়?

উ : লন্ডনে। (১৮৪৮ সালে লন্ডনে Folklore Society সর্বপ্রথম গঠিত হয়।)

প্র : 'ঠাকুরমার ঝুলি'র সংগ্রাহক কে?

উ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার।

প্র : 'হাউ, ঘাউ, খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ'-এর সঙ্গে ইংরেজি কোন কবিতার সাদৃশ্য পাওয়া যায়?

উ : Fi, fie, foh, fum! I smell the blood of a Britain man

প্র : 'খাঁক থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই' — এটি কী?

উ : প্রবাদ।

প্র : 'কথা কয়ে না কেটো পাত / তাতেই কাপড় তাতেই ভাত' — এটি কার কথা?

উ : খনার।

প্র : ভারতের পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথা কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়?

উ : প্রবাদ বাক্য, ডাক ও খনার বচনে।

প্র : কোন প্রবাদ বাকাটি পাণ্ডুয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়?

উ : পিঁড়ের বসে পেঁড়োর খবর।

প্র : খনা কে?

উ : প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী। তাঁর প্রকৃত নাম লীলাবতী। বাংলাদেশের জলবায়ু নির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলে ধারণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার দেউলি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল বলে জনশ্রুতি আছে।

প্র : 'পাণ্ডুয়া' কী?

উ : প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে 'সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

উ : প্রবাদবাক্য, ডাক ও খনার বচন, ঘুমপাড়ানী গান এবং খোকা-খুকির ছড়াকে।

প্র : কখন কপাটি খেলার প্রচলন ছিল?

উ : যখন ফুটবল, ব্যাটবলের নামও কারো জানা ছিল না।

প্র : পল্লির মাঠে-ঘাটে কী ছড়িয়ে আছে?

উ : জারি, ভাটিয়ালি, বাউলি, মারফতি গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

প্র : আজকাল বাংলা সাহিত্য বলে যে সাহিত্য চলছে তা কোন ধরনের সাহিত্য?

উ : পনের আনা শহুরে সাহিত্য।

প্র : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পল্লির সাহিত্যের সামুদায়ার কী বলেছেন?

উ : নাগরিক সাহিত্য।

প্র : কোন সাহিত্যে জেলে-মাঝি, মুটে-মজুর, কৃষকের কথা নেই?

উ : নাগরিক সাহিত্যে।

প্র : শহরের জীবন কাদের কাছে অজানা রয়ে?

উ : শহরে লোকদের।

প্র : 'বালাম' অর্থ কী?

উ : বইয়ের খণ্ড। ইংরেজি Volume।

প্র : Proletariat সাহিত্য কী?

উ : অত্যাচারিত শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্য।

প্র : 'ভুয়োদর্শন' অর্থ কী?

উ : প্রচুর দেখা ও শোনার মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা।

প্র : ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন কে?

উ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক ও সাধক। তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের গৌরব ও মর্যাদা সাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থে 'দীনেশচন্দ্র সেন' অংশ)।

প্র : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র সংগ্রাহক কে?

উ : চন্দ্রকুমার দে।

প্র : 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সংগ্রাহক ও সম্পাদকের নাম কী?

উ : চন্দ্রকুমার দে ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

প্র : 'রামায়ণী কথা', 'ভড়ভরত', 'বেহুলা' গ্রন্থগুলোর লেখক কে?

উ : ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন।

প্র : সাহিত্যের এক অমূল্য খনি কোথায় লুকিয়ে আছে?

উ : গ্রামবাংলার মায়েদের বুকের কোনে।

প্র : ময়মনসিংহের মদিনা বিবির সৌন্দর্যে কে মুগ্ধ হয়েছিলেন?

উ : পশ্চিমের সাহিত্যরসিক রোমাঁ রোলাঁ।

প্র : রোমাঁ রোলাঁ কে ছিলেন?

উ : ফরাসি নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিল্পচর্চাকারী। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর আলাপ হয়েছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ পরমহংসের, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী লিখেছিলেন। লেখকজীবনে বেশী বেশী ভ্রমণকাহিনী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রথা-প্রভাব তাঁকে পরলোকে রচনা করে।

প্র : আধুনিক নিক্কার কর্মনাশা স্রোতে অতল গর্ভে কী কী তলিয়ে যাচ্ছে?

উ : প্রতিটির লোককথা তলিয়ে যাচ্ছে।

প্র : আধুনিকদের শিক্ষিত জনগণীরা সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাজপুত্রীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা কবিরাজের ঘোড়ার কথা শোনান না তাই এগুলো স্রোতের অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।

প্র : ভারতের পুরান ইতিহাস অনেক গোপন কথা কার মধ্যে লুকিয়ে আছে?

উ : প্রবাদ বাক্য এবং ডাক ও খনার বচনে।

প্র : লোকসাহিত্য কী?

উ : গ্রামের সাহিত্য।

প্র : 'Proletariat' সাহিত্য কী?

উ : শ্রমমানুষের সাহিত্যকে প্রলেতারিয়েত সাহিত্য বলে।

প্র : পল্লিসাইতা কেন আজ ধ্বংস হচ্ছে?

উ : সময়-রুচির পরিবর্তনের কারণে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

প্র : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্মসন কত?

উ : আনুমানিক ১৭৬২।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : লেখক। পরে উইলিয়াম কেরীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম কী?

উ : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলী (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩)।

প্র : 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনূদিত কাহিনি সংকলন।

বাংলা গদ্যের আদিযুগের ইতিহাসে এ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

প্র : তাঁর রচনা কী কী?

উ : বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে তিনি অনেক কালজয়ী পুস্তিকা রচনা করেন।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৮১৯।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

প্র : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জন্ম কত সালে?

উ : ১৯০৩।

প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : কাজলদুর নোয়াখালি।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : শিক্ষাবিদ।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উ : বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের নাম কী?

উ : সংস্কৃতি-কথা (১৯৪৮), সমাজ (১৯৫৩) ও সুখ (১৯৬৮)।

প্র : তিনি সংস্কৃতি সম্পর্কে কী বিশ্লেষণ ও মানবজীবনে সংস্কৃতি কেন প্রয়োজন?

উ : সংস্কৃতি-কথা।

প্র : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনার পরিচয় দাও।

উ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী সংস্কৃতি ও শিক্ষা এ দুটো বিষয় নিয়ে ভেবেছেন। তবে সংস্কৃতি নিয়েই তিনি ভেবেছেন বেশি। শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধে বিবেচনা এক অর্থে সংস্কৃতি-চেতনার অঙ্গ। শিক্ষার উপযোগিতা ও মন্থর-সবল দুটোই তিনি ভেবেছেন। শিক্ষাদানে করে মাছ-ভাত জোগাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে বটে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশ ব্যবস্থা তার নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ বলতে তিনি বোঝাতেন সুসংস্কৃত হওয়াকে আর এটাই তাঁর সংস্কৃতিচেতনা। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধের বইয়ের নাম 'সংস্কৃতি-কথা'; আর এখানের প্রথম প্রবন্ধের নামও ঐ একই। এই একটি প্রবন্ধ মূলত পড়লে সংস্কৃতি

নিয়ে বাঙালির আর অন্য কোনো পাঠ নেবার দরকার নেই। 'সংস্কৃতি' বলতে সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে যা বোঝানো হয় মোতাহের হোসেন চৌধুরী সেই প্রচলিত কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন, কোনো সমাজের জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক কর্মকাণ্ডেই সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। নিষ্ঠাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলেই সংস্কৃতি উপভোগের ক্ষমতা জন্মে। আর নিষ্ঠার জন্য চাই উন্নত রুচিবোধ সৃষ্টি। ধর্মকে তিনি 'পুরো' সংস্কৃতি বলেন নি, বলেছেন সংস্কৃতির 'অঙ্গ'। তাই তাঁর বক্তব্য, ধার্মিক হওয়া মানে আংশিক সংস্কৃতিমান হওয়া; আর সংস্কৃতিমান হওয়া মানে পুরো ধার্মিক হওয়া। পাকিস্তানের যে সময় তিনি এই বক্তব্য উল্লেখ করেছিলেন, কালের বিচারে তা ছিল যথেষ্ট সাহসী। আর তাঁর সংস্কৃতি-ভাবনা আজকের বন্ধ্যা সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

প্র : তিনি আর কী রচনায় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন?
উ : কবিতা রচনায়।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কবে?
উ : ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সংসারটা আজ কিসে পরিপূর্ণ?
উ : স্থূলবুদ্ধি ও জবরদস্তিপ্রিয় মানুষে।
প্র : জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে না তুলে অন্যের ক্ষতি মানুষ কেন করে?
উ : প্রেম ও সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ করে নি বলে। এজন্য এরা নিষ্ঠুর ও বিকৃতবুদ্ধি।
প্র : প্রাবন্ধিক জীবনের সার্থকতা কোথায় খুঁজেছেন–
উ : বৃক্ষের মাঝে।
প্র : তপোবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ জীবনের গতি খুঁজেছেন কোথায়?
উ : নদীর গতিতে। উল্লেখ্য তিনি নদীকেই মনুষ্যত্বের প্রতীক ভেবেছেন।
প্র : মানুষের জীবনের সাধনা কী হওয়া উচিত নয়?
উ : অনবরত ধেয়ে চলা।
প্র : বৃক্ষের মাঝে রবীন্দ্রনাথ কী দেখেছেন?
উ : অন্তরের সৃষ্টি ধর্ম।
প্র : বৃক্ষ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিসের ইঙ্গিত দেয়–
উ : প্রশান্তির। শান্ত ও সহিষ্ণুতার সে জীবনের ভার বহন করে।
প্র : 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া?
উ : 'সংস্কৃতি' কথা।
প্র : অহংকার কাদের প্রধান দেবতা?
উ : বিচার বিবেচনা ও চিন্তা চেতনাহীন লোকদের।

'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম কী?
উ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী।
প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি প্রবন্ধকারের কোনগ্রন্থ থেকে সংকলিত?
উ : 'সংস্কৃতি-কথা'।
প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনকে কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
উ : দোতলা ঘরের সঙ্গে।
প্র : জীবসত্তার ঘর থেকে মানবসত্তার ঘরে উঠবার মই কী?
উ : শিক্ষা।
প্র : 'ক্ষুৎপিপাসা'র ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর।
উ : ক্ষুধা ও পিপাসা — দ্বন্দ্ব সমাস।
প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক কোনটিকে অভিনন্দনযোগ্য মনে করেছেন?
উ : অন্নচিন্তার নিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টাকে।
প্র : প্রচুর অন্নবস্ত্র পেলে আলো-হাওয়ার স্থান বঞ্চিত মানুষ কোন স্থানকে স্বর্গতুল্য মনে করে?
উ : কারাগারকে।
প্র : 'অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়েও মুক্তি বড়' — এই বোধটি কিসের পরিচায়ক?
উ : মানুষের মনুষ্যত্বের বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন।
প্র : কোথায় মুক্তি নেই?
উ : যেখানে চিন্তার, বুদ্ধির ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই।
প্র : কিসের জন্য মনুষ্যত্বের সাধনা ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব নয়?
উ : অন্নবস্ত্রের দুশ্চিন্তায়।
প্র : অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ কী অর্জনে অক্ষম?
উ : প্রকৃত মনুষ্যত্ব।
প্র : প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম নয় কারা?
উ : অর্থচিন্তায় ব্যস্ত মানুষ।
প্র : 'লেফাফাদুরস্তি আর শিক্ষা এক কথা নয়।'— উক্তিটি কার?
উ : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর।
প্র : 'লেফাফা' অর্থ কী?
উ : চিঠি আবৃত করার খাম।
প্র : 'লেফাফাদুরস্তি' অর্থ কী?
উ : বাইরে ঠিকঠাক ভেতরে ফাঁকা।
প্র : শিক্ষার আসল কাজ কী?
উ : মূল্যবোধ সৃষ্টি।
প্র : 'জ্ঞান' কী?
উ : মূল্যবোধ সৃষ্টির উপায়মাত্র।
প্র : কিসের মাধ্যমে মূল্যবোধ তথা মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়?
উ : শিক্ষার।
প্র : কিসের ফলে মানুষের আত্মিক মৃত্যু ঘটে?
উ : লোভের ফলে।
প্র : অন্নচিন্তা মানুষের কোন সত্তার অন্তর্ভুক্ত?
উ : জীবসত্তা।
প্র : 'শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে লেখক শিক্ষার কী রকম সুফল প্রত্যাশা করেছেন?
উ : ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক।
প্র : সহজে দানাপানি পাওয়ার লোভে খাঁচায় বন্দি না হওয়াটা কোন সত্যকে প্রমাণ করে?
উ : অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

প্র : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জন্ম কবে?
উ : ২২শে জুলাই, ১৯২৬।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : খালিশপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালি।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : অধ্যাপক ও লেখক।
প্র : তিনি কী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন?
উ : প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার, রবি পরিক্রমা, রঙিন আখর, Colloquial Bengali, সাহিত্যের নবরূপায়ণ।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার ও পদক লাভ করেন?
উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার আশুতোষ স্বর্ণপদক ও প্রবন্ধে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ নিখোঁজ হন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্র : মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্মতারিখ কবে?
উ : ৭ই জুন, ১৮৬৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : হাকিমপুর, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।
প্র : কত সালে তাঁর সম্পাদনায় 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯০৩।
প্র : তাঁর সম্পাদিত দুটি স্বল্পস্থায়ী দৈনিক পত্রিকার নাম কী?
উ : উর্দু দৈনিক 'জামানা' (১৯২০) ও দৈনিক সেবক (১৯২১)।
প্র : তাঁর সাংবাদিক জীবনের কীর্তি কী?
উ : 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা (১৮৩৬ সংখ্যা ৩১শে অক্টোবর থেকে)।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন?
উ : আরবি, উর্দু, পারসি ও সংস্কৃত ভাষায়।
প্র : রবীন্দ্রবিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি রবীন্দ্রবিতর্কে পাকিস্তান সরকারের পক্ষাবলম্বন করেন।
প্র : তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : হজরত মোহাম্মদ-এর জীবনী 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৩), 'মোসলেম বাংলার সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৮ই আগস্ট, ১৯৬৮।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী

প্র : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর জন্ম তারিখ কত?
উ : ১৮ই কার্তিক ১২৯৫ (১৮৮৮)।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তৎকালীন ফরিদপুর বর্তমান রাজবাড়ি জেলার পাংশার মাগরাডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : তিনি কোথায় লেখাপড়া করেন?
উ : রাজবাড়ি সূর্যকুমার ইন্সটিটিউট থেকে এন্ট্রান্স পাস; কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কোহিনূর'।
প্র : তিনি কোন সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯১১)।
প্র : তাঁর রচনার মূল উপজীব্য কী ছিল?
উ : ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি।
প্র : কর্মজীবনে তিনি কী ছিলেন?
উ : শিক্ষক এবং সাংবাদিক।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?
উ : মাসিক 'কোহিনূর'; মাসিক 'সাহিত্যিক' (কবি গোলাম মোস্তফা সহযোগে)।
প্র : তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল?
উ : ইসলামের প্রতি তিনি ছিলেন দরদি। এ মরম নিয়েই তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এই বিতর্কে তিনি বাংলার পক্ষাবলম্বন করেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'ধর্মের কাহিনী' (১৯১৪), 'মুসলিম-' (১৯১৮), 'শান্তিধারা' (১৯১৯), 'মহা মুকুট' (১৯২২)।
প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর, ফরিদপুরে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী

প্র : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ২৮শে ভাদ্র ১৩০৩ (১৮৯৬) বসিরহাট সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : মুনশী মোহাম্মদ ইব্রাহিম।
প্র : তিনি কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করেন?
উ : স্থানীয় স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে কলকাতা গঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। সাংবাদিকতার জন্য লেখাপড়া ছাড়েন।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দি মুসলমান; দৈনিক সেবক, সাপ্তাহিক খাদেম, সাপ্তাহিক সওগাত, দ্বিমাসিক সাম্যবাদী। এসব পত্রিকা তখন কলকাতা থেকে বের হতো। ওয়াজেদ আলী কলকাতাতেই অবস্থান করতেন।
প্র : কত সালে তিনি কলকাতা থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আসেন, কেন?
উ : ১৯৩৫ সালে। চলে আসার একটি কারণ, মোহাম্মদী ও আজাদ পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে তিনি আশরাফ-আতরাফ বিষয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আকরম খাঁ ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। অন্য কারণ, নিজের পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনিই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন।
প্র : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর পরিচয় কী?
উ : তিনি মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক। ইসলামিক আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ তিনি লালন করতেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর প্রিয় নেতা ছিলেন।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম লেখ :
উ : রসায়নুল মুহসীন (১৯৪০); মরুভাস্কর (হযরত মোহাম্মদের জীবনী, ১৯৪১); হযরত মোহাম্মদ (ছোটদের জন্য জীবনী, ১৯৪৮); তাজেদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৯৪৯); মণিচয়নিকা (১৯৫১)।
প্র : কবে, কোথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৫৪ সালের ৮ই নবেম্বর, সাতক্ষীরার বাঁশদহে।

রসুল মুহম্মদ (স.) থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচিত 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধটি লেখকের কোন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত?
উ : মরু ভাস্কর (১৯৪১)।
প্র : 'মানুষ মুহম্মদ (স.)' প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : মানুষ হিসেবে হযরত মুহম্মদ (স.)-র বৈশিষ্ট্যের আলোচনাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।
প্র : মদিনায় আঁধার ঘনিয়ে এল কেন?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)'র মৃত্যুর কথা প্রচারিত হওয়ায়।
প্র : 'যে বলিবে হযরত মরিয়াছেন, তাহার মাথা যাইবে।'—উক্তিটি কার?
উ : হযরত ওমরের।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর মৃত্যুসময়ে পাশে পর্যন্ত যে ছিলেন?
উ : আবু বকর।
প্র : হযরত আবু বকর মৃত্যুর মুসলমানদের কী বুঝিয়ে ছিলেন?
উ : হযরত মুহম্মদ রসুল, কিন্তু তিনি মানুষ, তিনিও জীবন-মৃত্যুর অধীন।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) কিভাবে মানুষের মন আকর্ষণ করেছিলেন?
উ : মানবীয় গুণাবলি দ্বারা।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) আকারে কেমন ছিলেন?
উ : আল-আমিন-বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী।
প্র : হযরতকে দেখে মানুষ অবাক হয়ে যেত!
উ : তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠ দেহ দেখে।
প্র : মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের সময় হযরত যে কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই কুটির-স্বামীর নাম কী?
উ : আবু আইয়ুব।
প্র : আবু আইয়ুবের স্ত্রীর নাম কী?
উ : উম্মে আইয়ুব।
প্র : শত্রুর নিষ্ঠুরতম নির্যাতন কার হাতের লৌহকপাটে আহত হাত ফিরে যেত?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'তিনি দীর্ঘ নন, খর্ব নন, কৃশ নন—এই 'তিনি' কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর।'—এটি কার উক্তি?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) পাশে মানুষকে কী করতেন?
উ : ভালোবাসতেন।
প্র : হযরত মুহম্মদ (স.) কোথায় সত্য প্রচার করতে গিয়ে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন?
উ : তায়েফে।
প্র : 'মানুষের দ্বারে দ্বারে সত্যের বাণী বহন করা আমার কাজ।'—কার কথা?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।

প্র : 'তায়েফ' কোথায় অবস্থিত?
উ : সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি উর্বর প্রদেশ।
প্র : 'তোমার পতাকা যদি দিয়াছ প্রভু, হীন আমি, তুচ্ছ আমি, নির্বল আমি, তাহা বহন করিবার শক্তি আমায় দাও।'—উক্তিটি কার?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'বিপদবারণ তুমি, অশরণের শরণ তুমি'—'তুমি' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : সৃষ্টিকর্তা: আল্লাহ।
প্র : মক্কাবাসীরা কাদের হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠিয়েছিল?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.) এবং হযরত আবু বকরকে।
প্র : ইসলাম ও মুসলিমের চিহ্ন মুছে ফেলতে চেয়েছিল কারা?
উ : মক্কার বাসিন্দা এবং তাদের মিত্রজাতিরা।
প্র : কোন কোন যুদ্ধে মক্কাবাসীরা পৃথিবী থেকে ইসলামের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছিল?
উ : বদর, ওহোদ ও আহযাব (খন্দক)-এর যুদ্ধে।
প্র : কোন যুদ্ধে হযরতের মৃত্যু সম্ভাবনায় মক্কাবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল?
উ : খয়বরের যুদ্ধে।
প্র : কোন সন্ধিতে মুসলমানদের কাঁধে ঘোর অপমানের শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল?
উ : হুদায়বিয়া সন্ধিতে।
প্র : খালিদ কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর জীবিতকালে ইসলামের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা ও সেনাপতি।
প্র : 'সাফা' কোথায়?
উ : কাবার নিকটে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়।
প্র : সাফা পর্বতের পাশে বসে হযরত মুহম্মদ (স.) কী করছিলেন?
উ : সত্যান্বেষী মানুষকে দীক্ষা দান করেছিলেন।
প্র : 'আমি রাজা নই, সম্রাট নই, মানুষের ভাই নই।'—এটি কার উক্তি?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)-এর।
প্র : 'আমি এমন এক নারীর সন্তান, সাধারণ শুষ্ক মাংসই ছিল যাঁহার নিত্যকার আহার্য।'—এখানে 'এমন এক নারী' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : হযরত আমিনার।
প্র : 'তিনি অন্ধকে ঘৃণা করিয়াছেন'—এখানে 'তিনি' কে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : 'দারিদ্র্য' কোন পদ?
উ : বিশেষ্যপদ।
প্র : 'আয়েশা' কে?
উ : হযরত আবু বকর (রা)-এর কন্যা, হযরত মুহম্মদের (স.) অন্যতম সহধর্মিণী।
প্র : 'তিতিক্ষা' শব্দের অর্থ কী?
উ : সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা।
প্র : 'তাই মানুষের একজন হইয়াও তিনি দুর্লভ'—এ বাক্যে কার কথা বলা হয়েছে?
উ : হযরত মুহম্মদ (স.)।
প্র : মানুষের মনের রাজা হয়েও হযরত মুহম্মদ মাথায় কিসের মুকুট পরলেন?
উ : দারিদ্র্যের কণ্টক-মুকুট।
প্র : হযরত মুহম্মদের (স.) বিশেষ গুণাবলি কাকে আকর্ষণ করেছিল?
উ : বিবি খাদিজাকে।
প্র : 'কুসুমকোমল'-এর ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখ।
উ : কুসুমের ন্যায় কোমল = উপমান কর্মধারয়।
প্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কার কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
উ : মক্কার বিখ্যাত কোরেশ বংশে।
প্র : হযরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হতে মদিনায় হিযরতের পথে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন?
উ : এক পরহিতব্রতী দম্পতির কুটিরে।
প্র : পরহিতব্রতী অর্থ কী?
উ : পরের উপকারে যারা নিয়োজিত থাকে।

প্র : মুসলিম ধর্মমতে, এই পৃথিবীতে ইসলামের বাহক ও সত্যের প্রচারক কে ছিলেন?
উ : হযরত মুহাম্মদ (স.)
প্র : কখন হযরত মদিনায় চলে গেলেন?
উ : যখন রসুল (স.)-এর উপর কোরেশরা নির্যাতন চালাতে শুরু করল আর বোঝা গেল, তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না।
প্র : বিবি আয়শার মর্মছোঁড়া বিলাপ কাদের প্রতি?
উ : সমস্ত মানুষের প্রতি।
প্র : 'আল-আমিন' শব্দের অর্থ কী?
উ : বিশ্বস্ত, প্রিয়ভাষী, সত্যবাদী।
প্র : 'জীবন-নদী'র সমাস কী?
উ : জীবন রূপ নদী— রূপক কর্মধারয় সমাস।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন

প্র : মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্ম কত সালে?
উ : আনুমানিক ১৮৬০।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চরবেলতৈল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : ঔপন্যাসিক।
প্র : তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম কী?
উ : 'আনোয়ারা' (১৯১৪) তাঁর প্রথম ও জনপ্রিয় উপন্যাস।
প্র : 'আনোয়ারা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'আনোয়ারা' (১৯১৪) শিল্পসম্মত উপন্যাস নয়। তবে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের চিত্র আছে এখানে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ব্যবসা, চাকরি ইত্যাদিতে মুসলিমদের প্রবেশের সূচনাকালীন কথকতা থাকায় এর সমাজতাত্ত্বিক মূল্য কম নয়। তাছাড়া এ সময় মুসলিমরা যে ইংরেজি পড়াশোনাও আরম্ভ করেছে সে চিত্রও এখানে আছে। নামাজের জন্য অজু করতে গিয়ে তরুণী আনোয়ারা কোরান পাঠরত নুরল এসলামকে দেখে। আনোয়ারা সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে এমন [illegible]
প্র : তাঁর রচিত ও উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?
উ : ধর্ম ও সত্যের জয়, অধর্মের পরাজয় ও আনোয়ারার স্বামীনিষ্ঠা।
প্র : তাঁর রচিত অন্য উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : 'চাঁদতারা' বা [illegible] (১৯১৭), 'পরিণাম' (১৯১৮), 'গাঁয়ের মেয়ে' (১৯২৩), 'দুনিয়া আর চাই না' (১৯২৪) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১৮ই অক্টোবর, ১৯২৩।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

প্র : মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের জন্মতারিখ কবে?
উ : ৩রা অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : পাইকারদি, চাঁদপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাময়িকপত্রের সম্পাদক।
প্র : তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি কী?
উ : সচিত্র মাসিক 'সওগাত' প্রকাশ (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) ও সম্পাদনা।

প্র : লেখা প্রকাশের পাশাপাশি সওগাতে তিনি কী করেন?
উ : গোঁড়া মুসলিম সমাজের অন্ধ সংস্কার উপেক্ষা করে তিনি পত্রিকাতে কবি-সাহিত্যিক এমনকি বিদুষী নারীদের ছবি প্রকাশ করেন।
প্র : 'সওগাত' নামটি কে নির্বাচন করেন?
উ : নাসিরউদ্দিন একাধিক নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেলে তিনি এ নামটি নির্বাচন করেন।
প্র : তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি কী?
উ : সচিত্র সাপ্তাহিক মহিলা-সাহিত্যপত্র 'বেগম' (১৩৫৪) প্রকাশ।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমির সম্মাননা পুরস্কার (১৯৭৫), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার ও ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পুরস্কার।
প্র : কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করার জন্য তিনি কী প্রবর্তন করেন?
উ : নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৬)।
প্র : তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ (২১শে মে, ১৯৯৪); ঢাকা।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

প্র : মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর জন্মতারিখ কবে?
উ : ২রা মার্চ, ১৮৯৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ঘোড়াশাল, সাজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : গদ্যশিল্পী।
প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'পারস্য প্রতিভা' (১ম খণ্ড ১৯২৪, ২য় খণ্ড ১৯৩২) ও 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪)।
প্র : পাকিস্তানে রবীন্দ্রসংগীত বিতর্কে তাঁর অবস্থান কী?
উ : তিনি বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের পাকিস্তানি সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন।
প্র : তাঁর রচনার জন্য কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০), নয়াজাতির স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ গ্রন্থের জন্য দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩), সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধি (১৯৬২) ও প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড পারফরমেন্স পদক (১৯৭০)।
প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কবে?
উ : ২রা নবেম্বর, ১৯৭৪।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্র : মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের জন্ম কত সালে?
উ : ১৮৬০।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বাউইগাছি গ্রাম, শান্তিপুর, নদীয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি ও গদ্যশিল্পী।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
উ : মোস্‌লেম ভারত (১৩২৭)।
প্র : কোন পত্রিকার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন?
উ : মোস্‌লেম ভারত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'কুসুমাঞ্জলি' (১২৮৮), 'অপূর্ব দর্শন' (১২৯২), 'হজরত মহাম্মদ' (১৩১০), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৩১৯)।
প্র : তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : 'মহর্ষি মনসুর' (১৩০৩), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৩০৫) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : 'জোহরা' (১৩২৪), 'দরাফ খান গাজী' (১৩২৬) ইত্যাদি।
প্র : তিনি কী উপাধি লাভ করেন?
উ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি।
প্র : তিনি কোথায়, কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : শান্তিপুর, ৩০শে নবেম্বর, ১৯৩৩।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

প্র : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ৩০শে শ্রাবণ, যশোরের খড়কি নামক এলাকায়।
প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : শিক্ষাবিদ, কবি ও গীতিকার।
প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : প্রবন্ধ-গবেষণা : 'আধুনিক বাংলা কাহিনীকাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র' (১৯৬২), 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ১৮৫৭-১৯২০ (১৯৭০), বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা (১৯৭৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ইতিহাস ১৯২১-৮১ (১৯৮২), আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত (১৯৮৫)। কবিতা : দুর্লভ দিন (১৯৬১), শঙ্কিত আলোক (১৯৬৮), বিপন্ন বিষাদ (১৯৬৮), প্রতনু প্রত্যাশা (১৯৭৩)। সঙ্গীত : অনির্বাণ (১৯৬৭), নির্বাচিত গান (১৯৮৪)।
প্র : তাঁর দুটো জনপ্রিয় গানের পঙ্‌ক্তি কী?
উ : আমার দেশের মাটির গন্ধে এবং অশ্রু দিয়ে লেখা এ গান।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (কবিতা : ১৯৭২), জহির রায়হান চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৭২-৭৩), বিশ্ব সাহিত্য উন্নয়ন রত্ন, বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ, ভারত (১৯৮৩), বৃহত্তর যশোর সমিতি পুরস্কার (২০০৪)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সালে।

মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান

প্র : মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমান কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৮৮৯ সালে বর্তমান মাগুরা জেলার শারনান্দুয়ালি গ্রামে।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : মাগুরা জেলার হাজিপুর গ্রামে।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : সরদার মইনউদ্দিন আহমেদ।
প্র : তিনি আর কী নামে পরিচিত?
উ : ডাক্তার লুত্‌ফর রহমান। [illegible] 'লুত্‌ফর' বানান লিখতেন [illegible] তার ক্ষেত্রে [illegible]।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : মাগুরা স্কুল থেকে [illegible] মহসিন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু [illegible] অব্যাহত রাখেন নি। [illegible] হোমিওপ্যাথিক এইচ.এম.বি. [illegible] হোমিও ডাক্তারিতে নিয়োজিত হন।
প্র : লুত্‌ফর রহমান সমাজপরিত্যক্ত নারীদের জন্য কোন কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, কোথায়?
উ : 'নারীশিল্প বিদ্যালয়' এবং 'নারীশ্রী' : কলকাতায়।
প্র : এ প্রতিষ্ঠান দুটোর সভাপতি করা হয় কাকে?
উ : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে।
প্র : লুত্‌ফর রহমান কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?
উ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা; সহচর; নারীশক্তি।
প্র : প্রকাশকালসহ লুত্‌ফর রহমান রচিত গ্রন্থাবলির নাম লেখ :
উ : প্রবন্ধগ্রন্থ : উচ্চজীবন (১৯১৯); মহৎজীবন (১৯২৬); উন্নতজীবন (১৯২৭); মানবজীবন (১৯২৭); সত্যজীবন (১৯৪০)।
উপন্যাস : পথহারা (১৯১৯); রায়হান (১৯১৯); প্রীতি উপহার (১৯২৭)।
শিশুসাহিত্য : রানী হেলেন (১৯৩৪) ইত্যাদি।
প্র : মোহাম্মদ লুত্‌ফর রহমানের সাহিত্যসাধনার লক্ষ্য কী ছিল?
উ : মানুষের নৈতিক চেতনাজাগ্রত ও উন্নত করাই ছিল তাঁর সাহিত্যরচনার লক্ষ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলি সহজবোধ্য কিন্তু গভীর ভাবযুক্ত।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক হিসেবে।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৩৬ সালের ৩১শে মার্চ নিজ নিবাস মাগুরার হাজিপুর গ্রামে।

মোহিতলাল মজুমদার

প্র : মোহিতলাল মজুমদারের জন্মতারিখ কবে?
উ : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কাঁচড়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : অধ্যাপনা।
প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেন?
উ : বাংলা বিভাগে।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : সত্যসুন্দর দাস।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন?
উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন'।
প্র : মোহিতলালের কবিতা বিশিষ্ট কোন দিক থেকে?
উ : তিনি সাহিত্যের আদর্শানুসারে বাংলায় চমৎকারভাবে আরবি, পারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হন। মোহিতলালের কবিপ্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেহবাদ-ভোগবাদ। তাঁর কবিস্বভাবের মর্মমূলে ছিল ঘোর বাস্তববাদ। তিনি বস্তুজগৎ ও বাস্তবের পূজারী। কবিতার আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তার কথায়- 'Form বলিতে রচনার একটি পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বোঝায়- ভাষা যেমন গাঢ়বদ্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই সুসম্বদ্ধ ও আকার সুপরিকল্পিত হইবে।'
প্র : মোহিতলালের কবিতার প্রধান বিষয় কী?
উ : মোহিতলালের কবিতার প্রধান বিষয় প্রেম দেহাশ্রয়ী, কামকে স্বীকার করেই [illegible] স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। প্রথমে তাঁর কবিতায় রবীন্দ্রবিরোধী ভাব থাকলেও পরে রবীন্দ্র অনুসারী ভাবও ধরা পড়ে।
প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : স্বপন পসারী (১৩২৮), বিস্মরণী (১৩[illegible]), স্মরগরল (১৩৪৩), হেমন্ত [illegible] (১৩৪৮)।
প্র : তাঁর রচিত প্রবন্ধ সমালোচনাগুলোর নাম কী?
উ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য (১৩[illegible]), সাহিত্যকথা (১৩৪৫), বিচিত্র [illegible] (১৩৪৮), কবি শ্রীমধুসূদন (১৩[illegible]) ইত্যাদি।
প্র : নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল?
উ : মোহিতলালই 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতার প্রথম একটি সুন্দর আলোচনা করে নজরুলের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ২৬শে জুলাই, ১৯৫২।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্র : যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মতারিখ কত?
উ : ২৭শে নবেম্বর, ১৮৭৮।
প্র : তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : জামশেরপুর, নদীয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?
উ : মানসী, পূর্বাচল ও যমুনা পত্রিকার।
প্র : তাঁর কবিমানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?
উ : পল্লিপ্রীতি।
প্র : তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), অপরাজিতা (১৯১৫), নীহারিকা (১৯২৭), মহাভারতী (১৯৩৬) ইত্যাদি।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?
উ : ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮।

রণেশ দাশগুপ্ত

প্র : রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি; আসামের ডিব্রুগড়ে।
প্র : তিনি কিভাবে রাজনীতিতে আসেন?
উ : ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়ার সময় সশস্ত্র গোপন দলে যোগদানের মাধ্যমে।
প্র : কোথায় তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয়?
উ : ঢাকার নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় (এই পত্রিকায় শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতা ছাপা হয়) সহকারী সম্পাদক হিসেবে (১৯৩৮)।
প্র : তিনি কোন সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন?
উ : ঢাকায় 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠায় (১৯৩৯-৪০)। তাছাড়া এই সংঘের মুখপত্র 'ক্রান্তি' প্রকাশের ক্ষেত্রে।
প্র : রণেশ দাশগুপ্ত কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : বামপন্থী রাজনীতি। এ কারণে তিনি বহুবার জেল খেটেছেন, বিনা বিচারে আটক থেকেছেন।
প্র : তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কী ছিলেন?
উ : নির্বাচিত (১৯৫৭) ওয়ার্ড কমিশনার। শাঁখারি বাজার-তাঁতি বাজার-ইসলামপুর ছিল তাঁর এলাকা।
প্র : রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম লেখ।
উ : উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (১৯৬৬), আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০), আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬), মুক্তিধারা (১৯৮৯), সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা : আত্মজিজ্ঞাসা (১৯৯৪)।
প্র : তাঁর কোন গ্রন্থটি পাকিস্তানি শাসনামলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে স্বীকৃতি পায়?
উ : উপন্যাসের শিল্পরূপ।
প্র : 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : রণেশ দাশগুপ্তের প্রবন্ধের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। ২৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রন্থটিতে উপন্যাসের উত্তর ও বিকাশ, আঙ্গিক ও গঠন, বিষয় ও শৈলী, সর্বোপরি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলা উপন্যাসের 'অভ্যুত্থানমূলক ধারা' শীর্ষক শাঁচটি পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাসগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলা প্রবন্ধের ধারায় এই গ্রন্থটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। পাকিস্তানি শাসনামলেই এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হয়। মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস বিচারের এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলাদেশে আর লিখিত হয় নি। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি একে আরো সমৃদ্ধ করেন।
প্র : 'আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : রণেশ দাশগুপ্ত রচিত প্রবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। বইটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়, পাবলো নেরুদা, গিওনি লুকাচ, শলোকভয়ের সাহিত্য ও কাব্য আলোচনা পাঠকের চিন্তাকে প্রসারিত করে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সারের সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখক রণেশ দাশগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠকের জন্য নতুন দিক নির্দেশনা ও ভাবনার জগতকে প্রসারিত করেছেন।
প্র : তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে কে, কোন বিখ্যাত নাটকটি লেখেন?
উ : মুনীর চৌধুরী রচিত কবর (রচনা : ১৯৫৩, প্রকাশ : ১৯৬৬)।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর কলকাতায়। ৬ই নবেম্বর ঢাকার শ্যামপুর শুশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৬১ সালের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ, কলকাতার জোড়াসাঁকো নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা: সব্যসাচী লেখক, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সুরস্রষ্টা, গায়ক, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, সমাজসেবী ও শিক্ষাবিদ।

প্র : তাঁর পিতামহ, পিতামহী এবং পিতা ও মাতার নাম কী?

উ : পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতামহী দিগম্বরী দেবী এবং পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী।

প্র : রবীন্দ্রনাথ মাতা-পিতার কততম সন্তান?

উ : তিনি মা-বাবার চতুর্দশ সন্তান ও অষ্টম পুত্র। রবীন্দ্রনাথেরা পনের ভাইবোন ছিলেন।

প্র : তাঁদের পরিবারটি কোন বংশের ছিল?

উ : পিরালি ব্রাহ্মণ বংশের।

প্র : তিনি কত বছর বয়সে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন?

উ : আট বছর।

প্র : কত বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় এবং তা কোন পত্রিকায়?

উ : ২৫/২/১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায়। তখন তার বয়স তের বৎসর।

প্র : কবিতাটির নাম কী ছিল?

উ : হিন্দুমেলার উপহার।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত সালে ইংরেজি সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যে প্রথম ইংল্যান্ডে যান?

উ : ১৮৭৮ সালে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : কবি-কাহিনী (প্রকাশকাল : ১৮৭৮)

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : বনফুল (প্রকাশকাল : ১৮৮০)

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত নাটকের নাম কী?

উ : বাল্মীকি প্রতিভা (প্রকাশকাল : ১৮৮১) (রবীন্দ্রনাথের 'রুদ্রচণ্ড' নাটক নয়। এতে সামান্য নাটকীয়তা আছে মাত্র। রুদ্রচণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম কী?

উ : বৌঠাকুরাণীর হাট (প্রকাশকাল ১৮৮৩)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের নাম কী?

উ : ভিখারিনী (১৮৭৪)।

প্র : 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন : 'বোলপুরে যখন কবিতা লিখিতাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু-নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালোবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত। তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে পৃথ্বীরাজের পরাজয় বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত বাহন সেই বাঁধানো ডায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীলখাতাটির অনুসরণ করিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া যায় নাই।' এখানেই প্রথম জানা গেল 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে'র নাম। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ধরেই কেউ কেউ বলেন যে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' তাঁর প্রথম রচনা। কিন্তুর এর আগেও যে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন তার ইঙ্গিত এই উদ্ধৃতিতেই আছে (হারিয়ে যাওয়া নীলখাতায়) সে কথা তারা ভুলে যান। রবীন্দ্রনাথের হারিয়ে যাওয়া সেই ডায়েরি ও নীলখাতা পাওয়া গেলে বোঝা যেত, কোনটি তাঁর প্রথম রচনা। তাই খুঁজে না পাওয়া লেখাগুলোকে বিবেচনায় আনা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা কোনটি তা নির্ধারিত হবে তাঁর প্রাপ্ত লেখাগুলোর নিরিখে।

প্র : 'কবি-কাহিনী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কবি-কাহিনী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি একটি কাব্যগ্রন্থ। 'ভারতী' পত্রিকায় পৌষ-চৈত্র, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৮ খ্রি.) সংখ্যায় এর কবিতাগুলি ছাপা হয়। ১৮৭৮ সালেই কবিতাগুলি নিয়ে 'কবি-কাহিনী' গ্রন্থ প্রকাশিত হলে গ্রন্থকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আরম্ভ হয়। চার সর্গে বিভক্ত এই নাতিদীর্ঘ কাব্যের নায়ক এক কবি এবং নায়িকা নলিনী। নলিনীর মৃত্যুর পর নায়ক কবির বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি। মনে করা হয়, এ কাব্যের নায়ক রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কবিতার কাহিনিতে নাটকীয়তা নেই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা। তবে বিন্যাস পয়ার ও ত্রিপদী উভয় ধরনের।

প্র : 'বনফুল' কাব্য সম্পর্কে লেখ।

উ : গ্রন্থ হিসেবে 'বনফুল' কাব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ (প্রকাশ: ১৮৮০)। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' (প্রকাশ: ১৮৭৮)। তবে 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রতিবিম্ব' নামক দুটি পত্রিকায় 'বনফুল' গ্রন্থের কবিতা ১৮৭৬ সালেই প্রকাশ পায়। তাই কেউ কেউ 'বনফুল'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য বলে থাকেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে পত্রিকায় প্রকাশের উপর নির্ভর করে 'বনফুল'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্য বলা গেলেও প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কিন্তু বলা যাবে না। তাছাড়া 'বনফুল'কে সুকুমার সেন নির্ভেজাল কাব্য না বলে, বলেছেন 'কাব্যোপন্যাস'। একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য: 'বনফুলের প্লটের আরম্ভে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনীর অনুসরণ আছে। কমলা-ভূমিকায় শকুন্তলার ছাপ আছে। ভাব-ভাষা-অলঙ্কারে মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রনাথের বিহারীলালের এবং মধুসূদনের প্রতিধ্বনি আছে।' গ্রন্থটি আট সর্গ বিশিষ্ট। মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বিজয়, কমলা, নীরদ, নীরজা এ কাব্যের উল্লেখযোগ্য পাত্রপাত্রী।

প্র : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বৌঠাকুরাণীর হাট' [illegible] 'ভারতী' পত্রিকায় [illegible] খ্রিষ্টাব্দে তা গ্রন্থাকার প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের কাহিনি সূত্র পেয়েছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গবিপ্লব পরাজয়' (১৯৬৯) গ্রন্থের মতো। উপন্যাসের [illegible] চরিত্রগুলোর নাম ও কিছু [illegible] ঐতিহাসিকতার ছোঁয়া থাকলেও এর সঙ্গে ইতিহাসের সরাসরি সম্পর্ক নেই। চরিত্রসমূহ যেমন, বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য, বিভার সম্পর্ক রবীন্দ্রভাবনা তাড়িত শিশুকালে ভূতলালিত রবীন্দ্রনাথ মাতৃবিয়োগ হবার পর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সৌদামিনী দেবীর স্নেহে লালিত-পালিত হন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' সেই স্নেহের সুষমা আছে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় সৌদামিনী দেবীকে। এই উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নামে নাটক রচনা করেন।

প্র : 'করুণা' কি রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস?

উ : 'করুণা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা প্রথম উপন্যাস, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস নয় (প্রথম উপন্যাসগ্রন্থের নাম 'বৌঠাকুরাণীর হাট')। মাসিক 'ভারতী' পত্রিকায় এক বৎসর ধরে (আশ্বিন-ভাদ্র ১২৮৪-৮৫) 'করুণা' উপন্যাসটি ছাপা হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তেও এই রচনার কোনো উল্লেখ করেন নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলি'তে (১৯৬১) 'করুণা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সাতাশ পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট এই উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মহেন্দ্র, মোহিনী, রজনী।

প্র : বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয় কাকে?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি?

উ : বিবিধপ্রসঙ্গ (১৮৮৩)।

প্র : রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা কয়টি নাটকে অভিনয় করেন?
উ : ১৩টি।
প্র : আর্জেন্টিনার কোন মহীরুহকে রবীন্দ্রনাথ বিজয়া নাম দেন?
উ : ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।
প্র : তাঁকে রবীন্দ্রনাথ কী উৎসর্গ করেন?
উ : পূরবী (১৯২৫) কাব্য।
প্র : রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বিদেশযাত্রা কোন দেশে, কবে?
উ : সিংহল, ১৯৩৪ সালে।
প্র : প্রথমজীবনে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা কোনটি?
উ : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (আমি এ প্রভাতে রবির কর/ কেমনে পশিল প্রাণের' পর)।
প্র : হিন্দু-মুসলিম মিলনের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন উৎসবের সূচনা করেন?
উ : রাখিবন্ধন।
প্র : ভবতারিণী দেবীর সঙ্গে কত সালে তাঁর বিয়ে হয়?
উ : ১৮৮৩, ৯ই ডিসেম্বর।
প্র : রবীন্দ্রনাথের শ্বশুর বাড়ি কোথায়?
উ : বাংলাদেশের খুলনায়।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ভবতারিণী দেবীর নাম পাল্টে কী রাখেন?
উ : মৃণালিনী দেবী।
প্র : রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনীর কয় সন্তান ছিল?
উ : ৫ জন। দুই পুত্র, তিন কন্যা।
প্র : রবীন্দ্রনাথের বৌঠান জ্যোতিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী কত তারিখে আত্মহত্যা করেন?
উ : ১৯-৪-১৮৮৪।
প্র : কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ৪১ বছর।
প্র : রবীন্দ্রনাথ কত সালে ব্রাহ্ম সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন?
উ : ১৮৮৪ সালে।
প্র : তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস কোন পত্রিকায় বের হয়?
উ : 'বালক' পত্রিকায়।
প্র : কবি কত সালে 'শান্তিনিকেতনে' স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন?
উ : ১৯০১ সালে।
প্র : কত সালে কবি শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন?
উ : ১৯০১ সালে।
প্র : কত সালে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়?
উ : ১৯২১ সালে।
প্র : 'গীতাঞ্জলি' কাব্য কত সালে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : গীতাঞ্জলি অবলম্বনে Song Offerings কত সালে প্রকাশিত হয়।
উ : ১৯১২ সালের নবেম্বরে, ইংল্যান্ডে।
প্র : Song Offerings-এর ভূমিকা লেখেন কে?
উ : ইংরেজ কবি W. B. Yeats.
প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার অর্জন করেন ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বা Song Offerings গ্রন্থের জন্য।
প্র : কবি কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?
উ : ১৯১৩ সালের নবেম্বর মাসে।
প্র : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে?
উ : ১৯১৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর।
প্র : শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক চুরি হয় কবে?
উ : ২৪শে মার্চ, ২০০৪ দিবাগত রাতে।
প্র : ব্রিটিশ সরকার কত সালে তাঁকে নাইটহুড বা 'স্যার' উপাধি প্রদান করেন?
উ : ১৯১৫, ৩রা জুন।
প্র : তিনি কবে, কেন তা বর্জন করেন?
উ : পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৩/৪/১৯১৯) প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে।
প্র : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কত সালে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করে।
উ : ১৯৪০-এর ৭ই অগস্ট।
প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কত সালে ডি.লিট. উপাধি দেয়া হয়?
উ : ১৯৩৬ সালে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিভাণ্ডারের সংখ্যা কত?
উ : কাব্যগ্রন্থ ৫৬টি, গীতিপুস্তক ৪টি, ছোটগল্প ১১৯টি, উপন্যাস ১২টি, প্রবন্ধ-আলোচনা ১২টি, নাটক ২৯টি, কাব্যনাট্য ১৯টি, চিঠিপত্রের বই ১৩টি, গানের সংখ্যা ২২৩২টি এবং অঙ্কিত চিত্রাবলি প্রায় ২৫০টি।
প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম রচনা সংকলনের নাম কী?
উ : 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)। এলাহাবাদের ভারতমিহির প্রেস থেকে পাঁচকড়ি মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণে ১৩০টি কবিতা ছিল। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের ২০০টি কবিতা বেছে দেবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার থেকে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দেন। তাঁদের ভোট সংখ্যা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তার সূচক। ১৯২৫ সালের সংস্করণ এই লোকপ্রিয়তা অনুসারে সংকলিত হয়।
প্র : রবীন্দ্রনাথের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : ধ্বনী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৭), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬), পূরবী (১৯২৫), পুনশ্চ (১৯৩২), পত্রপুট (১৯৩৬), সেঁজুতি (১৯৩৮), শেষলেখা (১৯৪১)।
প্র : 'প্রভাতসঙ্গীত' গ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩) একটি কাব্যগ্রন্থ। এখানে মোট একুশটি কবিতা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস।' এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।
প্র : 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) সম্পর্কে বলা হয়, এইগ্রন্থের বিষয়বিচিত্র, ভাবসুস্পষ্ট, ভাষা সুদৃঢ়, ছন্দ মধুর। তারুণ্যের উচ্ছলতা, নারীদেহের প্রতি মুগ্ধতা ও মৃত্যুর রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ-এই দ্বিতীয় পর্যায় কবিতা। উপন্যাস লিখেছেন, 'মুকুল' নামের একটি শিশুর মাসিক পত্র প্রকাশ। কবি ও সোনার তরী প্রকাশ ১৮৯৪ সালে, ছোট গল্পের ভাবনাকে সূচনা হয় ইন্দিরা দেবীর আগ্রহাতিশয্যে। এই বিরাশের সৃষ্টি অবলম্বন চিত্রা প্রকাশ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য কবিতা : ১ম পত্র, ১ম দেখা, মোহ।
প্র : 'মানসী' কবিতার পরিচয় দাও।
উ : 'মানসী (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন পূর্ণপ্রস্ফুটিত কবিতা তাই কবি বুদ্ধদেব বসু 'মানসী কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণবিকাশ বলেছেন। এখন বুদ্ধদেব প্রকৃতির প্রভাব কীভাবে অনুভূতির উপর বিস্তার করেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মানুষ আমাদের এই কবিতাগুলি সরল ভাবে সহজের ভাবে করল।[...] আমার বয়সের এই পর্যন্ত অন্তরকে পূর্ণমূল্য দিয়ে মানুষের সুখ দিতে পেরেছি।" 'মানসী'তেই মানুষ ও খোলাস দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। তাঁর সঙ্গে যেন একজন বিদ্ধ হয়ে গেল।" মানসীর কবিতাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে অতীত জীবনের পিছুটানমূলক কবিতা, অন্যদিকে নবযৌবনের নিকৃষ্ট কর্মউদ্দীপক খরনীতি। 'নিষ্ফল কামনা' এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা। এছাড়া মায়ার দুরন্ত আশা, ভুলভাঙা, বৃহৎজনে, সুরদাসের প্রার্থনা, নেপথ্যে, মেঘদূত প্রতি, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি কবিতা।
প্র : 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : 'চিত্রা' (১৮৯৬) যেন কবির রূপকের রূপক থেকে মানবের জীবনের প্রাত্যহিকতায় অবতরণ। উর্বশী, বিজয়িনী, জীবনদেবতা, স্বর্গ হইতে বিদায়, ১৪০০ সাল 'পুরনো নুই বিষয় জমি, এবার ফিরাও মোরে প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের বহুবিখ্যাত কবিতা এই কাব্যের অন্তর্গত। একগুচ্ছ কবিতায় বাস্তবমুখিতা, আরেকগুচ্ছ কবিতায় নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অভিসার-এই দুই ভিন্নমুখী সুর 'চিত্রা' কাব্যের শুরুতে

বৈশিষ্ট্য। 'চিত্রা'র শেষ কবিতা সিন্ধুপারেতে প্রকাশ করা হয়েছে যে, হৃদয়েশ কবিসত্তাকে জীবনদেবতা ঘর ছাড়া করে স্বপ্ন-অভিসারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সবজীবনলোকে জীবনস্বামিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন।

প্র : 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪১)। এই কাব্যে কোন কবিতার নাম নেই, সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে কবি এই কবিতাগুলো মুখে মুখে রচনা করেছেন এবং তা কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। এটি ত্রিত্রিশটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি ১৯৪০-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে রচিত। কবিতার ভাষা অলঙ্কারহীন, ছন্দ ধীরগতি এবং চিত্রগুলি পরিচিত জীবনের। এই ক্ষুদ্রাকৃতি কবিতাগুলি কবিপ্রতিভার করুণ অস্তিমকালের আলোক রশ্মিতে দীপ্তিময়।

প্র : 'কণিকা' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কণিকা' (১৮৯৯) ১১০টি ছোটো ছোটো পদ্যের সংকলন। অধিকাংশ কবিতাই নীতিমূলক, সংস্কৃত কাব্যের সুভাষিতাবলির আদর্শে রচিত। এই কবিতাকণাগুলোতে কবির তাত্ত্বিক দৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে।

প্র : 'উৎসর্গ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : ৪৬টি কবিতার সংকলন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উৎসর্গ' (১৯১৪)। রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা এই কাব্যগ্রন্থটিতে সংযুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : আমি চঞ্চল হে: তোমার পাছে সহজে বুঝি, সবটাই মোর ঘর আছে ইত্যাদি।

প্র : 'ক্ষণিকা' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ক্ষণিকা' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ। জীবনের আপাত-তুচ্ছ মুহূর্তগুলির প্রতি গভীর ভালোবাসা, যৌবনের উল্লাস ও চটুলতা, এই কাব্যের মূল সুর। ছন্দের সাবলীলতা ও ক্ষিপ্রতা এই কাব্যের কবিতাগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উল্লেখযোগ্য কবিতা : ক্ষণিকা, যথাসময়, বোঝাপড়া, অচেনা, বিদায়, সেকাল, উদাসীন, শেষ ইত্যাদি। এই গ্রন্থের কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতার চেয়ে স্বতন্ত্র।

প্র : 'কথা ও কাহিনী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কথা ও কাহিনী' (১৯০০) কাব্যগ্রন্থ। 'কথা' (১৮৯৯) ও 'কাহিনী' (১৯০০) নামে দুটি স্বতন্ত্রকাব্য থেকে এই গ্রন্থের কাব্য পঠিত হয়েছে। 'কথা ও কাহিনী'র প্রথম অংশে বৌদ্ধ অবদান এবং টডের গ্রন্থ 'রাজস্থানে'র কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা আছে। কবির অংশে আছে লেখকের মৌলিক কবিতা। দেবতার গ্রাস, পাষাণী, আবেদন, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, বিসর্জন প্রভৃতি কাহিনি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

প্র : 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'খেয়া' (১৯০৬) পঞ্চাশটি কবিতার সংকলন। এ সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে ক্লান্তি ও বিষাদের সুর প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থটি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো : পথের শেষ, শেষ খেয়া, ঘাটেরপথ, বিদায়, দীঘি, আষাঢ়, বৈশাখে, জাগরণ ইত্যাদি। খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে জীবনের ব্যথাবেদনার ও বিচিত্র অনুভবের মধ্যে চরম শ্রেয়োলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত। এ গ্রন্থের বেশ কিছু কবিতায় আধ্যাত্মিকতা আছে।

প্র : 'মহুয়া' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'মহুয়া' (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কাব্যগ্রন্থ। সবকটি কবিতাই প্রেমবিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের প্রেমের কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন দুঃখ, অন্যদিকে তেমনি সংরাগ প্রকাশিত। 'মহুয়া' নামের কবিতায় সেই সংরাগের পরিচয় আছে এভাবে :

'তরল যৌবনচিহ্ন মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে।
বধূরে যেদিন পাবো তাকিব মহুয়া নাম ধরে।'

মহুয়ার কবিতাগুলিকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের নারীবন্দনা। নারীর মাধুর্য ও লাবণ্য এই কাব্যগ্রন্থে বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্র : 'শ্যামলী' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'শ্যামলী' (১৯৩৬) কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের নাম দেয়া হয়েছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের মাটির ঘরের নামে। এটি মোট বাহান্নটি কবিতার সংকলন। এগুলো পদ্যকবিতার বিশেষ উদাহরণ। 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে এর মিল আছে। 'আষাঢ়ে চেতনার রঙে পাওয়া হল সবুজ', 'ঐশিকথালা', 'হঠাৎ দেখা' প্রভৃতি পরিচিতি পঙ্‌ক্তি বা কবিতাগুলি এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের শেষ পর্বের নিরলঙ্কারী ভাষা, উদাসীনতা ও জীবনের প্রতি আসক্তির বিরোধী অনুভূতি 'শ্যামলী' কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

প্র : 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থ, যেখানে জীবন সায়াহ্নে কবি জগতের অপচয় দেখে ব্যথিত হৃদয়ে প্রশ্ন করেছেন, 'কেন'? এই কাব্যের কবিতাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো শ্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য।' রাষ্ট্র ও সভ্যতার আবর্জনার উপর এবং দেশের মূঢ়তা ও বিদেশের জুলুমের প্রতি কবির ভর্ৎসনা ও ধিক্কার আছে এ গ্রন্থের কবিতায়। আছে ধর্মকে পদদলিত করে বিত্তের শক্তিতে সব শাসন করার বিরুদ্ধে শ্লেষ। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা: বুদ্ধভক্তি, হিন্দুস্থান, রাজপুতনা, কেন ইত্যাদি।

প্র : 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থে মোট বাইশটি কবিতা রয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই কবির মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে রচিত। এর আগে কবি রোগে ভুগেছেন। রোগমুক্তির পর কবিদৃষ্টিতে রূপের জগতে আপনার রূপ যেন নতুন করে দেখা দিলো।

প্র : 'আকাশ-প্রদীপ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'আকাশ-প্রদীপ' (১৯৩৯) একটি কাব্যগ্রন্থ। অধিকাংশ কবিতায় শৈশবস্মৃতি এবং জীবন সায়াহ্নের অনুভূতির প্রকাশ, 'গোধূলিতে নামল আঁধার' কবিতাটিকে কাব্যগ্রন্থের মূলসুর বলা হয়। এই কাব্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যেসব আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিকে কালবারিত বলে মনে করতেন তাদের উদ্দেশে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ আছে এ গ্রন্থে।

প্র : 'শেষ সপ্তক' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫) কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি পয়ারে লিখিত। এই ছন্দ ছন্দোলক্ষণের নির্দিষ্ট শাসন না থাকলেও আক্ষরিকতার অতিরিক্ত সংযম থেকে কবিতাগুলির মাত্রা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের নিজস্ব ছন্দ। কাকলি, অচিন গোলাপ, দূর, দূরের প্রতীক্ষা কবিতাগুলির ছন্দ ও সুরের মমতা ও জীবন সায়াহ্নের সকরুণ রেশ বহন করে।

প্র : 'সন্ধ্যাগীতা' কী?

উ : 'সন্ধ্যাগীতা' (১৯৩১) রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত। 'সন্ধ্যাগীতে' কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতাগুলি এবং সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দূরবর্তী সংস্করণে অনেক বিশ্বভারতীর পরিচালকেরা এতে কিছু নতুন কবিতা যোগ করেছেন এবং এই সময় 'শেষলেখা' পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। 'সন্ধ্যাগীতা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংকলিত গ্রন্থ।

প্র : 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উ : 'পুনশ্চ' (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্যছন্দে রচিত প্রথম ও সার্থক কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'অসংকুচিত গদ্যভঙ্গিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।' এই কাব্যের অর্ধপৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি ভূমিকা লেখেন কবি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইতিহাসে তথা আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই কাব্যের ভূমিকা বৈপ্লবিক। গদ্যকবিতার অসংকোচ প্রতিষ্ঠা হলো এই কাব্যে। উল্লেখযোগ্য কবিতা : ছেলেটা, শেষ চিঠি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে, বাঁশি, খ্যাতি ইত্যাদি।

প্র : 'পরিশেষ' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'পরিশেষ' (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যের সর্বত্র যে বিষাদ গভীর অতীতচারিতা,

পারিপার্শ্বিক খুঁটিনাটির প্রতি অনুরাগ, কাব্যদেহে প্রসাধনের প্রতি নির্মোহ ও জীবনের প্রতি আসক্তি নিরাসক্তির দ্বন্দ্ব, 'পরিশেষ' কাব্যেও তা ফুটে উঠেছে।

প্র : 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭টি গানের সংকলন। গানগুলি ১৯০৮ ও ১৯০৯ সালে রচিত এবং ১৯১০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এগুলো সহজ ভাষায়, সাবলীল ছন্দে লিখিত। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলো মূলত কবিতা। ভাবধারার দিক থেকে কবিতাগুলোকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ঈশ্বরকে না-পাবার বেদনা; নিজের অহংকার ত্যাগ ও হৃদয় নির্মল করে সহনশীলতা প্রদর্শন; ঈশ্বরের ক্ষণদর্শনানুভূতি; দরিদ্র-দীন-হীন-পতিতের মধ্যে ঈশ্বরকল্পনা; অসীম-সসীমের লীলাতত্ত্ব। 'গীতাঞ্জলি'র মূলসুর ঈশ্বরমুখিতা হলেও তা কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের নয়। বিশ্বের বিশালতা ও প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে উৎসারিত এক অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে এই বিশ্বাসযুক্ত। 'গীতাঞ্জলি'র সম্পূর্ণ অনুবাদ যদিও Song Offerings (১৯১২) নয়, তবু এই গ্রন্থের অধ্যাত্মবাদ, প্রকৃতি, প্রেম যৌথধারায় ইংরেজি গ্রন্থে প্রবহমান। Song Offerings গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন (১৯১৩)।

প্র : 'উৎসর্গ' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'উৎসর্গ' (১৯১৪) একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৯০৩-'০৪-এ মোহিতচন্দ্র সেন যখন বিষয় অনুসারে ভাগ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পাদনা করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি প্রবেশক কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতাগুলির সঙ্গে পরে আরও ২৪টি কবিতা যোগ করে 'উৎসর্গ' কাব্য রচিত হয়। বলা হয়, রচনাকাল হিসেবে 'উৎসর্গ' 'স্মরণ' ও 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের সমসাময়িক, ভাবের দিক থেকে 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' কাব্যের মাধ্যমিক। 'উৎসর্গে'র কবিতাগুলির অধিকাংশে কবি স্বরূপের পুনরাত্মপ্রকাশ লক্ষ করা যায়।

প্র : 'স্ফুলিঙ্গ' কী ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'স্ফুলিঙ্গ' (১৯৪৫) ছোট ছোট কবিতার সংকলন। এর অনেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতা বা ডায়েরি থেকে সংগৃহীত। দক্ষিণ ও আরবিন এই কবিতা-কণিকাগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল কাব্যজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

প্র : 'শেষলেখা' কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১)।

প্র : 'শেষলেখা' গ্রন্থের পরিচয় দাও?

উ : 'শেষলেখা' (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের নামকরণ রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি। অধিকাংশ কবিতা জীবনের শেষ কয়েকদিনের রচনা। কয়েকটি কবিতা মুখে মুখে রচিত। অনুভূতির গভীরতা ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আছে 'দুখের আঁধার রাত্রি বারেবারে' কিংবা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' প্রভৃতি কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দর্শনের মধ্যেও চরমভাবে ইহজগৎপ্রীতি প্রকাশিত। তিনি লিখেছেন :

'রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এজগৎ
স্বপ্ন নয়।'

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস কোনগুলো?

উ : চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), যোগাযোগ (১৯২৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চার অধ্যায় (১৯৩৪), মালঞ্চ (১৯৩৪)।

প্র : 'গোরা' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'গোরা' (১৯১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯০৮ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ধর্মান্দোলন, স্বদেশপ্রেম এবং নারীমুক্তি চিন্তার পটভূমিকায় এই আখ্যান গড়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়ক গোরা সিপাহি বিপ্লবের সময় নিহত এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। কিন্তু সে বড় হয় হিন্দু ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ীর

ঘরে। গোরা নিজের জন্মবিবরণ ও লক্ষ্য পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দম্পতি কৃষ্ণদয়াল ও আনন্দময়ী না চাইলেও গোরা হিন্দু ধর্মের অন্ধ সমর্থক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বিশেষত এক নারীর ভালোবাসা কীভাবে তাকে অন্ধতা ও সংকীর্ণতা থেকে পৌঁছে দিল এক মহাভারতবর্ষের আদর্শের দিকে, নির্দিষ্ট ধর্ম থেকে মানবতার মধ্যে, তারই কাহিনি 'গোরা'। এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : গোরা, সরেশবাবু, সুচরিতা, পানুবাবু, ললিতা, বিনয়, গরদাসুন্দরী, কৃষ্ণদয়াল, আনন্দময়ী প্রমুখ। 'গোরা'য় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয় চিত্রিত হয়েছে।

প্র : 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক কিসে পরিণত হয়?

উ : গৌরমোহন গোরা দেশ-জাতি-ধর্ম অতিক্রম করে বিশ্বমানবে পরিণত হয়।

প্র : 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) চলিতভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসটি 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে একদিকে আছে জাতিপ্রেম ও সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার সমালোচনা অন্যদিকে আছে সমাজ ও প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক, বিশেষত পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিশ্লেষণ। স্বামী নিখিলেশের প্রতি অনুরাগ সত্ত্বেও এই কাহিনির নায়িকা বিমলা অন্যপুরুষ বিপ্লবী সন্দীপের দ্বারা তীব্রভাবে আকর্ষিত। একদিকে বাইরে জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনা অন্যদিকে তিনটি মানুষের জীবনে টানাপোড়েন-রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব এই দুই মিলে উপন্যাস। 'ঘরে-বাইরে'র সঙ্গে পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' উপন্যাসের ভাবসাদৃশ্য আছে। স্টিভেনসনের সেরাফিনা, অটো ও গোনড্রেমার্ক যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। তবে স্টিভেনসনের উপস্থাপনা ব্যঙ্গাত্মক, সমাপ্তি মিলনাত্মক; আর রবীন্দ্রনাথের

[illegible]

প্র : 'যোগাযোগ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'যোগাযোগ' (১৯২৬) [illegible]

প্র : 'দুইবোন' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'দুইবোন' (১৯৩৩) [illegible]

প্র : 'শেষের কবিতা' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস। 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২৮ সালে। ভাষার অসামান্য ঔজ্জ্বল্য, দৃষ্টিশক্তি ও কবিত্বের দীপ্তি এই গ্রন্থটিকে এমন স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, যার জন্য এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আধুনিক

সাহিত্যিকেরা যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই মনোভাব লক্ষ করেছিলেন কৌতুকের সঙ্গে। নিজেকে নিয়ে এই উপন্যাসে রসিকতার আধুনিকদের আক্রান্তের কিন্তু তখনও পর্যন্ত অবজ্ঞিত এক ধারণাটির সৃষ্টিতে 'শেষের কবিতা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় গ্রন্থ। অমিত, লাবণ্য, কেতকী, শোভনলাল প্রমুখ এই উপন্যাসের চরিত্র। উপন্যাসের কতিপয় বাক্য আজ প্রবাদের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন। ফ্যাশনটা হলো মুখোশ, স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। সুকুমার সেন বলেছেন : 'বৈষ্ণব সাধনার পরকীয়াতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে যেভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল শেষের কবিতায় তাহার পরিচয় পাই।' 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'– এই কবিতা দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়েছে।

প্র : 'মালঞ্চ' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসে এক মৃত্যুপথযাত্রী নারী ও তার স্বামীর কাহিনি আছে। কবিতুময় ভাষায় গড়ে উঠেছে এ উপন্যাস। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুপথবর্তী হয়েও নীরজা তার স্বামী আদিত্যর ওপর অমোঘ ও প্রত্যাশা একটুও কমায় না। অসুখে নিজে শয্যাশায়িনী হলেও স্বামীকে অযথা সন্দেহ করতে থাকে সে। উপন্যাসে ফুলবাগান আছে– এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। নীরজা ও আদিত্য এই ফুলচাষ করত। বিয়ের দশ বছর পর নীরজা-আদিত্যের ঘরে সন্তান আসার সম্ভাবনা হলেও সে সন্তান জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে মা নীরজাও মৃত্যুপথযাত্রী হয়। ফুল ব্যবসায়ী আদিত্য ফুলবাগান দেখভাল করার জন্য সংসারে আনে দূরসম্পর্কিত বোন সরলাকে। সরলা নীরজার গড়া ফুলবাগানের কর্ত্রী হয়ে ওঠায় তা অসুস্থ নীরজার ঈর্ষার কারণ হয়। সে স্বামীকেও সরলাকে দিয়ে সন্দেহ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ ছোট উপন্যাসে মূলত নীরজা চরিত্রের বিকার, সন্দেহ, প্রতিজ্ঞা ও অক্ষমতা ফুটিয়ে তুলেছেন। মালঞ্চে নীরজারই প্রধান ভূমিকা। তার তুলনায় আদিত্য, রমেন বা সরলার ভূমিকা গৌণ।

প্র : 'চার-অধ্যায়' কোন ধরনের উপন্যাস?

উ : 'চার-অধ্যায়' (১৯৩৪) একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। অসহযোগ আন্দোলনের পর বাংলায় নতুন করে যে হিংসাত্মক বিপ্লব প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল, 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসে তার তত্ত্বাবলোপ এবং বিশ্লেষণ মূলত নির্ধারণের চেষ্টা আছে। আন্দোলন সন্ত্রাসবাদের সমালোচনা করে এই কাহিনি রচিত। সন্ত্রাসবাদীদের নেতা ইন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অতিমানবীয় দৃঢ় সংকল্প অন্যদিকে সে নিষ্ঠুর ও মানবতাহীন। তার নির্দেশে অতীন ও এলার প্রেমের সমাধি এই উপন্যাসের মূল কাহিনি। সমকালীন বিপ্লবপন্থী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব এই উপন্যাসের মূল সুর। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : অতীন, এলা, ইন্দ্রনাথ। চার-অধ্যায়ের কাহিনির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' গল্পের সাদৃশ্য আছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পটি উপন্যাসধর্মী, কোন উপন্যাসটি ছোটগল্পধর্মী?

উ : নষ্টনীড় উপন্যাসধর্মী ছোটগল্প, চতুরঙ্গ ছোট গল্পধর্মী উপন্যাস।

প্র : রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম লেখ।

উ : বিসর্জন (১৮৯১), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), চিরকুমার সভা (১৯২৬), রক্তকরবী (১৯২৬), তাসের দেশ (১৯৩৩) ইত্যাদি।

প্র : 'বিসর্জন' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বিসর্জন' (১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মঞ্চসফল এবং জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন। উদার ধর্মবোধ এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব যেমন এই নাটকের প্রধান উপকরণ, তেমনই বিশ্বাসের উগ্রতা এবং মানব সম্পর্কের নিবিড়তা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। নাটকে শুধু আত্মবিসর্জনে সমস্যার সমাধান খোঁজা হয় নি, তার চেয়েও কঠোর ত্যাগের মধ্য দিয়ে বিরোধের অবসান প্রদর্শিত হয়েছে।

নাটকের সমস্যা হলো। 'কেন আপনার নাহি পায় পথ।' 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রধানাংশ নিয়ে বিসর্জনের কাহিনি পরিকল্পিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রঘুপতি, জয়সিংহ, অপর্ণা, নক্ষত্ররায়, গোবিন্দমাণিক্য।

প্র : 'রাজর্ষি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ কোন চরিত্রে রূপদান করেন?

উ : ১৯০০-এ রঘুপতি, ১৯২৩-এ জয়সিংহের চরিত্রে।

প্র : 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিচয় দাও।

উ : 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের পৌরাণিক প্রণয়-কাহিনি অবলম্বনে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক। এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাহিনির পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নতুন এবং মহাভারতের কাহিনি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা এক বছরের জন্য অসামান্য রূপলাবণ্যের অধিকারী হন। অর্জুন সেই রূপসী চিত্রাঙ্গদার প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পর্যন্ত দুই চিত্রাঙ্গদার যথার্থ পরিচয় লাভ করেন। এই নাটকে নারীর মর্যাদা ও প্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ একই কাহিনি পরবর্তীকালে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য (১৯৩৬) রূপে রচনা করেন। চিত্রাঙ্গদায় নাম-চরিত্রের মধ্যে নারীর আত্মজাগরণের যে প্রকাশ ঘটেছে তা আধুনিক নারীবাদীদের কথিত সমানতার চেয়েও ব্যাপক। উভয় ক্ষেত্রে নারীর আত্মসম্মান ও বীরত্ব উভয়ই গুরুত্ব পেয়েছে।

প্র : 'কৌতুকের খাতা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'কৌতুকের খাতা' (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় কৌতুক নাটক। এক গ্রামের সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ এই নাটকের কেন্দ্র। তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের কৌতুকময় ঘটনা। সংলাপের সৃষ্টি এবং আচরণের নাটকীয়তা নাটকটির জনপ্রিয়তার মূলে। নাটকটির কোনো চরিত্রে লেখকের রবীন্দ্রবন্ধুর চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে।

প্র : 'শারদোৎসব' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : 'শারদোৎসব' (১৯০৮) একটি নাটক। পঞ্চালের পটভূমিকায় এই নাটকের

[illegible] মন্ত্রণা দেওয়ার। [illegible] উঠেছেন, এই নাটকে তাঁর সেই মনোভাব স্পষ্ট। মুক্তধারার এই নাটক [illegible] সংস্কৃত নাটকের দর্শনে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই নাটকে [illegible] কাহিনির মূল ধারা [illegible] ছাড়িয়ে তার অনুসরণে উদ্ভব।

প্র : 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে [illegible] নাটকের [illegible] প্রতিষ্ঠা। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের [illegible] রবীন্দ্রনাথের শেষ সমাধানমূলক নাটক। নাটকটি পরিমার্জনার। [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] প্রচলন হয় পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকা পরে যার ধনঞ্জয় বৈরাগীর কথা ও কাজ রবীন্দ্রনাথ এ সময় বহু বাউল গায়কের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই প্রভাব ধনঞ্জয় বাউলের মধ্যে আছে। অন্য চরিত্রগুলো, সুরমা, উপরঞ্জনবিহা, বিভা ইত্যাদি। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের নতুন ও পরিবর্তিত সংস্করণ 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) নাটক।

প্র : 'মুক্তধারা' নাটকের মূলকথা কী?

উ : 'মুক্তধারা' (১৯২২) প্রথমে নাম ছিল 'পথ'। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশ ও জাতিপ্রেমের মন্ত্রে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে মানবগোষ্ঠীকে পঙ্গু এবং এই অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ এই নাটকের কেন্দ্রীয় কথাবস্তু। নাটকের প্রথমে যুবরাজ অভিজিৎ বৈরাগীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, গান্ধীচরিত্র অসহযোগ আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয়। নাটকের পটভূমিতে আছে একটি পথ। তার ওপর দিয়ে জনতার অবিরাম স্রোত। তার মধ্যে ভৈরবদের গর্বোদ্ধত শিবমন্ত্র, রাজশক্তির যন্ত্রবন্দনার গান, সন্ত্রস্ত দীন নারী-পুরুষের আর্তনাদ, ধনঞ্জয়ের গান নাটকে এক গভীরতা ও প্রত্যাশাকে ধ্বনীভূত করেছে। অবশেষে প্রবল গর্জনে মুক্তধারার কালোচ্ছ্বাসে নাটক উপনীত

হয়েছে চরম মুহূর্তে। পাশ্চাত্য সভ্যতা, তার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ চেতনা ও বণিকবুদ্ধি মিলে যে পীড়ন যন্ত্র চালিয়েছে, এর বিরুদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যাণপ্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হয়ে যন্ত্র মানুষের দাস হবে। এটাই 'মুক্তধারা'র মূলকথা।

প্র : 'ডাকঘর' নাটক সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ডাকঘর' (১৯১২) রূপক সাংকেতিক নাটক। ঘরের মধ্যে বন্দি এক রুগ্ণ বালক অমল এই নাটকের নায়ক। সুদূর পিপাসিত চিত্ত অমলের ধারণা, সে একদিন বাইরের জগতে যাবে, একদিন তার নামে রাজার চিঠি আসবে। বিষয়ী লোকেরা তার কথায় পরিহাস করত। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি রাজা এলেন। অপরূপ সংলাপ, প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা এবং সংকেতময়তা এই নাটকটির সার্থকতার মূলে। একটি শিশুকে কেন্দ্র করে এমন গীতিময় নাটক রচনা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন : 'এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক।' নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: অমল, ঠাকুর্দা, সুধা, নৈওয়ালা ইত্যাদি।

প্র : 'বসন্ত' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বসন্ত' (১৯২৩) গীতিনাট্য। এই নাটকের বিষয় যৌবনের প্রতীক ঋতুরাজ বসন্তের জয়গান। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। কারণ নজরুলও বাংলার জীবনে বসন্ত তথা যৌবন এনেছিলেন। বসন্ত ঋতুনাট্যে গানের প্রাধান্য, গল্প বলতে আছে অতি সামান্য কিছু। সমৃদ্ধির সার্থকতা শুধু প্রাচুর্যে নয়, সেই সঙ্গে চাই ত্যাগের নিরাসক্তি- বসন্তের মর্মকথা এটাই।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ কবি নজরুলকে 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করলে অনেকেই তা মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কোন কথা জানিয়েছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাকে 'কবি' [illegible] অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের [illegible] কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে [illegible] নি। আমার বিশ্বাস, তোমরা [illegible] কবিতা না পড়েই এই মনোভাব [illegible] করেছো। আর পড়ে থাকলেও [illegible] রসের সন্ধান করো নি, অবজ্ঞাভরে [illegible] বুলিয়েছো মাত্র। কাব্যে অসির [illegible] থাকতে পারে না এসব তোমাদের [illegible] বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন [illegible] বাঁধা, অসির ঝনঝনায় যখন [illegible] ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, [illegible] কাব্যে তাকে প্রকাশ করবে বৈকি! [illegible] যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে [illegible] কলমেও ঐ সুর বাজতো।"

প্র : 'রক্তকরবী' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'রক্তকরবী' (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের একটি সাংকেতিক নাটক। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত। মানুষের প্রবল লোভ কিভাবে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতাকে অস্বীকার করে মানুষকে নিছক যন্ত্রে ও উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত করে এবং তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ কিরূপ ধারণ করে তারই রূপায়ণ এই নাটক। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছেন, 'যক্ষপুরী পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত'। নন্দিনী নিপীড়িত মানুষের মাঝখানে দেখা দিয়েছে আনন্দের দূত রূপে। রঞ্জন বিদ্রোহের বাণী বহন করে এনেছে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের প্রাণশক্তি। বাইরে বেরিয়ে এসেছে জালের আড়াল থেকে যক্ষপুরীর রাজা। 'রক্তকরবী'তে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের এবং মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

প্র : 'তাসের দেশ' গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উ : 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) রূপক নাট্য। রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 'এক আষাঢ়ে গল্প' নামক গল্পের কাহিনি এই নাটকের ভিত্তিভূমি। রাজপুত্র এবং সদাগর পুত্র এক অপরিচিত দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন, যে দ্বীপের জীবন শাসিত হয় যান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতায়, যুক্তি ও হৃদয়হীন শাসনতন্ত্রের আনুগত্যে। রাজপুত্র এবং সদাগর এই নিয়মবন্দি জীবনের মধ্যে আনলেন বিদ্রোহ। এই নাটকটি উৎসর্গ করা হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। এই রূপক নাটক লিখে উপনিবেশ শাসিত ভারতীয়দের জড়ত্ব ঘোচানোর জন্য একজন সে-রকম মুক্তিদূত রূপী রাজপুত্রের আগমনকে কামনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : 'চণ্ডালিকা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) নাটক। এর কথাবস্তু পালি শার্দুল-কর্ণাবদান থেকে গৃহীত। প্রকৃতি একটি চণ্ডালী কন্যা, সে কিভাবে তার মায়ের সাহায্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দকে প্রলোভিত করেছিল সেই কাহিনিকে রবীন্দ্রনাথ এক নতুনমাত্রা দিয়েছেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ যেমন এই কাহিনির প্রধান সুর তেমনি এর মধ্যে আছে সংরাগের প্রকাশ ও তার সংযমের সুষমা। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে নৃত্যনাট্যে রূপ দেন। কথা ও সুরের সমন্বয়ে 'চণ্ডালিকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সৃষ্টি।

প্র : 'চিরকুমার সভা' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) কৌতুক নাটক। রবীন্দ্রনাথ ১৯০০-'০১ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় একটি আখ্যান রচনা করেন। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'চিরকুমার সভা' পরিহাস-উচ্ছল গীতবহুল মঞ্চসফল নাটক। ১৯২৬ সালে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'কে 'চিরকুমার সভা' নামে নাট্যরূপ দেয়া হয়। একদল যুবকের বিয়ে না-করার প্রতিজ্ঞা এবং পরে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কৌতুককর কাহিনি নিয়ে এ নাটক রচিত।

প্র : 'নটীর পূজা' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নটীর পূজা' (১৯২৬) একটি নাটক। 'কথা ও কাহিনী'র অন্তর্গত পূজারিণী কবিতাটির আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনা করেন। মূল কাহিনিটি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে গৃহীত। গান ও নৃত্য সমন্বিত নাটক 'নটীর পূজা'।

প্র : 'জীবনস্মৃতি' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আত্মজীবনী। এখানে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কালের কাহিনি ও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রচলিত কালানুক্রমিক বিবরণের পরিবর্তে ছোটো ছোটো ঘটনা, চিত্র, চরিত্রের সাহায্যে কবির স্বভাবের বিকাশ, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কিভাবে ঘটেছে তার সহজ সুন্দর আখ্যান বর্ণিত। কৌতুক ও কবিত্বে গাঁথা বর্ণনা ভঙ্গিতে এটি বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় জীবনী। আত্মজীবনী রচনার প্রচলিত রীতি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ এ গ্রন্থে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

প্র : 'কালান্তর' কোন ধরনের গ্রন্থ?

উ : 'কালান্তর' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। পরবর্তী সংস্করণে আরও নতুন প্রবন্ধ (যেমন: সভ্যতার সংকট, ১৯৪১) অন্তর্ভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতের বিকাশের সামগ্রিক পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

প্র : 'সভ্যতার সংকট' পাঠ করা প্রয়োজন কেন?

উ : 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশেষ গদ্যরচনা। এই ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা ও মানবতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত। 'ঐ মহামানব আসে' গানটি এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এখানেই তিনি বলেছেন : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' রবীন্দ্রনাথকে বুঝবার জন্য এ প্রবন্ধটি অবশ্য-পাঠ্য।

প্র : 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : 'বিশ্বপরিচয়' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ। মূলত কিশোর-কিশোরীদের জন্য রচিত হলেও বয়স্কদের উপভোগ্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ বহু পরিভাষা প্রস্তুত করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের উপযোগী ভাষারীতির পরেও।

করেছেন। কাব্যগ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিন্তার নিদর্শন হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশে শুধুই কবিসত্তার অংশটুকু ছিল না, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের সন্ধান তথা ও তত্ত্বপুষ্টি ছিল, বিশ্বপরিচয় তার প্রমাণ।

প্র : 'মানুষের ধর্ম' কী?

উ। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তমলুক স্মৃতি বক্তৃতাগুলোই এর মূল লেখা। তাঁর ধর্মচিন্তা, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বিষয়ে তাঁর বীতরাগ এবং উহার মানবিক-আধ্যাত্মিকতাবোধের কবিত্বময় প্রকাশ এই বক্তৃতা তথা লেখাগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য।

প্র। 'পঞ্চভূত' গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কেন?

উ: 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। এই প্রবন্ধগুলি সাধনা পত্রিকায় 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে ছাপা হয়। ক্ষিতি, অপ্তেজ, ব্যোম, মরুৎ ও গগন এই পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে আলোচনার রীতিতে মূলত তত্ত্ব বিষয়ক সমস্যার সরস ও গভীর বিশ্লেষণ। রবীন্দ্র গদ্যরচনায় এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করে। পত্রিকায় প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছাপা হতো: 'লেখক ভূতনাথ বাবু'। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পত্রিকার কিছু অংশ বর্জিত হওয়ায় এর অন্তরঙ্গতা কমেছে। এই গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্যছন্দের উৎপত্তি বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান এখন সে কথাই বলছে। আসলে পঞ্চভূতের 'ডায়েরি'র মধ্যে সহজ সরল ভাষায় মনোহর ভঙ্গিতে অনেক গভীর কথা আছে।

প্র : 'জাভাযাত্রীর পত্র' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৯২৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পত্র-সংকলন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রগুলি লিখেছিলেন। তবে ব্যক্তিগত চিঠি বলতে যা বোঝায় এগুলি তা নয়। নতুন দেশের মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে,

পঞ্চভূতাকালীন কবির সাথে [illegible] ঘটেছে এখানে। এই গ্রন্থটিকে [illegible] প্রবন্ধ বলা চলে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের [illegible] প্রবন্ধগ্রন্থের নাম লেখ।

উ। পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্রপ্রবন্ধ (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১) ইত্যাদি।

প্র : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' — কোন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন?

উ : 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

প্র : ধ্বনিবিজ্ঞানের উপর লেখা রবীন্দ্রনাথের নাম কী?

উ : শব্দতত্ত্ব (১৯০৯)।

প্র : রবীন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহের নাম 'ছোটগল্প' (১৮৯৩)। পরে প্রকাশিত হয় পরপর চারটি গল্পগ্রন্থ : 'কথা-চতুষ্টয়' (১৮৯৪), 'বিচিত্র গল্প' দুই খণ্ড (১৮৯৪), 'গল্প দশক' (১৮৯৫)। ১৯০৩ সালে এই পাঁচটি গ্রন্থের গল্প ও নতুন লিখিত কিছু গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ' নামে একটি গ্রন্থ। এরপর কয়েকটি মাসিক পত্রে লিখিত চারটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'গল্প চারিটি' (১৯১১) নামে গ্রন্থ। ১৯১৬ সালে 'গল্প সপ্তক' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। আর প্রকাশিত দুটি গল্প ও দুটি কবিতা 'গল্প নম্বর' নামে ১৯২০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। ১৯৩৭ সালে 'লে' প্রকাশিত হয়। শেষজীবনে লেখা তিনটি গল্প প্রকাশ পায় 'তিনসঙ্গী' (১৯৪০) নামের গ্রন্থে। আর ১৯৪১ সালে অন্য কিছু গল্প নিয়ে বের হয় 'গল্পসল্প' নামের গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, চরিত্রচিত্রণের কুশলতা, গঠনের সুষমা, রচনার ব্যঞ্জনাধর্মিতা সমস্ত দিক থেকে রবীন্দ্রগল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর গল্পে বাঙালির সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনের ছবি প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় ছোটগল্পের জনক বলা হয়।

প্র : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে?

উ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি 'গল্পগুচ্ছ'-এর তিন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের চারটি সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি ছোটগল্প– 'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'মাস্টারমশায়' ও 'অনধিকার প্রবেশ'।

প্র : জীবনের শেষপর্বে রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বুদ্ধিদীপ্ত গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলির নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপর্বে আধুনিক নরনারীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে যে কয়টি বুদ্ধিদীপ্ত ছোটগল্প রচনা করেছেন সেগুলি হলো : রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি।

প্র : রবীন্দ্রনাথ রচিত চারটি অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথ রচিত চারটি অতিপ্রাকৃত রসের ছোটগল্প : ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, মণিহারা ও কঙ্কাল।

প্র : পণপ্রথা নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ ছোটগল্পের নাম লেখ। এই গল্পের উপসংহার কী ঘটেছে?

উ : পণপ্রথা নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গল্প 'দেনাপাওনা'। গল্পটির উপসংহারে রামসুন্দর মিত্রের আদরের কন্যা হতভাগ্যা নিরুপমার মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে এবং তার স্বামীর বিবাহের সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্র : রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের ছোটগল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং এই পর্যায়ের দুটি গল্পের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের ছোটগল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য সময়ের প্রাসঙ্গিকতা মেনে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নরনারীর সম্পর্কের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ। এই পর্যায়ের দুটি গল্প : রবিবার ও ল্যাবরেটরি।

প্র : 'তিনসঙ্গী' গল্প সংকলনে কটি গল্প আছে? গল্পগুলির নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী গল্প-সংকলনে তিনটি গল্প আছে–রবিবার, শেষকথা ও ল্যাবরেটরি।

প্র। 'শে' কোন পর্যায়ের গল্প?

উ। 'শে' (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গল্পগ্রন্থ। উহা ৭ সংখ্যক, সর্বশেষ ও অন্তর্ভুক্তের হিসাবে গল্পগুলি পঞ্চম। রবীন্দ্রনাথের শেষ 'বাঙ্ময়' ও 'ছায়া' [illegible] জীবনের সাথে ও গল্পগুলির শেষ সময়ে লেখা। গল্পগুলো 'শেষের কবিতা' [illegible]

প্র : 'পোস্টমাস্টার' ছোটগল্প রবীন্দ্রপ্রতিভার কী?

উ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্মাতীরের পল্লিজীবন নিয়ে যে কয়টি ছোটগল্প রচনা করেছেন তার মধ্যে 'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮) অন্যতম। পদ্মার চরে অবস্থানকালে কবি যে সমস্ত দৃশ্য দেখেছিলেন, তার অনেকগুলি কখনো কখনো হুবহু ব্যবহার করেছেন। 'পোস্টমাস্টার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে হৈমন্তী পত্রিকায়। গল্পটিতে প্রধান চরিত্র দুটি– পোস্টমাস্টার, রতন ও প্রকৃতি। গল্পটিতে প্রকৃতি যেমন [illegible] ও ভৌগোলিক পরিবেশ যেমন করে [illegible] গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রের জন্মদান নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং গল্পের অন্তর্গত পরিণতিতে অন্যের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পোস্টমাস্টার আর রতন– এ দুটি চরিত্রের মানসিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরাট ফারাক। এই ফারাকই গল্পের বাকবিন্যাসে এবং উপস্থাপনে পরিষ্কার। আবার বয়সেও পোস্টমাস্টার ছিল পূর্ণ যুবক আর রতন নিতান্তই বালিকা। তবে, গল্পের মধ্যেই রতনের মনোগত পরিবর্তনটি হয় এবং সে বালিকার কোঠা অতিক্রম করে। নরীর ভালোবাসার যে ধীরে ধীরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্বলিত হয় রতন তার প্রমাণ। আর পুরুষের ভালোবাসা নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিকবাতির মতো, সুইচের ওঠানামার তার মাত্রাফের হয়। তাই বালিকা থেকে নারীতে পরিণত হওয়া রতন নিজের অব্যক্ত ভালোবাসার অপমানে কাতর। অপরপক্ষে পোস্টমাস্টার তার

কাদম্বরীদেবীর কাছ থেকে। এই গানে 'পূর্ণিমার চাঁদ যেমন সাগরের' - জাতীয় সঙ্গীতকার বাঙ্ময় করে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'আমি তত্ত্ব আমি উপনিষদ' এই ধারণা অস্বীকার করেন। আসলে, 'গোধূলিসাথীর' হোটেলের প্রকৃতির আবাহে অবস্থানরত লেখক রবীন্দ্রনাথের একাশ ঘটিয়ে তবে তা যে তত্ত্বকথা জাতীয় কাব্যময় বিবেচনে হিল না- এই রবীন্দ্রসঙ্গীতটি হোটেলে পরিষ্কার।

প্র : 'ছিন্নপত্র' কাকে লেখা চিঠির সমাহার?

উ : প্রাক্তন্তুরী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্র প্রকাশ : ১৯১২।

প্র : ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে কার বিবাহ হয়?

উ : প্রমথ চৌধুরীর। পরে তিনি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী হন।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : জীবনস্মৃতি (১৯১২)।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে কোন গ্রন্থ উৎসর্গ করেন?

উ : বসন্ত (প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩২৯, ১৯২৩) গীতিনাট্য।

প্র : কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথকে কী উৎসর্গ করেন?

উ : নজরুলের কাব্যরচনার শ্রেষ্ঠ সমাহার 'সঞ্চিতা'।

প্র : রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসংকলনের নাম কী?

উ : 'সঞ্চয়িতা'।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কোন পত্রিকা সম্পাদনা করেন?

উ : সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮), বঙ্গদর্শন (১৯০১), তত্ত্ববোধিনী (১৯১১)।

প্র : বাংলা সাহিত্যে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নাম কী?

উ : চোখের বালি (১৯০৩)।

প্র : চোখের বালির প্রধান চরিত্রের নাম?

উ : মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী প্রমুখ।

প্র : রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনা কোন গ্রন্থ দিয়ে শুরু?

উ : পুনশ্চ।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত?

উ : আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের প্রথম ১০ পঙ্‌ক্তি।

প্র : এই গানটি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থভুক্ত?

উ : পীতিবিতানের স্বদেশিকা অংশভুক্ত।

প্র : এই গানটি রবীন্দ্রনাথের কোন পর্যায়ের গান?

উ : স্বদেশ পর্যায়ের।

প্র : এই গানের সুরকার কে?

উ : রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। (এই গানে বাউল সুর হওয়ার সুরের প্রভাব পড়েছে।)

প্র : বাংলাদেশের কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এই সঙ্গীতের কত পঙ্‌ক্তি বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়?

উ : ৪ পঙ্‌ক্তি।

প্র : এই সঙ্গীত প্রথম কোথায়, কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১৩১২ (১৯০৫) সালে।

প্র : 'আমার সোনার বাংলা' গান রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

উ : বঙ্গভঙ্গ দিয়ে ব্রিটিশদের কাছে ভারতবাসীর চেয়ে-চেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কোনো রকম বিভক্তি চান নি। তাই তিনি ব্রিটিশদের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন এবং এর প্রতিক্রিয়ায় রচে দিয়ে দেশাত্মবোধক গান লেখেন। 'আমার সোনার বাংলা' এর একটি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা যখন তাদের আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মের সম্পৃক্ততা করে, তখনই রবীন্দ্রনাথ এ কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোন গানটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে?

উ : জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।

প্র : রবীন্দ্রগল্পে কোন বিষয় প্রধানভাবে এসেছে?

উ : পদ্মাপারের মানুষের জীবনচিত্র এবং সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ, বিরহমিলন।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কে প্রথম 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিষিক্ত করেন?

উ : পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান আছে 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে...'। এখানে 'চাবি' শব্দটির ব্যবহার হলো কেন, 'তালা' নয় কেন?

উ : এই গানটি বহু পুরোনো, রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন বলে হয়তো এখনো এত জনপ্রিয় আছে। আসলে এটি কোনো প্রচলিত বাংলা। কাজী নজরুল ইসলামও 'মানুষ' কবিতায় ব্যবহার করেছেন। 'মোল্লা-পুরুত' সম্প্রদায়ের তার সকল দুয়ারে চাবি'। চলিত 'তালা' ব্যবহার করেন নি। আসলে কাব্যের ধর্মতত্ত্বে কবিরা শব্দকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। তিনি 'চাবি'র সাথে 'খুলে'র যে সেলব শব্দযোজনা করেছেন তাতে তাঁর গীতিকবিতাটি অধিকতর নমস্য ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এখানে অন্য কোনো শব্দ না খোঁজাই শ্রেয়। তবে, আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গ্রামীণ জনপদে অনেকে তালাকে চাবি বলে অভিহিত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু পতিসরে ছিলেন, সেহেতু সেখান থেকেও রবীন্দ্রনাথ শব্দটি গ্রহণ করতে পারেন। আমার এই খোঁজ নিয়ে জানার ওপর যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি তাহলে কিন্তু নজরুলের ব্যাপারটি মিলছে না। অতএব, কাব্যকলার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল দুজনেই তালার বদলে 'চাবি' ব্যবহার করেছেন- এটি মেনে নেয়াই ভালো।

প্র : বিবিসির বাংলা বিভাগ পরিচালিত জরিপে (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?

উ : দ্বিতীয়।

প্র : কোন বাঙালি প্রথম গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ ও গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : এর জন্য নিজ পুত্রকে তিনি কী করেন?

উ : এ জন্য তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমেরিকার আরবানায় ইলিয়নস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান কৃষি ও পশুপালন বিদ্যায় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে।

প্র : মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়?

উ : মৃত্যুর পর 'রবীন্দ্রনাথের ছড়া' (১৯৪১) ও 'শেষলেখা' (১৯৪১) প্রকাশিত হয়।

প্র : প্রাথমিক পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ কোন পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন?

উ : 'প্রাথমিক' পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ 'পরিণত' পর্যায় বলে অভিহিত করেন।

প্র : রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মেয়ের নামের নাম লেখ।

উ : রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মেয়ের নাম হলো-একাধিক, মহাশ্বেতা, মধ্যবর্তিনী, সুচরিতা, শেষের কবি, নিশীথে প্রভৃতি।

প্র : রবীন্দ্রনাথের একটি করে কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য ও মুক্তধারার নাম লেখ।

উ : কাব্যনাট্য- গান্ধারীর আবেদন; রূপকনাট্য- মুক্তধারা; রূপকনাট্য- অচলায়তন; মুক্তধারা- চরিত্রলিপি।

প্র : রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চা আরম্ভ করেন কবে ও কিভাবে?

উ : মাটোত্তর বয়সে: লেখার কালিঝুলি থেকে।

প্র : তিনি তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোকে কী বলেছেন?

উ : শেষ বয়সের গিন্না।

প্র : রবীন্দ্রনাথের ডাকনাম কী?

উ : টু জেন ডান। অবশ্য বলে রাখা ভালো, কোনো মানুষেরই দেশ বা জাতিভেদে নাম বদলাতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম ঘটে। টু জেন ডান অর্থ মেঘমুক্ত প্রভাত। রবীন্দ্রনাথ (রবি+ইন্দ্র+নাথ)-এর অর্থগত ধারণা থেকে চিনদেশে কবির এ নামকরণ করেন বেইজিং বুদ্ধিজীবীদের সংস্থা ক্রিসেন্ট মুন সোসাইটি। রবীন্দ্রনাথের ৬৩তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এই নামকরণ হয়।

প্র : ইউরোপীয় সভ্যতার তথাকথিত বিকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী?

উ : রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন দেশের স্ব-সংস্কৃতি ও নিজস্ব সভ্যতার বিলোপ ঘটিয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার বিকৃতিকে, নিরুৎসাহিত ও সমালোচনা করে লিখেছেন: 'য়ুরোপের বাইরে আফ্রিকমণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।' (-কালান্তর)

প্র : রবীন্দ্রনাথ কোন সময় থেকে নিজের নামের আগে 'শ্রী' লেখা ত্যাগ করেন?

উ : ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে (অগস্ট ১৯৩২)। (সূত্র: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড)।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?

উ : নয়টি। এগুলো হলো : ভানুসিংহ ঠাকুর; অকপটচন্দ্র কাঞ্চন; আন্নাকালী পাকড়াশী; দিকশূন্য ভট্টাচার্য; নবীনকিশোর শর্মণঃ; ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মাঃ; বাণীবিনোদ বিদ্যাবিনোদঃ শ্রীমতী কনিষ্ঠা; শ্রীমতী মহামা।

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন কি?

উ : 'চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় : তপসী নাটকে অংশগ্রহণ' শিরোনামে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলেও বিদেশে চলে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ছবির শুটিঙে অংশ নেওয়া সম্ভবপর হয় নি। তবে মুভি ক্যামেরার সেই প্রাথমিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ বিক্ষোভ' ধারণ করা এবং একই বছর ২১ ও ২২শে অক্টোবর কলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে সেই প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ই অগস্ট ১৯৪১) পর তাঁর অন্তিমযাত্রার দৃশ্যও মুভি ক্যামেরাতে ধারণ করে প্রামাণ্য চিত্র তৈরি হয়। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে থাকাকালে বিভিন্ন মনীষীদের সঙ্গেও কবির কিছু দৃশ্য ধারণ করা আছে। বিদেশেতো মুভি ক্যামেরায় রবীন্দ্র-উপস্থিতি আছেই। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানিতে তিনি 'দি চাইল্ড' (শিশুতীর্থ) আবৃত্তি করেন। সবাক মুভিতে সেটি পরে পরিবেশিত হয়।

প্র : রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম চলচ্চিত্রায়ণ কোনটি?

উ : রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'মানভঞ্জন' অবলম্বনে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির ব্যানারে নরেশ মিত্রের পরিচালনায় একই নামে একটি চলচ্চিত্র ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়। এ চলচ্চিত্রের সূচনাতে গল্পকার রবীন্দ্রনাথকে পর্দায় দেখানো হয়েছে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে 'মানভঞ্জন' গল্প 'পিরিবালা' নামে মধু বসুর পরিচালনায় দ্বিতীয় বার চলচ্চিত্রায়ণ হয়। এর উদ্বোধনী শোতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

প্র : অশ্লীলতার অভিযোগে রবীন্দ্র-গল্পের কোন চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ হয়?

উ : শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'বিচারক' চলচ্চিত্রায়িত হয়ে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়। মুক্তির পর পরই অশ্লীলতার কারণে ছবিটি নিষিদ্ধ হয়। উল্লেখ্য, এটি ছিল গল্পের নির্বাক চিত্ররূপ।

প্র : রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত নাট্যচিত্র কোনটি?

উ : নীতিন বসুর ক্যামেরায় রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা 'নটীর পূজা'র সবাক নাট্যচিত্র পরিচালনা করেন ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে। এতে অংশ নেয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এ নাট্যচিত্রের শুটিং হয়। উল্লেখ্য, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় মুক্তি পায় প্রথম বাংলা সবাকচিত্র 'জামাইষষ্ঠী'।

প্র : হিন্দি কোন চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

উ : 'অচ্ছুৎ কন্যা'। ছবিটি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি পায়।

প্র : রবীন্দ্র-উপন্যাসের কোন চলচ্চিত্রে নজরুল সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন?

উ : রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে একই নামে মুক্তি পায় একটি চলচ্চিত্র। এ ছবির একটি গান রচনা, একটি গানের সুর দেওয়া ছাড়াও ছবিটির সার্বিক সঙ্গীত পরিচালনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কি বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছিলেন?

উ : আজকের ভাষায় তাঁকে 'মডেল' বলা যেতেই পারে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ১১শে ডিসেম্বর কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে স্থাপিত একটি প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রেক্ষাগৃহের নাম 'রূপবাণী' ('টকি ফিল্ম'-এর অনুসরণে) রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রেক্ষাগৃহটি উদ্বোধনের আগে কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং হস্তলেখা সরাসরি মুদ্রিত করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এতে ছাপা ছিল : "কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করিলাম 'রূপবাণী'।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বাক্ষর)"। বিজ্ঞাপনটি তৎকালে সুধীমহলে আগ্রহ ও ওজনের সৃষ্টি করেছিল।

প্র : রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুরে কখন আসেন?

উ : ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে, জমিদারি পরিদর্শনে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কত সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন?

উ : ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : এ সময় তিনি কোন কাব্য রচনা করেন?

উ : সোনার তরী।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট অনুসারে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে।

রবীন্দ্রনাথ ও ঢাকা

প্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বার ঢাকায় আসেন?

উ : ২ বার।

প্র : কোন কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় আসেন?

উ : ১৮৯৮ সালে প্রথমবার; ১৯২৬ সালে দ্বিতীয়বার।

প্র : রবীন্দ্রনাথকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনার ব্যাপারে কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন?

উ : জগন্নাথ হলের তৎকালীন প্রভোস্ট এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

প্র : কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন; কোথায়?

উ : ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি; কার্জন হলে।

প্র : এই বক্তৃতার শিরোনাম কী ছিল?

উ : The Meaning of Art.

প্র : কত তারিখে তিনি দ্বিতীয় বক্তৃতা দান করেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তৃতার শিরোনাম কী ছিল?

উ : The Rule of the Giant.

প্র : এই বক্তৃতা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়?

উ : প্রথম বক্তৃতার মত দ্বিতীয় বক্তৃতাও হয় কার্জন হলে।

প্র : উক্ত বক্তৃতাদ্বয়ের অনুষ্ঠানে কে সভাপতিত্ব করেন?

উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জি এইচ লাংলে।

প্র : কত তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম হলের (বর্তমানে সলিমুল্লাহ হল) ছাত্রদের সংবর্ধনায় যোগ দেন?

উ : ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

প্র : উক্ত সংবর্ধনায় ছাত্রদের দেয়া শ্রদ্ধাপত্রের শেষে কী প্রার্থনা ছিল?

উ : 'আশীর্বাদ কর,— তোমার স্মৃতি যেন তরুণ এই মুসলিম হলের অন্তরে চিরদিন রস ও নবনব কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করে।'

প্র : রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম হলে দেয়া এই সংবর্ধনার সংবাদ সমকালীন কোন দুটি সংবাদপত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়?

উ : 'দি মুসলমান' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ কোন গীতিকবিতা রচনা করেন?

উ : বাসন্তিকা নামের গীতিকবিতা।

প্র : গীতিকবিতাটির প্রথম পঙ্‌ক্তি চারটি কী?

উ : এই কথাটি মনে রেখো/তোমাদের এই হাসি খেলায়/আমি এ গান গেয়েছিলেম/জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

প্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে কী ডিগ্রি প্রদান করে?

উ : ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট.)।

প্র : কত তারিখে, কিভাবে এই ডিগ্রি প্রদান করা হয়?

উ : ১৯৩৬ সালের ২৯শে জুলাই, বিশেষ সমাবর্তনের মাধ্যমে।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কি এই সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন?
উ : না। রবীন্দ্রনাথ এই সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন না।
প্র : রবীন্দ্রনাথকে যখন ডি.লিট. ডিগ্রি দেওয়া হয়, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?
উ : এ. এফ. রহমান।

'সুভা' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সুভাষিণীকে আদর করে সবাই কী ডাকত?
উ : সুধা।
প্র : সুভাষিণীর আর কত ভাই বোন ছিল?
উ : সুভাষিণীর কোন ভাই ছিল না। তবে তার আর দুই বোন ছিল।
প্র : তার বড় দুই বোনের নাম কী?
উ : সুকেশিনী ও সুহাসিনী।
প্র : সুভাষিণী নামটি কে রাখে?
উ : সুভাষিণীর মা'য় তার বড়ো দুই বোনের নামের সাথে মিল রেখে ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে।
প্র : সুভাষিণী কেমন প্রকৃতির মেয়ে?
উ : বোবা।
প্র : সুভাকে তার মা কিভাবে দেখতেন?
উ : নিজের ত্রুটিস্বরূপ। আগেকার দিনে মেয়ের ত্রুটিকে মা নিজের দোষ হিসেবে মনে করতেন।
প্র : সুভার পিতার নাম কী?
উ : বাণীকণ্ঠ।
প্র : সুভার চোখ দুটো কেমন ছিল?
উ : সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল।
প্র : সুভা কিভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করত?
উ : ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে।
প্র : সুভার চোখের ভাষা কেমন ছিল?
উ : অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গম্ভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো।
প্র : সুভার গ্রামের নাম কী?
উ : চন্ডীপুর।
প্র : বোবা মেয়েটি কার সাথে মনের ভাব প্রকাশ করত?
উ : নদীতীরে এসে নদীর প্রকৃতির সাথে মনের ভাব প্রকাশ করত।
প্র : বোবা মেয়েটির সাথে নদীর কেমন মিতালি ছিল?
উ : নদীপ্রকৃতির সাথে গভীর মিতালি ছিল।
প্র : সুভার অন্তরঙ্গ বন্ধু কারা ছিল?
উ : গোয়ালের দুটি গাভী সর্বশী ও পাঙ্গুলি।
প্র : সুভার মন খারাপ হলে কারা সান্ত্বনা দিত?
উ : তার দুই বন্ধু সর্বশী ও পাঙ্গুলি।
প্র : সুভা কাদের বেশি ভালোবাসত?
উ : পশুদের।
প্র : প্রতাপ কে ছিল?
উ : সুভার গ্রামের গোয়ালাদের ছেলেটির নাম প্রতাপ।
প্র : প্রতাপের প্রধান শখ কী ছিল?
উ : ছিপ ফেলে মাছ ধরা।
প্র : প্রতাপ আদর করে সুভাকে কী বলে ডাকত?
উ : সু।
প্র : সুভা নদীতীরে তেঁতুলতলায় বসলে তার দিকে কে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত?
উ : প্রতাপ।
প্র : প্রতাপ নদীর জলে জাল ফেলে বসে থাকলে সুভা তার জন্য কি নিয়ে আসত?
উ : সুভা তার নিজ হাতে সাজিয়ে একটি করে পান নিয়ে আসত।
প্র : প্রতাপের কাছে পাতালপুরীর রাজকন্যা কে ছিল?
উ : সু অর্থাৎ সুভাষিণী।
প্র : সুভার কলকাতা যাবার দিন স্থির হলে কিভাবে তার বাল্যসখীদের কাছ থেকে বিদায় নিল?
উ : খাইয়ে দিল। তারপর সে যেহেতু বোবা ছিল তাই চোখ দিয়েই কথা বলতে লাগল। লেখক লিখেছেন : যেন দুচোখে কথা ভরে সখীদের মুখের দিকে সে কথা বলতে লাগল। তখন তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
প্র : বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হলে সুভার মন কেমন হতে লাগল?
উ : কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মতো সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরে গেল।
প্র : বিদেশ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে?
উ : কলকাতা।
প্র : স্রোতস্বিনী কিসের সমার্থক শব্দ?
উ : নদীর।
প্র : কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা অর্থ কী?
উ : আগেকার সমাজে এমন কথা প্রচলিত ছিল। যে পিতামাতার বিবাহযোগ্যা কন্যাসন্তানের বিয়ে হয় না তাদের কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা বলা হতো। কন্যারা স্বাবলম্বী হওয়ায় এমন শব্দের প্রচলন এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে।
প্র : 'সুভা' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।
প্র : 'সুভা' গল্পে সুভার প্রতি লেখকের কেমন আচরণ ফুটে উঠেছে?
উ : বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী সুভার প্রতি লেখকের

এমন নিরঙ্কুশ ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে।
প্র : যে রমণীর হাসি সুন্দর– একথার অর্থ কী?
উ : সুহাসিনী।

'অপরিচিতা' ছোটগল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : কোন বয়সটা না দৈর্ঘ্য না প্রস্থের বড়–
উ : সাবালক বয়স।
প্র : 'সেই ঘুড়িহাসাটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিত।'– কোন ইতিহাস?
উ : অনুপমের বিয়ে ভেঙ্গে যাবার ইতিহাস।
প্র : ছেলেবেলায় অনুপম পণ্ডিতমহাশয়ের তিরস্কার পাত্র হয়েছিলেন কেন?
উ : গুরুর চেহারার জন্য। অনুপমকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করা হয়।
প্র : 'মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ'– কে?
উ : অনুপমের পিতা, ওকালতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।
প্র : অনুপম নিজের কিসের সঙ্গে তুলনা করতেন?
উ : অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাই এর সঙ্গে।
প্র : অনুপমের মামার পরিচয় দাও?
উ : অনুপমের চেয়ে তার মামা ৬ বছরের বড় ছিলেন। লেখকের সংসারকে তিনি ফলন্ত ফলির মতো নিজের অন্তরে ওষে নিয়েছেন, তাকই পাকা লোক হওয়ায় সংসারে তিনি ছিলেন গর্বের। লেখক বলেছিলেন– 'মামা যদি মনু হতেন তবে তিনি হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাঁর সংহিতায় একেবারে নিষিদ্ধ করে দিতেন।'
প্র : অনুপমের মনে বিয়ের আশা কে জাগিয়েছিল?
উ : বন্ধু হরিশ, যে কানপুরে কাজ করে হরিশ মানুষটা ছিল রসিক। সেই বলেছিল– 'ওহে মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।'
প্র : বিয়ের চিন্তা মাথায় আসায় অনুপমের কী অবস্থা হয়েছিল?
উ : 'হৃদয় তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপের মরীচিকা দেখিতেছিল আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস তরুমর্মরে তাহার গোপন কথা।'
প্র : কল্যাণীর পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল?
উ : এককালে এদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তা শূন্য বললেই হয়। অথচ তলায় সামান্য আছে। দেশে বংশমর্যাদা রক্ষা করা সহজ নয় বলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করছিলেন।
প্র : বিনুদার পরিচয় দাও?
উ : বিনুদা অনুপমের পিসতুতো ভাই। তার রুচি ও সভ্যতার উপরে অনুপমের খুব শ্রদ্ধা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভালো ছাত্র ছিল। বিনুদা বিলেত যাবার পূর্বক্ষণে বেশ কিছু বই উপহার দেয়। বইগুলো ছিল– পিকউইক, ডেভিড কপারফিল্ড, নিকোলাস নিকলবি, ওলিভার টুইস্ট, ডম্বি এন্ড সন, দি ওল্ড কিউরিওসিটি শপ, দি ক্রিসমাস কারল, দি ক্রিকেট অন দি হার্থ, দি চাইম্স, দি ব্যাটল অব লাইফ, দি হন্টেড ম্যান এন্ড দি গোস্ট'স হলিডে, সাইলাস মার্নার, অ্যাডাম বেড, দি মিল অন দি ফ্লস, রোমোলা, পিপ্পা পাসেস, দি স্কারলেট লেটার, দি হাউজ অব সেভেন গেবলস, দি ব্লিথডেল রোমান্স, দি ব্লাইথ স্পিরিট, মিসেস লিরিপার।
প্র : শম্ভুনাথ বাবুর পরিচয় দাও।
উ : শম্ভুনাথ বাবুর বয়স চল্লিশের কিছু বেশি হবে। তিনি কঠোর। ছিল কঠোর, গোঁফ পাকে কঠিন করিয়াছে। মুখের ভাব। কোথাও কোমল, নিষ্ঠুর চিন্তার চিহ্ন, একটুতে কোনো ক্লেশ নাই। অনুপমের কাছে তাঁহার কঠোরতা তিনি স্থায়ী করতে চান নি।
প্র : অনুপমের বিয়েতে যাবতীয় কাজ কেমন ছিল?
উ : ষাঁড়, বাঁশি, শাখের কান্ড বাজিয়ে মহা কোলাহলের সাথে সবকিছুর পরে নহবত করে বিয়ে বাড়িতে উঠল। মহা হুলুস্থুল জরি-জহরতে শরীর যেন ঝলসে দেবেন।
প্র : অনুপমের নিজের সম্পর্কে কিরূপ ধারণা ছিল?
উ : অতি সংপাত্র। তামাকটুকু খাই না। নিতান্ত ভালো মানুষ, মাতার আদেশ লঙ্ঘন চলিবার ক্ষমতাটুকু আছে। কন্যা সম্প্রদানে ইচ্ছুক পিতার কাছে ইর্ষনীয়। বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পরে মনে হয়, মস্ত বাহাদুরি আমিই একমাত্র পুরুষ যাকে কন্যার বাবা বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে নিয়েছে।
প্র : কল্যাণীর বাবা মেয়ের কোন কষ্ট সইতে পারলো না–
উ : অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ের বিমর্ষ মুখ।
প্র : 'যে ধারটি চোখের জলের মতো শুভ্র সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া কহিল, যেমন করিয়া একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম। তেমন করিয়া উড়িয়া যাইতে দাও।'– দময়ন্তীর পুষ্পবনের পরিচয় দাও।
উ : দময়ন্তী বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। বিদর্ভরাজ

ভীম ও তার স্ত্রী কবি মদনকে সেবায় তুষ্ট করে মদনতী নামে এক কন্যা লাভ করেন। নল ও দময়ন্তী গ্রামে পড়েন। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম দেবতা বাবা দেয়। একাদিক্রমে পুষ্কর কলিকে পরাজিত করে নল দময়ন্তীকে পান। তিনি ছিলেন নৈষধি।

'ঐকতান' কবিতা থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ঐকতান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা।
প্র : কবিতাটি কবির মৃত্যুর কত মাস আগে প্রকাশিত হয়?
উ : কবির মৃত্যুর চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ গ্রন্থাকারে এবং তার আগে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়।
প্র : 'ঐকতান' কবিতাটিতে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
উ : জন্মদিনের স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্মসমালোচনা, কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি।
প্র : 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে, কত পর্বে রচিত?
উ : প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। কবিতাটিতে ৮+৬ এবং ৮+১০ মাত্রার পর্বই অধিক ভাবে ৯ মাত্রার প্রসম পর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণপর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।
প্র : জ্ঞানের দীনতা কবি কিসের দ্বারা পূর্ণ করেন?
উ : ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা। এই কথাটি প্রতীকী। তিনি অন্য মনীষীদের কাছে অনেক একথা বুঝিয়েছেন।
প্র : কৃত্রিম পণ্যে কী ব্যর্থ হয়?
উ : গানের পসরা।
প্র : 'ঐকতান' শব্দের অর্থ কী?
উ : বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্টসুর।
প্র : 'ঐকতান' কবিতায় কবি নিজেকে কী পরিচয় দিয়েছেন?
উ : পৃথিবীর কবি।
প্র : কবির সাহিত্য সাধনা কেন পূর্ণতা পায় নি?
উ : সুরসাধনায় বহুতর ফাঁক রয়ে গেছে বলে।
প্র : 'ঐকতান' কবিতায় কবি কী স্বীকার করেছেন?
উ : জীবনের সুরের অপূর্ণতা।
প্র : জীবন সংসার কাদের ওপর নির্ভর করে চলে।
উ : শ্রমজীবী মানুষের উপর।
প্র : কবি সমাজের উচ্চ মঞ্চের কোথায় বসেছেন?
উ : সংকীর্ণ বাতায়নে।

প্র : কবি জীবনের সাথে কী যোগ করতে বলেছেন?
উ : জীবন। উচ্ছ্বসা জীবনের সাথে জীবন যোগ না হলে কৃত্রিম পণ্যে গানের পসরা ব্যর্থ হয়।
প্র : কার সুরে সুরে নতশির স্তব্ধ করে আছে বিশ্ব সভাতল?
উ : মূক যারা। অর্থাৎ যারা নিজেদের কথা বলতে পারে না।
প্র : 'আমার সুরের অপূর্ণতা' বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : সকল শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখের কবি তাঁর কাব্যে গানে তুলে ধরতে পারেন নি। আমার সুরের অপূর্ণতা বলতে কবি এ বিষয়টিই বোঝাতে চেয়েছেন।
প্র : 'কীর্তি' কী?
উ : বড় কাজ। এই শব্দের সম-উচ্চার্য কতিপয় শব্দ সম্পর্কে সচেতনতা জরুরি : কৃতী = সাফল্য লাভকারী বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কৃতি = কর্মবহু; কৃত্তি = বাঘের চামড়া; কীর্তন = ধর্মীয় গান।
প্র : এই কবিতার প্রথম চাবি-কথা কোন্‌টি?
উ : 'আমি পৃথিবীর কবি'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজেকে ভাবলোকের নয় মাটি ও মানুষের কবি বলে দাবি করছেন।
প্র : এই কবিতার নামকরণের সঙ্গে কবির আত্মক্ষোভ কোথায়?
উ : কবি বলছেন, পৃথিবী হলো মানুষ, প্রকৃতি, পশুসহ বিভিন্ন সৃষ্টির মিলনক্ষেত্র। তিনি চেয়েছেন তাঁর রচনায় এসব ধারণ করতে। কিন্তু সব পারেন নি। এই আত্মসমালোচনার ফলে বেরিয়ে আসা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করে কবির আত্মক্ষোভ জেগেছে।
প্র : কেন এই ব্যর্থতা?
উ : কবি বলেছেন : 'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াজালি জীবনযাত্রার'। অর্থাৎ অভিজাত সমাজ ও বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্য তিনি চাইলেও অনেক ক্ষেত্রে সব পেরে ওঠেন নি।
প্র : এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাদের জয়গান গেয়েছেন?
উ : চাষি, তাঁতি, জেলে অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের।
প্র : সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে কী করা দরকার?
উ : 'জীবনে জীবন যোগ করা।'
প্র : শেষ বয়সে লেখা 'ঐকতান' কবিতায় কবির উপলব্ধি কী?
উ : তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয় নি। অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু ধারণ করা সম্ভবপর হয় নি তাঁর পক্ষে। (অবশ্য এটি তাঁর বিনয়ভাষ্য মাত্র। পৃথিবীর সব কিছু কেইবা এক জীবনে ধারণ করতে পারেন!)

...অপূর্ণতা পূর্ণ করার জন্য কবি কাদের

...কবিতা এবং প্রজন্মদের- যারা তাঁর ...এবং অভিজাতদের মতো থাকবেন না, ...গানামুদের দলে।
...কবিতা সার্বজনীন কেন?
...কবিতা হলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বিত ...যেখানে বৃহৎ ও বহুকণ্ঠের বাদ্যযন্ত্র ...তেমনি থাকবে একতারার ...ক্ষুদ্র ও আপাতভাবে ...বাদ্যযন্ত্রও। অর্থাৎ অভিজাত-...সবার সমন্বয় থেকে ঐকতানের ...এই কবিতার নামকরণ হয়েছে 'ঐকতান'।

'জুতা-অবিষ্কার' কবিতা থেকে
গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

...রাজা, গোবু মন্ত্রী কে?
...কোথায় এক অনবদ্য সৃষ্টি হয়েছে ও গোবু মন্ত্রী। এই দুটি নাম যেমন ...পূর্ণ, তেমনি প্রতীকী। এর মধ্য ...অনেক লেখক তাঁদের বক্তব্য তুলে ...।
...অর্থ কী?
...ভাগ করে।
...হলো খুব কথার অর্থ কী?
...ব্যবহৃত হয়েছে।
...যাওয়া
...নেই অর্থ কী?
...ঘুম নেই।
...প্রয়োগ?
...চোখের জল, এতে আর ...প্রয়োজন নেই ঠিক, ...লেখার প্রয়োজন খাতিরে কবিগণ এমন ...ছন্দের খাতিরে কবিগণ এমন ...করতে পারেন। এমন ব্যবহারকে ...বলে।
...থেকে পা দুটি যুক্তরাখার প্রধান ...কী?
...।
...অবিষ্কার কবিতায় রাজার দৃষ্টি কোন ...ছিল?
...থেকে পা দুটিকে রক্ষা করার ...।
...ঘুমিয়ে সারা রাত্র কী ভাবত?
...ধুলা লাগবে কেন পায়?
...রাজ্য থেকে কী প্রতিকার করতে ...ছিল?
...মাঝে পা ফেলা মাত্র যেন মলিন ...দুটিতে না লাগে।
...যখন বললো, তার পায়ে যেন ধুলা ...এর প্রতিকার করতে হবে, তখন কী ...?
...গোবুর ঘামে গা ভেসে গেল, পণ্ডিতদের ...শুকিয়ে গেল, সভাসদদের রাতে ঘুম ...সারা দেশে দেশে, কাজে কাজে সবার চলা ...বন্ধ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এর প্রতিকার ...না পারলে পদচ্যুত হবে।
...রাজার পায়ে ধুলা লাগে কেন?
...দেশে মন্ত্রী রাজার প্রায় ধুলা লাগতে ...বাধা করতে না পেরে কারণ রাজার পায়ে ...ধুলা, রাজার প্রায় ধুলা লাগে। রাজার পায়ে ধুলা না থাকে তাহলে রাজার কি করে ধুলা লাগবে। আসলে এটি ছিল দেশে মন্ত্রীর চাটুকারিতা।
...নদী কী?
...নদী কী?
...নাসিকায় প্রচলিত 'হিজলী এক নদের মধ্য। একে 'নদী'ও বলে। আসলে, একজনের একত্র হয়ে বসে বসে কথা বলার এবং গল্প-গুজব বিষয়ে আলাপ বা আলোচনা করাকেই।
...ধুলা ধর করতে করতে রিলে কী যুক্তি করল?
...সবাই সতেরো লক্ষ কাটা, কিলো এবং মাটি দিল।
...কাঁটা দিয়ে ধুলা মাটি দেওয়ার সময় ধুলা রাজার কোথায় এসে পড়ল?
...রাজার মুখে ও নুড়ে।
...ধুলার কারণে দেশের অবস্থা কী হলো?
...দেশটা সর্বনাশের উজাড় হয়ে গেল।
...মশক কী?
...'মশক' মানে মশা। কিন্তু আর একটি শব্দ 'মশক' হলো চামড়ানির্মিত জল বা পানি ধারণের পাত্র বিশেষ। এটি পারিভাষিক শব্দ।
...'ভিস্তি' কী?
...পারসি শব্দ 'বিহিশ্‌ত' থেকে বাংলায় 'ভিস্তি' শব্দ ব্যবহার চালু হয়েছিল। যারা 'মশক' নিয়ে পানিবহন করে তাদের 'ভিস্তি' বলে।
...'কিস্তি' অর্থ কী?
...নৌকা।
...'হেরিল' অর্থ কী?
...'হেরিল'। 'হেরা' অর্থ 'দেখা'।
...'সন্ধ' কী?
...'সন্ধ' 'সান্দ্র' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।
...সকল জ্ঞানী-গুণী মিলে কিভাবে ধুলা বন্ধ করতে চাইল?
...মাদুর দিয়ে পৃথিবী ঢেকে দিয়ে।
...মাদুর দিয়ে পৃথিবী ঢেকে দেয়া নিয়ে রাজার সন্দেহ হলে সবাই কী করতে চাইল?
...চর্ম দিয়ে পৃথিবী মুড়ে দিতে চাইল।
...'শূল' কী?
...শল্যকাতীয় অস্ত্র।
...'মন্ত্রী কহে, আমরো ছিল মনে। কেমনে কোটা পেয়েছে সেটা জানতে।' –এই চরণ দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
...চাটুকারেরা সব সময় অন্যের কৃতিত্ব স্বহস্তগত করার চেষ্টায় থাকে।
...'জুতা-অবিষ্কার' কবিতাটি কোথা থেকে নেয়া হয়েছে?
...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

'দুই বিঘা জমি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'দুই বিঘা জমি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?

উ : 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের। এই কাব্যগ্রন্থটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের সহযোগে 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কত তারিখে 'দুই বিঘা জমি' লেখেন?

উ : ১৩০২ বঙ্গাব্দের ৩১শে শ্রাবণ।

প্র : 'ভুঁই' কী?

উ : ভূমি।

প্র : 'ভুঁই' শব্দটি কিভাবে এসেছে?

উ : সংস্কৃত 'ভূমি' শব্দ থেকে (ভূমি > ভুঁই)।

প্র : 'উপেন' কে?

উ : 'উপেন্দ্র' থেকে কথ্য ভাষায় হয়েছে 'উপেন'। উপেন্দ্র হলেন দেবরাজ ইন্দ্রের ভ্রাতা (তাই তিনি উপ+ইন্দ্র=উপেন্দ্র)। রবীন্দ্রনাথ নামমাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, দেবরাজের ভাইয়ের নামে নাম যার তারও কি করুণ দশা!

প্র : 'ভূস্বামী' কী?

উ : ভূমির মালিক (ভূ+স্বামী)।

প্র : 'পাণি' কী?

উ : 'পাণি' অর্থ হাত। শ্রুতিকটু, 'পানি' অর্থ জল।

প্র : 'সপ্ত পুরুষ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : সাত প্রজন্ম। আসলে এটা এক, দুই করে সাত প্রজন্ম নয়। বহুকালধরে অর্থে।

প্র : 'সে মাটি সোনার বাড়া'– 'বাড়া' কী?

উ : অধিক। (বৃদ্ধি > বাড়া > বাড়)

প্র : 'লক্ষীছাড়া' কী?

উ : অপদার্থ।

প্র : ক্রূর হাসি– কী?

উ : নির্দয়ের হাসি বা হিংস্রের হাসি।

প্র : 'ডিক্রি' কী?

উ : বাদি-প্রতিবাদির দেনা-পাওনা সম্পর্কে আদালতের হুকুম।

প্র : 'ডিক্রি' কোন শব্দ?

উ : ইংরেজি শব্দ (decree)।

প্র : 'এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি– / রাজার হস্ত করে সর্বস্ব কাঙালের ধন চুরি।'– এই বক্তব্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিয়েছেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, ধনীরা আরো ধনী হতে চায়। এ কারণে তারা গরিব ও সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এবং এই শোষণের মাধ্যমেই নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে তারা তৎপর থাকে।

প্র : 'মোহগর্ত' কী?

উ : মোহ অর্থ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। 'মোহগর্ত' অর্থ মোহের গর্তে অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারে।

প্র : 'মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান বধিবে না মোহগর্তে, / তাই লিখি দিল বিধাতৃপক্ষ দুবিষহ পরিবর্তে।'– এই চরণদ্বয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : ধরিব মানুষেরা ধনীদের অত্যাচারে এত সময় সম্পদ রক্ষায় হাল ছেড়ে দেয় এবং তখন তারা মনে করে এটা ঈশ্বর যা খোনার ইচ্ছা। তাই ঈশ্বর বা ভোগের নাম নিয়ে নিজের সম্পদের স্বত্ব সে তাদের করে। এখানেও উপেন নিজের সম্পদ হারিয়ে মনে করছে, ঈশ্বর তার দুঃখিনী জমির পরিবর্তে এই বিশ্ব জগতের বিপুল জমি তাকে দান করেছেন। এই বক্তব্য তুলে ধরে আসলে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের মানসিকতার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

প্র : 'সন্ন্যাসী' কারা?

উ : যারা সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনা ভিক্ষার অন্নে জীবন ধারণ করেন।

প্র : 'সাধুর শিষ্য' কী?

উ : পরম ধার্মিক লোকের অনুসারী।

প্র : 'হেরিলাম' কী?

উ : 'হেরা' অর্থ দর্শন করা। হেরিলাম অর্থ দর্শন করিলাম। এই শব্দটি দেশি শব্দ এবং এটি কাব্যে ব্যবহার হয়। সম্প্রতি কাব্যে অবশ্য এই শব্দ বর্জিত হয়েছে।

প্র : 'মনোহর ধাম' কী?

উ : মনোহর অর্থ সুন্দর; ধাম অর্থ গৃহ।

প্র : 'ভ্রমি' কী?

উ : ভ্রমণ করি।

প্র : 'কত শত বর্ষ পর আর পূর্ণযৌবনের ফুল্লকুসুম-ভরা বসন্তের দিনে / ফিরে ফিরে আসিবে ধরার কোলে।'– এই বক্তব্য দিয়ে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উ : প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুর পর উপেন আবার বিয়ে করবে। তার নতুন স্ত্রী হবে সুন্দরী, যুবতী। – এর পর রবীন্দ্রনাথ কী বর্ণনা করেছেন?

উ : এর পর কয়েক পঙক্তি রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের রূপ বর্ণনা করেছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও মানুষের যে আকর্ষণীয়তা ফুটে আছে তা যেন এই বাংলাদেশেরও। এই বর্ণনায় শুধু একটি নদীর নাম পাল্টে দিলেই তা হবে বাংলাদেশের বর্ণনা হয়ে যাবে। – সেটা কী?

উ : পদ্মা নদী।

প্র : 'কুমোর' কারা?

উ : যারা মাটির কাজ করে তাদের কুমার বলে। কুমার থেকে কুমোর।

প্র : 'কুম্ভকুল' কী?

উ : কুম্ভকার আতুর বা কাতর।

প্র : 'লুটিছি' কোন ধরনের শব্দ?

উ : প্রকৃত শব্দ। বর্তমান রূপ 'পৌঁছলাম'।

প্র : 'দিক দিক ওরে, শত দিক তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি!'– এই পঙক্তিতে উপেনের কী প্রকাশিত হয়েছে?

উ : ক্ষোভ। তাই সে জন্মভূমিকে নির্লজ্জ ও কুলের কাঁটা বলে অভিহিত করছে।

প্র : কেন?

উ : কারণ ভূমির স্বভাবই এই– যে যেভাবে ব্যবহার করে ভূমি নীরবে তা করতে দেয়, কোনো প্রতিবাদ করে না।

প্র : উপেনের এ ক্ষোভ প্রকাশকে মূল্যায়ন কর।

উ : অন্যের দিক থেকে উপেনের এ ক্ষোভ প্রকাশকে সমীহ করা গেলেও এ কথা বলতে হয়, উপেন কেন জমিদারের অত্যাচারের প্রতিবাদ করে নি, দুবিষহ পরিবর্তে বিশ্বনিখিল লাভ করল– এই তৃপ্তি নিয়ে কেন সে স্বেচ্ছায় গ্রাম ছাড়া হলো?– রবীন্দ্রনাথ উপেনের এ ধরনের কর্মের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন নি।

প্র : 'বিবাগী' কী?

উ : সন্ন্যাসী।

প্র : 'সেই সুদূরের রুদ্র সুরে, পরিপাশ্বা পলাশ– / ধরাকে ফোক বিরচিত।

উ : অপরূপ সুন্দর নির্মিত।

প্র : 'অবিলাম হায় অন্ন কী কেবল ভিক্ষে পাত্র দে জীবনে / সকল আহার চেলি দেশ খাসে আমা সুধাইতে পারে,'– এই চরণদ্বয়ের মধ্যে অর্থ-সম্পর্ক দেখাও।

উ : এখানে মানব ও মর্তভূমির অন্যতম একান্নবর্তী হয়েছে। মানুষের হতাশা, শূন্যে ঘনায়ে প্রকৃতির নীরব নিঃসীমতা একাকার হয়ে গেছে।

প্র : যমদূত প্রায়– কী?

উ : মৃত্যুর দেবতা বলে ধূসর মনে।

প্র : 'সাধের মুখ' কী?

উ : ধানের সর্বোত্তম মুখ। 'একদা উল্লসিত কথা আর্থে।

প্র : 'লাটিগাছ'– এখানে 'গাছ' কী?

উ : এটি পদাশ্রিত এক নতুন নির্মাণক 'গাছ'র সংক্ষিপ্ত রূপ। এক গাছে লাঠির সঙ্গে 'গাছা' বা 'গাছ' বলতে পারে। এ রকম উদাহরণ আরো আছে: ছুরি বা ফিতার সঙ্গে বসে 'খানি'।

প্র : 'পরিষদ' কী?

উ : সঙ্গী-সাথী।

প্র : 'অমি অনে হাসি অবিচ্ছেদে ভগি, এই ছিল মোর ঘটে–' এই বক্তব্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : ভূস্বামী বাবু যখন উপেনকে সাধু ভেবে চোর বলে অভিহিত করছে তখন সত্যের অপলাপ করা উপেনের হাসি আসছে, আবার চোখ ভরে আসছে জলেও। উপেন ভাবছে, এই চোর তার কাছে ভগতে হবে– এই ভাগ্য তার ছিল।

প্র : 'ঘট' কী?

উ : ভাগ্য।

প্র : 'তুমি মহারাজ সাধু হয়ে আজ, আমি আজ চোর বটে।'– উপেনের এই বক্তব্যে কী প্রকাশিত হয়েছে? রবীন্দ্রনাথই-বা কী বুঝিয়েছেন?

উ : দুর্বলের মুখে নীতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নীতিকথা নিয়ে যে ভূস্বামী বাবুর হাত থেকে উপেন জমি রক্ষা করতে পারে নি,

[illegible]

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

রশীদ করীম

প্র : রশীদ করীম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২৫ সালের ১৪ই আগস্ট, কলকাতায়।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : উপন্যাস : উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রসন্ন পাষাণ (১৯৬৩), আমার যত গ্লানি (১৯৭৩), প্রেম একটি লাল গোলাপ, সাধারণ লোকের কাহিনী, [illegible]। প্রবন্ধ : আর এক দৃষ্টিকোণ, অতীত হয় নূতন পুনরায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি।

প্র : 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : রশীদ করীমের এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শাকেরকে ঘিরে সেলিনা, মুশতাক, শেখর, মুশতাক, সলিল, চন্দ্রা, নিহার ভাবি, শিরিন এ রকম অসংখ্য চরিত্র আবর্তিত হয়েছে। এদের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় কোথাও কোথাও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। আধুনিক মননশীলতা, পরিশীলতা, আঙ্গিক, শৈল্পিকতার নির্লিপ্ত বর্ণনায় পাঠকের পাঠতৃষ্ণার নিবারণ হয়।

প্র : 'আমার যত গ্লানি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক অস্থিরতাকে আশ্রয় করে রশীদ করীম উপন্যাসটি রচনা করেন। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ছাড়া বাকি সবই কল্পনাপ্রসূত। উপন্যাসের [illegible]

[illegible]

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), [illegible] পুরস্কার (১৯৮৪), [illegible] (১৯৯২)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০১১ সালের ২৬শে নভেম্বর।

রামরাম বসু

প্র : রামরাম বসু কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : হুগলি জেলার চুঁচুড়ায়, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : তিনি স্মরণীয় কেন?

উ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের গদ্য লেখক হিসেবে।

প্র : তিনি কোন ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন?

উ : ফারসি ভাষায়। এই ভাষা শেখার [illegible] প্রথম জীবনে মুন্সিগিরি [illegible] লোভায়ী উইলিয়াম জোন্সের [illegible] করেন।

প্র : তিনি উইলিয়াম কেরীকে কোন ভাষা [illegible] করে শেখান?

উ : বাংলা ভাষা (১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ পর্যন্ত)।

প্র : তিনি কেরী সাহেবের কী হিসেবে পরিচিত হন?

উ : কেরী সাহেবের মুন্সি।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি [illegible] জড়িত ছিলেন?

উ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

প্র : তিনি রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) গ্রন্থটি কেন লিখেন?

উ : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার জন্য।

প্র : বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত মৌলিক [illegible] কোনটি?

উ : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র।

প্র : [illegible]

উ : [illegible] (১৮০১)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : [illegible] ১৮১৩।

রামমোহন রায়

প্র : রামমোহন রায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৭৭২ সালে, হুগলির রাধানগর গ্রামে (মতান্তরে তাঁর পিতার বাসে)।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?

উ : রামকান্ত রায়।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, চিন্তাবিদ ও বহুভাষাবিদ পণ্ডিত।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : তিনি গ্রামের পাঠশালায় হাতেখড়ি দেন, পাটনায় আরবি ও ফারসি এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণ করেন।

প্র : আরবি ও ফারসি ভাষায় লিখিত তাঁর প্রথম রচনা 'তুহফাতউল মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশিত হয় কত সালে?

উ : ১৮০৩ সালে।

প্র : এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?

উ : একেশ্বরবাদ।

প্র : তিনি কত সালে একেশ্বরবাদ ধর্মমত অনুসারে অনুবাদ ও ভাষ্যসহ বেদান্তসূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ প্রকাশে ব্রতী হন?

উ : ১৮১৫–১৮১৯ সালে।

প্র : একেশ্বর উপাসনার উদ্দেশ্যে তিনি কী প্রতিষ্ঠা করেন?

উ : আত্মীয়সভা নামের সংগঠন, ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে রামমোহন যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম কী?

উ : ব্রাহ্মধর্মমত।

প্র : কোন মত প্রকাশের জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে।

উ : হিন্দুধর্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃষ্ট– এই মত।

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

প্র : তিনি কত সালে [illegible]

উ : ১৮২৩ সালে।

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

প্র : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর নাম কী?

উ : ইংরেজি, বাংলা ও ফারসি [illegible] 'ব্রাহ্মণ সেবধি' [illegible], বাংলায় 'সম্বাদ কৌমুদী' [illegible] ও ফারসি ভাষায় 'মিরাত-উল-আখবার' (১৮২২)।

প্র : 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর পরিচয় দাও।

উ : 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫) [illegible] কর্তৃক [illegible] ঐতিহাসিক [illegible] একমাত্র [illegible] এই গ্রন্থ [illegible]।

প্র : তিনি কিভাবে 'রাজা' উপাধি পান?

উ : দিল্লির বাদশাহ কর্তৃক, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র : ইংল্যান্ড গমনকারী প্রথম বাঙালি কে?

উ : রাজা রামমোহন রায় (১৮৩১)।

প্র : তিনি কত সালে ফরাসি সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সংবর্ধিত হন?

উ : ১৮৩২ সালে।

প্র : তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), সোমাগীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) ইত্যাদি সহ ৩০টি গ্রন্থ।

প্র : উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কে প্রথম গদ্যের ব্যবহার করেন?
উ : উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হয় পাঠ্যপুস্তকের জন্যই। তাই বাংলা গদ্যের প্রথম কিছুদিন সেই পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকে গদ্যভঙ্গির সকল প্রয়াস। রামমোহন রায়ই তাঁর ধর্ম ও সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্য ব্যবহার করেন।

প্র : সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন কী কী গ্রন্থ রচনা করেন?
উ : উনিশ শতকের যুক্তিবাদী মননশীলতায় রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। নিরক্ষ মত প্রচারের জন্য হিন্দু সমাজের গোঁড়া সংস্কারের যুক্তিহীনতা দেখাবার জন্য তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। (ক) প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮-১৯), (খ) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮)।

প্র : অক্ষয়কুমার দত্তের কোন রচনা বিদেশি রচনা অবলম্বনে লিখিত হলেও মৌলিক রচনার মর্যাদা পায়?
উ : 'Asiatic Researches' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ হোরেস হেম্যান উইলসনের 'Sketch on the Religious Sects of the Hindus' রচনাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম ভাগ এবং ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। রচনার সাবলীলতার জন্য গ্রন্থটি মৌলিক রচনার গুরুত্ব পায়।

প্র : বিদ্যাসাগর কোন পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন?
উ : অক্ষয়কুমার দত্তের পর কিছুদিন বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্র : বাংলায় প্রবন্ধরচনার প্রথম কৃতিত্ব কার?
উ : রাজা রামমোহন রায়ের।

প্র : রামমোহন রায়ের পরিচয় কী?
উ : সমাজসংস্কারক এবং বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিকালীন লেখকদের একজন।

প্র : রামমোহন রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
উ : গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

প্র : ব্যাকরণ রচনায় রামমোহন স্মরণীয় কেন?
উ : রামমোহন রায় প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।

প্র : বিবিসির অন্বিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?
উ : দশম।

প্র : তাঁর মৃত্যু কোথায় কত সালে?
উ : ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে মৃত্যু: ২৭-৯-১৮৩৩। সেখানেই সমাহিত।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ

প্র : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬: বরিশালে।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০-তে বি.এ. অনার্স ও ১৯৮৩-তে এম.এ.।

প্র : তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন?
উ : জাতীয় কবিতা পরিষদের।

প্র : জাতীয় কবিতা পরিষদ কী?
উ : সামরিক স্বৈরাচার ও অগণতান্ত্রিকতা বিরোধী কবিদের সংগঠন।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?
উ : প্রতিবাদী কবি হিসেবে।

প্র : তাঁর কবিতায় কোন দিকটি বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত?
উ : মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণআন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতা।

প্র : 'ভাল আছি ভাল থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো'–কার গান?
উ : রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর।

প্র : তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?
উ : উপকূল (১৯৭৯), ঘরে ঘরে (১৯৮১), মানুষের মাঝখান (১৯৮১), নিয়োজিলে সকল আকাশ (১৯৮৬), মৌলিক মুখোশ (১৯৯০)।

প্র : তিনি কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : দুর্জয় চৌধুরী স্মৃতিপুরস্কার (১৯৮০)।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সালে?
উ : ২১শে জুন, ১৯৯১।

রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই)

প্র : রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২৫ সালের ৯ই এপ্রিল, ফরিদপুরের পাংশাতে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম কী?
উ : ছড়া : হাতিমাতিম (১৯৬২); অনুবাদ: আলব হলেও গুজব নয় (১৯৫৪); সম্পাদনা : আমার প্রথম লেখা (১৯৫৭), ঝিকিমিকি (গল্পসংকলন)।

প্র : তিনি বিখ্যাত কেন?
উ : দৈনিক ইত্তেফাকের কচি-কাঁচার মেলার প্রতিষ্ঠাতা দাদাভাই বলে।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশু সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪)।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

প্র : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮০, পায়রাবন্দ গ্রাম, রংপুরে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত।

প্র : তাঁর পৈতৃক নাম কী?
উ : রোকেয়া খাতুন, বিবাহের পরে নামের শেষে স্বামীর নাম সাখাওয়াত হোসেন যুক্ত হয়।

প্র : তিনি কোথায় কোন সালে ইন্তেকাল করেন?
উ : ইন্তেকাল করেন কলকাতায়।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?
উ : জহুর আলী সাবের।
প্র : বৈশাখে তিনি কোথায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন?
উ : বড় ভাই আবুল আসের ইচ্ছায় ও তাঁর বোন করিমুন্নেসা খানমের তত্ত্বাবধানে বৈশাখ থেকেই কুমারখন্দ গ্রাম থেকে পেশোয়ার ও দিল্লিসহ নানা স্থানে।
প্র : তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা কোথায়?
উ : পরিবারে।
প্র : তিনি কোথায় এসে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন?
উ : আসানসোল শিয়ারসোল স্টেশনের কাছে।
প্র : কত সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়?
উ : ১৯০৯ সালে।
প্র : স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কোন কাজে মনোনিবেশ করেন?
উ : সমাজসেবা ও সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারে।
প্র : কার নামে তিনি ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন?
উ : স্বামীর নামে।
প্র : তিনি কত সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন?
উ : ১৬ই মার্চ, ১৯১১।
প্র : প্রাইমারি স্কুলটি কত সালে তিনি উচ্চ ইংরেজি মাদ্রাসা স্কুলে উন্নীতকরণ করেন?
উ : ১৯৩১ সালে। আজীবন এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস এবং সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন করেন।
প্র : স্কুলের জন্য তিনি কিভাবে জমি সংগ্রহ করেন?
উ : মহাজন-মহাজন ঘুরে।
প্র : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, কবে?
উ : আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি); ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তিনি কোন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন?
উ : মুসলিম সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য।

প্র। তাঁর সব ছদ্মনামে সমাজ-জীবনের কোন বোধটি উৎসারিত?

উ। নেপথ্যচেতন।

প্র। রোকেয়ার কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ?

উ। মতিচুর (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড-১৯২২), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) ও Sultana's Dream.

প্র। 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ। 'অবরোধবাসিনী' (১৯৩১) রোকেয়ার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কতগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না নিয়ে এই গ্রন্থের কাহিনি রচিত। সকশাধর্মী ছোট ছোট রচনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে অবরুদ্ধ নারীর মর্মন্তিক জীবনকথা। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর এই গ্রন্থে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, পাঞ্জাব, দিল্লি ও আলিগড়ের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পরিবারে পর্দার নামে অবরোধের অমানবিক ঘটনার ৪৭টি চিত্র তুলে ধরেছেন। রোকেয়া নিজে এগুলোকে 'ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসিকান্না' বলে অভিহিত করেছেন। এই লেখাগুলো কলকাতার মাসিক 'মোহাম্মদী'র মহিলা পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। ১৯৩১ সালে রোকেয়ার এই সৃষ্টিকর্ম 'অবরোধবাসিনী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্র : তাঁর উপন্যাসের নাম কী?

উ : পদ্মরাগ (১৯২৪)।

প্র : 'পদ্মরাগ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত উপন্যাস। আসলে একে উপন্যাস না বলে উপন্যাসোপম গদ্য-আখ্যায়িকা বলাই ভালো। কেননা উপন্যাসের গাঁথুনি এখানে নেই, শিল্প হিসেবেও অসফল। তবে 'পদ্মরাগে'র মূল্য অন্যত্র। প্রথমত কোনো মুসলিম নারীর রচনা; দ্বিতীয়ত মুসলিম সমাজের অন্তঃস্থিত ক্লেদকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা কোনো হিন্দু লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তৃতীয়ত অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে এ জন্যে। শরিয়ত ও শিক্ষিকার লেখচিত্র আছে এখানে। উপাদান কলকাতার আয়ায়। 'তারিণীভবন'কে কেন্দ্র করে 'পদ্মরাগে' বলা হয়েছে যে, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান একই মাতৃগর্ভজাত। একটা চমৎকার গল্প আছে এ গ্রন্থের অন্তরালে। এক মুসলিম ধর্মশিক্ষকের কাছে এসো শিক্ষা নিতে। দানেশ তাকে নিজের হিন্দু গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। সেই হিন্দুগুরু আবার তাদের নিয়ে গেলেন নিজের মুসলিম গুরুর কাছে। এভাবে বোঝানো হলো প্রকৃত শিক্ষার কোনো সম্প্রদায়জ্ঞান থাকে না। জ্ঞানের অন্ধকারে কূপমণ্ডূকতা দূর করতে হয়। 'পদ্মরাগ' উৎসর্গ করা হয় রোকেয়ার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিমকে।

প্র : কোন কোন পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলো প্রকাশিত হয়?

উ : নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায়।

প্র : বিবিসির জরিপকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : ষষ্ঠ।

প্র : তিনি কোন আন্দোলনের পথিকৃৎ?

উ : মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের।

প্র : তাঁর কবে মৃত্যু হয়?

উ : ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩২।

'চাষার দুক্খু' রচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : আমাদের সভ্য হতে সভ্যতর হতে কতদিন সময় লেগেছে?

উ : দেড়শত বছর।

প্র : যে বলে বাঙালি সভ্য নহে সে কী?

উ : নিমকহারাম।

প্র : 'চাষার দুক্খু' প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় কী?

উ : চাষার দারিদ্র্য।

প্র : 'চাষার দুক্খু' প্রবন্ধে কোন বাগধারার উল্লেখ আছে?

উ : ধান ভানতে শিবের গীত।

প্র : দুই মিলের কর্মচারীরা কত বেতন পেয়ে থাকে?

উ : মাসিক চার টাকা।

প্র : প্রতিদিন কতজন লোক কাজ করে?

উ : প্রতিদিন ৫০০-৭০০।

প্র : কোন ভাষার বসুন্ধরা গান"—এ উক্তিটির মাধ্যমে তার বসুন্ধরা গান"—এ উক্তিটির মাধ্যমে কিভাবে সম্মান দেখানো হয়েছে?

উ : শ্রদ্ধেয় তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্র : পৃথিবীকে সর্বশান্ত করেছে কোন মহাযুদ্ধ?

উ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

প্র : লেখিকা তাঁর বাল্যকালের কোন ঘটনার কথা বলেছেন—

উ : ঘটনার ৮ সের সরিষার তৈরি ছিল, আর ঘটনার ৪ সের ঘি।

প্র : কৃষক কন্যা জমিরন দুই গণ্ডা পয়সার তেলের জন্য রাজবাড়ি আসিত ঘটনাটা কোন সময়ের?

উ : যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল।

প্র : 'সের' কী?

উ : ওজনের একক পদ্ধতি। কিছুকাল আগেও বাংলাদেশে 'সের' হিসেবে চাল, তেল ইত্যাদি ওজন হতো। ১৬ ছটাকে ১ সের; ৪০ সেরে ১ মণ এমন হিসেব ছিল।

প্র : কৃষক তার কন্যা বিক্রি করত?

উ : ৫০/৩২ বছর পূর্বেও দুই সের খেসারির জন্য

প্র : পঁচিশ বছর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কলিকা রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল?

উ : কৃষকরা পান্তা ভাতের সাথে লবণ ব্যতীত অন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে পারত না।

প্র : রাত-ভায়া সমুদ্রের তীরবর্তী লোকেরা কী করত?

উ : সমুদ্রের জলে চাউল ধুয়ে ভাত রেঁধে খেত।

প্র : রংপুরের লোকদের বস্ত্রাদি কেমন ছিল?

উ : পুরুষেরা বহু কষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮-৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করে নিজেরা কৌপিন পড়ত।

প্র : কৃষক নারীর তৈরি পোশাকের নাম কী?

উ : এড়ি (একখানি এড়ি কাপড় ৪০ বছর টিকে যেত)।

প্র : অসভ্য থেকে সভ্য হবার বাইরের নিদর্শন কী?

উ : 'শির দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক ;'— এটি ব্যঙ্গার্থে বলা হয়েছে।

প্র : চাষার দারিদ্র্য দূর করার উপায় কী?

উ : সবে সবে চাষা ও শ্রমে মনে পড়িলে যাপন।

লালন শাঁই

প্র : লালন শাঁইয়ের জন্ম কবে বলে কোনো?

উ : ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ১২৭৯ (১৭৭৩), হরিপুর গ্রাম, হিজোইদহ; মহকুমা কুষ্টিয়া জেলা কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন?

উ : বাউল সাধক ও বাউল কবি।

প্র : তাঁর জন্ম কোন পরিবারে?

উ : এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে।

প্র : লালনের শিক্ষাগুরুর নাম কী?

উ : সিরাজ শাঁই।

প্র : তিনি কার কাছে দীক্ষিত হন?

উ : সিরাজ শাঁইয়ের কাছে। তাঁর শিক্ষায় লালন করেন কয়েক বছর। লালনের নামের সাথে শাঁই যুক্ত হয়।

প্র : তিনি কোথায় আখড়া স্থাপন করেন?

উ : কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে।

প্র : তাঁর শিক্ষা কতটুকু?

উ : হিন্দু মুসলিম শাস্ত্র সম্পর্কে নিজের জ্ঞান অর্জন।

প্র : তিনি কোন গান লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন?

উ : বাউল সংগীত।

প্র : তাঁর গান কোন বিষয়ক সমৃদ্ধ?

উ : অধ্যাত্মভাব, মর্মমি রসব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

প্র : তাঁর রচিত গানের সংখ্যা কত?

উ : সহস্রাধিক।

প্র : লালনের গান কে প্রথম সংগ্রহ করেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কতগুলো গান সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয়?

উ : ২৯৮টি (২০টি গান তৎকর্তৃক 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়)।

প্র : বাঙালি বিদ্বৎসমাজের কাছে লালনকে পরিচিত করার প্রথম কৃতিত্ব কার?

উ : রবীন্দ্রনাথের।

প্র : লালনের একমাত্র যে ফোটো প্রচলিত সেটা কে অঙ্কন করেন?

উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্র : লালন শাহ কেন বাংলা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়?

উ : লালন শাহ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিমুক্ত সহজসরল জীবনযাপন করে গেছেন বলে।

প্র : তাঁর কোন গানগুলো বাউল সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ?

উ : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশি নগর', 'আমার ঘর খানা কে বিরাজ করে' ইত্যাদি।

প্র : বিবিসির অভিপ্রকৃত (২০০৪) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালির তালিকায় তাঁর স্থান কত?

উ : দশম।

প্র : লালন সাঁইয়ের মৃত্যু হয় কত সালে?

উ : ১লা কার্তিক, ১২৯৭, শুক্রবার; ১৭ই অক্টোবর, ১৮৯০।

'মানবধর্ম' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'মানবধর্ম' কি লালন লিখিত কবিতা?

উ : লালনের লেখা কোনো কবিতা পাওয়া যায় নি। লালন মুখে মুখে গান বাঁধতেন এবং তাতে সুর দিয়ে গাইতেন। তাঁর অনুসারীরা এই গানগুলো নিজেরা গাইতেন এবং মুখে মুখে প্রচার করতেন। 'মানবধর্ম' আসলে লালনের গাওয়া একটি গান। যেহেতু প্রত্যেক গানই কবিতা, সেহেতু এই গানটিও এক অর্থে কবিতা-গীতিকবিতা।

প্র : 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।'– পঙ্‌ক্তি দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : কায়স্থ লালনচন্দ্র কর যখন সিরাজ সাঁইয়ের আশ্রয়ে বিশেষ তত্ত্বমূলক গান শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন স্থানীয় লোকেরা লালনের জাত ও ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। লালন একথা জানতেন বলেই তাঁর গানে তিনি এ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

প্র : আজ লালনের ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের বক্তব্য কী?

উ : ঠিক উল্টো। আগে যেমন কেউ লালনকে নিজ ধর্মভুক্ত বলে মানতে চাইতেন না, আজ তারাই লালনকে নিজ ধর্মের লোক বলে দাবি করতে চাচ্ছেন। হিন্দুরা বলছেন লালন হিন্দু, মুসলমানরা বলছেন তিনি মুসলিম ধর্ম মতে বিশ্বাসী। আসলে লালন এ দুয়ের কোনোটি নন।

প্র : 'লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে।'– দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : লালন পুনিয়োছেন, জাত বলে কিছু আছে কি-না, তা তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনেও দেখতে পান নি। মানুষ নিজেই জাত-এর ইত্যাদির নামে দিনরাত বিবাদে লিপ্ত থাকে। এই জাতের পরিচয় মানুষ নিজেরাও বুঝতে পারে না।

প্র : 'মালা' বলতে লালন কী বুঝিয়েছেন?

উ : 'জপমালা'। তুলসী বা রুদ্রাক্ষের জপমালা তৈরি করে হিন্দুরা ভগবানের নাম জপ করে। তাই এখে 'জপমালা' বলে।

প্র : 'তসবি' কী?

উ : মুসলমানরা যে দানা বা গুটিগুলোর মালা নিয়ে খোদার নাম জপ করে তাকে তসবি বলে।

প্র : 'তসবি' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'যাওয়া কিংবা আসার বেলায়' বলতে কী বোঝান হয়েছে?

উ : জন্ম কিংবা মৃত্যুকালে।

প্র : 'জেতের চিহ্ন' বলতে কী বোঝান হচ্ছে?

উ : জাতের চিহ্নকে। যেমন, হিন্দুদের ত্রিশূল জপমালা, পৈতা, তিলক, টিকি ইত্যাদি; মুসলিমদের চিহ্ন তসবি, চোখে সুর্মা, দাড়ি ইত্যাদি।

প্র : 'গর্তে গেলে কূপজল কয়, / গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়, / মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়, / ভিন্ন জলায় পাত্র-অনুসারে।'– কবিতার এ স্তবকে কী বলা হয়েছে?

উ : মানুষ সবাই সমান। হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে হিন্দু বলে, মুসলিম ঘরে জন্ম নিলে মুসলিম বলে, খ্রিষ্টান ঘরে জন্ম নিলে খ্রিষ্টান বলে। আসলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই মানুষ– সবাই এক জাতি। বৃষ্টির পানি যেমন, কুয়োতে পড়লে কুয়োর পানি বলি; গঙ্গানদীতে পড়লে পবিত্র পানি বলি; ধানখেতে পড়লে সে পানিকে সাধারণ পানি বলি এবং তা দিয়ে ধানচাষ করি– তেমনি মানুষও জন্মের কারণে এই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাত-নামে হয়। জাত কিছু নয়, মানুষই তার আসল পরিচয়।

প্র : 'গাঙ্গাজল' কী?

উ : গঙ্গা নদীর পানি। গঙ্গা হিমালয় পর্বত থেকে সরাসরি নেমে এসেছে বিধায় এর পানিকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়।

প্র : 'জগৎ বেড়ে জাতের কথা,'– 'বেড়ে' কী?

উ : বেষ্টন করে বা ঘিরে।

প্র : 'ফাতা' কী?

উ : এটি একটি আরবি শব্দের কথ্যরূপ।

প্র : 'ফাতহু' (আরবি) শব্দের অর্থ বিজয় বা গৌরব। এখানে 'গৌরব' অর্থে ফাতহু > ফাতা ব্যবহার হয়েছে।

প্র : 'সাত বাজার' কী?

উ : সব মানুষ।

প্র : 'লালন সে জেতের ফাতা / বিকিয়েছে সাত বাজারে।'– অর্থ কী?

উ : লালনের জাতের গৌরব নেই, তিনি তা সব মানুষের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন।

শওকত আলী

প্র : শওকত আলী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি, দিনাজপুরে।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : উপন্যাস : পিঙ্গল আকাশ (১৯৬২), যাত্রা (১৯৭৬), প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪), দক্ষিণায়নের দিন (১৯৮৫), কুলায় কালস্রোত (১৯৮৬), পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬), যেতে চাই (১৯৮৮), ওয়ারিশ (১৯৮৯), বাসর মধুচন্দ্রিমা (১৯৯০), উত্তরের খেপ (১৯৯২), হিসাবনিকাশ (১৯৯৮), দলিল (২০০১), উপরে ছাপ (২০০২) ইত্যাদি। গল্প : উন্মূল বাসনা (১৯৬৮), লেলিহান স্বাদ (১৯৭৮), তন হে লক্ষিন্দর (১৯৮৮), বাবা আপনে যান (১৯৯৪)।

প্র : ওয়ারিশ-এর বিষয় কী?

উ : এই উপন্যাসে বাংলা সনের সঙ্গে সঙ্গে ও সমান্তরাল ভাবে ইংরেজি সনের ব্যবহার করা হয়েছে।

প্র : 'ওয়ারিশ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'ওয়ারিশ' শওকত আলীর (১৯৮৯) লেখা একটি উপন্যাস। এর রাজনৈতিক পটভূমি হলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। ঘটনাটি সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এবং বিশেষ করে হিন্দু এবং মেয়েদের দুঃখ। এই উপন্যাসের সময় ধরা হয়েছে বেশ লম্বা সময়ের ব্যাপ্তিকাল। সর্বজনীন, ব্যক্তিগত টানাপোড়েন নিয়ে এতে মার্চ ও অন্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও উপন্যাসের বিষয়। মানুষের মনে বিশ্বাস ও আস্থার ছিল চরমে। উপন্যাসে যেমন একক ব্যক্তিকে নায়ক করা হয় নি, ব্যাপ্তিকাল অর্থাৎ কালের পটভূমি সন্নিবেশকেও এই উপন্যাসে নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। উপন্যাসটির ভাষা এর প্রধান সম্পদ। মার্চের বিভিন্ন দিনের মধ্যে একজন পাঠকের ঘুরতে ঘুরতে ভাষারূপ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। এর ফলে পাঠক উপন্যাসটি পড়ার সময় যেন দারুণ সেসের এই সময়ে ফিরে যান।

প্র : 'ওয়ারিশ' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : শওকত আলী রচিত 'ওয়ারিশ' (১৯৮৯) উপন্যাসটি মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে। অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয়। এই নাম নামক সভ্যতার ইতিহাস, যাকে বলা যায় ক্রমবিকাশ। এর রচয়িতা শওকত আলী রনজু চরিত্রের মাধ্যমে উপন্যাস করেছেন। সমাজ ও ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতাই প্রকাশ করেছেন অনবদ্য শব্দশৈলীতে।

প্র : 'উত্তরের খেপ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : ট্রাক ড্রাইভার বাবা ও বিহারি মায়ের সন্তান হারাদারের সাথে বিয়ে হয় বড়লোকের নাতনি মরিয়মের। কিন্তু কিছু দিন পর আবার মরিয়মের বিয়ে হয় এক অসৎচরিত্র, কুচক্রীর সঙ্গে। এরকম

পরিস্থিতিতে তৃতীয় চরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে এক প্রবেতকের কাহিনি নির্মাণ করে শওকত আলী বলতে চেয়েছেন 'উত্তরের খেপ' (১৯৯২) উপন্যাসটি। এ উপন্যাসটি আমাদের প্রাচীন বাস্তবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্র : 'যদ্যা' কী ধরনের রচনা?
উ : 'যদ্য' (১৯৭৬) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯০)।
প্র : তিনি কবে, কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল ৮:১৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শওকত ওসমান

প্র : শওকত ওসমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১৭ সালের ২রা জানুয়ারি; হুগলি।
প্র : শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম কী?
উ : শেখ আজিজুর রহমান।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : ঔপন্যাসিকরূপে।
প্র : তাঁর কোন রচনাটি ১৯৪৬ সালে দৈনিক আজাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়?
উ : উপন্যাস 'বনি আদম'।
প্র : গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক কোনটি?
উ : জননী (১৯৬১)।
প্র : শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একজন মা (গোপনে) যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১) উপন্যাসে সে কথাই ব্যক্ত। পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের মহেশডাঙ্গা। উরসে তার গর্ভে সন্তান এলো ৩৫ পর্যন্ত সন্তানকেও দরিয়া অসীম মমতায় মানুষ করে তুলেছে। মেয়ে আমিনা ও ছেলে ফজলু দরিয়ার স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে। দরিয়া তার সন্তানদের মাধ্যমে সমাজ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই মূলকাহিনির পাশাপাশি উপন্যাসে এসেছে মুসলিম সমাজের পরিবর্তিত দ্বন্দ্ব, নিত্যদানের স্বার্থপরতা, গ্রামের দরিদ্র মানুষের পারস্পরিক কলহ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : দরিয়া-বিবি, আজহার, মোনাদি, ইয়াকুব, চন্দ্রকোটার প্রমুখ।
প্র : কোন গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে আদমজী পুরস্কার দেয়া হয়?
উ : ক্রীতদাসের হাসি।
প্র : 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসটিতে প্রতীকাশ্রয়ে তৎকালীন পাকিস্তানিদের বিরূপ শাসনের সমালোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের বাদশা হারুন অর রশিদ অত্যাচারী। সে ক্রীতদাস তাতারি ও বাঁদি মেহেরজানের প্রণয়ে বাধা সৃষ্টি এবং তাতারিকে গৃহবন্দি ও অত্যাচার করে। তাতারি আমৃত্যু বাদশা হারুনের নির্যাতনের প্রতিবাদ করে যায়। এখানে তাতারি বাঙালি জনতার এবং বাদশা হারুন আইয়ুব খানের প্রতীক। তাতারির হাসি উপন্যাসে বাঙালির স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এটি শওকত ওসমানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত।
প্র : 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা কর।
উ : শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২) উপন্যাসটি ১৯৬১ সালে রচিত এবং এতে তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সমালোচনা করা হয়েছিল রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে। আইয়ুবীয় সামরিক শাসনে পীড়িত পূর্ব-পাকিস্তানের [illegible] চরিত্রগুলো এ-প্রসঙ্গে বেশ [illegible] যায়। যেমন: বাদশা হারুন হলেন [illegible] খান; বেগম জুবাইদা হলেন [illegible] পাকিস্তানের সাধারণ জনতা; [illegible] হলেন বাংলার স্বাধীনতা, যা [illegible] থেকে পাকিস্তানিশক্তির কাছে বার [illegible] প্রতীকায়ন করে বাঙালির [illegible] স্পৃহাই রূপকাশ্রয়ে ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে।
প্র : তাঁর লেখা দুটো মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা কর।
উ : **রক্তাক্ত প্রান্তর হইতে বিদায় :**
শওকত ওসমানের 'জাহান্নম হইতে বিদায়' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সহর [illegible] ও প্রকাশিত গ্রন্থ। ১৯৭১ সালে [illegible] ঐ গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য [illegible] তিনি কলকাতায় অবস্থান করছিলেন এবং তাই বইটি বের হয় কলকাতার [illegible] পাবলিশার্স থেকে। এই উপন্যাসটি প্রকাশ পেলে তা পাঠ করে পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার পাঠকসহ সেখানে অবস্থানকারী বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী শরণার্থী কর্মীরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবনত হয়ে ওঠেন। প্রচলিত ধারার উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের নায়ক কোন ব্যক্তি নয়, নায়ক হলো সময় বা যুদ্ধকাল। যে সময় সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল পাকিস্তানিরা, সে সময় শিল্পীর কণ্ঠে ভেসে ওঠে এমন গান: সোনায় মোড়ানো বাংলাকে আমার শ্মশান বানালো কে? ইয়াহিয়া তোমায় আসামির মতো জবাব দিতে হবে। কী অসীম সাহস শিল্পীর! ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানও তাই করলেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গাজী রহমানের অভিজ্ঞতায় শওকত ওসমান তুলে ধরেছেন যুদ্ধকালীন পাকিবর্বরতা। গাজী রহমান যুদ্ধকালের [illegible] বোধ করেছে। কিন্তু যখন [illegible] পারিল তখনই পারে, [illegible] সেকেই [illegible] করছে। '১৯৭১ সালের [illegible] পূর্বাঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর [illegible] তাঁকে পাকিস্থানে [illegible] সে সময় [illegible] ছিল যে, বঙ্গবন্ধু [illegible] এবং সেকেই আসেন: [illegible] গেরিলা করবার [illegible] করছেন। গাজী রহমান [illegible] জানেন না যে, বঙ্গবন্ধু [illegible] প্রেফতার এড়িয়ে গেরিলা বাহিনী [illegible] পরিচালনা করছেন- এটা মনে করে নৌকার মাঝি গাজী রহমানের চিত্রিত করে। উপন্যাসে আছে: "বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হয়েছেন এ খবরটার জন্য গাজী রহমান সে রোকাই মনে করে ও স্থির করেছে ছাড়ে না। সে বলে, 'হাজার, লক্ষ লিখাপড়া মানুষ এ ঘরে আসে না' এই সংলাপেই বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার ছিলেন এবং তাঁর ওপর আবাল বৃদ্ধের আস্থা ছিল পর্বতের মতো অটল। তদুপরি কারণে পেয়ে শিক্ষিত গাজী রহমানের স্বপ্নজগতে প্রবেশ ঘটে। যদু পণ্ডিত রহমান জল্লাদের হত্যাযজ্ঞে হলেও আসলে যুদ্ধকালীন বাংলাদেশ ও জল্লাদের হত্যাগৃহ এখানে সমার্থক হয়ে ওঠে। জল্লাদগৃহ থেকে যদু পণ্ডিত বাঁচতে চান গাজী! তন্ত্রা ছুটে যায় তার। তখন অবশ্য সে নিজেই নিজেকে নিরাপদ আশ্রয়ে। এই উপন্যাসে পরবর্তী মন্বন্তরের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়াও রেজা আলী, রানদাই সেন কিরণ রায় প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র মাত্র এই উপন্যাসে।

দুই সৈনিক :
শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাস 'দুই সৈনিক' প্রকাশ হয় ১৯৭৩

সৈনিক' উপন্যাস। প্রত্যক্ষযুদ্ধবিবর্জিত উপন্যাসে যে বাস্তবতা ফুটে উঠেছে এতে যতোটা সমাজসত্তা রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে রাজনৈতিক আদর্শগত চেতনা। পাকিস্তানপন্থী 'মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান' হাজি মখদুম মৃধা ইসলাম বিপন্নতার কথা বলে মূলত পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে চায়। সে কৌশলে প্রচার করে কমিউনিস্ট, আওয়ামী লীগের লোকজন, হিন্দুরা আর ভারত হলো পাকিস্তানের শত্রু। ২৫শে মার্চের রাতের পর মখদুম হাজির আসল রূপ প্রকাশ পায় এবং সে সরাসরি বাঙালিদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, পাকবাহিনীকে ফেরেস্তা বলেও প্রচার করে সে। সায়ীদ মাতব্বর মখদুম মৃধার সহচর ও সমমানসিকতা সম্পন্ন। সে-ও বাঙালি হয়ে পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করে। চেয়ারম্যান মখদুম হাজিকে সে বলে: 'মৃধাসাব, দ্যাশে ইসলামী আর কিছু থাইকব না, এই আওয়ামী লীগ যদি শাসন চালায়। হিঁদু রবি ঠাকুররে নিয়া কী মাতামাতি! ওতবা, নাইজোবিল্লাহ। তৌবা।' মখদুম হাজি এতোটাই পাকিস্তানপন্থী ছিল যে, গ্রামে পাকবাহিনী টহল দেবার সময় সে নিজ বাড়িতে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। শুধু তাই নয়, নিজকন্যা সাহেলী ও চামেলীকে দিয়ে মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজকে খাবার পরিবেশন করায় সে। শহরে থেকে লেখাপড়া করার কারণে সাহেলী ও চামেলী আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও দেশ স্বাধীন করার আন্দোলন সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত ছিল। বলা চলে, পাকিস্তানপন্থী পিতার সন্তান হয়েও তারা মুক্তিযুদ্ধপন্থী। অবশ্যই এমন উদাহরণ সে সময় প্রচুর ছিল। উপন্যাসে দেখা যায়, মখদুম হাজির বাড়িতে খাদ্যগ্রহণের আগে প্রচুর মদ্যপান করে পাকিস্তানী সৈন্যরা। এক পর্যায়ে মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজ মখদুমের কন্যাদ্বয়কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং মখদুম হাজি তাতে সম্মতও হয়। কিন্তু বিয়ের আগে সে বর দ্বয়ের পিতাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মেজর ও ক্যাপটেন তৎক্ষণাৎ সাহেলী ও চামেলীকে বিয়ে করতে চায়। মখদুম হাজি বুঝতে পারে, এটা বিয়ে নয়, বিয়ের নামে সংযোগ। এবার তার পিতৃহৃদয় জাগ্রত হয় এবং সে এর বিরোধিতা করে। কিন্তু তার বিরোধিতায় কোনো কাজ হয় না। চোখের সামনে অপহৃত হয় তার দুই কন্যা। তার তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে পিতা ও পাকিস্তানের সেবক বলে পরিচিত হাজি মখদুম মৃধা। এই উপন্যাসে মখদুম মৃধার মায়ের চরিত্র আছে, নাম 'বুড়ি বিবি'। চরিত্রটি সবল নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেকের ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের নামে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, যারা নারীদের অসম্মান করেছে বা ভূমি দখল করেছে তাদের উদ্দেশে বলানো হয়েছে: 'পাকিস্তান বানাইছিলি না? তহন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতিস অমন দুএকড়া হয়। অহন দ্যাখ আল্লার ইনসাফ আছে কি না।' পাকবাহিনীর মেজর হাকিম ও ক্যাপটেন ফৈয়াজ এই দুইজনকে অবলম্বন করেই উপন্যাসের নামকরণ 'দুই সৈনিক'। শওকত ওসমান এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বহু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনাংশ উল্লেখ করেছেন মাত্র।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থের নাম কী?

উ : প্রবন্ধ : সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (১৯৮৫), মুসলিম মানসের রূপান্তর (১৯৮৬)। উপন্যাস : ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০), জাহান্নম হইতে বিদায় (১৯৭১), দুই সৈনিক (১৯৭৩), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), রাজসাক্ষী (১৯৮৫), জলাংগী (১৯৮৬), পুরাতন খঞ্জর (১৯৮৭)। গল্প: পিঁজরাপোল (১৩৫৮), জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৩৫৯), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), উত্তশৃঙ্গ (১৩৭৫), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৭৪), জন্ম যদি তব বঙ্গে (১৯৭৫), প্রতিদ্বন্দ্বী (১৯৯০) ইত্যাদি। নাটক : আমলার মামলা (১৯৪৯), ওস্তর ও লস্কর (১৯৫৩), বাগদাদের কবি (১৩৫৯), পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা (১৯৯০)। শিশুতোষ : গুটেন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), তারা দুই জন (১৯৪৪), ফুলে সোশালিস্ট (১৯৭৩)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), একুশে পদক (১৯৮৩), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৯১)।

প্র : কোন গ্রন্থের জন্য তিনি ফিলিপস পুরস্কার লাভ করেন?

উ : 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পগ্রন্থের জন্য।

প্র : শওকত ওসমানের কালোত্তীর্ণ উপন্যাস কোনটি? এর ধরন কী?

উ : ক্রীতদাসের হাসি। প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস।

প্র : জননী ও ক্রীতদাসের হাসির ইংরেজি অনুবাদ কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উ : ওসমান জামালকৃত জননী (ইংরেজিতেও একই নাম রাখা হয়েছে) অক্সফোর্ড (১৯৯৩) ও কবীর চৌধুরীকৃত এ স্লেভ লাকস (১৯৭৬) দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৯৮ সালের ১৪ই মে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৩ই ভাদ্র ১২৮৩, হুগলির দেবানন্দপুর গ্রামে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : অপরাজেয় কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?

উ : মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : তিনি ভাগলপুর দুর্গাচরণ এম.ই স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৮৭), টি.এন. জুবলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস (১৮৯৪), এরপর দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া চলে নি।

প্র : তিনি কত সালে জীবিকার তাগিদে রেঙ্গুনে গমন করেন?

উ : ১৯০৩ সালে।

প্র : শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম কী?

উ : মন্দির।

প্র : তিনি 'মন্দির' গল্পের জন্য কোন পুরস্কার লাভ করেন?

উ : কুন্তলীন পুরস্কার (১৯০৩)।

প্র : 'ভারতী' পত্রিকায় কোন উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্য খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে?

উ : বড়দিদি (১৯০৭)।

প্র : শরৎচন্দ্র এক মহিলা নামেও লিখেছেন, সেটি কী?

উ : অনিলা দেবী। (দ্র. নারীর মূল্য)

প্র : তাঁর কথাসাহিত্যে কোন দিকটি উজ্জ্বলভাবে রূপায়িত হয়েছে?

উ : গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি।

প্র : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোন সংঘাতের চিত্র অসাধারণভাবে শিল্প কুশলতার সঙ্গে অঙ্কিত?

উ : মানুষের অন্তরে তার ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস-সংস্কারের সঙ্গে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব।

প্র : কোন উপন্যাসটিকে লেখকের আত্মজৈবনিক বলা হয়?

উ : শ্রীকান্ত।

প্র : শ্রীকান্ত কত খণ্ড?

উ : ৪ খণ্ড। প্রকাশ : ১৯১৭, ১৯১৮, ১৯২৭, ১৯৩৩।

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য উপন্যাসগুলোর নাম কী?

উ : পরিণীতা (১৯১৪), বিরাজ বৌ (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), পল্লী সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস (১৯৩৫) ইত্যাদি।

প্র : 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এর চারটি খণ্ড। ১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য় খণ্ড ১৯১৮, ৩য় খণ্ড ১৯২৭, ৪র্থ খণ্ড ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ড মাসিক 'ভারতবর্ষে' (১৯১৬-'১৭) 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী' নামে প্রকাশ পায়। লেখকের নাম মুদ্রিত হয় 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা'। ২য় ও ৩য় খণ্ড 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ পায়। তবে ৪র্থ খণ্ড প্রথমে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। ১ম খণ্ডে বালক শ্রীকান্তের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন। খণ্ডটি যখন শেষ হয় তখন শ্রীকান্তের মনে হলো : 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' এই খণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী (পিয়ারী)। ২য় খণ্ডে যুবক শ্রীকান্তের রেঙ্গুন যাত্রার জীবন উপস্থাপনা আছে। এই অংশে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর আত্মিকতা অন্যদের সম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এইখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, অভয়া, রোহিণী, বজ্রানন্দ, রাজলক্ষ্মী। ৩য় খণ্ডে অসুস্থ শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর শুশ্রূষায় সুস্থ হলেও তাদের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শ্রীকান্ত তাই রেঙ্গুনে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। যাবার আগে রাজলক্ষ্মীর কাছে বিদায় নিতে এসে দেখে রাজলক্ষ্মীর সন্ন্যাসিনীর বেশ। এখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, বজ্রানন্দ, সুনন্দা, কুশারী, রাজলক্ষ্মী। ৪র্থ খণ্ডে শ্রীকান্তের সঙ্গে পুঁটুর বিয়ের দিন ধার্য, রাজলক্ষ্মীর সন্ন্যাসিনীর বেশ ত্যাগ করে সাধারণ পোশাক গ্রহণ, কমললতা কর্তৃক শ্রীকান্তকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত ও মৃত্যুপথযাত্রী গহরকে সেবা করার কাহিনি আছে। উপন্যাসটি শেষ হয় কমললতার নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে। এখণ্ডের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : শ্রীকান্ত, ঠাকুর্দা, পুঁটু, গহর, কমললতা, রাজলক্ষ্মী।

প্র : 'শ্রীকান্ত' প্রথম খণ্ড (১৯১৭) উপন্যাসের সূচনা 'বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'-এর বর্ণনা দিয়ে। এ নিয়ে শরৎচন্দ্রের অনেক বিরূপ সমালোচনা করা হয়। প্রকৃত ঘটনা কী?

উ : শরৎচন্দ্র বাস্তবনিষ্ঠ লেখক। বাস্তবতার হুবহু অনুকৃতি তাঁর লেখার প্রাণ। বাস্তবতা উদ্ঘাটনের ক্ষমতায় [illegible] মুসলিমদের তিনি খুশি করেন নি, 'বাঙালি ও মুসলমান' ছাত্রদের ফুটবল [illegible] বাস্তবতা অনুসরণ [illegible] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও [illegible] জবাব দিয়েছেন। [illegible] তিনি বুঝতে [illegible] 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে (১৯১৭) [illegible] লিখেছেন [illegible] অবিভক্ত বাংলার সামাজিক [illegible] বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমানদের [illegible] আর হিন্দু [illegible] বাঙালি মুসলমানদের নিজেদের বাঙালি না ভেবে আরব-ইরান-তুরানের [illegible] ভাবতে ভালোবাসত, [illegible] মনোভাব বর্তমান কালের [illegible] শেষ হয়ে যায় নি। শরৎচন্দ্র এই [illegible] সত্যের বিশ্বস্ত উপস্থাপন করেছেন মাত্র। এছাড়া এ বিষয়ে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রথম কিস্তির এই খণ্ড [illegible] পটভূমিকায়। তৎকালীন ভাগলপুরের মুসলিমরা প্রকৃতই বাঙালি ছিল না, অধিকাংশই উর্দুভাষী, কিছু কিছু ছিল খোট্টা। আর অধিকাংশ হিন্দু ছিল বাঙালি হিন্দু। ফলে শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় এই সামাজিক সত্যটির চারাপাত অসঙ্গত নয়, অস্বাভাবিক নয়।' (সূত্র : কথাসাহিত্যে বাস্তবতা : শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ ১২৭)।

প্র : 'অনুরাধা সতী ও পরেশ' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'অনুরাধা সতী ও পরেশ' (১৯৩৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত তিনটি গল্পের সংগ্রহ। 'অনুরাধা' ভারতবর্ষে, 'সতী' বঙ্গবাণীতে এবং 'পরেশ' 'শরতের ফুল' নামক সাময়িকীর পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। তিনটি রচনারই বিষয় প্রেম এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব। 'সতী' গল্পটি শরৎচন্দ্রের ব্যতিক্রম। এক সতীসাধ্বী কিন্তু [illegible] স্ত্রী এই কাহিনির নায়িকা। [illegible]

প্র : [illegible] উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : [illegible] হিন্দু ও ব্রাহ্ম [illegible] করে প্রকাশিত হয়েছে।

প্র : 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকায় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। [illegible] প্রেম ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক [illegible] এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এক নতুন আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। সতীশ ও সাবিত্রী, দিবাকর ও কিরণময়ীর [illegible] এবং সর্বমান সমাজ অনুমোদিত সম্পর্ক [illegible] উপন্যাসের নামকরণ তাই 'চরিত্রহীন'।

প্র : 'গৃহদাহ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'গৃহদাহ' (১৯২০) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। মাসিক 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। মহিম ও সুরেশ দুই পুরুষের প্রতি অচলার দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য। বিবাহ-বহির্ভূত [illegible] দাম্পত্যিক প্রেমের জটিলতা নিপুণ দক্ষতা সহকারে ও বর্ণনায় মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় তা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র হিন্দু বিধবা মৃণালকে আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করেছেন।

প্র : [illegible] উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : [illegible]

প্র : [illegible] উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : [illegible]

প্র : [illegible] উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : [illegible] (১৯২৬) [illegible] এই উপন্যাস [illegible] (১৯২৮) নামে [illegible] হয়।

প্র : 'দেবদাস' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'দেবদাস' (১৯১৭) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। [illegible] দেবদাস [illegible] পার্বতী [illegible] প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে চিত্রিত করেছে। [illegible] চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। ২০০৪ সালে হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বিশ্বব্যাপী সাড়া

জমায়। এর পরিচালক হিসেন সঞ্জয় লীলা ভংশালী। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র : দেবদাস, পার্বতী (পারু), চন্দ্রমুখী, চুনিলাল, ধর্মদাস। চলচ্চিত্রে পার্বতী চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই, চন্দ্রমুখী চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত, দেবদাস চরিত্রে শাকখ খান অভিনয় করেন।

প্র : 'নারীর মূল্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'নারীর মূল্য' (১৯২৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত নারীর সামাজিক অধিকার ও সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কিত মূল্যবান নিবন্ধ গ্রন্থ। 'অনিলা দেবী' ছদ্মনামে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। অনিলা দেবী শরৎচন্দ্রের বড়দিদির নাম।

প্র : 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ক্ষুদ্র উপন্যাস। এর প্রথমাংশ 'ঘরজামাই' নামে 'যমুনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও শেষ পর্যন্ত সম্প্রীতি এই কাহিনির উপজীব্য। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : গিরিশ, রমেশ, সিদ্ধেশ্বরী, শৈলজা প্রমুখ। ১৯৪৪ সালে Deliverance নামে দিলীপকুমার রায়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

প্র : 'পথের দাবী' কোন ধরনের উপন্যাস?

উ : 'পথের দাবী' (১৯২৬) রাজনৈতিক উপন্যাস। স্বদেশি বিপ্লবীদের হাতে হাতে থাকত। কাহিনির পটভূমিকা ব্রহ্মদেশ। এক গুপ্ত বিপ্লবী দলের নায়ক সব্যসাচী এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। কারো কারো মতে সব্যসাচী চরিত্রে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর ছায়াপাত ঘটেছে। নিঃসন্দেহে এই কাহিনিতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা এবং সশস্ত্র বিপ্লবকে আন্তরিক সমর্থন আছে। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। নান্দনিক মানদণ্ডে 'পথের দাবী' উৎকৃষ্ট সাহিত্য কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এ উপন্যাস উদ্দীপকের ভূমিকা রাখে। 'আমি বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কাম্য, আমার একটিমাত্র সাধনা।' এই বক্তব্য নিয়ে উপন্যাসের শেষে। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই গ্রন্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩২৯-এর ফাল্গুন সংখ্যা থেকে 'পথের দাবী' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

প্র : 'পল্লীসমাজ'-এর পরিচয় দাও।

উ : 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলার পল্লীজীবনের নীচতা ও ক্ষুদ্র রাজনীতির পটভূমিকায় এক আদর্শবাদী যুবক-যুবতীর সম্পর্ক ও বিশেষ করে তাদের অভিশপ্ত প্রেমকাহিনি এই উপন্যাসের মূল বিষয়। ১৯১৫ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর নাট্যরূপ 'রমা' (১৯২৮) বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রধান চরিত্র : রমা, রমেশ, বেণী, বলরাম।

প্র : শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'র পরিচয় দাও।

উ : 'বড়দিদি' (১৯১৩) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রথমে এর নাম ছিল 'শিব'। শরৎ উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ, নারীচরিত্রের সংযম ও মাধুর্য, শাস্ত্রশাসিত জীবন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে টানাপোড়েন এবং সহজ সাবলীল ভাষা-সবই এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : সুরেন্দ্রনাথ, ব্রজরাজ, মাধবী, প্রমীলা। বড়দিদি 'মাধবী'র নাম।

প্র : 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশ' এই তিনটি গল্পের সংকলন 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৪)। এই গল্পগুলি 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি গল্পে শরৎচন্দ্রের আখ্যান রচনার স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয় রচনার অন্যতম।

প্র : 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'বিরাজ বৌ' (১৯০২) জনপ্রিয় এবং সুখপাঠ্য উপন্যাস। বিরাজ, বিজয়া, রমেশ প্রভৃতি চরিত্র এবং তাদের মার্মিক সম্পর্কের জটিলতা এবং মাধুর্য, কাহিনির চমৎকারিত্ব এবং পরিণাম-রমণীয়তা এই উপন্যাসটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। প্রথম 'বিরাজ বৌ' 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাসগ্রন্থ।

প্র : 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় এবং পুস্তক আকারে দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। বাঙালি গৃহস্থ জীবনের বাস্তব ছবি এবং বাঙালি নারীর মনস্তত্ত্ব ও রূপায়ণের জন্য এই উপন্যাস রোমান্সধর্মিতা সত্ত্বেও অভিনন্দিত হয়। সুন্দরী বিরাজ বৌয়ের নানা সমস্যা এ উপন্যাসের বিষয়।

প্র : 'মেজদিদি' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'মেজদিদি' (১৯১৫) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদিদি' (১৯১৪), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৫) ও 'আঁধারে আলো' (১৯১৪) এই তিনটি গল্পের সংকলন। 'মেজদিদি' শরৎচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় রচনা। তিনটি রচনাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এই গ্রন্থে নারীর মহত্ত্বের পাশাপাশি 'স্বামীর কাছে স্ত্রীর অহংকার সাজে না' এই বক্তব্যও প্রকাশিত।

প্র : 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিতর্কপ্রধান ও সমস্যামূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের মূল উপন্যাস ধারা থেকে এটি কিছুটা পৃথক। উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র কমল। বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের দ্বারা এই চরিত্র রূপায়িত হয়েছে। কমল কোনো সংস্কার ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে না, জীবনে কোনো কিছুকেই তর্কাতীত ও শাশ্বত বলে মানে না। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের নারীচরিত্র রচনার জন্য এই উপন্যাস স্মরণীয়।

প্র : 'পথের দাবী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'পথের দাবী' (১৯২৬) প্রকাশের পূর্বে থেকে বহুবার সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাংলার বাইরে ব্রহ্মদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। ইংরেজ সরকার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'পথের দাবী' প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে এর প্রতি কড়া নজর রাখছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ত করে। ব্রিটিশ সরকার এই বইটিকে রাজদ্রোহমূলক বলে মনে করেছিল। ব্রিটিশ সরকার বইটির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বইটির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বইটির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল।

প্র : শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?

উ : শরৎ-উপন্যাসগুলির জনপ্রিয়তার যে বহুমুখী প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তা উপন্যাসগুলি থেকেই সর্বাধিক। দুটি বিষয়ে শরৎচন্দ্র সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের মতো এই সমস্ত উপন্যাসের পটভূমি বিস্তৃত। এর ফলে মুগ্ধ হয়েছে সর্বব্যাপী এবং বহুসংখ্যক পাঠক। প্রেমের অনুভূতির যে সমস্ত সমস্যাগুলিকে আঘাত করে, সমাজমনে যে সমস্যার শরৎচন্দ্রের প্রবিষ্ট, ব্যক্তিগত ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস, ব্রত, ছেলের উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র নানান ধরনে ধরা পড়েছে।

প্র : তাঁর কোন গল্পগুলো পড়া?

উ : মহেশ, বিন্দুর ছেলে, মন্দির, মামলার ফল ইত্যাদি ছোটগল্প এবং রামের সুমতি (১৯১৪), মেজদিদি (১৯১৫), বিন্দুর ছেলে (১৯১৪), চরিত্রহীন (১৯১৭), ইত্যাদি তাঁর সুখপাঠ্য বইগুলি।

প্র : বিন্দুর ছেলে গল্পে নায়ক চরিত্রের মধ্যে কার ছায়াপাত ঘটেছে?

উ : শরৎচন্দ্রের নিজের।

প্র : তাঁর কোন উপন্যাস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়?

উ : 'পথের দাবী'।

প্র : তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির নাম কী?

উ : তরুণের বিদ্রোহ (১৯২৯) এবং স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯২৩)।

প্র : শরৎচন্দ্র কোন কোন উপন্যাস মৃত্যুর পূর্বে অসমাপ্ত রেখে যান?

উ : 'শেষের পরিচয়' (ভারতবর্ষে প্রকাশিত

হয়), 'আগামীকাল' (বিচিত্রা পত্রিকায়), 'জাগরণ' (বসুমতী পত্রিকায়)। এর মধ্যে 'শেষের পরিচয়' অধিকতর বিস্তৃত ছিল।

প্র : শরৎচন্দ্র কয়টি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন?

উ : সাতটি। এগুলো হলো। অনিলা দেবী; অপরাজিতা দেবী; শ্রী চট্টোপাধ্যায়; অনুরূপা দেবী; পরশুরাম (পরশুরাম রাজশেখর বসুরও ছদ্মনাম। সাহিত্যসমাজে রাজশেখর বসুই এ নামে অধিক পরিচিত।); শ্রীকান্ত শর্মা; সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. (১৯৩৬) উপাধি লাভ। উল্লেখ্য, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মাতার নামে জগত্তারিণী পদক প্রবর্তন করেন।

প্র : তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : কলকাতা; ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮; ২রা মাঘ ১৩৪৪।

'অতিথির স্মৃতি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটির লেখক প্রদত্ত নাম কী?

উ : 'দেওঘরের গল্প'।

প্র : 'রেঙ্গুন' কোথায় অবস্থিত?

উ : বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মায়ানমার দেশের রাজধানী ইয়াংগুন। ইয়াংগুনকে আগে রেঙ্গুন বলা হতো।

প্র : 'ভাগ্যান্বেষণে' অর্থ কী?

উ : অর্থ রোজগার ও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে।

প্র : শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন বা ইয়াংগুনে কোন সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন?

উ : ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : 'দেওঘর' কোথায় অবস্থিত?

উ : ভারতে। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের (আগে বিহার রাজ্যের) সাঁওতাল পরগণা বিভাগের একটি জেলার নাম দেওঘর।

প্র : দেওঘর কেন বিখ্যাত?

উ : এখানে বিখ্যাত বিদ্যানাথ শিব মন্দির আছে। হিন্দুদের কাছে নমস্য ৫১ তীর্থপীঠের একটি এই দেওঘর। পাহাড়ি এলাকা বলে অনেকে অবকাশযাপন করতেও আসেন।

প্র : দেওঘর আর কী কী নামে পরিচিত?

উ : বিদ্যানাথ ধাম, বাবা ধাম ইত্যাদি।

প্র : 'দেওঘর' কী ধরনের শব্দ?

উ : হিন্দি।

প্র : দেওঘর-এর আভিধানিক অর্থ কী?

উ : দেব-দেবীদের গৃহ।

প্র : ব্যাধ কাদের বলে?

উ : পশুপাখি শিকার করে জীবনযাপনকারী এক দল মানুষ। এরা বংশ পরম্পরায় এই পেশায় নিয়োজিত থাকে।

প্র : এ যুগেও কি ব্যাধ আছে?

উ : আছে– তবে এর মাত্রা বদলেছে। বিল বা হাওড় থেকে পাখি শিকারকারী, অতিথি পাখি নিধনকারী বা সুন্দর বনে হরিণ হত্যাকারীদের আধুনিক ব্যাধ বলা যায়।

প্র : মধ্যবিত্ত কাদের বলে?

উ : সাধারণত ধনসম্পদের বিচারে মানুষকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যাদের প্রচুর টাকা আছে তারা উচ্চবিত্ত, যাদের ঘরে টাকার জন্য অভাব লেগেই থাকে তারা নিম্নবিত্ত আর যারা অভাবে থাকে না কিন্তু টাকা উদ্বৃত্তও রাখতে পারে না– কোনো মতে দিন অতিবাহিত করে, তাদের মধ্যবিত্ত বলে।

প্র : বামুনঠাকুর কে?

উ : রান্নাকারী বা পাচক।

প্র : 'ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালালো।'– বাক্যটি দিয়ে শরৎচন্দ্র কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উ : শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুকুরকে মানুষ তুচ্ছজ্ঞান করলেও তার অনুভূতি

আছে। লেখকের ঘরের দরজায় যে কুকুর নিশ্চিন্তে আগমন করে সে কুকুরই চাকরবাকরদের আগমনে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কারণ এই চাকরবাকরেরা তাকে প্রত্যহ প্রহার করে, খাদ্য প্রদান করে না। 'হয়ত, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।'– এটি কোন ধরনের বাক্য? এই বাক্য দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : এটি বিস্ময়সূচক বাক্য। এই বাক্যটি দাঁড়ি (।) দিয়ে সমাপ্ত করলে এর প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পেত না। এই বাক্যে কুকুরের মতো আপাত তুচ্ছ জীবের মমত্ববোধের মাত্রা প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে বকশিশ পেয়েই চাকরেরা ফিরে গেছে, সেখানে কোনো রকমের প্রতিদানের আশা না করে একটি আপাত তুচ্ছ প্রাণী এসেছে রেলস্টেশন অবধি এবং রেলগাড়ি চলে যাবার পরও পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। প্রাণীকুলে বিষয়-সম্পর্কের বাইরেও যে মনোগত সম্পর্ক আছে, এই গল্প তার প্রমাণ।

প্র : 'অতিথির স্মৃতি'র মতো আর অন্তত দুটো গল্পের নাম লেখ।

উ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী' এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালা পাহাড়'।

প্র : 'বেরিবেরির আসামি' বলা হয়েছে কেন?

উ : গল্পে বেরিবেরি রোগীদের পা ফোলার কথা আছে। পা ফুলে গেলে চলাচল শ্লথ হয়ে যায়। আসামিদের চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য পায়ে শেকল বা বেড়ি পরিয়ে দেয়া হয়। বেরিবেরির সঙ্গে বেড়ির ধ্বনিগত সাদৃশ্যও আছে। তাই লেখক আলঙ্কারিক কারণে রোগীদের বেরিবেরির আসামি বলেছেন। এটা তাদের প্রতি লেখকের কোনো শ্লেষ নয়, তাঁর শিল্পীসুলভতার প্রকাশ।

প্র : ক্ষুধা আহরণ কী?

উ : 'ক্ষুধামান্দ্য' বলে একটি রোগ আছে। এ রোগে আক্রান্তদের আহারে প্রবৃত্তি হয় না বা খেতে ইচ্ছে করে না। হজম শক্তিও কমে যায় তাদের। এ রোগের রোগীদের জন্য ডাক্তার ঔষধের সঙ্গে পরামর্শ দেন কারিক পরিশ্রম করার বা হাঁটার। এই গল্পে ক্ষুধা আহরণ বলতে হাঁটা বা ভ্রমণ শেষ অর্থে বোঝান হয়েছে।

প্র : নেমন্তন্ন কী ধরনের শব্দ?

উ : অর্ধ-তৎসম শব্দ। মূলশব্দ নিমন্ত্রণ।

প্র : 'প্রত্যুত্তর'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : প্রতি+উত্তর।

প্র : 'খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত'– বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

উ : কোনো খাওয়াতেই আপত্তি নেই এবং প্রচুর খায়।

প্র : 'মালির বউ' কে কী বলা হয়?

উ : মালিনী।

প্র : 'খবরদারি' কী?

উ : তত্ত্বাবধান বা দেখাশোনা।

প্র : 'খবরদারি' কোন শব্দ থেকে এসেছে?

উ : 'খবর' শব্দ থেকে। (খবর+দার+ই)

প্র : 'খবর' কোন শব্দ?

উ : আরবি শব্দ।

প্র : 'সুমুখে' কোন ধরনের শব্দ?

উ : তদ্ভব শব্দ। মূলশব্দ 'সম্মুখে'।

প্র : ফটক কী?

উ : সদর দরজা বা মূল গেট।

প্র : 'ফটক' কী শব্দ?

উ : হিন্দি।

প্র : 'মধ্যাহ্ন' বানানে কোন 'ন' আছে?

উ : 'ন'। বানান সতর্কতা: পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ। পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ বানানে 'ণ' আর মধ্যাহ্ন বানানে 'ন' আছে (ণ-ত্ব বিধি অনুসারে)।

শহীদ কাদরী

প্র : শহীদ কাদরী কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪২ সালের ১৪ই অগস্ট, কলকাতায়।

প্র : তিনি মূলত কী?

উ : স্বাধীন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আধুনিক কবি।

প্র : শহীদ কাদরী কোথায় ছিলেন?
উ : শহীদ কাদরী কলকাতার পাকাপাটে অবস্থান করেন। ১৯৭২ সালের আগে তিনি সেখানেই লেখালেখা শুরু করেন। এরপর ঢাকায় এসে বসবাস করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বিদেশে চলে যান। অবশেষে এসে শেষে আমেরিকায় স্থির হন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ঢাকায় সমাধিস্থ করা হয়।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী কী?
উ : কবিতা : উত্তরাধিকার (১৯৬৭), তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা (১৯৭৪), কোথাও কোন ক্রন্দন নেই (১৯৭৮), আমার চুমকুড়ি পৌষ মাস (২০০৭)।

প্র : 'উত্তরাধিকার' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : বাংলা কবিতার পঞ্চাশ দশকের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা ও সফলতা লেখা হয় শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরাধিকার'-এ (১৯৬৭)। এতে ৪০টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তিনি নৃশংসতা বন্ধকে দেখেছেন প্রবল অন্তরঙ্গে, মননের শাসনে ও আবেগের প্রাবল্যের যৌথ প্রস্তাবে। বাংলাদেশের বাংলা কবিতা সত্যিকার অর্থেই আধুনিকতার মুক্তাঙ্গনে হয় তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩)।

প্র : শহীদ কাদরী কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১৬ সালের ২৮শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে মারা যান।

শহীদুল জহির

প্র : শহীদুল জহির কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৫৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ঢাকায়।

প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : মো. শহীদুল হক।

প্র : তিনি কোন জেলার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন?
উ : সিরাজগঞ্জের।

প্র : কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর হন?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায়।

প্র : তিনি শেষ অবধি কোথায় কর্মরত ছিলেন?
উ : পার্বত্যচট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তাবেদার সচিব (অতিরিক্ত সচিব)।

প্র : শহীদুল জহির কী হিসেবে পরিচিত?
উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : শহীদুল জহির রচিত পাঁচটি উপন্যাসগুলোর নাম কী?
উ : পাঁচটি উপন্যাস : শারাপার (১৯৮৫); উপরতলার মানুষ ও অন্যান্য গল্প (২০০০); হাড় হাভাতে ও অন্যান্য গল্প (২০০৬)।
উপন্যাস : জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮); সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৮), মুখের দিকে চেয়ে দেখি (২০০৬)।

প্র : 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাস সম্পর্কে কী বলা যায়?
উ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি ভিন্নমাত্রার উপন্যাস। টানাপোড়েন থেকে প্রবন্ধের বই বলে অনেকে ভুলও করে পারেন। গতানুগতিক উপন্যাসের ধরন নেই। নিরীক্ষা আছে। সেদিন গুরুত্বপূর্ণ পর এ অঞ্চলের উপন্যাসে অন্তর্ভুক্তের এতো বেশি প্রচার আর কারো উপন্যাসে নেই। একই সঙ্গে মাজিক রিয়েলিজম ও জাদু বাস্তবতার উত্তরাধুনিক চেতনার সংমিশ্রণ আছে। উপন্যাসটি বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চেয়েও এতে দর্শনের প্রয়োগ ও কর্মের নতুনত্বের কারণে।

প্র : তিনি কবে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : মাত্র ৫৫ বছর বয়সে ২৩শে মার্চ ২০০৮, ঢাকায়।

শহীদুল্লা কায়সার

প্র : শহীদুল্লা কায়সারের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭; ফেনিতে।

প্র : শহীদুল্লা কী হিসেবে পরিচিত?
উ : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

প্র : তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থের নাম কী ছিল?
উ : তাঁর প্রথম গ্রন্থ নেতাজীর জন্মদিনে।

প্র : তাঁর লিখিত নাটকের নাম কী ছিল?
উ : তাঁর লিখিত নাটক একটি।

প্র : তাঁর রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
উ : তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

প্র : তিনি কোন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন?
উ : ষাটের দশকে পেশিশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

প্র : তিনি কোন দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
উ : তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল (জেএসডি) গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : তিনি পাক্ষিক গণদাবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্র : তিনি কোন সালে নিহত হন?
উ : ১৯৭১ সালে।

প্র : কত সালে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন?
উ : ১৯৫২ সালে।

প্র : তিনি প্রথম কত সালে গ্রেফতার হয়ে জেলে যান?
উ : ১৯৫২ সালে।

প্র : তিনি কোন পত্রিকায় যোগদানের মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন?
উ : সাপ্তাহিক ইত্তেফাক (১৯৪৯)।

প্র : তিনি কত সালে দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন?
উ : ১৯৫৮ সালে।

প্র : তিনি কোন শিরোনামে উপসম্পাদকীয় রচনা করেন?
উ : 'রাজনৈতিক পরিক্রমা', 'বিচিত্র কথা'।

প্র : তাঁর উপন্যাসে বাঙালি জীবনের কোন দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত?
উ : বাঙালি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামী চেতনা।

প্র : তিনি কোন দুটি উপন্যাস লিখে খ্যাত হন?
উ : সরে বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)।

প্র : 'সংশপ্তক' উপন্যাসের পটভূমি কী?
উ : 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) উপন্যাসের পটভূমি ১৯৬২ সালের পাকিস্তান বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর মূল চরিত্র আজাদ। আজাদ সাহসী ও দৃঢ়চেতা যুবক। সে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ১৯৬২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে পুলিশ হানা দিলে আজাদ পালিয়ে যায়। সে আত্মগোপনে থাকে। এ সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয় মিনুর। মিনু ও আজাদ একে অপরকে ভালোবাসে। আজাদ, মতিউর, মিনু, রাশেদা সবাই পরিচিত ছাত্র-ছাত্রী। তারা সবাই মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। আজাদ গ্রেফতার হয়ে জেলে যায়। সে জেলে বসে ডায়েরি লেখে। জেলে বসে সে জানতে পারে মিনু ও রাশেদা বিয়ে করেছে। আজাদ মুক্তি পেয়ে মিনুর সঙ্গে দেখা করে। মিনু তাকে জানায় যে, সে আজাদকে ভালোবাসে। আজাদ মিনুকে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে। আজাদ মিনুকে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে। আজাদ মিনুকে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে।

প্র : 'সংশপ্তক' উপন্যাসের পটভূমি কী?
উ : 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) উপন্যাসের পটভূমি ১৯৬২ সালের পাকিস্তান বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর মূল চরিত্র আজাদ। আজাদ সাহসী ও দৃঢ়চেতা যুবক। সে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। ১৯৬২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসে পুলিশ হানা দিলে আজাদ পালিয়ে যায়। সে আত্মগোপনে থাকে। এ সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয় মিনুর। মিনু ও আজাদ একে অপরকে ভালোবাসে। আজাদ, মতিউর, মিনু, রাশেদা সবাই পরিচিত ছাত্র-ছাত্রী। তারা সবাই মিলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। আজাদ গ্রেফতার হয়ে জেলে যায়। সে জেলে বসে ডায়েরি লেখে। জেলে বসে সে জানতে পারে মিনু ও রাশেদা বিয়ে করেছে। আজাদ মুক্তি পেয়ে মিনুর সঙ্গে দেখা করে। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে। আজাদ মিনুকে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে। আজাদ মিনুকে বিয়ে করতে চায়। মিনু তাকে জানায় যে, সে রাশেদাকে ভালোবাসে।

দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিকভাবেই উপন্যাসে এসেছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্র : রাবেয়া খাতুন (রানু), জাহেদ, সেকেন্দার, মালু, হরমতি, লেকু, রমজান, রামদয়াল ইত্যাদি। এ উপন্যাসে বাংলার জনগণ সংশপ্তকের মতো সর্বদা সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ও মনুষ্যত্ব রক্ষায় সংগ্রামশীল।

প্র : 'রাজবন্দীর রোজনামচা' নামক তাঁর স্মৃতিকথা কবে প্রকাশিত হয়?

উ : ১৯৬২ সালে।

প্র : তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম কী?

উ : 'পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ' (১৯৬৬)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : আদমজি পুরস্কার (১৯৬২), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২) (দুটোই সারেং বৌ উপন্যাসের জন্য)।

প্র : তিনি কত সালে কিভাবে নিখোঁজ হন?

উ : ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যগণ তাঁর ঢাকার কায়েতটুলির বাসভবন থেকে তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শামসুজ্জামান খান

প্র : শামসুজ্জামান খান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার নারিন্দায়ে।

প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?

উ : মা শামসুন্নাহার খানম; বাবা আবদুর

খ্রিষ্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় সম্মানসহ স্নাতক, ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

প্র : কর্মসূত্রে তিনি কোথায় কোথায় সংযুক্ত ছিলেন?

উ : ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিক্রমপুর হরগঙ্গা কলেজের প্রভাষক, সেখান থেকে আসেন জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে, থাকেন ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। জগন্নাথ কলেজ থেকে যোগ দেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে চলে আসেন বাংলা একাডেমির উপপরিচালক পদে। পরে তিনি জাতীয় জাদুঘর ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হন।

প্র : তিনি কোন কোন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হন?

উ : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমি।

প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনগুলো?

উ : প্রবন্ধসমগ্র: নানা প্রসঙ্গ (১৯৮৩), গণসংস্কৃতি (যৌথ : ১৯৮৫), মাটি থেকে মহীরুহ (১৯৯৯), বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলাপ ও প্রাসঙ্গিক কথকতা (১৯৯৫), ফোকলোরচর্চা (২০০৩); রম্য-রচনা: ঢাকাই বঙ্গবাসিকতা (২০০১), গ্রামবাংলার বঙ্গবাসিকতা (২০০৪), গ্রামবাংলার রঙ্গ গল্প (২০০৬); শিশু-সাহিত্য: দুনিয়া মাতানো নিখকাপ (১৯৮৭)।

প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হন?

উ : অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৭), কালুশাহ

হয়। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি অনুষদ। আগে এটি কলেজ ছিল, পরে ছিল ইন্সটিটিউট।

প্র : মঙ্গল শোভাযাত্রা কী?

উ : শোভাযাত্রা অর্থ সুন্দর করে সেজে, বহু বর্ণিল আয়োজনে মিছিল করা। মানুষের মঙ্গল কামনা করে যখন এমন মিছিল করা হয় এবং সেখানে গান, বাদ্য, আনন্দ-উল্লাস থাকে তখন তাকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বলে।

প্র : 'আবহমান' কী?

উ : 'আ' একটি উপসর্গ। 'আ' দিয়ে বোঝায় দীর্ঘতর কিছু বা পর্যন্ত। যা দীর্ঘ দিন ধরে 'বহমান' তাই 'আবহমান'।

প্র : 'ঐতিহ্যগত'-এর প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?

উ : ইতিহাস + ইক্ (বা সংস্কৃত ষ্ণিক)।

প্র : 'পঞ্জিত'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : পত্র + ইত (জাত অর্থে)।

প্র : আকবর কে ছিলেন?

উ : ভারতের তৃতীয় মোগল সম্রাট।

প্র : আকবরের সম্পূর্ণ নাম কী?

উ : জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর।

প্র : আকবরের জন্ম-মৃত্যু সন কত?

উ : জন্ম: ১৪ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দ; মৃত্যু: ২৭শে অক্টোবর, ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

প্র : আকবর কত দিন দিল্লির সম্রাট ছিলেন?

উ : ৪৯ বছর ২৭৩ দিন। (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি সিংহাসনে আরোহন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন।)

প্র : হিজরি সন কী?

উ : 'হিজরি' আরবি শব্দ; এসেছে 'হিজরত' বা গমন থেকে। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৬২২ বছর পরে হজরত মুহম্মদের মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমনের (হিজরতের) রাত থেকে যে বছর বা সন গণনা করা হয় সেটাই বিশ্বে (মূলত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে) হিজরি সন হিসেবে পরিচিত।

প্র : হিজরি কী ধরনের সন?

উ : চান্দ্র সন। চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে এই সন গণনা করা হয়।

প্র : সূর্য দেখার ওপর ভিত্তি করে যে সন গণনা করা হয়, তাকে কী বলে?

উ : সৌর সন।

প্র : 'দিন-ই-ইলাহি' কী?

উ : ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর 'দিন-ই-ইলাহি' নামে একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন, সব ধর্মেই মহৎ চিন্তা আছে। শুধু এই মহৎ চিন্তাগুলো একত্রিত করে একটি ধর্মমত দাঁড় করানো যেতে পারে। একেই তিনি নাম দিয়েছিলেন 'দিন-ই-ইলাহি'। ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ফতেহপুর সিক্রিতে 'এবাদতখানা' (প্রার্থনাগৃহ) নামে একটি বিশাল ঘর নির্মাণ করেন। এখানে সবধর্মের লোকেরা প্রার্থনা করার সুযোগ পায়।

প্র : 'ইলাহি সন' কী?

উ : আকবর 'দিন-ই-ইলাহি' প্রবর্তন করার পর (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) একই বছর তৎকালে প্রচলিত চান্দ্র সন হিজরির বদলে সারা ভারতে যে নতুন সৌর সন চালু করেন তাকেই বলা হয় 'ইলাহি সন'।

প্র : 'ইলাহি সন' বাংলায় আছে কী?

উ : অনেকে মনে করেন, এই 'ইলাহি সনই বঙ্গ অঞ্চলে 'বাংলা সন' বা 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিতি পায়। ভারতের অন্যত্র এই সন গণনা ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়।

প্র : 'পুণ্যাহ' কী?

উ : নবাবি ও জমিদারি যুগে বৎসরের সূচনায় প্রজাদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খাজনা আদায়ের অনুষ্ঠানকে পুণ্যাহ বলা হতো।

প্র : 'পুণ্যাহ'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

উ : পুণ্য + অহ।

প্র : 'অহ' অর্থ কী?

উ : দিবস বা দিন।

প্র : 'হালখাতা' কী?

উ : নববর্ষের একটি অনুষ্ঠান।

প্র : 'হালখাতা' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

উ : আরবি শব্দ 'হাল' অর্থ বর্তমান, আর আরবি শব্দ 'খত্' থেকে ফার্সি 'খাতা'- যার অর্থ লিখিত পত্র বা এমন কিছু। 'হালখাতা' বলতে বর্তমান পত্র বা বর্তমান খাতা বোঝায়।

প্র : 'হালখাতা' কোন সমাস?

উ : খাতা হাল করা হয় যে অনুষ্ঠানে- অনুক বহুব্রীহি। (কারণ, এখন 'হালখাতা' একটি

অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, সেখানে খাতা খোলা করা হোক বা না-হোক।)

প্র : 'বৈশাখী মেলা' কী?

উ : বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দিল্লির স্থানে যে মেলা হতো তাকে বৈশাখী মেলা বলে। তবে, এখন এই মেলা বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে না-হয়ে বৈশাখ মাসেরই অন্য কোনো দিন বা সপ্তাহব্যাপী হয়ে থাকে। 'এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলাতেও পরিণত হতো।'- এই বাক্য দিয়ে কী বোঝান হয়েছে?

উ : বৈশাখী বা এই ধরনের মেলায় বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু একত্রিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও মানুষ এসে মেলাতে অংশ নেয়। এর ফলে বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎ মেলে, কথা হয়, পরস্পরে আনন্দ লাভ করে এবং এতে সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

প্র : 'কবিগান' কী?

উ : আঠার শতকে কলকাতায় উদ্ভূত এবং সে-সময় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠা প্রশ্ন-উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গান। এই গানের দুটো পক্ষ থাকে, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গানের মাধ্যমে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। উনিশ ও বিশ শতকে এই গানের ধারা গ্রামবাংলায় জনপ্রিয়তার সঙ্গে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

প্র : আঠার, উনিশ, বিশ শতক কোন কোন সময়?

উ : আঠার শতক: ১৭০১– ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; উনিশ শতক: ১৮০১– ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত; বিশ শতক: ১৯০১– ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : 'যাত্রা' কী?

উ : চার দিক খোলা মঞ্চে অভিনীত এক প্রকার নাটক।

প্র : 'কীর্তন' কী?

উ : রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব বিষয়ক গান। জীবপ্রেমই যে গানের মূল সুর।

প্র : 'গম্ভীরা গান' কী?

উ : শিবের গাজন গান। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহি ও মালদহ অঞ্চলে সামাজিক সমস্যাও এই গানের বিষয় হয়ে উঠেছে।

প্র : 'পুতুলনাচ' কী?

উ : কাপড় বা কাগজ অথবা সুতার সাহায্যে পুতুল নাচানোর উপকরণ বানিয়ে তা দিয়ে যে খেলা দেখানো হয়ে তাকে পুতুলনাচ বলে।

প্র : 'আমরেলা' কী?

উ : দোকানবিশেষ, যাতে ওয়াকম্যান থেকে বাসে উঠার ফোন টাস, চার্জিংসহ সবকিছু এক সাথে পাওয়া যায়।

প্র : 'সর্বজনীন' কী?

উ : সবার জন্য উন্মুক্ত বা সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত।

প্র : 'বর্ষা' খেলা কী?

উ : বাংলাদেশ পুলিশের এক ধরনের বুদ্ধি খেলা।

প্র : 'বর্ষা' শব্দের গঠন-প্রকৃতি কী?

উ : বর্ষ + ইক (ষ্ণিক)।

প্র : 'বর্ষা' অর্থ কী?

উ : বাংলাদেশ বা পঞ্জিকা।

প্র : চৈত্র মাসের শেষ দিনকে কী বলা হয়?

উ : চৈত্র-সংক্রান্তি।

প্র : 'আমানি' কী?

উ : একটি লোক-অনুষ্ঠান।

প্র : 'বৈসুক' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?

উ : ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গা জাতি।

প্র : কিভাবে বৈসুক পালিত হয়?

উ : সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ দিন ত্রিপুরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করে জন্য গরাইয়া নামের এক ধরনের পূজা করে। এই পূজা যে বাড়ি থেকে হয় সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করে আবার সে বাড়িতেই শেষ হবার নিয়ম। নতুন বছরে ফসল ভাল হোক, সবাই সুস্থ থাকুক- এই প্রার্থনা করা হয়।

প্র : 'সাংগ্রাই' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?

উ : মারমা জাতির।

প্র : কিভাবে সাংগ্রাই পালিত হয়?

উ : মারমারা এ উৎসবে পরস্পরের প্রতি পানি ছিটিয়ে পুরাতন সব জরা ও জঞ্জাল ধুয়ে দেয়। পরে পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে পবিত্র মনে নাচ-গানের আয়োজন করে।

প্র : 'বিষু' কোন জাতি পালন করে?
উ : মারমা জাতির।
প্র : কিভাবে বিষু পালিত হয়?
উ : মারমা সম্প্রদায়ে চৈত্র মাসের শেষ দুই দিনকে যথাক্রমে আলাবিষু ও মূলবিষু বলা হয়। আর পহেলা বৈশাখকে তারা বলে পয়লাপয়া দিন। এই তিন দিনব্যাপী বিষু উৎসব পালিত হয় মূলত বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথিদের আপ্যায়ন, জীবনসাথী অন্বেষণ এবং সবার মঙ্গল কামনা করে বিষু পালিত হয়।
প্র : 'বৈসাবি' কী?
উ : আজ একত্রভাবে পাহাড়িরা যে নববর্ষ উৎসব পালন করে তাকেই 'বৈসাবি' বলে। মূলত বৈসুক-এর বৈ: সাংগ্রাই-এর সা: বিষু-ব বি নিয়ে বৈসাবি গঠিত।
প্র : ঠাকুর পরিবার কোনটি?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। এই পরিবারটি অনেক আগে থেকেই খুব প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরতো বটেই, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনেরাও বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির জন্য মহৎ কর্মাবলি সম্পন্ন করে বিশ্বের বুকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন।
প্র : শান্তিনিকেতন কোথায়?
উ : ভারতের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে ভূমি কিনেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১) করেন।
প্র : 'বাংলা একাডেমি' কী?
উ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে গবেষণাসহ বিভিন্ন কাজ করার প্রতিষ্ঠান। (এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের শেষ দিকে প্রদত্ত 'বাংলা একাডেমি সম্পর্কে
প্র : 'রমনা এলাকা' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : সুবিশাল রমনা পার্ক অঞ্চল এবং তার আশেপাশে।
প্র : আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারা?
উ : বালক থেকে বৃদ্ধ এবং সব বয়সের মানুষ একত্রে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

প্র : শামসুদ্দীন আবুল কালাম কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে; অগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
প্র : তিনি কেন নাম পরিবর্তন করেন?
উ : ওই সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন নামে এক রাজনীতিবিদ, সম্পাদক (দৈনিক আজাদের) ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাই তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের নাম 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম' বলে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা করেন।
প্র : তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল কী?
উ : ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতায় রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি করেন।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'মাহেনও'
প্র : তিনি কোন দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন?
উ : ইতালি (রোম শহরে)।
প্র : তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : অনেক দিনের আশা (১৯৫২), ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নাই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), শাহের বানু (১৯৫৭), পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)।

প্র : 'বিষু' কোন জাতি গোষ্ঠীর নববর্ষ উৎসব?
উ : চাকমা জাতির।
প্র : কিভাবে বিষু পালিত হয়?
উ : চাকমা সমাজে চৈত্র মাসের শেষ দুই দিনকে ফুলবিষু ও মূলবিষু বলা হয়। আর পহেলা বৈশাখকে তারা বলে গয্যাপদ্যা দিন। এই তিন দিনব্যাপী বিষু উৎসব পালিত হয়। মূলত বৌদ্ধ মন্দিরে প্রার্থনা, প্রদীপ প্রজ্বলন, অতিথিদের আপ্যায়নে, জীবনদাত্রী অন্বেষণ এবং সবার মঙ্গল কামনা করে বিষু পালিত হয়।
প্র : 'বৈসাবি' কী?
উ : আজ একত্রভাবে পাহাড়িরা যে নববর্ষ উৎসব পালন করে তাকেই 'বৈসাবি' বলে। মূলত বৈসুক-এর বৈ, সাংগ্রাই-এর সা: বিষু-র বি নিয়ে বৈসাবি গঠিত।
প্র : ঠাকুর পরিবার কোনটি?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। এই পরিবারটি অনেক আগে থেকেই খুব প্রভাবশালী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরতো নটেই, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনেরাও বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির জন্য মহৎ কর্মাবলি সম্পন্ন করে বিশ্বের বুকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে গেছেন।
প্র : শান্তিনিকেতন কোথায়?
উ : ভারতের বীরভূম জেলায় অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে জমি কিনেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৯২১) করেন।
প্র : 'বাংলা একাডেমি' কী?
উ : বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশে গবেষণাসহ বিভিন্ন কাজ করার প্রতিষ্ঠান। (এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের শেষ দিকে প্রদত্ত 'বাংলা একাডেমি সম্পর্কে তথ্যাবলি'।)
প্র : 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝান হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'রহনা এলাকা' বলতে কী বোঝান হয়েছে?
উ : খুলিপাল রহনা গ্রাম অমন এবং তার আশেপাশে।
প্র : আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কারা?
উ : বালক থেকে বৃদ্ধ এবং সব বয়সের নারীরা একত্রে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

প্র : শামসুদ্দীন আবুল কালাম কোথায়, কবে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : বরিশালের নলছিটি থানার কামদেবপুর গ্রামে; আগস্ট ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : তাঁর প্রকৃত নাম কী?
উ : আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
প্র : তিনি কেন নাম পরিবর্তন করেন?
উ : ওই সময় আবুল কালাম শামসুদ্দীন নামে এক রাজনীতিবিদ, সম্পাদক (সৈনিক আজাদের) ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাই তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজের নাম 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম' বলে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা করেন।
প্র : তাঁর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল কী?
উ : ছাত্রজীবনে তিনি কলকাতায় রিভলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতি করেন।
প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
উ : 'মাহেনও'
প্র : তিনি কোন দেশে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন?
উ : ইতালি (রোম শহরে)।
প্র : তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : অনেক দিনের আশা (১৯৫২), ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নাই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), শাহের বানু (১৯৫৭), পুই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭)।
প্র : তাঁর কয়েকটি উপন্যাসগ্রন্থের নাম লেখ।
উ : আলমগড়ের উপকথা (১৯৫৪), কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), জায়জঙ্গল (১৯৭৩), সমুদ্র বাসর (১৯৮৬), কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৮)।

'আলমগড়ের উপকথা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'আলমগড়ের উপকথা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৪ সালে। এখানে সামন্তবাদ ও ধনতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের দ্বন্দ্বের ফলে গণচেতনার বিকাশ চমৎকারভাবে ভাষারূপ পেয়েছে।
'কাশবনের কন্যা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) উপন্যাসে গ্রামকে এমনভাবে তুলে আনা হয়েছে যে, দুঃখ-দারিদ্র্য থাকলেও গ্রামই সুখের স্বর্গ, সমস্ত বিশ্বাসের আধার। উপন্যাসে বরিশাল অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, লোকজীবন, গ্রামীণ বিধি ফটোগ্রাফিকভাবে চিত্রায়িত। ফিকায়, হোসেন, জোবেদা, মেহেরজান প্রমুখের মুখের আঞ্চলিক কথা, লোকসঙ্গীত, প্রচলিত লোকবচন ইত্যাদির ব্যবহার উপন্যাসটিকে সুখপাঠ্য ও বিশ্বস্ত করেছে। 'কাশবনের কন্যা' গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গিতে এমন এক গ্রাম, গ্রামের মানুষ ও পরিবেশ তুলে এনেছেন, যা সুখ অতিক্রমকারী, সুখস্বপ্ন আশা সঞ্চারী।
'জায়জঙ্গল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
সুন্দরবনের জনবিরল বনজঙ্গলঘেরা পরিবেশে 'জায়গঙ্গল' (১৯৭৩) উপন্যাস রচিত। সে দিক থেকে এটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা চলে। উপন্যাসের একটি চরিত্রও সুন্দরবন অঞ্চলের নয়, উপন্যাসের পটভূমিই কেবল সুন্দরবন। তবে এ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে ঔপন্যাসিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যে মনুষ্যকুলের চিত্র এ উপন্যাসে আছে তারা সেটেলার; জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের চাপে তারা পিতৃপুরুষের নিবাসভূমি পরিত্যাগ করে সমুদ্রতীরবর্তী শ্বাপদসংকুল সুন্দরবন জঙ্গলে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। লাঠিয়াল জয়নাল শেখ এমন একটি চরিত্র যে লাঠিয়ালি পেশায় আস্থা রাখতে না পেরে এ জঙ্গলে এসেছে। সেখানে সে বসতি স্থাপন করে, জোতদারের অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন, পলাতক জীবন-এসবকিছুর মধ্যে পড়ে ওঠে ছোট 'জায়গঙ্গলের' জন। উপন্যাসের ঘটনা উপন্যাসের উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। এতে দেখান মগদাশিকর, মাদ, বিষধর-অবিষধর, জন্তু-জোনা ইত্যাদির সবকের ভাষাবিজ্ঞান প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।
প্র : 'সমুদ্র বাসর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : বৃহত্তর বরিশাল জেলার ঝিঙ্কাপাড়ের সমুদ্রতীরবর্তী জনজীবনভিত্তিক উপন্যাস 'সমুদ্র বাসর'। একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায়। কামদেবপুরের জেলে সরদার, মুচিকার, দেবনাথ, ট্রাইব সাধুর ও নদীর মোহনায় জীবন যাপি রেখে মায় ধরে। এক দিন তারা সন্ধান পায় নতুন জেলে ওঠা চরের। সবসাথে এ নতুন জায়গায় একটি গোষ্ঠীর দলপতি মুজফফর মিশ্রাকে। সবাসাথ মনে করেছিল মুজফফর মিশ্রা এই সমাজের ফসল তাকে পুনর্বসিত করবে। ঘরে নতুন মুজফফর নিলেও সবার কোনো আশাপূরণ ঘটে নি। এই অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবন পরিবর্তন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। মনু মল্লিক ও করিমন এ উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এছাড়া নিবু, ইউসুফ মুন্সা, জরিনা, মোস্তফা, মতলব সর্দার, পনি মিশ্রা, সকলের, রতিকান্ত, সুজাত আলি, সোনাবৌ, চন্দু প্রমুখ রয়েছে। উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য মতো কঠিন আঞ্চলিক বিশ্বাসের উল্লেখ আছে। যেমন: ফুনির-ব্রত, লাঙ্গবরণের উৎসব ইত্যাদি। উপন্যাসটি ১৯৪৭-'৪৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। ১৯৮০-'৮১ খ্রিষ্টাব্দে এর অংশবিশেষ পুনর্লিখিত হয় এবং ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পুথিঘর লিমিটেড থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।
প্র : শেষজীবনে সাহিত্য ছাড়া আর কোন মাধ্যমে তিনি কাজ করেন?
উ : চলচ্চিত্র।

প্র : সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি, ইতালির রোমে। তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয়।

শামসুর রাহমান

প্র : শামসুর রাহমান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর মাতুলালয় ঢাকার (পুরোনো ঢাকার) মাহুতটুলিতে। (সূত্র। বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান। ১৯৯৮) পারিবারিক হিসেবে তাঁর জন্ম ২৫শে অক্টোবর।
প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : বর্তমান নরসিংদী জেলার বাগপুরার পাড়াতলি গ্রামে।
প্র : তাঁর মা-বাবার নাম কী?
উ : মা : আমেনা বেগম
বাবা : মুখলেসুর রহমান চৌধুরী।
প্র : তাঁর স্ত্রীর নাম কী?
উ : জোহরা রাহমান (বেগম)।
প্র : শামসুর রাহমানের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া কতটুকু?
উ : ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। তিন বছর পড়েও অনার্স পরীক্ষা দেন নি। পরে বিএ (পাস) ডিগ্রি অর্জন করেন। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এমএ ভর্তি হন। কিন্তু এমএ-র প্রথম বর্ষ পরীক্ষায় পাস করলেও ফাইনাল পরীক্ষা দেন নি।
প্র : শামসুর রাহমানের ডাক নাম কী?
উ : বাচ্চু।
প্র : মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি একটি ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। সেটি কী?
উ : মজলুম আদিব।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : আধুনিক কবি; যিনি রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সমাজমনস্কতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কাব্যধারার জন্ম দিয়েছেন।
প্র : শামসুর রাহমানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম লেখ।
উ : কবিতা : মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ৩০টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), শুনাতাম তুমি শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), যে অন্ধ মৃত্তিকা কাঁদে (১৯৮৪), অবিরল আলোর্ঘ্য (১৯৮৬), এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৬), তুমি তাঁর বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮), হরিণের হাড় (১৯৯৩), উন্মাড় বাগানে (১৯৯৫), হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ (১৯৯৭), সৌন্দর্য আমার ঘরে (১৯৯৮), স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি (১৯৯৯), তবু হৃদয়ের ধ্বনি (২০০০), হৃদপদ্মে জ্যোৎস্না দোলে (২০০১), ভস্মস্তূপে গোলাপের হাসি (২০০২), ডাকাতেরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে (২০০৩), কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে (২০০৪), গোরস্থানে কোকিলের করুণ আহ্বান (২০০৫), অন্ধকার থেকে আলোয় (২০০৬), না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন (২০০৬)। উপন্যাস : মোট ৪টি উপন্যাস লিখেছেন: অক্টোপাস (১৯৮৩), অন্ধ আঁধার এক (১৯৮৫), নিয়ত মন্ত্রাঘাত (১৯৮৫), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)। প্রবন্ধ : আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬), কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২)। আত্মস্মৃতি : স্মৃতির শহর (১৯৭৯), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।
এগুলো ছাড়াও তিনি ৯টি শিশু-কিশোর সাহিত্যগ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, ৩টি অনুবাদ নাটকগ্রন্থসহ কলামগ্রন্থ, নিবন্ধগ্রন্থ ইত্যাদি মিলে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।
প্র : 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : শামসুর রাহমানের খ্যাতি ও পরিচিতি এর আগে থেকে কিছুটা থাকলেও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে তাঁর 'বন্দী শিবির থেকে'।

অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালে অর্থাৎ বাংলাদেশে এপ্রিল-ডিসেম্বর, ১৯৭১ সময়ে রচিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটির প্রথমে 'পূর্বলেখ' শিরোনামে একটি ভূমিকা রয়েছে যেখানে কবি তাঁর কাব্যগঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। এটি কবিতা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য কবিতা : তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, বন্দী শিবির থেকে, স্বাধীনতা তুমি, মধুমতি, রক্তাক্ত প্রান্তরে ইত্যাদি। প্রতিটি কবিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আবেগ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের শহিদদের উদ্দেশে।

প্র : 'রাত্রিশেষ নগ্ন পদধ্বনি' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : শামসুর রাহমানের নবম কাব্যগ্রন্থ এটি। প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ৪৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলোতে আছে স্বদেশ, স্বজন, প্রতিবেশ ও সমকালের অন্তর্গত নানা অনুষঙ্গ, নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা, যুদ্ধোত্তর হতাশা ইত্যাদি বিষয়। গ্রন্থটিতে টানা গদ্যে লেখা কবিতা যেমন আছে তেমনি আছে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার।

প্র : 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : শামসুর রাহমান রচিত ৫২টি কবিতার সংকলন এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। কাব্যগ্রন্থটিতে প্রেম-কাম, বিসর্গ-প্রকৃতি, আশা-নিরাশার দ্বৈরথে বিদীর্ণ। কবির আত্মবিশ্লেষণ, একই সঙ্গে শৈশব ও বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রভৃতি বিষয় এখানে চিত্রিত হয়েছে।

প্র : 'উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : ২৩টি কবিতার সমাহারে শামসুর রাহমানের এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। কবিতাগুলোতে আছে কবির স্বদেশ চেতনার পরিচয়, দুঃসময়ে দীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার ও অস্থিরতা এবং শামসুর রাহমানের স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি অবিচল ভালোবাসার প্রকাশ।
প্র : তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম লেখ।
উ : স্বাধীনতা তুমি, তুমি কতদূর রক্ত এ স্বাধীনতা।
প্র : শামসুর রাহমানের কবিতীর্থ সম্পর্কে লেখ।
উ : বেতিও পাকিস্তান প্রচার হওয়ার পর বিভাগে কর্মরতদের জন্য। পত্রিকার নাম: দৈনিক পাকিস্তান সংবাদ (১৯৫২), দৈনিক পাকিস্তান সমকাল (১৯৬৫), দৈনিক বাংলার সমকাল (১৯৭৭)। বেতারে প্রথম-দ্বিতীয় অনুষ্ঠানে একাত্ম হয়ে উঠেন স্বকাল ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে সকাল পর্যন্ত দৈনিক বাংলা থেকে পদত্যাগ।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : আদমজি পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।
প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট সকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
প্র : তাঁকে কবে, কোথায় সমাহিত করা হয়?
উ : কবির ব্যক্ত ইচ্ছানুসারে বনানী সমাধিক্ষেত্রে মা আমেনা বেগমের সমাধির মধ্যে ১৮ই আগস্ট, ২০০৬ কবিকে সমাহিত করা হয়।

'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
উ : নিজ বাসভূমি।

প্র : ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ কবিতাটি কি জাতীয় কবিতা?
উ : সংগ্রামী চেতনার কবিতা, দেশ প্রেমের কবিতা, গণজাগরণের কবিতা।
প্র : কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উ : গদ্যছন্দে ও প্রবহমান ছন্দে।
প্র : 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' কবিতায় বর্ণমালাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উ : নক্ষত্রের সঙ্গে।
প্র : 'আবার ফুটেছে দ্যাখো কৃষ্ণচূড়া থরে থরে শহরের পথে'– চরণটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দিকটি তুলে ধরে?
উ : ভাষা আন্দোলন।
প্র : শহরের পথে থরে থরে কী ফুটেছে?
উ : কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেছে।
প্র : সালামের চোখ আজ কী?
উ : আলোচিত ঢাকা।
প্র : বরকত কোথায় বুক পাতে?
উ : ঘাতকের থাবার সম্মুখে বুক পাতে।
প্র : সালামের হাত থেকে কি ঝরে?
উ : অবিনাশী বর্ণমালা।
প্র : কৃষ্ণচূড়াকে কাদের রক্তের বুদ বুদ মনে হয়?
উ : শহিদের।
প্র : থরে থরে কৃষ্ণচূড়া কোথায় ফুটেছে?
উ : শহরের পথে ফুটেছে।
প্র : কোন ফুল স্মৃতিগন্ধে ভরপুর?
উ : কৃষ্ণচূড়া ফুল।
প্র : পথঘাট কোন রঙে ছেয়ে গেছে?
উ : যে রং সন্ত্রাস আনে, সে রঙে পথঘাট ছেয়ে গেছে।
প্র : কার অশ্রুজলে ফুল ফোটে?
উ : মায়ের অশ্রুজলে।
প্র : 'অশ্রু' তো চোখের জল। এখানে 'অশ্রুজল' কি ভুল?
উ : না, এটাকে বলে 'আর্ষপ্রয়োগ'। লেখকেরা জেনেশুনে কখনো এমন শব্দ প্রয়োগ করেন।
প্র : হরিৎ উপত্যকা অর্থ কী?
উ : সবুজ উপত্যকা। আর উপত্যকা হলো দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি।
প্র : কোথায় দিনরাত ভূলুণ্ঠিত?
উ : ঘাতকের আস্তানায় দিনরাত ভূলুণ্ঠিত।

প্র : সারাদেশ ঘাতকের অশুভ আস্তানা– কেন একথা বলা হয়েছে?
উ : পাকিস্তানীবাহিনীর অশুভ পদচারণাকে বোঝানো হয়েছে।
প্র : 'দ্যাখো' কী?
উ : 'দেখ'-এর উচ্চারিত রূপ। শামসুর রাহমান শব্দের উচ্চারণকে অনেক সময় কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম : 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে'।
প্র : 'সালামের হাত থেকে নক্ষত্রের মতো / ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা'– এটি কোন অলংকার?
উ : উপমা।
প্র : কৃষ্ণচূড়া ফুল স্মৃতিগন্ধে ভরপুর বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উ : এই স্মৃতি হলো আন্দোলনও সংগ্রাম পরবর্তী রক্তদানের স্মৃতি– যা পরে ইতিহাস হয়েছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকেই এখানে বোঝানো হয়েছে।
প্র : ১৯৬৯ সাল এক কথায় কী কারণে উল্লেখযোগ্য?
উ : গণঅভ্যুত্থানের কারণে।
প্র : 'সেই ফুল আমাদেরই প্রাণ' কেন?
উ : কৃষ্ণচূড়ার ফুলকে বায়ান্নের শহিদের রক্তের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কবিতার প্রথমে। একুশের শহিদের রক্তকে বাঙালির প্রাণচেতনা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।
প্র : আনন্দের রৌদ্র, দুঃখের ছায়া কী?
উ : আনন্দকে কাব্যব্যঞ্জনায় রোদের উজ্জ্বলতা আর দুঃখকে ছায়ার অন্ধকারাচ্ছন্নতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রক্তগঙ্গা কী?
উ : সরাসরি হিমালয় পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যাওয়া নদী বলে এই নদী বেগবান ও বৃহৎ। স্বাধীনতার জন্য [illegible] রক্তদান' বোঝাতে এখানে [illegible] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্র : খাণ্ডবদাহন কী?
উ : 'মহাভারতে' আছে এই খাণ্ডব-এর কথা। [illegible] ইন্দ্রের সন্নিকটে খাণ্ডব একটি বন ছিল। অগ্নিদেবকে পরিতুষ্ট করার জন্য অর্জুন এই বন দাহ করলে বনবাসী ও [illegible] প্রাণীরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
প্র : জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক কেন?
উ : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পোশাকে জলপাই রঙের ব্যবহার ছিল। সাঁজোয়া ট্যাঙ্কগুলোও ছিল জলপাই রঙের।
প্র : রিকয়েললেস রাইফেল কী?
উ : একে সংক্ষেপে বলা হয় আর আর (R.R.)। দূরপাল্লার মারণাস্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এর ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। পাকিস্তানিরা এই আর আর নিয়ে নিরীহ বাঙালিদের ওপর আক্রমণ করে।
প্র : মেশিনগান কী?
উ : স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রচালিত বন্দুক। জার্মানি আবিষ্কার করে। পরে এই অস্ত্রের নানা দেশে নানা পরিমার্জন হয়েছে। সে হিসেবে মেশিনগানের আগে লাইট, হেভি, [illegible], শর্ট ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়।
প্র : অপরাহ্ণ বানানে কোন সতর্কতা থাকা প্রয়োজন?
উ : অপরাহ্ণ বানানে 'হ'-এর সঙ্গে 'ণ' সংযুক্ত, 'ন' নয়। মনে রাখা প্রয়োজন: হ্+ণ = হ্ণ; হ্+ন = হ্ন।
প্র : মতলব মিয়া উদ্দাম ঝড়ে 'গাজী গাজী' বলে কেন নৌকা চালায়?
উ : মুসলিম মাঝিদের লোকবিশ্বাস হলো: গাজিপিরকে স্মরণ করলে নদীতে ঝড়ঝঞ্ঝা তিনিই নিয়ন্ত্রণ করবেন।

শাহ আবদুল করিম

প্র : শাহ আবদুল করিম কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : তৎকালীন সিলেট জেলা, বর্তমান : সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণে দিরাই থানায় ১৯১৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৩২২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার)।

প্র : তাঁর বাবা-মায়ের নাম কী?
উ : [illegible]
প্র : তাঁর [illegible]
উ : [illegible]
প্র : তাঁর রচিত [illegible]
উ : [illegible]
প্র : আবদুল করিমের লেখা [illegible] কয়েকটি গানের উল্লেখ কর।
উ :
১. আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম,
২. কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া,
৩. আমি কূলহারা কলঙ্কিনী,
৪. গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে,
৫. বন্দে মায়া লাগাইছে, পিরিতি শিখাইছে,
৬. গান গাই আমার মনরে বুঝাই, মন থাকে পাগলপারা,
৭. [illegible]
৮. আমি তোমার কলের গাড়ি তুমি হও ড্রাইভার,
৯. [illegible]
১০. বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে।
প্র : আবদুল করিমের জীবনদর্শন কী?
উ : বাউল ছিল তাঁর ধর্ম। তিনি প্রচলিত বাউল ধর্মের বাইরে নতুন [illegible] করেছেন। আবদুল করিমের কাছে মানবপ্রেমই বড় ধর্ম। সৃষ্টিকর্তাকে পেতে হলে আগে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষের মাঝেই সৃষ্টিকর্তার অবস্থান। এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন।
প্র : তিনি কোন কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন?
উ : প্রথম জীবনে লালন শাহ্ ও হাসন রাজার দর্শনে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে প্রথম দিকে লালন শাহ্ ও হাসন রাজার মতো বাউল ফকিরদের গান গেয়ে মন-বাংলার লোক গানকেই ভিন্ন ধারায় তিনি

এগিয়ে নিয়ে যান। বাংলার লোকসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারই হলো তাঁর লক্ষ্য। আবদুল করিম এই সমন্বয়কারককে নিজের বিশ্বাস ও বোধের দ্বারা আরো সমৃদ্ধ করে তিনি উপরে স্থাপন করেন এবং বাংলার লোকগানে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। যে কারণে তাঁর গানে লালন ও হাসন রাজার গানের চেয়ে পৃথকতা লাভ করে। লালন ও হাসনের গানে আধ্যাত্মিকতা থেকেছে প্রধান আবদুল করিমের গানে প্রধানা হয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা।

প্র : কী কারণে এবং কবে তিনি প্রথম বিদেশে যান?

উ : ১৯৬৪ সালে যুক্তরাজ্যে যান গান গাওয়ার জন্য। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম বিদেশ সফর।

প্র : মৃত্যুর আগে তিনি কোন গান শুনতে চেয়েছিলেন?

উ। চিকিৎসা চলাকালে হাসপাতালে আবদুল করিমের সঙ্গে সার্বক্ষণিক থাকা একমাত্র ছেলে শাহ নূর জালাল বলেন, 'বাবা খাসকষ্টে ভুগছিলেন। টানা চার দিন চিকিৎসার পর খানিক সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বুধবার [৯-৯-২০০৯] তিনি খাওয়া-দাওয়াও করেন। আস্তে আস্তে কথাবার্তা বলছিলেন। একপর্যায়ে গান শুনতে চাইলে বাবার শিষ্য বাউল বশিরউদ্দিন নিজের লেখা একটি গান গেয়ে শোনান। এ গান শুনে তিনি হাসেন। পরে তিনি তাঁর প্রিয় গান 'কোন মেস্তরি নাও বানাইছে কেমন দেখা যায়...' শুনতে চাইলে বশির এ গান যখন গান, তখন তাঁর চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল।

শিষ্য বশিরউদ্দিন বলেন, 'এই হাসি-কান্নার পর তিনি নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। আর কোনো সাড়া শব্দ শোনা যায় নি। কোনো কথাও বলেন নি।'

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার পেয়েছেন?

উ : প্রায় দেড়শতাধিক পদক-পুরস্কার সহ ২০০১ সালে একুশে পদক।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২০০৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার, সকাল ৭.৪৫ মিনিটে; সিলেটে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৩৪ সালের ২৭শে জুন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির নৈহাটির কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?

উ : তাঁর পিতা ডেপুটি কালেক্টরেট (রিটা, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর সহোদরদের নাম কী?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহোদর ভাই ছিলেন।

প্র : কর্মজীবনে তিনি কী ছিলেন?

উ : কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বর্ধমান জেলার কর্মিশনার অফিসের কেরানি হিসেবে। পরে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হন।

প্র : তিনি কোন গ্রন্থ লিখে প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন?

উ : 'Bengal Ryots : Their Rights and Liabilites' (১৮৬৮) নামের গ্রন্থ লেখে।

প্র : তিনি কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

উ : বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। আর সম্পাদনা করেন 'ভ্রমর' নামের মাসিক পত্রিকা (১২৮১-১২৮২) বঙ্গাব্দ।

প্র : সঞ্জীবচন্দ্রের জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম কী?

উ : 'পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ; কী?

উ : এটি বিহারের একটি স্থান। চাকরিসূত্রে তিনি যখন বিহারে ছিলেন, সেই সময়ের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা তিনি লেখেন পরিণত বয়সে। তার নাম দেন 'পালামৌ'।

প্র : 'পালামৌ' কবে, কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়?

উ : ১২৮৭ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রথম এই ভ্রমণকাহিনি প্রকাশ হয়।

প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : 'পালামৌ' সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। ছোটনাগপুরের আদিম গিরিদরী অরণ্যানী ও আরণ্যক পশু ও মানব লেখকের [illegible] 'বঙ্গদর্শন' [illegible] এই গ্রন্থের মুদ্রণোত্তর নাম। সঞ্জীবচন্দ্র এই একটি মাত্র সৃষ্টি করেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যান্য রচনার নাম লেখ।

উ : [illegible] : 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭); [illegible]' (১৮৮৪)। গল্পগ্রন্থ : [illegible]' (১৮৭৫)। প্রবন্ধগ্রন্থ : 'বাহুবলের অদৃষ্ট' (১৮৭৭)। প্রবন্ধগ্রন্থ : [illegible]' (১৮৭৫) মুদ্রাদি।

প্র : কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৮৮৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পালামৌ থেকে
সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : লেখক কবে পালামৌ গিয়েছিলেন?

উ : ফাল্গুন মাসে।

প্র : পালামৌ অঞ্চলের বৃত্তান্ত লিখবার জন্য লেখকের কতজন বন্ধু তাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করেছিলেন?

উ : দুই-তিন জন।

প্র : বন্ধুরা পালামৌ এর বৃত্তান্ত লেখবার জন্য অনুরোধ করলে লেখক তাদের কি বলতেন?

উ : উপন্যাস লিখতেন।

প্র : লেখক পালামৌ এর বৃত্তান্ত কখন লিখতে বসেছিলেন?

উ : তাঁর বৃদ্ধ বয়সে।

প্র : বৃদ্ধ বয়সের রোগ কোনটি?

উ : গল্প করা।

প্র : বৃদ্ধ গল্প করে কখন?

উ : কেউ শুনলেও বা না শুনলেও।

প্র : 'অনেক দিনের কথা লিখতে বসিয়াছি'– কোন রচনার অংশ?

উ : পালামৌ।

প্র : অনেক দিনের কথা লিখতে বসায় লেখক কোন সমস্যায় পতিত হন?

উ : তিনি সব কিছু স্মরণ করতে পারেন না।

প্র : 'পূর্বে লেখক পর্বত কুসুমিত কানন' কোন চোখে দেখতেন?

উ : যুবক বয়সের চোখে।

প্র : পূর্ব সঙ্গে পরের লেখকের কিরূপ কিরূপ?

উ : সম্বন্ধযুক্ত।

প্র : পূর্ব সঙ্গে লেখক বলতে কিরূপ বুঝ করেন?

উ : কর্মজীবন।

প্র : অসিপাতীরা কোন কলাকারী সাজ করে কাজে সফল হয়?

উ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাগ।

প্র : লেখক কী ভাড়া করে পালামৌয়ে যাত্রা শুরু করেন?

উ : ইংলিশ ট্রাফিক কোম্পানির [illegible] ভাড়া করে।

প্র : লেখক রানিগঞ্জ হতে পালামৌয়ে ভ্রমণ কয়া শুরু করেছিলেন?

উ : মাঘি দোড় মাসে।

প্র : প্রথম রাত্রিবাস নদীর কোন পাশের পল্লি থেকেছিল?

উ : পূর্ব পাড়ে।

প্র : নদীটি কিরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ছিল?

উ : ধনুক।

প্র : নদীটিতে লেখকের অবতরণ করবার পানি ছিল?

উ : অল্পমাত্র পানি।

প্র : সকলে বরাক নদী কিভাবে পার হয়েছিল?

উ : হেঁটে।

প্র : ডাক পরিবহনকে কিভাবে নদী পার করানো হলো?

উ : হেঁটে।

প্র : কুলিকে ডাকতে কে দিয়েছিল?

উ : গাড়ওয়ান।

প্র : লেখকের পাল্কিটি বেয়াও করেছিল কারা?

উ : কুলিদের কিছু ছেলে-মেয়ে।

প্র : কুলিদের বালক-বালিকারা কি বলে লেখকের সামনে চিৎকার করছিল?

উ : সাহেব একটি পয়সা সাহেব একটি পয়সা।

প্র : লেখকের সামনে হাত পাতার অর্থ কে জানতো না?

উ : একটি দুই বছরের শিশু।

প্র : 'সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল।'– উক্তিটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উ : দুই বছরের শিশুটির ক্ষেত্রে।

প্র : শিউটির ফেলে দেওয়া পয়সা কুড়িয়ে নেওয়ার এক বালকের সাথে তার তুলনা দাখলা?
উ : শিউটির জমিদারীর।
প্র : তুলনা চলাকালীন লেখকের গাড়ি কোথায় গিয়ে উঠেছিল?
উ : ধবাকের নদীর ওপর গাড়ে।
প্র : দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় কোথা থেকে দেখা যায়?
উ : ধরাকের নদী থেকে।
প্র : বঙ্গবাসীদের অভ্যাস কোন্টি?
উ : কেবল মাঠ দেখা।
প্র : মৃত্তিকার সামান্য স্বপ্ন দেখলে কারা আনন্দিত হয়?
উ : বঙ্গবাসীরা।
প্র : একটি সুন্দর পর্বতের কাছ দিয়ে গাড়ি কখন যাচ্ছিল?
উ : অপরাহ্নে।
প্র : পর্বতের কাছ দিয়ে গাড়ি যাওয়ার ফলে কোন দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল?
উ : পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়ার দৃশ্য।
প্র : লেখক গাড়ি থামিয়ে কোথায় যাওয়ার অভিব্যক্তি গাড়োয়ানের কাছে প্রকাশ করেছিলেন?
উ : একটি পর্বতের নিকট।
প্র : কোনটি বাঙালির পক্ষে খুব কঠিন?
উ : পর্বত সম্বন্ধে দূরত্ব স্থির করা।
প্র : পরদিবসে প্রায় দুই প্রহরের সময় লেখক কোথায় পৌঁছেছিলেন?
উ : রাজারিবাগ।
প্র : লেখকের খাওয়ার ব্যবস্থা কার বাড়িতে হয়েছিল?
উ : একজন সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসীর বাড়িতে।
প্র : লেখককে দেখিয়ে বাড়ির সকলে কিভাবে অগ্রসর হয়েছিল?
উ : সাদরে অগ্রসর হয়েছিল।
প্র : বাটির কর্তা কে ছিলেন?
উ : না চিনে লেখক যার অভিবাদন সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছিলেন।
প্র : লেখক যে বাড়ির অতিথি হিসেবে গিয়েছিল সে বাড়ির লোকসংখ্যা কত ছিল?
উ : ৩০০ জন।

প্র : বৃদ্ধের কোন জিনিসটি লেখক তার জীবনে অতি অল্প দেখেছেন?
উ : প্রসন্নব্যঞ্জক ওষ্ঠ।
প্র : বৃদ্ধের তালিকায় লোকটির নাম ওঠার কারণ কোনটি?
উ : সতর শতাব্দীতে বেশি হয়েছিল।
প্র : লেখক বৃদ্ধকে প্রথম বারের মতো কিরূপ দেখে?
উ : সুন্দর দেখে।
প্র : সে সময় লেখকের বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত ছিল না কেন?
উ : লেখক যুবক ছিলেন।
প্র : লেখক নিজে বৃদ্ধ বিধায় সব বৃদ্ধকে তার কি মনে হয়?
উ : সুন্দর।
প্র : কোনটির আবশ্যকতা অনেকে বোঝেন না?
উ : দিবা রাত্র ছাত্রদের কাছে শিক্ষক থাকার আবশ্যকতা।
প্র : ধরটিতে এক কানি সুপক্ব মর্তমান রম্ভা বা কলা কিভাবে ছিল?
উ : সোদুল্যমান।
প্র : প্রতিদিনের কলার ব্যয় বাবদ খরচ কোথায় লেখা হয়ে থাকে?
উ : কলার কানিতে ঝোলানো কাগজে।
প্র : কলা ব্যয় হওয়ার হিসাব রাখাকে অন্যের কোন চোখে দেখে?
উ : ছোট চোখে।
প্র : 'কলাকাঁদির হিসাব দেখে'– লেখকের অনুভূতি কেমন ছিল?
উ : চমৎকৃত হয়েছিলেন।
প্র : ক্ষুদ্র দৃষ্টির লোকেরা কী করে থাকেন?
উ : কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অন্য বিষয় দেখতে পায় না।
প্র : লেখক কাদের প্রশংসা করেন না?
উ : যারা বড় বিষয় মোটামুটি দেখেন এবং সূক্ষ্ম বিষয় যাদের দৃষ্টিতে পড়ে না লেখক তাদের প্রশংসা করেন না।
প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাদের প্রশংসা করেন?
উ : যাঁরা বৃহৎ এবং সূক্ষ্ম একত্রে দেখে কাজ করে।
প্র : লেখক পালামৌকে কেমন বসবাসের স্থান মনে করেছিল?
উ : সুখের।

লেখকের ভাবনায় পালামৌ গদ্যটি

প্র : লেখক কোথায় বসে ভাবনা করছিলেন?
উ : পালামৌ অঞ্চলে।
প্র : প্রথমবারে লেখকের নিকট কোন বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল?
উ : পালামৌ শহর না একটি প্রকাণ্ড পালামৌ।
প্র : পালামৌ অঞ্চলে কোন দুইটি জিনিস নেই?
উ : বৃক্ষ এবং গৃহগ্রাম।
প্র : পালামৌ অঞ্চলটি কিসে পরিপূর্ণ?
উ : বন্যেতে ও জঙ্গল পরিপূর্ণ।
প্র : পালামৌতে সৌন্দর্যের জন্য লেখক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?
উ : পালামৌয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে।
প্র : পালামৌতে প্রবেশের পর লেখকের কোন ভুল হয়েছিল?
উ : নদী ও গ্রাম কিছু না থাকার ভুল।
প্র : পালামৌ পরগনায় কোনটি সংখ্যাতীত?
উ : পাহাড়।
প্র : পালামৌকে লেখক কিসের সাথে তুলনা করেছেন?
উ : রিলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।
প্র : পালামৌতে পাহাড় দেখে কে চমৎকৃত হয়েছিল?
উ : পাহাড় দেখে লেখক চমৎকৃত হয়েছিল।
প্র : 'সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। যাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নেই, সমুদয় পরিষ্কার ঝরঝরে করিতেছে।'– উক্তিটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
উ : চমৎকৃত পাহাড়ের ক্ষেত্রে।
প্র : গাছটির ফাটা স্থানে কোন গাছ জন্মগ্রহণ করেছে?
উ : অশ্বত্থ গাছ।
প্র : লেখকের নিকট অশ্বত্থগাছটিকে রসিক গাছ মনে হয়েছিল কেন?
উ : নীরস পাষাণ থেকে রস গ্রহণ করায়।
প্র : রসিক অশ্বত্থগাছটিকে হঠাৎ লেখকের পাষাণ মনে হলো কেন?
উ : কেননা নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করে।
প্র : শাল তাল তমাল হিন্তোল ইত্যাদি কিসের বর্ণনায় লেখক শুনেছিলেন?
উ : বন বর্ণনায়।
প্র : বন্যেরা বনে সুন্দর উক্তিটি কার?
উ : বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে উক্তিটি সকলের মনে থাকে।
প্র : শালটি অত্যন্ত হওয়ার কারণ কী?
উ : শালটি দুর্লভ এবং তাহার কোথাও কোন মূল্য নাই।
প্র : শাল গাছের জন্য একটিও কেন দরকার?
উ : ঘরের জন্য।
প্র : কার দর্শনে আগ্রহের লেখকের মন কেমন হয়েছিল?
উ : বিস্ময়ের।
প্র : কাদের কাছ থেকে লেখক তার কোথায় শেখেছিলেন?
উ : মেদিনীপুরে।
প্র : মহুলাদির পত্র কাদের পাশে রাখিয়ে দেখে বুঝে পাওয়া যায় কিসের?
উ : গাছের ফলের আকারের অনুপাতে।
প্র : গ্রামের কিসের কেমন অল্প গন্ধ বলে?
উ : কাহনদীর আগমনে সুগন্ধ।
প্র : অল্প বিলম্বেই লেখক কিসের দেখা পেলেন?
উ : অর্ধভগ্ন তুলসীবৃক্ষ একটি ক্ষুদ্র চারার।
প্র : গ্রামের রম্য ছায়ে গুরুত্ব কারণ কী?
উ : পর্বত ছায়ের কারণে।
প্র : গ্রামটিতে কি দেখতে পাওয়া যায়?
উ : দু একটি মধু বা মৌচাকের।
প্র : গ্রামের জল ও নদীর পরিবর্তে কী দেখা যায়?
উ : গ্রামের পরিচ্ছন্নতার।
প্র : কোলবালকরা যে মহীর চরিত্রে ভরা কেমন ছিল?
উ : কৃষ্ণবর্ণ কান্তি।
প্র : কোলবালকরা গায়ে কিসের ঘাম পড়েছে?
উ : পুঁটির।
প্র : ধুকধুকিয়ে পরিবর্তে তারা কী পড়ে?
উ : গোল আরশি।
প্র : কারা ধড়া পরিধান করেছে এবং কানে বনফুল দিয়েছে?
উ : কোলবালকেরা।
প্র : যারা কলকাতায় বা চা বাগানে যায় তারা কেমন প্রকৃতির ছিল?
উ : কুৎসিত প্রকৃতির।
প্র : লেখকের চোখে কালো কোলরা কেমন?
উ : রূপবান।
প্র : 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশু মাতৃক্রোড়ে' উক্তিটি কোথা থেকে গৃহীত?
উ : 'পালামৌ' রচনা থেকে।

প্র : প্রান্তরের পরের গ্রামে কতটি গৃহস্থ পরিবার বাস করে?
উ : ৩০-৩২টি।
প্র : সকলের বাড়ি দেখতে কেমন?
উ : পর্ণকুটির।
প্র : লেখকের পালকি দেখতে কারা ছুটে এসেছিল?
উ : যাবতীয় স্ত্রীলোক।
প্র : যুবতীরা কিরূপ কালো ছিল?
উ : আবলুসের মতো।
প্র : যুবতীদের কটিদেশে কি জড়ানো?
উ : ক্ষুদ্র কাপড় জড়ানো।
প্র : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল ও বড় বনফুল যুবতীরা কোথায় কোথায় পরিধান করেছিল?
উ : কর্ণে ও মাথায়।
প্র : যুবতীরা পরস্পর কাঁধ ধরাধরি করে কি দেখতে শুরু করেছিল?
উ : লেখককে।
প্র : বাংলার পথেঘাটে বৃদ্ধার সংখ্যা অধিক হলেও পালামৌতে কাদের সংখ্যা অধিক?
উ : যুবতীদের।
প্র : কোলরা অধিক বয়সী হলেও কেমন থাকে?
উ : যুবতী।
প্র : কোলরা কখন বৃদ্ধ হয়?
উ : বয়স আশির অধিক হলে।
প্র : পরিশ্রমী বেশি বিধায় কোল যুবতীরা কী করে?
উ : গৃহের কাজ ও কৃষিকাজ তারাই করে।
প্র : কোল পুরুষেরা কেন বঙ্গবাসী নারীদের মতো বৃদ্ধ হয়ে যায়?
উ : আলস্যের কারণে।
প্র : কোল নারীরা কেমন প্রকৃতির?
উ : শ্রমহেতু চিরযৌবনা।
প্র : মানুষের মধ্যে পশু পাখিদের কোন নিয়মটি রক্ষিত?
উ : পুরুষজাতিই বলিষ্ঠ ও সুন্দর।
প্র : কোল পুরুষদের উল্লেখযোগ্য কাজ কী?
উ : সন্তান রক্ষা করা ও চাটাই বুনা।
প্র : কোলদের মধ্যে কারা বলিষ্ঠ ও সুন্দর?
উ : স্ত্রীজাতিরা।
প্র : কোন পুরুষদের গায়ে খড়ি উঠছে?
উ : বয়ঃপ্রাপ্তদের।
প্র : পুরুষদের মুখে কোন জিনিসটির অভাব?
উ : হাসির।
প্র : কাদের জীবনী শক্তি কমে এসেছে?
উ : বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের।
প্র : বীরদর্পে কে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল?
উ : একটি যুবক।
প্র : স্ত্রীলোকগুলো কিভাবে যুবার সাথে যাচ্ছিল?
উ : সাধিতে সাধিতে।
প্র : স্ত্রীলোকগুলো কেন নিরস্ত হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল?
উ : লেখকের উপস্থিতিতে।
প্র : লেখকের প্রশ্নের জবাবে যুবা সদর্পে কী বলেছিল?
উ : 'আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গোরুকে বাঘ মারিয়াছে।'
প্র : বালকের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা লেখক কিভাবে প্রকাশ করেছিলেন?
উ : কিঞ্চিত অপ্রতিভ হয়ে।
প্র : লেখক ভীতু হলেও কী ভয় পেতেন না?
উ : বাঘ-ভাল্লুক।
প্র : বৃদ্ধ শিকারিরা লেখককে কোথায় যেতে নিষেধ করেছিলেন একাকী?
উ : পাহাড়ে।
প্র : যুবক কেন বাঘ মারার পূর্বে জল গ্রহণ করবে না বলেছে?
উ : ব্রাহ্মণ সন্তান বলে।
প্র : কারা নিজের ছায়া দেখে অনেক সময় ভয় পায়?
উ : সৈনিক পুরুষরা।
প্র : নিজের ছায়া দেখে ভয় পেলেও সৈনিক পুরুষেরা কী করে থাকে?
উ : রণক্ষেত্রে গিয়ে রণ করে।
প্র : যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পুরুষ সৈনিকদের মনে কী আসে না?
উ : গুলি কিংবা তরবারি তার অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে কি না।
প্র : আদিমকালের সব পুরুষেরা সাহসী ছিল কেন?
উ : ফলাফল জ্ঞান না থাকায়।
প্র : সভ্যতার সাথে সাথে কীসের ভাগ কমে যায়?
উ : সাহসের ভাগ।

প্র : শেলাল কোড ভাল হলে কী হয়?
উ : সাহস অন্তর্হিত হয়।
প্র : একদিন অপরাহ্নে লেখক কোথায় যাচ্ছিল?
উ : পাহাড়ের দিকে।
প্র : পাহাড়ের পথে লেখকের কার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?
উ : কিছু কোল কন্যার সাথে।
প্র : লেখককে নাচ দেখার জন্য কে আমন্ত্রণ করেছিল?
উ : সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ।
প্র : সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠার মাথায় কী ছিল?
উ : পূর্ণ কলস।
প্র : পৃথিবীর সব জাতি কোনক্ষেত্রে কোলদের থেকে পেছনে?
উ : হাসি ও নাচের দিক দিয়ে।
প্র : লেখক কখন নাচ দেখতে গিয়েছিল?
উ : সন্ধ্যায়।
প্র : গ্রামের সব যুবক কোথায় এসে একত্র হয়েছিল?
উ : বটবৃক্ষের নিচে।
প্র : তারা খোপায় কয়টি চিরুনি দিয়েছিল?
উ : দুই থেকে তিনটি।
প্র : সকলের দেহচঞ্চল কেন?
উ : বয়সের দোষে।
প্র : সবাই কিভাবে নিজের বলবীর্য দেখেছিল?
উ : নানাভঙ্গিতে।
প্র : কারা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপরে জড়বৎ বসে ছিল?
উ : বৃদ্ধরা।
প্র : বৃদ্ধদের জানু কী ছাড়িয়ে গিয়েছিল?
উ : স্কন্ধ।
প্র : বৃদ্ধদের পাশে কে গিয়ে বসেছিল নাচ দেখতে?
উ : লেখক।
প্র : কারা দলে দলে এসে যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করেছিল?
উ : গ্রামস্থ যুবতীরা।
প্র : লেখক কিসের কিছুই বুঝতে পারছিল না?
উ : উপহাসের।
প্র : কখন বড় হাসির ঘটা পড়ে গিয়েছিল?
উ : যুবতীরা যখন যুবকদের প্রতি উপহাস করছিল।
প্র : নৃত্য দেখতে আসা যুবক ও যুবতীর সংখ্যা কত?
উ : যুবক ১২-১৩ জন ও যুবতী প্রায় ৪০ জন।
প্র : চল্লিশজন যুবতী একত্রে হাসলে কি হয়?
উ : হাইলন্ডের পল্টন।
প্র : যুবতীরা কিভাবে দাঁড়িয়েছিল?
উ : হাত ধরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখাবিন্যাস করে।
প্র : সব যুবতীর গায়ের রঙ কেমন ছিল?
উ : সমান উঁচু ও পাথুরে কালো।
প্র : সবার মাথায় ও কানে কী ছিল?
উ : বনপুষ্প।
প্র : কখন যুবাদের দলে মাসল বেজেছিল?
উ : বৃদ্ধদের ইঙ্গিতে।
প্র : তালে তালে পা ফেললেও যুবতীরা কী হয় না?
উ : চলে না, দোলে না, টলে না।
প্র : নৃত্য আরম্ভ হলে কে মঞ্চের থেকে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করলো?
উ : একজন বৃদ্ধ।
প্র : যুবতীদের সুরের ঢেউ কোথায় যেতে লাগতে লাগল?
উ : নিকটের পাহাড়ে।
প্র : যুবতীরা যখন তালে তালে নাচছিল তখন তাদের বনফুলের কি পরিবর্তন হচ্ছিল?
উ : একবার উঠছিল, একবার নামছিল।
প্র : ফুলগুলোর মধ্যে দুই একটি ঝড়ে যুবতীদের কোথায় পড়েছিল?
উ : স্কন্ধে।
প্র : দুই তিন জায়গায় হু হু করে কী জ্বলছিল?
উ : আগুন।
প্র : অগ্নির আলোকে নর্তকীদের কেমন দেখাচ্ছিল?
উ : আরো কালো।
প্র : নর্তকীরা কিভাবে 'চিতিয়া' পড়ছিল?
উ : ফুলের পাপড়ির মতো।
প্র : ফুলের পাপড়ির মতো নর্তকীদের ঢোলে পড়া দেখে কে, কে হেসেছে?
উ : আকাশের চাঁদ ও বটমূলের অন্ধকারে বসে লেখক।
প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতিচারণামূলক ভ্রমণকাহিনি কোনটি?
উ : পালামৌ।
প্র : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কার সহোদর?
উ : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের।
প্র : তিনি কোন কোন বিষয়ে নিজের চেষ্টায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন?
উ : ইংরেজি, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে।

প্র : সঞ্জীবচন্দ্র জমিদারিতে কী ছিলেন?
উ : ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।
প্র : 'মাধবীলতা' ও 'জলধরতাপ চাঁদ' সঞ্জীবচন্দ্রের কী ধরনের রচনা?
উ : উপন্যাস।
প্র : দুক্ দুকি অর্থ কী?
উ : লন্ডেট।
প্র : 'ধড়া' অর্থ কী?
উ : ধুতি।
প্র : 'পেনাল কোড' দ্বারা কী নির্দেশ করে?
উ : ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি।
প্র : পালামৌ স্থানটি কেমন?
উ : গ্রন্থে বলা হয়েছে: 'পালামৌ সহর নহে, একটি প্রকাণ্ড পরগনামাত্র। সহর সে অঞ্চলেই নাই, নগর দূরে থাকুক, তথায় একখানি গণ্ডগ্রামও নাই, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।' অন্যত্র বলা হয়েছে: 'পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ এই লইয়াই পালামৌ'।
প্র : 'পালামৌ' কোথায় প্রথম প্রকাশ পায়?
উ : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় আরম্ভ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবৎকালে (১৮৩৪-১৮৮৯) এটি পুস্তাকারে প্রকাশ পায় নি।
প্র : 'পালামৌ' কিভাবে জনসম্মুখে আসে?
উ : সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৮৯) বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নাম দিয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাবলি প্রকাশ করেন। সেখানেই 'পালামৌ' প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়। এর বহু পরে ১৩৫১ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রথম স্বতন্ত্র পুস্তাকারে 'পালামৌ' প্রকাশ করে।
প্র : 'পালামৌ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য কী?
উ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পালামৌ' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এর এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন: "'পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।"
প্র : 'পালামৌ'-এ কয়েকটি বাক্য মন্তব্যের ন্যায় প্রবাদসদৃশ হয়ে উঠেছে। কোনগুলো?
উ : ১. 'বঙ্গবাসীদের কেবল মাছ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়'।
২. 'ধনবাগীমাত্রই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা কিছু শুনা যায় তাহা কেবল গতিবাসিত'।
৩. 'মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না'।
৪. 'যাহার ভাগ্যে কঠিন পাষাণ, পাষাণই তাহার অবলম্বন'।
৫. 'বনেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'।
৬. 'এক দিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব'।
৭. 'যে হাসে, সেই রাগে'।

সতীনাথ ভাদুড়ী

প্র : সতীনাথ ভাদুড়ীর জন্ম কবে, কোথায়?
উ : ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া নামক স্থানে।
প্র : তিনি কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হন?
উ : আইনে ডিগ্রি নিয়ে পূর্ণিয়াতে ওকালতি করেন। পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং ওকালতি ত্যাগ করেন। ১৯৪০-'৪২ পর্যন্ত রাজনীতির দায়ে জেলে ছিলেন। উল্লেখ্য ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন হয়। দলের সঙ্গে মতের মিল না হলে ১৯৪৪ সালে কংগ্রেস পরিত্যাগ এবং এ সময় থেকে ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন।
প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?
উ : ঔপন্যাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুটো উপন্যাস : জাগরী (১৯৪৬) ও ঢোঁড়াইচরিত মানস (দুই খণ্ড; ১৯৪৯, ১৯৫১)।

'জাগরী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
'জাগরী' (১৯৪৬) সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ এই উপন্যাসটিকে অভ্যর্থনা জানান। কাহিনিগঠন, চরিত্রসৃষ্টি ও বিশ্লেষণ- সমস্ত দিক থেকেই এই গ্রন্থটি একটি অসাধারণ উপন্যাসরূপে স্বীকৃত। রাজনীতির আবর্তে বিপর্যস্ত এক পরিবার- মাতা, পিতা ও দুই পুত্র। এক পুত্রের সাফোর্ড কলেজ প্রবেশ, অন্য পুত্রের মুক্তাঞ্চলের ঘটনা এবং প্রত্যেক চরিত্রের স্বগোক্তির মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি রূপায়িত হয়েছে।
'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
'ঢোঁড়াই চরিত মানস' দুই খণ্ডে প্রকাশিত (১ম খণ্ড ১৯৪৯, ২য় খণ্ড ১৯৫১)। বিহারের শহর জিরানিয়া, তার থেকে কিছু দূরে তাদমাটুলি। তাদমাদের বৃত্তি ধরামি আর কুয়োর বালি ছাঁকা। তারা জাতে ভূমিজ। তবে পাশেই ধাঙড়টুলি। এই পরিবেশে পিতৃহীন, মাতৃপরিত্যক্ত ঢোঁড়াই বড়ো হয়। এই তাদমা ঢোঁড়াইকে লেখক খাড়া করেছেন রামচন্দ্রের নতুন সংস্করণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্ব এর কালপরিধি। সমাজের নিম্নতম স্তরে রাজনৈতিক চেতনা কিভাবে প্রবেশ করে জ্বলে দেয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত করে এক ঢোঁড়াইকে 'রামায়ণজী'তে, তার এক অসাধারণ আখ্যান এই গ্রন্থ। এই কাহিনিতে অন্তর্লীন হয়ে আছে তুলসীদাসের রামচরিতমানস। রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তন ও সমাজের অন্ত্যজ মানুষের বিশ্বস্ত রূপায়ণ এবং রামচরিমানসের সঙ্গে আধুনিক কাহিনির রূপায়ন এই তিনদিক থেকে এই আখ্যান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম।
কোন উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন?
'জাগরী'; ১৯৫০ সাল।
তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
১৯৬৫ সালে।

সতোন সেন

প্র : সত্যেন সেনের জন্মস্থান কই?
উ : ১৯০৭।
প্র : তাঁর জন্ম স্থান কোথায়?
উ : সোনারং গ্রাম, বিক্রমপুর।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।
প্র : তিনি কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : আইনঅমান্য আন্দোলন, কমিউনিস্ট, শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি।
প্র : তাঁর গ্রন্থের মধ্যে কোন বিষয়গুলো পাওয়া যায়?
উ : সমাজ, রাজনীতি, সমকালীন ও ঐতিহাসিক, মার্কসবাদের শ্রেণি সংগ্রাম ও গণসংগ্রামের দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে বর্ণনিত।
প্র : তিনি কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন?
উ : 'উদীচী' (১৯৬৮)।
প্র : তাঁর গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : উপন্যাস : চেয়ারে বিকেল (১৯৫২), অভিশপ্ত নগরী (১৯৫৪), সাগর সঙ্গম (১৯৬৯), জন্মভূমি মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭২), পলাতক (১৯৭৩), অন্ধকারের (১৯৭৫), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৭৬)। ইতিহাস : মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), ঔপনিবেশ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (১৯৭৯)। শিশু সাহিত্য : পাহাড়ের (১৯৭৪), অভিযাত্রী (১৯৭৬)।
প্র : 'আলবেরুনী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক জীবনভিত্তিক উপন্যাস 'আলবেরুনী'র পাণ্ডুলিপি লিখেছিলেন জেলে বসে। যদিও তিনি লিখেছেন হাজার বছর আগে ছড়ানো-ছিটানো আলো আবার নানারঙের নক্সিকাটা দেশ খোরাসানের উপরও পড়বে কবিদের, গণিতবিদ, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমিক অবু রায়হান বিন আহমদ আলবেরুনীকে নিয়ে। গ্রন্থটিতে লেখক আলবেরুনীকে দেশকাল, জাতিসত্তা ও ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্ত করে নিখাদ

এক মানবতাবাদী পণ্ডিত হিসেবে অঙ্কন করেছেন।

প্র : সত্যের সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : বাইবেলের 'বুক অব দ্য প্রফেট : যেরেমিয়া খণ্ড' অবলম্বনে অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭) রচিত। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে সত্যেন সেনই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি বাইবেলের কোনো কাহিনিকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করেন। তবে এটা কোন ধর্মকথার প্রলম্বিত রূপ নয়। বাইবেলের কাহিনিকে আশ্রয় করে রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বে মেহনতি মানুষের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ রূপায়ণে সত্যেন সেন সফল। উপন্যাসে যেরেমিয়া, রাজা যিহোয়াকিম, নেবুকাডনাজার প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। জীবনের প্রবহমাণ ধারা রূপ দিতে গিয়ে মহাকাব্যিক ভাষারীতি ও অলঙ্কার গৃহীত হয়েছে এই উপন্যাসে।

প্র : 'পাপের সন্তান' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'অভিশপ্ত নগরী'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে পরিকল্পিত 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) শুধু সত্যেন সেনেরই সেরা সৃষ্টি নয়, বাংলা ভাষায় লিখিত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এ উপন্যাসের জন্য লেখক আদমজি পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করেন। 'অভিশপ্ত নগরী'তে যিরুজালেম নগরী পতনের কথা আছে। 'পাপের সন্তানে' সেই পতনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত। এই দীর্ঘ সময়ে ইহুদিদের সঙ্গে অন্য ধর্ম-জাতির অনেকেরই বিয়ে এবং সন্তান জন্মের ঘটনা ঘটে। পরজাতি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ইহুদি সন্তানদের পাপের সন্তান আখ্যা দিয়ে তাদের ধ্বংস কামনা করা হয়। এই উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী মিকা ও শদরা ধর্মীয় ও সামাজিক এই বিধি নিষেধ অতিক্রম করে নীলনদের তীরে এসে নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়। এই নতুনের প্রতি ইঙ্গিতই উপন্যাসের মূল কথা।

প্র : তাঁর রচিত পাপের সন্তান ও অভিশপ্ত নগরী উপন্যাস দুটি বিখ্যাত কেন?

উ : এই উপন্যাস দুটোর কাহিনি গৃহীত হয়েছে বাইবেল থেকে। বাংলাদেশে বাইবেল থেকে কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনা ও প্রথম।

প্র : তিনি কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), একুশে পদক (মরণোত্তর ১৯৮৬)।

প্র : তাঁর মৃত্যু সাল কত?

উ : ৫ই ডিসেম্বর ১৯৮১; শান্তিনিকেতন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্র : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মসন কত?

উ : ১৮৮২।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : নিমতাগ্রাম, কলকাতা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি।

প্র : প্রথম জীবনে তিনি কোন পেশায় জড়িত ছিলেন?

উ : ব্যবসায়।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : এন্ট্রান্স (১৮৯৯), এফ.এ (১৯০১)।

প্র : তাঁর কবিতার ভাববস্তু কী?

উ : দেশাত্মবোধ, শক্তির সাধনা ও মানবতার বন্দনা।

প্র : তাঁর বহুল প্রচলিত কবিতার নাম কী?

উ : 'মেথর'।

প্র : তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ কিভাবে?

উ : ছন্দের ঝঙ্কারে।

প্র : তিনি কী হিসেবে খ্যাত?

উ : 'ছন্দের রাজা' ও 'ছন্দের জাদুকর' হিসেবে।

প্র : তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগুলোর নাম কী?

উ : সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৯০৬), কুহু ও কেকা (১৯১২), অভ্র আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৯), বেলা শেষের গান (১৯২৩), বিদায় আরতি (১৯২৪), কাব্য সঞ্চয়ন (১৯৩০)। অনুবাদকাব্য : তীর্থরেণু (১৯১০), মণি মঞ্জুষা (১৯১৫)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?

উ : ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯২২।

প্র : তাঁর মৃত্যুর পর রচিত 'সত্যেন-প্রয়াণ' কবিতা কে লেখেন?

উ : কাজী নজরুল ইসলাম।

'ঝর্ণার গান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ঝর্ণার গান' কবিতায় ঝর্ণাকে কবি কী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন?

উ : সুন্দরের প্রত্যাশায় যারা থাকেন তাদের খোঁজকারী মানুষ হিসেবে; বিশেষভাবে বললে, 'নারী' হিসেবেও বলা যায়।

প্র : 'ডালচিনি' কী?

উ : 'দারচিনি'র বানান পার্থক্যে 'ডালচিনি' হয়। মসলারূপে ব্যবহৃত সুগন্ধ ও মিষ্টঝালস্বাদের গাছের ছালবিশেষ।

প্র : 'দুপুর-ভোর' অর্থ কী?

উ : দুপুর ভরে বা সারা দুপুর।

প্র : ঝর্ণার সারা গায়ে পুলক কেন?

উ : আনন্দে।

প্র : 'বিজন দেশ, ক্‌জন নাই' অর্থ কী?

উ : জনহীন এলাকা, পাখির ডাকও নেই।

প্র : যখন 'বিজন দেশ, ক্‌জন নাই' তখন ঝর্ণা কী করে?

উ : একা একাই নিজের পায়ে তাল বাজায়, একাই গান গায়, একাই চলে।

প্র : ঝর্ণা যখন এভাবে নির্ভার হয়ে চলে তখন পাহাড় কী করে?

উ : চোখ পাকিয়ে ভয় দেখায়।

প্র : ঝুম-পাহাড় কী?

উ : ঘন গাছপালা বিশিষ্ট নিঃশব্দ পাহাড়।

প্র : 'কোন গিরির হিম ললাট / ঘামল মোর উদ্ভবে'– অর্থ কী?

উ : ঝর্ণার উদ্ভব কোনো পাহাড় থেকে। কবি কল্পনা করছেন, পাহাড়ের কপাল ঘেমে উঠে সেই ঘাম থেকে ঝর্ণার উদ্ভব। অসাধারণ কল্পনা!

প্র : 'বুলবুলির বোল সাধি' অর্থ কী?

উ : বুলবুলি পাখির মতো কথা বলি।

প্র : কালসার কী?

উ : এক বিশেষজাতের হরিণ। এই জাতের হরিণের শিরদাঁড়ায় কালো রঙের দাগ থাকে।

প্র : ডালচিনি কী?

উ : ডালচিনি আর দারুচিনি একই। যার ডাল চিনির মতো (মিষ্টি অর্থে)। দারুচিনিও তাই। দারু অর্থ কাঠ। যে দারু বা কাঠ চিনির মতো।

প্র : এই কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোনটুকু? কেন?

উ : 'নিম্নে যাই, শুনতে পাই ..... আমরা যাই তার পাশেই।' কারণ, এখানে শুধু প্রাকৃতিক ঝর্ণার কথা বলা হয় নি, সত্য ও সুন্দরের অন্বেষণের কথাও বলা হয়েছে। যে মানুষের কণ্ঠে স্বচ্ছ জলের জন্য তৃষ্ণা অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, মনুষ্যত্ব ইত্যাদির জন্য আকুতি সে কষ্ট করবে। আর যে পঁচা, নষ্ট, অসুন্দরের পেছনে থাকে, তাকে কষ্ট করতে হয় না। এখানে 'ফটিক জল' দিয়ে সুন্দর আর 'পাতকুয়ার জল' দিয়ে অসুন্দরকে বোঝানো হয়েছে।

সমর সেন

প্র : সমর সেনের জন্ম কত সালে?

উ : ১০ই অক্টোবর, ১৯১৬।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : বাগবাজার, কলকাতা।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : কবি। তাঁকে আধুনিক যুগের নাগরিক কবি বলা হয়?

প্র : তাঁর কবিতায় কোন দিকটি বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত হয়েছে?

উ : নগর জীবনের ক্লেদ ও গ্লানি, মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, সংশয়, নীতিহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সংগ্রামী গণচেতনা।

প্র : তিনি কার কাব্যধারার বিপরীতে কবিতা লিখেন?

উ : রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিপরীতে।

প্র : তিনি কোন সাহিত্যের একজন দক্ষ অনুবাদক?

উ : রুশ সাহিত্যের।

প্র : তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), নানাকথা

(১৯৮২), কোলাহল (১৯৮৩), চির পুরুষ (১৯৮৬), গল্প সমগ্র কবিতা (১৯৫৮) প্রবন্ধগ্রন্থ : বাঙ্ময় পুরাণ (১৯৭৮)।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ১৯৮৭।

সমরেশ বসু

প্র : সমরেশ বসু কত সনে জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৪।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : রাজাপুর গ্রাম, বিক্রমপুর-মুন্সিগঞ্জ।
প্র : তাঁর উপন্যাসের মূল বিষয় কী?
উ : শ্রান্তাজীবন, সমাজের বিকৃতরূপ উন্মোচন ইত্যাদি।
প্র : তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উ : গঙ্গা (১৯৫৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), বিবর (১৯৬২), শ্রীমতী ক্যাফে (১৯৫৪), বিটি রোডের ধারে (১৯৫৩), দেখি নাই ফিরে ইত্যাদি।
প্র : 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাটকল শুরু হওয়া এবং তার সঙ্গে জড়িত শ্রমিক শ্রেণির জীবন নির্ভর উপন্যাস। ফরাশডাঙার নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের সুখদুঃখ, সমাজের পরিবর্তনের কাহিনির এক বিশ্বস্ত পরিচয় এখানে আছে।
প্র : 'জগদ্দল' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'জগদ্দল' (১৯৬৬) উপন্যাসের মূল উপজীব্য বাংলাদেশে শিল্পায়নের ইতিহাস ও তার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজের টানাপোড়েন। এটা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার জগদ্দল অঞ্চলের চটকলের প্রতিষ্ঠা এবং কারখানা সংলগ্ন জনপদের আখ্যান। 'উত্তরঙ্গ' নামক উপন্যাসের এটি পরবর্তী খণ্ড বলা চলে। উত্তরঙ্গের কাল ছিল আঠাশো ষাট থেকে আশি-বিরাশি, জগদ্দলের কাল শুরু হয়েছে তারপর থেকে। ইউরোপীয় ও ভারতীয় বহু চরিত্রের সমাবেশ এখানে।

[illegible] উপন্যাসের এই [illegible]
[illegible] অভিযোগে [illegible]
[illegible] মহে, [illegible]
[illegible] হচনা।

প্র : 'গঙ্গা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'গঙ্গা' (১৯৫৫) [illegible]
[illegible] মধ্য মহাজীবন [illegible]
[illegible] জীবনসংগ্রামের [illegible]
[illegible] এবং সামগ্রিক [illegible]
[illegible] ছিল, নিশ্চিত [illegible]
[illegible] এক বিশদীর্ণ [illegible]
[illegible] আছে গঙ্গার [illegible]
[illegible] আছে মৃত্যু ও [illegible]
মানবিক উপলব্ধি। 'গঙ্গা' সমরেশ [illegible]
শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম।
প্র : 'বিবর' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
উ : 'বিবর' (১৯৬২) উপন্যাসে [illegible]
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ, [illegible]
মূল্যবোধের প্রতি অনিষ্ঠতা ও [illegible]
পুরাবোধের অভিলাষা এবং [illegible]
এই কাহিনিটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে
সমকালে নির্মিত এবং পরে [illegible]
অভিনন্দিত এই উপন্যাস সমরেশ বসুর
অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।
প্র : 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।
উ : ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে 'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশ বসুর উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। একই সঙ্গে তিনি সাহিত্য থেকে ঝুঁকলেন অধ্যাত্মজীবনের দিকে। দীর্ঘ বছর প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে যে কুম্ভমেলা হয় এবং সেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের মানুষের যে সমাবেশ ঘটে, সেই মিলনমেলাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। এ তাতে অভিব্যক্ত হয়েছে মানুষের বিশ্বাসে সংকট থেকে উত্তরণের আকুতি।
প্র : তাঁর উপন্যাসে কোন দিকটি দৃশ্যমান?
উ : মানুষের শাশ্বত বেদনা, গ্লানি, মনুষ্যত্বের দায় এবং সংকট।
প্র : তিনি কোন ছদ্মনামে লিখতেন?
উ : কালকূট।

[illegible] অভিযোগে তাঁর কোন
উপন্যাসের বিরুদ্ধে মামলা হয়।
[illegible], অট্টহাসা আমে বসে বিবাদ
[illegible] হয় নি।
[illegible] কী পুরস্কার লাভ করেন?
[illegible] পুরস্কার (১৯৭৭), আদিত্য
একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৭)।
[illegible] কত সনে মৃত্যুবরণ করেন?
১২ই মার্চ, ১৯৮৮

সরদার জয়েনউদ্দীন

সরদার জয়েনউদ্দীনের জন্মসন কবে?
১৯১৮।
তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
ধলেশ্বরটি গ্রাম, পাবনা।
তিনি মূলত কী ছিলেন?
প্রাবন্ধিক।
তাঁর গল্প উপন্যাসে কোন বিষয়টি নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে?
সমকালীন সমাজের সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, গ্রামীণ সমাজের প্রবহমান মানুষের দুঃখ-বেদনা এবং জমিদার, জোতদার ও মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের চিত্র।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের নাম কী?
উপন্যাস : আদিগন্ত (১৯৫৯), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৭), বেগম শেফালী চৌধুরী (১৯৬৮), বোদের ঢেউ (১৯৭৫) ইত্যাদি। ছোটগল্প : নয়ন তুলি (১৯৫২), ঘরশ্রোত (১৯৫৫), বেলা ব্যানার্জির প্রেম (১৯৬৮), অষ্টপ্রহর (১৯৭৩)।
'আদিগন্ত' উপন্যাসের পরিচয় দাও।
সরলা ও মেহের নয়াতির প্রেমের কাহিনি বর্ণনার ভেতর দিয়ে পল্লিসমাজের জটগুলো অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে সরদার জয়েনউদ্দীন রচিত 'আদিগন্ত' উপন্যাসে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। গ্রামের পির খোরশেদ আলি, বৈষ্ণব কন্যা সরলার সঙ্গে মুসলমান মেহেরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খোরশেদ উভয়ের ধর্মের দোহাই দেয়। কিন্তু সরলার প্রতি কাম অনুভব

[illegible] তাঁর কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
[illegible] পুরস্কার (১৯৭৩), [illegible]
[illegible] পুরস্কার (১৯৮৭)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩), আদমজী পুরস্কার (১৯৮৫)।
প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫

সাদিক আহমেদ

প্র : সাদিক আহমেদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : শিক্ষাজীবন অনুসারে [illegible] তাঁর জন্ম [illegible] ঢাকার ইসলামপুরের [illegible]
প্র : তাঁর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন পর্যন্ত?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে [illegible] সম্পর্কে বিষয়ে [illegible] এবং [illegible] ডক্টরেট ডিগ্রি [illegible]
প্র : তিনি কোন পদে অবসর নিয়েছেন?
উ : বাংলা একাডেমির [illegible] অবসর নিয়েছেন।
প্র : তাঁর রচিত নাটকসমূহের নাম কী?
উ : কালবেলা (১৯৬১), মহাপতঙ্গ (১৯৬৪), দুরন্ত (১৯৬৯), প্রতিদিন একদিন (১৯৭২), শেষ নবব (১৯৮৭)।
প্র : তিনি বাংলাদেশের নাটকে কোন ধারার প্রবর্তক?
উ : আবেগার্তধারা।
প্র : কিভাবে তিনি আবেগার্ত ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন?
উ : ১৯৫৪ সালে লন্ডনে নাট্যগুরু বেকেটের নাটক দেখে তিনি আবেগার্ত ধারার প্রতি আকৃষ্ট হন।

প্র : 'নট আই' কী?
উ : সাঈদ আহমদ রচিত ইংরেজি নাটক। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে অবস্থানকালে তিনি এটি রচনা করেন। নাটকটি প্রশংসিতও হয়। কিন্তু এর পাণ্ডুলিপি তিনি নিজেই ছিঁড়ে ফেলেন।
প্র : তাঁর 'কালবেলা' নাটক কোন পরিপ্রেক্ষিতে রচিত?
উ : পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬০ সালে সংঘটিত হয় প্রবল ঘূর্ণিঝড়। এই ঝড়কে পটভূমি করে পরের বছরই সাঈদ আহমদ রচনা করেন ইংরেজি নাটক 'দা ফিংক'। এটি করাচিতে মঞ্চায়ন করে আমেরিকান এক নাট্যদল। পরে উর্দুতে মঞ্চায়ন হয় করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে। এই নাটক 'কালবেলা' নামে বাংলায় অনূদিত হয়ে ঢাকায় মঞ্চায়ন হয় ১৯৬২ সালে।
প্র : তাঁর 'তৃষ্ণায়' নাটক কোন ইংরেজি নাটকের অনুবাদ?
উ : 'দা সারভাইবেল'।
প্র : অ্যাবসার্ডধর্মী নাটকের বাইরে সাঈদ আহমদের অন্য নাটকগুলো কী?
উ : অ্যাবসার্ড ধারার বাইরে এসে ১৯৭৫ সালে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে লেখেন 'প্রতিদিন একদিন' নাটক। তাঁর রচিত শেষ নাটক 'শেষ নবাব' (১৯৮৭) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনালোকে রচিত।
প্র : নাট্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি আর কী লিখেছেন? কী করতেন?
উ : নাটকের পাশাপাশি তিনি সঙ্গীত ও শিল্প-সমালোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এসব বিষয়ে তাঁর প্রকাশিত বইসমূহ : আর্ট ইন বাংলাদেশ, পেইন্টিং ইন বাংলাদেশ, ফাইভ পেইন্টিংস অব বাংলাদেশ, কনটেম্পোরারি আর্ট, কনটেম্পোরারি আর্ট অব বাংলাদেশ। 'বিশ্বনাটক' নামে দীর্ঘদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তিনি পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনে।
প্র : তিনি কোন কোন পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৫), জার্মানির ট্রাস্টেল অ্যাওয়ার্ড (১৯৮৩), ফরাসি সরকারের সর্বোচ্চ লিজিওন ডি অনার (১৯৯৩), ডিগ্রিত এবেলা ফিরেছিল আসলের নাম হওয়া হয়েছে 'সাঈদ আহমেদ বো'।
প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঢাকার এইচ মাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। তিনি লিভারসংক্রান্ত ছিলেন।

সানাউল হক

প্র : সানাউল হকের জন্ম কবে, কোথায়?
উ : মে ২৩, ১৯২৪; চাটরা গ্রামবাড়িয়া।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : কবি।
প্র : তাঁর কবিকল্পনার অনুভূতি কী ছিল?
উ : প্রেম, নিসর্গ, স্বদেশ ও নিজস্ব মানসিক কল্পনা অনুভূত।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : নদী ও মানুষের কবিতা (১৯২৯), অনন্যা (১৯৬২), সূর্য অন্তহর (১৯৬৫), বিচূর্ণ আর্শিতে (১৯৭৩), পরিধি (১৯৭৬), উত্তীর্ণ পঞ্চাশে (১৯৮৬), রম্যরচনা: বন্দর থেকে বন্দরে (১৯৮৪)।
প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?
উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৮৩)।
প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?
উ : ৪ঠা মে, ১৯৯৩।

সিকান্দার আবু জাফর

প্র : সিকান্দার আবু জাফরের জন্মসন কবে?
উ : ১৯১৯।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : তেঁতুলিয়া গ্রাম, খুলনা (বর্তমানে সাতক্ষীরা)।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার ও অভিনেতা।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী ছিল?
উ : সৈয়দ মুহম্মদ হাশেমী।
প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?
উ : ম্যাট্রিক পাস, ১৯৩৬।
প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?
উ : সংবাদিকতা
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : দৈনিক ইত্তেফাক, সহযোগী সম্পাদক (১৯৫৩); দৈনিক মিল্লাত, সহযোগী সম্পাদক (১৯৫৪); মাসিক সমকাল সম্পাদক (১৯৫৭)।
প্র : তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?
উ : মাসিক সমকাল। (এ-প্রসঙ্গে আরো জানার জন্য দ্রষ্টব্য এই বইয়ের 'বাংলা পত্র-পত্রিকা' অংশ।)
প্র : তাঁর রচিত সংগ্রামের বিখ্যাত গান কোনটি?
উ : গ্রামের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির নাম কী?
উ : কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫), কবিতা (১৩৭২), বৃশ্চিকলগ্ন (১৯৭১) ইত্যাদি। নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)। উপন্যাস : মাটি আর অশ্রু (১৯৪২), ঝড়ের পথে (১৯৪২), পূরবী (১৯৪৪), নবী কাহিনী (১৯৫১)।
প্র : সিকান্দার আবু জাফরের 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটকের পটভূমি ও পরিচয় দাও।
উ : সিরাজউদ্দৌলা নাটকের পটভূমিতে ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে এসেছিল দেশ আবিষ্কার করার নেশায়। তারই পথ ধরে ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আসে বাণিজ্য করতে। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমান এই কোম্পানি ভারতের দূরবর্তী বন্দরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়। এদের চেয়ে তারা ছোপাপাড়ে-কোম্পানি হিসেবেও আলাদা বিস্তারে ফরাসিরাও এরা পড়ে। সিরাজ সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তার পুত্র বাহাদুর শাহর মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় বসার সিরাজ মসনদে বসেন তিনি ইংরেজদের সঙ্গে এবং ফরাসিদের বাণিজ্যকুঠি করেন। দুটির প্রথমে শর্ত ছিল মূলত ইংরেজদের পক্ষে। * ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মাত্র তিন হাজার টাকা বার্ষিক রাজস্ব দেয়ার পরিবর্তে সম্রাটের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে। * কলকাতার আশপাশের আরও তিনটি গ্রামের জমিদারির সনদ কোম্পানি পাবে। * কোম্পানির কোনও ব্যবসায়ীকে কোনও রকম অনুমতিপত্র ছাড়া দেশের আর কোথাও আটক করা যাবে না। * কোম্পানির মালামাল চুরি হলে সরকার তা ফেরত দেবার চেষ্টা করবে। * কোম্পানি নবাবের টাকশালে বিনামূল্যে টাকা তৈরি করবে। * এ দেশীয় কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানির থাকবে। কিন্তু অভিযোগ ছিল আমলে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয়। নবাব সিরাজের ক্ষমতারোহণের কয়েক এই সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয় পলাশির ঐতিহাসিক যুদ্ধ। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন, মুর্শিদাবাদের পলাশি প্রান্তরে সেই রক্তক্ষয়ী দিন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার সূর্য প্রায় দুশ বছরের জন্য অস্তমিত হবার দিন। ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার। নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। নবাবের পক্ষে মির মর্দান, ফরাসি বীর সাঁফ্রে, মোহনলালের মত ছোটখাট সেনাপতিরা প্রাণপণে লড়াই করল দেশমাতার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। বিশাল সৈন্যবাহিনী সেনাপতি মিরজাফর আলি খাঁ নির্দেশে নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। পলাশির প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

...জরা এদেশের শাসক হয়ে ওঠে। যদিও ক্লাইভের হাতের পুতুল নবাব মিরজাফর মসনদে বসে কিন্তু সেটা আসলে প্রহসন মাত্র। সংবেদনশীল কবি, নাট্যকার, সিকান্‌দার আবু জাফর এই পটভূমিকে ব্যবহার করে 'সিরাজ-উ-দ্দৌলা' নাটক রচনা করেন। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে নাটকটি রচিত এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে ইসমাইল মোহাম্মদের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে আবার অভিনীত হওয়া ছাড়াও এ নাটক বাংলা একাডেমী এবং পাকিস্তান সরকারের জাতীয় পূনর্গঠন সংস্থার অর্থানুকূল্যে ১৯৬৩ সালে ঢাকাতে অভিনীত হয়। নাটকটি বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৬৫ (পৌষ ১৩৭২) সালে। এটি বিষয়গুণে ঐতিহাসিক এবং রসবিচারে ট্র্যাজেডিধর্মী নাটক।

এই নাটকে উল্লেখযোগ্য চরিত্র উনত্রিশটি। এছাড়াও রয়েছে দশের অধিক অপ্রধান চরিত্র। স্বল্পসময়ের জন্য মঞ্চে উপস্থিত চরিত্র নিয়ে মোট চরিত্র সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো নায়ক সিরাজ। অন্যান্য

...প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করে সিরাজচরিত্রের দুর্বলতাসমূহ উল্লেখ করেন নি। একই বিষয় নিয়ে রচিত নাটকে সিরাজের চরিত্রে অন্য লেখকগণ কামুকতা, লাম্পট্য, পরস্ত্রীলোভ, অসহিষ্ণুতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, মদ্য ও নেশায় আসক্তি, অকর্মণ্যতা, নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সিকান্‌দার আবু জাফরের সিরাজ দেশপ্রেমিক, সাহসী, ধৈর্যশীল, বীরযোদ্ধা, প্রজ্ঞাবান, কর্তব্যপরায়ণ, বলিষ্ঠচিত্ত, তেজস্বী, দয়ালু, প্রজাপালক, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, উদার, সরল, মহৎপ্রাণ, দৃঢ়চরিত্র, নারী আসক্তিহীন, কর্তব্যপরায়ণ দেশনেতা।

প্র : কত সনে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন?

উ : ১৯৬৬।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ৫ই অগস্ট, ১৯৭৫।

'আশা' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আশা' কবিতায় কবি কোথায় সুখ খুঁজে পেয়েছেন?

উ : দরিদ্র মানুষের মনের মাঝে।

প্র : 'নিশুত' অর্থ কী?

উ : শব্দটি 'নিশুতি'; মানে 'মুখাবাস'

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
প্র : তাঁকে কী বলা হয়?
উ : কিশোরকবি।
প্র : তাঁর কবিতায় কোন দিকটি বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায়?
উ : শোষিত মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের হুঙ্কার।
প্র : তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কী?
উ : ছাড়পত্র (১৩৫৪), ঘুম নেই (১৩৫৭), পূর্বাভাস (১৩৫৭), অভিযান (১৩৬০), হরতাল (১৩৬৯) ও গীতিগুচ্ছ (১৩৭২)।
প্র : 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।
উ : 'ছাড়পত্র' (১৯৪৭) কবির মৃত্যুর তিনমাস পর প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা রাজনৈতিক কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনেক কবিতা বলিষ্ঠ উচ্চারণে এবং মৌলিক চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অসামান্য। 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি / নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'- এই পঙ্‌ক্তিগুলো কাব্যটিকে মহিমান্বিত করেছে।
প্র : পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তিনি কোন সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন?
উ : আকাল।
প্র : 'আকাল'-এর পরিচয় দাও।
উ : 'আকাল' (১৯৪৩) একটি সংকলন। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই সংকলনের কবিতাগুলির মূল প্রেরণা। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংকলন ও সম্পাদনা করে এই কবিতাগুচ্ছের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছিলেন সুকান্ত। ১৯৬৬ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সুকান্তের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত একমাত্র গ্রন্থ।
প্র : 'এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি'—কে বলেছেন?
উ : কবি সুকান্ত।
প্র : সুকান্ত কত বছর বয়সে কিভাবে মারা যান?
উ : ২০ বৎসর ৯ মাস বয়সে যক্ষ্মা রোগে।
প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কবে?
উ : ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪।

'রানার' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : রানার কবিতাটি কবি কাদেরকে নিয়ে লিখেছেন?
উ : শ্রমজীবী মানুষদের।
প্র : রানার কারা?
উ : ডাক হরকরা (যারা ধাপকের কাছে প্রেরিতের চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়।)
প্র : 'রানার' কী?
উ : 'রানার' কথাটি এখন ডাকবিভাগে চালু নেই। এখন 'পোস্টম্যান' বা [illegible] বিলিকারী চালু আছে। আগে [illegible] থেকে এনে একই ব্যক্তি ধাপকের কাছে চিঠি পৌঁছে দিতেন, তিনিই [illegible] রানার। এখন এসব কাজ একাধিক ব্যক্তি করেন। রানাররা যখন চিঠিসহ পথ চলতেন তখন তাদের হাতে [illegible] হেরিকেনসহ একটি বল্লম ও [illegible] থাকতো। হেরিকেন থাকত পথে [illegible] ফেলার জন্য, বল্লম থাকত [illegible] জন্য। আর বাদ্যঘণ্টা থাকত [illegible] চলমান অস্তিত্ব জানান দেবার জন্য।
প্র : দুর্বার অর্থ কী?
উ : যা নিবারণ করা যায় না।
প্র : লণ্ঠন অর্থ কী?
উ : হেরিকেন বা তেল দিয়ে চালিত [illegible] আবৃত দীপশিখা। এটি ইংরেজি শব্দ 'Lantern' থেকে এসেছে। তাই এখানে ঠ-এর সাথে ন হবে, ণ হবে না।
প্র : রানারদের চোখে-মুখে কী ছিল না?
উ : ক্লান্তি।
প্র : রানার কিভাবে ছুটে চলেছেন?
উ : দুর্গম পথ হোক, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক- তারা কাজের প্রয়োজনে অবিরাম ছুটে চলেছে।
প্র : রানারের কাছে পৃথিবীটা কালো 'ধোঁয়া' মনে হয় কেন?
উ : অভাবের তাড়নায়।
প্র : 'ঘরে তার প্রিয়া একা শয্যায় বিনিদ্র রাত জাগে।' —এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : রানারেরা ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে কর্তব্যকর্ম করে। তাদের খোঁজ রাখারও কেউ নেই। প্রিয়া তাদের মঙ্গল কামনা করে রাত জাগে।
প্র : [illegible] ভয়ের চেয়েও রানার সূর্য ওঠাকে বেশি ভয় পায় কেন?
উ : [illegible] কারণে। এই পঙ্‌ক্তিটি [illegible] সৃষ্টি। রানারের ব্যাগে কারো [illegible] টাকা থাকায় তা লুট হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সে ভয়ের চেয়েও [illegible] চিঠি সূর্য ওঠার আগেই যাতে পৌঁছে দেয়া যায়, সেই কর্তব্যবোধই তাড়িত করে রানারকে।
প্র : রানার রাতের আঁধারে কিভাবে ছুটে চলেছে?
উ : রাতের লণ্ঠন আর ঘণ্টা ঠন্‌ঠন করে।
প্র : রানারদের বোঝা টানার দিন শেষ হবে না কেন?
উ : আর্থিক অভাব অনটনের কারণে। আর এ সমাজ শ্রমজীবীদের শ্রমের প্রকৃত মূল্য নিতে চায় না বলে।
প্র : ভোরের আকাশে সহানুভূতির চিঠি নিয়ে রানার কোথায় ছুটে চলেছে?
উ : দুর্গম পথে।
প্র : কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে রানারদের কখন সুখের সোনালি আলো দেখা দেবে?
উ : যখন কাজের মাধ্যমে এই পৃথিবীকে তারা জয় করতে পারবে।
প্র : জোনাকির আলোয় পথ চলেছে কে?
উ : রানার।
প্র : রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?
উ : কষ্টের কালিমা দূরীভূত হয়ে যখন রানারদের সুখের সোনালি আলো দেখা দেবে।
প্র : রানার ভোরে কোথায় পৌঁছে যায়?
উ : নতুন খবর আনতে।
প্র : রানার পেছনে ফিরে তাকানোর সময় পায় না কেন?
উ : প্রিয়জনের কাছে যথাসময় খবর পৌঁছে দেওয়া তার কাছে জরুরি। তাই পেছনে ফিরে তাকানোর সময় পায় না।
প্র : 'রানার' কবিতায় কী প্রকাশ পেয়েছে?
উ : নিপীড়িত গণমানুষের প্রতি কবির গভীর মমতা।
প্র : 'মেসে' শব্দ দিয়ে কবিতাতে কী বোঝানো হয়েছে?
উ : 'মেল'-এ, অর্থাৎ ডাকে। ইংরেজি 'Mail'কে বাংলায় লেখা হয়েছে।
প্র : 'রানার' কবিতায় শেষ স্তবকে কী উল্লেখ করা হয়েছে?
উ : সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, ভীরুতা কাটিয়ে শ্রমজীবীদের জীবনধারায় নতুন প্রভাত আনা অর্থাৎ দিনবদলের কথা বলা হয়েছে।

'আঠারো বছর বয়স' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
উ : ছাড়পত্র (১৯৪৭)।
প্র : কবি সুকান্তের ধারণায় সব অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন বয়স?
উ : ১৮ বছর।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটির স্তবক সংখ্যা-
উ : আট।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
উ : মাত্রাবৃত্ত।
প্র : 'প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা-
উ : সুকান্ত ভট্টাচার্য।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো' শব্দের কতবার ব্যবহার আছে?
উ : নয়বার।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর' কথাটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?
উ : সাতবার।
প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর সাল কোনটি?
উ : ১৯৪৭ সাল।
প্র : 'ছাড়পত্র' কাব্য গ্রন্থটি কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে (মূল বই ১৮৪৮)।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি রচিত- কত মাত্রায়?
উ : ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায়?
উ : বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলায়।
প্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
উ : আকাল (সুকান্তের জীবিতাবস্থায় একমাত্রগ্রন্থ)।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য
উ : * যৌবনের উদ্দীপনা * সাহসিকতা * দুর্বার গতি।
প্র : 'তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা'- এখানে যন্ত্রণাগুলো কী?
উ : * অন্যায়। * অত্যাচার। * সামাজিক বৈষম্য।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা কত?
উ : ১৪।
প্র : আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?
উ : দুঃসাহস।
প্র : আঠারো কীসের প্রতীক?
উ : যৌবনের, প্রতিবাদের, আত্মপ্রত্যয়ের।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তি কী?
উ : 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'এ বয়স' শব্দটির ব্যবহৃত হয়েছে কয়বার?
উ : ১২ বার।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় 'আঠারো বছর বয়স' শব্দটি আছে কয় বার?
উ : ৪ বার।
প্র : তিনি ফ্যাসিবিরোধী শিল্পী সংঘের পক্ষে কোন কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন?
উ : 'আকাল' (১৯৪৩)।
প্র : বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি কেমন?
উ : অগ্রণী।
প্র : আঠারো বছর বয়স বেদনায় কাঁপে—
উ : থরোথরো।
প্র : আঠারো বছর বয়সে কী নেই?
উ : ভয়।
প্র : আঠারো বছর বয়স কী জানে না?
উ : কাঁদা।
প্র : দুঃসাহস, অসহ্য, ক্ষত-বিক্ষত, অন্তর্জ্বালা শব্দগুলোর উচ্চারণ লেখ।
উ : দুর্শশাহোশ, অশোজকো, ক্ষত-বিকখতো, জয়োদ্‌ধোনি।
প্র : আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে কী ভাঙতে চায়?
উ : পাথর।
প্র : আঠারো বছর লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে কী রং ধারণ করে?
উ : কালো।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার চরণে মাত্রা বিন্যাসের ধরন কী?
উ : ৬+৬+২।
প্র : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার লাইন সংখ্যা কয়টি?
উ : ৩২টি।
প্র : কবিতায় পঞ্চম স্তবকে লাইন সংখ্যা কয়টি?
উ : ৪টি।

'প্রার্থী' কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'প্রার্থী' কবিতা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : 'ছাড়পত্র'
প্র : 'ছাড়পত্র' কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : 'প্রতীক্ষা' অর্থ কী?
উ : অপেক্ষা বা সবুর।
প্র : 'প্রতীক্ষা'-এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : প্রতি+ঈক্ষা।
প্র : 'প্রার্থী' কবিতায় সূর্যের জন্য প্রতীক্ষার সঙ্গে কিসের তুলনা করা হয়েছে?
উ : ধানকাটার অপেক্ষায় থাকা কৃষকের চঞ্চল চোখের।
প্র : এই তুলনা করার মধ্যে সুকান্তের কী প্রকাশ পেয়েছে?
উ : কবিতার সঙ্গে শ্রমজীবী কৃষক-শ্রমিকের সম্পৃক্ত করার মানসিকতা।
প্র : 'রোদ্দুর' কী?
উ : রৌদ্র।
প্র : এই কবিতায় 'আমরা' বলতে কবি কাদের বোঝাচ্ছেন?
উ : দরিদ্র মানুষদের- যাদের গরম কাপড় কিনবার সামর্থ্য নেই, যাদের কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি নেই।
প্র : 'রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।'- এই 'উলঙ্গ' ছেলে কারা?
উ : এদের 'পথশিশু' বলে। কবি কবিতার স্বার্থে এখানে 'ছেলে' বললেও আসলে এটা ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে, সব অনাথ পথশিশুকেই বোঝান হচ্ছে।
প্র : 'জ্বলন্ত' সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : জল+অন্ত।
প্র : 'অগ্নিপিণ্ড' কী?
উ : আগুনের গোলাকার কিছু বা আগুনের দলা।
প্র : 'জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড' কী?
উ : যে আগুনের দলা জ্বলছে।
প্র : 'একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে / পরিণত হব' —এই বক্তব্য দিয়ে কী বোঝান হচ্ছে?
উ : কবিতার কথক একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি বলছেন, এমন একদিন আসবে যে দিন গরিব মানুষগুলো সূর্যের মতোই অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে নিজেরা জড়তামুক্ত হবে। এর ফলে সব বৈষম্য দূর হলে গরিব মানুষের জন্য উত্তাপের অভাব হবে না।
প্র : 'প্রার্থী' কবিতার মর্মার্থ কী?
উ : সভ্যতার সূচনায় আছে অগ্নি, আর অগ্নির আধার সূর্য। শীতে বস্ত্রহীন দরিদ্র মানুষেরা তাই সূর্যের কাছে উত্তাপ প্রত্যাশী। শুধু সাময়িক উত্তাপই নয়, সূর্যের কাছ থেকে জ্বলে ওঠার প্রেরণাও তারা কামনা করে। জ্বলে উঠেই তারা ধ্বংস করতে চায় সামাজিক জড়তাকে, প্রতিষ্ঠা করতে চায় সাধারণ মানুষের অধিকার।

সুকুমার রায়

প্র : সুকুমার রায়ের জন্মসন কবে?
উ : ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮৭।
প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?
উ : মাসুয়া গ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?
উ : শিশুসাহিত্যিক।
প্র : তাঁর পিতার নাম কী?
উ : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।
প্র : সত্যজিৎ রায় সুকুমার রায়ের কী?
উ : পুত্র।
প্র : তিনি কিভাবে শিশুদের মন জয় করেন?
উ : অনুপম ভাষায় গল্প, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে।
প্র : তাঁর লেখা কোন বইগুলো বাংলা শিশুতোষ সাহিত্যের অমর সৃষ্টি?
উ : আবোল তাবোল (১৯২৩), হ-য-ব-র-ল (১৯২৬), পাগলা দাশু (১৯৪০), বহুরূপী (১৯৪৪), খাই খাই (১৯৫০) ইত্যাদি।
প্র : তিনি অন্য কী হিসেবে খ্যাত?
উ : সুগায়ক ও সুঅভিনেতা হিসেবে।
প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত সনে?
উ : ১৯২৩।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

প্র : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, কলকাতায়।
প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?
উ : ইন্দুমতী বসুমল্লিক, (দার্শনিক) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
প্র : তাঁর শিক্ষাজীবন কোথায় শুরু হয়?
উ : কাশীতে হিন্দি বলয়ে। তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি পড়তেন। এমন কি ঘরে মায়ের সঙ্গেও হিন্দিতে কথা বলতেন। যে-কারণে বাঙালির সন্তান হয়েও তাঁকে পরে বাংলা শিখতে হয়।
প্র : তিনি কোন কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?
উ : নব-পর্যায় 'সবুজপত্র' (প্রকাশনা সহযোগী : ১৯২৭); দৈনিক ফরওয়ার্ড (সম্পাদকীয় কর্মী : ১৯২৮); ত্রৈমাসিক পরিচয় (সম্পাদক : ১৯৩১); দি স্টেটসম্যান (সহকারী সম্পাদক : ১৯৪৪); দি মাক্সিয়ান ওয়ে (সম্পাদনা সহযোগী : ১৯৪৪)।

প্র : কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি অমর হয়ে আছেন?

উ : ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (১৯৩১)। তিনি একাধারে ১২ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যজগতে পত্রিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্র : তাঁর স্ত্রীর নাম লেখ।

উ : রবি বসু (বিয়ে : ২২/৭/১৯২৪; বিচ্ছেদ : বৎসরাধিক কাল পর); রাজেশ্বরী বসুরায় (বিয়ে : ২৯/৫/১৯৪৩)।

প্র : সুধীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : কাব্যগ্রন্থ : তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), প্রতিদিন (১৯৫৪), দশমী (১৯৫৬); অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থ : প্রতিধ্বনি (১৯৫৪); প্রবন্ধগ্রন্থ : ঘরোয়া (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরুষ (১৯৫৭)।

প্র : তিনি কোন কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছেন?

উ : তন্বী (১৯৩০)। উৎসর্গপত্রে লিখেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য। ঋণশোধের জন্য নয়, ঋণস্বীকারের জন্য।'

প্র : 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত কবির এই দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ২৫টি কবিতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে- 'হৈমন্তী', পথশ্রম, কস্মৈ দেবায়ঃ, সঞ্চয়, মহাসত্য, দ্বন্দ্ব, ভবিতব্য, মহাশ্বেতা, অপচয়, শাশ্বতী, বিস্মরণী, অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি। প্রায় সবগুলোই প্রেমের কবিতা। প্রেমের নায়ক ভোগসর্বস্বতার শেষ পর্যায়ে ক্লান্তি বোধ করেছেন। ভেবেছেন দেহজ মিলনে যে তৃপ্তি, তারও এক সময় অবসান ঘটে, কিন্তু স্মৃতি বড় নির্মম। কিছুতেই মন থেকে বিগত মিলনের আনন্দের স্মরণিকা শেষ হয়ে যায় না। আসলে 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের সর্বত্রই সুধীন দত্তের এই স্মৃতি রোমন্থন দেখা

'একটি কথার বিদ্যা ঘর ঘর ঘুরে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী'।

প্র : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

উ : প্রথমত তিনি আধুনিকতাবাদী পঞ্চপাণ্ডবের একজন (অন্য চারজন : জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে)। অন্যদের সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য হলো, তিনি ক্লাসিক ভাষারীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য কাব্যরীতির সমন্বয়ে কবিতায় বিশিষ্টতা এনেছেন। তাঁর পদ্য স্বাপত্যধর্মী, সুসংবদ্ধ, ঋজু।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে জুন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্র : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম কবে, কোথায়?

উ : ২৬শে অক্টোবর, ১৮৯০; পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়।

প্র : তিনি মূলত কী?

উ : বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী।

প্র : তাঁর কর্মজীবন কোথায় শুরু হয়?

উ : ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির লেকচারার পদে।

প্র : লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কী অর্জন করেন?

উ : ফোনেটিক্সে ডিপ্লোমা ও ডি.লিট।

প্র : তিনি কী কী ভাষা জানতেন?

উ : বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, প্রাকৃত, পারসি, আইরিশ, গোথিক, জার্মান ইত্যাদি।

প্র : সুনীতিকুমারের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?

উ : অরিজিন এন্ড ডেভলেপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৯২৬)।

প্র : সংক্ষেপে এই গ্রন্থকে কী বলে?

উ : ODBL

প্র : রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের প্রশংসা কিভাবে করেন?

উ : 'শেষের কবিতা' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের স্বীকৃতি আছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁকে [illegible] উপাধি দেন।

প্র : সুনীতিকুমার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?

উ : বিভিন্ন ভাষায় ৩৮০টি।

প্র : তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লিখ।

উ : ফোনেটিক রিডার্স (১৯২৮), ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৫৩), ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচর অফ মডার্ন ইন্ডিয়া (১৯৬৩) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২৯শে মে, ১৯৭৭; কলকাতায়।

সুফিয়া কামাল

প্র : সুফিয়া কামাল কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯১১ সালের ২০শে জুন, বরিশালের শায়েস্তাবাদে।

প্র : তাঁর পৈতৃক নিবাস কোথায়?

উ : কুমিল্লায়।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?

উ : মাতা- সৈয়দা সাবেরা খাতুন; পিতা- সৈয়দ আবদুল বারি।

প্র : রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর কবে সাক্ষাৎ হয়?

উ : ১৯১৮ সালে কলকাতায়।

প্র : কবে, কার সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়?

উ : নানাভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে, ১৯২৩ সালে।

প্র : তখন তিনি কী নামে পরিচিত হন?

উ : সুফিয়া এন. হোসেন।

প্র : তাঁকে কী বলা হয়?

উ : জননী সাহসিকা।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কবি।

প্র : তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম কী?

উ : সৈনিক বধূ। রচনা হয় ১৯২৩ সালে। বরিশালের 'তরুণ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

প্র : কার অনুপ্রেরণায় তিনি অভিজাত সৈয়দ বংশের মুসলিম নারীদের পোশাকের পরিবর্তে চরকায় কাটা সুতোর শাড়ি পরিধান আরম্ভ করেন?

উ : ১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে গান্ধীর অনুপ্রেরণায় তিনি এই সাধারণ পোশাক পরিধান আরম্ভ করেন। তাঁদের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন।

প্র : সুফিয়ার স্বামী সৈয়দ নেহাল কবে কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৩২ সালে সন্ধ্যা রোগে।

প্র : কত সালে কার সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়?

উ : ১৯৩৯ সালে চট্টগ্রাম নিবাসী লেখক কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে। এরপর থেকে তিনি 'সুফিয়া কামাল' নাম গ্রহণ করেন।

প্র : সুফিয়া কামাল কোন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন?

উ : 'বেগম' (১৯৪৭) পত্রিকা।

প্র : তিনি কোন মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব দেন?

উ : মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৬৯)। আজ এর নাম বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম কী?

উ : কবিতা : সাঁকের মায়া (১৯৩৮), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মোর যাদুদের সমাধি পরে (১৯৭২), মায়া কাজল (১৯৯১) ইত্যাদি। গল্প : কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)। শিশুতোষ : ইস্কুল বিহঙ্গ (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)। আত্মজীবনী : একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)। ডায়েরি : একাত্তরের ডায়রী (১৯৮৯)।

প্র : তিনি কোন ধরনের কবি?

উ : রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), লেনিন পুরস্কার, রাশিয়া (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

প্র : কবে, কোথায় তাঁর মৃত্যু ঘটে?

উ : ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর, ঢাকায়।

'তাহারেই পড়ে মনে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়—
উ : ১৯৩২ সালে।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি লেখা কোন ছন্দে?
উ : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে।
প্র : 'কেয়ার কাঁটা' কোন জাতীয় গ্রন্থ?
উ : গল্প।
প্র : মাঘের সন্ন্যাসী কোন ঋতু?
উ : শীত ঋতু।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?
উ : মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায়।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার মাত্রার পর্ব কেমন?
উ : আট ও দশ।
প্র : বেগম সুফিয়া কামালের পৈতৃক নিবাস কোথায়?
উ : কুমিল্লায়।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার বক্তব্য–
উ : কবিজীবনের খ্যাতির অন্তরালে বেদনাকে স্মরণ।
প্র : কবিতাটিতে উল্লেখ আছে এমন দুটি ফলের নাম লেখ।
উ : * বাতাবি নেবু
* আম
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্ত বন্দনায় কবির বিমুখতার কারণ কী?
উ : প্রিয়বিয়োগ।
প্র : 'তরী তার এসেছ কি?' কোন কবিতার অংশ?
উ : তাহারেই পড়ে মনে।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারিনা কোন মতে'– কবির কাকে মনে পড়ে?
উ : শীত ঋতুকে।
প্র : 'কুহেলি উত্তরীতলে মাঘের সন্ন্যাসী'-এর অর্থ কী?
= শীতকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সন্ন্যাসী কুয়াশার (কুহেলি) চাদরের (উত্তরী) নিচে যেন বসে আছেন।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার স্তবক ও লাইন সংখ্যা কয়টি?
উ : স্তবক সংখ্যা ৫টি, লাইন সংখ্যা ৩০টি।
প্র : কবিতায় কোন দুটি বাংলা মাসের নাম উল্লেখ করেছে?
উ : মাঘ ও ফাগুন (ফাল্গুন)।
প্র : কবিতায় উল্লেখকৃত বাংলা ঋতুর নাম কী?
উ : বসন্ত।
প্র : কবিতায় 'তাহারেই পড়ে মনে' পঙ্‌ক্তিটি কয়বার এসেছে?
উ : ১ বার।
প্র : 'পুষ্পার্ঘ্য' শব্দের অর্থ কী?
উ : ফুলের বন্দনা বা নিবেদন।
প্র : 'কুহেলি' শব্দের অর্থ কী?
উ : কুয়াশা; কুজ্ঝটিকা।
প্র : 'উত্তরী' শব্দের অর্থ কী?
উ : চাদর; উত্তরীয়।
প্র : সুফিয়া কামালের স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন কবে মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ১৯৩২ সালে।
প্র : 'তাহারেই পড়ে মনে, কবিতার দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?
উ : নাটকীয়তা ও সংলাপনির্ভরতা।
প্র : 'মিনতি' সংকরজাতীয় শব্দটি কোন কোন শব্দযোগে গঠিত?
উ : সংস্কৃত বিনতি এবং আরবি মিনত্ শব্দযোগে।
প্র : 'অর্ঘ্য' ও 'অর্ঘ' শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য কী?
উ : 'অর্ঘ্য' শব্দের অর্থ পূজার উপকরণ এবং 'অর্ঘ' শব্দের অর্থ মূল্য।

'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : সুফিয়া কামালের 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতা তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?
উ : 'উদাত্ত পৃথিবী'
প্র : 'উদাত্ত পৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ কত খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়?
উ : ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : মৌসুমি কী?
উ : ঋতুভিত্তিক।
প্র : মৌসুমি কোন শব্দ?
উ : মৌসুম আরবি শব্দ; তার সঙ্গে 'ই'-প্রত্যয়যুক্ত হয়েছে।
প্র : 'মৌসুমি ফুল' কোনগুলো?
উ : শিউলি, কদম ইত্যাদি। যেমন, শিউলি ফুল শরৎ মৌসুমে, আর কদম ফুল ফোটে বর্ষা মৌসুমে ইত্যাদি।
প্র : 'মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে সকো আর / চারদিকে শুনি হাহাকার।' –এই বক্তব্য দিয়ে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
উ : কবি বোঝাতে চেয়েছেন, এক সময় প্রতি ঋতুতে নানা ধরনের ফুল দেখা যেত, সেই ফুলের গন্ধ পাওয়া যেত, অনেক ফুলে মধুও থাকত। কিন্তু এখন গাছপালা নির্বিচারে নিধন করার কারণে চারি দিক শূন্য মনে হয়– হাহাকার জাগে প্রাণে।
প্র : ক্ষুধার্ত ও ভয়ার্ত শব্দদ্বয়ের সন্ধিবিচ্ছেদ কর।
উ : ক্ষুধা + ঋত ; ভয় + ঋত ।
প্র : কারো কণ্ঠে আর গান নেই বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
উ : আগে গ্রামে নানা ঋতুতে নানা ধরনের ফসল হতো; বিভিন্ন গাছে ফুটত বিভিন্ন ফুল ও ফল। সেই ফসল কাটা বা ফল পাড়ার সময় অনেকে গান গাইত, নাচত; নবান্নে উৎসব হতো। এখন সেগুলো আর নেই– গাছ কেটে ভূমিকে প্রায় মরুভূমি করা হয়েছে বা দালান তোলা হয়েছে। এসব কথা মনে করেই কবি দুঃখ করে বলছেন, এখন ফুল-ফসল নেই, কারো কণ্ঠে গানও নেই।
প্র : মাটি চায় অরণ্যের দিকে– কোন মাটি?
উ : বৃক্ষহীন উষর মাটি।
প্র : কেন এভাবে অরণ্যের দিকে চায়?
উ : কারণ অরণ্যের মাটিতে সুনিবিড় ছায়া, সুশীতল স্নিগ্ধতা, আর স্নেহের অমিয় ধারা বহমান। সেখানে গেলে প্রাণ জুড়ায়।
প্র : কবি 'অরণ্য কন্যারা' বলেছেন কেন?
উ : কন্যারাই স্নেহশীলা। কন্যারাই মাতা হয়ে, ভগ্নি হয়ে, বধূ হয়ে পৃথিবী ধারণ ও সমৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি সময় দেয়। কবিকল্পনায় তাই অরণ্য এসেছে কন্যা রূপে।
প্র : 'মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি'– 'মর্মর' কী?
উ : শুকনো পাতার শব্দ।
প্র : 'মর্মর' কী ধরনের শব্দ / পদ?
উ : অনুকার শব্দ। বাক্যে ব্যবহার হলে অনুকার অব্যয় পদ।
প্র : 'বৃক্ষের ... বহ্নিজ্বালা'। –বৃক্ষের আবার বহ্নিজ্বালা কী?
উ : এটি বিশেষ কবিকল্পনা। কবি এখানে বৃক্ষকে মানব বা অন্য জীবের মতো জীবন্ত সত্তা ভেবেছেন। আর ভেবেছেন, মানুষের মতো গাছেরও বুকে অনেক কষ্ট, তার কথাতে সেই কষ্টের প্রকাশ।
প্র : 'কঙ্কণ' কী?
উ : কঁকন বা এক প্রকার চুড়ি।
প্র : মুমূর্ষু কারা?
উ : মৃত্যু পথযাত্রী। (দ্রষ্টব্য: মুমূর্ষু বানান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।)
প্র : কবি অরণ্য কন্যাদের কী করতে বলছেন?
উ : –মুমূর্ষুকে প্রাণদান;
–ফুলের ফসল আনয়ন;
–ক্ষুধার্তের জন্য খাদ্য আনয়ন;
–আত্মার আনন্দ;
–যারা অন্ধকারে আছে, যারা নিদ্রাহীন অবস্থায় আছে তাদের জন্য প্রভাতের মুঠি মুঠি আলো আনয়ন।
প্র : 'জাগো তবে অরণ্য কন্যারা' কবিতার মূল সুর কী?
উ : চারি দিকে পরিবেশ, বিশেষ করে অরণ্য-প্রকৃতি ধ্বংসের লীলা চলছে। এতে পৃথিবীর মানুষ ফল-ফুল-শস্যহীন হয়ে নিরানন্দময় পরিবেশের শিকার। কবি অরণ্যের গাছপালাকে কন্যা হিসেবে অভিহিত করে কামনা করেছেন, তারা যেন মানুষের মনে চেতনার সঞ্চার করে চতুর্দিকে খাদ্যের সংস্থান ও অপার আনন্দের ব্যবস্থা নেয়– মানুষকে অস্তিত্ব বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করে।

সেলিনা হোসেন

প্র : সেলিনা হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন, রাজশাহিতে।

প্র : তিনি মূলত কী?

উ : কথাশিল্পী।

প্র : তাঁর উপন্যাসের মূলবিষয় কী?

উ : অবরুদ্ধ সমাজে মুক্তচিন্তা ও মানুষের মুক্তির আকুতি।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : প্রবন্ধ : স্বদেশে পরবাসী (১৯৮৫), একাত্তরের ঢাকা (১৯৯০), নির্ভয় করো হে (১৯৯৮), মুক্তো করো ভয় (২০০২), ঘর গেরস্থির রাজনীতি (২০০৭)।

গল্প : উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯), পরজন্ম (১৯৮৬), মানুষটি (১৯৯৩), মতিজানের মেয়েরা (১৯৯৫), অনূঢ়া পূর্ণিমা (২০০০), একালের পান্তাবুড়ি (২০০২), নারীর রূপকথা (২০০৭)।

উপন্যাস : জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২), হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬), নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি (১৯৮৭), কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২), ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২), গায়ত্রী সন্ধ্যা (১ম খণ্ড ১৯৯৪; ২য় খণ্ড ১৯৯৫; ৩য় খণ্ড ১০০৬), লারা (২০০০), কাঠকয়লার ছবি (২০০১), ঘুমকাতুরে ঈশ্বর (২০০৪), অপেক্ষা (২০০৭), পূর্ণছবির মগ্নতা (২০০৮), যমুনা নদীর মুশায়রা (২০০৯) ইত্যাদি।

প্র : 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'পোকামাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬) উপন্যাস। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীর মধ্যে শাহপরিদ্বীপ নামক এক ছোটো দ্বীপের মানুষের, বিশেষ করে মাঝিদের সংগ্রামী জীবনের বাস্তব রূপায়ণ।

প্র : 'উৎস থেকে নিরন্তর' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : এটি সেলিনা হোসেনের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ, প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। গৈরিক বাসনা, বৈশাখী গান, রতি বিলাস, মাস্টার, কান্নার তৃতীয় দিক, [illegible] ঘোঁটা সকাল, খেয়াঘাট ইত্যাদি [illegible] হয়েছে গ্রন্থটি। বিচিত্র বিষয় নিয়ে [illegible] গল্পগ্রন্থেই সেলিনা হোসেন [illegible] পরিচয় দেন। ভাষা আন্দোলন, [illegible] পুরুষের সমতা প্রত্যাশা, [illegible] পারিবারিক পরিমণ্ডলের ভাঙ্গন ইত্যাদি তাঁর গল্পের বিষয়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : মুহাম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৬৮), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১), ফিলিপস পুরস্কার (১৯৮৮), অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৭)।

সেলিম আল দীন

প্র : সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম কী?

উ : মইনুদ্দিন আহমেদ।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?

উ : মাতা-ফিরোজা খাতুন, পিতা-মফিজ উদ্দিন আহমেদ।

প্র : তিনি কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর তৎকালীন নোয়াখালি জেলার (বর্তমান ফেনি) সোনাগাজির সেনেরখিল গ্রামে। (সূত্র বাংলা একাডেমি লেখক অভিধান : ১৯৯৬ : পৃষ্ঠা ২০৯)

প্র : কর্মজীবনে তিনি কোন প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত ছিলেন?

উ : ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক, পরে একই প্রতিষ্ঠানে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রারম্ভকালীন অধ্যাপক।

প্র : তিনি কোনো নাট্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কী?

উ : তিনি ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্র : সেলিম আল দীনের কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখ।

উ : নাট্যগ্রন্থ : সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য (১৯৭৩); বাসন (১৯৮২); কেরামতমঙ্গল (১৯৮৩); কীর্তন খোলা (১৯৮৩); মুনতাসীর ফ্যান্টাসি (১৯৮৫); ঢাকা (১৯৯০); দৈবতী কন্যার মন (১৯৯১); বনপাংশু (১৯৯১); হরগজ (১৯৯২); একটি মাবনা রূপকথা (১৯৯৪); হাতহদাই (১৯৯৭); নিমজ্জন ইত্যাদি।

গবেষণা গ্রন্থ : মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য (১৯৯৭)

প্র : সেলিম আল দীনের নাট্যচর্চা কীভাবে আরম্ভ হয়?

উ : সেলিম আল দীন কবিতাই লিখতেন। কিন্তু ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'নীল শয়তান : 'তাহিতি ইত্যাদি' নাটকটি টেলিভিশন ও বেতারে প্রচার হলে তাঁর নাট্যরচনার কথা জানাজানি হয়। একই বছর ডাকসু মঞ্চস্থ করে 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' এবং নাট্য প্রতিযোগিতাতেও নাটকটি প্রথম পুরস্কার পায়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ডাকসু নাট্যচক্র তাঁর লেখা 'এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা' মঞ্চস্থ করলে নাট্যকার হিসেবে সেলিম আল দীন সবার পরিচিতি পান। লক্ষ করার বিষয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে নাটকের নামকরণে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল, সেলিম আল দীনও সে বৈশিষ্ট্য তাঁর নাটকে ধারণ করেছিলেন।

প্র : 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' নাটকের বক্তব্য কী?

উ : প্রথমেই বলা দরকার রচনাকালে নাটকের নাম 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসি' থাকলেও কয়েক বছর পর নাট্যকার এর নাম থেকে 'ফ্যান্টাসি' শব্দটি বাদ দেন। এই নাটকে বিশ শতকের আশির দশকের স্বৈরশাসকের কবল থেকে দেশের কিছুই যে রক্ষিত হচ্ছিল না, সেই চিত্র উপস্থাপিত। হাস্যরসের মাধ্যমে সেলিম আল দীন দেখিয়েছেন সেনা ও স্বৈরশাসকেরা দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গে শুভবোধ ও সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে।

প্র : 'হাতহদাই' নাটকের সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে 'হাতহদাই' এর উদাহরণ। নাটকটি নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। 'হাতহদাই' মান বাংলায় অর্থ দাঁড়ায় 'সাত সদাই' বা সাত রকমের সওদা বা বস্তু কিছু। এই নাটকে নোয়াখালি অঞ্চলের এক গ্রামের মৌলবির মুখের আঞ্চলিক ভাষাও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সে কথা প্রতিষ্ঠিত।

প্র : সেলিম আল দীনের কোন নাটকের দীর্ঘ ব্যাপ্তি ছিল?

উ : 'নিমজ্জন' নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটি মঞ্চায়নের আগে যখন পাঠ করা হয় তখন এটা ছিল আট ঘণ্টা ব্যাপী। সেলিম আল দীনের ইচ্ছে ছিল নাটকটি পুরোটাই মঞ্চে রাখার। তাহলে মঞ্চ নাটকে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়। গ্রাম থিয়েটার কর্তৃপক্ষ প্রথমে ভেবেছিলেন, তাই হবে। যে দিন নাটক মঞ্চায়ন হবে, সেদিন আট ঘণ্টায় কয়েকটা বিরতি দিয়ে তা সম্পন্ন করা হবে। বিরতির ফাঁকে খাবার ও ইনডোর বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু সব কিছু বিবেচনার পরে সে চিন্তা পরিত্যাগ করে নাটকটি দুই ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়।

প্র : 'ধাবমান' নাটকের কাহিনি উল্লেখ কর।

উ : নেত্রকোনার বিরিশিরি-দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ও সোমেশ্বরী নদী এর আখ্যানের পটভূমি। বাঙালি ও গারোদের হাজার বছরের সংঘাত-যুদ্ধ-ধর্মান্তর প্রক্রিয়ার ব্যাপক অঘটনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে প্রান্ত এলাকায় বাসরত দুই জাতির মানুষের সমন্বয়ের ক্রিয়া, সম্পর্কসহ অবস্থানের প্রস্তুতি। এ সংস্কৃতি মানব প্রকৃতি ও জগতের প্রকৃত ছন্দরীতিতে নির্মিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ লীন হয়ে যায় এ সংস্কৃতির ছন্দোময় স্রোতে। এ রকম প্রেক্ষাপটে সোহরাব নামের এক মহিষকে নিয়ে ধাবমান নাটকের ঘটনা গড়ে ওঠে। নাটকে দেখা যায়, নহবত-সুবতীর গৃহপালিত নারী-মহিষ (হামেলা) এক অপরাহ্নে নিখোঁজ হয়। গর্ভবতী হয়ে হামেলা কদিন পর ফিরে আসে। গারোরা এই ভেবে আনন্দিত হয় যে, দেবতা তুষ্ট হয়ে আর এক দেবতা-মহিষ উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছেন। যথাসময় জন্ম নেয় এক মিশমিশে কালো মহিষ-শাবক 'সোহরাব'। সোহরাব তার অঞ্চলে বলশালী ও যুদ্ধে অপরাজেয় মহিষ হিসেবে খ্যাতি পায়। নহবত-সুবতীর পঙ্গু সন্তান

এবার সব দেখে সোহরাবকে জবাই করে ফেলে দিলে তার শত্রুর দূর হয়ে যাবে। পরের দুটো অঙ্কনের আলোয় কাহিনীর সোহরাবকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারই হত্যার পূর্ব মুহূর্তে পালায় সোহরাব। আর ফিরে আসে সোহরাব নামের মহিষ। অবশেষে খুন হওয়ার নির্মিতে সোহরাব নিজের গলা বাড়িয়ে দেয় ঈশান ছুরির নিচে।

প্র : 'রবদল' কোন প্রেক্ষাপটে রচিত নাটক?

উ : মন্দিরপুর জেলার হরখর নামক স্থানে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রলয়ংকরী টর্নেডোর অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৯২-এ সেলিম আল দীন 'হরগজ' নাটক লেখেন। টর্নেডো-পরবর্তী সর্বপ্রথম উচ্চারণে একটি গ্রামের সবুজ দেখা প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের নানান স্তরে ছিটেফুঁটে ফেলার অদ্ভুতপূর্ব চিত্র এ নাটকের উপজীব্য। এতে প্রায় আবহিক বিশ্বেরণকৃত অতুর অভিজ্ঞতায় তাদের ভ্রমণ শেষাবধি যেন হয়ে ওঠে আকৃতির জগত থেকে নিরাকৃত বিশ্বে অভিপ্রয়াণ।

প্র : 'নিমন্ত্রণ' নাটকের কাহিনি কী?

উ : বিশ্ব-পর্যটনের ঘটমান কাহিনি ও দৃশ্যচিত্রের সমন্বয়ে 'নিমন্ত্রণ'-এর কাহিনি গড়ে উঠেছে। বিশ্ব পরিভ্রমণ শেষে এক আগন্তুক মৃত্যুশয্যায় শায়িত বন্ধুর কাছে আসবে বলে চিনদীর মোহনায় গড়ে ওঠা এক শহরে এসে উপস্থিত হয়। বন্ধুটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য ব্লাক ডেথ স্কোয়াড অব কারাজার লোকেরা নির্যাতনের পর তার মেরুদণ্ডে পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। আগন্তুক ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে একে একে দেখতে পায় এক কুলির ঝুলন্ত লাশ, অদ্ভুতদর্শন এক বৃদ্ধ, স্টিমারে হলোকাস্ট, নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসা এক রূপসী নারী– তাকে যতবার কবরে শোয়ান হয় ততোবার সে মৃত্যু থেকে উঠে আসে। আগন্তুক বরফের ভেতরে একান্নটি শিশুর লাশ, আট কি নয় বছরের গায়িকা এক শিশুকে ধর্ষণের পর তার জিভ কেটে নেয়া, কান্দহারের মমি, মাদ্রিদের গণহত্যা, চিলির কবি পাবলো নেরুদার ফিন্দেমুন্দোর শোকগীতি, স্টেডিয়াম গাভর্নরের হাস দেড় হাজার লাশ কেটে খুন, হিরু হাজার উচ্চেকমতাসম্পন্ন বিশ্বটির বিস্ফোরণে ষোল কিলোমাটার পর্যন্ত বস্তুহার ঈশান করে যাওয়া শহরটির ক্রম নিঃস্তব্ধ সোহরাব লাশ এবং পরিশেষে মৌর আর্তনাদ ইত্যাদি নিয়ে এ নাটকের অন্তিম সংলাপ উচ্চারিত হয়।

প্র : 'পুত্র' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : সেলিম আল দীন পুত্র হারানো এক সম্পর্কিত অবিস্মরণীয় বিলাপ ও পূর্তি মহাকাব্য এ নাটকে রূপায়িত করেছেন। মহাজন সিরাজ ও তার স্ত্রী যমুনা পারের অসহায় তাদের পুত্র মানিক আমগাছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। নিষ্ফলতার ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন লাশ মাটিতে পুঁতে আমগাছটি কেটে ফেলা হয়। এ ঘটনার দুবছর পর এক শীতের রাতে ইন্দিরা পেতে এক দম্পতির আমগাছটির কিছু নিয়ে আসন জ্বালায়। এক দিকে নুরু নিষ্প্রেষ হয়ে আসতে থাকে আর শরীর শিকড়, অন্য দিকে মা-বাবার অন্তরে পুত্র হারানোর যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ যন্ত্রণায় ছটফট থাকে। মৃতপুত্রের অপূরণীয় সব ইচ্ছের আকাঙ্ক্ষাকে স্মরণ করতে করতে এক সময় গাছের শিকড়কেও পুত্র ভাবতে থাকে তারা। নাটকের শেষাংশে দেখা যায়, নতুন সন্তানের তীব্র কামনায় বুনি আবছা স্বামীকে তালাক দিয়ে ফিরে যায় ফেলে আসা যমুনার তীরে।

প্র : 'জুলান' নাটকের পরিচয় দাও।

উ : উরুক গোত্রের অধিবাসীরা বরফ ঝড় অজন্মার মুখোমুখি। তাই তারা এসে পর্বতের ওপারে জুলান পর্বতে চলে যাবে। তাদের যেতে হবে জন্মভিটা ছেড়ে। সেই বেদনায় মন ভেঙে যায়। স্বপ্নময় চোখে জ্বালে সমান তালে। কিন্তু স্বপ্নে দেখে গোত্রপতি পুরুত এক রজনী সন্ধ্যায় তাকে বলি দেবে শামাসের উদ্দেশে। বজ্রাহতের মতো মুষড়ে পড়ে ইশতার ও প্রেমিক বীর গামেশ। কিন্তু গোত্রবাসীর কল্যাণার্থে প্রেমিকও উৎসর্গ করে প্রেমিকাকে। অতঃপর স্মৃতিতাড়িত হয়

দুজন। প্রেমের দুর্নিবার টানে ফেরেশতা জাগে হৃদয়ে। দুজনে পায় পুরুতের লাম্পট্য। অবশেষে তারা পালিয়ে যাবে সুরে, বহু দূরে কোথাও শান্তিময় নির্বিঘ্ন গ্রহাবাসে বাঁচবে। পুরুতের ছোবলিক্ষা, ছানাচারি আর রক্ষা পেল না। হতচ্ছ কোপে ঘোড়া ছুটে গেল। হায়! মুসোপুসের মকপথে পুরুতের ফেরেস্তাও তবে সেরেছে বণনায়ে। গ্রহাপত গামেশ, ইশতার ও পুরুতের হতে বন্ধ হয়ে যায় ঝুলানের পথ।

৫: নাট্যসাহিত্যে সেলিম আল দীন বিশিষ্ট কেন?

উ: তিনি তাঁর নাটকে নিজের গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে বাংলার লোকজ উপাদানকে ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর শিল্পচিন্তার নাম ছিল 'কথানাট্য'। প্রতিটি নাটকে কবিতা, গান, গদ্য ও নাট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন সেলিম আল দীন। তিনি লোকজ উপাদানের সঙ্গে বিশ্ব বা পুরাণকেও অসাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন।

প্র : তিনি কোন কোন নাটক শেষ করে যেতে পারেন নি?

উ : 'হাড়-হাবিড' নামের একটি নাটক পরিকল্পনার মাত্র এক তৃতীয়াংশ তিনি লিখেছিলেন। সেটি সমাপ্ত করার আগেই সেলিম আল দীন মৃত্যুবরণ করেন।

প্র : তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের নাম কী?

উ : 'নিম্নো সাহিত্য'। ১৯৬৮ সালে দৈনিক পাকিস্তান সাময়িকীতে প্রকাশিত।

প্র : টেলিভিশনে প্রচারিত সেলিম আল দীনের প্রথম নাটক কোনটি?

উ : 'ঘুম নেই'। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এই নাটক প্রচারিত হয়। প্রযোজক ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী।

প্র : সেলিম আল দীন কী কী পুরস্কার পান?

উ : একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, কবকতা সাহিত্য পুরস্কার, টেনাসিনাস পুরস্কার, নান্দীপট পদক ইত্যাদি।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯ অক্টোবর ১৯৯৮ ভারতীবনার বিশ্ববিদ্যালয় কাম্পাসে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

সৈয়দ আলী আহসান

প্র : সৈয়দ আলী আহসান কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২১ সালের ১৫ই মার্চ, সেলেবের করিমগঞ্জ গ্রামে

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : অধ্যাপক ও লেখক।

প্র : তিনি জীবনীবনে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন?

উ : ঢাকা, চট্টগ্রাম ও জবাহর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

প্র : তিনি কোন দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন?

উ : জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্র : তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য কী?

উ : ভাববস্তুতে ঐতিহ্য সচেতনতা, সৌন্দর্যবোধ ও দেশপ্রীতি।

প্র : তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো কী?

উ : কাব্যগ্রন্থ : অনেক আকাশ (১৯৩৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৬), সহসা সচকিত (১৯৬৯), উচ্চারণ (১৯৮৮), আমার প্রতিদিনের শপথ, সমুদ্রই থাকো।
প্রবন্ধ-গবেষণাগ্রন্থ : নজরুল ইসলাম (১৯৫৭), কবিতার কথা (১৯৫৭), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০), রবীন্দ্র কাব্যবিচারের ভূমিকা (১৯৭৪), কবি মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সততত স্বাগত, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, পদ্মাবতী।
অনুবাদগ্রন্থ : হুইটম্যানের কবিতা, ইঁদুরপুর।
আত্মজীবনী : আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), সুফি মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭)

একুশে পদক (১৯৮৩), মধুসূদন স্বর্ণপদক (১৯৮৫) ও নাগরিকউদ্দিন স্বর্ণপদক।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ২৫শে জুলাই ২০০২ সালে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

প্র : ইসমাইল হোসেন কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই, সিরাজগঞ্জ। (মতান্তরে ৫ই অগস্ট, ১৮৭৯)

প্র : তাঁর পিতার নাম ও পেশা কী?

উ : আব্দুল করিম খন্দকার (১৮৫৬-১৯২৪)। পেশায় ভেষজ চিকিৎসক।

প্র : তাঁর মাতার নাম কী?

উ : নূরজাহান খানম।

প্র : সিরাজী কি তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নামের অংশ?

উ : না। সিরাজগঞ্জে জন্মেছিলেন বলে নামের শেষে 'সিরাজী' যুক্ত করেন। তিনি 'শিরাজী' বানানও লিখতেন। প্রথম দিককার বইতে তাঁর নামের সঙ্গে 'শিরাজী' যুক্ত থাকত।

প্র : তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে লেখ।

উ : প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা লালন করতেন। কংগ্রেসের বিশেষ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ও বাগ্মী নেতা ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-'১১) বিরোধী আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১২-'১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি মুসলিম ধর্মীয় চেতনায় অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হতে থাকেন এবং পরে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্র : তাঁর সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

উ : ইসমাইল হোসেন সিরাজীর গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সংস্কৃতবহুল, কবিতা মধুসূদনের মতো ক্লাসিক রীতির। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : অনল প্রবাহ (১৯০০), উচ্ছ্বাস (১৯০৭), উদ্বোধন (১৯০৭), স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪); উপন্যাস : তারা-বাঈ (১৯০৮), রায়নন্দিনী (১৯১৮), ফিরোজা বেগম (১৯২৩); প্রবন্ধ : স্বজাতি প্রেম (১৯০৯), তুর্কিনারী জীবন (১৯১৩), স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), [illegible] তুরস্ক ভ্রমণ (১৯২০)।

প্র : 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী [illegible] মুসলিম জাগরণমূলক কাব্য [illegible] প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে [illegible] গেছে তার জন্য শোক [illegible] হৃতগৌরব উদ্ধারের [illegible] বাণীতে মুসলমানদের [illegible] অধঃপতন ব্যক্ত করে ইংরেজদের [illegible] ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করা [illegible] কাব্যটিতে। 'অনল প্রবাহ' [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভিক্ষা' [illegible] বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার [illegible] আছে। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে [illegible] পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় [illegible] বের হয়। প্রথম সংস্করণে [illegible] মাত্র নয়টি। এগুলো হচ্ছে [illegible] তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীর-পূজা, [illegible] ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো-সঙ্কট, [illegible] আগমনে, দীপনা, আমীর-[illegible] ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible] বাংলা সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত [illegible] এবং ১১৭, ১২৪ (ক), ১৫৩ [illegible] অনুসারে গ্রন্থাকারের প্রতি [illegible] পরোয়ানা জারি করেন। পরে [illegible] সিরাজীকে ধরিয়ে দেবার জন্য [illegible] পুরস্কার ঘোষিত হয়। ব্রিটিশ-[illegible] বিদ্বেষ ও প্রচারণার অভিযোগে [illegible] কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯১২ সালের [illegible] মে তিনি কারামুক্ত হন। তাঁর রচিত [illegible] কাহিনী' মূলত এ জেল-জীবনের [illegible] থেকে রচিত।

প্র : 'স্পেনবিজয় কাব্য' সম্পর্কে লেখ।

উ : ইসমাইল হোসেন সিরাজী [illegible] লিখতে চেয়েছিলেন। 'স্পেনবিজয় [illegible] (১৯১৪) মুসলিম বীর তারেক ও স্পেন সম্রাট রডারিকের সংগ্রামের [illegible] বর্ণনার মাধ্যমে মুসলিমদের [illegible] বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে তুলে [illegible] হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি [illegible] মহাকাব্য হয় নি।

প্র : 'রায়নন্দিনী' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রতিক্রিয়ায় সিরাজী 'রায়নন্দিনী' লেখে [illegible] দুর্গেশনন্দিনী'তে একটি প্রসঙ্গ আছে, [illegible] যুবক জগৎ সিংকে দেখে [illegible] নারী আয়েষা মুগ্ধ হয়। এইটুকুর [illegible] সিরাজী পুরো উপন্যাস লিখে [illegible]। 'রায়নন্দিনী'তে ঈশা খাঁকে দেখে [illegible] রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে দিয়ে শুধু [illegible] নয়, ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়ে [illegible] প্রদান করানো হয়। উপন্যাস [illegible] 'রায়নন্দিনী' ব্যর্থ। তবে [illegible] ইতিহাসে এই নামটি স্মরণ [illegible] হয়। উপন্যাসটির শেষ বাক্য। [illegible] উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-পরিবার ক্রমশঃ [illegible] ধর্মে দীক্ষিত হন।'

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে।

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : হাতে লেখা কোন পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন, কখন?

উ : ফেনি স্কুলের ছাত্রাবস্থায় (১৯৩৬) 'ভোরের আলো' নামের পত্রিকা।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম গল্পের নাম কী? কোথায় বের হয়?

উ : 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে।

প্র : ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি কোন পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন?

উ : কলকাতার দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান; সহকারী সম্পাদক পদে।

প্র : মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবস্থান কী ছিল?

উ : মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি প্রবাসে ইউনেস্কোতে কর্মরত থাকার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ার ক্ষেত্রে কাজ করেন।

প্র : তাঁর স্ত্রী কে?

উ : ফরাসি নাগরিক এ্যান মেরি (বিয়ে : ১৯৫৬)।

প্র : তাঁর রচনাসমূহ কী?

উ : উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), [illegible] অমাবস্যা (১৯৬৪), [illegible] (১৯৬৮), [illegible] (ইংরেজি ভাষায়, রচনা ১৯৬৩)। গল্পগ্রন্থ : নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)। নাটক : [illegible] (১৯৬৫), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৬), সুড়ঙ্গ (১৯৬৪), উজানে মৃত্যু (১৯৬৬)।

প্র : ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্য সম্পর্কে কী বলা যায়?

উ : গভীর জীবনবোধ, অন্তর্লোকের রহস্য অনুসন্ধানস্পৃহা ও সংস্কারকামী মনের অভিব্যঞ্জনায় তাঁর সাহিত্য স্বচ্ছ। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিজীবন ও সমাজসমস্যার প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, মূল্যবোধের বিপর্যয়, মানসিক স্খলন ও পতনের আলেখ্য উচ্ছলভাবে অঙ্কন করেছেন।

প্র : 'লালসালু' উপন্যাসের মূলবিষয় কী?

উ : ধর্ম নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থকারীদের স্বরূপ উন্মোচন এবং নারী জাগরণের প্রেক্ষাপটে সমাজচেতনা।

প্র : 'লালসালু' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত উপন্যাস। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই উপন্যাসে একদিকে যেমন বাংলার গ্রামজীবনের বাস্তব প্রকৃতি ধরা পড়েছে তার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও কঠোরতা নিয়ে; তেমনই রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য গ্রামীণ মানুষের জীবন। নোয়াখালি অঞ্চল থেকে মজিদ নামের একটি কূটচরিত্র পারোপ্যহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে সেই এলাকার মানুষকে ধর্মের নামে কীভাবে শোষণ করে, সেই বাস্তব চিত্র আছে উপন্যাসটিতে। ধর্ম ব্যবসায়ী মজিদ অর্থ ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে অল্পবয়সী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। সে গ্রামের মোড়লদেরও প্রভাবিত করে। পাশের গ্রামে অন্য পিরের আগমন হলে, নিজের দাপট খর্ব হবে বিবেচনায়, তাকে মারধর দিয়ে উচ্ছেদ করে। এদেশে মজিদের মতো চরিত্র আজো গ্রামে ও শহরে প্রচুর। তবে স্বল্পবয়সী স্ত্রী জমিলা কর্তৃক সে লাঞ্ছিত হয়, মাজারের গায়ে পা লেগে থাকে

...ভাষণের। উপন্যাসে ভাষণে বিদ্রোহী, সংস্কারমনস্ক নেতৃত্বের প্রতীক। 'লালসালু'র একটি বহুমাত্রিক ও কালোত্তীর্ণ উপন্যাস। উন্নাসহারা মতিন, ছায়েম, খালেক ব্যাপারি, জমিলা, রহিমা, আমেনা, আক্কাস, তাহেরের বাপ, হামুদির মা। উপন্যাসিক সৃষ্টিকর্তাদের উপলব্ধ করে লিখছেন, 'খোদার প্রেমে বুক ভরে না হলে সেটি খুদা হবে।' উপন্যাসটি 'Tree Without Roots' নামে অনূদিত হয়ে (১৯৬৭) খ্যাতি অর্জন করে।

প্র : 'লালসালু'র ইংরেজি অনুবাদের নাম কী?

উ : 'A Tree Without Roots' (১৯৬৭)।

প্র : 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদের নাম কী?

উ : লা অরবরে সাবস মারেমে (১৯৬১)।

প্র : কে উপন্যাসটির ফরাসি অনুবাদ করেন?

উ : ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী আয়েশা মেরি।

প্র : 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসে আরেফ আলী নামের এক স্কুল মাস্টারকে অবলম্বন করে মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতা উন্মোচন প্রসঙ্গে সামন্ত-সমাজ প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য কাদের (যে গ্রামে নরবেশ বলে খ্যাত) গভীর রাতে এক যুবতীকে বাঁশঝাড়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই ঘটনা হঠাৎ দেখে ফেলে ওই পরিবারে আশ্রিত নিম্নবিত্তের স্কুল শিক্ষক আরেফ আলী। এখন আরেফ কী করবে? সে কি সবাইকে জানিয়ে দেবে সত্য ঘটনা? যদি জানায় তাহলে তার আশ্রয়চ্যুতি ঘটবে, নিজের উপরও চেপে যেতে পারে সে অপরাধ। আর না বলেও সে মনে মনে অস্থির হয়ে যায়। আরেফের মনোগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এই উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্র : 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে মুস্তফা, তবারক, খোদেজা, বদর শেখ, খেদমতুল্লা, কালু মিয়া ইত্যাদি চরিত্রের নামে গ্রামীণ ও পুনরুদ্ধারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নামের ছোঁয়া ছাড়া তাদের চারিত্রিক গঠন ও পরিণতির মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। নিজের খোদেজা আত্মহত্যা করলে মুস্তফা ভাবে, মৃতের আত্মা তাকে অনুসরণ করে মৃত্যুর আহ্বান করে। অন্যদিকে বাকল নদীতে চর পড়ায় মাঝির মাস্টার খতির, তাদের বোবা কন্যা সকিনা, মোসলেহ উদ্দিন প্রমুখ কতিপয় হয়। এ উপন্যাসে ধর্মের আচার- সর্বস্বতা, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, বাস্তবতার নামে স্থূল ইত্যাদির বিরুদ্ধাচারণ দেখা যায়। উপন্যাসে ব্যক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ সামগ্রিক অভিঘাতে ধরিত হয়েছে। এই হয়ে উঠেছে সামগ্রিক জীবনবাদী চেতনার প্রতীক। উপন্যাসে শুধু বিষাদচিত্রা নয় প্রকরণেও নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

প্র : 'দি আগলি এশিয়ান' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ কে, কী নামে করেন?

উ : শিবব্রত বর্মণ অনুবাদ করেন 'কদর্য এশীয়' (২০০৬) নামে।

প্র : 'দি আগলি এশিয়ান' সম্পর্কে লেখ।

উ : উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের রাজধানী শহর (নাম নেয়া হয় নি) কেন্দ্র করে রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ, সেনাবাহিনীকে দিয়ে সামরিক আইন জারি, সাধারণ মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার খর্ব করা, দেশে সাম্যবাদী উত্থান প্রচেষ্টা বানচাল করা ইত্যাদি প্রধান হয়ে উঠেছে। সমরিক আইন জারি করিয়ে সেনাবাহিনী দিয়ে ব নিজেদের সমর্থনপুষ্ট পুঁজিবাদীদের কাছে লাগিয়ে মার্কিন দেশ তখন এশিয়ার প্রতিটি দেশেই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত ছিল। এশিয়ার এই কদর্য রূপকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এ উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে নানাটি প্রধানমন্ত্রী কাদের শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি ও মার্কিন সমর্থক। মার্কিন সাংবাদিক জনসনকে কাদের বলে যে, সে দেশে শিল্পায়ন চায় না। এতে মানুষ অধিকার সচেতন হয়ে উঠবে। কাদের কঠোর হস্তে গণতান্ত্রিক দাবির আন্দোলন দমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের হত্যা করে। কিন্তু এক পর্যায়ে সেনাশাসনের ইস্পাত কাঠামো লণ্ডভণ্ড হয়ে ভেঙে পড়তে থাকে। মার্কিন গুটিকয় 'তাদের আর একজন প্রভুত্ব মুস্তাফিজকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে সেনাবাহিনী তাকে মেনে নেয়। মুস্তাফিজ প্রধানমন্ত্রী হয়ে দেশে সামরিক আইন জারি করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহসান জেল খাটেন। তিনি নামের এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীসহ অসংখ্য মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। উন্নাসহারা ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এভাবেই আইয়ুব খান ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে একইভাবে ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আসলে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ওয়ালীউল্লাহ্‌ ১৯৭১-এর পূর্বপর্যন্ত বাঙালির সংগ্রামসমূহ এই উপন্যাসে ধারণ করেছেন শুধু তাঁর অন্তর্দৃষ্টির গুণে। উপন্যাসটি চরিত্রভাবে মার্কিনবিরোধী। উইলিয়াম লে লেডেরার ও ইউজিন বারডিক যৌথভাবে রচিত মার্কিন উপন্যাস 'দি আগলি আমেরিকান' (১৯৫৮) এর প্রভাব এ উপন্যাস রচনার সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ওপর পড়েছিল।

প্র : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই গল্পটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। দেশভাগের সময় কলকাতা থেকে কিছু সংখ্যালঘু মুসলমান এদেশে এসে একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কদিনের মধ্যেই তারা জানতে পারে বাড়িটি এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিত্যক্ত। এ বাড়ির লোকেরাও প্রাণভয়ে ওপারে পালিয়ে গেছে। বাড়িতে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার হয়। এরকম কাহিনি নিয়েই গল্পটি সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। গল্পটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মানুষের নিজস্ব জীবন যখন বিপন্ন ও অর্থহীন, তখন তার পারিপার্শ্বিক অনুষঙ্গসমূহও হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। দেখা যায় দেশবিভাগের নির্মম পরিণতিতে সর্বস্বান্ত মানুষের মানবিক মূল্যবোধও পরিস্থিতির কাছে জিম্মি।

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'বহিপীর' সম্পর্কে লেখ।

উ : তাহেরা নাটে এক ফকিরকে সমস্যা ও কান্না নিয়ে তার দুয়ারে এক ভিড়ের সঙ্গে এই ভিড় বইয়ের ভাষা অর্থাৎ কথ্যভাষাতে বলা বলে বলা হয়ে বহিপীরের বলা অভিহিত করা হয়েছে। ভিড়ের একজন হলো, বইয়ের ভাষায় বা সাধুভাষাতে কথা বললে তাদের আত্মবিশ্বাসের কারণসমূহের হয় তবে তাদের দুঃখের অনুভূতি ও প্রেক্ষাপটের অনুভূতি হবে না। কারণ তাহেরাকে যে বিয়ে করেও তাহের 'কবুল' বলে নি। বরং সেই এক দুঃসহ রাতের নিয়ে পালিয়ে নদীর মাঝি ভাড়া সে। বেদেনীদের ছদ্মবেশে হাতেম খুঁ খোদেজা ও দুই সন্তানকে নিয়ে নদীপথে চলায় আক্রান্তদের। নদীর ধারে তাহেরাকে দেখে সে তাকে বজরায় তুলে নেয়। এদিকে বহিপির তার ভুতা রহিমুল্লাকে নিয়ে তাহেরাকে খুঁজতে নৌকাযোগে বের হয়। তাদের খোঁজা জমিদার হাতেমের বজরার সঙ্গে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটায় আক্কাস হাতেম বহিপির ও তার ভুতাকে ঘায়ে বজরায় তুলে জীবন বাঁচায়। নাটকীয়তা এখানেই যে, একই বজরায় দুই কামরায় বহিপির ও তাহেরার অবস্থান কিন্তু কেউ তা জানে না এবং তাদের পারস্পরিক পরিচয়ও জমিদার-পরিবারের কাছে অজানা। তবে অল্প সময় পরেই সে পরিচয় জানা হয়ে যায় এবং বহিপির তাহেরাকে নিজের আস্তানায় নিতে চায়। এ ব্যাপারে সে নানা কৌশল প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাশেম ও তাহেরা নবজীবনের পথে বের হলে নতুনের জয়গাথা রচিত হয় এই নাটকে। নাটকটি লেখকের 'লালসালু' উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। এখানেও ধর্মকে ভণ্ডবহিপির ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে। বহিপির> মজিদ, তাহেরা>জমিলা, হাতেম>খালেক ব্যাপারি, আমেনা>খোদেজা, হাশেম> আক্কাস এভাবে প্রতিতুলনা করে 'বহিপীর' ও 'লালসালু' পাঠ করা যেতে পারে। নাটক ও উপন্যাসটির বক্তব্য-বিষয় মূলত একই। ১৯৫৫ সালে 'বহিপীর' রচিত এবং ১৯৬৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'তরঙ্গভঙ্গ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৬) পাশ্চাত্যরীতি অনুসারী এবসার্ডধর্মী অস্তিত্ববাদী একটি নাটক। মৌলবি আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী বিচারকের কাছে দরিদ্র চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী গৃহবধূ আমেনার বিরুদ্ধে শিশু ও স্বামী হত্যার অভিযোগ আনে। অভাবের তাড়নায় অসুস্থ স্বামী কুতুব শেখকে চিকিৎসা করাতে না পেরে সে ধুতুরার বিষ পান করিয়ে স্বামী হত্যা করে। আর চারটি শিশুর আহার সংস্থান করতে না পেরে ছোটটিকেও সে মেরে ফেলে। বিচারক এর বিচার করতে বসেন। কিন্তু এ নাটকের একটি সংলাপ: 'ভেবেছিলেন জজ সাহেব ঘুমিয়েছিল? না, জজ কখনো ঘুমায় না। তার চোখে ঘুম নেই।' এ সংলাপের মধ্য দিয়েই বিচারের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়। আর তাই মামলা দেড়মাস মুলতবি ছিল কেন- প্রশ্ন ওঠে। বলা হয়: জজ সাহেব আসামির ফাঁসি দেবেন না, রায়ও দেবেন না? আসলে অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত মানুষের অন্তর্গত আর্তনাদ শব্দরূপ পেয়েছে এই নাটকে। কাঠগড়ায় অবনত দৃষ্টের আমেনা, জাগ্রতচেতনার প্রতীক হয়ে ওঠা ভাঙাপাত্র নিয়ে বসে থাকা ভিখারিণী, জীবন সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত না থাকা এক যুবক, বাদি মৌলবি আবদুস সাত্তার নেওলাপুরীসহ আদালতের উকিল, সাক্ষী মতলুব আলী, বিচারক ইত্যাদি এই নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'উজানে মৃত্যু' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬৬) নাটকের মুখ্য বিষয় আধুনিক সভ্যতার অন্তঃশূন্যতা, এর ক্লান্তিকর পথপরিক্রমা, নিরাশাবাদী ভাব কিন্তু সুখের জন্য অসীম প্রতীক্ষা, যা শেষ হবার নয়। এটি একটি এবসার্ড নাটক। এবসার্ড শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জীবনের এলোমেলো ভাব প্রকাশিত হবে শিল্পের শরীরে। তাই এবসার্ড নাটকে থাকবে সংলাপ ও পাত্রপাত্রীর আপাত সমন্বয়হীনতা। কিন্তু এর গভীরে প্রবাহিত থাকবে পরিত্রাণের অন্তঃশীলা। নৌকাবাহক, সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি, কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তি- এই তিন প্রতীকচরিত্রকে কেন্দ্র করে নাটকটি সৃষ্টি করা হয়েছে। নৌকা উজানে নেওয়া ভয় না মৃত্যুর কারণ। নৌকাবাহক নিঃসঙ্গতার প্রতীকও। স্ত্রী-সংসার হারা হয়ে তার বর্তমান দশাও ভয়ের কারণ। কিন্তু বিশ শতকের এই যুগ যন্ত্রণা ধারণ করেই এগিয়ে যেতে হবে। গ্রামীণ আবহে, নদী ও নৌকার অনুষঙ্গে পুরো নাটকটি রচিত হলেও তা আসলে বিংশ শতাব্দীর সার্বিক অবস্থাকেই ধারণ করে।

প্র : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটক 'সুড়ঙ্গ' সম্পর্কে লেখ।

উ : 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪) নাটকে মানুষের চেতনার গভীরস্থ লোভ, লালসা, ঘৃণা, ঈর্ষাকে নাট্যকার রূপকাশ্রয়ে তুলে ধরতে গিয়ে এবসার্ড নাট্যধারাকে অনুসরণ করেছেন। তাই অনেক সময়ই সংলাপে সামঞ্জস্যহীনতা, অস্পষ্টতা ও নাটকে রহস্যময়তা পরিদৃষ্ট হয়। ষোড়শী রাবেয়া নিজের বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আমার ত্যাগ করে। সবাই ভাবে বিয়েতে অমত তার। কিন্তু রাবেয়া জানায় বরে তার আপত্তি নেই। তাহলে কেন রাবেয়ার এ অবস্থা? শুরু হয় রহস্যময়তা! রাবেয়ার ঘরের আলমারির নিচে থাকা গুপ্তধনের সংবাদে তার চাচাতো ভাই কলিমসহ তিনজন যুবক রাতদিন সুড়ঙ্গ কাটতে ব্যস্ত। মাটির সুড়ঙ্গ নাকি মনের সুড়ঙ্গ-রূপকটি এখানেই।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজি পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩)।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কত তারিখে?

উ : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর; প্যারিসে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্র : সৈয়দ মুজতবা আলী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর পিতার (সাবরেজিস্ট্রার) কর্মস্থল তৎকালীন শ্রীহট্ট অর্থাৎ আজকের সিলেটে।

প্র : তাঁর শৈশবকে নিবাস কোথায়?

উ : বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার উত্তরসুর গ্রামে।

প্র : তিনি কোন কোন ভাষা জানতেন?

উ : বাংলা, উর্দু, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, পারসি, আরবি ও ইতালীয় ভাষা।

প্র : বিশ্বভারতী থেকে তিনি কত সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন?

উ : ১৯২৬ সালে।

প্র : তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনির নাম লেখ।

উ : 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৯)।

প্র : 'দেশে বিদেশে'র পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম গ্রন্থ। নিজে বিভিন্ন দেশে বিশেষত কাবুলে অবস্থান ও ভ্রমণ করে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তার পরিচয় আছে এই গ্রন্থে। এর ভাষা সহজ, উপস্থাপনায় সাবলীলতা ও আড্ডার মেজাজ আছে। রাজনৈতিক ঝোড়ো হাওয়া, সাধারণ মানুষের জীবন, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পরিচয়, অপরিচিত দেশের নানা বৈশিষ্ট্য সব ফুটে উঠেছে এক অপূর্ব আন্তরিক ভঙ্গিতে। গ্রন্থটির রচনাশৈলী অসাধারণ বলে প্রথম গ্রন্থেই মুজতবা আলী পাঠকহৃদয় জয় করেন।

প্র : তাঁর রচিত দুটো উপন্যাসের নাম লেখ।

উ : অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০)।

প্র : তাঁর রচিত রম্য-রচনার নাম লেখ।

উ : পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২)।

প্র : পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' (১৯৫২) দুই পর্বে বিভক্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সংকলন। প্রথম পর্বে ৩৪, দ্বিতীয় পর্বে ৩১, মোট ৬৫টি রচনার সংকলন। উল্লেখযোগ্য রচনা বই কেনা, মোপাসাঁ, চেখফ্-রবীন্দ্রনাথ, বিদেশে, মেশেদিনী, অনুবাদ সাহিত্য, অর্থং অর্থং ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধ 'বসুমতী' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে মুজতবা আলীর বিশেষ ও সরস গদ্যশৈলীর পরিচয় মেলে। তাছাড়া বিচিত্র বিষয় প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রন্থটিকে রম্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্র : তাঁর রচিত ছোটপল্লবের নাম লেখ।

উ : চাচা-কাহিনী (১৯৫২), টুনি মেম (১৯৬৪)।

প্র : সৈয়দ মুজতবা আলী চাকরি জীবনে অবসরগ্রহণ করেন কোথা থেকে?

উ : ১৯৬৫ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে।

প্র : তিনি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন?

উ : রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।

প্র : তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ১৯৭৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি, ঢাকায়।

'প্রবাস বন্ধু' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : অধ্যক্ষ জিরার সাহেব কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

উ : ফ্রান্সের।

প্র : খাজামোল্লা গ্রামটি কোথায়?

উ : আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলের আড়াই মাইল দূরে।

প্র : এই রচনায় 'আফগানিস্থান' লেখা হয়েছে 'আফগানিস্তান' নয় –কেন?

উ : আফগানিদের স্থান অর্থে 'আফগানিস্থান' ঠিক আছে। 'স্তান' উর্দু শব্দ।

প্র : আবদুর রহমান কে ছিলেন?

উ : অধ্যক্ষ জিরার সাহেবের কাজের লোক।

প্র : 'ডাবর' কী?

উ : বড় পাত্র।

প্র : ভীমসেন কে?

উ : পঞ্চপাণ্ডবের এক ভ্রাতা। সাধারণত তিনি ভীম নামেই পরিচিত।

প্র : পল্টন কী?

উ : 'Platoon' থেকে পল্টন শব্দের উদ্ভব। এর অর্থ সেনাদের মধ্যে দলবিশেষ।

প্র : পাগমানের পাহাড় কত দূরে?

উ : কাবুলের অনতিদূরে। কাবুল থেকে চার/পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

প্র : আবদুর রহমান কী কী ভালো রাঁধতে জানত?

উ : পোলাও, কুর্মা, কাবাব, ফালুদা।

প্র : পাগমান পাহাড়টি কোথায়?

উ : খাজামোল্লা গ্রামে।

প্র : পাহাড়ে কী পাওয়া যায়?
উ : বরফ।
প্র : আবদুর রহমান লেখকের জন্য রাতের খাবারের কী কী তৈরি করলো?
উ : [illegible], কোফতা পোলাও, আর [illegible]
প্র : পানশির নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত?
উ : উত্তর আফগানিস্থানে।
প্র : কাবুলে শীতকালের অবস্থা কেমন হয়?
উ : বরফের তলায় রাস্তা চাপা পড়ে যায়, মাঠ পথ পাহাড় নদী পাহাড়পালা সব ঢাকা পড়ে যায়, ক্ষেত-খামারে কাজ বন্ধ থাকে, কোনো কাজকর্ম নেই, বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না।
প্র : আবদুর রহমানকে লেখক মহানাব বলেছেন কেন?
উ : শরীরিক গঠনের জন্য।
প্র : আবদুর রহমানের চরিত্রের মধ্যে লেখক কী খুঁজে পেয়েছেন?
উ : সরলতা, স্বদেশপ্রেম, অতিথিপরায়ণতা।
প্র : 'প্রবাস বন্ধু' রচনার লেখকের কী অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়?
উ : বাংলাদেশের নিকট-প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্থান ভ্রমণের আংশিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।
প্র : 'প্রবাস বন্ধু' রচনা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশ-বিদেশ' গ্রন্থের পঞ্চদশ অংশ থেকে।

সৈয়দ শামসুল হক

প্র : সৈয়দ শামসুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর; কুড়িগ্রামে।
প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?
উ : লেখক।
প্র : তাঁকে কী সব্যসাচী লেখক বলা যায়?
উ : বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বোঝায়। কারণ তিনি সাহিত্য ও শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে বুদ্ধদেব বসুকেও সব্যসাচী লেখক বলা চলে। [illegible] তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্য শিল্পের সবদিকে অবদান রাখতে পারেন নি। সৈয়দ শামসুল হক [illegible] অবশ্যই সব্যসাচী লেখক নন। [illegible] সব্যসাচী লেখক হিসেবে [illegible] ক্ষেত্রে তাঁর কয়েকজন অনুরাগী [illegible] নিজেও চেষ্টা করছেন। আসল কথা, [illegible] প্রথম দিককার গ্রন্থগুলো সৈয়দ [illegible] হকেরই মহোদয়ের [illegible] সব্যসাচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পায় এবং এ সময় সৈয়দ শামসুল হক গল্প, কবিতা, উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা সিনেমার [illegible] চিত্রনাট্যও লিখছিলেন।
প্র : তাঁর কথাসাহিত্যে যৌনতার অভিযোগ কি সত্য?
উ : তিনি কথাসাহিত্যে চরম যৌনতা আমদানি করেছেন। ষাটের ও সত্তরের দশকে যখন বাংলাদেশের বাংলা কথাসাহিত্যে যৌনতা ছিল খুবই লজ্জার ও অপমানের বিষয়, সে সময়ই তিনি বহু যৌনগন্ধী কাহিনি লেখেন। তাঁর 'খেলারাম খেলে যা' উপন্যাসকে 'পিন-আপ-নভেল' বলা হয়। হুমায়ুন আজাদ এ ধরনের উপন্যাসকে 'অপন্যাস' বলেছেন।
প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?
উ : কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা (১৯৭০), পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০), বেজান শহরের জন্য কোরাস (১৯৮৯), কানরে কানরে তোমারই সন্ধানে (১৯৯০), আমি জন্মগ্রহণ করিনি (১৯৯০) ইত্যাদি।
কাব্যনাট্য : পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), নূরুলদীনের সারা জীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।
প্রবন্ধ : হৃৎকলমের টানে (১৯৯১)।
গল্প: তাস (১৯৫৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২), জলেশ্বরীর গল্পগুলো (১৯৯০)।
উপন্যাস : এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), অনুপম দিন (১৯৬২), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৯), নীল দংশন (১৯৮১), স্তব্ধতার অনুবাদ

(১৯৮৭), দূরত্ব ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮২), 'তুমি সেই তরবারী' (১৯৮৯), অন্য এক আলিঙ্গন, এক যুবা (১৯৮৯), আলোর জন্য, বাজার সুন্দরী।
প্র : 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের পরিচয় দাও।
উ : সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। এটি রচিত হয়েছে ১লা মে থেকে ১০ই জুন, ১৯৭৫; লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড শহরে, আর প্রকাশ পেয়েছে ১৯৭৬ সালে। এর কাহিনিতে আছে: তখন ১৯৭১ সাল, চারদিকে মুক্তিযুদ্ধ: উদ্বেগ আর উত্তেজনা ছোট-বড় সবার মধ্যে। একদিন গ্রামের নারী-পুরুষ এসেছেন মাতব্বরের কাছে। তাদের চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। গত রাতেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে দেখা করেছে জানিয়ে সবাইকে আশ্বাস দেয় মাতব্বর। সে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর ভরসা রাখতে বলে সবাইকে। গ্রামবাসীরা সহজ-সরল, কিন্তু তারা আশ্বস্ত হতে পারে না মাতব্বরের কথায়। যুদ্ধে অংশ নেবার ইচ্ছে জাগে কারো কারো, তবে তা প্রকাশ করে না। এভাবে নানা ঘটনার ঘনঘটায় এগিয়ে যায় নাটকের কাহিনি। একসময় ঘর থেকে বের হয় মাতব্বরের মেয়ে। সবার সামনে সে বলে, পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন দেখা করতে আসে নি, বাবা জোর করে তাকে ঐ রাতে ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিয়েছিল। পরে সেই বীরাঙ্গনা আত্মাহুতি দেয়। অবশ্য নিস্তার মেলে নি রাজাকার মাতব্বরের। নিজের পাইকের হাতেই নির্মমভাবে মারা পড়ে সে। এ সময় পাইক বলেন: 'আপনার কোনো ঈমান ছিল না।' কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলো হচ্ছে: মাতব্বর, পির সাহেব, মাতব্বরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণদল ও মুক্তিযোদ্ধারা। নাটকটিতে কোনো দৃশ্য-বিভাজন নেই। একটানা কাহিনি স্রোত বয়ে চলে। গ্রামবাসীর সংলাপ দিয়ে এটির সূচনা। 'মানুষ আসতে আছে কালীপুর হাজীগঞ্জ থিকা... ক্রমাগতে ফুলবাড়ী নাগেশ্বরী, [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পড়ে।
প্র : 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কেন সফল?
উ : সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাট্য 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সফল এ কারণে যে, এখানে মুক্তিযুদ্ধকে সার্থকভাবে বাস্তবায় রূপ দেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল কাহিনিকে [illegible] গণমানুষের সৃষ্টি, [illegible] নাটকের মধ্যে সফলভাবে [illegible] হয়, পাকিস্তানিদের দোসর [illegible] মাতব্বরের পরাজয় ও পতন, শেষে গণমানুষের অভ্যুত্থানকে শীর্ষে তুলে ধরে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বাংলা কাব্যনাট্যের ইতিহাসে তো বটেই, নাটকের ইতিহাসেই এ এক উল্লেখ করার মতো ঘটনা। নাটকটির চরিত্রগুলো হচ্ছে: মাতব্বর, পির সাহেব, মাতব্বরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণদল ও মুক্তিযোদ্ধাগণ। নাটকটিতে কোনো দৃশ্য-বিভাজন নেই। মুক্তিযুদ্ধ যে কোনো খণ্ড খণ্ড বিষয় নয় তারই প্রতীকে একটানা কাহিনি স্রোত বয়ে চলেছে এখানে। গ্রামবাসীর সংলাপ দিয়ে এটির শুরু। এটিও ইঙ্গিতবহ: গণমানুষ দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা। এ নাটকের গ্রামবাসী গ্রিক নাটকের মতো কোরাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কাব্যনাট্যটির শেষ সংলাপে আছে: 'আছে দরকার। আছে জরুরি কারণ। [...] মানুষ সড়ক দিয়া মাথা তুইলা যাও' এভাবে শত্রুদের মধ্যে যাওয়ার

মীনদর্শনও আছে কাব্যনাট্যটিতে আর তারপরে, বাঙালি পাঠক শ্রোতৃ বীরাঙ্গনা হাজারবছরের বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। নারীর এই যন্ত্রণা নাটকের শরীরে সেঁধিয়ে এর কারণে পাঠক-দর্শকের হৃদয় দ্রবিত। এই সম্ভাবনা আর যন্ত্রণার মধ্যেই কাব্যনাট্যটির সার্থকতা নিহিত আছে।

প্র: 'নূরলদীনের সারাজীবন'-এর পরিচয় দাও।

উ: বাঙালির কাছে প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় তাঁর 'ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' পুস্তকে এবং সুধাংশু শেখর তাঁর 'বাংলার বীর বিদ্রোহী' বইতে এই বীর বিদ্রোহীকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর নাম নূরুলউদ্দিন। ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে নূরুলউদ্দিনের বিস্তারিত পরিচয় খুব একটা উদ্ধার করা যায় না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে, তিনিই প্রথম রংপুরের কৃষকদের সংঘবদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি তাদের নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ইতিহাসে প্রায় বিস্মৃত এই কৃষকনেতাকে বইয়ের পাতা থেকে কল্পনা মিশিয়ে বাঙালির সামনে নতুন করে তুলে ধরেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি নূরুলউদ্দিনকে আখ্যায়িত করেন নূরলদীন নামে। আর তাঁর নামেই লেখা হয় 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাট্য (১৯৮২)। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর 'নূরলদীনের সারাজীবন' কাব্যনাটকের ভূমিকাতে লিখেছেন: 'ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন নূরুলউদ্দিন, আমি ব্যবহার করেছি নূরলদীন- রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে।' রংপুরের বুকে নূরুলউদ্দিন যে বিপ্লবের লাল আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে নির্বাপিত করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে। আর যাকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ, সেই শাসককে রংপুর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। জনগণের চূড়ান্ত জয় হয়তো হয় নি সেদিন, কিন্তু এই সাময়িক জয়ও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সগৌরবে। আর সেটাই ফুলে ফুলে সবুজ এবং প্রেরণা যুগিয়েছে অধিবাসীদের গণবিদ্রোহ এবং গণ-আন্দোলনকে। যেখানে আছে অগ্নিগিরার অমিত 'আবার আসিব ফিরে' ধ্বনি, আছে দেশের মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকা মাতাল এক অনুভূতি, আছে কাল পূর্ণিমায় রক্তলোলুপ হায়েনার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য গণবিদারী কণ্ঠে জেগে ওঠা, একবার "সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে। / নূরলদীনের কথা যেন সারা দেশে / পাহাড়ী ঢলের মত নেমে এসে সমস্ত তামাম, / অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার এ আশায় / যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়, / আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় / ফিরে তাই, 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।" এই নূরলদীন ইতিহাসের মানুষ কিন্তু তাঁর অনেক কিছুই শামসুল হকের কল্পনা। সৈয়দ হক এই কাব্যনাট্যের চরিত্র নিয়ে লিখেছেন: 'ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও তরুলাহাকে, কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আকাস, আখিয়া, দিলবের, টমসন ও মরিসকে। নূরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি।' ১৪টি দৃশ্যে কাব্যনাটকটি রচিত। রংপুরের শহর, হাট ও বনাঞ্চল এর স্থান। এর কাল ১১৮১ বাংলা সন। প্রস্তাবনা সূত্রধর দিয়ে শুরু হয়েছে: 'নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর।' এই প্রস্তাবনার পর লালকোরাস, নীলকোরাস ও নূরলদীনের কণ্ঠ দিয়ে প্রথম দৃশ্যের সূচনা হয়। পর্যায়ক্রমে নূরলদীনকে সাধারণ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ও চরিত্রটি বিকশিত করার নাট্যিক কৌশল গ্রহণ করতে দেখা যায়। পঞ্চম দৃশ্য থেকে কুঠিয়ালদের আবির্ভাব ঘটে নাটকে। অষ্টম দৃশ্যে নূরলদীনের পিতৃস্মৃতি পারিবারিক উপস্থাপিত হয়েছে। নবম দৃশ্যে নূরলদীনকে সুপারস্টাইলার মতো পূজা করে। অথচ সে অনেক মুসলিমের শত্রু। এই দৃশ্যে বিদ্রোহ দমনের কথা শোনা যায়। যুদ্ধের আশঙ্কায় বিচলিত দেখা যায় নূরলদীনের স্ত্রী আখিয়াকে দশম দৃশ্যে। একাদশ দৃশ্যে ধ্বনি শোনা যায়, 'জয় নবাব নূরলদীন'। ধীর ধীরে আন্দোলন করার আহ্বান আসে নেতার কাছ থেকে দ্বাদশ দৃশ্যে। আর রচিত হয় ইতিহাস। যুগে যুগে এ রকম নেতাদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা উজ্জীবিত হয় সংলাপে। 'এক এ নূরলদীন ধ্বনি চলি যায়, / হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।' এই নূরলদীন বাঙালির জননায়কদের ধারাবাহিক প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন।

প্র: তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৮), আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), একুশে পদক (১৯৮৪) ইত্যাদি।

প্র: তিনি কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উ: ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, ঢাকায়।

'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: মানুষের জটিল জীবনপ্রবাহ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কার সাহিত্যকর্মের মূল প্রবণতা?

উ: সৈয়দ শামসুল হকের।

প্র: নিলক্ষা শব্দের অর্থ কী?

উ: দৃষ্টিসীমা অতিক্রমী। নিলক্ষা অকাশের রং নীল।

প্র: 'নূরলদীনের কথা মনে পড়ে' কোন কাব্যনাটকের অংশ বিশেষ?

উ: নূরলদীনের সারা জীবন।

প্র: নূরলদীন কী বলে ডাক দিয়েছিল?

উ: জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।

প্র: কত সালে নূরলদীনের ডাকে মানুষ জেগে উঠেছিল?

উ: ১১৮৯ বঙ্গাব্দে বা ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র: নূরলদীন আবার কবে ডাক দিবেন বলে সকলে মনে করে?

উ: কাল পূর্ণিমায়।

প্র: অভাগা মানুষ কার আশায় জেগে ওঠে?

উ: নূরলদীনের আশায়।

প্র: নূরলদীনের বাড়ি কোথায় ছিল?

উ: রংপুরে।

প্র: কবিরাজ জোছনার সাথে কী করে গাছ?

উ: পাহাড়ের মধু।

প্র: নূরলদীনের কথা সারা দেশে ডিসেম্বর মাসের মতো নেমে আসে?

উ: পাহাড়ি ঢলের মতো।

প্র: এ কবিতায় কত হাজার লোকসাহের কথা বলা হয়েছে?

উ: উনসত্তর হাজার।

প্র: অতীত হঠাৎ কোথায় হানা দেয়?

উ: বড় সবসময়।

প্র: মরা আশ্বিনের নূরলদীন কিভাবে দেখা দেয়?

উ: দীর্ঘ দেহ নিয়ে।

প্র: কবির দৃষ্টিতে ব্রহ্মপুত্র মদে কী হয়ে মিশেছে?

উ: লক্ষ লক্ষ নদী।

প্র: এ কবিতায় বর্ণিত কবির দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ে কোথায়?

উ: ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

প্র: নূরলদীন কিসের প্রতীক?

উ: প্রতিবাদের।

'আমার পরিচয়' থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র: কবি বাংলার আলপথ দিয়ে কত বছর ধরে চলেন?

উ: হাজার বছর ধরে চলেন।

প্র: কোমল পলিমাটির ভেতর কবি কিসের চিহ্ন রেখে যান?

উ: চলার চিহ্ন ফেলে রেখে যান।

প্র: কবি কিসের অক্ষরের ভেতর থেকে এসেছেন?

উ: চর্যাপদের অক্ষরের ভেতর থেকে।

প্র: কবি কার জিজ্ঞার বহর থেকে এসেছেন?

উ: সওদাগরের জিজ্ঞার বহর থেকে।

প্র : কবি কোন গ্রাম থেকে এসেছেন?
উ : কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে।
প্র : কবি কোন চিত্রকলার ক্ষেত্রের থেকে এসেছেন?
উ : পালযুগ নামে চিত্রকলার ক্ষেত্র থেকে।
প্র : কবি কোন বিহার থেকে এসেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন?
উ : পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার থেকে।
প্র : কবি কোন মসজিদের বেদি থেকে এসেছেন?
উ : ষোড়ঙ্গাবাংলার।
প্র : কবি কোন মসজিদ থেকে এসেছেন?
উ : বরেন্দ্রভূমে সোনা মসজিদ।
প্র : কবি কোন সার্বভৌম নেতাদের থেকে এসেছেন?
উ : সার্বভৌম বারো ভুঁইয়া নেতাদের থেকে।
প্র : কবি কোন দীঘি থেকে এসেছেন?
উ : কমলার দীঘি।
প্র : কবি কোন পালা থেকে এসেছেন?
উ : মহুয়ার পালা থেকে।
প্র : কবি কোন গ্রন্থদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : 'গীতাঞ্জলি' ও 'অগ্নি-বীণা' থেকে।
প্র : কবি কোন নেতাদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : কুদিরাম ও সূর্য সেন।
প্র : কবি কোন চিত্রশিল্পীদ্বয় থেকে এসেছেন?
উ : জয়নুল আবেদিন ও অবন ঠাকুর। (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর > অবন ঠাকুর)
প্র : কবি কোন লালপথ থেকে এসেছেন?
উ : রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে।
প্র : কবির আগমন কোন বজ্রকণ্ঠ থেকে?
উ : জয়বাংলার বজ্রকণ্ঠ।
প্র : কবির আগমন কোন যুদ্ধ থেকে?
উ : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।
প্র : বাঙালি জাতির বীজমন্ত্র কোনটি?
উ : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
প্র : কবি কী মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকতে চান?
উ : সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে।
প্র : চর্যাপদ কী?
উ : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-ঐতিহ্যের প্রথম নিদর্শন।
প্র : চাঁদ সাগরের কাহিনি কোন কাব্যগ্রন্থে আছে?
উ : মঙ্গলকাব্যে।

প্র : কার শাসনের মধ্য দিয়ে পাল যুগের সূচনা হয়?
উ : ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা গোপালের শাসনের মধ্য দিয়ে।
প্র : পাল রাজত্ব কত বছর টিকে ছিল?
উ : প্রায় চারশত বছর।
প্র : পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার কোথায় অবস্থিত?
উ : বর্তমানে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে।
প্র : কে পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার করেন?
উ : স্যার কানিংহাম।
প্র : রাজা ধর্মপালের রাজত্বকালের বিস্তৃতি কত?
উ : ধর্মপালের রাজত্বকাল ছিল ৭৭৭-৮১০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্র : পাহাড়পুর বিহারের অপর নাম কী?
উ : সোমপুর বিহার।
প্র : সোনামসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উ : চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার অবস্থিত ঐতিহ্য সোনামসজিদকে কোথায়।
প্র : 'দেউল' শব্দের অর্থ কী?
উ : দেবালয়।
প্র : 'কমলার দীঘি' পালাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?
উ : মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত।
প্র : 'মহুয়ার পালা' পালাটি কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত?
উ : মৈমনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত।
প্র : তিতুমির কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : চব্বিশ পরগনা জেলার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে।
প্র : তিতুমিরের পুরো নাম কী?
উ : মীর নিসার আলী।
প্র : তিতুমির কিভাবে শহিদ হন?
উ : ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তিনি শহিদ হন।
প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার শামাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহর আন্দোলন কী নামে পরিচিত?
উ : ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

প্র : হাজি শরিয়তউল্লাহ কিসের বিরুদ্ধে দেশের হয়েছিলেন?
উ : ধর্মকে আশ্রয় করে সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।
প্র : কুদিরাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : কুদিরাম বসু ১৮৮৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌবনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : কুদিরাম কাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন?
উ : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
প্র : কুদিরাম কাকে মারতে চেয়েছিলেন?
উ : প্রত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশত দুইজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করেন।
প্র : কুদিরাম কিভাবে মারা যান?
উ : ১১ই আগস্ট, ১৯০৮ এই মহান বিপ্লবীর ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়।
প্র : সূর্য সেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : মাস্টার দা সূর্য সেন ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র : সূর্য সেন কাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করেন?
উ : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।
প্র : সূর্য সেন কত সালে চট্টগ্রামকে ইংরেজমুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
উ : ১৯৩০ সালে।
প্র : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কে ছিলেন?
উ : জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে শিল্পকলা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী।
প্র : জয়নুল আবেদিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার ময়মনসিংহ থানায়।
প্র : অবন ঠাকুর কে ছিলেন?
উ : বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
প্র : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ : ১৯২০ সালে ফরিদপুর জেলার, বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : 'আমার পরিচয়' কবিতাটি কবির কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উ : সৈয়দ শামসুল হকের 'বিশের কবিতা সমগ্র' নামক গ্রন্থ থেকে।
প্র : বাংলার আলস্য নিয়ে মানুষ এত হাসে কেন?
উ : আজ বিশ্বের বাঙালি জাতির বড়ই দুর্দিন। যে সময় অন্যদের সাধনা ও সাফল্যের যে প্রেরণা পাওয়া যায় তা হয়তো বিন্দুমাত্র বড় ছিল না, ছিল আমাদের সমূল অপেক্ষাকৃত সত্য। তাইতো সেই আলস্য ধরেই আজ বাঙালি হয়ে পৌঁছায়।
প্র : হোসেনের নদী কেন?
উ : হোসেন মনিমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী পরিবেষ্টিত হওয়ায় 'হোসেনের নদী' বলা হয়েছে। এটি 'অনিন্দ্যসুন্দর সম্বোধন'।
প্র : ষোড়ঙ্গাবাংলার মসজিদ-বেদি কী?
উ : এটি একটি বিশেষ ধরনের মন্দিরস্থাপত্য। প্রায় ছয়শ বছর আগে মধ্যযুগে প্রথমে বঙ্গদেশে নিয়ে এই ধরনের মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির পরস্পর সংযুক্ত দুটি দোচালা কুটিরের সমন্বয়ে গঠিত বলে একে ষোড়-বাংলা মন্দির বলে। মন্দিরগাত্রে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' থেকে কাহিনি, সামাজিক জীবনযাত্রা, শিকারের দৃশ্য টেরাকোটা অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। মন্দির সংযুক্ত আগের মাঝখানে একটি চারচালা ছোট শিখর-ঘর বিদ্যমান। উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুরে চারশ বছরের পুরোনো একটি শিবমন্দির আছে, যা ষোড়বাংলা পদ্ধতিতে তৈরি। উল্লেখ্য, লেখক সৈয়দ শামসুল হকের জন্মস্থান কুড়িগ্রাম জেলার অদূরবর্তী হরিপুরের এই মন্দির।
প্র : আউল-বাউল কী?
উ : বাউল বাংলার নিজস্ব দর্শন। 'বাতুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব। চাঁদকাজি ও মাধবী এই দর্শনের প্রবক্তা। বীরচন্দ্র নামের এক বৈষ্ণব একে জনপ্রিয় এবং পরে লালন সাঁই একে লোকপ্রিয় করেন। বাউলপথ এক বিশেষ দর্শনের মানুষ।

হিন্দু চৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদ ও মুসলিমদের সুফিবাদের সমন্বয় এই বাউলদের মধ্যে অনেকে পেয়ে থাকেন। এই মতবাদীরা সংসারবিষয়ে 'আওলানো' (এলোমেলো) ভাব পোষণ করেন বলে সংসারীরা অভিযোগ করে তাদের অনেককে আউলও বলেন। তাই আউল-বাউল প্রায় সমার্থক শব্দজোড়ে পরিণত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, কর্তাভজা নামের বিশেষ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ বা আউলেচাঁদ নামের একজন সাধক। তিনি নদীয়ার উলাগ্রামের মহাদেব দাস নামের এক বারুই পানব্যবসায়ীর গৃহে প্রতিপালিত হন। তার অনুসারীরাই আউল। আউল ও বাউল এই সম্প্রদায় মিলেই আউল-বাউল।

প্র : 'গীতাঞ্জলি' ও 'অগ্নি-বীণা' কী?

উ : 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। 'অগ্নি-বীণা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। (এ দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম অংশ।)

প্র : 'শুধাও' কী?

উ : 'জিজ্ঞেস করো'। শুধাও কবিতায় ব্যবহার হয়, গদ্যে নয়। তাই এ ধরনের শব্দকে 'কাব্যভাষা' বলে।

প্র : বীজমন্ত্র কী?

উ : হিন্দুধর্মে মন্ত্র ও বীজমন্ত্র বলে দুটো ধারণা আছে। মন্ত্র প্রকাশ্যে উচ্চারণযোগ্য, অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বা দীর্ঘ। কিন্তু বীজমন্ত্র প্রকাশ্যে উচ্চারণযোগ্য নয় ও হ্রস্ব। বীজমন্ত্রকে প্রাণমন্ত্রও বলা হয়।

প্র : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'– কার উক্তি?

উ : মধ্যযুগের বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের।

প্র : সাম্য কী?

উ : 'সমতা'। সাম্যবাদ একটি রাজনৈতিক মতবাদ। জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

সোমেন চন্দ

প্র : সোমেন চন্দের জন্মসন কত?

উ : ২৪শে মে, ১৯২০।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : বালিয়া গ্রাম, পলাশ, নরসিংদী।

প্র : তাঁর পূর্ণ নাম কী?

উ : সোমেন্দ্র কুমার চন্দ।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ।

প্র : তাঁর অন্য কি পরিচয়?

উ : তিনি ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

প্র : তাঁর গ্রন্থসমূহের নাম কী?

উ : সংকেত ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৫), বনস্পতি ও অন্যান্য গল্প (১৯৪৬), সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ (১৯৭৩)।

প্র : সোমেন চন্দের একটি উল্লেখযোগ্য গল্পের নাম লিখ।

উ : ইঁদুর।

প্র : 'ইঁদুর' ছোটগল্পটির পরিচয় দাও।

উ : জীবনের পরতে পরতে যে বাস্তবের অনুশীলন প্রতিনিয়ত আমরা চর্চা করে চলেছি, আমাদের শাণিত বোধ যেখানে আটপৌরে সমাজব্যবস্থার কাছে নমনীয়, সেখানে একটি ইঁদুরের সংগ্রাম সেই মানুষের বিরুদ্ধে। এরকম পটভূমিতে সোমেন চন্দের এক অসাধারণ গল্প ইঁদুর। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় 'ইঁদুর' খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ জানিয়েছেন, 'ইঁদুর' গল্প পড়েই তিনি কথাসাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

প্র : তাঁর মৃত্যু হয় কিভাবে?

উ : ফ্যাসিবাদ সমর্থকদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে তিনি নিহত হন।

প্র : তাঁর মৃত্যুসন কত?

উ : ৮ই মার্চ, ১৯৪২।

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্র : স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্মসন কবে?

হাসান আজিজুল হক

প্র : হাসান আজিজুল হক কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৯৩৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : **গল্প :** শীতের অরণ্য (১৯৬৪), আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭), জীবন ঘষে আগুন (১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (১৯৭৫), পাতালে হাসপাতালে (১৯৮১), আমরা অপেক্ষা করছি (১৯৮৯), রোদে যাবো (১৯৯৫)। **উপন্যাস :** বৃত্তায়ন (১৯৯১), শিউলি (২০০৬), আগুনপাখি (২০০৬), সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩)। **প্রবন্ধ:** কথাসাহিত্যের কথকতা (১৯৮১), অপ্রকাশের ভার (১৯৮৮), কথা লেখা কথা (২০০২)। **মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক :** একাত্তর- করতলে ছিন্নমাথা। **সম্পাদনা :** অসীমান্তিক (১৯৯৮)।

প্র : 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পগ্রন্থ সম্পর্কে লেখ।

উ : দেশ বিভাগের ফলে সৃষ্ট ব্যক্তিচরিত্রের নৈতিক স্খলন সাম্প্রদায়িকতা এবং সংশ্লিষ্ট কারণে সৃষ্ট চরম হতাশা ও দারিদ্র্য, উত্তেজক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রচিত হয় আত্মজা ও একটি করবী গাছ, পরবাসী, সারাদুপুর, অন্তর্গত নিষাদ, মারী, উটপাখি, সুখের সন্ধানে, আমৃত্যু আজীবন এই আটটি গল্প। হাসান আজিজুল হকের এই আটটি গল্পের সমাহারে সমৃদ্ধ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গ্রন্থটি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৭ সালে। বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এই গল্পগ্রন্থটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : 'আমরা অপেক্ষা করছি' গল্পগ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : হাসান আজিজুল হক রচিত 'আমরা অপেক্ষা করছি' গ্রন্থটি মিনি মাগনার, চুমকুড়ি হাওয়া নেই, মাটির তলার মাটি, সমুখে শান্তি পারাবার, পাব্লিক সার্ভেন্ট, অচিন পাখি- এই কয়েকটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৮৯ সালে। [illegible] জীবনের চিত্র, [illegible] নর-নারীর [illegible] ছোবলে [illegible] বিষয় গল্পগুলোতে [illegible]

প্র : 'আগুনপাখি' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উ : 'আগুনপাখি' হাসান আজিজুল হকের পৈতৃক নিবাস বর্ধমানের একটি [illegible] অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে [illegible] এলাকার মানুষের সংগ্রামী জীবন [illegible] বিভেদকামী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার যথাযথ রূপায়ণ। এর মধ্য দিয়েই লেখক জীবনের নেতিবাচকতা পরিহার করে ইতিবাচকতার সন্ধান করেছেন। উপন্যাসটিতে প্রথাগত চরিত্র-নাম নেই তবে সব চরিত্রই বোঝা যায়। এগুলো ত্রিমাত্রিক এবং দ্বন্দ্বসংকুল। মেঝ বউ চরিত্রটি উপন্যাসের মূল এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধতার প্রতীকে পরিণত।

প্র : হাসান আজিজুল হকের 'সাবিত্রী উপাখ্যান' উপন্যাসে কী আছে?

উ : হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস 'সাবিত্রী উপাখ্যান' প্রকাশ পায় তাঁর উপন্যাস 'আগুন পাখি'র (২০০৬) সাত বছর পর ২০১৩ সালে। বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজমনস্ক উপন্যাস এটি। উপন্যাসটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। একটি পত্রিকাকে প্রকাশনা-পর্বে লেখক বলেন: '১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন হয়েছে। ভারতে প্রথম একটি নির্বাচন হচ্ছে। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস কোয়ালিশন করার চেষ্টা করেছে। তাদের চেষ্টা সফল হয় নি। ওদিকে জমিদারি ও মহাজনি প্রথা উঠে যাচ্ছে। সমাজে তখন একটি পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সে সময়ই বীরভূম এলাকায় একটি ঘটনা ঘটে। ব্রাহ্মণবংশীয় এক নারী ধর্ষিতা হয়েছিল। সে ঘটনায় উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের নামে মামলা হয়। ঘটনাটি তখন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। [illegible] ঐ সময়টির পাশাপাশি সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরতে চেয়েছি। একে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যাবে না। অতীত থেকে এই সাম্প্রতিককাল অবধি নারীর যে চিরন্তন অবস্থান, উপন্যাসটিতে সে বিষয়ই প্রধান হয়ে এসেছে।'

প্র : হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত 'অসীমান্তিক' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের মোট একষট্টি গল্পের সমাহারে হাসান আজিজুল হকের সম্পাদনায় 'অসীমান্তিক' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত গল্প থেকে উঠে আসে তিনটি অঞ্চলের জীবনের পরিপূর্ণ দিক, যা পাঠকের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের উৎস। এই অর্থে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই গ্রন্থে ওই তিন অঞ্চলের গল্পের সমকালীন ধারাও স্পষ্ট হয়।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : আদমজি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০), আলাওল পুরস্কার (১৯৮৩), অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৪), আনন্দ পুরস্কার (২০০৭)।

হাসান হাফিজুর রহমান

প্র : হাসান হাফিজুর রহমানের জন্মসন কত?

উ : ১লা জুন, ১৯৩২।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : জামালপুর।

প্র : তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু?

উ : ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪৬), আই.এ (১৯৪৮), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. (১৯৫১), বাংলায় এম.এ (১৯৫৫)।

প্র : তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন কেন?

উ : তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য [illegible]

প্র : [illegible]

উ : [illegible]

প্র : তিনি কী হিসেবে পরিচিত?

উ : [illegible]

প্র : সাহিত্যকর্মে তিনি কীসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন?

উ : [illegible]

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উ : [illegible]

প্র : তাঁর প্রকাশিত অন্য গ্রন্থগুলোর নাম কি?

উ : **কবিতা :** [illegible] (১৯৭২), [illegible] (১৯৭৭)। **গল্প :** [illegible] (১৯৭০)।

প্র : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় যে আত্মদান করা হয় তার স্মরণে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন। এর প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সুলতান। সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংকলনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস শিরোনামে ৬টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখক লিখেছেন। এই সংকলনেই প্রথম প্রকাশিত হয় আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি। প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে।

'বাংলা ভাষার জন্মকথা' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : 'ভাষা' কিসের মতো জন্ম নেয় না?
উ : মানুষ বা গাছপালার মতো।
প্র : 'এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না।'—একথা দিয়ে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
উ : বাংলা ভাষা পরিবর্তনশীল, স্থির নয়।
প্র : ভাষার ধর্ম কী?
উ : ভাষার ধর্ম হলো বদলে যাওয়া।
প্র : ভাষার কী মানুষের মুখে মুখে বদলে যায়?
উ : ভাষার ধ্বনি।
প্র : মানুষের মুখে মুখে ভাষার ধ্বনি বদলের সাথে আর কী ঘটে?
উ : বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের।
প্র : বাংলা ভাষা কিভাবে জন্মলাভ করেছে?
উ : পূর্ববর্তী ভাষার ধ্বনি-শব্দ-অর্থ বদলে বদলে।
প্র : কোন ভাষার বেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহার হয়?
উ : সংস্কৃত ভাষার।
প্র : সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলার কারণ কী ছিল?
উ : যেহেতু বাংলায় অনেক বেশি সংস্কৃত শব্দ আছে, তাই অনেকে মনে করেছেন সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী বা মা। আর বাংলা সংস্কৃত ভাষার দুই মেয়ে।
প্র : কোন শতকে একদল লোক মনে করেন যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক আসলে দূরের সম্পর্ক?
উ : উনিশ শতকে।
প্র : সংস্কৃত সমাজের কোন শ্রেণির মানুষের ভাষা ছিল?
উ : সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের ভাষা। তা মুখের ভাষাও ছিল না।
প্র : মানুষেরা সে সময় কোন ভাষায় কথা বলতো?
উ : নানা রকমের প্রাকৃত ভাষায়।
প্র : একদল লোক বাংলা ও প্রাকৃতের সম্পর্ক নিয়ে কী ভাবতো?
উ : সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব।
প্র : মাগধী প্রাকৃতের কোন পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম— এমত প্রথম কে দেন?
উ : একজন বিদেশি, তাঁর নাম জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন।
প্র : বাংলা ভাষা ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস প্রথম কে রচনা করেন?
উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্র : কোন দুই মহাদেশের বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্যে গভীর মিল দেখা যায়?
উ : এশিয়া ও ইউরোপের।
প্র : ইউরোপ থেকে পূর্বভারত-বাংলাদেশের ভাষাগুলোর একটি ভাষাবংশের নাম কী দেয়া হয়?
উ : ইন্দো-ইউরোপীয় বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ।
প্র : ভারতীয় আর্যভাষা কোন ভাষাবংশের শাখা?
উ : ইন্দো-ইউরোপীয়।
প্র : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যায়?
উ : ঋক বেদে।
প্র : ঋক বেদ কোন সময়ের রচনা?
উ : আনুমানিক ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।
প্র : বেদের শ্লোকগুলো কেমন?
উ : পবিত্র
প্র : বেদ কিভাবে প্রচারিত হয়েছে?
উ : মুখস্থের মাধ্যমে।
প্র : বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হবার কারণ কী?
উ : কারণ হাজার হাজার বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে মুখের ভাষা বদলে যায়।
প্র : বেদের ভাষার নাম কী?
উ : বৈদিক ভাষা।
প্র : কারা বৈদিক ভাষা বিধিবদ্ধ করে মানসম্পন্ন করেন?
উ : ব্যাকরণবিদগণ।
প্র : এই ভাষার নাম কী দেয়া হয়?
উ : সংস্কৃত
প্র : সংস্কৃত ভাষা কেমন?
উ : বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা।
প্র : সংস্কৃত ভাষা কখন বিধিবদ্ধ হয়েছিল?
উ : খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই।

প্র : বিশ্বে ভাষার মধ্যে ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর পাওয়া যায়?

উ : তিনটি।

প্র : প্রথম স্তরটির নাম কী?

উ : বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত।

প্র : বৈদিক ভাষার সময় বা কাল কত?

উ : খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে [illegible]।

প্র : বৈদিক ভাষার পরের স্তরটি কী?

উ : সংস্কৃত।

প্র : ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতে সংস্কৃত ভাষা কখন স্থিতিশীল রূপ পায়?

উ : খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে।

প্র : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কাকে বলে?

উ : বৈদিক ও সংস্কৃতকে।

প্র : মধ্যভারতীয় আর্যভাষা কোন কোন ভাষাকে বলে?

উ : প্রাকৃত ভাষাগুলোকে।

প্র : প্রাকৃত ভাষার কথ্য ও লিখিত রূপ কোন সময় পর্যন্ত প্রচলিত থাকে?

উ : খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্র : প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম কী?

উ : অপভ্রংশ

প্র : অপভ্রংশ ভাষা হিসেবে কেমন?

উ : খুব বিকৃত হয়ে যায়।

প্র : বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকে উৎপন্ন ভাষাগুলোর নাম কী?

উ : বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি।

প্র : পূর্বমাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব– কে মনে করেন?

উ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্র : একই সূত্রে আর কোন দুটো ভাষার জন্ম?

উ : আসামি ও উড়িয়া।

প্র : মৈথিলি, মাগধী, ভোজপুরিয়া ভাষার সঙ্গে খানিকটা মিল কেন বাংলা ভাষার?

উ : কারণ, মাগধী প্রাকৃতের অন্য দুটি শাখা থেকে এগুলো উৎপন্ন।

প্র : প্রাকৃত বাংলাকে গৌড়ী প্রাকৃত নাম দেন কে?

উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

প্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, [illegible] বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে?

উ : গৌড়ী প্রাকৃতের [illegible] থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে।

হুমায়ুন কবির

প্র : হুমায়ুন কবিরের জন্মদিন কত?

উ : ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : কোমরপুর গ্রাম, ফরিদপুর।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : লেখক ও রাজনীতিবিদ।

প্র : তাঁর পিতার নাম কী?

উ : খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আহমেদ।

প্র : তাঁর গ্রন্থ সমূহের নাম কী?

উ : প্রবন্ধ : ধারাবাহিক (১৯৪০), শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), মার্কসবাদ (১৯৫১), শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (১৯৫৭)। কাব্য : স্বপ্নসাধ (১৯২৮), সাথী (১৯৩০), অষ্টাদশী (১৯৩৮)। উপন্যাস : নদী ও নারী (১৯৪৫)।

প্র : তিনি কোন পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন?

উ : 'চতুরঙ্গ'।

প্র : তাঁর মৃত্যুতারিখ কত?

উ : ১৮ই অগস্ট, ১৯৬৯।

হুমায়ূন আহমেদ

প্র : হুমায়ূন আহমেদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ : তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা, বর্তমানে নেত্রকোনার কুতুবপুরে ১৯৪৮ সালের ১৩ই নবেম্বর কৃষ্ণপক্ষের শনিবার রাত ১০-৩০ মিনিটে।

প্র : তাঁর মাতা-পিতার নাম কী?

উ : আয়েশা বেগম ও ফয়জুর রহমান।

প্র : তিনি মূলত কী হিসেবে পরিচিত?

উ : কথাসাহিত্যিক।

প্র : তিনি কোন বিষয়ের উপর পিএইচডি [illegible] করেন?

উ : পলিমার কেমিস্ট্রি

প্র : তিনি কোথায় কর্মজীবন আরম্ভ করেন?

উ : ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] পদে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে।

প্র : তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি এবং এটি কত সালে প্রকাশিত হয়?

উ : 'নন্দিত নরকে', ১৯৭২ সালে।

প্র : 'নন্দিত নরকে' ছাড়া তাঁর অপূর্ব সাহিত্যকর্ম কোনটি?

উ : 'শঙ্খনীল কারাগার'।

প্র : হুমায়ূন আহমেদ-এর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি কোনটি?

উ : 'আগুনের পরশমণি'।

প্র : 'আগুনের পরশমণি' কয়টি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে?

উ : আটটি শাখায়।

প্র : 'আগুনের পরশমণি' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য ছায়াছবিগুলো কী?

উ : 'শ্রাবণ মেঘের দিন' ও 'দুই দুয়ারী'।

প্র : লজিক ও এন্টি লজিক নিয়ে কাজ করা তাঁর দুটি চরিত্র কী?

উ : মিসির আলী ও হিমু।

প্র : তাঁর প্রকাশিত প্রধান গ্রন্থগুলো কী?

উ : নীল অপরাজিতা, প্রিয়তমেষু, জয়জয়ন্তী, দূরে কোথাও, এই সব দিনরাত্রি, নৃপতি, মহাপুরুষ, নির্বাসন, সম্রাট, দুই দুয়ারী ইত্যাদি।

প্র : তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনগুলো?

উ : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প।

প্র : 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'আগুনের পরশমণি'তে ঢাকায় গেরিলা অপারেশনের দুঃসাহসিক বর্ণনা, [illegible]

প্র : '[illegible]' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : [illegible]

প্র : 'অনিল বাগচীর একদিন' উপন্যাস সম্পর্কে লেখ।

উ : [illegible] মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে 'অনিল বাগচীর একদিন' [illegible] অনিল বাগচী [illegible] ঢাকায় [illegible] অনিল বাগচী [illegible] একটি চাকরি করে তার [illegible] সেখানে থাকে তার মা-বাবা আর বোন। ভয়, আতঙ্ক, দুঃখ, ভবিষ্যৎহীন, স্বপ্নহীন অবস্থায় অনিল বাগচী এক সময় জানতে পারে যে, গ্রামে তার পিতাকে হত্যা করেছে পাকসেনারা। গ্রামের স্কুলের শিক্ষক মনোয়ার উদ্দিন খাঁ তাকে চিঠি দিয়ে এ সংবাদ দেন এবং

তাকে গ্রামে আসতে নিষেধ করেন। অনিলের বোন অরুণীতে নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন বলে তাকে সান্ত্বনা দেন তিনি। এই চিঠি পাবার পর থেকে অনিল আর ঘরে লুকিয়ে থাকে না, বেরিয়ে পড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে। পথে বিদেশি সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হয় এবং সেখানে সে সাক্ষাৎকার দেয়। বলে, দেশের অবস্থা ভালো নয়। এখানে কেউ হাসে না। দেশটা যেন কবরখানা বা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। একদিকে রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা চলে, অন্য দিকে সে বিদেশি সাংবাদিকদের এমন সাক্ষাৎকার দেয় যে গ্রামে তার পিতাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করেছে। আসলে অনিল বাগচীর ভেতরের মানুষটি জেগে ওঠে, যে ভয় ভরের ঊর্ধ্বে। সে তার অফিসে যায়। এই অফিসের বিহারি বসকে অনিলের পিতা একদিন চিঠিতে জানিয়েছিল যে, তার পুত্রের গুণ হলো সততা, দোষও সততা। এই অফিসে বিহারি বস কোম্পানির লাভক্ষতি নিয়ে চিন্তায় মগ্ন আবার গ্রামে যাবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনিলের নিরাপত্তার কথাও সে ভেবেছে। অনিল গ্রামে যাবে বলে টাঙ্গাইলের বাসে চেপে বসে। সহযাত্রী পায় আইয়ুব আলী নামের একজনকে, যিনি স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে শ্যালকের বিয়ে উপলক্ষে টাঙ্গাইলে যাবেন বলে বসে চেপেছেন। আইয়ুব আলী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে ফেলেন যে, তার সহযাত্রীটি হিন্দু। তাই আইয়ুব আলী অনিল বাগচীকে পরামর্শ দেন এই বলে যে, অনিল বাগচী যেন নিজের নাম অনিল না বলে মহসীন বলে। বাসে চলতে চলতে আইয়ুব আলী ও তার পরিবারের সঙ্গে অনিল বাগচীর পরিচয় জমে যায়। একদিকে যুদ্ধকালীন ভয়াবহ অবস্থা, আতঙ্কিত অন্যান্য যাত্রী, রাস্তায় নানা রকমের চেকপোস্ট অতিক্রম অন্যদিকে পিতার হত্যা-সংবাদ ও বোনের অন্যের বাড়িতে আশ্রয়ের খবর পেয়ে গ্রামে ফিরবে বলে অনিলের মধ্যে চাপা উত্তেজনা- এসব নিয়েই উপন্যাসটি ভিন্ন আঙ্গিকে সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে অনেক পর অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে একটি চেকপোস্টে বাস থেকে নামতে হয় সবাইকে। নাম-পরিচয় জানতে চাইলে আইয়ুব আলীর পরামর্শ উপেক্ষা করে অনিল তার আসল নামই বলে। কিন্তু জিজ্ঞাসাসূত্রে জানায়, সে আওয়ামী লীগের কর্মী নয়, মুক্তিবাহিনীর সদস্যও নয়। আইয়ুব তাকে মুসলিম বলে বাঁচাতে চায়। কিন্তু আত্মীবন সততার ওপর নির্ভরকৃত অনিল নিজের পরিচয় গোপন করে না। পাকবাহিনীর সদস্যরা আইয়ুবকে বাঁচায় কিন্তু অনিলকে হত্যা করে। মৃত্যুর সময় সে নিজের গ্রামকে মনে করে, মনে করে পিতাকে, বোনকে, শৈশবকে, কৈশোরকে আর বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে। এভাবেই অনিল বাগচীর একদিন সমাপ্ত হয় চিরতরে কিন্তু বাংলাদেশে একদিন উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য।

প্র : তিনি কী কী পুরস্কার লাভ করেন?

উ : লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), একুশে পদক (১৯৯৪), শেলটেক পুরস্কার (২০০৭)।

প্র : তিনি কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ : ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই।

'নিয়তি' গল্প থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

প্র : হুমায়ুন আহমেদের শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছুদিন কোথায় কেটেছে?

উ : জগদলে।

প্র : জগদলে দিনগুলো লেখকের কাছে আনন্দময় ছিল কেন?

উ : কারণ সেখানে কোনো স্কুল ছিল না। তাই কোনো পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। সেজন্য দিনগুলো খুব আনন্দময় ছিল।

প্র : মহারাজার বসতবাড়িটি কোথায় ছিল?

উ : জগদলে।

প্র : মহারাজা বসতবাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিল?

উ : 'পুর্নিয়া' (চারত)। কারণ, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিমদের থাকার জন্য।

প্র : একসময় বাড়িটি কারা দখল নেয়?

উ : পাকিস্তান সরকার।

প্র : লেখকের বাবা মহারাজার কথা শুনে মুগ্ধ হতো কেন?

উ : কারণ মহারাজার বসতবাড়িতে বিভিন্ন রকম বই ছিল।

প্র : আর কোন কারণে লেখকের বাবা মহারাজের প্রশংসা করেছেন?

উ : মহারাজ নিজ বাড়িতে জেনারেটর স্থাপন করে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য কাজের জন্য ছোট ছাপাখানা বসিয়েছিলেন বলে।

প্র : জগদলে বিকেলের দিনগুলো লেখকের কাছে রোমাঞ্চকর ছিল কেন?

উ : প্রতিদিন বিকেলে বাবা কাঁধে টাঙ্গি ঝুলা বন্দুক নিয়ে বলতেন– চল বনে বেড়াতে যাই।

প্র : কাঁধে বন্দুক নিতেন কেন?

উ : কারণ, বন থেকে প্রায়ই বাঘ বের হতো।

প্র : জগদল কেন কুখ্যাত ছিল?

উ : কারণ ঐ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রভাব বেশি ছিল।

প্র : ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক কী ছিল?

উ : বায়োকেমিক ঔষধ আর কুইনাইন।

প্র : লেখক তার তিন ভাইবোন সহ রোজ গায়ে মাখতেন কোথায়?

উ : রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে।

প্র : মহারাজার অবশিষ্ট কুকুরের নাম কী ছিল?

উ : বেঙ্গল টাইগার।

প্র : শাহীন কে?

উ : লেখকের ছোট ভাই

প্র : শাহীন কি দেখে আনন্দ পেল?

উ : সাপ দেখে।

প্র : বেলা টাইগারের ইচ্ছা করে পাল কেন?

উ : সাপের কামড়।

প্র : বেলা টাইগারকে কে মেরে ফেলল?

উ : লেখকের বাবা বন্দুক নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলেন।

প্র : বিশ্লেষণের লেখকের কয়ে লেখক পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখিত মানুষ তাকে মনে হলো?

উ : লেখকের ভেবেছে। কারণ যে কুকুর তার ছোটবেলা থেকে তার সাথে ছিল সে কুকুরকে তিনি মেরে ফেলেছেন।

প্র : 'হুকুম' কী?

উ : নির্দেশ।

প্র : নিবন্ধটি কোথা থেকে নেয়া হয়েছে?

উ : বাঁধন কর্মকারিকে রচয়িতা মাহমেদের পূর্ণাঙ্গরূপক গ্রন্থ 'আমার ছেলেবেলা থেকে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্র : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কত সনে জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৭ই এপ্রিল ১৮৩৮।

প্র : তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

উ : গুলিটা বাঙ্গবল্লভ গ্রাম, হুগলি।

প্র : তিনি মূলত কী ছিলেন?

উ : মহাকাব্যের কবি।

প্র : তাঁর পেশা কী ছিল?

উ : আইন ব্যবসা। প্রথমে শ্রীরামপুর, পরে হাওড়ায় মুন্সেফ পদে কর্মসম্পাদন। অবশেষে কিছুকাল স্বাধীনভাবে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা।

প্র : বাংলা মহাকাব্যের ধারায় তাঁর দান কেমন?

উ : তিনি মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ইংরেজ শাসিত ভারতীয়দের, বিশেষ বাঙালি শিক্ষিত মহলে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি করেন।

প্র : মধুসূদনের পরবর্তীকালে সর্বাধিক খ্যাতিমান কবি কে ছিলেন?

উ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্র : তাঁর কাব্য গ্রন্থগুলোর নাম কী?

উ : চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১),
বীরবাহু (১৮৬৪),
কবিতাবলী (খণ্ড কবিতার সংকলন, ১৮৭০),
আশাকানন (১৮৭৬),
ছায়াময়ী (১৮৮০),
দশমহাবিদ্যা (১৮৮২),
চিত্তবিকাশ (১৮৯৮)।

প্র : হেমচন্দ্র রচিত মহাকাব্যের নাম কী?

উ : বৃত্রসংহার (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭)।

প্র : 'বৃত্রসংহার' গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫-৭৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত জনপ্রিয় আখ্যান কাব্য। মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত। দুই খণ্ডে (১ম খণ্ড ১-১১ সর্গ, ২য় খণ্ড ১২-১৫ সর্গ) প্রকাশিত হয়। বৃত্রাসুরের স্বর্গজয় ও দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র দ্বারা ইন্দ্রের বৃত্র বধ ও স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার এই কাব্যের আখ্যান ভাগ। পৌরাণিক কাহিনির নূতন ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর জীবনজিজ্ঞাসা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপারে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অনুসারী। উনবিংশ শতাব্দীতে এই কাব্য অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

প্র : তাঁর রচিত এবং সমকালে প্রশংসিত খণ্ডকবিতাগুলোর নাম লেখ।

উ : 'জীবন-সঙ্গীত' (লংফেলোর 'The Psalm of life' এর বঙ্গানুবাদ), 'ভারতসঙ্গীত', 'ভারতবিলাপ', 'গঙ্গার উৎপত্তি', 'পদ্মের মৃণাল', ভারত-কাহিনী', 'অশোকতরু', 'কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ' ইত্যাদি।

প্র : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্য কি?

উ : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

প্র : হেমচন্দ্রের আখ্যান কাব্য কোনটি?

উ : হেমচন্দ্রের আখ্যান কাব্য 'বীরবাহু' ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্র : হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনি ও বর্ণনাত্মক কাব্যগুলি কী কী?

উ : হেমচন্দ্রের অন্যান্য কাহিনি ও বর্ণনা প্রধান কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আশাকানন' (১৮৭৬), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২)।

প্র : হেমচন্দ্রের মহাকাব্য কোনটি?

উ : হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্রসংহার (দুই খণ্ডে ১৮৭৫ ও ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত)।

প্র : 'চিন্তাতরঙ্গিনী' কোন্ ঘটনা অবলম্বনে রচিত?

উ : 'চিন্তাতরঙ্গিনী' প্রতিবেশী এক বন্ধুর আত্মহত্যার ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

প্র : হেমচন্দ্রের আশাকানন কোন্ জাতীয় কাব্য?

উ : হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' রূপক কাব্য, দশটি কল্পনায় কাব্যটি বিন্যস্ত।

প্র : ছায়াময়ী কাব্যটি কার অনুসরণে লেখা?

উ : 'ছায়াময়ী' কাব্যটি দান্তের ডিভাইন কমেডিয়ার অনুসরণে লেখা।

প্র : হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কাব্যটি বিশিষ্ট কেন?

উ : কবি 'তন্ত্রসারে' গ্রন্থে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্র থেকে কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা প্রমুখ দেবীর রূপমূর্তি গ্রহণ করলেও তিনি দেবীর দশটি রূপের মধ্যে মানব সভ্যতার দশটি রূপের মধ্যে মানব সভ্যতার দশটি বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

প্র : তাঁর মৃত্যু তারিখ কত?

উ : ২৪শে মে, ১৯০৩।

বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম

প্রকৃত নাম	ছদ্মনাম / লেখক-নাম
অভিজাতকুমার সেনগুপ্ত	নীহারিকা দেবী
অনুরূপা দেবী	অনুপমা দেবী
অন্নদাশঙ্কর রায়	লীলাময় রায়
আইদুর রেজা	হাসন রাজা
আবু নঈম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শহীদুল্লা কায়সার
আবুল ফজল	শমসের উল আজাদ
আবুল হোসেন মিয়া	আবুল হাসান
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো
এম. ওবায়দুল্লাহ	আসকার ইবনে শাইখ
কাজেম আল কোরেশী	কায়কোবাদ
কাজী নজরুল ইসলাম	নুরু: নুরুল ইসলাম (এটি কাজী নজরুলের ঠিক সে অর্থে ছদ্মনাম নয়, তবে নজরুল 'বাঁধন-হারা' উপন্যাস এবং দু-একটি আত্মজৈবনিক রচনায় এই নাম ব্যবহার করেছেন।)
কালিকানন্দ	অবধূত
কালীপ্রসন্ন সিংহ	হুতোম পেঁচা
কামিনী রায়	জনৈক বঙ্গমহিলা
চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	জরাসন্ধ
জসীমউদ্দীন	জমীরউদ্দীন মোল্লা
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবু শর্মা
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার	দৃষ্টিহীন
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	সুনন্দ
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	দাদাভাই: বাণভট্ট
প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবে চৌধুরী
প্রেমেন্দ্র মিত্র
শচীন্দ্র মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বনফুল মুখোপাধ্যায়

বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিমল ঘোষ
বিমল মিত্র

মইনুদ্দিন আহমেদ
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
মণীশ ঘটক
মনিরুজ্জামান
মধুসূদন মজুমদার
মহাশ্বেতা দেবী
মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মীর মশাররফ হোসেন
মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ
মোহিতলাল মজুমদার
মোঃ শহীদুল হক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজশেখর বসু
রোকনুজ্জামান খান

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শম্ভু মিত্র
শেখ আজিজুর রহমান

সতীনাথ ভাদুড়ী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কৃত্তিবাস ওঝা; দৈবকীনন্দন সিংহ
টেকচাঁদ ঠাকুর

কমলাকান্ত
বনফুল

যাযাবর
কৃচিৎ প্রৌঢ়
মৌমাছি
জাবালি

সেলিম আল দীন
শংকর
যুবনাশ্ব
হায়াৎ মামুদ
দৃষ্টিহীন
সুমিত্রা দেবী
এ নেটিভ
গৌড়তটবাসী মশা; উদাসীন পথিক; গাজী মিঁ
জহির রায়হান
কৃত্তিবাস ওঝা; সত্যসুন্দর দাস
শহীদুল জহির

ভানুসিংহ ঠাকুর
পরশুরাম
দাদাভাই

অনিলা দেবী
প্রসাদ দত্ত; শ্রী সঞ্জীব; সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
শওকত ওসমান

চিত্রগুপ্ত
কালকূট
নীল উপাধ্যায়; নীল লোহিত; সনাতন পাঁড়ে
সুবচনী
ইন্দ্রকুমার সোম

বাংলা পত্র-পত্রিকা

পৃথিবীর প্রথম সংবাদপত্র ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি থেকে প্রকাশিত হয়। ১৭০২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে বের হয় বিশ্বের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় কলকাতা থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। নাম : বেঙ্গল গেজেট; সম্পাদক : জেমস অগাস্টাস হিকি। এরপর কলকাতা থেকে 'ক্যালকাটা গেজেট' (ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪)সহ মাদ্রাজ, বোম্বে ইত্যাদি স্থান থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে মাদ্রাজ, পরে অন্যান্য স্থানে পত্র-পত্রিকায় প্রথম সেন্সর প্রথা চালু করে।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ এ বছর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো: 'দিগ্দর্শন', 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গাল গেজেট'। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের খ্রিষ্টান মিশনারিরা সেখান থেকেই ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিগ্দর্শন নামে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর সম্পাদক ছিলেন : জন ক্লার্ক মার্শম্যান। এই পত্রিকায় ধর্মীয় নানা নীতিকথা ও উপদেশ প্রকাশ হতো। এর মাস খানেকের মধ্যেই খ্রিষ্টান মিশনারিরা সমাচার দর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর সম্পাদনার দায়িত্বও দেয়া হয় জন ক্লার্ক মার্শম্যানকে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের সামান্য আগে বা পরে (মতান্তর আছে) রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বাঙ্গাল গেজেট নামে সার্বিক অর্থেই একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। আর একটি তথ্য, এই পত্রিকা বাংলা ও বাঙালিদের তো বটেই, কোনো ভারতীয় ভাষায়, ভারতীয়দের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার সম্মান দাবি করে। অবশ্য পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং এর কোনো নিদর্শনও

একই বছর ২রা অক্টোবর মিশনারিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য, ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে পত্রিকাটি দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং যার ফলে ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হবার গৌরব। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর (১৮৩৯, জুন ১৪ থেকে দৈনিক হিসেবে প্রকাশ পায়)।

প্র : 'বেঙ্গল গেজেট'-এর পরিচয় দাও।

উ : ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট'। পত্রিকাটিতে মূলত বিজ্ঞাপন, বিদেশি ইংরেজি পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, সংবাদদাতাদের বিবরণধর্মী লেখা ছাপা হতো। 'পোয়েটস্ কর্নার' বলে একটি বিশেষ অংশ ছিল। প্রকাশের প্রথম নয় দশেক কোন রাজনৈতিক বিবাদপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয় নি। পরে প্রশাসনের বিপক্ষে কিছু লেখা বের হলে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ডাকঘর মারফত পত্রিকা বিতরণ বন্ধ করা হয়। পরে হিকি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে হিকির ছাপাখানা আটক ও বিক্রি করে দেওয়া হলে ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

প্র : 'দিগ্দর্শন' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা মাসিকপত্র হিসেবে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মিশনারিদের পক্ষ থেকে 'দিগ্দর্শন' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। সংবাদ অপেক্ষা ধর্মীয় নীতিকথা ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তথ্য পরিবেশনই এখানে প্রাধান্য পেতো। ২৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। নীতি ও ধর্ম শিক্ষা প্রচার

প্র : 'বাঙ্গাল গেজেট' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : এ পত্রিকার কোনো কপি পাওয়া যায় নি। তবে সমাচার দর্পণে, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতির লেখায় এর প্রকাশ ও অন্তর্ধানের সংবাদ জানা যায়। 'ওরিয়েন্টাল স্পেক্টেটর' পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে প্রথম প্রকাশ পায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই তারিখ ১৬ই মে থেকে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে। অতএব, 'বাঙ্গাল গেজেট' 'সমাচার দর্পণে'র আগে না পরে প্রকাশিত তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত এক বৎসরের বেশি পত্রিকাটি চলে নি। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর সম্পাদক ছিলেন, তার সহকারী হিসেবে ছিলেন হরচন্দ্র রায়। রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ উৎসাহে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। এ-সব বিচারে, 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায়, বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশকদের পরিচালনায় প্রথম সংবাদপত্র। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের সম্পাদনা-প্রকাশনা-পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রও।

প্র : ভারতবর্ষের প্রথম ও ভারতীয় প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?

উ : ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র জেম্‌স অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত 'বেঙ্গল গেজেট' (কলকাতা)। [illegible] ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের [illegible] (জানুয়ারি, ১৭৮০)। [illegible] ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে প্রথম প্রকাশ পায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই তারিখ ১৬ই মে থেকে ৯ই জুলাইয়ের মধ্যে। অতএব, 'বাঙ্গাল গেজেট' 'সমাচার দর্পণে'র আগে না পরে প্রকাশিত তা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত এক বৎসরের বেশি পত্রিকাটি চলে নি। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর সম্পাদক ছিলেন, তার সহকারী হিসেবে ছিলেন হরচন্দ্র রায়। রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ উৎসাহে এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাপ্তাহিক ছিল। এ-সব বিচারে, 'বাঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায়, বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশকদের পরিচালনায় প্রথম সংবাদপত্র। শুধু তাই নয়, ভারতীয়দের সম্পাদনা-প্রকাশনা-পরিচালনায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রও।

প্র : 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : [illegible] ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের [illegible] ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। [illegible] এর সম্পাদক ছিলেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। [illegible] দত্ত। সামাজিক ও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদার মনোভাব নিয়ে এ পত্রিকা লেখনী ধারণ করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্র : 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : রামমোহনের সঙ্গে মত-পার্থক্যের কারণে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা ত্যাগ করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহনের মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতের প্রতি ঝুঁকে যায়। এ-ব্যাপারে 'সমাচার দর্পণে'র অনেক

প্র : 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ভারতীয় আত্মীয় সভার [illegible] রামমোহন রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা থেকে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশক তারাচাঁদ দত্ত। সামাজিক ও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে উদার মনোভাব নিয়ে এ পত্রিকা লেখনী ধারণ করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

প্র : 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : রামমোহনের সঙ্গে মত-পার্থক্যের কারণে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকা ত্যাগ করেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ তাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সমাচার চন্দ্রিকা'। রামমোহনের মতের বিরোধিতা করতে গিয়ে পত্রিকাটি রক্ষণশীল মতের প্রতি ঝুঁকে যায়। এ-ব্যাপারে 'সমাচার দর্পণে'র অনেক [illegible] পত্রিকার সম্পাদক সহকর্মে সমাবর্তনী [illegible] ও পাদরিসাহেবদের সমান সাদরাদের [illegible] একজন ছিলেন। 'সমাচার দর্পণের [illegible] সমান পৃষ্ঠা পায় এবং ১৮২৯ [illegible] সাপ্তাহিক থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৩ বছরের [illegible] সমস্ত ধরে এ পত্রিকা টিকে ছিল।

'সমাচার' পত্রিকার পরিচয় দাও।

প্র : [illegible] ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা [illegible] হয়ে নীলমণি হালদারের [illegible] ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সমাচার', পত্রিকাটি সংস্কারবাদী গোঁড়ামুখী চিন্তায় পরিচালিত হতো।

প্র : বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্রের নাম কী?

উ : সমাচার প্রভাকর।

প্র : 'সমাচার প্রভাকর' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'সমাচার প্রভাকর' সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসেবে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি (১৬ই মাঘ, ১২৩৭) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এর সম্পাদক, তার সহকারী ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পত্রিকাটির স্বভাব এমন। অল্পদিন আন্দোলনের সমর্থক, গোঁড়ামুখী রাধাকান্তদেবের বিরোধী, নারী স্বাধীনতার পক্ষে নয়। এ পত্রিকা বছর দেড়েক স্থায়ী ছিল। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই অগস্ট (২৩শে শ্রাবণ, ১২৪৩) ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনাতেই পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হয় বাক্‌ত্রয়িক (অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে তিন দিন) রূপে। এ পত্রিকাই ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুন দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করে। 'সমাচার প্রভাকর' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা হবার গৌরবমালা পায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে এই পত্রিকা পৃথক একটি মাসিক সংকলন প্রকাশ করে। দীর্ঘদিন 'সমাচার প্রভাকর' সুনামের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি ঈশ্বর গুপ্ত মারা গেলে তাঁর সহোদর রামচন্দ্র গুপ্ত পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন। সংবাদ প্রকাশের [illegible] পরিচালনা ও পরিচয় দাও।

উ : [illegible] 'সমাচার প্রভাকর' পত্রিকার [illegible] 'ভত্তবোধিনী পত্রিকা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক জীবনকে আগাগোড়া বদলে দেওয়ার সম্পৃক্ত এবং বাস্তবরূপ ত্বরান্বিত করে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রামমোহনের মৃত্যুর পর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ব্রাহ্মসমাজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বেগবান করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মসমাজের সভায় অনুপস্থিত সভ্যদের রক্ষা করবে, আলোচিত বিষয় তাদের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এ পত্রিকার সম্পাদক হন অক্ষয়কুমার দত্ত। এখানেই প্রথম 'গ্রন্থাধ্যক্ষগণ' (আজ যাকে সম্পাদকমণ্ডলী বলে) নির্বাচিত হন এবং সম্পাদক নয়, গ্রন্থাধ্যক্ষগণের মনোনীত রচনাই প্রকাশ করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক লেখা সে কারণে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে নি। অসুস্থতার জন্য সম্পাদক পদ থেকে অক্ষয়কুমার অবসর নিলে (১৮৫৫) পত্রিকার সম্পাদক হন ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যালয়ের। অন্যান্যদের সম্পাদকাল (১২ বছর) পত্রিকার স্বর্ণযুগ। বিজ্ঞান ও এঁর বিষয়ক আলোচনাই তরুণদেরকে বাংলাদেশীয় পত্রিকার ঘরানা দান করে।

প্র : বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?

উ : মাসিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' বাংলার মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৎকালীন নদীয়া বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে 'কুমারখালি বাংলা পাঠশালা'র প্রধান শিক্ষক হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পরে পাক্ষিক, আরো পরে সাপ্তাহিক হিসেবে বের হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি বের হতো। কেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে, এ-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন : 'আমার [সম্পাদক] ইচ্ছা হইল এই সময় সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যেভাবে অত্যাচারিত হইতেছে তাহা গভর্ণমেন্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।' নীলকর অত্যাচার, খাজনা আদায়ে বাড়াবাড়ি ইত্যাদির বিরুদ্ধে পত্রিকাটি প্রতিবাদী ছিল।

প্র : 'ভারতী' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : 'ভারতী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে, রবীন্দ্র-ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায়। পরে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ এ পত্রিকার সম্পাদক হন। 'ভারতী' একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলে। এই লেখকগোষ্ঠী মূলত রবীন্দ্রানুসারী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, রবীন্দ্রনাথ তো লিখতেনই। পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু লাভ করে।

প্র : 'হিতকরী' পত্রিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে এর সম্পাদক হন মোসলেম উদ্দিন খান। মাত্রাতিরিক্ত মুসলমানের মাতব্বরি পরিহার এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ ও সম্পাদকীয় ছাপা হয় পত্রিকাটিতে। বিদ্যাসাগর বলে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয় এবং এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে 'হিতকরী'র দ্বিতীয় পর্যায় যা সবপত্রে প্রকাশনা শুরু হলে বছর দিয়াশলে চলে যায়। তখন নিয়মাপনে সাদা হয়েছিল: 'নূতন প্রণালীতে খাঁটি নির্ভুল মুসলমানিজাবে বাহির হইবে।' মীর মশাররফ হোসেন ও এস এ এম মহম্মদ রওশন আলীর যুগ্ম সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার কথা। কিন্তু 'খাঁটি নির্ভুল মুসলমানিজাবে'র পত্রিকাটি পরবর্তীকালে আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা আজ জানা যায় না।

প্র : 'সাধনা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্র-ভ্রাতৃদ্বয় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। মূলত ঠাকুরবাড়ি কেন্দ্রিক লেখকদের দ্বারা পরিচালিত। তবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ পত্রিকার প্রাণ। রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে 'সাধনা' পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পত্রিকা প্রকাশের তিন বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে 'সাধনা' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন।

প্র : 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। অনেক দিন বিরতির পর পত্রিকাটি এখন আবার প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশ করছে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার বৈহাটি থেকে 'বঙ্কিমচন্দ্র রিসার্চ সেন্টার' কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন জন সম্পাদনা করছেন।

প্র : 'সবুজপত্র' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'সবুজপত্র' প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বাংলা

গদ্যরীতির বিকাশে এই পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। সাধু গদ্যরীতির বদলে চলিত গদ্যরীতি এই পত্রিকা ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা করে। রবীন্দ্রনাথ নিয়েও এই পত্রিকায় বেশ সুবাদে চলিত গদ্যরীতির সম্ভাবনা অনুভব এবং পরে তা চর্চা করেন। সাহিত্যমাঝে এই পত্রিকা 'সবুজপত্র গোষ্ঠী' তৈরি করতে সক্ষম হয়।

প্র : 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৯২০) মাসে মাসিক 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত হয়। প্রথম বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হলেও পরের বছর অনিয়মিতভাবে প্রকাশ হয়। সব মিলিয়ে মাত্র ১৭টি সংখ্যা বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বলাকা পত্রিকার প্রতি সংখ্যার সূচনাতে মুদ্রিত হতো। 'মোসলেম ভারত' নজরুলের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে প্রধান সহায়ক হয়েছে। প্রতি সংখ্যায় নজরুলের একাধিক রচনা এখানে মুদ্রিত হয়। নজরুলের কামাল পাশা, মোহরম, সাত ভাই আকন, বিদ্রোহী, বাঁধন-হারা (উপন্যাস, কিস্তিতে) ইত্যাদি নানা ধরনের লেখা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

প্র : 'ধূমকেতু' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে 'ধূমকেতু' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এর সম্পাদক। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার সাফল্য কামনা করে লেখেন। 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু / দুর্দিনে এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।' ব্রিটিশ বিরোধী রচনা এখানে ছাপা হতো। নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' এ পত্রিকায় প্রকাশ হলে কবিতা ও পত্রিকা উভয়ই ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। এজন্য নজরুলকে এক বছর কারাবাসও করতে হয়।

প্র : 'কল্লোল' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে আধুনিক লেখকদের সাহিত্যিক মুখপত্র হিসেবে কলকাতা থেকে মাসিক 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ।

[illegible] পত্রিকার [illegible] সম্পাদনে [illegible] ছিলেন, [illegible] ছিলেন। [illegible] ছিলেন [illegible] করেন, তবে [illegible] পত্রিকার [illegible] ছিল। [illegible] বুদ্ধদেব বসু, [illegible] বুদ্ধদেব। [illegible] হৈরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible] মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] ছিল এই পত্রিকার [illegible] পত্রিকাটি কল্লোল [illegible] চলতে সক্ষম হয়। [illegible] [illegible] প্রভাব কম ছিল না।

প্র : 'কালিকলম' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : কলকাতা থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক 'কালিকলম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, যে [illegible] ও সাহিত্যকর্ম থেকে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছিল, 'কালিকলম'ও একই বোধ সম্পন্ন পত্রিকা ছিল। তবে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু হতে পারে নি। 'কল্লোল' ও 'কালিকলমে'র লেখকগোষ্ঠী ছিল মূলত একই।

প্র : 'প্রগতি' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিকপত্র 'প্রগতি'। সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার বাতাস প্রবাহিত হলে ঢাকা যে তাতে পিছিয়ে ছিল না, 'প্রগতি'র প্রকাশ তার প্রমাণ। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি একই সঙ্গে উল্লেখিত হওয়ার যোগ্য হিলেই নয়। সামগ্রিকভাবে আধুনিক সাহিত্যের বিকাশে এ পত্রিকার অবদান কম নয়।

প্র : 'শিখা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সাহিত্য সমাজ'। পরে সংগঠনটির নামকরণ হয় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এ প্রতিষ্ঠানের স্লোগান ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' জ্ঞানের শিখা

[illegible]

বিপ্লবী কৃষ্ণকুমার ধরের সম্পাদনায় পত্রিকাটি আবার ছাপা শুরু করে। ১৯৩০ সালে 'পরিচয়' বন্ধ হয়ে গেলেও কিছু দিন পরে পত্রিকাটি আবার বের হয় এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে একাধিক লেখক এখানে যুক্ত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথও টানা বারো বছর সম্পাদক ছিলেন এ পত্রিকার। পরে পত্রিকার মালিকানা-বদল ঘটে এবং গোপাল হালদার এর সম্পাদক হন। কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) পশ্চিমবঙ্গ শাখার তত্ত্বাবধানে এখনো 'পরিচয়' প্রকাশ পায়। বলা হয়, 'সবুজপত্রে'র পর এরকম উচ্চমানের পত্রিকা বাংলায় আর প্রকাশিত হয় নি।

প্র : 'পূর্বাশা' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬১) ছিলেন

[illegible]

প্র : 'ক্রান্তি' পত্রিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশে প্রগতিবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পত্রিকা 'ক্রান্তি'। ঢাকায় ১৯৩৯ সালে গঠিত হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ। ১৯৪০ সালে এই সংঘের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংঘের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন সোমেন চন্দ, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ। পরে কাজী আবদুল ওদুদ, মুনীর চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন প্রমুখ এই সংঘের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সংঘ ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ,

[illegible]

উ : [illegible] ১৯৪৮ সালে পত্রিকাটি প্রকাশ হয় [illegible] ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর এটিই স্বাধীন পূর্ববাংলার প্রথম বাংলা সাহিত্যপত্র। পত্রিকার সম্পাদকরাই লেখা যায় সকলের দিকে যাদের প্রত্যাশী ছিলেন আয়োজকগণ। এই সাহিত্যপত্রে মূলত মুসলিম লেখকদের লেখা ছিল। এই লেখকদের অনেকেই পরবর্তীকালে খ্যাত হয়েছিলেন। এই সাহিত্যপত্রটি আজ দুর্লভ। বাংলা একাডেমীর 'দুষ্প্রাপ্য' বিভাগে এর প্রথম সংখ্যাটি রক্ষিত আছে। প্রথম সংখ্যায় লিখেছেন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মুহম্মদ এনামুল হক, মাহবুব উল আলম, আবু রুশদ,

[illegible]

[illegible]

প্র : [illegible] পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : [illegible] 'সুন্দরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্র : 'পূর্বমেঘ' পত্রিকার পরিচয় দাও।

উ : ১৯৪৭ থেকে [illegible] সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ ও তা টিকিয়ে রাখা যখন কঠিন ছিল, সে সময়ই রাজশাহী থেকে 'পূর্বমেঘ' (১৯৬০) নামে সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ হয় এবং এক দশকের বেশি সময় টিকে থাকে। ত্রৈমাসিক হিসেবে ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত 'পূর্বমেঘের' আয়ুষ্কাল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং প্রকাশক ছিলেন এ. আর. মল্লিক। উচ্চমানের সাহিত্যালোচনার পাশাপাশি সৃজনশীল রচনার সমাদর ছিল এ পত্রিকায়। ঢাকা থেকে যেকালে 'সমকাল' (১৯৫৭) প্রকাশ হচ্ছে, ঠিক সে-কালেই রাজশাহী থেকে 'পূর্বমেঘ' প্রকাশ দেশে সাহিত্যচর্চার ইতিবাচক উত্তরণকে চিহ্নিত করে।

প্র : 'স্বাক্ষর'-এর পরিচয় দাও।

উ : বাংলাদেশের ইতিহাসে উত্তাল ষাটের দশকে যে-কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল, 'স্বাক্ষর' এগুলোর একটি। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'স্বাক্ষর'

[illegible] বাংলা সাহিত্য বিকাশে যে কয়টি 'স্বাক্ষর'-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্র : 'কণ্ঠস্বর' সম্পর্কে লেখ।

উ : বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের ষাটের দশকে বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন বা ছোট-কাগজ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হয়, এর মধ্যে 'কণ্ঠস্বর' অন্যতম। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হলেও পরে তা নিয়মিত সাহিত্যপত্র রূপে এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথাগত সাহিত্যচর্চা থেকে মুক্তিপ্রয়াসী লেখকদের সমাদর করা হতো এই পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে 'কণ্ঠস্বর'-এর ৩য় সংখ্যার লেখা : "সাহিত্যকে যারা অনুভব করে [illegible] শতদলে, শতপথে, বিচ্ছিন্ন [illegible] আঙ্গিকের জটিলাকরে, চিত্রের [illegible] সরণীতে: কটু স্বাদে ও লোনা [illegible] সততায় শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, [illegible] পাপে: মহত্ত্বে ও বিবংসায়, [illegible] আলিঙ্গনে, 'কণ্ঠস্বর' সেই [illegible] পদপাতবিরল তারুণ্যের পত্রিকা।"

[illegible]

পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল	প্রথম সম্পাদক
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৩১)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ প্রভাকর (দৈনিক, ১৮৩৯)	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১)	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১)	শেখ আলিমুল্লাহ
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫)	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদ ভাস্কর (১৮৩৯)	শ্রীনাথ রায়
[illegible] দর্পণ (১৮৪০)	[illegible] রায়
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)	অক্ষয়কুমার দত্ত
[illegible] (১৮৪৭)	[illegible] বসু
[illegible] (১৮৪৭)	[illegible]
[illegible] দর্পণ (১৮৪৯)	[illegible] বসু
বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১)	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
চিকিৎসারত্নাকর (১৮৫৩)	হলধর সেন
ভারতবর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ (১৮৫৩)	প্যারীচাঁদ মিত্র
সুলভ পত্রিকা (১৮৫৩)	দ্বারকানাথ রায়
মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪)	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫)	কালীপ্রসন্ন সিংহ
বিচারক (১৮৫৮)	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
সোমপ্রকাশ (১৮৫৮)	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
কবিতাকুসুমাবলী (১৮৬০)	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
[illegible] সাহিত্য (১৮৬০)	রামচন্দ্র ভৌমিক
বিজ্ঞান কৌমুদী (১৮৬০)	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
ঢাকাপ্রকাশ (১৮৬১)	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
অবকাশরঞ্জিকা (১৮৬২)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র
অমৃতপ্রবাহিণী (১৮৬২)	বসন্তকুমার-শিশিরকুমার ঘোষ
রহস্য-সন্দর্ভ (১৮৬৩)	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
অবোধবন্ধু (১৮৬৩)	যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ-বিহারীলাল
ঢাকাদর্পণ (১৮৬৩)	হরিশ্চন্দ্র মিত্র

বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)
বামাবোধিনী পত্রিকা (১৮৬৩)
হিতসাধক (১৮৬৮)
অমৃতবাজার (১৮৬৮)
অবলাবান্ধব (১৮৬৯)
বিদ্যাপ্রকাশ (১৮৭০)
সঙ্গীত চিন্তরঞ্জিকা (১৮৭০)
বঙ্গদর্শন (১৮৭২)
মধ্যস্থ (১৮৭৩)
সাধারণী (১৮৭৩)
আর্যদর্শন (১৮৭৪)
বান্ধব (১৮৭৪)
আর্যীজন নেহার (১৮৭৪)
ভারতমিহির (১৮৭৫)
চিত্রকর (১৮৭৬)
ভারতী (১৮৭৭)
বীণা (১৮৭৮)
বালকবন্ধু (১৮৭৮)
নিরামিষভোজী ব্রাহ্মক (১৮৭৯)
পরিদর্শক (১৮৮০)
বঙ্গবাসী (১৮৮২)
সখা (১৮৮৩)
সঞ্জীবনী (১৮৮৩)
নব্যভারত (১৮৮৩)
পাক প্রণালী (১৮৮৩)
অশ্রুকুত ইন্দ্রজাল (১৮৮৪)
নবজীবন (১৮৮৪)
আলোচনা (১৮৮৪)
প্রচার (১৮৮৪)
আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪)
বালক (১৮৮৫)
আহমদী (১৮৮৬)
অনুসন্ধান (১৮৮৭)
ক্রীড়া ও কৌতুক (১৮৮৮)
সুধাকর (১৮৮৯)
চিত্রদর্শন (১৮৯০)
জন্মভূমি (১৮৯০)
সাহিত্য (১৮৯০)

উমেশচন্দ্র দত্ত
কাঙাল হরিনাথ
শ্যামাচরণ সরকার
শিশিরকুমার ঘোষ
ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায়
হরিশ্চন্দ্র মিত্র
উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ বসু
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মনোমোহন বসু
অক্ষয়চন্দ্র সরকার
যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসন্ন ঘোষ
মীর মশাররফ হোসেন
প্রাণবন্ধু শুহ
সত্যাশচন্দ্র রায়চৌধুরী
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজকৃষ্ণ রায়
কেশবচন্দ্র সেন
বলরাম হাড়িভা
বিপিনচন্দ্র পাল
ক্ষেত্রমোহন রায়
প্রমদাচরণ সেন
ভবকালাম গঙ্গোপাধ্যায়
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়
গিরীন্দ্রলাল ঘোষ
অক্ষয়চন্দ্র সরকার
গগনচন্দ্র হোম
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন
আনন্দময়ী দেবী
আবুল কাসিম খান ইউসুফজায়ী
মুকুন্দদাস মাহিড়ী
শশিশেখরেশ্বর রায়
শেখ আবদুর রহিম
বিহারীলাল রায়
নীলমণি বসু ও পঞ্চানন তর্করত্ন
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মুকুলদী (১৮৯০)
হিতবাদী (১৮৯১)
মাধুরী (১৮৯১)
মুসলমান প্রচারক (১৮৯১)
আলী (১৮৯২)
নির্মল (১৮৯২)
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (১৮৯৪)
মুকুল (১৮৯৫)
সোরভ (১৮৯৫)
প্রসূনী (১৮৯৬)
ইণ্ডিয়ানিয়ি (১৮৯৭)
প্রদীপ (১৮৯৭)
কোহিনূর (১৮৯৮)
প্রবাসী (১৯০১)
নবনূর (১৯০৩)
বাসনা (১৯০৮)
মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক, ১৯০৮)
মোহাম্মদী (মৈমিক, ১৯২২)
মোহাম্মদী (মাসিক, ১৯২৭)
ভারতবর্ষ (১৯১৩)
গড়ুলপত্র (১৯১৪)
নারায়ণ (১৯১৪)
আল এসলাম (১৯১৫)
এশিয়া মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৯১৮)
সওগাত (মাসিক, ১৯১৮)
সওগাত (সাপ্তাহিক, ১৯২৬)
প্রাঙ্গুর (কিশোর মাসিক, ১৯২০)
মোসলেম ভারত (১৯২০)
নবযুগ (দৈনিক, ১৯২০)
দৈনিক সেবক (১৯২১)
ধূমকেতু (১৯২২)
কল্লোল (১৯২৩)
সাম্যবাদী (১৯২৩)
যুগবাণী (১৯২৪)
লাঙল (১৯২৫)

কবিতাকলাপ (১৯২৬)
গণবাণী (১৯২৬)

মীর মশাররফ হোসেন
কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য
মুকুন্দমুরারি ঠাকুর
মেহের মোজাফ্ফর আহমেদ
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শেখ আবদুর রহিম
বঙ্গবিহারী দত্ত
শিবনাথ শাস্ত্রী
নিবারণচন্দ্র ঘোষ
যোগেশচন্দ্র গুপ্তবী
জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহম্মদ হবিবুল্লা বাহার
হেমেন্দ্রলাল রায়
ইসলাম প্রচারক সমিতি
শেখ ফজলল করিম
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
জলধর সেন ও জলধরচন্দ্র বিদ্যারত্নন
প্রমথ চৌধুরী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মেল হক
মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন
মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মোজাম্মেল হক
কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমদ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
কাজী নজরুল ইসলাম
দীনেশরঞ্জন দাশ
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
মকবুল হোসেন চৌধুরী
প্রধান পরিচালক- কাজী নজরুল ইসলাম
সম্পাদক – মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মুজফ্ফর আহমদ (কমরেড)

যে ধারাটি আবহমানকাল বাংলা গ্রামীণ জনজীবনকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তা 'মঙ্গলগীতি'। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল প্রভৃতি ধারাগুলি নিয়ে কবি তথা গীতিকারের হাতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। প্রতিটি মঙ্গলগীতিতেই অজস্র রাগরাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই যুগে শ্রোতাদের আনন্দলাভের একমাত্র উপকরণ ছিল মঙ্গলগীত। এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে মাসাধিককাল কোনো-কোনো মঙ্গলকাব্য গীত হতো। বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রমুখ এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি ও গীতিকার।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে 'পাঁচালি' স্থান লেখ।

উ : আগে মঙ্গলকাব্যকেই পাঁচালি বা পাঁচালিপ্রবন্ধ বলে অভিহিত করা হতো। পালাগানগুলিকে দীর্ঘ আখ্যানমূলক কাহিনি 'পাঁচালি' নামে পরিচিত। 'পাঁচালি' শব্দটি 'পথমালা' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলায় পাঁচালি বলতে আমরা বুঝি দেবমাহাত্ম্যসূচক কাহিনিমূলী গান। বাংলা পাঁচালির শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথী রায় (১৮০৬-'৫৭)। তাঁর রচনায় কবিওয়ালাই ছিলেন। তাঁর আগে পাঁচালির নিদর্শন বিশেষ নেই। দাশরথী রায়ের পাঁচালি সাধারণ মানুষের মধ্যে লোকশিক্ষা, সাহিত্যচর্চা, সমাজচিন্তা এবং ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর পরে পাঁচালির পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। দাশরথীর পর পাঁচালিকারদের মধ্যে নাম করেছিলেন সাকুলিয়ার পটু (১৮০২-'৭৩), পাঁচক গায়ে (১৮২০-'৯১), প্রসন্নকুমার গায়ে (১৮৩১-'৭৩) প্রমুখ। পাঁচালিতে একজন গায়েন থাকেন। তিনি নানারকম ভঙ্গিতে আবৃত্তি, ছড়া, গান গেয়ে মূল কাহিনি বিবৃত করেন। এ ধরনের পালায় বেলা, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে পাঁচালি গায়ক পায়ে নূপুর পরে, হাতে তাল দিতে দিতে বা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান উপস্থাপন করতেন।

প্র : 'শাক্তপদাবলি' গানের ইতিহাসে কোন্ ভূমিকা নেয়?

উ : শাক্তপদ বা শ্যামাসংগীত বাংলার শাক্তদের গান। আগমনী-বিজয়া গানে তাঁর বহুবিধ আকুলতার প্রকাশ পায়। শক্তিপীঠে বিশ্বা শ্যামা, কালী বা উমাকে কেন্দ্র করে। এই গানের মূল রস বাৎসল্য, ভক্তি ও শান্ত। শাক্ত সাধকদের মধ্যে মা আনন্দময়ী কেশবের মা, কোথও কখনও কল্পিত। এই পদগুলিতে ছন্দ মিলিয়ে দেওয়া অলংকারের আতিশয্য নেই, তাই কবির আকুতি এবং হৃদয়ের সহজ-সরল আবেদন। এ যেন আমাদের ঘর-গেরস্থালির কথা। তাই এই গান আরো অনুরাগ, অভিমান আর আব্দারে পূর্ণ। শাক্তগীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. প্রকৃতিমূলক বা তত্ত্বমূলক পদ; ২. উমাসংগীত বা আগমনী নিজয়া গান। প্রকৃতিমূলক বা তত্ত্বমূলক পদগুলি 'চক্রের আকৃতি', 'মাতৃরূপ' প্রভৃতি পর্যায়ে সাজিয়ে আলোচনা করা যায়। যেখানে মাতৃরূপকে মোক্ষ নিবেদন করে তাঁদের ভজনের কথা তাঁদের ভজনের কথা নিবেদন করেছেন।

শ্যামা পর্যায়ে যেসকল শাক্তপদের স্বরূপ আকৃতি জানিয়ে এসেছে তাকে নিয়ে যায় আত্মনিবেদনের পথে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কন্যা উমা পার্বতী পতিগৃহের কন্যারূপে পরিচিত। মা মেনকার অন্তরে কন্যার কন্যা উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আসেন। মায়ের চিত্ত তখন আনন্দে আপ্লুত। আবার পিতৃগৃহ থেকে পুনরাবর্তনকালে মা মেনকা নিশাদ-মঙ্গল তাপাক্রান্ত। এই তিনটি পর্যায়ে পর্যায়ে কবিগীতি এখানে কবিতার মাত্র করেছে। তাই শ্যামাপদী বিজয়া পর্যায় আমাদের মনের কথা, প্রাণের কথা। শাক্তপদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি একাধারে ভক্তসাধক ও কবি। তিনি তাঁর নিজস্ব ঢঙে শাক্তপদ গাইতেন। রা

রামপ্রসাদী সুর বলে বাংলার ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধতা পেয়েছে। এছাড়াও অপর বিখ্যাত শাক্তপদকর্তা ছিলেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তিনিও বহু শাক্তপদ রচনা করেন।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে 'কীর্তন'-এর স্থান লেখ।

উ : বাংলার ইতিহাসে 'কীর্তন'-এর স্থান দেখা। বৈষ্ণবী লাউগিতা প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণ সুর, তালের মাধ্যমে প্রকাশ করাই কীর্তন। কীর্তন বলতে তাই ঈশ্বর বিষয়ক গানকে বোঝায়। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রচার করে যে গান, তাই কীর্তন। শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। তিনি কীর্তনকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করেন- ১. নামকীর্তন, ২. রসকীর্তন বা লীলাকীর্তন। নামকীর্তনে ঈশ্বরের নামগান ও করণার কথাই প্রধান। আর লীলাকীর্তনে তাঁর রূপ-গুণ ও বিচিত্র লীলার বর্ণনাই প্রধান হয়ে ওঠে। নামকীর্তন বা লীলাকীর্তন যাই হোক, একক গায়ক তখন, নিজস্ব সুরে, নিবিষ্ট চিত্তে উপযুক্ত খোলের সাথে, ধীরে ধীরে সুরের মায়া রেখে প্রকাশ করতে হয়। কখনো তা কীর্তন পদাবলি হবে না। কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ- কথা, দোহা, রূপ, তুক ও ছুট। কীর্তন গানের স্থায়ীকাল লঘুস্থায়ী, অল্পস্থায়ী, অল্পস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। ঘনশ্যামের যে সকল লীলাকীর্তনের ঢঙ রয়েছে তা নিয়ে কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে। তার বৈশিষ্ট্য বৃন্দাবন লীলা। রয়েছে পৌগণ্ডলীলা, রূপলীলা, নৌকালীলা, দানলীলা, মানলীলা, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন বা মাথুর ইত্যাদি। কীর্তনে মোট ৬৪টি রস আছে। এত অর্থে না জানলে গান করলে অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শ্রীগৌরাঙ্গ-চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে চৈতন্য-পরবর্তী পদাবলি রচয়িতাদের সকলেরই কীর্তনের প্রধান অবলম্বন।

প্র : বাংলা গানের ইতিহাসে কবিওয়ালাদের অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ।

উ : অষ্টাদশ শতকে যখন মঙ্গলকাব্যের ভাটাটানের সূত্রপাত হয় তখন বাংলা গানে কবিওয়ালাদের আবির্ভাব। এই কবিওয়ালাদের অধিকাংশই ছিলেন কবি। তাঁরা আখড়াইয়ে গান বাঁধতেন। শ্রীধর কথক (১৭১৭) সবচেয়ে প্রাচীন কবিওয়ালা। তিনি কবি বহুবল্লভ ছিলেন ১৮শ শতকের কবি ঠাকুরদাস। তাঁর আগে এবং পরে বহু কবিওয়ালা হয়েছেন। কবিগানের একটি স্বতন্ত্র ধারা আমরা এদের মধ্যে পাই। বাঙালির জীবনে বহুল ছিল। এই গানের বাংলার সুপ্রাচীনকাল, তাই কবিগানের উদ্ভব আর বিকাশের কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। বিশেষত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কারণের বিরাট পরিবর্তন এই পর্বে ঘটেছিল। কবিওয়ালাদের গানের কলকাতার বিদগ্ধ মহল করতেন কেননা খৃষ্টিতে আসলটা। তাঁরা আখড়াইকারে তাঁদের বর্ণনা করেছিলেন। পরবর্তে রসিকজন গুণি, মানবতাবাদ এবং বিভিন্ন সামাজিক দোষকে। তাঁরা আসরে উপস্থিত সুখে মুখে গান রচনা করতেন। বিপক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং যুক্ত বজায় রেখে 'লড়াই' ও চলিয়ে যেতেন, যাকে চলিত ভাষায় 'কবির লড়াই' বলা হয়। আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা এবং নিজের তথা নিজের দলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই গানের মূল উদ্দেশ্য ছিল। একদলে পক্ষদলের শ্রোতাদের ঢঙিয়ে অনুপ্রাসে কবিওয়ালারা গান বাঁধতেন। এই ধারার প্রাচীনতম কবি গোঁজলা গুঁই। তিনি 'আরড়াইয়ের সমসাময়িক। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ দাস। রঘুনাথের শিষ্যদের মধ্যে রাসু, নৃসিংহ ও হরু ঠাকুর কবিওয়ালা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। এই হরু ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন ভোলানাথরা। অপর শিষ্য রামপ্রসাদ ঠাকুর। তবে কবিওয়ালা হিসেবে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছেন এন্টনি ফিরিঙ্গি বা এন্টনি ফিরিঙ্গি।

প্র : টপ্পা, যাত্রাগান, পক্ষীর গান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উ : উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরির সঙ্গে টপ্পাও একটি নিশিষ্ট শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। 'টপ্পা' শব্দের অর্থ লম্ফ। এর গতি এবং তান উল্লম্ফনযুক্ত হওয়াতেই এইরূপ নামকরণ বলে অনেকে মনে করেন। টপ্পার দুটি স্তবক বা তুক—স্থায়ী ও অন্তরা। এর সঙ্গে দ্রুত খেয়ালের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। টপ্পায় ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, সিন্ধু, কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোঁয়া প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত করুণরসাত্মক প্রণয়সংগীত।

বাংলায় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে টপ্পার প্রচলন। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) বাংলা টপ্পার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত। তবে বাংলা টপ্পা সর্বতোভাবে পাঞ্জাবি টপ্পার অনুকরণ নয়। একে বাঙালির প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী বিন্যাস করা হয়েছে। এতে দ্রুত তানের পরিবর্তে আন্দোলনযুক্ত তান ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় টপ্পার আবেদন অত্যন্ত মধুর ও গভীর। উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংগীতজ্ঞ সুললিত, অপূর্ব টপ্পা রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে রাধামোহন সেন, কালিকা মির্জা, শ্রীধর কথক, দাশরথী রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আগমনী গান, শ্যামাসংগীত, ভক্তিরসাশ্রিত গানে টপ্পার বিশেষ প্রভাব পড়েছে।

যাত্রাগান : বাংলাদেশে 'যাত্রাগানে'র উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে। 'যাত্রা' শব্দের অর্থ নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা। বাংলা ভাষায় শব্দটির একটি বিশেষ যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়িয়েছে— উৎসব-অনুষ্ঠানে কোনো গ্রথিত কথাবস্তুর গীত-নৃত্য-সংলাপ সহযোগে অভিনয়। বিশেষ এক মণ্ডপে সমবেত হয়ে দেব-মাহাত্ম্যমূলক সংগীত, নৃত্য ও নাট্য। তখন থেকেই যাত্রার পালাগানকে 'যাত্রা' বা 'যাত্রাগান' বলা হয়। 'গীতগোবিন্দ' অনেকটা যাত্রাগানের আকারেই রচিত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও সেই যুগের কৃষ্ণযাত্রা পালা। এছাড়া চণ্ডীযাত্রা, মনসামঙ্গল, কংসবধ, যযাতি যজ্ঞ ইত্যাদি নিয়েও যাত্রাগান রচিত হয়েছে। 'কৃষ্ণযাত্রা' রচয়িতা হিসেবে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ে ও মধুসূদন কিন্নর যাত্রাগানের জগতে এখনও প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গানেও যাত্রাগানের প্রভাব দেখা যায়। যাত্রাগানের মধ্যে সুসাহিত্যের উপাদান ও অভিজাত সংগীতের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। সেই সময় সমাজে কৃষ্ণযাত্রা থেকে শুরু করে সবরকম যাত্রাগানই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। জনচিত্তে তা গ্রহণযোগ্যও হয়েছিল। বর্তমানে আর যাত্রাগানের প্রচলন নেই।

পক্ষীর গান : উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে রূপচাঁদ পক্ষীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সংগীত রচয়িতা রূপচাঁদ শাস্ত্ররসাত্মক সংগীত এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সংগীত সৃষ্টিতে সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত সমস্ত সংগীতই 'পক্ষী' বা 'খগরাজ' ভণিতাযুক্ত। তিনি 'পক্ষীর জাতিমালা' নামে শখের পাঁচালি দল তৈরি করেন। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে তিনি গান বাঁধতেন। আগমনী-বিজয় গান, বাউল গান, দেহতত্ত্বের গান, টপ্পা গান রচনাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গানে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর দলের সদস্যরা নানারকম পাখির স্বর অনুকরণ করে নিজ নিজ নামগ্রহণ করতেন। তাই তাঁর দলকে 'পক্ষীর দল' বলা হয়। রূপচাঁদ খুবই আমোদপ্রিয় ও রসিক পুরুষ ছিলেন। 'পক্ষী' উপাধিকারী বলে তাঁর গাড়িটি কতকটা খাঁচার আকারের ছিল। তিনি সেই গাড়ি চড়ে শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাড়িতে উপস্থিত হতেন। তিনি প্রচুর সংগীত রচনা করেছেন। গঙ্গার পোল, রেল, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গেও তিনি সংগীত রচনা করেছেন। বাগবাজারে শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রূপচাঁদ জীবিত ছিলেন।

সমসাময়িককালের এই দাবি বাংলা গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্র : বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উ : বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এক অবিস্মরণীয় নাম। রবীন্দ্র-সংগীত সময়ের সাথে সাথে সমসাময়িক হয়ে উঠেছে। নাগরিকসমাজের এই গানের সংস্পর্শে এসেছে চিরকালীন। বাংলার মানুষের আশা, সুখ, দুঃখ, প্রকৃতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্ব ঐক্যবোধ – সবকিছু নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন – তা রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গান। মৃত্যুপর্যন্ত জীবনের আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর গান। আর এই গান আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'। এছাড়া শ্রীলঙ্কার জাতীয় সংগীত মূলত রবীন্দ্রনাথের গানের সুরানুকরণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর গানের মোট সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বেশি। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অল্প কিছু গানে সুর দিয়েছিলেন। অনেকগুলোর সুর করেছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি নিজেও সুর সংযোজন করেছেন বেশ কিছু। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর গান সম্পর্কে বলেছেন– 'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনের সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ, আর সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত'। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন বাংলা গানের বিষয়বিন্যাসের প্রচলিত রীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে গিয়ে। নতুনত্ব এনেছেন শুধু বিষয়ে নয়, গানের গঠনেও। যা পুরোপুরি নতুন। গান সৃষ্টির সাথে সাথে তৈরি করেছিলেন একদল দীক্ষিত ছাত্রছাত্রী যাঁরা পরম্পরাবাহী হয়ে আজও তাঁর গানকে উজ্জীবিত রেখেছে প্রথম দিনের মতন। বাঙালি সমাজের গানের রবীন্দ্র চেতনা করে দিয়ে গেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিগত করেছিলেন, সাধারণ সংগীতের জন্য সুরসাগুলিকে বদ্ধ, সাধারণ মিলন থাকতে তবে নিজে সহজ সুরটি আমাদের। তবু তাঁর গান সবসময়ে। তাঁর গানের সাধারণ সংগীত গানের মতো 'গীতবিতান', 'গীতমালা', খুব কবিতের মতো। রৌদ্রিক সুর গাইতো আর তার অনেক বাণী দিতো। প্রথম, মানান, খেয়াল, ঠুমরির সাথে পাশ্চাত্যের সুরমালার গানে নিজের তাঁর গানে, আর আছে আমাদের লোকগীতি। সবচাইতে উপলব্ধি, কথা গানে বা কিছুতেই; সমস্বরবাদী সাদিনা এসেই অনায়াস। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা, এবং গীতিনাট্যগুলিতেও নতুন উদ্ভাবনের ধারা রয়েছে যা নিতান্তই তাৎপর্যবাহী। নাটক না সিনেমার গান হিসেবেও আজ রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা সার্বিক।

প্র : বাংলা গানের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উ : বাংলার এক ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটক এবং গানগুলি। যা আজও মহলাংশে প্রাসঙ্গিক ও জনপ্রিয়। সেই যুগে তাঁর রচিত নাটকগুলি সারা ভারতবর্ষেই প্রদর্শিত হতো। ইতিহাসভিত্তিক সেই সময়ে নাটকগুলির প্রয়োজনে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন প্রচুর গান। গান দেশিরভাগই ছিল দেশপ্রেমমূলক। তার সাথে রয়েছে বেশ কিছু প্রেম, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক ভাবনার গানও। তাঁর নাটকগুলির বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিল আদর্শবাদ এবং যুগের চাহিদা অনুসারী সঠিক উপস্থাপন। তাঁর গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি সেই সময়ের সুর ধরতে পেরেছিলেন। সেই সুর এনেছিলেন তাঁর গানে। 'সাজাহান' নাটকের 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' গানটি প্রায় জাতীয় সংগীত পর্যায়ের হয়ে উঠেছিল। 'প্রতাপসিংহ' নাটকের 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে',

আছে সৌন্দর্যবোধ, ঈশ্বরানুভূতি আর ব্যক্তি-হৃদয়ের আকুতি।

প্র : চারণকবি মুকুন্দ দাসের কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : বাংলা গানের চারণকবি মুকুন্দ দাস (১৮৭৮–১৯৩৪) ছিলেন অবিভক্ত বাংলার বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্য। ওঁর দিকে মুকুন্দ দাস যাত্রার গান লিখতেন। তা শুনে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হন। মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে দেশপ্রেমমূলক গান গেয়ে বড়াতেন, অভিনয় করতেন যাত্রাপালায়। ভবরঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত 'মাতৃপূজা' সংকলনে তাঁর একটি গান– 'ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা'। এ গানের জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেফতার হন এবং তাঁর তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় তিনি যাত্রাপালা ও গান দিয়ে দেশের মানুষকে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর 'মাতৃপূজা' নামক যাত্রাপালাটি ওই যুগে জনপ্রিয় হয় দেশের তরুণদের কাছে। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ– সাধনসংগীত, ব্রহ্মচারিণী, পল্লীসেবা, সাথী প্রভৃতি। বাংলা গানের এই ভিন্ন ধারার গীতিকার সারাজীবনে অজস্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছাপিয়ে তিনি বাঙালি সংগীত শ্রোতার কাছে আজও প্রিয় হয়ে আছেন তাঁর অপূর্ণ গানগুলির জন্য। মুকুন্দ দাস বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর সাধনসংগীতে আছে পদাবলি ও শ্যামাসংগীতের অপূর্ব সমন্বয়। তিনি সারাজীবন কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত হননি। নিয়মিত কীর্তনের আসরেও যোগ দিতেন। লিখতেন 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায়। বিদেশি বর্জন উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগুলি প্রতিবাদী মানুষের মনে ঢেউ তোলে। তাঁর গান আজও আধুনিক। বাংলা গানের ইতিহাসে তাঁর আসন চিরকাল উজ্জ্বল থাকবে।

প্র : বাংলা সংগীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা কর।

উ : একাধারে প্রেমিক কবি এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬)। রবীন্দ্রযুগে তিনি [illegible] সাহিত্যে থেকে গান [illegible] সুরারোপ করেছেন। [illegible] আকাশে 'অগ্নি-বীণা' হাতে [illegible] 'ধূমকেতুর' মতো তাঁর প্রকাশ। [illegible] রচিত গানগুলি তাঁর [illegible] 'নজরুলগীতি' নামে পরিচিত ছিল। নজরুল নিজেও এই অভিধা ভালোবাসতেন। এখন বাংলাদেশে সেগুলো 'নজরুল সংগীত' বলা হয়। [illegible] এই পরিবর্তনটি করেছেন তাদের জন্য এই প্রবাদই যথেষ্ট : 'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।' তাঁর কবিতা এবং গানগুলিতে তাঁর চিরবিদ্রোহী সত্তার দুঃখ ধোঁয়া পাই। অন্যদিকে, বহু গানে তাঁর রোমান্টিকতা, আবেগমুগ্ধতার আভাস আছে। তাঁর চিন্তায় আর প্রকাশভঙ্গিতে ছিল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ, এক বিদ্রোহের বাণী। তাঁর রচনাগুলি স্থবির সমাজের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধতা শুধু বিষয়ের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ছিল প্রকাশভঙ্গি এবং সুরের ক্ষেত্রেও। গানের ভাষাকে গতি আর দ্যুতি দেবার জন্য তিনি শব্দসৃজনের পরীক্ষানিরীক্ষাও করেছেন। তিনি অজস্র আরবি, পারসি, উর্দু শব্দ ব্যবহার করেছেন গানে। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায় ভিন্ন মেরুতে পৌঁছেছিলেন নজরুল। তাতে সবথেকে খুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। নজরুলকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন 'বসন্ত' নাটকটি। জীবনানন্দ দাশ নজরুল সম্পর্কে বলেছেন– 'বাংলার এ মাটি থেকে জেগে, এ মৃত্তিকাকে সত্যিই ভালোবেসে আমাদের দেশে ১৯ শতকের ইতিহাস প্রান্তিক শেষ নিঃসংশয়বাদী কবি নজরুল ইসলাম।' তাঁর 'কারার ঐ লৌহ কপাট' অথবা 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' গানগুলি ছিল সে সময়ের বিপ্লবীদের জীবনসংগীত, তিনি মূলত 'ভাঙার গান' গেয়েছেন। যে ভাঙনের পথেই আসবে নতুন দেশ, নতুন জাতি, নতুন এক সমাজব্যবস্থা।

প্র : সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

উ : বাংলা গানে নতুন আলোর পথযাত্রী খ্যাতনামা সুরকার ও গীতিকার সলিল চৌধুরী (১৯২২–১৯৯৫)। ভারতীয় সংগীতধারা সম্পূর্ণরূপ আত্মস্থ করে তাকে নিজের অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল উপস্থাপন করেন তিনি। ছয়-সাত দশকের বাংলা গান তাঁর নতুন নতুন সুর আর কথার জাদুতে আচ্ছন্ন ছিল। ১৯৪৪-এ তিনি যুক্ত হন গণনাট্য সংঘের সাথে। তাঁর গানে সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন আর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ করা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার উপলক্ষে তিনি রচনা করেছেন 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা'। ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহের সমর্থনে লিখেছেন– 'ঢেউ উঠছে, কারা টুটছ'। তাঁর রচিত 'আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমে। চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়– ওগো প্রিয় মোর, খোলো বাহুডোর। পৃথিবী তোমারে যে চায়' গানটির বক্তব্য অনুধাবন করলে তাঁর সমকালের চাহিদা সমাজতান্ত্রিক বোধের উজ্জীবন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক ইচ্ছার কথা বোঝা যায়। তিনি গানের সুরারোপ কথার সাথে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন গানের সুরকে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বেশকিছু কবিতায় সুরারোপ করে সেগুলিকে গান হিসেবে কালজয়ী করে দিয়েছেন সলিল চৌধুরী। হিন্দি আধুনিক গান, সিনেমার গান রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর সমকালীন সমস্ত খ্যাতনামা ভারতীয় সংগীতশিল্পীই তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান গেয়েছেন। বাংলা গানকে একক প্রচেষ্টাতেই তিনি নিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ নতুন পথে, যে পথ চির-আধুনিক।

প্র : লোকগান বলতে কী বোঝ? এর বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উ : প্রতিকূল প্রকৃতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আদিম যুগ থেকে মানুষ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। [illegible] লড়াই থেকে উদ্ভব [illegible] লোকসংগীত। [illegible] মানুষের [illegible] [illegible] সাংস্কৃতিক [illegible] আমরা বলতে পারি, [illegible] [illegible] পাশাপাশি আমোদ-প্রমোদ, উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। [illegible] অভিনয়, সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার। [illegible] লোকনৃত্য-লোকসংগীত-লোকবাদ্যের ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। [illegible] পারে, পল্লির সমাজজীবনে যে গান [illegible] ধরে মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচার লাভ করে, তা-ই লোকগান। যেমন– বাংলাদেশের ও পশ্চিমবঙ্গের লোকগানের যতগুলি ধারা আছে, সেগুলিকে আমরা মূলত চারটি অঞ্চলভেদে ভাগ করতে পারি। যেমন– ১. পূর্বাঞ্চল বা পূর্ববঙ্গ, ২. উত্তরাঞ্চল বা উত্তরবঙ্গ, ৩. পশ্চিমাঞ্চল বা মালভূমি অঞ্চল, ৪. দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণবঙ্গ। এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের মূল ধারাটি ভাটিয়ালি, তা ছাড়াও সারি, জারি, ধামাইল, বিয়ের গান, মুর্শিদি, মারফতি, পালাগান ইত্যাদি। তবে পূর্ববঙ্গের সব গানের মধ্যে মূলত ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য। উত্তরবঙ্গের প্রধান ধারাটি ভাওয়াইয়া। এছাড়াও এই অঞ্চলে আমরা পাই চটকা, ঝিকোল, দীঘলনাশা, জাগগান, মনসার গান, রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু আচার অনুষ্ঠানমূলক গান। পশ্চিমাঞ্চল বা মালভূমি অঞ্চলের গানের মূলধারাটি ঝুমুর। তা ছাড়াও ভাদু, টুসু, রাঢ়ের বাউল, কুর্মিগান, হাপু গান, ছড়া গান ইত্যাদির প্রচলন আছে। আর দক্ষিণবঙ্গের ধারাগুলির মধ্যে মূলধারাটি– বনবিবির গান। তাছাড়াও রয়েছে দক্ষিণরায়ের গান, দাণ্ডরায়ের গান, অষ্টক গান, দক্ষিণবঙ্গের ভাটিয়ালি গান ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগে মুরশিদাবাদ অঞ্চলে আলকাপ,

সোপান গানের চল আছে। অঞ্চলভেদে গোকগানগুলি পৃথক হলেও এগুলির মধ্যে এক সর্বজনীন আবেদন আছে। যেমন- কুষ্টিয়া, ভাওয়াইয়া, ঘাটু পৃথক অঞ্চলের গান হলেও এদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু প্রেম। ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক গান। বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া ভাওয়াইয়া গানের প্রকৃত অঞ্চল। এই গানগুলিতে ভাটির দেশের সংস্কৃতি, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র ও পারিবারিক ঘটনাবলির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবংশীরা এই গানের গায়ক ও বাহক। এই গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী আকবরউদ্দিন। গানের বিষয় মূলত প্রেম। নদী-নৌকা-মাঝিকেন্দ্রিক ভাটিয়ালি গান মূলত পূর্ববঙ্গের গান। এ গানের বিষয়বস্তু লৌকিক ও আধ্যাত্মিক প্রেম। এটি প্রধান মুসলমানি গান, তাই এর সুর ও গায়কি বিলম্বিত। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রায় নেই। সারি গানও মাঝিদের গান। তারা দাঁড় টানার সময় সারিগান গায়। প্রেমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এই গানের গতিপ্রবাহ বিচিত্রমুখী। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তভূড়ে ঝুমুর গানের চল। এটি মূলত প্রেমসংগীত। এর সুর সহজ-সরল। বাংলাদেশের লোকায়ত সম্প্রদায় বাউলরা তাদের গানের মাধ্যমে প্রচার করেছেন মানবতার বাণী। মানবাত্মাকে জানার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মাকে জানা, সেই পরম লীন হয়ে যাওয়া বা আধ্যাত্মিক প্রেমই বাউল গানের মূল উপজীব্য বিষয়। লালন সাঁই ছিলেন এ জাতীয় গানের প্রধান গীতিকার।

প্র : 'ভাটিয়ালি' গানের উৎস সম্পর্কে লেখ।

উ : 'ভাটিয়ালি' বাংলাদেশের ঐতিহ্যপূর্ণ নিজস্ব গান। গানের মূল বিষয় ব্যক্তিপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনা। সুর করুণ। এর মুখ্যভাব প্রেম। লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রেমে বিরহজনিত করুণ রস সঞ্চারিত হয়েছে। আবহমানকাল বাংলার মাঝি-মাল্লা-জেলেরা নদী-খাল-বিল-হাওর-গাঙের উদার প্রসারে এই গান একান্তে গেয়ে থাকে। তাদের মাঝারি মানের গলায় খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এই গান গাওয়া হয়। এই গানের বৈশিষ্ট্য হলো- সুরের লালিত্য। এই গানের তৈরিতে ঝুমুর-ভাটা-সুর-ছন্দ-ঢংকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাটির দেশে নদী-খাল-বিল-হাওর-গাঙের পরিবেশ মিলিয়ে এই গানের একটি নিজস্ব ছন্দ ও স্বতন্ত্র ঢঙ তৈরি হয়েছে। ফলে শ্রোতারা খুব সহজেই গানের সুরমাধুর্যতা ধরতে পারে, এই গানগুলি তাই প্রমাণ। সর্বশ্রেণির এই বাংলাদেশের মানুষ সহজে উপলব্ধি করে। গানের শ্রোতারা গানের মাধ্যমে মানসিক লৌকিক প্রেম, রাধাকৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ত্ব সবটাই এই গানে সহজভাবে মনের উপলব্ধি আসলে প্রকাশিত। দেহকে নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। মাঝির আসল মুর্শিদের গান বলে এর সুর ও লয় বিলম্বিত। ভাওয়াইয়ার মতো এতে দীর্ঘ টান আছে। আর তাকে কোনো ঝাঁক নেই। এর টানে সুর চড়া গলায় শুরু হয় আর অনেকক্ষণ পর শমে এসে শেষ হয়। ধীর, স্থির, শান্ত নদীর চলার সাথে এ গানের টান সুরের মিল আছে। এর সাথে একে মেলে দুপুর প্রহরে বিকেলের অলস ধীর মন্থরের নির্জনতা মাঝির একাকিত্ব আর নিগূঢ় বিস্তারী আকাশের মুক্ত উদারতা। তটির টানে নৌকা চলনে বিনা আয়াসে তা এগিয়ে চলে। এই সহজ অবলম্বনই ভাটিয়ালির গঠনগত উৎস। একটি ভাটিয়ালি গানের দুই পঙ্‌ক্তি- "এ ভর সাগর রে কেমনে দিব পাড়ি রে। / দিবানিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইসা।।" এই গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই। এই গানের উল্লেখযোগ্য শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, শচীনদেব বর্মণ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, নীনা হামিদ, অনর পাল প্রমুখ। এই গানের বেশিটাই সংগৃহীত। গীতিকারের নাম পাওয়া যায় না। নরসিংহ, ফরিদপুর, বৃহত্তর ঢাকা নদীর মাঝিমাল্লাদের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। নিচে কয়েকটি ভাটিয়ালি গানের প্রথম কলি উল্লেখ করা হলো :

১. কুমার পাকের নাইয়া, তুমি কইবারে
পার মোরে পেছে কত দূর:

২. ও মাঝি নাইয়া যাও রে অকুল
দরিয়ার মাঝে আমার ছাড়া যাও তে
মাঝি।

৩. সামাল সামাল সামাল ওরে সামাল
তরী সাইও / বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
কালো মেঘে গগন ছাইল;

৪. আমায় পার কর রে ওরে মাঝি ভাই
আখার টাতে কাদি কইয়া আমার
কেহ নাই;

৫. ও মাঝি ভাই তোমার নায়ে তুলে
নেও আমায় / আমি নিশ ভিখারি
পারি বড়ি যেতিছি হারাই।

প্র : ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উ : নরনারীর জীবনপ্রবাহ, প্রেম, বিরহ, ব্যাকুলতা, দৈহিক আবেগ, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা এবং জীবনসংগ্রাম- এসব নিয়েই ভাওয়াইয়া গান। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, আসামের গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি-এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নিজস্ব সংগীত ভাওয়াইয়া। এই অঞ্চলের রাজবংশী (বা কামরূপী) ভাষায় পরিবেশিত হয় এই গান। ভাওয়াইয়া গান কারও কাছে মন উদাস করা গান, কারও কাছে ভাবের গান, কেউ আবার এই গানকে বলেন, 'বাদুয়াহিত গান'। আসলে উদাস মনে উদাত্ত কণ্ঠে এই গান পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাবিত মানুষের প্রধানত প্রেমজীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ ঘটে এই গানে। মানবজীবনের নানা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই গানের বিষয়। এখানে রয়েছে তত্ত্বকথা, অর্থনৈতিক সমস্যা, জীবনের জটিলতা, শোষণ, দারিদ্র্য, মানবজীবন দর্শন, বাল্যবিবাহ, সতিনী প্রথা, হুদুমদেও নামক জাদু অনুষ্ঠান, সমাজের গিরিপ্রজা বাদহা, কাতি ও গাইটোল পূজা, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদি। এই গানের মুখ্য বিষয় নরনারীর প্রেম। নায়ক সাধু, মৈশাল বন্ধু, মাহুত বন্ধু, বৈদ্য, রাখাল বন্ধু প্রভৃতি ঠকের কথা এই গানে উঠে। একটি ভাওয়াইয়া গান : "ও কালা বন্ধুরে- কার মন্ত্রে গেছ তুমি ভুলিয়া / কালা বন্ধুরে- কার মন্ত্রে গেছ তুমি ভুলিয়া / তোমার মন মোর হাতের মুঠির মোর, তোমার- মানিয়ে চল কাটি হয় পুরুষ উসমানকালে আসর বিলাসে কথা মিলে চর। আরো, সমাজেই হয় ঘরে ঘরে, বিরহ-বিচ্ছেদে ভরে বসুধা। কবিয়ালের ভোগ এই গানে হয়েছিল। প্রতিবারে আসরেতে উঠায় ঝড় তুফান হয়ে উঠায় ভাওয়াইয়া গানে। কবিয়ালের মনের বাসনাটিকে উচ্চ করে এই গান মনুষ্যজীবন। এই গানের প্রতিভাবান শিল্পী অকবরউদ্দিন। এছাড়াও এই গানের অন্যতম সফল সুরকারদের কথা বলা যায়। বিভিন্ন কয়েকটি ভাওয়াইয়া গানের প্রথম কলি উল্লেখ করা হলো :

১. ও কি পরিরাম, তাই কত রব আমি
পাছের দিকে চাইয়ারে;

২. ওকি একবার অভিনয় যেমন চন্দ্র
মের মাও দেখিয়া;

৩. বন্ধিকুমনী বাহন মানস ঘুরিয়া
ঘুরিয়া মরে / ওরে ঐ মনে মোর
গড়িবর চালা পাছে;

৪. ফাল্গুন পড়িল্য বন্ধু কাহে যে।

প্র : টপ্পা গানের বিশিষ্টতা আলোচনা কর।

উ : উত্তরবঙ্গের সর্বক্ষেত্রে জনপ্রিয় লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার সঙ্গে সঙ্গে টপ্পার কথা উচ্চারিত হলেও আবেদনের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির নিজস্ব সংগীত ভাওয়াইয়াতে প্রেমের অনুভূতি, গভীরতা, ব্যঞ্জনা, বিরহ-কাতরতা ও নারীমনের গোপনতাকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভাওয়াইয়ার সুর তাই মর্মস্পর্শী ও বেদনাবিধুর।

অন্যদিকে, টপ্পা হল লঘু সুরে বিলম্বিত এক প্রকার চটুল ভাবের গান। মাহফিল, মনোরঞ্জক, চটকদার বিষয় নিয়ে লেখা টপ্পা গানে সুখৈবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়।

[illegible] ঘটনা ও প্রণয়কে বিষয় করে এই গান রচিত। ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের শিল্পী আব্বাসউদ্দীন তাঁর লেখায় ভাওয়াইয়া ও চটকা গানের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এইভাবে- 'ভাওয়াইয়া ঢিমা সুরের গান, দিরঘল গলা ছেড়ে ছেড়ে গায় গানের সময়, সুরের বৈচিত্র্যও বেশি। রচনার দিক থেকে এ গান বিরহমূলক, উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি যথাযথভাবে ধরা পড়ে এ গানে, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, [illegible] পাহাড়ের ধারে যেন এ গানের সুরে রূপ পায়। চটকা চটুল দ্রুত তালের গান।' ভাওয়াইয়া আর চটকার মধ্যে মানবিক প্রেমভাব প্রকাশে, সুরবিন্যাসে, বাক্যবন্ধ রচনায় কিংবা উচ্চারণ ভঙ্গি এবং গানের রীতির ক্ষেত্রে মিল লক্ষ করা যায়। ভাওয়াইয়ায় যেখানে বিরহজনিত বেদনা ও হতাশা, চটকায় সেক্ষেত্রে মিলনাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রেমের আর্তি ও আকুলতা প্রকাশ পায়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক : এই গান রংপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে তৎকালীন ডিসি স্যার জর্জ গিয়ারসন সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে নববিবাহিতা স্ত্রী মারা যাবার পর যুবক স্বামী তার দিদিমা বা নানিকে রংপুর ও কোচবিহারের কথ্যভাষায় বলছে : 'আবো নাও দারীটা মরিয়া মুরছে / হইছে হানি আনার ঘরত পড়ি থাকুম/ পড়ে চোখের পানি।'

প্র : বাংলা সারিগানের পরিচয় দাও।

উ : সারিগান সংগ্রামপ্রবৃত্তিজাত যৌথিক আবেগ প্রকাশক কর্মসংগীত। নৌকার মাঝি- যারা বৈঠা টানে আর নৌকা চালায়, তারাই এই গানের ধারক-বাহক। এই গানের মূল উদ্দেশ্য- একঘেয়ে কাজের ভার কিছুটা লাঘব করা আর মনের আনন্দ প্রকাশ। এ জাতীয় গানে জেলেরাই গায়ক। কাজের ছন্দে ছন্দে তারাই সমস্বরে কণ্ঠে এ গান গায়। জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এ গানের ধারা আজও বহমান। যুগে যুগে এ গান রচিত হয়েছে। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে অধিকাংশ সারিগান নৌকা বাইচের সমারোহে সম্পৃক্ত হয়েছে। [illegible] গানের [illegible] গান আর গান [illegible] মাধ্যমে [illegible] প্রমথনাথ [illegible] চৌধুরী [illegible] প্রসঙ্গে [illegible] ভাওয়াইয়া, এককথা, [illegible] পটচিত্র [illegible] প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ আর নজরুল দুই দিক থেকেই সারিগানের সুরে গান সৃষ্টি করেছেন। এ গানে ভাবের গভীরতা নেই, আছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। বিভিন্ন উৎস থেকে বিষয় সংগ্রহ করে সারিগান রচনা করা হয়। যেমন- ১. পৌরাণিক : রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, ২. ঐতিহাসিক : নিমাইসন্ন্যাস প্রসঙ্গ, ৩. লৌকিক : লৌকিক প্রেম ও জীবন, ৪. আধ্যাত্মিক : দেহতত্ত্ব ও মরমীয়াবাদ, এবং ৫. ব্যঙ্গকৌতুক : আক্রমণ ও রসিকতা। তবে এই গানে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ জাগতিক ও মানসিক আবেদ-আকাঙ্ক্ষার রূপক হিসেবেই ব্যবহৃত। সে দিক থেকে এ গান সম্পূর্ণ ইহজাগতিক। সারিগান তালপ্রধান। প্রধানত দাদরা ও কাহারবা-এই দুটি তালে গাওয়া যায়। বদরপিরের নামে রচিত সারিগান আছে। একটি সারিগানের দুই পঙ্‌ক্তি-"এমন রঙের নাও বানাইয়াছে কে, মন-মাঝি রে, রঙমহল দেখাইয়া দে মোরে।।" নিচে কয়েকটি সারিগানের উদাহরণ দেয়া হলো:

১. যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরানি / আমি কালিদহে যাবো আমি কালিদহে যাবো;
২. সাজায়া চলে গো সখি যমুনার জলে বংশীধারী আছে না কদম তলে;
৩. জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে গাঙ্গে নয়া পানি গো আইলিনা যমুনার জলে।

প্র : ঝুমুর গান সম্পর্কে লেখ।

উ : লোকগানের সব থেকে আকর্ষণীয় দিক তার স্বতঃস্ফূর্ততা আর অকৃত্রিম সুর। বিশেষ করে ঝুমুর গানে এই সুরের মূর্ছনা এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বিহার, [illegible] ঝুমুর [illegible] লোকসংগীতের [illegible] এ গানের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। কুর্মী, ওরাওঁ, সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, হো, বাউরি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি আদিবাসীদের সমাজে ঝুমুর গানের প্রচলন। তারা এ গান মাদল, ধামসা, বাঁশি, ঘুঙুর, খোল, ঢোলক, সহযোগে গায়। ঝুমুরের সুরের সাথে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ একদম মিশে যায়। লালমাটি, পাথর, ঢেউখেলানো জমি, কাঁকর, শাল, কুসুম, শিমুল, মহুয়া আর পলাশ। আর রয়েছে টিলা, পাহাড়ি নদীর বাঁক। প্রাথমিকভাবে ঝুমুরকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- ১. লৌকিক ও ২. দরবারি। প্রয়োগগত দিক থেকে ঝুমুর ছয় রকম- ১. নাচনি নাচের ঝুমুর, ২. টাড় ঝুমুর, ৩. ছৌ নাচের ঝুমুর, ৪. খেমটা নাচের ঝুমুর, ৫. করম নাচের ঝুমুর, ৬. পাতা নাচের ঝুমুর। গানে অধ্যাত্মচেতনা যেমন আছে, তেমনি আছে সামাজিক রীতিনীতি, জীবনযাপন চিত্র, অভাব, লড়াইয়ের আহ্বান, পুরাণ, রাজনীতি, ইতিহাস, আর সব ছাপিয়ে প্রেম। সে প্রেম লৌকিক এবং তাতে দেহেরই প্রাধান্য। ষোড়শ শতকে প্রাচীন সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ 'সংগীত দামোদর'-এ ঝুমুর এবং সংক্রান্ত প্রসঙ্গে শৃঙ্গার রসের আধিক্যের কথাই বলা হয়েছে। একটি ঝুমুর গান দেখি- 'চোখে চোখে ইশারাতে আর মনের কথা বলি তোমাকে, / রসিক যে জন বুঝবে সে জন আমার মনের বেদনা। / ও হামার যৌবন-জ্বালা বড়ো জ্বালা দেঁধু দিয়েছে মদনা।।' উল্লেখযোগ্য ঝুমুর পদকর্তা জগৎ কবিরাজ, গদাধর চৌধুরী,

[illegible]

[illegible] সাধক ও সংগীত হিসেবে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। বাউলরা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, তাঁরা [illegible] সম্প্রদায়ও। তবে তাঁদের [illegible] নামে যান। [illegible] 'উপাসক সম্প্রদায়' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা [illegible] করেন, [illegible] অবশ্য তাঁরা [illegible] করেন। [illegible] হন। তাঁদের [illegible] কিন্তু তাঁরা আত্মভোলা, বিবাগী, ঘরছাড়া এবং বৈরাগ্যপন্থী। তাঁরা গান গেয়ে 'মনের মানুষে'র সন্ধান করেন। এই মনের মানুষই মাত্র। গৃহহীন বাউল ভিক্ষাবৃত্তি, গৃহী বাউল জাত পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। বাউলরা ভাবের পাগল। তাঁদের প্রেমভাবই মুখ্য। বাউলদের পাগল, ক্ষ্যাপা বা গোঁসাই বলা হয়। বাউলদের মধ্যে লালন সাঁই সর্বাগ্রগণ্য। তিনি প্রতিভাবান কবি। দু-

আওয়াই হালার গান রচনা করেন। ওস্তাদজনের তাঁর গানে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ এক মরমিয়া সাধক। তাঁর গানে পাই- 'সব লোকে কয় লালন বলী জাত সংসারে, লালন কয় জাতের কীরূপ দেখলাম না এই নজরে।' তাঁর একটি বিখ্যাত গান- 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায় / ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তাহার পায়।'

প্র : জারিগান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উ : মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শোকাবিহ্বল মহরম মাসেই জারিগানের ব্যবস্থা হতো- এতে মানসিকভাবেও শ্রোতা-দর্শক-মন প্রস্তুত থাকতো। উনুক্ত বৃক্ষ বা শামিয়ানার নিচে হওয়া জারিগানে সাধারণত দুইটি দল থাকতো। একদল পরিচালনা করে মনসুর গাইত। প্রধান জারিয়ালের পায়ে নূপুর, হাতে লাঠি, কখনও গলে হাত দিয়ে (বাজনা বন্ধ) গান ধরত- তখনও মাঝে বসা বয়াতির চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে বাজনা বাজাত দোহারগণ- বয়াতি গানের মাঝখানে নানা প্রশ্নবাণ ছুড়ে জারিয়ালা দলের শোকের মহরম মাসে এই জারিগান শুনে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত। [illegible] নিজের তৈরি এবং অপর উল্লেখিত দুটি বলে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারিত এই গান লোকমুখে বাংলা এবং লোকসমাজের অত্যন্ত কাছের সম্পদ। অসংখ্য জারিগান [illegible] করা যায়। মহরম মাস ছাড়া অন্যান্য সময়েও, বিশেষতই বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি নিয়ে জারিগানের অনেক গান তৈরি করে গেয়ে শোনা যায়। লালন ফকিরের জারিগানে [illegible] ফকিরি নিয়ে জারিগানের অনেক গান রচনা করেছেন। তাঁর গানে [illegible] এবং [illegible] জারিগানে [illegible] জারিগানের [illegible] জারিগানের [illegible]

প্র : বাংলার মুসলমান সমাজের [illegible] উল্লেখযোগ্য ও বহুলচর্চিত গান [illegible] জারিগান। শিল্প সম্পদমানের [illegible] মহরমপর পালনকে [illegible] কারণ: মহরমের চাঁদ দেখার সাথে সাথে জারিগানের সঙ্গে শুরু হয় জারিগান, চলে প্রায় দশদিন। সাধারণত এক-একটি দল ১২-২০ জন নিয়োগ ও বাজনা এই সমস্ত অংশ নেয়। দলের প্রধান গিদি, তিনি গান করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন যে, গায়কের সঙ্গীতশিল্পের দুটি, ওস্তাদ, বয়াতি, জোয়ারি- ইত্যাদি নাম [illegible] হয়ে থাকে। গানে ও নাচে অংশ গ্রহণকারীদের 'পাইল', 'দোহার' বলা হয়। সাধারণত প্রতিটি দলের [illegible] দুটি, শর্ত বা দোহি, হাতে ও মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাঁদির জারিয়ালা [illegible] কেউ কেউ পায়ে ঘুঙুর বাঁধে। কোমরে বয়াতি চারি নলের চামড়ার তৈরি [illegible] ব্যবহার করে, দোহারা হাতবেলি [illegible] মুর্শিদাবাদে 'ধরসি' বলে। বয়াতির [illegible] হয়ে থাকে। জারিগান বৃত্তাকার [illegible] থাকে। মূল গায়েন [illegible] বয়াতির [illegible] জারিয়ালের দল [illegible] দোহারগণ [illegible] গাওন শেষে তারে সমস্বরে [illegible] দোহারগণের মুখিয়ে [illegible] জারিগানের মূল কথা। উপরে [illegible] নিম্ন তুলির [illegible] কারবালায় [illegible] দান অবলম্বে [illegible] খাকে।

প্র : বাংলা মঙ্গলকাব্যের গ্রন্থের পরিচয় দাও।

উ : বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি [illegible] মধ্যেই 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর [illegible] কারণ এটি [illegible] দেবীর [illegible] নাম [illegible]

শিরোনাম গীতিকা' তো দূরের গীতিকাগুলো- সবে মা কাকা আকারে আমাদের কাছে পরিচিত পায়। কিন্তু পল্লীকবিদের মধ্যে এদের আধুনিককালে যে আকর্ষণ পায়ে সে-বিষয়ে এখনকার বলতে হয় 'গানের বই'-এর প্রথম। ১৮৩১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশ করেছিলেন শিক্ষদের জন্য এই 'গানের বই'। পরবর্তী সেই ধারা; তারপর খ্রিষ্টীয় গীতসংকলনগুলির সাহিত্যমূল্য কিছু না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা আছে। খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবমুক্তে সংকলনগুলিতে দেখা যেতে থাকল, তেমনি সাধারণভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের নানা মতের ও পথের সংকেতও দেখা গেল গীত-সংকলনে। বৈষ্ণবগান, শাক্তগান, ব্রহ্মসংগীতের বেশ কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। তখন ব্রহ্মসংগীতের সবচেয়ে বড় সংকলন ছিল বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সংকলিত ৩ খণ্ডে 'সঙ্গীত মুক্তাবলী'। ক্ষেত্রমোহন সেন একটি বইয়ের উল্লেখ করেছেন। বইটির নাম 'পিরের গান'। লেখক ও প্রকাশকাল অনুল্লেখিত। মুসলিম সম্প্রদায়ের গানের আর কোনো সংকলন বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় নি। নিধুবাবুর গানের এক সংকলনগ্রন্থ বেরিয়েছিল ১৮৩৭ সালে জয়গোপাল তাঁতির সম্পাদনায়। বইয়ের নাম 'গীতরত্ন'। ব্রহ্মানন্দ ব্যাসদেব রচনার ৩ খণ্ডে সর্বাপেক্ষা সঙ্গীত সংকলন 'সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম' (১৮৪৬) প্রকাশ করেছিলেন। আদর্শ সঙ্গীত সংকলনের সব বৈশিষ্ট্যের দাবিই পালন করেছিল বইটি। ১৮৬৩-তে বাংলার তিন অধিবাসী বাংলার তাঁদের গান নিয়ে বঙ্গবাসী মত প্রকাশ করেছিলেন 'সঙ্গীত সুধাকর'। বিহারী তাঁদের রচনা সংকলন করেছিলেন ক্ষেত্রমোহন সেন নাম ১৮৬৯-এ। বইটির নাম 'সঙ্গীত তরঙ্গ'। ১৮৭৩ সালে বের হলো বাংলা ভাষায় প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সঙ্গীত চিত্রলেখা'। সম্পাদনা করলেন উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্রনাথ বসু। তবে সবচেয়ে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন নবেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)। বন্ধুর পরিচয়ের সূত্রে নবেন্দ্রনাথ বৈষ্ণবগায়ক কালীপ্রসন্নের সঙ্গে যুগ্মভাবে সংকলন করলেন ৪৭১ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'। প্রকাশকাল ১৮৮৭-র নভেম্বর মাস। দেড় টাকা দামের ঐ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হলো মাত্র চার মাস যেতে না যেতে। পৃষ্ঠা বেড়ে হলো ৫৮৬। দাম আড়াই টাকা। তবুও ১১০০ কপি চার মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত। ঐ বছর জুলাই মাসে এর সংকেত ছাপতে হলো। দাম কমল দেড় টাকায়। এরপর তো দামের বইয়ের আর শেষ নেই। একটি দামের বইয়ের সোনেরই হিসেব জমল। 'গীতাবলি' তার নাম; লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

5/15 21:28

বাংলা একাডেমি ও একুশে বইমেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলি

'Academy' একটি বিদেশি শব্দ। তাই একাডেমি বানানে ই-কার হবে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে পাসকৃত বাংলা একাডেমি আইনে একাডেমি বানান ই-কার (ি) গৃহীত হয়েছে। আগে 'বাংলা একাডেমী'– এই বানান লেখা হতো।

প্র : বাংলা একাডেমিকে কী বলা হয়?
উ : জাতির মননের প্রতীক।
প্র : বাংলা একাডেমি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ : ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর।
প্র : কোথায় একাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়?
উ : ঢাকার রমনায় বর্ধমান হাউজের সামনে।
প্র : বর্তমানে বাংলা একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
উ : ঢাকার ৩, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ।
প্র : বর্ধমান হাউজ কী?
উ : বর্ধমানের তৎকালীন রাজা কর্তৃক নির্মিত বাড়ি। বর্তমানে এটা বাংলা একাডেমির কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
প্র : বাংলা একাডেমির 'উদ্বোধন-ভাষণ' কে পাঠ করেন?
উ : পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার।
প্র : কত তারিখে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা একাডেমির 'প্রিপারেটরি কমিটি' গঠন করে আদেশ জারি করেন?
উ : ১৯৫৫ সালের ২৬শে নবেম্বর।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রধানকে প্রথমে কী বলা হতো?
উ : স্পেশাল অফিসার বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।
প্র : কে প্রথম স্পেশাল অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন?
উ : মুহম্মদ বরকতউল্লাহ।
প্র : পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে 'দি বেঙ্গলি একাডেমি অ্যাক্ট' কত সালে গৃহীত হয়?
উ : ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল।
প্র : কত তারিখ থেকে উক্ত অ্যাক্টের আইন বলবৎ হয়?
উ : ১৯৫৭ সালের ১০ই অগস্ট থেকে।
প্র : কত তারিখে কাউন্সিলের প্রথম নির্বাহী অনুষ্ঠিত হয়?
উ : ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ।
প্র : বাংলা একাডেমি কয়টি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু করে?
উ : ৪টি।
প্র : বিভাগগুলো কী কী?
উ : গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংকলন বিভাগ, প্রকাশনা বিভাগ।
প্র : বাংলা একাডেমিতে সভাপতি পদ সৃষ্টি হয় কখন ও কীভাবে?
উ : ১৯৬০ সালের ২৬শে জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর 'দি বেঙ্গলি একাডেমি (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স' জাতীয় মাধ্যমে।
প্র : বাংলা একাডেমির সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় করা হয়, কবে?
উ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড; ১৯৭২ সালে।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রধান নির্বাহী হিসেবে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয় কবে, প্রথম মহাপরিচালক কে?
উ : ১৯৭২ সালে; প্রফেসর মাহবুবুল ইসলাম।
প্র : বাংলা একাডেমি বর্তমানে কয়টি বিভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করছে?
উ : ৪টি বিভাগ এবং গ্রন্থাগার একটি পৃথক বিভাগের মর্যাদায়।
প্র : বিভাগ ৪টি কী?
উ : গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ; পাঠ্যপুস্তক বিভাগ; প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ।
প্র : বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি কে?
উ : মওলানা আকরম খাঁ; ১৯৬১ সাল।
প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : জামিল চৌধুরী।

প্র : বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : মনজুরুল রহমান।
প্র : বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যকোষের সম্পাদক কে?
উ : সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম।
প্র : বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদক কে?
উ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অন্যান্য।
প্র : ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক বাংলা একাডেমিতে একটি অভিধান সম্পাদনা করেছেন। তার নাম কী?
উ : বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান।
প্র : বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি কে সম্পাদনা করেন?
উ : আবদুল কাদির।
প্র : বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান-এর সম্পাদক কে?
উ : আহমদ শরীফ।
প্র : বাংলা একাডেমি থেকে কয়টি সাময়িকী ও পত্রিকা বের হয়?
উ : ৬টি
প্র : 'উত্তরাধিকার' কী ধরনের সাময়িকী?
উ : সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক। ২০০৯ থেকে মাসিক হিসেবে প্রকাশ পায়।
প্র : 'বাংলা একাডেমি পত্রিকা' কোন ধরনের?
উ : গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক।
প্র : 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা' কোন ধরনের?
উ : 'বিজ্ঞান গবেষণামূলক ষান্মাসিক'।
প্র : 'The Bangla Academy Journal' কোন ধরনের?
উ : ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক ষাণ্মাসিক পত্রিকা।
প্র : 'ধানশালিকের দেশ' কোন ধরনের পত্রিকা?
উ : ত্রৈমাসিক কিশোর সাহিত্য পত্রিকা।
প্র : বাংলা একাডেমির মাসিক পত্রিকার নাম কী?
উ : 'লেখা'।
প্র : কবে বাংলা একাডেমি চত্বরে নজরুল মঞ্চ উদ্বোধন করা হয়?
উ : ২০০৩ সালের ২৫শে জুন।
প্র : বাংলা একাডেমিতে নজরুল স্মৃতিকক্ষ কোথায়?
উ : কাজী নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসে বর্ধমান হাউজে বাসিন্দা রাজিয়াপন করেন। বর্ধমান হাউজের একটি কক্ষকে 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
প্র : বাংলা একাডেমি কোন কোন বাঙালি সাহিত্যিক স্মরণে অনুষ্ঠান করে থাকে?
উ : 'বাংলা একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠানমালা' পূর্ব নির্ধারিত। এই প্রতিষ্ঠান বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, জসীম উদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মরণে বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তবে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার অনুষ্ঠানে যে আলোচনা হয়, সেখানে অন্যদের নিয়েও আলোচনার সুযোগ থাকে।
প্র : ১৯৯১ থেকে ২০০০ পর্যন্ত এক দশকের বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম লেখ।
উ : ১৯৯১ : বিপ্রদাস বড়ুয়া ও হাবীবুল্লাহ সিরাজী
১৯৯২ : ইমদাদুল হক মিলন ও মুনতাসীর মামুন
১৯৯৩ : বশীর আল্‌হেলাল ও খালেদা এদিব চৌধুরী
১৯৯৪ : ওয়াকিল আহমদ ও সিকদার আমিনুল হক
১৯৯৫ : সৈয়দ আবুল মকসুদ ও শাহরিয়ার কবির
১৯৯৬ : মঈনুল আহসান সাবের ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
১৯৯৭ : কেউ পুরস্কার পান নি
১৯৯৮ : সন্‌জীদা খাতুন ও মঞ্জু সরকার
১৯৯৯ : নাসরীন জাহান
২০০০ : কেউ পুরস্কার পান নি।

দ্রষ্টব্য : এই দশ বছর কাউকে বিষয়ভিত্তিক পুরস্কার না দিয়ে 'সামগ্রিক অবদানের জন্য' পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্র : বাংলা একাডেমির বই মেলার প্রবর্তক কে?
উ : চিত্তরঞ্জন সাহা।
প্র : চিত্তরঞ্জন সাহা কে এবং কিভাবে তিনি এতো বড় মেলার প্রবর্তক হলেন?
উ : চিত্তরঞ্জন সাহা ছিলেন গ্রন্থপ্রকাশক, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক। ১৯২৭ সালের পহেলা জানুয়ারি তিনি নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কৈলাশচন্দ্র সাহা ছিলেন কাপড় ব্যবসায়ী। চিত্তরঞ্জন চৌমুহনী কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর পিতার লাভজনক কাপড়ের ব্যবসা না করে পুস্তক ব্যবসা আরম্ভ করেন। নিজে লেখাপড়া করার সময় বইয়ের অভাব বোধ করেন বলে পাকিস্তানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নোটবই ছাপা ও বিক্রির জন্য চৌমুহনীতে 'পুঁথিঘর' নামে বইয়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ঢাকায় এসে ব্যবসা আরম্ভ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর গ্রামের বাড়ি ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানপন্থীরা পুড়িয়ে দিলে তিনি কলকাতায় আশ্রয় নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতায় তিনি সূচনা করেন প্রবাসী বাঙালি লেখকদের লেখা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ। শওকত ওসমান, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সত্যেন সেন প্রমুখ বাংলাদেশি লেখকদের লেখা প্রকাশ করতে গিয়ে ১৯৭১ সালেই 'মুক্তধারা' নামে একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি। তাই 'মুক্তধারা'ই বাংলাদেশের প্রথম সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান। সেই যুদ্ধকালেও 'মুক্তধারা' থেকে বত্রিশটি বই তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হন, যা মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমি একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই সংবাদ পেয়ে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে মাদুর পেতে চিত্তরঞ্জন সাহা বসে

যান সেই বইমেলা। [illegible] বিকট হয়। 'এবার বই মেলা ৭ [illegible] জমছে ভালো। [illegible] প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি [illegible] সাহা বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে [illegible] ১৯৭২ সালে 'মুক্তধারার পক্ষ [illegible] কিতাবস্তান', 'বাস প্রকাশ', 'প্রকাশ [illegible] নিয়ে বসে। সেবারেই বাংলা একাডেমি [illegible] বই ব্যবসায়ীরা ১৯৭৮ সাল থেকে নিজেরাই যে যার মতো বই [illegible] একাডেমি চত্বরে বসতে শুরু [illegible] সুবিধা বিধান করার জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বই [illegible] একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মনজুরে মওলার সময় এই বইমেলার আনুষ্ঠানিক নাম প্রদান করা হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। ১৯৮৪ সাল থেকে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে আরম্ভ হয় আশপাশের বইমেলা।

প্র : চিত্তরঞ্জন সাহা আর কী করেন?
উ : তিনি শুধু পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ছিলেন না, ছিলেন আদায়ে বিকায় নীরব কর্মী। লেখকদের জন্য 'মুক্তধারা পুরস্কার', 'একুশে সাহিত্য পুরস্কার' তিনি প্রদান করতেন। 'বইয়ের খবর' ও 'সাহিত্যপত্র' নামে দুটো পত্রিকা প্রকাশ করেও তিনি লেখকদের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রনির্মাণ করেন। তাঁর স্ত্রী বিজলীবালা সাহা ছিলেন 'সাহিত্যপত্র'-এর সম্পাদক।

প্র : তাঁর কর্মের স্বীকৃতি কিভাবে মিলেছে?
উ : অনেক পুরস্কার ও পদক তিনি লাভ করেন। ২০০৫ সালে পান রাষ্ট্রীয় একুশে পদক।

প্র : কবে চিত্তরঞ্জন সাহা মৃত্যুবরণ করেন?
উ : ২০০৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর নিঃসন্তান চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষাশহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি : ১৯৫২

প্র : কোন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা?
উ : বাংলাদেশ।
প্র : কত খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ভাগ হয় ও পাকিস্তানের জন্ম হয়?
উ : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে।
প্র : সর্বপ্রথম মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে কোথায় ও কবে আন্দোলন হয়?
উ : এক সময়ের পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে, ১৯৫২ সালে।
প্র : কি নিয়ে পাকিস্তানে ভাষা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল?
উ : করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত হয় একমাত্র উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা- এ নিয়েই ভাষা সমস্যাটি দানা বাঁধে।
প্র : পাকিস্তানের ভাষা সংগ্রাম কেন শুরু হয়েছিল?
উ : মোট জনসংখ্যার অধিক সংখ্যক লোকই বাঙালি অথচ পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে উৎখাত করে উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।
প্র : রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।
প্র : কোন দিনটি বিশ্বমাতৃভাষা (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা) দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়?
উ : ২১শে ফেব্রুয়ারি।
প্র : মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে প্রথম কবে, কোথায় মানুষ শহিদ হন?
উ : ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি, প্রথম ঢাকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় মানুষ শহিদ হন।
প্র : মাতৃভাষা বাংলার জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি কতজন শহিদ হন, তাদের নাম কী?
উ : [illegible] (১) রফিক উদ্দিন আহমদ (২) আবদুল জব্বার (৩) শফিউর রহমান (৪) আবদুস সালাম (৫) অহিউল্লাহ (৬) আবুল বরকত (৭) শফিউর রহমান। তাদের মধ্যে প্রথম শহিদ হিসেবে শিউলিবাড়ি, তাদের নাম জানা যায় নি।
প্র : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে - কত বছরের কত ছাত্রের মৃত্যু?
উ : ১৯৫২ বছরের ৭ ছাত্র।
প্র : বাংলাদেশের কোথায় এবং কবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তথা বিজ্ঞানের স্তম্ভ স্থাপন করা হয়?
উ : ঢাকার শেরে বাংলার নিকা মহাসড়কে মিরপুরে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ, বুদ্ধিজীবীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তথা বিজ্ঞানের স্তম্ভ স্থাপন করা হয়।
প্র : কে এই বিজ্ঞানের স্তম্ভ করেন?
উ : অধিকাংশের সর্বসম্মতিক্রমে বরকত অনন্য।
প্র : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলতে পারি।' গানটির কথা ও সুরকার কে?
উ : গানটি লেখেন আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী। গানটির সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
প্র : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি।- (ক) গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী কে? (খ) কোথায় প্রথম গানটি গাওয়া হয়?
উ : (ক) গানটির প্রথম সুরকার ও শিল্পী আবদুল লতিফ (খ) ঢাকা কলেজের মধুর ক্যান্টিনের অভিষেক অনুষ্ঠানে গানটি প্রথম গাওয়া হয়।

মহান ভাষা আন্দোলনে [illegible] ভূমিকা রাখার জন্য আবদুল জব্বারকে বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করেন।

প্র: শহিদ শফিউরের পরিচয় দাও।

উ: শফিউর রহমান (জন্ম: জানুয়ারি ২৪, ১৯১৮ – মৃত্যু: ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫২) মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ। শফিউর রহমান বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট। কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ হতে আই.কম. পাস করে শফিউর রহমান চব্বিশ পরগনা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে কলকাতার তমিজউদ্দিনের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। দেশ বিভাগের পর পিতার সঙ্গে ঢাকায় এসে ঢাকা হাইকোর্টে হিসাব রক্ষণ শাখায় কেরানি পদে যোগ দেন। ১৯৫২-র ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটার দিকে ঢাকার রঘুনাথ দাস লেনের বাসা থেকে সাইকেলে চড়ে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হন শফিউর। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নওয়াবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্বদিনের পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলি শফিউর রহমানের পিঠে এসে লাগে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায় ঐদিন সন্ধ্যা সাতটায় মৃত্যুবরণ করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ২২শে ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর কবরের পাশেই রয়েছে পূর্বদিনের শহিদ আবুল বরকতের কবর। ২০০৫ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শফিউর রহমানকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

প্র: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কী?

উ: বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা [illegible] আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। [illegible] আন্দোলনের সময় [illegible] ছিল বর্তমান মেডিকেল কলেজে। তার সামনের আমতলাই ছিল [illegible] সমস্ত [illegible] আন্দোলন ও সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনের ঐতিহাসিক ১৪৪ ধারা ভাঙার স্মারক গেটটি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের উজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে আছে। ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। বাঙালির মুখের ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩১শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক ঘোষিত ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস ঘোষিত হলে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নুরুল আমিন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' সর্বদলীয় [illegible] সহযোগী হিসেবে কাজ করে [illegible]। [illegible] ১৪৪ ধারা [illegible] করা হয়। [illegible] ১৪৪ ধারা [illegible] পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গুলি চালায় তৎকালীন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর পেটোয়া বাহিনী। এর ফলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে প্রথম দফায় গুলিতে জব্বার ও রফিক এবং ২য় দফায় গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত নিহত হন। এছাড়াও গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন সালাম। আহত হন অনেকেই। মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসই ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্যানভাস আর এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ছিল সেই ক্যানভাসের সবচেয়ে অমর চিত্র। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া ভাষা আন্দোলনের কোনো ছবিই অঙ্কিত হতে পারে না। তাই বলা চলে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূতিকাগার।

প্র: একুশের প্রথম শহিদ কাকে বলা হয়?

উ: একুশের প্রথম শহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন মানিকগঞ্জের আবদুল লতিফের বড় ছেলে। তাঁর মায়ের নাম রাফিজা খাতুন। সিংগাইর উপজেলার পারিল গ্রামে ছিল তাঁদের বাড়ি। ১৯৫২ সালে রফিকের বয়স হয়েছিল ২৬ বছর। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে আশ্রয় নেওয়ার সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন রফিক। গুলিতে তাঁর মাথার খুলি উড়ে গিয়ে তখনই মারা যান তিনি। আজিমপুর কবরস্থানে অসংরক্ষিত এলাকায় দাফন করা হয় শহিদ রফিকের মরদেহ।

প্র: [illegible]

উ: [illegible]

প্র: একুশের [illegible]

উ: [illegible] সিরাজুল ইসলাম, [illegible] চৌধুরী, [illegible] সম্পূর্ণ এই সংকলনের [illegible] করেন মুর্তজা বশীর, পাইওনিয়ার প্রেসের পক্ষে এম এ মুকিত ছেপেছেন এবং ব্লক তৈরি করেছেন এইচম্যান কোম্পানি, বাংলাবাজার, ঢাকা। ডাবল ক্রাউন সাইজের ১৮০ পৃষ্ঠার এ সংকলনের

...ছাড়া হয়েছিল দুই টিকা ফাটা আনা।
...সংকলনটি করে সংকলনটি
...সংকলনের সঙ্গে কোথাও কোথাও ছাপানো
...হয়েছিল ৫২২৬। এটি প্রকাশিত হওয়ার
...পর প্রকাশকের অসতর্কতায় কয়েকটি
...পৃষ্ঠা। সেই পরের সংকলনটির শিরোনাম
...করে সংকলন। পরে ১৯৫৩ সালে একুশের
...বইমেলা ঢাকা হয়।
কিন্তু এই সংকলনের আগে ঢাকার মানুষ
সম্পাদিত 'ওরা প্রথম দিন' সংকলন ১৯৫২
সালের ফেব্রুয়ারির মাসে বের হয় কলকাতা
থেকে। কামরুদ্দীনের বামপন্থী মেজো প্রবণ
মন্ত্রী সংকলনটি হয়েছিল কলকাতার ২০ বি
বাদিয়াড়া শৈলেন রোড থেকে প্রকাশিত
হয়েছে 'ওরা প্রথম দিন' নামে এই সংকলন
সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এতে লেখেন
মোহাম্মদ তোহা, সৈয়দ আবুল হুদা, নেমাই
বিশ্বাস, সুভাষ মুখার্জি (তিনি ছদ্মনাম
হাসিবুর রহমানের সংকলনেও তুজ
ছিলেন), নিতা বসু, তালিকা ঘোষ প্রমুখ।
লেখকদের অনেকেই তৎকালীন পূর্ব
পাকিস্তানের বাসিন্দা। সেদিক থেকে
একুশের প্রথম সংকলন কিন্তু 'ওরা প্রথম
দিন'। তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত
প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারী'।
সংকলনটির প্রচ্ছদ এবং এর কিছু লেখা
২০০৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক
'প্রথম আলো' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এই
সংকলনে দাবি করা হয়, মাতৃভাষার
দাবিতে শহিদ হয়েছেন ছাব্বিশ জন,
আহত হয়েছেন একশ পঁচিশ জন, বন্দি
হয়েছেন দুশ জন। সংকলনটির মূল্য ছিল
চার আনা।

প্র : একুশের প্রথম স্মরণিকা সম্পর্কে লেখ।

উ : ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা শহিদের স্মরণে একুশের প্রথম স্মরণিকা। শুরুতেই আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' পরে কাজী নজরুল ইসলামের

'শহীদ মাতৃ ভীম অশ্রুমান চিত্তের এই ...
...সুদিনের প্রভাত'। ...
...মাই বক্তৃতা একুশের কথা' শিরোনামে ...
...দুটি ছোট নিবন্ধ। তাতে ফুটে ...
...ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে জারীত জীবনে ...
...ভিবন্ধকীয় একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের ...
...মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, ...
...সেই বীর শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে ...
...হয় এই স্মরণিকা। এটির একটি ...
...আবেদনও ছিল : 'নিজে পড়িয়া অপরকে ...
...পড়িতে দিন।'

প্র : শহিদ মিনার আমের প্রতিবাদে লেখা কবিতা কোনটি?

উ। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের হাতে প্রথম শহিদ মিনার ভাঙ্গনের প্রতিক্রিয়ায় কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেন 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামের কবিতা। তখন শহিদ মিনারকে 'স্মৃতিস্তম্ভ' বলা হতো। বাংলা দিয়েই এর নামকরণ হয়েছিল। এই কবিতাটির কয়েকটি চরণ- 'স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু আমরা এখনো/চারকোটি পরিবার/ বাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজনা/ পারেনি ডাসতে।'

প্র : একুশের প্রথম কবিতা কোনটি?

উ : একুশের প্রথম কবিতা লেখেন মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী। কবিতার নাম 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। তখন তিনি প্রগতিশীল মাসিক সীমান্তর সম্পাদক এবং চট্টগ্রামের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন।

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় ছাপা হয় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'। বইটির দাম রাখা হয় দুই আনা। ওই দিনই চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জনসভায় রাজনৈতিক কর্মী হারুনুর রশীদ কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান। কবিতাটি ছাপানোর সময় চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার কোহিনুর প্রেসে হামলা চালায় পুলিশ। কিন্তু প্রেসের কর্মীরা

...সংকলনের পাণ্ডুলিপি, সাজানো মাটির ...
...এ ছাড়াও কাল গোপন করে ফেলার সময় ...
...হয়। পুলিশ চলে গেলে আবার নতুন করে ...
...শুরু হয় ছাপার কাজ। সকালের মধ্যে ...
...কপিটি এক্সচেঞ্জ করে সরকার, কবির ...
...হাতে জানি করে দানিয়া। আর এটি ...
...ছাপার অপরাধে কোরিয়ুর জেলের ...
...বারান্দার মাবির আহমেদ চৌধুরী ও সময় ...
...রাজনীতির চৌধুরী হাসানুর রশীদকে দীর্ঘ ...
...কারাভোগ করতে হয়।

একুশের প্রথম গান কোনটি?

একুশের প্রথম গান রচনা করেন রাজনৈতিক আ ন ম গাজীউল হক। গানটির প্রথম চরণ- 'ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না। এটি সে সময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'সুর হবে খুব হটো আই দুনিয়াওয়ালো, হিন্দুস্তান হামারা হ্যায়'- জনপ্রিয় এ হিন্দি গান থেকে নেওয়া হয় গানটির সুর। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রমনা ময়দানে আয়োজিত এক জনসভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়। এ সম্পর্কে গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ভাষা আন্দোলনের ওপর লেখা গানটি আমাকে গেয়ে শোনাতে হয়। সময়ের প্রয়োজনেই গানটি লিখেছিলাম।'

একুশের প্রথম গান ও গানের রচয়িতা সম্পর্কে আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' রচনার আগেই গাজী ভাই (গাজীউল হক) লিখেছিলেন 'ভুলবো না ভুলবো না'। এটা ছিল তখনকার দিনে রাজপথের গান। সবাই এ গান গাইত।

প্র : একুশের প্রভাতফেরির প্রথম গান কোনটি?

উ : ১৯৫৩ সালে প্রথম শহিদ দিবসের প্রথম প্রভাতফেরিতে গাওয়া হলো 'মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল/ভাষা বাঁচাবার তরে/আজিকে স্মরিও তারে।' গানটির রচয়িতা প্রকৌশলী মোশারেফউদ্দিন আহমদ। ১৯৫৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে লেখা হয়েছিল এ গান। হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ লিখেছেন, 'সেই সংগীতই হয়ে ওঠে অমর

...ফুলের প্রথম পর্বের ...
...পর্ব। একুশের ...
...সংকলন। ...
...ফেব্রুয়ারি ...
...ছাত্রদের ...
...ফুলের ...
...গানের ...

প্র : একুশের প্রথম গানের রেকর্ড?

উ। একুশের প্রথম গানের রেকর্ড তৈরি হয় ১৯৫২ সালে। ...
...'একুশে ফেব্রুয়ারি' ...
...ছিলেন ...
...চৌধুরীকে ...
...হয়েছিল ...
...নাটক লিখে ...
...চিত্রটি ...
...রাজবন্দিদের ...
...মঞ্চস্থ হয়। ...
...না। তাই ...
...মুনীর চৌধুরী '৫১ সালের ...
...নাটকটি লিখে ফেলেন। ...
...২১শে ফেব্রুয়ারি, ...
...জেলকর্তৃপক্ষের ...
...পর রাজবন্দিদের ...
...হয় 'কবর'। ...
...নলিনী দাস, ...

প্র : একুশের প্রথম উপন্যাস কোনটি?

উ : অমর একুশের ওপর লেখা প্রথম উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুন'। শহীদ মিনার প্রসঙ্গ, একুশের মিটিং-মিছিল, সংগ্রাম বর্ণনা, শহিদ মিনার নির্মাণসহ একুশের স্মৃতিবিজড়িত নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লিখেছেন জহির রায়হান। পঞ্চাশের দশকেই এটি পত্রিকায় ছাপা হয়, বই আকারে বের হয় '৬৯ সালে। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জহির রায়হান অংশ)।

প্র : একুশের ইতিহাস নিয়ে প্রথম বই কোনটি?

উ : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার মাত্র তিন মাস পর ভাষা আন্দোলন ও একুশের ইতিহাস নিয়ে লেখা হয় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস। গ্রন্থটির সম্পাদক অধ্যাপক (পরে প্রিন্সিপাল) আবুল কাসেম। '৫২ সালের জুন মাসে 'আমাদের প্রেস' থেকে মুদ্রিত এবং তমদ্দুন লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয় এ বই। প্রথম সংস্করণে প্রিন্টার্স লাইনে লেখা আছে–প্রকাশনায় হাসান ইকবাল, ১৯ নম্বর আজিমপুর রোড, ঢাকা। মুদ্রণে এন আর জামালী, 'আমাদের প্রেস' ১৯ আজিমপুর রোড, ঢাকা। প্রাপ্তিস্থান তমদ্দুন লাইব্রেরি, ১৯ আজিমপুর, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৫২। দাম চার আনা। দুই কভারসহ মোট ৪০ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির সাইজ ৭.৫ ইঞ্চি× বাই ৫ ইঞ্চি। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ সালের মার্চে।

প্র : 'শহিদ মিনারে'র পূর্ব নাম কী ছিল?

উ : ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়েছিল 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ।' পুরোনো ফটোগ্রাফে এটা প্রমাণিত। তাছাড়া আলাউদ্দিন আল আজাদ এটি ধ্বংসের প্রতিবাদে 'স্মৃতিস্তম্ভ' নামে কবিতাও লেখেন। 'স্মৃতি' ও 'স্তম্ভ' দুটোই বাংলা ভাষীদের শব্দ। পরে পাকিস্তান আমলেই 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' কে 'শহিদ মিনার' নামে অভিহিত করা হতে থাকে। বাংলা শব্দের বদলে এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরবি শব্দ। বাংলা ভাষার জন্য অবদানকারীদের স্মরণে নির্মিত স্থাপনার নামে একটিও বাংলা শব্দ অবশিষ্ট থাকে না। এর তারিখও ৮ই ফাল্গুন এর বদলে ২১শে ফেব্রুয়ারি হিসেবে পরিচিতি পায়।

প্র : প্রথম শহিদ মিনার সম্পর্কে লেখ।

উ : শহিদ মিনার প্রথমে ছিল ১১ ফুট লম্বা ত্রিস্তম্ভবিশিষ্ট একটি স্মৃতি। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা গোলাম মওলা ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে স্মৃতিটি রাতারাতি গড়ে তোলে প্রায় ৩০০ মানুষ। এদের বেশির ভাগই ছিলেন মেডিকেলের ছাত্র। তখন এর নাম ছিল 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এই স্তম্ভের মূল নকশা করেছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র বদরুল আলম। কাগজিট আর ইট দিয়ে করা শীত উপেক্ষা করে তৈরি করা এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পরদিন ভিড় জমায় শত শত মানুষ। ফুল থেকে শুরু করে টাকা-পয়সা পর্যন্ত অনেক কিছুই দান করতে থাকে তারা। নাম না-জানা এক নারী দান করেন তাঁর গলার হার।

বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণের স্থান নির্বাচন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। এর নকশা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা করেন শিল্পী হামিদুর রহমান। একটা প্রশস্ত ভিত্তিভূমি ও পাঁচটি উচ্চমিনার নিয়ে এই শহিদ মিনারের সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাদা পাথরের ভিত্তিভূমি পার হয়ে মিনারের পাদদেশে গিয়ে জনগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন শহিদদের উদ্দেশ্যে। আর পাঁচটি মিনারের পরিকল্পনা করা হয় মা ও সন্তানের মানব বন্ধনের কথা ভেবে। প্রথম বড় মিনারটি মায়ের রূপ আর তার দুপাশে রয়েছে মায়ের চার সন্তান। এ যেন মায়ের মমতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সেই সন্তানেরা। শহিদ মিনারের এই শান্ত সৌম্য অভিব্যক্তি জাতীয় ইতিহাসের একটি অন্যতম স্মারক। ভাষা শহিদদের এই স্মৃতিফলকটি ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আবারো গুঁড়িয়ে দেয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ঐ ভগ্ন শহিদ মিনারেই পালিত হয় প্রথম শহিদ দিবস।

১৯৭৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘনিষ্ঠ. প্রাক্তন শহিদ মিনারটির স্থলে পুনর্নির্মাণ এবং জনগণের জন্য এর সম্প্রসারণ করা হয়।

প্রথম শহিদ দিবস সম্পর্কে লেখ।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো পালন করা হয় শহিদ দিবস। ওই দিন বিভিন্ন স্তরের ও শ্রেণির মানুষ বিশেষ করে মহিলা খালি পায়ে ও খালি মাথায় সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত দীর্ঘ শোভাযাত্রা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে। দলে দলে সাধারণ আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে ও কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। বেলা ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় শোভাযাত্রীরা। ১২টার সময় সেখান থেকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বের হয় তারা। শোভাযাত্রীরা শোকজ্ঞাপক কালো পতাকা, কালো ব্যাজ ধারণ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'রাজবন্দিদের মুক্তি চাই' প্রভৃতি স্লোগান সহকারে অগ্রসর হতে থাকে।

প্র : একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা কোনটি?

উ : একুশের শহিদদের স্মরণে ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি গায়েবানা জানাযার পর একটি সংক্ষিপ্ত সভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মহম্মদ এমাদুল্লাহ। সভাপতির ভাষণে তিনি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির ভাষণের আগে একমাত্র অলি আহাদই এ সভায় বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'নুরুল আমীন সরকারের হত্যার জবাব দিব ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মারফত, মাতৃভাষা বাংলাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার দ্বারা।'

প্র : একুশের ঘটনার প্রতিবাদে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী প্রথম সদস্য কে?

উ : ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন পূর্বদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মন্ত্রী পরিষদ সভা ডাকেন। সভায় ৭ দফাবিশিষ্ট একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, 'বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সম্পর্কে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত সরকারি নীতি পুনর্বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।' এ প্রস্তাব পাসের ব্যাপারে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৪ জন মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন বাঙালি। এঁরা হলেন– শামসুদ্দিন, নূরুল আমীন, আবদুল মোনেম খান, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুল মতিন চৌধুরী ও খাজা খায়ের উদ্দিন। এঁরা সবাই সভার শুরুতে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রস্তাব পাসের সময় এঁরা সভাকক্ষে অনুপস্থিত ছিলেন। এঁরা সভাকক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন।

প্র : একুশের স্মরণে প্রথম বিশেষ সংখ্যা কোনটি?

উ : একুশে ফেব্রুয়ারির গুলি ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত দেশে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন বিক্ষুব্ধ জনতার গুলি চালিয়ে পুলিশ হত্যা করে বহু ছাত্র-জনতা। একুশের এই রক্তাক্ত ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এর বিশেষ সংখ্যা। সকালে পত্রিকা প্রকাশের মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এক হাজার কপি এবং পরে পুনর্মুদ্রণ করা হয়। এটাই ছিল ভাষা আন্দোলনের ওপর শহিদদের স্মরণে কোনো পত্রিকার প্রথম বিশেষ সংখ্যা।

প্র : একুশে স্মরণে প্রথম মিছিল কোনটি?

উ : ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে জানাজা শেষে সমবেত হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীসহ সর্বস্তরের জনগণ বিশাল মিছিল নিয়ে হাইকোর্টের পথ ধরে নবাবপুর রোডের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'খুনি নুরুল আমিনের বিচার চাই', 'খুনের বদলে খুন

চাই' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি হাইকোর্টের গেটের সামনে উপস্থিত হলে বিপুলসংখ্যক পুলিশ তাদের পথ রোধ করে। মিছিলটি সেক্রেটারিয়েটের পাশ দিয়ে আবদুল গণি রোড ধরে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মিছিল গণি রোডের দিকে মোড় নিতে শুরু করা মাত্র পুলিশ একই সঙ্গে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ শুরু করে। মিছিলকারীদের অনেকেই এ সময় ফজলুল হক হল, কার্জন হল, ঢাকা হলসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ও হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করে।

প্র : কে প্রথম একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আইন পরিষদে প্রথম বক্তব্য দেন?

উ : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় পূর্ববঙ্গ পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে ছাত্রদের ওপর গুলি চালনার প্রতিবাদে অধিবেশন সেদিনের জন্য স্থগিত রাখার দাবি জানান আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। তিনি বলেন, 'জনাব স্পিকার সাহেব, প্রশ্নোত্তরের পূর্বে আমি আপনার কাছে একটা নিবেদন করতে চাই। যখন দেশের ছাত্ররা, যারা আমাদের ভাবী আশা-ভরসাস্থল, পুলিশের গুলির আঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে সভা করতে চাই না। প্রথমে ইনকোয়ারি তারপর হাউস চলবে।' একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে এটাই ছিল আইন পরিষদে প্রথম বক্তব্য।

প্র : পাকিস্তান গণপরিষদে কে প্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন?

উ : ১৯৫২ সালের ১২ আগস্ট সব ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলায় বক্তৃতা শুরু করেন। পশ্চিম পাকিস্তানি গণপরিষদ সদস্যরা নানা উপহাস করে এ সময় তর্কবাগীশকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু উপহাস উপেক্ষা করেই তর্কবাগীশ বাংলায় বক্তব্য দেন। বাংলায় বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য ৫ই সময় আইনসভার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মাওলানা তর্কবাগীশ দেশ কয়েকবার স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পর পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা বক্তৃতা রেকর্ড করার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়।

প্র : একুশের প্রথম ইশতেহার কোনটি?

উ : একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর ৭ই দিনই পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ কমিটি 'অত্যাচারী নুরুল আমিন সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গব্যাপী তুমুল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করে। সাইক্লোস্টাইল করা এ ইশতেহারই ছিল একুশের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথম ইশতেহার।

১৯শে মে : ১৯৬১

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলন কী?

উ : ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকার শিলচর জেলায় ১৯৬১ সালের ১৯শে মে বাংলাকে রাজ্যভাষা করার দাবিতে বিএসএফের গুলিতে ১১জন বাঙালি প্রাণ দেন। সেখানের রাজ্য সরকার শুধু অহমিয়া ভাষাকে রাজ্যভাষা করার ঘোষণা দেবার কারণে এই আন্দোলন হয়। শিলচর বাংলাদেশের সিলেট জেলার পূর্ব সীমান্ত সংলগ্ন।

প্র : মাতৃভাষা প্রেমী হিসেবে সারা ভারতে বরাক উপত্যকার নাম ছড়িয়ে পড়ার কারণ কী?

উ : মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বরাকের সন্তানেরা হাসিমুখে প্রাণ বলি দিয়েছিলেন।

প্র : বরাক উপত্যকার নিখিল আসাম বাংলাভাষা ও অন্যান্য অনঅসমিয়া ভাষা সম্মেলন কোথায় কবে হয়েছিল?

উ : শিলচর, ১লা, ২রা ও ৩রা জুলাই ১৯৬০ সালে।

প্র : উক্ত সম্মেলনে সভাপতির পদ কে গ্রহণ করেছিলেন?

উ : চপলাকান্ত ভট্টাচার্য।

প্র : একমাত্র অসমিয়া ভাষাকে রাজ্য ভাষা করে বিধানসভায় কবে বিলটি গৃহীত হয়?

উ : ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬০ সালে।

প্র : ভাষা বিলের প্রতিবাদে নিখিল আসাম বঙ্গভাষী সম্মেলন কোথায় ও কবে হয়?

উ : হোজাই, ৫ই-৬ই নভেম্বর, ১৯৬০ সালে।

প্র : আসাম রাজ্য ভাষাবিল কবে রাজ্যপালের অনুমোদন পায়?

উ : ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬০ সালে।

প্র : রাজ্যভাষা প্রশ্নে উপত্যকার প্রথম জনসম্মেলন কোথায় কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উ : আসামের করিমগঞ্জে। ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ সালে।

প্র : বরাক উপত্যকার কোন কোন সালে ভাষা সংগ্রাম হয়েছিল?

উ : ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৮৬, ১৯৯৬ সালে।

প্র : বরাক উপত্যকার শহিদ দিবসগুলি উল্লেখ কর।

উ : (১) ১৯শে মে, ১৯৬১, (২) ১৭ই আগস্ট, ১৯৭২ (৩) ২১শে জুলাই, ১৯৮৬ (৪) ১৬ই মার্চ, ১৯৯৬।

প্র : ১৯৬১-র ভাষা সংগ্রামের শহিদ কজন? এবং তাদের নাম কী?

উ : শহিদ ১১ জন। তাদের নাম- (১) কমলা ভট্টাচার্য (২) শচীন্দ্রচন্দ্র পাল (৩) চণ্ডীচরণ সূত্রধর (৪) কুমুদরঞ্জন দাস (৫) কানাইলাল নিয়োগী (৬) সুকোমল পুরকায়স্থ (৭) সুনীল সরকার (৮) হীতেশ বিশ্বাস (৯) তরণী দেবনাথ (১০) বীরেন্দ্র সূত্রধর (১১) সত্যেন্দ্র দেব।

প্র : মেহেরোত্রা কমিশন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গঠন করা হয়েছিল?

উ : শিলচর রেল স্টেশনে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের গুলিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্র : ১৯৬১-র সংশোধিত ভাষা আইনটি কী ছিল?

উ : বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হবে।

প্র : বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রথম মহিলা শহিদ কে?

উ : শহিদ কমলা ভট্টাচার্য।

প্র : 'কমলা ভট্টাচার্য' তখন শহিদ হন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উ : মাত্র ষোল বছর।

প্র : ১৯৬১-র ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলোর নাম কী?

উ : কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ, কংগ্রেস ভাষা সংগ্রাম সমিতি, ছাত্রদের সংগঠন বেং কমিউনিস্ট পার্টি ও রাজ্যতান্ত্রিক দল।

প্র : ১৯শে মে-র একাদশ শহিদের স্মৃতির উদ্দেশে স্থাপিত শহিদ মিনারটি কোথায় অবস্থিত?

উ : শিলচর গাছীবাগে।

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

উ : বিমলা প্রসাদ চালিহা।

প্র : আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কোন সালের কোন মাসের কত তারিখ আসাম বিধানসভায় ভাষা-বিল পাস করেন?

উ : ১৯৬০ সালের ২৪শে অক্টোবর।

প্র : ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে আসাম বিধানসভায় উপস্থাপিত ভাষা বিলের মূল কথা কী ছিল?

উ : আসামের একমাত্র রাজ্যভাষা হবে অসমীয়া।

প্র : ১৯৬০ সালের এই ভাষা বিলের প্রতিবাদে কাছাড় ছাড়া আর কোথায় সেদিন 'কালো দিবস' পালিত হয়?

উ : সেদিন শুধু কাছাড়েই নয়, শিলচর পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয় এবং ৪০ হাজার নর-নারী শিলচরের পথে পথে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়।

প্র : প্রস্তাবিত ভাষাবিলের প্রতিবাদে অবিভক্ত কাছাড় জেলায় কোন দিনটি 'সংকল্প দিবস' রূপে পালিত হয়?

উ : ১লা বৈশাখ, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬১।

প্র : ১৯৬১ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কার আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা কোন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন?

উ : বরাক উপত্যকার বদরপুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে।

প্র : আসামের প্রথম রাজ্যভাষা কোনটি?
উ : অসমীয়া।
প্র : অসম ভাষা কবে আইনে রূপান্তরিত হয়? আইনে কী বলা হয়?
উ : ১৯৬০ সালের ১৮ শে অক্টোবর 'অসম ভাষা বিল' আইনে রূপান্তরিত হয়। আইনে বলা হয় অসমীয়া ভাষাই সমগ্র আসামের সরকারি ভাষা।
প্র : কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদের দ্বিতীয় সম্মেলন কবে কোথায় হয়?
উ : ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ সালে। করিমগঞ্জে।
প্র : ১৯শে মে-র গুলিচালনার পর কমিশনের বিচারক কে ছিলেন?
উ : আসাম হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি গোপালজি মেহরোত্রা।
প্র : মেহরোত্রা তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকারের নিকট কবে দাখিল করা হয়?
উ : ১০ই এপ্রিল, ১৯৬২ সালে।
প্র : উনিশে মে-র পরবর্তী বেসরকারি তদন্ত কমিশনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
উ : নির্মল চন্দ্র চাটার্জি (এন-সি-চাটার্জি)।
প্র : উনিশে মে-র প্রথম কবিতা কোনটি? কবির নাম কী?
উ : কবি গোলাম কিবরিয়ার 'উনিশের কবিতা।'
প্র : উনিশের প্রথম সংকলন গ্রন্থ কোনটি?
উ : উনিশের উত্তরাধিকার। সম্পাদক— অনন্ত দেব, মৃণালকান্তি বিশ্বাস, মিলন উদ্দিন লস্কর, ইমান উদ্দিন বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী।
প্র : উনিশের প্রবন্ধ সংকলন কোনটি?
উ : কলোকোল। সম্পাদক কানু আইচ।
প্র : উনিশের কাব্য সংকলন?
উ : উনিশ আত্মদান হও— কবি অনুরূপা বিশ্বাস।
তেমন রবার নেই মোছে উনিশে মে — কবি করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য।
মাতৃভূমি বাংলা ভাষা, মা — দিলীপকান্তি লস্কর।
প্র : উনিশের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ?
উ : 'বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রাম' — লেখক সুধীর কর।
'ভারতের বাংলাভাষা সংগ্রাম' — লেখক কানু আইচ।
প্র : উনিশের স্মৃতিগ্রন্থ?
উ : 'রক্তাঞ্জলি'— লেখক পরিতোষ পাল চৌধুরী।
প্র : একষট্টির ভাষা সংগ্রামের কণ্ঠরোধ করতে কোন সংস্থা কুখ্যাত হয়ে আছে?
উ : কাছাড় জেলা শান্তি পরিষদ।
প্র : একষট্টির ভাষা সমস্যার সমাধানে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেন? কি ভাবে?
উ : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়। ত্রিসূত্র ফর্মুলার মাধ্যমে। সংবিধানের ৩৪৭ ধারা সংশোধনের দাবি।
প্র : একষট্টির ভাষা সমস্যা সমাধানে কোন সূত্রকে মেনে নেওয়া হয়?
উ : শাস্ত্রী সূত্র বা শাস্ত্রী ফর্মুলা।
প্র : সংক্ষেপে সংশোধিত শাস্ত্রী ফর্মুলা কী?
উ : শাস্ত্রী ফর্মুলার মূল বক্তব্য— (১) মহকুমা পরিষদের কুখ্যাত ধারা উঠিয়ে দেওয়া। (২) কাছাড়ে বাংলা ভাষার প্রচলন। (৩) রাজধানীর সাথে কাছাড়ের (বর্তমান বরাক উপত্যকায়) পত্রালাপ বাংলায়। (৪) গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম.এ. পড়ার সুযোগ। (৫) সংখ্যালঘুর রক্ষা কবচ প্রয়োগ। (৬) কাছাড় সংক্রান্ত সকল বিল, অর্ডিনেন্স নোটিশ বাংলা ভাষায় প্রচারিত হবে।
প্র : আসাম বিধানসভায় কবে বাংলা বিল সংশোধন হয়?
উ : ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

১৭ই অগস্ট : ১৯৭২

প্র : ১৯৭২-এ আবার ভাষা আন্দোলন হবার কারণ কী?
উ : ১৯৬১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষা সরকারি স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯৭২-এ উচ্চস্তরে শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র অসমীয়া এই নির্দেশ জারি করার প্রতিবাদেই বাহাত্তরে আবার বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়।
প্র : ১৯৭২-এর ভাষা আন্দোলনের শহিদ কে?
উ : শহিদ বিজন ওরফে বাচ্চু চক্রবর্তী।
প্র : ১৯৭২ সালের ক্ষত তারিখে বাচ্চু চক্রবর্তী শহিদ হন?
উ : ১৯৭২ সালের ১৭ই অগস্ট।
প্র : মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা অধিকারের রক্ষায় সেদিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব কে করেন?
উ : হাইলাকান্দি পুরসভার তখনকার সভাপতি হরিদাস দেব।
প্র : বাহাত্তরের শহিদ বাচ্চু চক্রবর্তীর জন্ম ও মৃত্যুর দিনটি তাৎপর্যবাহী কেন?
উ : তাঁর জন্ম ও মৃত্যু একই তারিখে ১৯৪৯ এর ১৭ই অগস্ট তার জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৯৭২ এর ১৭ই অগস্ট।
প্র : ১৯৭২ সালে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসামে পাঠিয়েছিলেন?
উ : স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণচন্দ্র পন্থ (কে. সি. পন্থ)।
প্র : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে. সি. পন্থের সঙ্গে আসাম সরকার, সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্রযুব সংগ্রাম পরিষদের কোথায়, কবে বৈঠক হয়েছিল?
উ : শিলংয়ে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল।
প্র : কে. সি. পন্থের সমাধান সূত্রে কারা স্বাক্ষর করেছিলেন?
উ : মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহ, সাংসদ মইনুল হক চৌধুরী, মন্ত্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার, সাংসদ নীহাররঞ্জন লস্কর, বিধায়ক বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুল জলিল চৌধুরী, সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক তারাপদ ভট্টাচার্য এবং সদস্য অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন দে ও মতিলাল জায়গিরদার। ছাত্র-যুব সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক সুনীল রায় এবং সদস্য আব্দুল কায়ুম চৌধুরী।
প্র : কবে, কোথায় কে. সি. পন্থের সমাধান সূত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
উ : ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল [illegible] শিলং-এ।
প্র : আসামের উচ্চশিক্ষা তথা ডিগ্রি এবং উপরের স্তরে শিক্ষার মাধ্যম কী?
উ : একমাত্র ইংরেজি ভাষা।
প্র : আসামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম কী?
উ : (ক) গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় (খ) ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, (গ) আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শিলচর (ঘ) তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জোরহাট এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের [illegible] ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি, (এন. আই. টি) শিলচরের নাম উল্লেখ্য।
প্র : বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা সংগ্রামের দ্বাদশ শহিদ বলতে কাকে বুঝি?
উ : শহিদ বিজন ওরফে বাচ্চু চক্রবর্তী।
প্র : ১৯৭২-এ আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
উ : শরৎচন্দ্র সিংহ।
প্র : দ্বাদশ শহিদ বাচ্চু চক্রবর্তীর শেষকৃত্য কোথায় সমাপন হয়?
উ : শিলচর শ্মশানঘাটে।

২৪শে জুলাই : ১৯৮৬

প্র : বরাক উপত্যকা ছাত্র যুব সংগ্রাম কমিটির কবে এবং কোথায় জন্ম হয়?
উ : ১৯৮৫ সালের ৩০শে নভেম্বর, শিলচরে জন্ম হয়।
প্র : বরাক উপত্যকার ৮৬র আন্দোলনকারী সংগঠনের নাম কী ছিল?
উ : বরাক উপত্যকা সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।
প্র : এই কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক কে ছিলেন?
উ : শ্রীযুক্ত মিহিরলাল রায়।
প্র : কোন কোন মূল দাবি নিয়ে ৮৬তে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আন্দোলনকারী সংগঠনের জন্ম হয়?
উ : 'সেবা' ভাষা সার্কুলারের বিরুদ্ধে ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে।
প্র : 'সেবা' ভাষা সার্কুলারে কী জারি করা হয়েছিল?
উ : আসামে অসমীয়া ভাষা-ভাষীদেরও

অসমীয়া ভাষায় বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে।

প্র : ১৯৮৬র আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটির দাবিগুলো কী ছিল?

উ : (১) বরাকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। (২) ভাষা সার্কুলার প্রত্যাহারের দুই দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনের কার্যসূচি গৃহীত হয়।

প্র : ১৯৮৬ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

উ : প্রফুল্ল কুমার মহন্ত।

প্র : '৮৬তে কমিরগঞ্জের স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাদের স্লোগান কী ছিল?

উ : কালো ব্যাজ পরা স্বেচ্ছাসেবক সেবিকাদের মুখে আওয়াজ ছিল – 'গো ব্যাক প্রফুল্ল কুমার মহন্ত', 'বাংলা ভাষা ফিরিয়ে দাও, নইলে তুমি চলে যাও'। 'সেবা সার্কুলার মানছি না, মানব না'।

প্র : কবে সেবা সার্কুলার স্থগিত ঘোষণা করা হলো?

উ : ১৯৮৬ সালের ১৫ই অগস্ট।

প্র : '৮৬র ২১শে জুলাই করিমগঞ্জে গুলির খবরে শিলচরে তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হলো?

উ : শিলচরে সেদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ও বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনাও ঘটে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

প্র : ১৯৮৬র ২১শে জুলাইর প্রতিবাদ কবে এবং কোথায় ঐতিহাসিক মিছিল হয়েছিল?

উ : ১৯৮৬র ২৪শে জুলাই সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির জেলা কমিটির আহ্বানে পুলিশি গুলি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রায় বিশ হাজার লোকের এক মৌন ঐতিহাসিক মিছিল বেরিয়েছিল।

প্র : ১৯৮৬-র আন্দোলনের শহিদ কজন? তাদের নাম কী? কোথায়, কবে শহিদ হয়েছিলেন।

প্র : নয় দফা কার্যসূচি নিয়ে কবে সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন?

উ : ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে যুগ্ম আহ্বায়ক মিহির লাল রায় সহ ৪০ জনের এক প্রতিনিধিদল দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

প্র : সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির এই স্মারকলিপি প্রদান কার্যকরী না হওয়ায় কমিটির পরবর্তী পদক্ষেপ কী ছিল?

উ : ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করা।

প্র : সাংসদে বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি কবে পাস হয়েছিল এবং তা আবার স্থগিত হলো কেন?

উ : বিল পাস হয় ১৯৮৮ তে। আসাম সরকার এই বিলের সম্মতি জানান নি বলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আইনি বাধা হয়ে থাকল।

প্র : বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রসঙ্গে আসাম সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির কবার আলোচনা হয়?

উ : তিনবার। প্রথমবার : ১৯৮৮র ২১শে মে। শিলচর সার্কিট হাউসে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্তের সঙ্গে। সেই আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ২য়বার : দিসপুরে আলোচনা হয় সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সঙ্গে। সরকারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন মন্ত্রী ললিত রাজঘোয়া এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। ৩য়বার : মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মোহন্ত সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে ১৯৯০ সালের মার্চ দিসপুরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

প্র : ৩য়বারের আলোচনার প্রস্তাবগুলি কী ছিল?

উ : প্রস্তাবগুলো ছিল– বরাকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলকে আসাম সরকার কর্তৃক সম্মত জানানো, এর জমির ব্যবস্থা করা, বরাকে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতন হওয়া, বেহাল রাস্তাঘাট মেরামত করা, সেবা ভাষা সার্কুলার ভবিষ্যতে জারি করা না হয়। আন্দোলনকারীর উপর সাজানো

খ্রি.), (২) শহিদ সলিল সিংহ (বেহুলী ১৯৯৫ খ্রি.), (৩) শহিদ সুদেষ্ণা সিংহ (পাথারকান্দি ১৯৯৬ খ্রি.)।

প্র : কত তারিখে শহিদ সুদেষ্ণা শহিদ হন?

উ : ১৬ই মার্চ ১৯৯৬ সালে।

প্র : কত তারিখে শহিদ সলিল সিংহ শহিদ হন?

উ : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে।

প্র : সুদেষ্ণা সিংহে কোথায় শহিদ হন?

উ : পাথারকান্দির বিলবাড়ি নামক স্থানে।

প্র : পুলিশ কেন সেদিন কলকলিঘাটে (বিলবাড়ি) গুলি চালিয়েছিল?

উ : বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষা দুশিতাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে কলকলিঘাটে (বিলবাড়ি) জনতা রেল অবরোধ করেছিল বলে।

প্র : শহিদ রাজবাবুর শহিদ হবার কারণ কী?

উ : 'মণিপুরী' পত্রিকার মাধ্যমে মণিপুরী জাতির অধিকারের আলোচনায় সোচ্চার ছিলেন এবং যে মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীর অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত সেই মণিপুরী জাতিকে পার্বত্য জাতি বলে সরকারি ঘোষণার প্রতিবাদে সোচ্চার হন, ফলে মণিপুরী একাংশ তাতে বিক্ষুব্ধ হন। তার পরিচালিত 'মণিপুরী' পত্রিকায় (১৯৩০ খ্রি.) এই বিষয়ে বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কাজ শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে অজ্ঞাত আততায়ীদের হাতে নিহত হন (১৯৩৪)। উল্লেখ্য সমগ্র বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজের উদ্যোগে শহিদ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁকে বিষ্ণুপুর মণিপুরীরা প্রথম ভাষা-শহিদ বলে মনে করে থাকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

প্র : অষ্টম শতকে বিশ্বে কতগুলো ভাষার অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়?

উ : প্রায় ২০ হাজার।

প্র : বর্তমানে বিশ্বে কতগুলো ভাষা রয়েছে?

উ : বর্তমানে বিশ্বে সাড়ে ছয় হাজার ভাষা রয়েছে। তবে স্বাবলম্বী ভাষা আড়াই

হাজারের বেশি নয়। বাকিগুলি মৃতপ্রায়।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা দেবার জন্য কোথায় এ দাবি জানানো হয়েছিল?

উ : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা দেবার জন্য জাতিসংঘের মহাসচিবকে পত্র দেবার ব্যাপারটি প্রথম কে কে করেন?

উ : রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম।

প্র : রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম কে?

উ : রফিকুল ইসলাম সুনিয়া বিদেশী ছিলেন আর আবদুস সালামের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। উভয়ে চাকরি ও কর্মসূত্রে কানাডার অটোয়ায় অবস্থান করছিলেন। সংগঠনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আর আবদুস সালাম ছিলেন উপদেষ্টা। কানাডায় তাঁরা একটি 'সাদা বিদ্যালয়' খোলার পরিকল্পনা করেন যে তখনই তাঁদের মনে আসে যে, পৃথিবী থেকে বহুভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এটা হলে মানুষ নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগী হবে।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে কে কবে কার কাছে প্রথম পত্র লেখেন?

উ : রফিকুল ইসলাম জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে ১৯৯৯ সালের ৯ই জানুয়ারি প্রথম পত্র লেখেন।

প্র : সেই পত্রের কোনো উত্তর কি এসেছিল?

উ : ১৯৯৮ সালের ২৩শে জানুয়ারি কফি আনান রফিকুল ইসলামকে এক পত্রে জানান যে, এধরনের প্রস্তাব কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে এলে গ্রহণ করা হয় না। কোনো মন্ত্রী বা সরকারের কাছ থেকে এমন প্রস্তাব এলেই তা কেবল বিবেচনার যোগ্য হয়।

প্র : 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কী?

উ : এটি ১৯৯৮ সালে কানাডায় গঠিত একটি সংগঠন। রফিকুল ইসলাম কফি আনানের কাছে চিঠি (১৯৯৮) লেখার পর কানাডায় সমমনা দলগুলিকে নিয়ে এই সংগঠন গড়েন। এখানে লিখের মাতৃভাষার মানুষ ছিল। যাঁরা এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন, তাঁরা হলেন। আলবার্ট জিনমুন (ফিলিপিনো ভাষা), অন্দ্রেজ ফ্রেডোবাল (ফিলিপিনো ভাষা), জেমস থরিন (ইংরেজি ভাষা), সুজান হুর জিন্স (ইংরেজি ভাষা), ডা. কেলভিন চাও (কেন্টনিজ ভাষা), মাজলিন ইসলাম (ফ্রেঞ্চ ভাষা), মেলেটা থার্নিস (জার্মান ভাষা), ফুলদা জোশী (হিন্দি ভাষা) এবং বাংলা ভাষী আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম।

প্র : 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কে কে হন?

উ : সভাপতি হন রফিকুল ইসলাম আর সাধারণ সম্পাদক হন ফিলিপাইনের আলবার্ট জিনমুন।

প্র : এই সংগঠনের নামে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে কবে দাবি উত্থাপন করা হয়?

উ : ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ এই সংগঠনের নামে জাতিসংঘের মহাসচিবকে আবার চিঠি দেয়া হয় যাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার অনুরোধ করা হয়। সেখান থেকে পরামর্শ প্রদান করা হয় যে, প্রস্তাবটি জাতিসংঘে না দিয়ে তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোতে যেন পাঠানো হয়। কারণ এ জাতীয় বিষয় নিয়ে সেই সংস্থাই কাজ করে। সে অনুসারে ১৯৯৯ সালের ২৩শে জুন ইউনেস্কোতে আবেদন করা হয়।

প্র : একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ঘোষণা করার পেছনে কোন দেশগুলোর প্রত্যক্ষ সমর্থন ও দাবি ছিল?

উ : বাংলাদেশ, ভারত, কানাডা, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যান্ড।

প্র : বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইউনেস্কোতে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কেন?

উ : কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন থেকে প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না, প্রস্তাব আসতে হবে কোনো

[illegible] সদস্য রাষ্ট্র থেকে, তাই বাংলাদেশ সরকার এই প্রস্তাব পাঠায়।

প্র : বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন কোন দেশ এর সহ-প্রস্তাবক ছিল?

উ : ভারত, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান, ওমান, মরিশাসের, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইসরাত, পাকিস্তান, চিলি, পানামাসহ ২৭টি দেশ।

প্র : কবে থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়?

উ : ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে

প্র : 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড ও রফিক-সালাম কি কোন পদকে ভূষিত হিসেবে?

উ : ২০০১ সালে 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড' সংগঠনটি একুশে পদক এবং ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম স্বাধীনতা পদক লাভ করেন। ২০১৩ সালের ২৩শে মার্চের রফিকুল ইসলাম মারা যাওয়ায় তিনি পদক মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক।

খনার বচন

[illegible]

কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন যায় দিন।'

[illegible]

বৃষ্টি, ঝড়, আবহাওয়া ও যাত্রা নিয়ে

১. অকালে কুয়াশা। অকালে বৃষ্টি।

২. [illegible]

[illegible]

১০. [illegible]

১১. [illegible]

১২. [illegible]

১৩. [illegible]

১৪. [illegible]

১৫. [illegible]

১৬. [illegible]

১৭. [illegible]

১৮. [illegible]

১৯. [illegible]

২০. [illegible]

২১. [illegible]

২২. [illegible]

২৩. উঠান ভরা লাউ শসা
ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর দশা।

২৪. উত্তর দুয়ারি ঘরের রাজা,
দক্ষিণ দুয়ারি তাহার প্রজা।
পূর্ব দুয়ারির খাজনা নাই
পশ্চিম দুয়ারির মুখে ছাই।

২৫. [illegible]

২৬. [illegible]

২৭. [illegible]

২৮. এক পুরুষে রোপে তাল,
অন্য পুরুষে করে পাল।
তারপর যে সে খাবে,
তিন পুরুষে ফল পাবে।

২৯. এক মাসে তিন গহণ।
মরে গাভা কি দেওয়াব ঃ
৩০. একে তে মাহুরী মুড়ি,
তার উপর ঢোলের বাড়ি।
৩১. তল কচু মান
তিন-ই সমান।
৩২. কচু বলে ছড়ালে ঘাই,
খনা বলে তার সংখ্যা নাই।
৩৩. কপালে নাই ঘি,
ঠনঠনকালে হবে কি!
৩৪. কাচায় না নোয়ালে বাঁশ,
পাকলে করে ঠাস ঠাস।
৩৫. কার্তিকের উনজলে।
খনা বলে ঘুনো ফলে ঃ
৩৬. কানা মেঘের দৃষ্টি
সর্বত্র নয় বৃষ্টি।
৩৭. কানার ছাতা বুধের মাথায়
ক্ষেতের ফসল রাখবে কোথায়?
৩৮. কাঁচা রোপা শুকায়
ভুইয়ে ধান ভুইয়ে খুটায়।
৩৯. কাল ধানের ধরা পিঠা,
মা'র চেয়ে মাসি মিঠা।
৪০. কী করো শ্বশুর মিছে খেটে
ফাল্গুনে এঁটে পোত কেটে
বেড়ে যাবে ঝাড় কি ঝাড়
কলা বইতে ভাঙে ঘাড়।
৪১. কী করো শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।
কোদাল কুঙুলে মেঘের গাঁ,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলোগে বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।
৪২. কুয়ো হয় আমের ভয়
তাল তেঁতুলের কিবা ভয়!
৪৩. কৃষক ক্ষেতের বাদ্ধ আইল,
বৃষ্টি হইবে আইজ কাইল।
৪৪. খনা ডেকে বলে যান
রোদে ধান ছায়ায় পান।
৪৫. খনা বলে চাষার পো
শরতের শেষে সরিষা রো।
৪৬. খনা বরে, শোনো কৃষকগণ
হাল লয়ে মাঠে বেরুবে যখন
শুভ দেখে করবে যাত্রা
না হলে ফলে অনেক মাত্রা।
ক্ষেতে গিয়ে করো ঠিক নিরূপণ,
পূর্বদিক হতে চাষ চলবে
নাহিকো সংশয় হবে ফসল।
৪৭. খনা বলে, শুন শুন
সাতকের পেছে মুলা দুন।
৪৮. খনা বলে, শুনে যাও
নারিকেল মূলে ছিটা দাও
পাছ হয় তাহা মোটা
তাড়াতাড়ি ধরে গোটা।
৪৯. খনা বলে, শোনো ভাই
দুনায় দুনা অধিক পাই।
৫০. খনা ভুয়ে চালবি জল
সারা বছর পাবি ফল।
৫১. খনা নামে আবার বধূ!
৫২. খিলে লক্ষী খিলে ধান।
দুপে দুপে ভাক্তার বাদ্ধ।
৫৩. গরু ছাগলের মুখে দিস।
চারা না খায় বাকিস দিস।
৫৪. গরু-জরু-ক্ষেত-পুতা,
চষিবর বেটার মূল সুতা।
৫৫. গরুর মুখে ঘাস পানি।
হাল গৃহস্থি পরে জানি।
৫৬. গাছ-গাছলি ঘন রোবে না
গাছ হবে তাতে ফল হবে না।
৫৭. গাছে গাছে আগুন জ্বলে
বৃষ্টি হবে খনায় বলে।
৫৮. গরু জারু ধান
এই তিনে চাষার মান।
৫৯. গাই বুড়ো আঁতে, বলদ বুড়ো দাঁতে।
৬০. গরুর মুখে দিয়ে ঘাস
তার পরে করবে চাষ।
৬১. গাজর, গছি, সুরী
তিন বোধে দূরী।
৬২. গাই দিয়ে বাদ্ধ হল।
দুঃখ তার চিরকাল ঃ
৬৩. গাই পালে মেয়ে,
দুধ পড়ে বেয়ে।
৬৪. গাঙ দেখলে মুত আসে,
নাঙ দেখলে হাস আসে (নাঙ মানে
স্বামী)।
৬৫. গাঁ গড়ানে ঘন পা।
যেমন মা তেমন ছা।
৬৬. ঘে নারিকেল খেকে বো
আগা টুকরা কাঁঠাল ভো।
৬৭. ঘোরে ঘিরা কয় গরল,
ছলনে ছিপল ফসল গরল।
৬৮. ঘন সরিষা পাতলা সাই,
তেলো মেপে তাপাস পাই।
৬৯. ঘরের কোনে মরিচ গাছ লাল মরিচ ধরে,
তোমার কথা মনে হলে চোখের জল পড়ে।
৭০. চরি হাত অন্তর এক হাত খাই।
তারা গাছে চারা ভাই।
৭১. চাকা গোরুর বাঁশে ছাই।
লক্ষের বাণিজ্য বসে পাই।
৭২. চাঁদে মুখে যারে পড়ায়
তার ধান-চৌইলো ন যায়।
৭৩. চাঁদের সকার মধ্যে তারা।
মধ্যে পানি মুকল ধারা।
৭৪. চরি হাত চষা মাটি
এ মুখে মুড় দেশ খাটি।
৭৫. চাষে মুলা ভাব
অর্ধেক তুলা ভাব
অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।
৭৬. চালায় চালায় কুমুড় পাতা
লক্ষী বলেন আছি তথা।
৭৭. চাষা পঁড়লি মশা।
৭৮. চৈত্র মাসে পাঁচ শনি পায়।
নারের মুণ্ড গড়াগড়ি যায়।
৭৯. চৈতে লাগাইলে আনা।
বৈশাখে লাগাইলে আধা।
৮০. চৈতে বৃষ্টি নালে মিষ্টি
চাষার ক্ষেতে শুভদৃষ্টি।
৮১. চৈত্রে দিয়া মাটি
বৈশাখে কর পরিপাটি।
৮২. চৈতের কুয়া আমের ক্ষয়।
তাল তেঁতুলের কিবা হয়।
৮৩. চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান
নর মুণ্ড গড়াগড়ি যান।
৮৪. চৈত্রেতে খর খর;
বৈশাখেতে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠতে তার ফুটে;
তবে জানবে বর্ষা বটে।
৮৫. চোরের মার বড় গলা
লাফ দিয়ে খায় গাছের কলা।
৮৬. ছাগলের কাল লম্বা পকর কাল।
মেয়েলোক ইচ্ছে করলে।
৮৭. ছায়া ছাড়ে ছাতার তল।
তল ছাড়ে নিচের তল।
৮৮. ছাতার তলে মুকলের মুখ।
কিন্তু ছাতে নাইকো সুখ।
৮৯. জাওলা ঘাসে।
চাষা ঘাসে।
৯০. জ্যৈষ্ঠে খরা, আষাঢ়ে ভরা
শ্রাবণের তার সাজ না করা।
৯১. জৈষ্ঠেতে ভরা পুত্র
তবে জানবে বর্ষা সত্র।
৯২. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ,
তিন না জানে কারু।
৯৩. জানের পক্ষ ছিন্নে কাম।
৯৪. জাল বিছান মাছের আশি,
তাহেও দিও মনে শশি।
৯৫. ঝরে ফোঁটা বসে ঝাড়ে
কলা হোরে আষাঢ়-শ্রাবণ।
৯৬. ঝাড় দিয়ে বসে বিছিয়ের ফুঁ,
গোল শরিষে পিতা,
ভাদ্র মাসে আমের আগে কাদন বকুনায়।
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় আমার হল,
হাতে কালি পুঁথি ফের বিদ্যে না পড়ে
ধারে।
৯৭. ঝাকে পারি না ছাড়ে বকে
ঝিঁঝিয়ে বসে ধরে কাঁদ মশা,
ফিরে যায় নিজালয় না পড়ে নিদ।
খনা ডেকে বলে সেই সে উদং।
উড়ে পারি বসে না, ঝরিলে কেন হয় না।
৯৮. ডাহিনে বসিয়া বামে দিলে।
'ধনিরে ধনিরে' বলে গোসাঞি।
তবে জনিবে যাত্রা ভালটি।
৯৯. তামাক ক্ষেতে গোবর সার,
তামাক বাড়ে বেজায় বাড়।
১০০. তাল বাড়ে কেঁপে
খেজুর বাড়ে ঝোপে।
১০১. তেলা মাথায় ঢালো তেল,
শুকনো মাথায় ভাঙো বেল।
১০২. তিন নাড়ার সুপারি সোনা,
তিন নাড়ায় নারকেল টনা,
তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল,
তিন নাড়ায় খেরুর ফেল।

১০২. তলা, তেঁতুল, কুল
কিনে বাস্ত নির্মুল।
১০৩. তিথি বারো, স্বনক্ষত্র মাসের সাতো দিন
একত্র করিয়া তারে সাতে কারো হীন
পাতে ভঙ্গ, দুইয়ে লাভ, তিনে শূন্যপক্ষ
চতুর্থকে কাণাকাড়ি, পঞ্চমে সহায়
ষষ্ঠে মৃত্যু, সুখা হলে পায় বহু সুখ
বলা বলে তারা কভু নাহি সুখ।
১০৪. তিন মাঘে মাঘে দিল।
১০৫. তিন পক্ষ ছায় কলা দেখে,
থাক পেছন ঘরে শুয়ে।
১০৫. তিন পাতনে পান
এক আশ্বিনে ধান।
১০৬. ঘাকে দুখ দিতে
ঢালমু দুখ মাঘ মাসের শীতে।
১০৭. ছেলে বলদ না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্বকাল।
১০৮. দশে মিলে করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।
১০৯. দাতার নারিকেল, বন্ধিলের বাঁশ,
কমে না বাড়ে বারো মাস।
১১০. দিন থাকতে বাঁধে আল।
তবে খায় তিন শাল ॥
বারো পুত তেরো নাতি।
তবে করো যোয়ো খেতি ॥
১১১. দিনের মেঘে ধান,
রাতের মেঘে পান।
১১২. দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে।
ঘর করগে পোতা জুড়ে।
১১৩. দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি। সূর্য মণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি কুড়ি সোমে ষোল। পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বায়। শুক্র শনি চৌদ্দ তের ॥
হাঁচি জেঠি পড়ে যাবে। অষ্ট গুণে লভ্য হবে।
১১৪. ধান ধন বড় ধন, আর ধন নাই।
সোনা রূপা কিছু কিছু আর সব ছাই।
১১৫. নদীর ধারে পুঁতলে কচু
কচু হয় তিন হাত উঁচু।
১১৬. নারিকেল গাছে নুনে মাটি,
শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি।
১১৭. নিজের খেলায় অর্ধেকটাই,
পরের খেলায় তিনটি আই।
১১৮. পানীর জল খোলার তলায়,
জাতের মেয়ে কালোর তলায়।
১১৯. যা পাইয়া পাইছে ঘর,
বাপে পুতে কীর্তন।
১২০. পথাবা হথান তাতো পই।
সাতের কাছেতের যা যই।
১২১. মাই ধান। নিড়ুয়ে অন।
১২২. পাটল বুনলে ফাল্গুনে
ফলন বাড়ে দিগুনে।
১২৩. পাতলা তিল ঘন সরিষা।
ফলে বেশি পুরায় আশ।
১২৪. পুকুরেতে পানি নাই, পাখা মেলে বসে
যার কথা মনে করি সেই দেশে হাসে।
১২৫. পুরতাসো মশ, অনাচরণে লক্ষ্মী।
১২৬. পারে না স ফলাইতে
উইঠা থাকে বিয়ান বাইতে।
১২৭. পরের বাড়ির মিঠা
খাইতে বড়ই মিঠা।
১২৮. পূর্ব আষাঢ়ে সঞ্চিতা বয়
সেই বৎসর বন্যা হয়।
১২৯. পাঁচ রবি মাসে সার,
ফসল কিনো ঘরায় যার।
১৩০. পূর্ণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ হয় চিরকাল।
তার বলদের হয় ব্যাত
তার ঘরে না থাকে ভাত।
খনা বলে আমার বাণী,
যে চষে তার হবে জানি।
১৩১. পান লাগালে শ্রাবণে,
খেয়ে না কুলায় রাবণে।
১৩২. পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা
পূর্বের ধনু বর্ষে ভরা।
১৩৩. পৌষ গরমি বৈশাখ জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥
খনা বলেন শোন হে স্বামী
শ্রাবণ ভাদর নাইকো পানি ॥
১৩৪. পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল
যদিন কুয়া তদিন জল।
শনির সাত মঙ্গলের তিন।
আর সব দিন দিন ॥
১৩৫. পোষের শীত মোষের গায়।
১৩৬. ফাল্গুন যেতেতেই মরে চাষ।
১৩৭. বোশেখী পনেরে পানিয়া পাই।
লক্ষ্মী ঘরমীর ঘয় যান।
লক্ষ্মী পাইলে হয় যান।
লক্ষ্মীকে নিখুঁত পাতান।
১৩৭. ভুল ফুলিয়া ফসলে নিলায় যতন করে
ধানিয়া।
আমার কথা মনে পড়বে ফাল্গুন পুনি
দেখিয়া।
১৩৮. ফাল্গুনে না করে বল,
শেষে হয় পরপোল।
১৩৯. ফাল্গুনে আটি, চৈতের আটি,
সেই তিল যায়ে কাটি।
১৪০. বিশ হাত কবি ফাঁক
আম কাঁঠাল পুতে রাখ।
ঘন ঘন গাছ হবে না,
গাছ হবে তো ফল হবে না।
১৪১. বার পুত, তের নাতি
তবে কর কুশার ক্ষেতি।
১৪২. বিপদে পড় নহে ভগ্ন
অভিজ্ঞতায় হবে জয়।
১৪৩. বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।
১৪৪. বারু ডাকে ঘনঘন
শীঘ্র হবে বৃষ্টি জানো।
১৪৫. বাঁশের ধারে হলুদ দিলে
খনা বলে দ্বিগুণ বাড়ে?
১৪৬. বারো বছরে ফলে তাল
যদি না লাগে গরু নাল।
১৪৭. বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়,
সে বৎসর বর্ষা হবে খনা কয়?
১৪৮. বৈশাখের প্রথম জলে,
আগু ধান দ্বিগুণ ফলে।
১৪৯. বাড়ির কাছে ধান পা,
যার মার আগে ছা।
চিনিস বা না চিনিস,
খুঁজে দেখে কিনিস।
১৫০. বিনা বাতাসে বর্ষে তুলা
কোথা রাখবি ধান।
১৫১. বাপ-বেটায় চাষ চাই।
তৎ অভাবে সোদর ভাই।
১৫২. বুড়ো গরু চোরা ধান
যে বেচে সে সেয়ান;
১৫৩. বৈশাখ জৈষ্ঠেতে রতন বোনা।
পাকা পাকা খেলা খেলিয়া পাবে।
১৫৪. বৈশাখে কাকন, জ্যৈষ্ঠেতে জামরা।
আষাঢ়ে বোনরা, শ্রাবণে পাবরা।
১৫৫. বৈশাখী বোনা আখটি বোনা
আখের চর না খান খোনা।
১৫৬. অসাধের ঘরি অষ্টাধনের ঘরি,
বলাই বোনে ধন পাই।
১৫৭. ঘাস খেলার মুলেন নয়,
তিল খেলার খেলেই।
১৫৮. ভাদরে ধরে বলা বোনে ধনধান ঈশান
ধান।
১৫৯. ঘাই ধরো ধন, ভাদর ঈশানে
ঈশান পুষক হয় নাহিক কারো।
১৬০. ভরা হাতে পুত আসে, ঘরি ভরতে যায়
আগে হাতে পিতে আসে ঘরি ভরতে যায়
মধ্য হাতে ভাসুর আসে ঘরি ভরতে যায়
শেষে হাতে ভাইনে আসে ঘরি দিতে চায়
পাঁচা হাতে খোলা আসে মাথা তুলে চায়
হাসু হাতে কাঁথা আসে ঘরি কাঁদে হায়
১৬১. ভাদ্র অর্ধেকে যায় ঈশান,
কাঁধে কোদালে নাচে কৃষাণ।
১৬২. মধু মাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি হয়
শনি।
সে বৎসর শস্যহানি, বলে গেল শনি।
১৬৩. মরুক গরু, ফলুক ধান।
বছর বছর দিবে জান।
১৬৪. মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ।
পূর্ব দিক হতে কর হাল চালন।
১৬৫. মঙ্গলে উষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যায়।
১৬৬. মা মরা সয়, শস পচা সয় না।
১৬৭. মাঘের তিন মাও।
গরু তিন ছাও।
১৬৮. মাঘে উড়িল উলনি
বৃষ্টি হবে ফলাফলি।
১৬৯. মাঘ মাসে বর্ষে দেবা
রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।
১৭০. মাঘে মুষী, ফাল্গুনে চুষি,
চৈতে লতা, বৈশাখে পাতা।
১৭১. মাসে মাসে করে দেওয়া।
রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা।
১৭২. মুলার দুই তুলা।
কৃষকের দুই খুলা।

১৭৩. দেখে ভরে বাড়ে হয় জ্বর।
তবে মাথা ব্যথাই বিষম।
১৭৪. মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যেইবার,
ধরিত্রীকে মঙ্গল বর্ষা, দুর্ভিক্ষ দুষবার,
সোম, শুক্র শুক্র বার,
পৃথ্বী সয় না সংসার ভার।
১৭৫. মেয়ে কষ্ট খাটে,
ছেলে কষ্ট হাটে।
১৭৬. দিবসে মেলা।
না দিবসে মেলা একেলা জলা।
১৭৭. মানুষের মাটি হীরের খনি,
রাজ্যের মাটি সোনা,
চৌত্রের মাটি যেমন তেমন।
বৈশাখের মাটি সোনা।
১৭৮. যদি না হয় আগুনে সৃষ্টি
তাহলে না হয় জাঁতাকলের সৃষ্টি।
যদি না হয় আগুনে পানি,
জাঁতাল হয় টানাটানি।
১৭৯. যে না শোনে ধনায় বচন
সংসারে তার স্থির পতন।
১৮০. যদি বর্ষে মাঘমাসে
টিনা ভাউন্ডি ঘিউয়ে।
১৮১. যদি বর্ষে মঘায়
ধান হবে টিনায়ে।
১৮২. যদি হয় চৈতে বৃষ্টি
তবে হবে ধানের সৃষ্টি।
১৮৩. যদি ঘরে মায়ের স্নেহ
ধনী রাজা পুথি তেহ।
১৮৪. যদি থাকে বন্ধুত্বে মন
নাহ সাঁতরাইতে অনুক্ষণ
১৮৫. যা অযোরে যাকা তাই পাইবে
দুই দুই অযোকে মুক্তাল হবাইবে
১৮৬. দুপায়ে মাইলে দুনুক,
মাপায়ে মারে পুনুক
১৮৭. যাও পাখি বলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।
১৮৮. যদি হয় সুজন
এক পিঁড়িতে নয় জন।
যদি হয় কুজন
নয় পিঁড়িতে নয় জন॥
১৮৯. যদি হয় সুজন, তেতুল পাতায় নজন।
১৯০. যদি ঝরে কাড়ি।
সোনা মাড়ি মাড়ি॥
১৯১. যদি রোয়ে ফাগুনে কলা,
তবে হয় মাশ মশলা।

১৯২. যে চলে ঘরে শেত ভরে।
সকল পাপে চন্দ্র না ছিনে।
পক্ষ না পায় ঘাস পাতে,
ফলল এই তার হয়েছে।
পক্ষপ ছিন্ন তুলসি হয়,
সিংহের কভু পাপ না হয়।
১৯৩. ধুনি ধানের টাকা অনেক দেখি
ঠেঁড় ঘরে দুই ঘিনে যে।
১৯৪. যার জন্মে হলে পুত্রের বর্ষে
তথা তারে দুঃখ দেখে
১৯৫. যে যে মাসের যে যে তৃণি
তাঁর সকলে ধানের কথা।
যে ঘিনে হয় শেষি ঘরেই
অবশ্য বাহু হলে কথা।
১৯৬. যে ভাইবোনের হয় সাপের চাঁদোরে
সকলে সকল হয়, তবে জোঁচোরের
কথা খাসা শরিপুর কথুহয় হয়,
তথা তবে ঘিনিবারে, বাইর সংসর।
১৯৭. যে মেঘে নাই পাতে জোঁচোরে।
নোয়াদি সকল হয়ে টায়।
১৯৮. যেমন তেমন হয়
নই নিয়ে হয়।
১৯৯. হল হলের হয় ঘিনে।
সমর হলের বহু ঘিনে।
২০০. মেঘে ধন, মুষায় পর।
২০১. সন্ধ্যে শশ, সাতে শশ
জানিলে ধন্য পাঁচে যশ।
যদি হয় হয় না সবে সন্ধে
অশ্ব হইবে পারে অনেক।
২০২. সকলে না ঘুঁকুলে বাড়ি
নই না নিচে পরিপাটি,
অকল হয় না অনুভবাড়ি
২০৩. লড়ি পাহে সাহেব জল,
যেনো মাটির অল প্রকৃত।
২০৪. অনুপাতে হলল ঘুনে,
হলের হলের টাকা হনে
২০৫. অল বায়ু মায়ের কোটা
বাঁশের আড়ে দিও ধনের টাকা।
টাকা কিনে পাহের সাড়ে।
দুই কুড়া দুই বাহুর আড়ে।
২০৬. শনের দ্বিতল একের ঈশ।
তিথি নক্ষত্র বারে ভণ।
বসু শতে হারিয়া গাই।
আয়ু প্রমাণ সেই পাই।
কিসের তিথি কিসের বার।

অর্থ নষ্টের ভয় নয়।
কী করে ঘরের বউটিকে,
সারাক্ষণ আসু থাকে ভিজে।
২০৭. পড়েছে যেসু হারায় তলা।
২০৮. ঘুমন্তের বাসে মশার ঝোল।
ঘুমন্তের সাজা পাচ্ছে চোরে
ওয়াজ্জাইদে তল বাড়ুক।
২০৯. কথা শোনে চাষি ভাই
কাজ না দিলে ভাতার নাই।
২১০. চলতে ঝোটা চাষার দেশ
২১১. ঘৈশব জোড়ে হুলুদ বো।
আষাঢ় শাওনে শিউরে ঘাটি,
ভাদরে শিউরে কবরে ঘাটি।
হুলুদ বোলে অনর ভাতে,
মন চাইলে ঘাস বিছনে।
২১২. ঘৈষ শ্রাবণে ঘিনে ঘিনে,
ভাদরে ভাটরে অবশ্যিন।
ওরে ঝোটা চাষার দেশ,
কেতে কেতে শশী যে।
ভাদরে বাপু চাষার ঝোটা
ঘাটির মতো জোরে ঝোটা
ভাতে হবে হুলির শটিল
ভাতে ভোর আশার সম্বল।
২১৩. কথা কওয়, আসর জমি
আর বোনে পাহেই আমি
ভাল হলে হবে পাই ভাত
এবং বছরে ফলে একবার
২১৪. খুড়া ভালমি ভতলা যা।
ভতলা ভালে ভাতে ভা।
হুলি ভবে মাতৃম বোলে।
এত পা না হইবে বাশা।
কথা বলে এরেই ঠেলি।
আমনে না পাহে ভেলী।
২১৫. দোনে ঘোটি ভুবে ঘর।
মানুষে ঘর না করল।
২১৬. শ্রাবণ কন্যা বারে ঈশ্বর
কাঁধে ভোলা নাচে কুহকে।
২১৭. ভোলা মারে মুলা,
তার অনেক মুলা
তার অনেক ধন,
তার অনেক পান,
বচনার বচন
মিথ্যা হয় না কদাচন।

২১৮ অর্থ ভাবি ভেলেন ভেলেন
ভালো ভালো ভাতন
ঘর বাড়িলো পথ ভলে
বুড়ী হয়ে ভাঁচে
২১৯ কথা কয় চুপ চুপ
হাতের পাত ভোয়ে ঘুম
২২০ সময় কম, বর্ষার দিন
ঘরের চুরে চাষার ঘাম
২২১ মুখরিতে ভোয়ে, ভিন্ন ভাটি
ভরল পাতিলে ভিজায় ভাটি
২২২ ভোয়ে ও ঘুম এ ভিন ঘর
বন ঝাঁয়ে বাড়ি ঘর
২২৩ মুখের ভোয়ে পাল পয়
অতির ভোয়ে পাল চলে।
২২৪ সময়ে সময়ে সোনা
সময়ে সময়ে পুনা
২২৫ আঁধে ভালা মুখ
মুখে ভোয়ে চালায় মুখ
২২৬ কথা হয়ে, ভিন ঘিনায়ে
ভল পালায়ে ঘরে পুত্র
২২৭ সময় বাপু ভাটিয়ারী
ভাঁচে পাপ ঘরি ঘরি
২২৮ আঁধে হয়ে ভলই মুখ
মুখে ভোয়ে চালায় মুখ
২২৯ ভোয়ে ঘিনে ঘরে ঘর,
ঘর ঘরিত ঘর ঘর
২৩০ সময় পুকুরে মুকুরো ঘি,
সময় ঘরিত ঘর একটা জী
২৩১ ভোয়ে ঘরে, মুখরে
ঘিনে ঘিনে ঘর ঘর
২৩২ ভোয় ভোয়ালে ভোয়
ঘর ঘরেন ঘর ঘর ঘরে ভোয়ে
২৩৩ ঘরিনে পুরে চালায়ে ভাল
ঘর পুরে ঘরে ভাল।
২৩৪. মুখের কথা, সময়ে সময়ে।
২৩৫. ভোলা ভোলায় ঘরিনে ভোলা,
ঘরিনে ভোলায় ঘরিনে ভোলায়ে।
২৩৬. ঘরে সময়ে দুনে পাই
সবই ঘরে চালায়ে ঘরি।
২৩৭. ঘরিনের পিনে পাত।
মুকলেরও মুনে সাত॥
২৩৮. ঘরে মুল কটি পাত।
পটি পাকিলে সাহে ঘিউপু॥
২৩৯. ঘরি মিনিটির কল পাতে
ভোজনে উপরে যা সাজন।

বিবাহে বিবাদে আর অল্প পরিমাণে ॥
এই সব কথে ইহাই আমি সুশোভন।
অন্য কথে ভঙ্গ নাই হয় কদাচন ॥
মৃত্তিকা নির্মিত অথবা কাচের যে হাঁড়ি।
যন্ত্রপুতকের হাঁড়ি কদাচ না বাড়ি ॥
গোধনের হাঁড়ি হয় মৃত্যুর কারণ।
জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য কারণ।
মিতের মিলয় কারি বুঝহ সুবুদ্ধি।
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে অন্ন হয়।
দক্ষিণেতে অগ্নিজলা আনিহ নিশ্চয় ॥
নৈঋতে কলহ লাভ পশ্চিমেতে ভাব।
বায়ুকোণে নব-বস্ত্র গন্ধ অন্ন লাভ ॥
উত্তরে টিকটিকি হাঁড়ি স্ত্রী-লাভ কারণ।
ঈশানে হৈলে মৃত্যু কে করে খারণ ॥

২৪০. হাঁড়ি ফেটে পড়ে যবে,
অই ঔণ ভার লভ্য না হবে।
২৪১. হাঁড়ি টিকটিকির বাধা।
যে না মানে সে গাধা।
২৪২. ক্ষেতে নাই ধান
উড়ে যায় চাষার প্রাণ।
২৪৩. ক্ষেতের সোনা,
খামিজোর সোনা।
২৪৪. ক্ষেত আর পুত।
যত্ন বিনে যমদূত ॥

খাদ্য, খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক

২৪৫. অধিক খেতে করে আশ,
এর নাম বুদ্ধি নাশ।
২৪৬. আগে তিতা, শেষে মিঠা।
২৪৭. আলো হাওয়া নেই না,
রোগ ভোগে মরো না।
২৪৮. আঁতে তিতা দাঁতে নুন,
উদর ভরো তিন কোন।
২৪৯. আহারান্তে ঘোমে জল,
দৃষ্টি শক্তির বাড়ে বল।
২৫০. আগে খাবে মায়ে,
তবে পাবে পোয়ে।
২৫১. আম নিম জামের ডালে
দাঁত মাজও কুতুহলে।
২৫২. আম লাগাই জাম লাগাই
কাঁঠাল সারি সারি
বারো মাসের বারো ফল
নাহে জড়াজড়ি?
২৫৩. আম খেয়ে খায় পানি,
পেঁদি বলে আমি ন জানি।
২৫৪. আমড়া চালতা তাল-ত
অবাল বৃদ্ধ আল।
২৫৫. ঔষধে পিবে দেও,
নিতিা নিতিা খেয়ো।
২৫৬. আশ্বিনে বান্ধে মাড়ে অগ্রহায়ণে খায়
যে ঘর মাগে সে ঘর পায়।
২৫৭. উনা ভাতে ধুনা বল,
অতি ভাতে রসাতল।
২৫৮. কলা-ভক্ষে কেউো না পায়,
ভাতে কাপড় আতেই যাও।
২৫৯. কচি পাঁঠা বুড়া মেষ
দধির আগা ঘোলের শেষ।
২৬০. খালি পেটে পানি খায়
যার যার বুদ্ধে যায়।
২৬১. খালি পেটে কুল,
ভরা পেটে মূল।
২৬২. খায় না খায় সকাল সাঝ
হয় না হয় দুবরা মাঝ
তাঁর কড়ি কি বৈদ্যে পায়?
২৬৩. খেয়ে মুতে হেগে খায়
তাঁর বাড়ি বৈদ্যে না যায়।
২৬৪. খেয়ে হাগে যাতে জানে
সে মানুষ কোন কাজে মানে?
২৬৫. খেতে বসলে কিসের দয়া,
পাকনা ধান কি জলে যায়।
২৬৬. খানা খায়া করে শব্দ,
অলক্ষী খুশি লক্ষ্মী রুদ।
২৬৭. খেয়ে উদাইয়্যা ভাত,
শইল করে উৎপাত।
২৬৮. গরুর পিঠে তুলসে হাত।
গিরস্থে কভু পায় না ভাত ॥
২৬৯. ঘোল কুল কলা,
তিনে নাশে গলা।
২৭০. চৈতে গিন্না তিতা,
বৈশাখে নালিতা মিঠা,
জৈষ্ঠে অমৃতফল,
আষাঢ়ে দৈ,
শাঙনে সৈ।
ভাদরে তালের পিঠা,
আশ্বিনে শশা মিঠা,
কার্তিকে কৈলসার কোল,
অঘ্রানে ওল।
পৌষে কাঠি,
মাঘে তেল,
ফাল্গুনে পাকা বেল।
২৭১. জল বিনায় তুলে গণ,
যে আগে তাহার অন্ন।
২৭২. জল খেয়ে ফল খায়
রস বলে আয় আয়।
২৭৩. তেতে চালতা,
বৈশাখে নালিতা,
আষাঢ়ে দৈ,
শাঙনে শশা মিঠা,
ভাদ্রে তালের পিঠা।
আশ্বিনে ওল,
কার্তিকে কৈলের কোল।
২৭৪. তপ্ত পথে ঠাণ্ডা দুধ,
যে খায় সে নির্বোধ।
২৭৫. তাল, তেঁতুল দই।
২৭৬. হেথা বলে ঔষধ কই?
তেল তামাকে পিত্ত নাশ,
ঘৃত হয় তা বারো মাস।
তেল মাখবে ধানা খাবা
চিৎ হয়ে শোবে বাবা
ধান দেখে পালবে গাভ
তবে খাবে কাল দমনের ভাত।
২৭৭. তিল, তিসি, তাল, মাখনা
ধান নির্মলে হয় জেয়ান্না।
তিনশ ষাট কাড়ু কলা বুদ্ধে
২৭৮. থাকলা চান্দি মাচায় কদু,
তিন হাত অন্তর এক হাত মাই
ঘনা পুতলে চাষা ভাই।
২৭৯. ততো তিতা চুনা আল।
এই চার পুরুষের কাল।
২৮০. দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের রাজা,
পুব দুয়ারী তাহার প্রজা।
পশ্চিম দুয়ারীর মুখে ছাই,
উত্তর দুয়ারীর খাজনা নাই।
(টীকা: এর ভিন্নপাঠ আছে ২৪ নম্বরে।)
২৮১. দুগ্ধ শ্রম গংগা বারি,
এ তিন উপকরী।
২৮২. দিনে নালিশ। রাতে চালিশ।
২৮৩. নিম-নিন্দিনা তেঁতুলগাছ
ঘরে রোপ না কোন কাল
২৮৪. নিম নিন্দিনা গণ্ডা,
মানুষ কি মরে তণ্ডা।
২৮৫. নিত্যি নিত্যি ফল খাও,
বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।
২৮৬. পেটে ছাই মেখে খাস,
খাঁয় মুখে চিরকাল।
২৮৭. পুরে ঢাল পাঁচপরে ঢাল উপর সেরে
(কদু)
পঁচিশে ফেলে ঘর একশে পূরণ জানে।
২৮৮. পুই, কচু, সেচু,
তিন আমাশয় সেরে
২৮৯. হাজরাকালে ছাড়ে যে ঘরে ঔষধ জল,
তাহার ঘরে বাঁদা না যায়ে ফেল কাল।
২৯০. ঘর আছে জানালা নাই,
রোগ বালে এসে যাই।
২৯১. বাদুর খাসের বাঁশ
এই তিনে বাস্তু নাশ।
২৯২. মাঘে মাসে খাসো ফল,
না খেলে যায় রসাতল।
২৯৩. যেন খেয়ে খায় জল,
জিরা (ঝুনি) খায় কদাচল।
২৯৪. যেন খেয়ে খায় শনি,
জিরা কালে ঘইলাবে অমি।
২৯৫. যত বকুল চিপা,
তিন পুরুষো বাপ।
২৯৬. বিয়ানে খায় আদা বুদ
পেটের আগুন ঘরেই বিদ্য।
২৯৭. ভোরের হাওয়া
লাখে উনকার দাওয়া।
২৯৮. মাসে মাসে বৃদ্ধি, ঘুতে বৃদ্ধি বল
দুগ্ধে কীর্তি বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।
২৯৯. মানুষ মরে যাতে,
গাছপা সারে তাতে।
পচলা সরায় গাছপা সরে,
গোকুলা দিয়ে মানুষ মরে।
৩০০. মুড়ি আর মুড়ি।
সকল রোগের গুড়ি।
৩০১. যত ফুলে ব্যঞ্জন মিষ্ট,
তত ফুলে ভাত নষ্ট।
৩০২. যে একবার হাসে সে সুখী
যে দুইবার হাসে সে জেগী।
যে তিনবার হাসে সে রোগী ॥
৩০৩. শাক অন্ন পান্তা,
তিনো অসুখের হন্তা।
৩০৪. সকালে সোনা,
বিকালে সোনা।
৩০৫. সকাল খেয়ে সকাল ওঠ,
তাঁর কড়ি না বৈদ্যে লোটে।

সংখ্যাসূচক বাংলাজ্ঞান

বাংলা পঠন-পাঠনকালে সংখ্যাশব্দ ব্যবহার করে অনেক প্রতীতি জানতে হয়। সেই প্রতীতিগুলোর গূঢ়ার্থ কী, তা আজকের আধুনিকযুগে বিস্মৃতির প্রায় অতল গর্ভে তলিয়ে গেছে। অথচ একদা সেই প্রতীতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো মানুষের জীবনযাপনকে। মানুষের বোধ, বিশ্বাস, নির্ভরতা আবর্তিত হতো এগুলো দিয়ে। এমনকি নানা কবিতা, কথকতা, পদ্যরচনা ইত্যাদিতে এই প্রতীতিগুলো অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। নিচে সংখ্যাশব্দ ব্যবহার করে বাঙালির জীবনে পরিচিত কতিপয় প্রতীতি তুলে ধরা হলো :

দুই

দুই পক্ষ : কৃষ্ণপক্ষ; শুক্লপক্ষ

(পক্ষ বলতে এখানে মাসের অর্ধ বা মাসার্ধ বোঝানো হয়েছে। চাঁদের হিসেবে প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ আর প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শুক্লপক্ষ। প্রতিটিতে পঞ্চদশ বা পনের তিথি করে ধরা হয়। এই পনের ও পনের তিথিতে মাস পূর্ণ হয়ে থাকে।)

দুই

অয়ন : উত্তরায়ণ; দক্ষিণায়ন

(অয়ন অর্থ গমন, গতি, জন্ম। এখানে সূর্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকে বোঝায়। উত্তর থেকে দক্ষিণে গমনকে দক্ষিণায়ন; দক্ষিণ থেকে উত্তরে গমনকে উত্তরায়ণ বলে। বাংলা বছরের ১১ই পৌষ থেকে ৬ মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ৬ মাস দক্ষিণায়ন হিসেবে গণনা করা হয়।)

তিন

ত্রিকাল : ভূত; বর্তমান; ভবিষ্যৎ

(যেকাল অতীত হয়েছে তা ভূতকাল। ভূতকাল আবার ত্রিবিধ : অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ। যেকাল চলমান তাকে বর্তমানকাল বলে। বর্তমানকাল চতুর্বিধ : প্রত্যুৎপন্নভূত, ঐতিহ্য, নিত্যবৃত্ত, সামীপ্য। যেকাল সম্পূর্ণরূপে না ঘটিয়াছে। ভবিষ্যৎকাল ত্রিবিধ : আসন্ন, দূরভব্য।)

ত্রিসন্ধ্য : পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ণ; সায়াহ্ণ

ত্রিকুল : মাতৃকুল; পিতৃকুল; শ্বশুরকুল

ত্রিধারা : মন্দাকিনী; অলকানন্দা; ভোগবতী

(শাস্ত্রে আছে, গঙ্গার একধারা স্বর্গে, একধারা মর্ত্যে, একধারা পাতালে গিয়েছে।)

ত্রিপিটক : সূত্র; বিনয়; অভিধর্ম

(বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থ ত্রিপিটক তিন খণ্ডে রচিত।)

ত্রিফলা : হরীতকী; আমলকী; বহেরা

(এই তিন ফল একত্র ও নিয়মিত ভক্ষণে বহু দীর্ঘায়ু পেয়ে থাকে।)

ত্রিবর্গ : ভারতীয় ঐতিহ্যে তিনের সমন্বয় সম্মিলন আছে। তিনের সম্মিলনকে ত্রিবর্গ বলে। যেমন। ধর্ম-অর্থ-কাম; সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ; ব্রহ্ম-বায়ু-শুক্লি; উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস ইত্যাদি।

ত্রিবেণী : গঙ্গা; যমুনা; সরস্বতী

(বেণী অর্থ নদী। ভারতের উত্তর মধ্যের প্রয়াগে উল্লিখিত তিনটি নদীর মিলিত ধারা ত্রিবেণী।)

ত্রিভুবন : স্বর্গ; মর্ত্য; পাতাল

ত্রিরত্ন : বুদ্ধ; ধর্ম; সংঘ

(বৌদ্ধ ধর্ম মতে এই তিন পবিত্র আধার।)

ত্রিশক্তি : কালী; তারা; ত্রিপুরা

(পুরাণমতে তিন দেবীর সম্মিলিত শক্তি।)

ত্রিব্যঞ্জন বা গরমমসলা : দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ

চার

চতুর্বর্গ : ধর্ম; অর্থ; কাম; মোক্ষ

(এগুলোকে পুরুষার্থ বোঝায়। একজন পুরুষের এই চতুর্বর্গই পূরণ করা প্রয়োজন।)

চতুর্দশ : রামায়ণ; বৈশাখাব্দ; জগন্নাথ।

চতুর্ধাম (ভারতের চতুর অঞ্চলের মথুরা জেলা অবস্থিত তিনটি তীর্থ স্থান। উল্লেখ্য, মথুরা থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের অতি পরিচিত স্থান।)

চতুর্বর্ণ : ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয়; বৈশ্য; শূদ্র

(বর্ণপ্রথা জাতি চতুষ্টয়। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ; বৈশ্য কৃষি ও গবাদি পশু সেবা, তাতে জীবিকা নির্বাহ না হলে বণিজ্য কর্মের অধিকারী।)

চতুর্যুগ : সত্য, ত্রেতা; দ্বাপর; কলি

(বর্ষ মতে, সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০ বৎসর; ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০ বৎসর; দ্বাপরযুগ ৮,৬৪,০০০ বৎসর স্থায়ী ছিল। ৩৮,৮৮,০০০ বৎসর অন্তে শুক্রবারের মাঘী পূর্ণিমাতে কলিযুগ আরম্ভ হয়। কলিযুগ ৪,৩২,০০০ বৎসর স্থায়ী হবে। এ সময় মানুষের আয়ু ১২০ বৎসরে পৌঁছাবে।)

চতুর্বেদ : ঋক্; যজুঃ; সাম; অথর্ব

(হিন্দুদের মুখ্য ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ চারটি। ব্রাহ্মণ অনেকেই চারটি বেদই মুখস্থ করতেন। যাদের বলা হতো চতুর্বেদী বা চৌবে। যাঁরা তিনটি বেদ মুখস্থ করতেন তাঁদের ত্রিবেদী বা ত্রিবেদারী বলা হতো। যারা দুটো বেদ মুখস্থ করতেন তাদের দ্বিবেদী বলে অভিহিত করা হতো।)

চতুরঙ্গ : হস্তী; অশ্ব; রথ; পদাতিক

(এটি কুরুক্ষেত্রের সৈন্যযোজনা। তবে দাবা বা শতরঞ্জ খেলাতেও এমন চতুরঙ্গ সমাহার পরিদৃষ্ট হয়।)

চতুরাশ্রম : ব্রহ্মচর্য; গার্হস্থ্য; বানপ্রস্থ; সন্ন্যাস

(মানবজীবনে চারটি পর্ব ধরা হয়। শিক্ষাজীবন ব্রহ্মচর্য, গৃহী জীবন গার্হস্থ্য, সংসার থেকে অবসর নেবার প্রস্তুতিপর্ব বানপ্রস্থ আর সংসার ত্যাগ করে তীর্থধামে চলে যাওয়া হলো সন্ন্যাস। এই হলো চার আশ্রম।)

পাঁচ

পঞ্চ 'ক' : কেশ; কাঙ্গি (চিরুনি); কঙ্কন (চুড়ি); কাচ্ছ; কৃপাণ (সাঁইত্রিশ অনুচ্ছেদে পঞ্চ 'ক'-এর ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই সমর্থিত হয়ে আসছে।)

পঞ্চ 'ম' : মদ; মাংস; মৎস; মুদ্রা; মৈথুন

(হিন্দু তান্ত্রিক সাধনায় জীবনে আসক্তজন পঞ্চ 'ম' তে আবেশিত থাকেন। বলা হয়, পঞ্চ 'ম' পঞ্চতত্ত্বের সব তৈরি করে।)

পঞ্চকল্প বা পঞ্চকর্ম : সংহার, উদ্গম; পোষণ; তাপন; রঞ্জন

(পুরাণ অনুসারে কামদেব এই পাঁচটি বাণের অধিকারী। উল্লিখিত পঞ্চবাণ ছাড়াও অন্য পাঁচটি বাণের নাম পাওয়া যায়। যেমন : অরবিন্দ; অশোক; চূত; নবমল্লিকা; কোকনদ। এগুলো ফুলের নামে। পঞ্চশরই পঞ্চবাণ।)

পঞ্চগঙ্গা : ভাগীরথী; গোমতী; কৃষ্ণবেণী; পিনাকিনী; কাবেরী

পঞ্চনদ : কনকনদ; বিপাশা; ইরাবতী; চন্দ্রভাগা; বিতস্তা (ঝিলম)

(পাঞ্জাবকে পঞ্চনদ বলা হয়। কারণ পাঞ্জাব দিয়ে উল্লিখিত পাঁচটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।)

পঞ্চনদী : কিরণা; পুরুপাণা; সরস্বতী; গঙ্গা; যমুনা

(এই পাঁচটি নদীকে সৌভাগ্য ও পুণ্যপ্রবিষয় বলে মনে করা হয়।)

পঞ্চধান্য : শালি; ব্রীহি; শূক; শিম্বি; ক্ষুদ্র

(ধানের পাঁচটি প্রকার। এ ধানগুলো খুবই প্রার্থিত বলে মনে করা হয়।)

পঞ্চবটী : অশ্বত্থ; বট; বিল্ব; আমলকী; অশোক

(দণ্ডকারণ্যস্থ বিশেষ বন। পাঁচ প্রকার বৃহৎ বৃক্ষ বা বটের সমাহার আছে যে বনে। রামায়ণে রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পঞ্চবটী বনে বনবাসে গিয়েছিলেন।)

পঞ্চরত্ন : নীলকান্ত; হীরক; পদ্মরাগ; মুক্তা; প্রবাল

পঞ্চভূত : ক্ষিতি; অপ্; তেজঃ; মরুত; ব্যোম

(ক্ষিতি অর্থ পৃথিবী; অপ্ অর্থ পানি বা জল; তেজঃ অর্থ দীপ্তি বা তাপ; মরুত অর্থ বায়ু আর ব্যোম অর্থ নভোমণ্ডল।)

পঞ্চগব্য : দুগ্ধ; দধি; ঘৃত; গোমূত্র; গোবর

(গরু প্রাচীনকাল থেকেই অতি উপকারী প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। দুধ-দৈ-ঘি পঞ্চামৃতের তিনটিই গরু থেকে মেলে। দুধ-দৈ-ঘি ছাড়াও গোবরে জমিতে উর্বরতা বৃদ্ধির সার এবং গোমূত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে রোগের ঔষধ হয়ে থাকে।)

পঞ্চগুণ : রূপ; রস; গন্ধ; স্পর্শ; শব্দ

পঞ্চতিক্ত : নিম; গুলঞ্চ; বাসক; পলতা; কণ্টকারী

(স্বাদে তেতো কিন্তু দেহের রোগ নিরাময়ে অব্যর্থ ভেষজ। কণ্টকারী হলো কেঁটি গাছ, পলতা হলো পটলের পাতা।)

পঞ্চশস্য : ধান; যব; মাষ; তিল; মুগ

পঞ্চামৃত : দধি; দুগ্ধ; ঘৃত; মধু; চিনি

পঞ্চপল্লব : আম; অশ্বত্থ; পাকুড়; বট; যজ্ঞডুমুর

পঞ্চপাণ্ডব : যুধিষ্ঠির; ভীম; অর্জুন; নকুল; সহদেব

('মহাভারতে' বর্ণিত পাণ্ডুপুত্র এই পাঁচজন। পিতার নাম পাণ্ডু বলে তাঁদের পাণ্ডব বলা হয়।)

পঞ্চকন্যা : অহল্যা; তারা; মন্দোদরী; কুন্তী; দ্রৌপদী

(অহল্যা ব্রহ্মার মানসকন্যা, গৌতম ঋষির স্ত্রী ও শতানন্দের মা। তারা হলেন কিষ্কিন্ধ্যার রানি ও হনুমান বালীর স্ত্রী। মন্দোদরী অর্থ কোমল বা মন্দ উদর বিশিষ্টা। তিনি রাবণের স্ত্রী। উপরের তিনজনই 'রামায়ণ'র চরিত্র। কুন্তী 'মহাভারতে'র চরিত্র ও পাণ্ডুর স্ত্রী। তিনি একাধারে কর্ণ ও অর্জুনের মাতা। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। মহাকাব্যের প্রবাদপ্রতিম এই পঞ্চনারী বা পঞ্চকন্যা। আদর্শ ও কর্তব্যে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়ায় তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়।)

পঞ্চোপচার : গন্ধ; পুষ্প; ধূপ; দীপ; নৈবেদ্য

(উপচার অর্থ প্রার্থনার অনুষঙ্গ। প্রার্থনাকালে এই পঞ্চ-উপচার যুক্ত থাকলে প্রার্থনা ও পরিবেশ যথার্থ হয়।)

পঞ্চায়ুধ : তরবারি; শক্তি; ধনুক; ধর্ম; পরশু (কুঠার)

(আয়ুধ অর্থ অস্ত্র। যুদ্ধকালে এই পঞ্চায়ুধের ব্যবহার করা গেলে জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল।)

পঞ্চ ইন্দ্রিয় : চক্ষু; কর্ণ; জিহ্বা; নাসিকা; ত্বক

(ইন্দ্রিয়কে ইংরেজিতে সেন্স বলে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ পৃথিবীর রূপরসগন্ধ গ্রহণ করে।)

পঞ্চতীর্থ : গয়া; গঙ্গা; প্রয়াগ; পুষ্কর; কুরুক্ষেত্র

পঞ্চবায়ু বা পঞ্চপ্রাণ : প্রাণ; অপান; সমান; উদান; ব্যান

(পঞ্চবায়ুকে পঞ্চপ্রাণও বলে। হৃদয়ে থাকে প্রাণবায়ু, গুহ্যে থাকে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমানবায়ু, কণ্ঠে থাকে উদানবায়ু, আর সর্বদেহব্যাপী থাকে ব্যানবায়ু।)

পঞ্চমুক্তি : সার্ষ্টি; সারূপ্য; সালোক্য; সাযুজ্য; নির্বাণ

(ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্যশালী হয়ে মোক্ষপ্রাপ্তি হলো সার্ষ্টি; সারূপ্য হলো ঈশ্বরের তুল্য রূপ বা আকার লাভ; সহ লোক হলো সালোক্য; সহ যোগ বা অভেদ হলো সাযুজ্য আর পরমানন্দ হলো নির্বাণ।)

পঞ্চলবণ : সৌবর্চল; সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ; সামুদ্র

(উদ্ভিদ, খনি, সমুদ্রজাত এবং মানবসৃষ্ট ইত্যাদি পাঁচ প্রকারের লবণের সমাহারে পঞ্চক্ষার বা পঞ্চলবণ।)

পঞ্চসুগন্ধিক : কর্পূর; কঙ্কোল; লবঙ্গ; গুবাক; জাতিফল

(কর্পূর গাছ থেকে আহরণ করা হয়। এটি ঔষধি ও সুগন্ধের জন্য ব্যবহার হয়। জাতিফল হলো জায়ফল। গুবাক সুপারি। কঙ্কোল সুগন্ধবিশেষ।)

পাঁচফোড়ন : মৌরি, মেথি; জিরে; রাঁধুনি; কালো জিরে

পাঁচ মহাসাগর : প্রশান্ত; ভারত; উত্তর (সুমেরু); দক্ষিণ (কুমেরু); আটলান্টিক মহাসাগর।

ছয়

ষড়ঋতু : গ্রীষ্ম; বর্ষা; শরৎ; হেমন্ত; শীত; বসন্ত

ষড়ঙ্গ : দধি; দুগ্ধ; ঘৃত; গোমূত্র; গোময় বা গোবর; গোরোচনা

(গোরোচনা হলো গরুর মস্তিষ্কজাত বিশেষ প্রাকৃতিক রং; গোমূত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রোগ নিরাময়ের ঔষধ; গোময় সার এবং প্রথম তিনটি [illegible] হিসেবে বিবেচ্য।)

ষড়রস : কটু; তিক্ত; কষায়; লবণ; অম্ল; মধুর

ষড়রিপু : কাম; ক্রোধ; লোভ; মোহ; মদ; মাৎসর্য

(মাৎসর্য অর্থ পরশ্রীকাতরতা। বলা হয়, ষড়রিপু মানুষের সর্বনাশের মূল শত্রু।)

ষট্‌চক্র : মূলাধার; স্বাধিষ্ঠান; মণিপুরক; অনাহত; বিশুদ্ধ; আজ্ঞা

ষট্‌কর্ম : যজন; যাজন; অধ্যয়ন; অধ্যাপন; দান; প্রতিগ্রহ

(যজন অর্থ পূজা; যাজন অর্থ পৌরোহিত্য; অধ্যয়ন অর্থ পড়ালেখা; অধ্যাপন অর্থ পড়ানো; দান অর্থ উদ্দেশ্য ত্যাগ করে কিছু দেওয়া; প্রতিগ্রহ হলো দানগ্রহণ। বলা হয়, [illegible] মানুষগুলো এই ষট্‌কর্মে নিয়োজিত হতে পারেন।)

সাত

সপ্তসিন্ধু বা সাতসাগর : সাগরের জল (লবণ); ইক্ষুরস (চিনি); দুধ (ক্ষীর); ঘি (সর্পি); দধি; জল; সুরা (মদের রস)।

(বাংলায় সাতসমুদ্র বা সাতসাগর দুই অর্থে ব্যবহার হয়। প্রথমটি রূপকথার গল্পের উপাদান হয়ে, যার কোনো ভিত্তি নেই। শুধু সাত সাগরই নয়, সঙ্গে তের নদীর কথাও বলা হয়। আসলে সাগর পাঁচটি আর নদী অসংখ্য। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাতসাগর বা সাতসমুদ্র হলো এই তরলসমূহ যা পান করলে মানুষ সুস্বাস্থ্যে দীর্ঘজীবী হয়।)

সাত মহাদেশ : এশিয়া; ইউরোপ; আস্ট্রেলিয়া; আফ্রিকা; উত্তর আমেরিকা; দক্ষিণ আমেরিকা; অ্যান্টার্কটিকা।

সপ্তপাতাল : অতল; বিতল; সুতল; তলাতল; মহাতল; রসাতল; পাতাল

(কল্পিত অধোলোকের এই সাতটি স্তর ধরা হয়।)

সপ্তস্বর্গ : ভূলোক; ভুবর্লোক; স্বর্লোক; জনলোক; মহর্লোক (মহোলোক); তপর্লোক; সত্যলোক

সপ্তধাতু : বায়ু; পিত্ত; কফ; রক্ত; শুক্র; মাংস; অস্থি

([illegible] সপ্ত [illegible] হয়।)

সপ্তকাণ্ড : আদি বা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা বা যুদ্ধ, উত্তর

(মহর্ষি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' [illegible])

সপ্তদ্বীপ : জম্বু; প্লক্ষ; শাল্মলি; কুশ; ক্রৌঞ্চ; শাক; পুষ্কর

([illegible])

সপ্তর্ষি : ক্রতু; পুলহ; পুলস্ত্য; অত্রি; অঙ্গিরা; মরীচি; বশিষ্ঠ

([illegible])

সপ্তরথী : দ্রোণাচার্য; কর্ণ; কৃপাচার্য; অশ্বত্থামা; [illegible]; দুর্যোধন; দুঃশাসন

('মহাভারতে'র এই সাত মহারথী [illegible] অভিমন্যুকে বধ করেছিলেন।)

সপ্তসুর : ষড়জ; ঋষভ; গান্ধার; মধ্যম; পঞ্চম; ধৈবত; নিষাদ

(সংগীতে এই সাতটি সুর সংক্ষেপে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি অথবা স-র-গ-ম-প-ধ-নি বলা হয়। ময়ূরের স্বর থেকে সা; বৃষের স্বর থেকে রে; ছাগের স্বর থেকে গা; ক্রৌঞ্চের স্বর থেকে মা; কোকিলের স্বর থেকে পা; ঘোড়ার স্বর থেকে ধা; হাতির স্বর থেকে নি সুরের সৃষ্টি হয়েছে;

উৎপত্তিতে এসে C-D-E-F-G-A-H ধরা হয়। এই সপ্তসুরের আবার কোমল, অতিকোমল, তীব্র (কড়ি), অতি তীব্র ভেদ আছে।)

সাতবার : রবি; সোম; মঙ্গল; বুধ; বৃহস্পতি; শুক্র; শনি

(রবি অর্থ সূর্য, সোম অর্থ চন্দ্র, বাকি পাঁচটি নাম গ্রহের নামানুসারে।)

আট

অষ্টবসু : ধর; ধ্রুব; সোম; বিষ্ণু; অনল; অনিল; প্রত্যূষ, প্রভাস

(গঙ্গা থেকে উৎপন্ন এই অষ্টপুত্র বা গণদেবতাকে অষ্টবসু বলা হয়।)

অষ্টধাতু : স্বর্ণ; রৌপ্য; তাম্র, পিত্তল; কাংস্য; রূপু (রাং), সীসক; লোহ

(লোকবিশ্বাস আছে অষ্টধাতুর অলংকার পরিধান করলে রোগশোক থেকে মুক্তি ঘটে। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।)

অষ্টকাল : প্রাতঃ; পূর্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ণ; অপরাহ্ণ; সায়াহ্ণ; প্রদোষ; মধ্যরাত্রি; নিশান্তক।

(চব্বিশ ঘণ্টা দিনকে এভাবে আটভাগে ভাগ করা হয়।)

অষ্টনাগ : বাসুকি (ভোগীন্দ্র); তক্ষক; জনত্; পদ্ম; মহাপদ্ম; কূর্মীর; ককটি; শঙ্খ

(পুরাণানুসারে নাগকুলের মধ্যে এই আট নাগই শ্রেষ্ঠ ও বিচিত্র।)

অষ্টনায়িকা : মঙ্গলা; বিজয়া; ভদ্রা; জয়ন্তী; অপরাজিতা; নন্দিনী; নারসিংহী; কৌমারী

(এই আটজন নায়িকাশ্রেষ্ঠ। তাদের গুণাবলি অতুলনীয় এবং তারা মনোহর। কিন্তু তারা ছাড়া অষ্টনায়িকা দিয়ে রসশাস্ত্রে কোনো এক নায়িকার আট রূপকেও বোঝায়। যেমন : অভিসারিকা; বাসকসজ্জা; উৎকণ্ঠিতা; বিপ্রলব্ধা; খণ্ডিতা; কলহান্তরিতা; স্বাধীনভর্তৃকা; প্রোষিতভর্তৃকা।)

অষ্টসিদ্ধি : অণিমা; লঘিমা; গরিমা; প্রাপ্তি; প্রকাম্য; মহিমা; ঈশিত্ব; বশিত্ব

অষ্টদিগগজ : ঐরাবত; পুণ্ডরীক; বামন; কুমুদ; অঞ্জন; পুষ্পদন্ত; সার্বভৌম; সুপ্রতীক

অষ্টধর্ম : সত্য; শৌচ; অহিংসা; অনুসূয়া; ক্ষমা; অনুশংসা; অকার্পণ্য; সরলতা

(এখানে ধর্ম বলতে মানবধর্মকে বোঝানো হয়েছে। মানবচরিত্রে এই আটটি গুণ থাকলে তবে সে আইনের সমর্থিত না হলেও ভালো মানুষ বলে গণ্য হয়।)

নয়

নবগ্রহ : সূর্য; চন্দ্র; মঙ্গল; বুধ; বৃহস্পতি; শুক্র; শনি; রাহু; কেতু

(এই গ্রহের নামকরণ পৌরাণিক সূত্রে হলেও, আধুনিক যুগে এই নামগুলো পাশ্চাত্য প্রভাবিত হয়ে মাত্র।)

নবরত্ন : ধন্বন্তরি; ক্ষপণক; অমরসিংহ; শঙ্কু; বেতালভট্ট; ঘটকর্পর; কালিদাস; বরাহমিহির; বররুচি (সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজসভার এই নয়জন মহাপণ্ডিতকে নবরত্ন বলা হতো।)

আবুল ফজল; ফৈজি শাল; বীরবল; তানসেন; আব্দি ওদ্দি; মানসিংহ; দো পিয়াজা; রাজা টোডর মল

(সম্রাট আকবরের রাজসভায় এই নয়জনকে নবরত্ন বলা হতো।)

পুরাণবিশারদ গদাধর তর্কালঙ্কার; সাহিত্য কালিদাস-কন্দর্প; জ্যোতিষী অনুকূল বাচস্পতি; আয়ুর্বেদাচার্য গোবিন্দরাম; পণ্ডিত রাধেশ বিদ্যালঙ্কার; কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি; ঈশ্বর তর্কসিদ্ধান্ত; ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; গোপাল ভাঁড় বিদূষক (এই নয়জনকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নবরত্ন বলা হয়।)

নবরস : আদি বা শৃঙ্গার; হাস্য; করুণ; রৌদ্র; বীর; ভয়ানক; বীভৎস্য; অদ্ভুত; শান্ত

(রসশাস্ত্র অনুসারে এই নয় প্রকার রস রয়েছে থাকে।)

নবগুণ : আচার; বিনয়; বিদ্যা; প্রতিষ্ঠা; তীর্থদর্শন; নিষ্ঠা; আবৃত্তি; তপ; দান

(মানবজীবনে এই নবগুণ অর্জন করা জরুরি। প্রাচীনকালে মানুষ এই নবগুণে গুণান্বিত হতে চেষ্টা করতো।)

নবশায়ক বা নবশাক বা নবশাখ : মালি; মালাকার; সদ্‌গোপ; তৈলী (তেলি); নোনা (ময়রা); বারুই; কুম্ভকার; কর্মকার; নাপিত

(পুরাণেতে প্রজাপতিদের এই নয়জনকে আদি বলা হয়েছিল গাণিত সমাজে। সে অনুসারে গ্রহের মাঝের নামটি হয়েছে।)

দশ

অন্যান্য

একাদশরুদ্র : অজ; একপাদ; অহিব্রধ্ন; পিনাকী; অপরাজিত; ত্র্যম্বক; মাহেশ্বর; বৃষাকপি; শম্ভু; হরণ; ঈশ্বর

(শুধু অর্থ শিব। শিবের আরো নাম আছে। তবে তিনি একাদশ তনু বা দেহ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁকে একাদশতনুও বলা হয়। প্রতিটি রুদ্রের পৃথক নাম আর এটাই হলো একাদশরুদ্র।)

দ্বাদশরাশি : মেষ; বৃষ; মিথুন; কর্কট; সিংহ; কন্যা; তুলা; বৃশ্চিক; ধনু; মকর; কুম্ভ; মীন

(জ্যোতিষ শাস্ত্রে মনুষ্যপুরুষরূপ এই রাশির ভাগ্যের কথা বলা হয়। ভাগ্যবিশ্বাসীগণ রাশিচক্র ধারণ স্থাপন করেন।)

চতুর্দশমনু : স্বায়ম্ভু; স্বারোচিষ; উত্তম; তামস; রৈবত; চাক্ষুষ; বৈবস্বত; সাবর্ণি; দক্ষসাবর্ণি; ব্রহ্মসাবর্ণি; ধর্মসাবর্ণি; রুদ্রসাবর্ণি; দেবসাবর্ণি; ইন্দ্রসাবর্ণি

দশদিক : পূর্ব; পশ্চিম; উত্তর; দক্ষিণ; ঈশান; অগ্নি; নৈঋত; বায়ব্য; ঊর্ধ্ব; অধঃ

(ঊর্ধ্ব অর্থ ওপর, অধঃ অর্থ নিচ। এই দশদিক ধারণা করে দশদিক্‌পাল দেবতা।)

দশদিক্‌পাল : ইন্দ্র; অগ্নি; যম; নৈঋত; বরুণ; বায়ু; কুবের; ঈশান; ব্রহ্মা; অনন্ত

(দশদিক্‌পাল দেবতা দশদিকের রক্ষক।)

দশাবতার : মৎস্য; কূর্ম; বরাহ; নৃসিংহ; বামন; পরশুরাম; রাম; বলরাম; বুদ্ধ; কল্কি

(বিষ্ণুর দশ অবতার। কল্কি অবতার এখনো আসেনি। তিনি আসবেন কলিযুগের শেষে।)

দশমহাবিদ্যা : কালী; তারা; ষোড়শী; ভুবনেশ্বরী; ভৈরবী; ছিন্নমস্তা; ধূমাবতী; বগলা; মাতঙ্গী; কমলা

(মতে কালী হচ্ছেন পার্বতীর এই দশ মহাবিদ্যা অবতারে বিভক্তি।)